তরী হতে তীর

রিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৫৭

প্রকাশক :
দিলীপ বসু
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০১২

প্রচ্ছদ : শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক :
সিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিত্যস্মরণীয়েষু

'ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ
তুভ্যমেব সমর্পয়ে।'

ভূমিকা

'তরী হতে তীর' আখ্যাটি যে আমার নিজস্ব উদ্ভাবন নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাঠকেরা সম্ভবত সবাই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে এটিকে তুলে নিয়েছি। লেখা প্রায় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসম্পূর্ণ গ্রন্থের এই নামকরণ করতে আমার মন চেয়েছে— একটু সভয়ে, কারণ তীরে উপনীত হওয়ার মতো সুকৃতি আমার নেই। মনে পড়ে যাচ্ছে, বোধ হয় ১৯৫৯ সালে জওয়াহরলাল নেহরুকে লেখা একটা চিঠিতে বলেছিলাম আমার জীবন এমন বাত্যাবিক্ষুব্ধ নয় যে পোতাশ্রয়ের শান্তি আমি দাবি করতে পারি। তবু জীবনের তরী থেকে দূরায়ত হলেও তীরের সাক্ষাৎ কথঞ্চিৎ পেয়েছি এবং সেজন্যই শুধু দিন যাপনের গ্লানি নয়, তার সার্থকতারও স্বল্প সন্ধান অন্তত পেয়েছি। এরই আভাস যদি রচনায় মেলে তো কৃতার্থ হব।

আমি জানি যে যাই বলি-না কেন, অনেকেই এই গ্রন্থকে বলবেন 'স্মৃতিচারণ' (যে শব্দটিতে আমার অরুচি আর যে ব্যাপারে আমার মতো ব্যক্তির অনধিকার আমার কাছে প্রশ্নাতীত)। কেউ কেউ হয়তো একে আত্মজীবনী আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত বোধ করবেন না। এতে আমি অসুখী। নিজেকে কেন্দ্রবিন্দু করে বিবিধ বর্ণনা আমার অভিপ্রায় নয়— আশা করি ঐ অকর্মের দায়ে দায়ী বলে অভিযুক্ত হব না। নিজের কথা অবশ্য এড়িয়ে চলা সম্ভব হয় নি। মাঝে মাঝে একটু বেশি-ই হয়তো বলে ফেলেছি। তবে চেয়েছি, আন্তরিকভাবে চেয়েছি নিজের পরিবেশের ছবি ফুটিয়ে তুলতে ; অনেক বিচিত্র মানুষ আর বহুবিধ ঘটনা যা আমার প্রত্যক্ষে এসেছে তার বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছি ; আর প্রাণপণে আশা করেছি যে যে-প্রত্যয় আমার জীবনকে স্বার্থমগ্ন তুচ্ছতা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বলে বিশ্বাস করি, সেই প্রত্যয় সহজ স্বাভাবিক ধরনে পাঠকের চোখে প্রতিভাত হয়ে যেন ওঠে। শুধু এজন্যই একেবারে কটমট শোনালেও গ্রন্থের বিশ্লেষণী আখ্যা হ'ল 'পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত'। এই অনভিপ্রেত

অনুপ্রাসবাহুল্যে একটু পীড়িত বোধ করছি ; তবে ভরসা করব গ্রন্থের ব্যাখ্যা হিসাবে কথাগুলি নির্ভুল।

সম্পূর্ণ নিজের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে লেখাটি আপাতত শেষ করলাম। বহু ক্ষেত্রে এমন ঘটেছে যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কী লিখেছি ভুলে গিয়ে পরবর্তী অধ্যায় লিখে চলেছি, হয়তো বা এমন স্থানে বসে যেখানে শান্তচিত্তে চিন্তাও খুব সহজ নয়। রোজনামচা লেখার অভ্যাস কোনো কালে ছিল না ; অনেক বড়ো হয়ে মোটামুটি 'ডায়েরি'-তে কবে কার সঙ্গে দেখা তার আংশিক ইঙ্গিত খুঁজে হয়তো পেতাম, কিন্তু একত্র সেগুলি জড়ো করে উঠতেও পারি নি। অবশ্যই এজন্য কিছু ভুলভ্রান্তি আর পুনরুক্তি হয়ে থাকবে, তবে অধুনা স্মৃতিশক্তি একটু হ্রাস পেতে থাকলেও সে-বিষয়ে আজও সামান্য অহংকার হয়তো পাঠকেরা মার্জনা করতে পারবেন। অন্তত কয়েকটা ভুল ঘটে গেছে বলে বিশ্রী লাগছে, তাই এখানেই উল্লেখ করছি। আমার বন্ধু হুমায়ুন কবিরের কলেজ-জীবনে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'স্বপ্নসাধ', কিন্তু কী ভূত চেপে ছিল মাথায়, 'প্রুফ্' দেখার সময় পর্যন্ত মনে ঘুরছিল বহুখ্যাত জ্যেষ্ঠ কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'স্বপনপসারী'। ১৪৫ পৃষ্ঠায়, পাঠকের সহৃদয়তা যাচ্ঞা করছি, ভুলটি তাঁরা দয়া করে শুধ্রে নেবেন। আরো কিছু ভুল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে জানি ; তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর নাম একাধিকবার আমার নির্দেশ উপেক্ষা করে 'তুলসীচরণ' বলা হয়েছে। তা হলেও বলতে পারি যে সচরাচর বাংলা বইয়ে ছাপার ভুল যে অনুপাতে থেকে যায় এখানে তার চেয়ে কম ভুল দেখা যাবে।

যথাসম্ভব সত্যকথনের চেষ্টা লেখায় করেছি। একেবারে আত্মাকে বিবস্ত্র করে সর্বজনের সামনে দাঁড় করাবার সাধ্য আমার মতো ব্যক্তির নেই, তাই হয়তো একেবারে সব কথা খুলে বলা সম্ভব হয় নি, পাঠকের কাছে তার প্রয়োজনও নেই জানি। তবে বলব যে সজ্ঞানে সত্য গো' ('suppressio veri') করি নি, অসত্যের আভাস ('suggestio fals. দিতে চাই নি। ব্যক্তি ও ঘটনার মূল্যায়নে একেবারে কঠোর হয়ে উঠ সংকোচ বোধ করেছি— নিজেকে পুরোপুরি কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে কুণ্ঠা যখন বর্জন করতে পারি নি, তখন অপরের বিচার সে ভাবে করব কেমন

করে ? 'Tout comprendre, c'est tous pardonner' ('সব-কিছু বোঝা মানে সব-কিছু মার্জনা করা') অভিজাত মনস্বী Rochefoucauld-এর এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করি না, কিন্তু নিজেকে বিচারকের উচ্চাসনে বসাবার সংগতি বা প্রবৃত্তি নেই— তাই রচনার কোথায় যেন Somerset Maugham-এর একটা উক্তি উদ্ধৃত করেছি : 'There's one job I do not care for, God's on Judgment Day' ! এতৎসত্ত্বেও অবশ্য বহু ব্যক্তি ও ঘটনা সম্পর্কে আমার মাঝে মাঝে প্রতিকূল মানসিক প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পাঠক পাবেন।

এই রচনার পরিসমাপ্তি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে। যে সুহৃজ্জনের নির্বন্ধাতিশয্যে এ-ধরনের লেখায় হাত দিয়েছি, তাঁদের আগ্রহ ভারত ভূখণ্ড স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কথা যেন লিখি। পারব কিনা বলা সম্ভব নয়— সময় এবং সাধ্যে কুলোবে কিনা জানা নেই, আর আপাতত ভাবি, পাঠক সাধারণের মনে এই রচনার প্রতিক্রিয়া না জেনে কলম গুটিয়ে রাখব, একটানা এতগুলো পাতা লিখে যাওয়ার পর না-হয় জিরোলাম !

সাধারণত আমি লিখে থাকি দ্রুতবেগে, কিন্তু এই লেখা নিয়ে এগিয়েছি ধীরে, অনেক কুণ্ঠা অনিচ্ছা আর অসুবিধা অতিক্রম করে। আমার বহুদিনের বন্ধু, বাঙালী কবিকুলে সর্বাগ্রগণ্য, শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে বরাবর ধৈর্য ধরে এই লেখায় আমাকে প্ররোচিত করেছেন, প্রলুব্ধ করেছেন— প্রথম কয়েকটা পরিচ্ছেদ সম্পর্কে তাঁর সহর্ষ অনুমোদন বিনা লিখে যেতে সাহস পেতাম না, স্বীকৃতই হতাম না। আর মনীষা গ্রন্থালয়ের পরিচালক, আমার একান্ত প্রীতিভাজন শ্রীমান্ দিলীপকুমার বসুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা না পেলে কিছুতেই লিখে উঠতে পারতাম না। দিল্লীতে সংসদ ভবনের একান্তে রচনাব্যস্ত আমাকে আবিষ্কার করে অপ্রতিভ করেছিলেন তিন প্রখ্যাত অবাঙালী— তাঁরা হলেন অসমিয়া ভাষার যশস্বী কবি (অধুনা কেন্দ্রীয় সরকারের তৈল ও রসায়ন-মন্ত্রী) শ্রীযুক্ত দেবকান্ত বড়ুয়া, প্রসিদ্ধ গুজরাতী কবি শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর জোশী এবং সাহিত্য অকাদেমির প্রাক্তন সচিব (একদা শান্তিনিকেতন-খ্যাত) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপলানি। তিন সংসদ সদস্যই বাংলা সাহিত্যের সমঝ্‌দার —তাই সাহস করে প্রথম কয়েকটা পরিচ্ছেদ তাঁদের দেখাই। আমার

সৌভাগ্যক্রমে পড়ে তাঁরা খুশি হয়েছিলেন, উৎসাহ দিয়েছিলেন লিখে যেতে। কলকাতায় আরো কয়েকজন বন্ধু এই রচনা সম্বন্ধে সহৃদয় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন; 'পরিচয়', 'কালান্তর', 'নতুন পরিবেশ', 'বেতার জগৎ'-এ এর কিয়দংশ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। মনীষা গ্রন্থালয়ের আগ্রহে আর শ্রীসুবিমল লাহিড়ী-প্রমুখ মুদ্রণকর্মীর আনুকূল্যে রচনাটি এখন সর্বসমক্ষে প্রচারিত হতে চলেছে।

লেখবার সময় বহুবার নতুন করে বুঝেছি আমার সমকালীন প্রত্যেকটি বাঙালীর ঋণ রবীন্দ্রনাথের কাছে কত বেশি। রবীন্দ্রনাথের অজর স্মৃতির উদ্দেশে তাই এই গ্রন্থ অর্পণ করলাম। উৎসর্গপত্রের উদ্ধৃতি পুনরাবৃত্তি করি: 'ত্বদীয়ং বস্তু, গোবিন্দ, তুভ্যমেব সমর্পয়ে'।

সংসদ ভবন
নয়া দিল্লী

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১

নিজের সত্তার সামনে আয়না তুলে ধরার সাহস কার আছে জানি না, কিন্তু আমার অন্তত তা নেই। আত্মবৃত্ত রচনার অধিকার হয়তো বাস্তবিকই আছে মুষ্টিমেয় মানুষের, কিন্তু তাদের মধ্যে নিজেকে গণনা করার আত্মাভিমান যে হাস্যকর, তা জানি। সন্ত অগস্তিন কিম্বা রুশো কিম্বা গান্ধীর মতো যাঁদের জীবনই যেন এক শিল্পকর্মবিশেষ, তাঁরা নিজেদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সত্যতা সন্ধান করতে গিয়ে দেহমনের নিভৃত ব্যঞ্জনার কথা ব্যক্ত করতে সংকুচিত না হতে পারেন— কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো মাহাত্ম্যের দুর্ভেদ্য বর্ম নিয়ত তাঁদের রক্ষা করে থাকে, বোধরহিত ইতরজনের নেত্রপাত তাকে ক্ষুণ্ণ করার শক্তি রাখে না। আমার সামর্থ্য নেই, সাহস নেই, প্রবৃত্তি নেই নিজের সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলার, আর কারো কাছে তার প্রয়োজন তো নিশ্চয়ই একটুও নেই।

'স্মৃতিচারণ' বলে যে-কথাটির অধুনা বহুল প্রচলন, তার সার্থক দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। স্মৃতিসঞ্জাত কিছু তথ্য অর্ধ-বিস্মৃতির কল্যাণে কল্পনায় রঞ্জিত করে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছাপার অক্ষরে সাজাতে পারলে সামান্য আত্মপ্রসাদ মিলতে পারে, কিন্তু তার বেশি কিছু বোধ হয় মেলে না। আমরা প্রায় সবাই এমন ধরনের জীবন যাপন করে থাকি যে আমাদের শ্রুতি স্মৃতি সব-কিছু বিস্মৃতির জলে ভেসে গেলেও সংসারের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

ঠিক এজন্যই অত্যন্ত অপ্রতিভ বোধ করব যদি কেউ ভেবে বসেন যে আত্মকথা লিখতে বসেছি। অনেক দ্বিধার পর কিছু বলতে চাইছি জীবন যে-পরিবেশে কেটেছে সে-বিষয়ে। বহুদিন ধরে বহু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বহু ব্যক্তিত্ব ও বহু সংঘটনের অন্তত কিয়দংশ প্রত্যক্ষ করেছি যার স্বল্প বিবরণ হয়তো কিঞ্চিৎ সার্থকতা বহন করতে পারে। আর ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্ক বিষয়ে যে-প্রত্যয় আমার সত্তাকে পুষ্টি দিয়েছে, গতানুগতিকতার বশ্যতা-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছে, সমাজসত্য অনুধাবনে লিপ্ত করেছে, কর্ম-

রহিত তত্ত্বের ব্যর্থতা প্রতিভাত করেছে, সেই প্রত্যয়কে শত দুর্বলতা সত্ত্বেও যথাসাধ্য মনে প্রতিষ্ঠিত করতে বিপ্লবী চিন্তা ও ইতিবৃত্তের অনুধ্যান শুধু নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও যে-ভূমিকা আছে তার কথঞ্চিৎ আভাস এই বিবৃতিতে হয়তো মিলবে।

আবার বলব, আত্মকথা লিখতে বসি নি। অনেক ব্যাপারেই মনের দরজায় কুলুপ লাগানো থাকবে— তার অভ্যন্তরে সবাইকে আহ্বান জানাবার মতো পরিসর নেই, অভিপ্রায়ও নেই। লেখার মধ্যে নিজেকে আনতে হবে প্রায়ই। কিন্তু তা হবে কিছুটা যেন আগের যুগের কথকের মতো— মাঝে মাঝে এমন কথা বলতে হতে পারে যাতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে, যেমন কথকেরও হয়ে থাকে, কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়েরও উত্থাপন এখানে মূলত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে, যেন যা ঘটছে বা যা মনে আসছে তার একটা প্রায়-নিরপেক্ষ বিবরণ দিয়ে চলেছি।

* * *

স্বীকার করব যে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যে আমার মতো যাদের জীবন-যাত্রা চলেছে, হয়তো সমাজের কাছে তার একটা জবানবন্দি-গোছের কিছু জানাবার দায়িত্ব যে একেবারে নেই তা নয়। কার্ডিনাল নিউমান-এর মতো মহাভাগ 'Apologia pro vita sua' যে তাগিদে লিখেছিলেন তার সঙ্গে অবশ্য এটা তুলনীয় নয়। কিন্তু সমাজের যে স্তর থেকে এসেছি এবং যেখানেই প্রধানত বিচরণ, সেখানকার পাট একেবারে না চুকিয়ে বিপ্লবী ভাবাদর্শ এবং কর্মপ্রয়াসে লিপ্ত হতে চাওয়া এবং অপরকে আহ্বান করা কেমনভাবে এবং কেন ঘটল, তার মধ্যে অসংগতি যদি থাকে তো তার পরিমাণ ও চরিত্রই বা কি, কিছু 'ন ঘর্‌কা ন ঘাট্‌কা' -ধরনের জীবন একে বলা চলে কিনা— এ-সব কথা নিয়ে তত্ত্বের গোমড়া আকারে নয়, সাধারণ ঘটনার সহজ বিবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ অন্তত খানিকটা করতে পারা মন্দ ব্যাপার নয়।

বছর পনেরো আগে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে (১৯৫৬) স্টালিনের এক-নায়কত্বের যুগে বহু অপকর্ম ও অপরাধ সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর আত্মসমালোচনা দেখা দিয়েছিল, তখন শুধু যে ইতিহাসে বিপ্লবের ভূমিকা নিয়ে ভাবতে হয়েছে তা নয়। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যে স্বদেশবাসীর কাছে আবার একটা দেনা বাড়ল— তাদের জানাতে

হবে কেন নিজেদের কমিউনিস্ট বলতে আমাদের লেশমাত্র অনুশোচনা নেই, কেন প্রখ্যাত কোনো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক 'The God that Failed' বলে সাম্যবাদকে পরিহার হল সুস্থ মানসিকতার বিকৃতি মাত্র, যে-আবেগ কঠোর বাস্তবের সংস্পর্শে গলে যায়, যে-অভিভূতি বুদ্ধিসর্বস্ব বলে ভঙ্গুর, যে-আদর্শ মাটির মানুষের অপাপবিদ্ধ বিশুদ্ধির প্রত্যাশা পূর্ণ না হলে হতোদ্যম আর হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, তারই উদাহরণ। ফরাসী বিপ্লবের উত্তুঙ্গ অধ্যায়ে মাদাম রলাঁ-র মতো অবিস্মরণীয়া গিলোটিনের নীচে মাথা পেতে দেওয়ার আগে বুঝি বলেছিলেন : "হে স্বাধীনতা, তোমার নামে কত অপরাধই না অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে!" আবহমান কাল ধরে ন্যায়, মুক্তি, ধর্ম প্রভৃতির নামে অনাচার কম হয় নি, বিপ্লবী আতিশয্য ও অপকর্মও ঘটে এসেছে প্রায় যেন প্রাকৃতিক বিধানেরই নির্দেশে— কিন্তু তা বলে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ইত্যাদি মন্ত্রের মূলগত মহত্ত্ব ম্লান হয় নি। এ-সব বলতে গিয়ে ভয় হচ্ছে যে তত্ত্বকথা এসে পড়ছে একটু যেন অবান্তর ভাবে; এ-ধরনের অজুহাতগন্ধী যুক্তি বাদ দিয়ে সাধারণ বৃত্তান্তের মাধ্যমেই সাধারণ একজন মানুষের কমিউনিস্ট সত্তার শিকড়গুলো কিছু পরিমাণে দেখাতে হবে।

কিছুকাল আগে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বহুমানভাজন মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব আত্মজীবন প্রসঙ্গে যে-পার্টির সঙ্গে তাঁর একদা একান্ত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল সেই পার্টিরই অনেক পূর্বতন সহকর্মীর বিষয়ে অত্যন্ত কটু এবং মারাত্মক মানহানিকর মন্তব্য করেছেন। এর ভগ্নাংশও যদি নির্ভুল হয় তো না বলে চলবে না যে এদেশের প্রমুখ কমিউনিস্টদের মধ্যে ঠগ বাছতে গিয়ে গাঁ উজাড় হয়ে গেছে। সোভিয়েট দেশে খ্রুশচেভ্ যখন স্টালিনের নিন্দাবাদে মুখর হয়েছিলেন, তখনো বক্তব্যের অভিপ্রায় যাই হোক, সাধারণ সহজ ব্যাখ্যা ছিল প্রায় একই। এতে সত্য রূঢ় একদেশদর্শিতার ফলে তার মৌলিক ভারসাম্য থেকে বিচলিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সর্বথা প্রমাদমুক্ত চেতনা কতটা সম্ভব জানি না। কিন্তু এই বিচলিতির প্রমাদ থেকে সত্যকে উদ্ধারের যথাসাধ্য প্রয়াস না করে পথ কোথায়? এজন্যও নিজেদের নিছক অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা প্রয়োজন।

১৯৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় 'কমন্ওয়েল্থ্ পার্লামেণ্টারী কনফারেন্সে' ভারতীয় প্রতিনিধিদলে থাকার সময় মেলবোর্ন শহরে এক ভোজসভায়

আমার কাছেই বসেছিলেন এক অশীতিপর 'সেনেটর'। কথায় কথায় তিনি বললেন যে এই প্রথম কমিউনিস্টকে চাক্ষুষ দেখলেন, তবে কানাঘুষো শুনেছেন যে সিড্‌নি শহর আর বন্দরে কিছু অস্ট্রেলিয়ান কমিউনিস্ট আছে। চুরাশী বছরের বৃদ্ধ এ কথা বলায় প্রতিবেশী কয়েকজন, বিশেষত 'লেবর' পার্টির একজন, কতকটা অপ্রতিভ হয়ে ওঠায় আমি বুড়োকে হেসে বলেছিলাম: 'তা সেনেটর, আমায় দেখে কি মনে হচ্ছে যে শিশু-মুণ্ড দিয়ে প্রাতরাশ সেরে থাকি?' তিনিও হাসিমুখে জবাব দিয়েছিলেন, 'না মুশকিল তো তাই, ঠিক তা মনে হচ্ছে না, তবে কিনা—!'

তুলনার ব্যাপার নয়, কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পনেরো-ষোলো বছর আগে কলকাতার রাস্তায় দেখা হলে আমার পুরোনো স্কুলের 'হেডপণ্ডিত' বিজয়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থ মহাশয় একবার প্রশ্ন করেছিলেন: 'আচ্ছা হীরেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, কিছু মনে কোরো না।' আমি তখনই রাজী হতে বললেন, 'তোমাকে ছেলেবেলা থেকে জানি। এখন তুমি পার্লামেণ্টের মেম্বর, সবাই তোমায় জানে— তা তুমি কি বাস্তবিকই ভগবানে বিশ্বাস কর না?' জবাব দিলাম, 'না স্যার, করি না— তবে তার যুক্তি আপনাকে দিই কেমন করে?' তিনি বললেন, 'না, যুক্তি আমি চাইছি না, তবে তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে। তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা তুমি নিশ্চয়ই জানো— আমার বিশ্বাস তুমি জেনেশুনে অন্যায় অনাচার করবে না, তোমরা কমিউনিস্টরা অনেক ভালো কাজও করে থাকো, কিন্তু তুমি বলছ যে ভগবানে বিশ্বাস কর না অথচ সৎভাবে জীবন চালানো আর বহুজনের ভালোর জন্যে কাজ করা তোমার আটকায় না— হীরেন, তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে, আমাকে অনেক ভাবতে হবে।' এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক ছিলেন; তাঁর কথা আমাকে পরেও কিছু বলতে হবে। কিন্তু ধর্মতলা স্ট্রীটের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হঠাৎ-বলা তাঁর এই কথাগুলির দাম আমার কাছে অনেক। হৃদয়ের ব্যাপ্তি কতদূর থাকলে অত্যন্ত সদর্থে ধর্মভীরু একজন মানুষের পক্ষে এমন কথা বলা যায়, তাই ভাবি।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন (১৯৫৭) উপলক্ষে ক্রমাগত দিনের পর দিন যখন ছোটো-বড়ো-মাঝারি সভায় বক্তৃতা করে বেড়াতে হচ্ছে, তখন 'ভোট'

হওয়ার দিন-বারো আগে, হঠাৎ রাত্রে, আটটা মিটিং সারার পর, আমাকে অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। সেখানে দিন-পনেরো কাটাবার সময় আমার দেখাশুনার ভারপ্রাপ্ত নার্সদের মধ্যে একজন ছিল শিয়ালদা অঞ্চলে আমার নির্বাচন কেন্দ্রের বাসিন্দা। ফিরিঙ্গী মেয়ের পক্ষে আমাকে জানার কোনো কথা ছিল না, জানতও না একেবারে। তার ক্যাথলিক গির্জার পাদ্‌রির কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছিল যে কমিউনিস্টরা মূর্তিমান শয়তান আর সেজন্য ভোট দেওয়া উচিত কংগ্রেসকে— সেই নির্বাচনে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, যশস্বী ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যালকে। যাই হোক্, আমি কে, কী বৃত্তান্ত, ইত্যাদি কিছুটা জানার পর দেখলাম তাকে যেন একটু চিন্তায় পড়তে হয়েছে। ভোট সে পাদ্‌রি সাহেবের উপদেশ অনুযায়ীই দিয়েছিল নিশ্চয়। কিন্তু আমাকে এবং যারা আমায় দেখতে আসত তাদের লক্ষ্য করে ঠিক শয়তান ঠাওরাতে সে বোধ হয় পারে নি। তার গির্জার কতক-গুলো কাগজ আমাকে সে দিয়েছিল, আর একটু-আধটু হাবভাবে বুঝিয়ে-ছিল যে ব্যাপারটা তার পরিষ্কার বোধগম্য হচ্ছে না। তখন চুপ করে শুয়ে থাকা আর সমর্‌সেট্ ম'ম-এর গল্প বারবার পড়ার ফাঁকে ভাবা ছাড়া করার কিছু ছিল না— হয়তো তাই প্রায়ই মনে হত যে 'pro vita sua' একটা জবানদিহি রেখে যেতে পারলে মন্দ কি?

* * *

আবার স্বীকার করছি, এই ধরনের লেখা অনভ্যাসের কাঁটার মতো একটু ফুটছে বলেই গেয়ে রাখছি যে কয়েকজন সুহৃদের উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো লিখতে রাজী হয়েছি। তবে আর-একটা দিক থেকে মনের তাগিদ খুঁজে কিছুটা পেতে পারি। আর তার ফলে লেখা যদি উৎরোয়, তবেই বাঁচোয়া। অবশ্য ভরসা এখনো যে পাচ্ছি না, তাও হ্রস্বকণ্ঠে বলে রাখছি।

অধিকাংশ মানুষের মতোই জীবন সম্বন্ধে আমার গভীর আসক্তি। এ-ব্যাপারে খুব একটা অস্থিরতা হয়তো দেখাই না। কত জিনিসই জানলাম না, দেখলাম না, বুঝলাম না, শরীর মন দিয়ে স্পর্শ করতে পারলাম না, এ নিয়ে ছেলেবেলায় আকুলতা যা ছিল তাও সর্বদা প্রকট হতে পারত না; আজ সে আকুলতার কামড় থেকে পুরো রেহাই না পেলেও তাকে অনেকটা

গা-সওয়া করে ফেলা গেছে। কিন্তু হয়তো আবার এদেশে মোটামুটি আমার মতন পরিবেশে যারা মানুষ হয়েছে তাদের অনেকের মতো আমারও আছে জীবন সম্বন্ধে একপ্রকার অনাসক্তি। ইয়োরোপের মানুষের মতো ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য লালায়িত হওয়ার যে-অভিজ্ঞতা (যার মধ্যে মহীয়ান্ ও অপরূপ উপাদানেরও অভাব নেই), তা থেকে নিস্তার পাওয়া ভারতবাসীর পক্ষে তাই সহজ। অনেকে এ কথা শুনে রুষ্ট হবেন, কারণ প্রবাদ এই যে আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি। হয়তো তাই, কিন্তু নিত্যকর্মপদ্ধতি যাই বলে বলুক, হাঁসের মতো আমরা আনন্দে ধর্মের সরোবরে বিচরণ করলেও গায়ে তার জলকে দাগ কাটতে দিই না। আমাদের সাধুসন্তদের শেষ কথা তাই হল— 'ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্!' জীবনকে আঁকড়ে থাকি বই-কি আমরা, চোখ বোজার পর কী দেখব বা না দেখব তা ভেবেও অনেকে আমরা ব্যাকুল হতে পারি, কিন্তু মনের এক গহনে সচেতন ভারতবাসী হল নিরাসক্ত; পঞ্চত্বপ্রাপ্তি তার কাছে সর্ব অর্থে সামান্য ঘটনা।

নিজেকে খুব একটা আত্মিক অর্থে বীরপুরুষ কল্পনা করলে হাসি পায়, কিন্তু ভারতীয় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই অনাসক্তির কল্যাণে হয়তো বলতে পারি যে অতি শীঘ্র জীবনান্ত ঘটবে একেবারে অমোঘভাবে জানতে পারলে একটু আঁতকে উঠব নিশ্চয়, কিন্তু প্রধান দুশ্চিন্তা হবে এই যে একেবারে আত্মীয় যারা তাদের অন্তত কিছুকাল নানা মুশকিলে ফেলব আর কতকগুলো কাজ, যা করতে সম্ভবত পারতাম, তা করা হয়ে উঠল না। 'দেহ সাথে সব ক্লান্তি' পুড়ে ছাই হওয়ার পর নিজের সম্পর্কে আর কোনো চিন্তা থাকবে না— যাবার বেলায় এই পৃথিবী পিছু ডাকবে নিশ্চয়, কিন্তু সে-ডাক শোনা বা তাতে সাড়া দেবার মতো অবস্থায় থাকব না, এ তো অবধারিত। আত্মা অবিনশ্বর নয় জেনে খেদ নেই, পঞ্চভূতে ফিরে যেতে দুঃখ নেই, গ্লানি নেই। মৃত্যুভয়ে ভীত নই বলার স্পর্ধা রাখি না, কিন্তু সে ভয়ে আকুল হতে রাজী নই, নিজের পরকাল গোছাবার কারবারে হাত দিতে কখনো চাই নি, চাইব না।

তাই একটুও বিচলিত হব না ভেবে যে মরার পরে উত্তর পুরুষের কাছে বিস্মৃত হয়ে যাব। অতি অল্প যে কাজে অন্য বহুজনের সঙ্গে মিলে হাত

দিয়েছি, তা যদি কেউ মনে রাখে, ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও যদি কেউ কিছুদিন মনে রাখে তো তা হল উপরি পাওনা— সে পাওনা হাত পেতে নেবার জন্য আমি থাকব না, কিন্তু আপাতত একটু ভালো লাগবে বই-কি জানতে যে কিছুকাল কিছু লোকের মনে কিছুটা জায়গা আমার থাকবে। যে মৃত, তার কাছে মৃত্যুর পর প্রশস্তি বা ধিক্কার তুল্যমূল্য, একান্ত অবান্তর।

কিন্তু একেবারে আত্মীয় যারা, তারা অন্তত চাইবে যে মৃত প্রিয়জনের স্মৃতি যেন কটু বাক্যে মসীলিপ্ত না হয়, তারা শুনতে চাইবে কিছু গুণকীর্তন। আনুষ্ঠানিক শোকজ্ঞাপন ছাড়াও তারা অপরের কাছে অন্তত কিয়ৎপরিমাণে চাইবে বিয়োগদুঃখ উপশম করতে পারে এমন সমবেদনা যা মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা বিনা উৎসারিত হয় না। অনাত্মীয় জনের বিলাপ অত্যন্ত সাময়িক ও অগভীর হলেও তাই সান্ত্বনা আনে— তাই এর মূল্য, মৃতের কাছে নয়, যারা জীবিত তাদের কাছে। হয়তো এজন্যই মার্জিত রুচিতে বলে থাকে যে মৃতের নিন্দাবাদ সাধারণত (এবং মৃত্যুর অন্তত অব্যবহিত পরে) অশালীন ও অকর্তব্য। এই রেওয়াজ মামুলী এবং কিছুটা ভণ্ডামির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এর মূল্য যে নেই তা নয়।

ইতিহাসে বেঁচে থাকে অতি স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি— শুধু তার পাতায় যাদের নাম দেখা যায় তারা সবাই মানুষের মনে যে স্থান পেয়েছে তা নয়, স্থান পায় মুষ্টিমেয় কীর্তিমান্, যাদের ভূমিকা হল যুগন্ধর। অবশ্য বহু নরশ্রেষ্ঠের কোনো উল্লেখও ইতিবৃত্তে নেই ; আদিপর্বে মূল আবিষ্কার ও উদ্ভাবন যারা করেছে, সবাই মিলে জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলবার তাগিদে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং নিজেদেরই দেহমনের অজস্র দিগন্ত খুলে ওঠার যুগে যারা ছিল অগ্রণী তাদের নাম কেউ জানে না। উত্তরকালেও, এবং বিশেষ করে একক ব্যক্তিত্ব ও মানসের স্ফুরণের যুগ আমার পূর্বে, বহু আকাশচুম্বী প্রতিভা, যা শিল্পে ও অন্যান্য দৃষ্টিতে ভাস্বর সাক্ষ্য রেখে গেছে, তার ব্যক্তিগত পরিচিতি নেই। এতে ক্ষুব্ধ হওয়া ভুল— মানুষের ব্যক্তিসত্তা চরম বস্তু কে বলল ? সন্দেহ নেই যে মানুষ প্রায়ই একা, ভিড়ের মধ্যেও একা, কিন্তু আমাদের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষের অস্তিত্ব বাঁধা ছিল ঢের বেশি পরস্পরসংহতির সূত্রে। একক অনুভূতি ও সৃষ্টিতে মানুষের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু যুগ যুগ ধরে ইতিহাস এগিয়ে এসেছে বহুজনের সমাবেশের বহু বিচিত্র ছন্দে।

আজকের যুগে সেই বহুজনের মধ্যেই একজন আমি থেকেছি, নিজের একান্ত এবং প্রায়শ কঠোর একাকিত্ব সত্ত্বেও থেকেছি। মাহাত্ম্যের অধিকারী আমি নই। ১৯৪৬ সালে দার্জিলিঙে আমার তৎকালীন পরম বন্ধু স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের অপরূপ গিরিগৃহে থাকার সময় কী যেন কথায় কথায় আর-এক বন্ধু অধুনা স্বনামখ্যাত জ্যোতি বসুকে বলেছিলাম: 'মহত্ত্ব আমার নাগালের বাইরে; বাকি যা কিছু, তাতে আমার আগ্রহ নেই।' কথাটার পিছনে দর্প কিছুটা নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তা উগ্র আত্মম্ভরিতার সমার্থক যেন কেউ মনে না করেন। মহৎ ব্যক্তি হয়ে ওঠা আমার সাধ্যাতিরিক্ত; নীচে কোন্ সারিতে জায়গা পেলাম বা না পেলাম, তা নিয়ে বাস্তবিকই মস্তিষ্কপীড়া থেকে আমি মুক্ত। তবুও যে এই লেখা লিখতে বসতে নিজেকে সম্মত করেছি, তার কারণ অনেকের সামনে নিজেকে জাহির করে যথাসম্ভব আত্মপ্রসাদ সংগ্রহ নয়। প্রকৃতই নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে জবানবন্দি একটা রেখে যাওয়া মন্দ নয়, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা আমার কাছের মানুষ, আমার স্ত্রী, পুত্রকন্যা, ভাইবোন, যারা খুব কাছে বলেই হয়তো শোনে নি অনেক কথা, যা তাদের শোনালে মন্দ হয় না, যা জানলে হয়তো তারা কতকগুলো জিনিস বুঝবে, ক্ষমা করবে, মনের একটা ছকে ফেলতে পারবে। একান্ত স্বজন যারা, তারা হয়তো অনেক অনুক্ত কথাও নিজে থেকে বুঝতে পারে— মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়, একটু সান্ত্বনার খোঁজ করছি বলেই বোধ হয় মনে পড়ে রবার্ট ফ্রস্ট্-এর একটি পঙ্ক্তি—"Words are not the only means of communication" ("কথাই শুধু মনের বাহন নয়")। উক্তি আর অনুক্তির মধ্যে ফাঁক কিছু থাকবেই— তা থাকুক, নিজের পরিবেশ, প্রত্যক্ষ আর প্রত্যয় সম্পর্কে কতকগুলি উক্তি না হয় রাখাই যাক্।

২

আমাদের কলকাতা শহরের বয়স খুব বেশি নয়, তার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, সেখানে দ্রষ্টব্য স্বল্প, তার প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে 'আহা মরি' বলে ওঠাবার মতো কিছু নেই। লোভী বিদেশী বণিকের উদ্যোগে এর পত্তন। বড়োলাট কর্জন-এর মতো যাদের খ্যাতি ছিল কলকাতা-প্রেমী বলে, তাদের ভালোবাসা 'মুসলমানের মুরগী-পোষা'-র বেশি কিছু ছিল না কোনোকালে— ইংরেজ এবং তাদের আশ্রিত ভারতীয় (অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাঙালি) ধনপতিরা কখনো শহর কলকাতা সম্বন্ধে মায়া পোষণ করে নি। কেউ কখনো ভাবে নি যেখানে শহর হতে পারে, সেখানে এযুগের এক পেল্লাই শহর বানানো হয়ে পড়েছিল— বিরাট এক ভূখণ্ড জুড়ে, গঙ্গার দু'ধারে, না-গ্রাম না-শহর এমন এক জবড়জং জনপদ তাই আজ দেখছি। যা হোক একটা নকসা না বানালে ইমারৎ হয় না, রাস্তাঘাট হয় না। কিন্তু যথার্থই ভেবেচিন্তে, মাথা ঘামিয়ে শহরে থাকবে যারা, সেই নানাবয়সের স্ত্রীপুরুষের সামান্য একটু স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কখনো যে বিচার করে কিছু ঘটেছে, কল্পনা করা কঠিন। নানা দিক থেকে এই আজব শহরের কিন্তু একটা বিশেষ মোহ আছে, চরিত্র আছে, কিছু পরিমাণে অসামান্যতা আছে, যা মনে হয় অন্য অনেক কম-দুর্ভাগ্য শহরের নেই। আজকের কলকাতার দিকে তাকালে কান্না আসে, রাগ হয়, সব-কিছু ওলট-পালট করবার যে-ঝোঁক এখন অল্পবয়সের প্রায় সবাইয়ের চিন্তায়, তার কারণ খুঁজতে মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াতে হয় না। বন্ধুবর বিষ্ণু দে একবার বোধ হয় বলেছিলেন যে কলকাতায় বেঁচে থাকাই আজ একপ্রকার বীরত্ব— এমন শহরকে তার বর্তমান চরম দুর্দশার দিনেও যে 'ভীষণ ভালোবাসি' বলার লোকের অভাব নেই, তাতে আশ্চর্য হওয়া ভুল। আজও তাই আমাদের মতো যারা কলকাতায় মানুষ হয়েছে তারা কলকাতার বাইরে থাকতে হবে ভাবলে হাঁপিয়ে পড়ি। আমার প্রাক্তন ছাত্র ও সহকর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, সিনেমা কর্মচারীদের নেতা সয়ীদ্ আমায় বলেছিলেন ১৯৫৯ সালে যে প্যারিস বা প্রাগে বসেও

ইচ্ছে করত পাটোয়ারবাগান বস্তিতে ফিরে আসতে। এটা হয়তো শুধু কলকাতায় আমাদের বাস বলে নয়— কলকাতার বিকৃত, আপাতদৃষ্টিতে ধিক্কৃত জীবনেও একটা গতিবেগ আছে, অন্ধ, মূঢ়, প্রায়-ক্ষিপ্ত হলেও তা আছে, এই জীবন্মৃত দেশে যার মূল্য অল্প নয়।

আমাদের যখন ছেলেবেলা, তখনো কলকাতার বুকে আগুন যে জলছিল না তা নয়— ভারতমানসে ভূমিকম্পের 'epicentre' কলকাতা বললে যখন ভুল হয় না, তখন কলকাতা পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে যে ধীরে সুস্থে চলছিল তা ভাবা যায় না। তবে আজকের তুলনায়, আর ছেলেবেলার চোখ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে গিয়ে, মনে হয় যে তখন কলকাতার চেহারার মধ্যে একটা আত্মীয়তার ছাপ ছিল, মেজাজও বুঝি অনেকটা মোলায়েম ছিল। এক-একটা অঞ্চলের সঙ্গে সেখানকার বাসিন্দাদের যেন নাড়ির যোগ ছিল, প্রায়ই তারা পুরোনো পরিচিত পরিবারভুক্ত বলেই সম্ভবত। তখনো অবশ্য গ্রামের তুলনায় কলকাতা ছিল এক বিস্ময়— আমার দাদুর কাছে শুনেছি কলকাতার বর্ণনা (হয়তো ঈশ্বর গুপ্তের) : 'বাহান্ন বাজার, তিপ্পান্ন গলি' যেখানে 'রেতে মশা দিনে মাছি' সত্ত্বেও কী সুখে মানুষ থাকে তা গ্রামের বাসিন্দার পক্ষে বোঝা শক্ত ছিল। খাস 'কলকত্তিয়া' কিন্তু এখানে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল। কলকাতার বাইরে কখনো যাই নি, যেতে চাই নি, বলতে সংকোচ বা লজ্জা দূরে থাক্‌, বেশ একটু অহংকারের ভাব দেখাবার মতো লোকের তখন অভাব ছিল না।

বৌবাজার এলাকায় সুবিদিত হিদারাম বাঁড়ুজ্জে লেন যার নামে, কোম্পানির আমলে বিখ্যাত সেই হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে আমাদের বাড়ির কুটুম্বিতা সম্পর্ক ; তাদের একজনকে পঞ্চাশ বছরের কিছু আগে বড়াই করতে শুনেছিলাম যে হাওড়া ব্রিজ পার হওয়ার কোনো হেতু তার জীবনে ঘটে নি। মনে রাখতে হবে আজকের হাওড়া ব্রিজ তখন ছিল না। বছর ত্রিশেক আগে আজকের এই লৌহসেতু যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন মনে পড়ে একদিন দুপুরে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সভা করতে যাচ্ছিলাম, সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন ছাত্রনেতা এবং বর্তমানে দেশের এক প্রধান প্রচারবিদ বলে সুবিদিত প্রশান্ত সান্যাল— নির্মীয়মাণ যন্ত্রসৌধের দিকে তাকিয়ে তিনি আবৃত্তি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটক

থেকে 'নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র' মন্ত্রটি এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আধুনিক কবিরা ঐ-ইমারত নিয়ে লিখছেন না কেন। পুরোনো পুল ছিল ভাসমান, যাকে খণ্ডবিখণ্ড করে প্রতিদিন একবার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুলে পরীক্ষা করে আবার জুড়ে দেওয়া হত— কাগজে রোজ খবর থাকত কখন ব্রিজ থাকবে খোলা অবস্থায়; তখন নদীপার হতে হলে পোর্ট কমিশনরের স্টীমার কিম্বা সনাতন স্বদেশী নৌকার শরণ নিতে হত, ভাঁটা পড়ে গেলে কাদা ভেঙে ঘাটে উঠে তবে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানো যেত। আজকের তুলনায় হেফাজৎ বেশি বই কম নয়। কিন্তু ব্যাপারটা মোটামুটি মন্দ চলত না! আর তখন— শুধু আমাদের ছেলেবেলা কেন, এই ত্রিশের দশকের শেষাশেষি পর্যন্ত, ভাসমান ব্রিজের উপর সন্ধ্যার পর হেঁটে হাওয়া খেয়ে আসা মন্দ লাগত না, যা আজ কল্পনার অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতা শহরের ছক্ খুব বেশি হয়তো বদলায় নি— তবে চৌহদ্দি হু হু করে বেড়েছে, হরেকরকম ইমারত নানা জায়গায় এবং বে-জায়গায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, পুরোনো এলাকার বুক চিরে নতুন রাস্তা বেরিয়েছে। শহরতলি বিলকুল বদলে গেছে, বাড়ির সঙ্গে বাড়ির ভিড়ে রাস্তাঘাট ভেঙে পড়তে বসেছে, আর কলকাতার হাড়গিলে মাটিতে একটু আশ্রয়ের আশায় দুঃখী মানুষের বিষণ্ণ মেলা দশদিকে উপচে পড়েছে। শহরের বিস্তার চারদিক ছাপিয়ে ছড়িয়ে চলেছে, তার শ্রী নেই ছন্দ নেই, তার রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ সবই যেন বিকৃত। পোড়া পেটে অন্ন দেবার তাগিদে সেখানে মাথা গুঁজে থাকার জন্য অগণিত মানুষ লালায়িত অথচ আপন বলার মতো ঘর বাঁধার কল্পনা সেখানে ব্যর্থ। উত্তেজনা আছে, নইলে হাঁপ-ধরা বাক্সবন্দী জীবন মানুষ সইবে কেমন করে— কিন্তু স্বস্তি বলে বস্তু নেই, তার আস্বাদ ক্রমশ যেন অজানা থেকে যাচ্ছে বিশেষ করে ছোটো ছেলেমেয়েদের কাছে। তারা বাঙালির নিজস্ব চিরাভ্যস্ত খাদ্য থেকে যে শুধু বঞ্চিত হচ্ছে তা নয়, পূর্বপুরুষ যে-পরম্পরা থেকে অন্তত কিছু মানসিক পুষ্টি পেত তাও তাদের কাছে ক্রমশ অর্থহীন ও অবাস্তব মনে হচ্ছে; রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী আর 'ঠাকুরমার ঝুলি'— 'হাসিখুসি'-জাতীয় বইয়ের সঙ্গে অনায়াস আত্মীয়তা পাতানো আর সহজে সম্ভব হচ্ছে না— জীবনযাত্রায় এ-যাবৎ পরিচিত ঢঙ বদলে, বিগড়ে, বরবাদ হতে চলেছে।

* * *

"বাবুজী, কবিতা বড়া মধুর"—ভারী, ভরাটগলায় হিন্দুস্থানী-বাংলায় কে যেন বলছিলেন ওয়ার্ডের আর-এক রোগীকে : "শুষ্কং বৃক্ষং তিষ্ঠত্যগ্রে' এ হল গদ্য, আর কবিতা 'নীরস-তরুবর বিলসতি পুরতঃ'— আহা, আওয়াজ কী মধুর !"

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মেনে গদ্য ও পদ্যের নমুনা দেওয়া হচ্ছিল কি না জানার দরকার বোধ করি না, শুধু মনে আছে বহুদিন আগে শোনা সেই কথা। বক্তার নাম কী, কারো জানা ছিল না, তবে সবাই তাকে চিনত এবং ডাকত 'পণ্ডিতজী' বলে। রোজ অন্তত একবার করে তিনি টহল দিয়ে যেতেন উত্তর কলকাতায় গঙ্গার ধারে এক হাসপাতালে যা ১৮৭০ সালে ওয়াহাবী বিদ্রোহীর হাতে খুন বড়োলাট মেয়ো-র নাম ধারণ করে ছিল। সেখানে ১৯১৪-১৫ সাল নাগাদ সময়ে আমার পিতামহের চোখ কাটানো হয়েছিল, খুব সম্ভব আমার পিতার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ভারপ্রাপ্ত ছিলেন বলে। হাসপাতালের দরজা পণ্ডিতজীর কাছে ছিল অবারিত। রোগীদের সঙ্গে হেসে, বসে, দুটো গল্প করে তিনি চলে যেতেন, গঙ্গাস্নানের পর কাজটি নিত্যকর্মপদ্ধতিরই অঙ্গীভূত ছিল। 'কবিতা বড়া মধুর', এই শব্দ একটু আবছা হলেও বেশ মনে পড়েছে— আর মনে আসছে হাসপাতালের বারান্দা থেকে গঙ্গার ছবি। স্রোতে তখন ভাঁটা, পাথুরিয়াঘাটার বাঁধা ধাপ অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, স্নানার্থীর ভিড় প্রায় মিটে যাওয়ায় বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে গঙ্গামাটির কাদা চোখে পড়ছে। দুপুর তখনো ঠিক আসে নি, তবে গোটাদুয়েক মোষ বেশ সেই কাদায় মৌজ করছে আর কাছেই ক'টা নৌকো বে-ওয়ারিশ অবস্থায় আস্তে আস্তে দোল খাচ্ছে। গোটা নদী জুড়ে তখন বিশ্রামের আমেজ, আর হাসপাতালে শুয়ে-থাকা রোগীদেরও মনে খাবারের প্রত্যাশা আর চোখে ঝিমুনির ঝোঁক। তারই মধ্যে পণ্ডিতজীর খেয়ালী ভরাট গলা কেমন যেন বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

দূরে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে ফেরানো চোখে মোহাঞ্জন মিশে

থাকারই কথা। কিন্তু এটা কি শুধু মনের পিছুটান যে আজ ভাবি কলকাতায় একটা মস্ত ওলট্‌পালট্‌ হয়ে গেছে— কলকাতার কথা বলতে গেলে এখন ক্রুদ্ধ, কঠোর গদ্য ভিন্ন গতি নেই, 'মধুর' কবিতা যেন কলকাতার প্রাণ থেকে মিলিয়ে গেছে। দীনহীন হলেও কলকাতার আকাশে বাতাসে একরকম কবিতা ছিল তা আজ আছে কি? যে-কবিতার কথা ভাবছি তা অবশ্য উঁচুদরের না, একেবারে সাদামাটা। তার দৌড় শুধু এই পর্যন্ত যে "পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল" পদ্যটির মাথায় ছাপা কালিতে একেবারে ধ্যাবড়া ছবির মধ্যে শিশু পাঠককে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আকুল করার ক্ষমতা তার ছিল, দৈনন্দিন ধান্দায় নাজেহাল বয়স্কদের বোধ হয় ছুঁতে পেত না। তবু ভালো লাগে ভাবতে তখন কলকাতার খাস এলাকাতেই কত মাটির রাস্তা, কত সত্যিকারের চেনা গলিঘুঁজি, সেখানকার বাসিন্দারা কেমন যেন দূর হলেও আপনজন। কয়লাপোড়ানো কালি ঢেলে রাস্তাকে পিছমোড়া বাঁধা হয় নি। পিচের রাস্তার ছড়াছড়ি এখন কলকাতায়; তার অধিকাংশ প্রায় সব সময় ভেঙে চুরে যাচ্ছেতাই অবস্থায় থাকলেও তা হল পিচের রাস্তা, যে জিনিস আমাদের ছেলেবেলায় নতুন বলেই বোধ হয় 'Tar-MacAdamised' শব্দটি শিখতে হয়েছিল। সেযুগে পিচের রাস্তা দেখা যেত প্রধানত যাকে বলা হত 'সাহেবপাড়া', যেখানে 'নেটিভ'দের চলাফেরা তখনো একটু যেন সন্তর্পণে, গা বাঁচিয়ে, পারতপক্ষে 'সাহেবসুবো'-দের এড়িয়ে। খোয়া দিয়ে বাঁধানো পাকা রাস্তা অবশ্য অনেক ছিল। আর বড়বাজার-পোস্তার মতো এলাকায় আজও যেমন, তেমনই তখনো বোধ হয় ইঁট দিয়ে মজবুত করা পথ বানানো হত। কিন্তু সাধারণত যেখানে আমাদের গতিবিধি সেখানে বৃষ্টি হলে পিছল আর কাদা যতই হোক্‌-না কেন, মোলায়েম মাটির ওপর পা ফেলে চলতে বেশ লাগত, আর লাট্টু, ডাংগুলি, এমন-কি, নেকড়ার গোলা নিয়ে ফুটবল আর বাতিল করা টেনিস বল নিয়ে ইঁটের উইকেট-ওয়ালা ক্রিকেট খেলার জায়গা খুঁজে পেতে ছোটো ছেলেরা হায়রান হত না।

আজকের বস্তি-বিদূরণ-পরিকল্পনায় হিম্‌শিম্‌-খাওয়া কলকাতাতে বলতে একটু যেন অপ্রতিভ লাগছে যে তখন বস্তি সত্যই ছিল বসতি, তার সংখ্যাই বা কত বেশি। পুকুরেরই বা তখন কত ছড়াছড়ি— আমাদেরই বাড়ির

পিছনে ছিল পাড়ার প্রাক্তন ধনী সদ্‌গোপ পরিবারের প্রকাণ্ড বাগান, পুকুর, আর কুঠুরী থেকে দালান শতাধিক নানা আকৃতির নানা ছাঁদের ঘর নিয়ে ছড়ানো, ঢাউস, অসম্ভবরকম এলোমেলো বাড়ি, যার উঠোনে হত বারোয়ারী যাত্রা, পূজোর সময় যার বিরাট ভিয়েন্ থেকে অন্তত সাত-আট দিন নারকল-নাড়ু আর রসকরা আর বোঁদে-র সৌরভ কেবলই আমাদের নাকে ধাক্কা দিত, যার বাগানের খানিকটা অংশে মাঝে মাঝে বাড়ির মালিক ও তার বন্ধুদের ঘোড়সওয়ারী মহড়া চলত, পুকুরে কাছাকাছি এক Y.M.C.A.-র মেম্বররা দাপাদাপি করত। আর তখনকার কলকাতার গাছ, যার অভাবে আমাদের শহর ক্রমে শুকিয়ে মরছে, যার ছায়ায় ঝর্‌ঝরে হাওয়ার মতো স্নধায়-ভরা বস্তু আর কী আছে? আজ যারা ছোটো তারা কি হাসবে যদি বলি যে আমাদের বাড়ির তিনতলার ছাদে উঠলে ভাবতাম যেন আকাশকে প্রায় ছোঁওয়া যাচ্ছে, আর সেখান থেকে দেখতাম দূরে গড়ের মাঠে 'মনুমেণ্ট' (এখনকার শহীদ-মিনার) আব্‌ছা আলোয় খাড়া হয়ে আছে; মাঝে জানবাজারে রানী রাসমণির বংশধর 'মাড়ে'-দের থামওয়ালা বাড়িগুলি সারসার দাঁড়িয়ে রয়েছে; তখনকার নামজাদা সাহেবী দোকান 'লেড্‌-ল'-বাড়ির মাথায়-আঁটা প্রকাণ্ড ঘড়ির কাঁটা দুটো না হোক্, ঘড়িটাকে দেখা যাচ্ছে, আর নীচে বাড়ির কলতলার দিকে তাকালে যেন পাতালদর্শন ঘটছে!

আমার পিতামহের সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রতিবেশী, যাঁকে আমরা 'নতুনদা' বলতাম, তাঁর সঙ্গে খুব অল্প বয়সে যেতাম আমাদের বাড়ির কাছে মাদ্রাসার দিঘিতে (যার নাম এখনও বোধ হয় ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ার) আর বায়না নাকি করতাম যে জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকব— আজ সেই জলাশয় আর তার চারদিকের চেহারা যখন দেখি, আতঙ্ক হয়, শিশুমনকে সে টানে কি এখনো? এমনও হতে পারে যে এ প্রশ্ন হল আমারই বুড়িয়ে যাওয়ার লক্ষণ, কিন্তু সন্দেহ নেই যে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে কলকাতার নিরাভরণ এলাকাতেও যে-মনোহারিত্ব ছিল তা প্রায় হারিয়ে গেছে। তখনকার জীবন নিশ্চয়ই আজকের তুলনায় সংকীর্ণ ছিল, ঢের বেশি কুপমণ্ডুকবৎ ছিল সে জীবন, কিন্তু আপাত-নিস্পন্দ সেই অস্তিত্বের মধ্যেও যেন একটা স্বস্তির সম্ভাবনা ছিল, যা বুঝি ফুরিয়ে গেছে। এ কথা বলার অর্থ পরিতাপ নয়;

মূলগত বিচারে তখনকার সামাজিক তুষ্টি আর স্বস্তিকল্পনা অকিঞ্চিৎকর বস্তু, হয়তো আরো নিন্দনীয়, কারণ তা ছিল নিস্তেজ, প্রশ্নবিবর্জিত চিত্তের বশ্যতারই পরিচায়ক। তবে এ-লেখাটা হচ্ছে বিবরণ মাত্র, আর আগেই তো বলে রেখেছি— দূরে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে ফেরানো চোখে মোহাঞ্জনের প্রলেপ কিছু না থাকাই হল অবাস্তব কাণ্ড।

৩

কলকাতায় জন্মেছি, মানুষ হয়েছি— কলকাতাতেই 'বাড়ি' বললে অত্যুক্তি হয় না, যদিও আমাদের পরিবারের আদিবাস চব্বিশ পরগনা জেলার হালিশহরে। সেখানে ক্বচিৎ কদাচিৎ গিয়েছি— সহজেই ট্রেনে কলকাতা ফিরে আসা যায় বলে কখনো সেখানে রাত কাটাতে হয় নি। আমার পিতামহ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় গত শতাব্দীর ষাটের দশকে কোনো-এক সময়ে এখানে এসেছিলেন তাঁর পিতৃব্যের সঙ্গে। লেখাপড়া করেছিলেন, সেকালের কী-এক 'সিনিয়র-জুনিয়র' পরীক্ষা দিয়েছিলেন, পরে কর্মজীবনে বাড়ি করেছিলেন পরিচিত তালতলা পাড়ার উত্তর প্রান্তে, যেখানে ছোট্ট এক রাস্তার নাম হল ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট। আমার জন্মসময়ে রাস্তার নাম ছিল 'মট লেন'; ঐ পাদরি সাহেবের নামে, একটু পশ্চিমে, গোয়ালটুলি-জানবাজারের দিকে এগিয়ে-যাওয়া গলি আজও আছে। তবে আমার জ্ঞান যখন থেকে হয়েছে তখন থেকে ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটই জেনে এসেছি। গলির নামকরণ হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান মিরর' বলে প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংবাদপত্র থেকে—যার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মহাজনের নিকট সম্পর্ক ছিল। এই পত্রিকার সঙ্গে আমার পিতামহ কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। আমার পিতা শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও পত্রিকাটির শেষ অধ্যায়ে সম্পাদকীয় রচনার ভার-প্রাপ্ত ছিলেন। এর খ্যাতনামা সম্পাদক-পরিচালক নরেন্দ্রনাথ সেন আমাদের গলিতে থাকতেন, তাঁর পরিবারের কেউ কেউ আজও সেখানে থাকেন, যদিও 'আর্য-কুটির' নামধেয় সেই মস্ত, পুরোনো বাড়িতে অনেক অদলবদল হয়েছে। বহুদিন আগে নাকি ড্যাল্ সাহেব নামে এক সহৃদয় ভারতবন্ধু পাদরির একটি স্কুল ঐ বাড়িতে ছিল— আজও বাড়িটি লক্ষ্য করার মতো, প্রকাণ্ড গেট, মাথায় সিংহ (যা ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে বেশ দেখা যায়), যদিও আমাদের ছেলেবেলায় হিন্দুস্থানীরা বলত, হয়তো অনেকে এখনো বলে: 'বাঘ-ওয়ালা বাড়ি'! বিরাট উঠোন আজ সংকীর্ণ হয়ে উঠলেও অবজ্ঞা করার মতো নয়। আমরা যখন ছোটো তখন শুনতাম (আর কেউ অবিশ্বাস

করতাম না) যে ঐ বাড়ির যে ডালিম গাছের ডালপালা পাঁশের সরু গলির উপর ঝুঁকে পড়েছে, তাতে অনেকদিনের বাসিন্দা এক 'কন্ধ-কাটা', যে নাকি অন্ধকার রাত্রে টুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে পথচারীর ঘাড়ের উপর— বেশ মনে আছে বহুদিন পর্যন্ত ঐ গলি দিয়ে রাতের অন্ধকারে হেঁটে আসতে হলে গা ছম্‌ছম্‌ করত ; পারতপক্ষে আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে একটু ঘুরে আসাই তখন পছন্দ করতাম।

আমাদের ঐ রাস্তার অধুনাতন ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) নাগাদ সময়ে, যখন মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বর্তমানে সুবিদিত নাহার-পরিবার বড়ো বড়ো ইমারৎ বানিয়ে ঐখানে বসবাস আরম্ভ করেন। পাড়ার চেহারা বদলে দেওয়ার ব্যাপারে এই ধনী, শিষ্ট, জৈন পরিবারের অবদান প্রচুর। অস্বাভাবিক নয় যে ত্রিশের দশকে চেষ্টা হয়েছিল নাহারদের নামেই রাস্তাটির পরিচয় করাবার, কিন্তু আরো স্বভাবত পুরোনো বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে আপত্তি ওঠে ; 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সামান্য স্মৃতিটুকু মুছে দেওয়া তাই সম্ভব হয় নি। এরই ফলে সাম্প্রতিক রাজনীতিক্ষেত্রে বিখ্যাত শ্রীবিজয়সিং নাহারের স্বর্গত পিতা পূরণ-চাঁদ নাহারের নাম ধারণ করছে আমাদের ছোটোবেলার 'পোয়ালাগলি' বস্তি ভেঙে যে প্রশস্ত পথটি আজকের লেনিন সরণি (ধর্মতলা স্ট্রীট) আর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডকে (সাবেকী কর্পোরেশন স্ট্রীট) সংলগ্ন করেছে এবং সাধারণত তালতলা অ্যাভেন্যু নামেই যা পরিচিত।

গলিতে ঢুকে, আবার 'তস্য গলি' দিয়ে তবে আমাদের বাড়িতে আসা যায়। দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে তারিখ বার করার সাধ্য বা উপায়ও নেই, কিন্তু বাড়ির একটা অংশের বয়স যদি একশো বৎসর কি তার কিছু বেশিও হয় তো আশ্চর্য হব না। পাতলা ইঁটের চওড়া গাঁথুনি দেখে মনে হয় যেন সেকালে নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও মজবুৎ ইমারৎ বানানোর ব্যবস্থা বাস্তবিকই কম ছিল না— ইস্পাত আর 'কংক্রিট' তো সেদিনের ব্যাপার, কিন্তু মাঝে কিছুকাল যে-ধরনের দেওয়াল দেখা গেছে তাকে চলিত কথায় বলা যায় 'ফক্কবেনে'। আগেকার দিনের ঘরবাড়িতে অবশ্য আজকের থেকে তফাত বেশ কিছু অনিবার্য, জানলার আকৃতি-প্রকৃতিতে তো বটেই। কিছুকাল আগে চিৎপুর রোড-কলুটোলা এলাকার এক মুসলমান ব্যারিস্টার বন্ধুর বিয়েতে

গিয়ে দেখেছিলাম, একটামাত্র গাড়ি কোনোক্রমে ঢুকতে পারে এমন এক ঘিঞ্জি গলিতে ঢুকে, সবাইকে শশব্যস্ত করে এগিয়ে গিয়ে, একেবারে অপ্রত্যাশিত তিনমহলা বাড়ির দরজায় পৌঁছানো গেল, যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ মনের কোণে উঁকিঝুঁকিও দিতে পারে নি, অথচ যার দেওয়াল-জোড়া আরশী-আঁটা হল্‌ঘর দেখে যেন চম্‌কে উঠতে হয়। আমাদের পুরোনো বাড়ির বেলায় অবশ্য চমকপ্রদ কিছু নেই, কিন্তু হয়তো সাবেকী কায়দার সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য রেখে, গলি এবং 'তস্য গলি' পার হয়ে দেখা যাবে যে সামনের দিকটা একটু ঘুপটি হলেও ভিতরে খোলামেলা জায়গা নেহাৎ কম নয়। পিছনে দক্ষিণে আর পূর্বে কিছুদূর পর্যন্ত আলো-হাওয়া আটকাতে পারে এমন উঁচু ঘরদোর নেই, বরঞ্চ আছে—আশ্চর্য এই যে এখনো বেশ কতকটা আছে— খোলা জমি, যা আজ অযত্নক্লিষ্ট হলেও খোলা এবং মাটি বলেই এত দামী।

পূর্বেই বলেছি আগেকার দিনের ধনী সদ্‌গোপ-পরিবারের কথা। এরা মনীষী মহেন্দ্রলাল সরকারের আত্মীয়। এদেরই মস্ত ছড়ানো বাড়ির সংলগ্ন হল আমাদের বাড়ি— তাই পাশেই ছিল তাদের বাগান, গোশালা, শিব-মন্দির, রান্নাবাড়ি, কিছু দূরে পুকুর ইত্যাদি। গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর ধরে এই খোলা জায়গা ক্রমশ চেহারা বদলাচ্ছে, নোংরা হচ্ছে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে একেবারে নষ্ট হয় নি। অতি সম্প্রতি পুকুরটার আধা-আধি বুজিয়ে নাকি মোটর লবির রাত্রের আশ্রয় বানানো হয়েছে। কিন্তু ছেলেবেলায় যা দেখতে পেতাম বাড়ি থেকে সে-দৃশ্যের অদলবদল মারাত্মকরকম আজও হয় নি। আজও পিছনে রয়েছে তালগাছ আর নারকোলগাছ যা আগেরই মতো এখনো ঝড়ে জটার মতো দোল খায়। আছে কাঁঠালগাছ, সুপুরিগাছ, কলাগাছ তো বটেই। আর আছে আমাদেরই পিছনের দেওয়ালের মাথায় আমড়াগাছের ডালপালা নিয়ে বিস্তার। আমার এক ছোটো বোনকে বোধ হয় বিলেত থেকে লিখেছিলাম চল্লিশ বছর আগে, আমাদের বাড়ির পিছনের নারকোল-গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পুব আকাশে চাঁদের চেহারা নিয়ে— আজও তা প্রায় যেন তেমনই মনোরম রূপ নিয়ে দেখা দেয়। এখনো ভরা বর্ষায় আকাশ জুড়ে রামধনু ফুটে উঠলে সেদিকে তাকিয়ে চোখ জুড়োতে হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখার মেহনৎ করতে হয় না। পুরোনো কলকাতার একটা ভগ্নাংশ

যার মেয়াদ হয়তো খুব বেশি দিন আর নেই, এখনো রয়েছে আমাদের বাড়ির আশেপাশে। আজকের দিনে প্রায় বাতিল হলেও তাকে হতশ্রী বলে 'হতচ্ছেদ্দা' করতে আমার মন কখনো সায় দেবে না।

আজকের বিচারে কী বলবে জানি না, কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় বাড়ির মধ্যে আলো আর বাতাসের অভাব কখনো পাই নি, কিম্বা পেলেও গায়ে মাখি নি। শেষ কথাটা লিখলাম এইজন্য যে মনে পড়ে গেল, ১৯২৪ সালে বাড়িতে বিজলী বাতি আর পাখা আসে, তার আগে কলকাতার গরমে আইঢাই নিশ্চয়ই করতে হয়েছে, সনাতন তালপাখার হাওয়ায় খুব বেশি কি বাস্তবিকই শানিয়েছে তখন? যাই হোক্, যত দূর মনে পড়ে, হাওয়ার অভাবকে কখনো গায়ে মাখি নি। তা ছাড়া আমাদের ছিল— অদ্ভুত শোনাবে হয়তো, এখনো আছে— দুটো উঠোন, নিম, পেঁপে (যার ফলন খারাপ), পেয়ারা প্রভৃতি গাছ, আগে ছিল হাস্নাহানার বাহার আর অনেক সাধারণ অথচ সুগন্ধি ফুলের গাছ, এখন বোধ হয় আছে শুধু একটি কামিনী, আর রয়েছে আমার বাবার শখের পাম, ক্রোটন্ প্রভৃতি, যার মধ্যে একটা গোদা 'পাম' বাস্তবিকই দুষ্প্রাপ্য জাতের। আমাদের ছেলেবেলায় বাড়ির পিছনে চাকরদের ঘরের পাশে ছিল গোয়ালঘর— গোরু চরতে যেত ময়দানে রোজ, ফিরত যখন বিকেলে তখন বৈঠকখানায় কেউ চেয়ারে বসে থাকলে দাঁড়িয়ে গোমাতাকে যাবার জায়গা দিতে হত, কারণ একধারে সতরঞ্চি-পাতা তক্তপোষ আর মধ্যে মস্ত টেবিল থাকায় জায়গার তো সংকুলান, কিন্তু গোরুর আবির্ভাবে কাউকে সংকুচিত বা অপ্রতিভ বোধ করতে হত না। বেশ মনে আছে গয়লা এসে দুধ দুইতে দুইতে কত কথা সবাইকে বলছে, আমরা ভাইবোনেরা কেউ কেউ গোরুর লম্বা ঝোলা গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, সে চোখ বুজে আরাম খাচ্ছে— আর মনে আছে বাছুর জন্মাবার পর লাফিয়ে বেড়াতে থাকলে আমাদের ফুর্তি। তবে কী জানি কেন, বাছুরগুলো প্রায়ই বেশিদিন বাঁচত না। আর সেজন্যই বোধ হয় আমার ছেলেবেলাতেই গোরু রাখার পাট উঠে গেল। হয়তো একটা হাঙ্গামাও চুকল, যে-হাঙ্গামা শহুরে জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু বেশ একটু ফাঁকাও লেগেছিল বাড়ি, গোরু না থাকায়। দুধের প্রতি অনীহা, যা এখনকার ছেলেমেয়েদের বেলায় প্রায়ই দেখি, আমাদের তাই কখনো হয় নি। আমাদের বুড়ো বয়স পর্যন্ত

জামবাটি দুধ না খাইয়ে আমাদের মা কখনো ক্ষান্ত হতেন না— কোন্ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে এনে দিতেন জানি না, কিন্তু কী প্রয়োজন জানার? অমৃতের সন্ধান দেবতাদের কাছে নেই, আছে আমাদের মায়েদেরই কাছে।

* * *

মায়ের কথা কেমন করে বলব জানি না— আমার চোখে আমার মা কী ছিলেন, তা কতকগুলো শব্দের মধ্যে আনি কী করে? অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে ভাবছি, হয়তো বিমূর্ত ছবি যারা আঁকে তাদের অস্পষ্ট কাজের অর্থ একটু ধরতে পারছি। বুকের আকাশ ছেয়ে যা থাকতে পারে তাকে কথায় ধরতে পারা তো সম্ভব ব্যাপার নয়, অন্তত আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়— হয়তো পারে শুধু সেই দুর্লভ কবিশক্তি যার যোগমায়ায় ধরিত্রীর অনির্বচনীয়ত্বও নিমেষের জন্য ধরা দেয় আর নিমেষেই মিলিয়ে যায়।

শুনে অনেকে হাসবেন, বলতেই পর্যন্ত হাসি পাচ্ছে, যে বেশ বড়ো হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমার মাকে 'মা' বলি নি, বলতাম 'মামী'। এটি অধুনা-প্রচলিত ফ্যাশন-দুরস্ত পরিবারে মাতৃসম্বোধন সূচক শব্দ নয়। আমরা মা-কে মামী বলতাম কারণ তখন একচ্ছত্র গৃহকর্ত্রী ছিলেন আমার পিতামহী যাঁকে সবাই মা বলে ডাকত, আর আমরাও অনুকরণ করতাম; তা ছাড়া একান্নবর্তী পরিবারে তিন পিসতুতো দাদা এবং এক দিদি আমাদেরই সঙ্গে ছিলেন যাঁরা সবাই আমারই মাকে 'মামী' বলে যেন ভোটাধিক্যে ছোটো আমাদেরও বলিয়ে ছিলেন! এখন আমাদের সমাজে যে 'nuclear' পরিবারের সংখ্যা সমধিক তখনো তার রেওয়াজ ঠিক হয় নি। 'বড়দা' 'মেজদা' 'সেজদা' বললে আজও আমার অগ্রজ, মধ্যম অগ্রজ, আমি এবং ভাইবোন সবাই বুঝি যাঁদের তাঁরা আজ চলে গেছেন কিন্তু আমাদের দুই পিসীর এই তিন ছেলেকেই আমরা সকলে দাদা বলেছি, বয়সানুক্রমে সাজিয়ে বড়ো, মেজো, সেজো, নামে ডেকেছি। 'বড়দি' যাকে বলি আর সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তিনি হলেন আমাদের পিসীর মেয়ে। এমনও হতে পারে যে আমার বাবার কোনো সহোদর ভ্রাতা না থাকায় দুই বোনের সঙ্গে সংস্পর্শটা গভীর সহজে হতে পেরেছিল— তাদের মধ্যে একজনকে আমি কখনো দেখি নি, অপরকে ডাকতাম 'চেনুমা' বলে, কারণ তাঁর ডাকনাম ছিল চেনু বা চেনী, যে-নামে তাঁরই পুত্র আমাদের বড়দা-সেজদাও ডাকতেন! আমাদের

ঠাকুরমা তখন যেন 'মা' নামের একমাত্র অধিকারিণী হয়ে ছিলেন— পিতামহের একমাত্র পুত্রের সুন্দরী বধূ হওয়া সত্ত্বেও আমার মাকে হয়তো কিছুটা সীমিত ও সংকুচিত ভাবে অন্তত কিছুকাল থাকতে হয়েছে। কিন্তু এটা জানি যে আমার পিসতুতো ভাইবোনেরা আমার মাকে ভালোবাসতে আর তাঁর কাছ থেকে ভালোবাসা পেতে আমাদের কারো চেয়ে পিছপাও ছিল না। দিন যে সর্বদা সহজ আনন্দের হড়্‌হড়া রাস্তায় চলত তা নিশ্চয় নয়; কে জানে কোন্ জটিল অবস্থার উদ্ভব কখন্ হত, কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, বাইরের ঝড়ঝাপ্‌টার কথা জানি না, বাড়ির মধ্যে স্বস্তির আর কল্যাণের স্পর্শ ছিল, রোজ সন্ধ্যায় ধূপধুনো দেওয়া এবং শাঁক বাজার যেন একটা প্রকৃত অর্থ ছিল, দীপাবলী-রাত্রে লক্ষ্মীপূজার পর কুলো বাজিয়ে অলক্ষ্মীকে বিদায় করার মধ্যে শুধু কৌতুক নয় একটা তাৎপর্যও বুঝি ছিল। সেদিনের পরিস্থিতিতে আঁতুড় ঘরে ছ'দিনের দিন বিধাতাপুরুষ নবজাত শিশুর কপালে তার ভাগ্যের লিখন রেখে যাচ্ছেন শুনলে আজকের ছেলেমেয়েদের মতো তৎক্ষণাৎ অবিশ্বাসী হওয়াটাও বোধ হয় কঠিন ছিল।

ভাইবোন মিলে আমরা দশজন— সাত ভাই, তিন বোন। 'শত্তুর মুখে ছাই' দিয়ে সবাই বেঁচে আছি, তবে শত্রু বোধ হয় আমাদের তেমন কেউ নেই। আমার ওপর দুই দাদা এক দিদি, বাকী দুই বোন আর চার ভাই আমার ছোটো। আর এক বোন আমার জন্মের কিছু আগে একেবারে কচি বয়সে মারা যায় বৈদ্যনাথধাম বা দেওঘরে, যেখানে আমার বাবা তখন স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। একেবারে সবচেয়ে ছোট্ট আমাদের এক বোন মারা যায় পাঁচ বছর বয়স পার হওয়ার আগে, ১৯২৫ নাগাদ সময়ে। তার নাম দেওয়া হয়েছিল প্রতিমা, চেহারার সঙ্গে প্রতিমার মিল ছিল বলে। বেশ মনে আছে, যে হিন্দুস্থানী পরিবার আমাদের বাড়িতে থাকত, স্বামী-স্ত্রী কাজ করত, আত্মীয় বন্ধু দু-একজনকে থাকবার জায়গা করে দিত আর আমাদেরও পুরোপুরি আপনজন হয়ে উঠেছিল, তারা শখ করে আমাদের ছোটো বোনের নাম দিয়েছিল 'গঙ্গোত্রী'। আজ ভাবি যে বর্তমানের মতো শিশুচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলে প্রতিমা হয়তো বাঁচত। যাই হোক, দিনের বেলায় সে চলে গেল— রাত্রে বাড়িতে উনুন ধরানো হয় নি, কিন্তু মনে আছে বাজার থেকে লুচি বা কচুরি-জাতীয় খাবার কিনে আনা

হয়েছিল। যতদূর জানি, মা ছাড়া আমরা সবাই খেয়েছিলাম। যখন সব-কিছু বিক্রী লাগছে তখন খাচ্ছি কেমন করে, এই ভেবে মনে খোঁচা লাগতে থাকতেও তো পেট পোরাতে কসুর করি নি। অত্যন্ত নগণ্য ঘটনা নিশ্চয়, কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে কেমন যেন মনে খচ্ খচ্ করে ওঠে।

ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি আমাদের বাড়ি বোঝাই বই— এমন ঘর ছিল না যেখানে বই থাকত না, এমন ফাঁকা কোণ ছিল না যেখানে বই আর কাগজের ডাঁই মিলে তাকে ভরাট করে রাখত না। নানান রকম পত্রিকা, দৈনিক থেকে মাসিক বা অন্যকিছু থাকত চারদিকে— কিছু কাগজ যত্ন করে 'ফাইলে' বেঁধে রাখা, আর অজস্র 'কাটিং'। সাংবাদিকতায় আমাদের ঊর্ধ্বতন দুই পুরুষ বহুবৎসর ডুবে ছিলেন বলে শুধু নয়— বইকে আপদ না ভেবে তার সম্পর্কে একরকম মায়া আর লেখাপড়ার আমেজ যেন বাড়ির আলোবাতাসে মিলিয়ে থাকত। আমার দাদুর, এবং তার চেয়ে বেশি আমার বাবার, বিদ্বান্ বলে খ্যাতি ছিল— বিদ্যার জাহাজ তাঁরা ছিলেন না, তবে কি ভাবে যেন বিদ্যাবত্তা এবং বিদ্যোৎসাহিতা তাঁদের সত্তার মধ্যে মিশে গিয়েছিল। পাড়ার লোকের চোখে আমাদের পরিবার সম্বন্ধে পণ্ডিত বলে বেশ সমীহ ছিল। তা ছাড়া আমরা ছিলাম গলিতে একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার, যে-ঘটনার একটা তৎকালীন মূল্য ও মর্যাদা ছিল। চারদিকে ঘোষ, কুমার প্রভৃতি সদ্‌গোপ বংশের বাস, যারা তালতলার নিয়োগীপুকুর এবং কাছাকাছি অঞ্চলে রীতিমতো প্রতিষ্ঠাপন্ন। আমাদের একেবারে গায়ে-লাগানো বাড়িতে থাকতেন মল্লিকেরা, এখনো তাঁদের কেউ কেউ আছেন; জাতিতে শুঁড়ী হলেও কাউকে কখনো তাদের হেনস্থা করতে দেখেছি মনে পড়ে না— বিজয়ার রাত্রে পাড়াসুদ্ধ সবাইয়ের সঙ্গে তাঁরাও আসতেন আমাদের বাড়িতে প্রণাম আর কোলাকুলির পালা সারতে। ব্রাহ্মণত্বের জোরে মাঝে-সাঝে অতি অল্প কিছু প্রাপ্তিযোগও আমাদের হয়ে যেত— বৈশাখ মাসে অবস্থাপন্ন প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বৈকালী আসত কম নয়, অনেক বাড়িতেই আমার মার ডাক পড়ত ব্রত উদ্‌যাপন ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে, আর পৈতে হওয়ার পর আমার মতো বালখিল্যেরও কপালে দু-একবার কারো উপবাসভঙ্গ উপলক্ষে ফল আর মিষ্টান্ন আর আধুলি বা সিকি (যা তখন রুপো দিয়ে গড়া হত!) মিলে যেতে পারত।

আমরা বড়ো হতে হতে যজ্ঞোপবীতকে 'তেজহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস' বলেই জানা হয়ে গিয়েছিল। এ-সব ব্যাপারে ছেলেবেলার পরিবেশ সম্বন্ধে পরে আরো কিছু বলতে হবে, কিন্তু 'জাতের বিড়ম্বনা'— যা ছিল একদা-বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত সুলিখিত এক পুস্তিকার নাম— আমাদের খুব বেশি কখনো ভোগায় নি। তখন অবশ্য নিমন্ত্রণে পঙ্‌ক্তি-ভোজনে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণদের জায়গা হত আলাদা ; কুশের আসনে বসে কলাপাতায় সবাই খেতেন ; খেয়ে উঠে না আঁচিয়ে জলের গেলাসে হাত ডুবিয়ে রুমাল দিয়ে মুছে ফেলা তখন কল্পনাতীত। দাদুর সঙ্গে এমন সভাতেও গিয়েছি, সেখানে ঢুকেই তাঁকে বলতে হত : 'ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ'। কিন্তু আমার দাদু কখনো গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না, আমার বাবা বিশ্বাসী হয়েও চিন্তায় ও ব্যবহারে প্রকৃত উদারনীতিক ছিলেন। দাদু তো যুবা বয়স থেকে 'ব্রাহ্মভাবাপন্ন' ছিলেন (তখন এই শব্দটির খুব প্রচলন)— শুনেছি 'ভাবাক্রান্ত' বলে খোঁটা তাঁর মতো সবাইকে শুনতে হত সেই সমসাময়িকদের কাছ থেকে, যাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তখনকার অভিনয়-জগতে বিখ্যাত অমৃতলাল বসু 'খাস দখল'-ধরনের নাটকে, যাঁরা রসিকতা করে 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' মন্ত্রকে বলতেন 'ব্রহ্মকৃপা হেঁকে বলো'! তাঁর সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ, আজীবন বন্ধুর কথা আগে বলেছি, তিনি ছিলেন আমাদের নতুনদা, আমাদের বাড়ির পাশে বিস্তীর্ণ জমি ছিল তাঁর সম্পত্তি, যার অধিকাংশ বিক্রয় হয়ে যায় পূর্বোল্লিখিত নাহার-পরিবারের কাছে। নতুনদারা উপাধিতে ঘোষ, জাতিতে সদ্‌গোপ, যে তিন গ্রাম নিয়ে কলকাতার পত্তন তার পুরোনো বাসিন্দা পরিবারের মানুষ— শোনা যায়, ইংরেজ নাকি তাঁর পূর্বপুরুষদের জমি ছাড়তে বলে অন্যত্র গিয়ে যতটা খুশি বেড়া দিয়ে নিজের সম্পত্তি বানিয়ে নেবার হুকুম দিয়েছিল। এর সত্যাসত্য জানি না, কিন্তু এই ঘোষেদের জমি, পুকুর ইত্যাদি অনেকটা এলাকা জুড়ে ছিল ; সেখানকার বস্তি উঠিয়ে, পুকুর বুজিয়ে, খানা খোন্দল ভরাট করে নাহারদের প্রকাণ্ড অনেকগুলো বাড়ি বানানো হয়, তাদের মধ্যে একটিকে আমরা জানতাম 'মন্দির' বলে, যাকে অনেকে জানে 'কুমার সিং হল' নামে, বহুদিন ধরে কংগ্রেস পার্টির সভাসমিতির স্থান হিসাবে। এই ঘোষ পরিবারের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক ছিল। এখনো একেবারে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও যথাসম্ভব আছে।

তাদের এবং আমাদের বাড়ি যে আলাদা এ-বোধ ছেলেবেলায় আমাদের ছিল না। নতুনদার ছেলেকে আমরা বলতাম 'মামা', পিসতুতো দাদাদের অনুকরণে। নতুনদার নাতিরা আমার বাবাকে বলত 'জ্যাঠামশাই'— আরো অন্যান্য যথাযথ সম্বোধনের তালিকা নাহয় না-ই দিলাম। নিউ মার্কেটের কাছে ঘোষ-কোম্পানি বলে তাদের এক দোকান ছিল, সাহেবসুবাদের দরকারী জিনিস, 'অয়েলম্যান-স্টোরে' যা মেলে তা ছাড়া কেক কমলালেবু পর্যন্ত ডালায় সাজিয়ে ভেট্ দেবার বস্তুও সেখান থেকে বোধ হয় সরবরাহ হত। নতুনদা মারা যান যখন আমি খুবই ছোটো, তবু অস্পষ্ট হলেও মনে আছে তাঁর আদর আর তাঁর কাছে জেদী আবদারের কথা।

তিনি গেলেন, তাঁর সম্পত্তির একটা বড়ো অংশ গেল। আর অন্য ধরনের অনেক বেশি ধনী নাহার-রা আসার পর থেকে পাড়ার চেহারা বদলাল। বস্তিবাসীরা কোথায় গেল কে জানে, কিন্তু তারা গেল। আরো কিছুকাল ছিল এক 'ভুঁজোওয়ালা' বস্তি, যেখানে থাকত বিহারী ডালওয়ালারা, যাদের পণ্যের সৌরভ আমাদের গলিতে ঢুকতেই পাওয়া যেত, যাদের সঙ্গে ছোটো বড়ো আমাদের সবাইয়ের কেমন জানাশোনা ছিল। বাঙালি আর হিন্দুস্থানী মিশে ছিল বস্তি, যেখানে থাকত আমাদের পুরোনো ঝি গোপালের মা যাকেও আমরা বাইরের লোক ভাবতাম না। এই গোপালের বুঝি এক বুড়ী থুথ্‌ড়ী ঠাকুরমা ছিল যাকে সবাই বলত 'দুটো মা'— শব্দটা অদ্ভুত বলেই বোধ হয় মনে আছে, তবে সম্ভবত স্বামীর দ্বিতীয়া স্ত্রী রূপেই তার ঐ নামকরণ ঘটেছিল। আমাদের বাড়িতে বহুদিন রান্না করত উড়িষ্যাবাসী বংশী ঠাকুর— তবে সবচেয়ে আপন হয়েছিল দারভাঙ্গা-নিবাসী রামধারী (যে কোন্-এক সাহেব অফিসে দরোয়ানী করত এবং সপরিবারে আমাদের বাড়ি থাকত), তার স্ত্রী ঝিয়ের কাজ করত অথচ তাকে আমরা সবাই বলতাম 'বউ', আর সে আমার বাবাকে বলত দাদাবাবু, আমার মাকে বলত বউদিদি, আর আমার ঠাকুরমাকে বলত মা। আমি বিলেত ঘুরে আসার পরও কয়েকবৎসর পর্যন্ত 'রামধারী-বউ' আমাদের বাড়িতে ছিল, তারপর দেশে ফেরে। কিছুদিন যোগাযোগ ছিল, আর নেই। মনে হয় যোগাযোগ যে নেই এর দোষ তাদের নয়, দোষ আমাদের— যোগাযোগ রাখার ব্যাপার-স্যাপার আমাদের মতো লোকের অনেক বেশি রপ্ত, বিহারের পাড়াগাঁয়ের

গরিবদের চেয়ে। তাই ভাবি 'জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা', এ কথা যারা প্রবাদ বানিয়ে বসেছে, তারা ভুলে যায় যে 'জন' সম্বন্ধে আমাদের মমতায় মস্ত ফাঁকি আছে, আমাদের মতো মাঝারি অবস্থার বাঙালি গরিবকে আপন করেও যেন আপন করি না। ছেলেবেলায় এ-বালাই অবশ্য থাকে না— তাই তখন সত্যই আপন জন ছিল রামধারী-বউয়ের মতো যারা আমাদের ভালোবাসত, যারা মাঝে মাঝে শাসন করত ভয় দেখিয়ে যে বাড়ির পাশে বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য আছে এবং দুষ্টুমি করলেই ঘাড় মটকে দেবে, কিম্বা ঘুম পাড়াতে পুকুরে আত্মহত্যা-করা ধোপা-ভূতের গভীর রাত্রে হুশহুশ শব্দ করে কাপড় কাচার গল্প শোনাত। অনেক কুসংস্কার হয়তো মনে ঢুকিয়ে দিত কিন্তু অতি সহজ ও স্বাভাবিক ছন্দে শিখিয়ে দিত যে ভয় হোক আনন্দ হোক সব অনুভূতিই কল্পনার একটু ছোঁওয়া না পেলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।

আমাদের রাস্তায় বাস ছিল মালকাজান্ নামে এক বিখ্যাত বাঈজীর আর ছিল বেশ কয়েক ঘর ফিরিঙ্গীর, যারা কতকগুলো আগেকার দিনের পক্ষে মোটামুটি ভালো বাড়িতে থাকত আর 'রাজার জাত'-এর গরিব জ্ঞাতি হিসাবে খানিকটা নিজেদের জাহিরও করত। এদের দাম্ভিক আর দুরাত্মা বলেই আমরা জানতাম, যদিও সাংবাদিক বলে (এবং কখনো কখনো ব্যবহারজীবী বলে) আমার কাছে কোনো কোনো ফিরিঙ্গীকে আসতে দেখতাম, যাদের মধ্যে মোরেনো বলে একজন তাদের মধ্যে হোমরা চোমরা ছিলেন। ক্বচিৎ কদাচিৎ এই ফিরিঙ্গী বাড়ির ছেলেরা আমাদের খেলায়, বিশেষত রাস্তার ক্রিকেটে যোগ দিত। কিন্তু একটা দুস্তর বাধা ছিল আমাদের মধ্যে। রাস্তায় ঘাটে শুধু গোরা সিপাহীর হাতে নয়, ফিরিঙ্গীদের হাতেও ভারতীয়ের লাঞ্ছনা আমাদের ছেলেবেলায় একটু পুরোনো খবর হয়ে গেলেও তার জের বোধ হয় চলছিল। মনে আছে ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় আমাদের কারো কারো খেয়াল হয়েছিল ফিরিঙ্গীদের মতো ধাক্কা দিয়ে রাস্তা হাঁটতে হবে এবং বিশেষ করে ফিরিঙ্গী মেয়েদের ঠেলে এগুতে হবে— দরকারমতো বললেই চলবে, 'সরি'! যৌনবিদ্যা-বিশারদরা এর একটা মানে করতে পারেন যেটা বেঠিক না হলেও এর মুখ্য কারণটা বোধ হয় একটা আহত, অক্ষম জাতীয়তাবোধের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। শাদাচামড়ার

মানুষ যে যেখানে আছে তাদের সঙ্গে আমাদের যে বৈরিতা, তাদের হারিয়ে দেওয়া— তা সে খেলার মাঠে হোক্ বা অন্যত্র— যে আমাদের লক্ষ্য, আর আমাদের অধম, অভিশপ্ত জীবন যে বড়ো জ্বালা, এ-বোধ জাগিয়ে তুলতে ছেলেবেলা থেকেই বোধ হয় ফিরিঙ্গী প্রতিবেশীরা অজ্ঞাতে কিছুটা সাহায্য করেছিল। এখানে বলছি কালানুপাতকে একটু অগ্রাহ্য করে, কারণ এখনো ঠিক সচেতন বাল্য বা কিশোর কালের খবর কিছু বলতে পারি নি।

এ-প্রসঙ্গ যে হঠাৎ এসে পড়ল, তার একটা ফল ভালো মনে করি। হয়তো পুরোনো দিনের মায়ায় কতকটা মজে গিয়ে অনেক তুচ্ছ ব্যাপারে মাধুর্যের সন্ধান রয়েছে বলে একটু উল্লাস করে ফেলা গেছে, যা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য নয়। খেলায় খুব ভালো কোনোকালে ছিলাম না, তবুও অনেকে মিলে ডাংগুলি বা পাথরে তৈরি গুলি (marbles) খেলা নিয়ে কিম্বা নেবুতলার উড়িয়া মিস্ত্রীর কাছে লাট্টুর ভালো 'আল' তৈরি করিয়ে আনার কথা ভেবে কিছুটা উচ্ছ্বাসও হয়তো এসে পড়েছে। বস্তির গরিব মানুষদের উল্লেখের মধ্যে একটা আন্তরিক অথচ অস্পষ্ট আবেগ হয়তো প্রকাশ পেয়েছে, যার প্রখর মূল্যায়ন খুব সুখকর হবার মতো নয়। একটু যেন কশাঘাত করে নিজেকে মনে পাড়িয়ে দিতে হচ্ছে সেই ছেলেবেলাকার দিনগুলির অপরিসীম ক্ষুদ্রতার কথা— যে ক্ষুদ্রতা হল দীর্ঘায়ত পরাধীনতায় প্রায়-নিষ্প্রাণ, এবং দুঃসাহসিক কর্ম ও চিন্তায় ব্যাপৃতি হতে বঞ্চিত অথচ স্বল্পে সন্তুষ্ট, স্থাণু, মূলত গতানুগতিক জীবনধারার অপরিহার্য পরিণতি। যত ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনা আজকের ভারতবর্ষে থাকুক-না-কেন, এখন যারা ছোটো অন্তত তারা জানবে না 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হয়ে থাকার অভিশাপ। তারা ভাবতে পারবে না যে আমরা 'ইংরেজের প্রজা' এই কদর্য ধিক্কারকেই বিধাতার আশীর্বাদ বলে মাথায় পাতার মতো প্রবৃত্তি এই সেদিন পর্যন্ত আপাতবিচারে চক্ষুষ্মান্ ভারতীয় মহারথীদের ছিল। তাদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে অন্তত এ-বস্তু নেই, বিচলিতির অন্য অজস্র হেতু থাকুক-না-কেন। অবান্তর কথা এসে গেল সন্দেহ নেই, কিন্তু উপায়ান্তর কোথায়?

৪

আমাদের 'দেশ' হালিশহরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নামমাত্র— কলকাতায় অত কাছে হলেও তখন সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রভূত প্রকোপ আর তিন পুরুষ বাস করে আমাদের পরিবারও একেবারে 'শহুরে'। সম্পর্ক থাকার মধ্যে ছিল একজনের সঙ্গে, যিনি আমার দাদুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো হলেও ছিলেন তাঁর কাকার একমাত্র ছেলে ; সুতরাং সম্পর্কে আমাদের ঠাকুর-দাদা। অন্যান্য জ্ঞাতিদের অস্তিত্বের কথা বাড়িতে কোনো 'যগ্যি' না হলে বড় একটা জানা যেত না। বছরে একবার হয়তো দাদু আম-কাঁঠালের সময় গিয়ে কিছু ভালোমন্দ ঘরের ফসল নিয়ে আসতেন। চোখে দেখে এসেছি, গোটা পরিবারের সম্পত্তি নেহাত ফেলনা ছিল না— দুটো কচুরিপানায় ভরা পুকুর, অনেকটা জায়গা জুড়ে জঙ্গল (যার নাম ছিল বাগান), ছোটো একটা দোতলা বাড়ি, বড়ো রোয়াক, একটা পাতকুয়ো, ইত্যাদি। নিয়মমাফিক ভাগাভাগি হলেও আমাদের কপালে অল্প-কিছু প্রাপ্তিযোগ হত। কিন্তু তা কখনো হয় নি এবং এ নিয়ে কারো আফসোস কখনো দেখি নি। সম্প্রতি-কালে নির্বিকার চিত্তে সবাই জেনেছি যে জ্ঞাতিরা কেউ কেউ নৈহাটী বা অন্যত্র বাস করছেন। পুরোনো জমিজমা নাকি মোটামুটি লোপাট হয়ে গেছে আর স্বাধীনতার পর পূর্ববাংলার বাস্তুত্যাগীরা এসে অনেকে বুঝি সেখানে বসে গেছে। ১৯৫২-৫৭-৬২ সালে ইলেক্‌শানের বক্তৃতা করতে হালিশহর গিয়েছি। সময় হয় নি, দুশ্চিন্তাও হয় নি বারুইপাড়ায় আমাদের পুরোনো অবস্থানের খোঁজ নেওয়া সম্বন্ধে। দাদুর আমলে আলিপুর আদালতে মোক্তা বা ঐরকম ধরনের কোনো-একটা ব্যাপারের দলিল সম্বন্ধে কানাঘুষা শুনেছি। কিন্তু 'অর্থমনর্থম্' ভেবে শুধু নয়, হয়তো পাড়াগাঁয়ে সামান্য সম্পত্তির জট খুলবার অসামান্য হেফাজতের কথা ভেবেই অর্ধচেতন মন থেকে তার সব চিন্তা আমরা সবাই দূর করে রাখতে পেরেছি— কলকাতায় যা-হোক্-একটা মাথা গুঁজে থাকার জায়গাই যথেষ্ট ভেবে নেওয়া গেছে।

আমার ঠাকুরমার আত্মীয়স্বজন বুঝি থাকতেন বর্ধমান জেলার সরংগা বলে

এক স্থানে। সে-জায়গা কখনো দেখি নি। তবে সেখানকার সুবাদে একজন আত্মীয় হুগলি কলেজ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন কিছুকাল, এবং কদাচিৎ হলেও কলকাতায় আমাদের বাড়িতে আসতেন। তাঁকে মনে আছে এইজন্য যে তাঁর চেহারা দেখে আমরা বলতাম (অবশ্য গোপনে) 'রামকৃষ্ণ', কারণ প্রায় অবিকল ছবিতে-দেখা পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তাঁর মুখাবয়ব ছিল, এবং শিক্ষক বলেই বোধ হয় অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি ও মৃদুভাষী মানুষ ছিলেন।

আত্মীয়তার ঐ সূত্র ধরেই আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল শাঁখারিটোলার ক্ষেত্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আমার বাবার তিনি ছিলেন মামা এবং তাঁর বাড়িতে প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজায় সারাদিন কাটানো ছিল ছেলেবেলার একটা বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা। তাঁকে আমরা বলতাম ছোড়দা আর তাঁরই ছোটো ছেলে হলেন পরবর্তী জীবনে খ্যাতিমান কংগ্রেস নেতা এবং দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিম বাংলা সরকারের মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়। রাজনীতিক্ষেত্রে কৃতী, বিতর্কিত ও বিচক্ষণ এই মানুষটির পরিচয় কিন্তু আমাদের কাছে একান্ত ব্যক্তিগত— তাঁর কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে বিজয়ার রাত্রে আমাদের বাড়ি ঢুকেই 'বৌদি' ডাক দিয়ে আমার মার কাছে গিয়ে বসছেন। এমনও হয়েছে যে শরীর-রক্ষী বিনা কোথাও যান না, যেমন ১৯৪৮-৪৯ সালে। সঙ্গে পুলিশ প্রহরী, কিন্তু গলি বেয়ে আমাদের বাড়ি হেঁটে আসতে তাঁর ভুল হয় নি কোনো বিজয়ার রাত্রে।

আমাদের মামার বাড়িও খুব দূরে নয়— মাত্র ক' মাইল তফাতে, উত্তরপাড়ায়। কিন্তু সেখানে দু-একবার রাত কাটালেও আমার স্বস্তি ছিল না, কারণ পায়খানা ছিল 'খাটা'। মামাদের কথা পরে একটু-আধটু আসতে পারে, কিন্তু তা এখন স্থগিত থাক্। মায়ের বাবা, আমার দাদামশাইকে দেখেছি, একবার, মনে আছে— তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বৃদ্ধ, বারান্দার কোণে স্নান করছেন, আমাকে যেন ডাকলেন, পালিয়ে গেলাম। মায়েরও মামাবাড়ি ছিল একেবারে সংলগ্ন, পুকুরের অপর পাড়ে, তবে যিনি মায়ের বড়ো মামা তিনি থাকতেন তমলুকে, সেখানে ওকালতি এবং সর্ববিষয়ে দারুণ তাঁর পসার। একবার উত্তরপাড়াতেই তাঁকে দূর থেকে দেখেছিলাম, রাশভারী মানুষ, কাছে যাই নি। তাঁরই ছেলেদের মধ্যে উত্তরকালে বিখ্যাত হয়েছেন স্বাধীনতাযুদ্ধে মেদিনীপুরের একজন অগ্রণী এবং একাধিকবার পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর ছোটো ভাই, ছাত্র ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে খ্যাতিমান্ বিশ্বনাথ। মায়ের আপন মামাতো ভাই হলেও এঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কখনো খুব নিকট হয় নি ; কমিউনিস্ট পার্টিতেই বিশ্বনাথের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। মামাবাড়ির দিক থেকে আর-একজনের কথা বলতে ইচ্ছা করছে, যিনিও সম্পর্কে আমার মামা ছিলেন। কদাচিৎ হলেও দেখেছি আমাদের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে কে যেন কথা বলছেন, দীর্ঘ-কায় তেজঃপুঞ্জ এক ব্যক্তি, যাঁর গতিবিধি প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বহু বৎসর সহজ ছিল না, বাংলার সন্ত্রাসবাদী ধারায় যিনি স্মরণীয়—অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। দাবি করতে পারি না যে এঁর প্রভাবের আওতায় কখনো এসেছি। বেশ মনে আছে, ১৯৩৬ কি ১৯৩৭ সালে সগুলব্ধ মার্ক্‌স্‌বিদ্যা নিয়ে হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলনে সভাপতি হয়েছি ; আমার পরে বলতে উঠে অমরেন্দ্রনাথ বললেন 'আমার স্নেহাস্পদ ও শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতির' ভাষণ শুনে কিঞ্চিৎ হতাশ হয়েছি— বললেন শুধু যেন সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি শোনা গেল অথচ তিনি চেয়েছিলেন যে স্বাধীনতারিক্ত ভারতবর্ষের বঞ্চনা সতীহীন শিবের উদ্দাম একাগ্র সংকল্পের রূপে প্রকাশিত হোক্ ! ভ্রান্তি সকলেরই ঘটে, কিন্তু বুঝেছিলাম মানুষটির ব্যক্তিত্বের অন্তত একাংশ একান্ত সত্যসন্ধ এবং সরল হৃদয়াবেগে পরিপূর্ণ। অনেক পরে, পার্লামেণ্টে কিছু খ্যাতি যখন আমার জুটেছে, তখন উত্তরপাড়াতেই এক সভা থেকে বাড়তে ডেকে নিয়ে তিনি আমায় আশীর্বাদ করেছিলেন স্মরণ করে যেন একটু স্বস্তি পাচ্ছি।

'জ্যাঠামশায়' বলে একজনকে জানতাম, তবে নিকট থেকে বা স্পষ্টভাবে নয়। তিনি সম্পর্কে আমার বাবার দাদা, থাকতেন মধ্যপ্রদেশে (বর্তমানে উড়িষ্যার) সম্বলপুরে, যেখানে আজও পুরোনো বাসিন্দারা মনোরঞ্জন বন্দ্যো-পাধ্যায়কে মনে রেখেছেন স্কুলের ডাকসাইটে হেডমাস্টার বলে। শান্তি-নিকেতনের আদিযুগে রবীন্দ্রনাথ বুঝি তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ; সেখানে আজও তাঁর নাম অবিস্মৃত। কতকটা অমরেন্দ্রনাথের মতো দীর্ঘাঙ্গ, সৌম্য ও সুদর্শন তিনি ছিলেন— তাঁর মেয়েদের মধ্যে একজনের বিবাহ কলকাতায় আমাদের বাড়ি থেকেই হয়। সে যুগে চারিত্র্যের যে মর্যাদা ছিল, কিছু পরিমাণে তার অধিকারী তিনি ছিলেন শুনেছি। বাবা যখন উনষাট বছর পূর্ণ হবার আগে হঠাৎ মারা গেলেন তখন জ্যাঠামশায়

সমবেদনা জানিয়ে লিখেছিলেন। চিঠির শেষে ছিল শেক্‌সপীয়রের লাইন: He should have gone hereafter— যে-উক্তির মধ্যেই যেন হারিয়ে-যাওয়া এক যুগের কণ্ঠ শোনা গেল।

বাড়ির বাইরে মাত্র একটা জায়গায় গেলে ছেলেবেলায় বিশেষ অস্বস্তি হত না— সেটা হল টালায় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক্ রোডের ওপর আমাদের পিসীর বাড়ি। সেখানে গেলেই পাওয়া যেত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'ডিটেক্‌টিভ্' গল্প, 'মিস্টর ব্লেক' আর 'মিস্টর স্মিথ'-এর নানা রহস্যজনক কাহিনী যা আমাদের বাড়ির বইয়ের মেলায় কখনো দেখতাম না। একেবারে ছোটো বয়সে টালায় গেছি ছ্যাক্‌রা গাড়ি চড়ে, যেগুলোর অনেক সময় 'রবর্' টায়ার না থাকায় তখনকার রাস্তায় আওয়াজ উঠত নিদারুণ। একটু বড়ো হয়ে দাদুর সঙ্গে সেকালের লম্বা-পা-দানি-লাগানো ট্রামে গেছি শ্যামবাজার ডিপো পর্যন্ত (যা দৈন্য দশা নিয়ে আজও রয়েছে), তারপর হেঁটে খাল আর রেলব্রিজ পার হয়ে কর্পোরেশনের প্রকাণ্ড জলের ট্যাঙ্ক ডান দিকে রেখে টালার বাড়িতে পৌঁছেছি। সে-বাড়ি আজ ভেঙেচুরে একেবারে পালটে গেছে —আগে ছিল দোতলা উঁচু ফুলকাটা থামের সারি, বড়ো হলঘর যার অন্ধকার দেয়ালে অনেক উঁচুতে ঝুলত কর্তাদের আমলের বিলিতী ছবি (সম্ভবত ইংরেজ শিল্পীর তৈলচিত্রের নকল), শুনতাম সেগুলো নাকি খুব দামী। বাড়ির সামনে মস্ত খোলা জায়গা, পিছন দিকে কাশীপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে ভাড়া-দেওয়া ইমারৎ, তার পিছনে পুকুর। আমাদেব ছোটো বয়সেই বিরাট প্রাঙ্গণে ভাড়াটে বসানো হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আসা এক খান্ সাহেবকে, যার উদ্যোগে সেখানে বসল মস্ত খাটাল। যেখানে ছিল ঘাস সেখানে এল ইঁটের উঁচুনিচু গাঁথুনি যার মাঝে মাঝে নর্দমা আর গোরুর জাব্না-ভরা পেল্লাই সাইজের ডাবা। বাড়ির আশেপাশে ছিল কয়েকটা কবর, আর আমরা গল্প শুনতাম যে 'মামদো' ভূত রাত্রে বেরিয়ে আসে। রান্নাবাড়ির ছাদের ওপর নাকি দেখা গেছে শাদাচুল শাদাদাড়ি শাদাটুপি পরা কে একজন শাদা ঘোড়ায় চড়ে খটাখট্ শব্দ করে ঘুরছে। ক্রমশ কালের হাওয়া আর আমাদের অজানা নানা কঠোর সাংসারিক কারণে সে-বাড়ির এবং জমির মালিকানা বদ্‌লেছে, চেহারা পাল্‌টে গেছে, কতকটা অংশ ভেঙে আবার গড়া হয়েছে কিন্তু কোথাও কোনো ছিরি-ছাঁদ নেই, হয়তো ঘর-ঘর ভাড়াটে সেখানে

রয়েছে। ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে হলে সেদিকে তাকাতে খারাপ লাগে—কিন্তু ঐ এলাকায় এ-ধরনের ব্যাপার কোনো ব্যতিক্রম নয়। যেখানে ছিল প্রকাণ্ড মঞ্জিল কিম্বা কারো শখের বাগানবাড়ি, সেখানে ভগ্নাবশেষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যেন ছোটোখাটো চিম্‌নি, বেমানান্‌ কুঠুরি আর ছড়িয়ে-থাকা লোহা-লক্কড়ের ভিড়ের মধ্যে মানুষ থাকছে, খাটছে, বংশবৃদ্ধি করছে, দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে, মূর্তিমান্‌ অস্বস্তির সঙ্গে সহাবস্থান করছে।

* * *

আমার তখন বয়স বোধ হয় পাঁচ বৎসর, তখনকার একটা ছবি আব্‌ছা হলেও এখনো চোখে দেখতে পারি। ক'জন মিলে শীতের রোদে কোন্‌ একটা খেলার সময় গলি থেকে হঠাৎ দেখা গেল বাসন্তী রঙে ছাপানো কাপড়ের পাগড়ি মাথায় একদল ছেলে বড়ো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে; আমরা ছুটে কাছে গিয়ে দেখলাম। ইংলণ্ডে নতুন রাজার অভিষেক উপলক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা আমরা সরকারি হুকুমে উৎসব করছিলাম, তারই এক অঙ্গ হল স্কুলের ছাত্রদের কুচ্‌কাওয়াজ, হয়তো বা সঙ্গে সঙ্গে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা। পরে যখন স্কুলে পড়ি তখন আবার ইংরেজ যুদ্ধজয় করেছে বলে (১৯১৮-১৯) কলকাতায় হল মস্ত বড়ো মেলা, ছাত্রদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ প্রতি স্কুলে সরকারি নির্দেশে ঘটল, আর মনে আছে বাংলার তখনকার ইংরেজ লাট রোনাল্‌ড্‌শে-র স্বাক্ষরিত এক চিঠি মূল হস্তলিপির 'ব্লক' করে ছাপিয়ে আমাদের সবাইকে দেওয়া হল। তখনো হয়তো এ-সব ব্যাপার নিয়ে ভাবিত হওয়ার মতো মন আমাদের গজায় নি, কিন্তু রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠতে আমাদের দেরি হয় নি কারণ বাড়ির আবহাওয়ার মধ্যেই ছিল চারদিকে যা ঘটছে তা জানা আর বোঝার একটা ঝোঁক। আমার যখন দশ বছর বয়স, তখন আমাদের বাড়ির খুব কাছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমানে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার) কংগ্রেসের অধিবেশনে হয় (ডিসেম্বর ১৯১৭)। সভানেত্রী ছিলেন অ্যানি বেসান্ট; মনে আছে, মাদ্রাজ থেকে ট্রেন আসতে তাঁর দেরি হয়েছিল, হাওড়া স্টেশন থেকে তাঁকে আনা হয় যে-মিছিলে, তা আমি দেখেছিলাম, আর কংগ্রেসের গেটের সামনে ভিড় থেকে চাক্ষুষ প্রথম দেখলাম রবীন্দ্রনাথকে, চারদিকে রব উঠল 'রবিঠাকুর! রবিঠাকুর!' কিন্তু

থাক্, একেবারে ছেলেবেলার আরো-কিছু কথা না বলে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

* * *

সেকালে আমাদের মতো গৃহস্থ-বাড়িতে ছেলেপুলে অনেক থাকলেও একেবারে ছোটো যারা তাদের ভাগ্যে বড়োদের কাছ থেকে আদরের ভাগ কম হত না— কেউ যেন না ভাবেন যে আজকালকার স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন, ("nuclear") প্রায়-একক পরিবারেই ছোটো ছেলেমেয়েরা ঠিক মাত্রায় আদর এবং শাসন পেয়ে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে। অনেকে মিলে একত্র থাকার অসুবিধা অবশ্যই আছে, কিন্তু আমাদের ছেলেবেলার কথা ভেবে তার সুবিধা ও স্বস্তির দিকটাই বড়ো বলে মনে হয়। ছোটো বয়সে আদর পেয়েছি যথেষ্ট— ঠাকুরমার কাছ থেকে, দাদুর কাছ থেকে, মায়ের কাছ থেকে বিশেষ করে— স্নেহের ভাগাভাগি নিয়ে অল্প বয়সে কোনো যন্ত্রণাবোধের স্মৃতি আমার নেই। তখনকার জীবনযাত্রায় সংকীর্ণতা থাকলেও স্নায়বিক অস্বাভাবিকত্বের উদ্ভব ঘটত অতি কদাচিৎ— অন্তত তৎকালীন বাঙালি সমাজের যে স্তরে আমরা ছিলাম, সেখানে। মনের আকাশ থম্‌থমে হয়ে ওঠার পর আবার তাকে নির্মল করে ফেলার দাওয়াই বোধ হয় সেদিনের পারিবারিক পরিস্থিতিতে সহজে খুঁজে পাওয়া যেত। আমাদের কাছে হয়তো তাই বাড়ি মানায় না যদি একেবারে বাচ্চা ছেলেমেয়ে সেখানে না থাকে, অথচ আধুনিক কেতায় জীবননির্বাহ ব্যাপারে 'কচি-কাচা'-র হাঙ্গাম পোয়ানো প্রায় একটা কঠোর পরীক্ষা!

ব্যতিক্রম হিসাবে নয়, সেকালের রীতি-মাফিকই কিছু পরিমাণে 'আদুরে' ছিলাম ছেলেবেলায়। দেওঘরের বৈদ্যনাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা তখন ছিল। ছোটো বয়সে দেখেছি তাঁদের অনেককে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে আসতে— নধরকান্তি, পুষ্টোদর, মিষ্টভাষী, বৈঠকখানায় বসে হিন্দী মেশানো বাংলায় গুরুজনদের সঙ্গে আলাপ করতে তাঁদের দেখেছি। নামের শেষে "আনন্দ", তাঁদের এই রীতি অনুসরণ করে আমার ঠাকুরমা আমার ডাকনাম দিয়েছিলেন উমানন্দ, যার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হল 'নন্দ'। আমি যখন খুব ছোটো, তখন ঠাকুরমা নিয়ে গিয়েছিলেন দেওঘরে— অস্পষ্টভাবে মনে আছে, যাবার তোড়জোড় হচ্ছে,

কী কারণে যেন আমার মা-র যাওয়া হল না বলে মনটা মুষ্‌ড়ে গেল। ভোরবেলা ছ্যাকড়া গাড়িতে চড়ে রেলস্টেশন, ট্রেনে দারুণ ভিড়— কারা যেন ঠাকুরমাকে বলছে, 'মাগো, তোমার চরণতলে বসে যাব, একটু বসতে দাও'। আরো মনে আছে মন্দির-প্রাঙ্গণের ধারে একটা ছোটো কুঠুরিতে আমার কামিয়ে-দেওয়া মাথার ওপর হুড় হুড় করে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল জালা থেকে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। দেওঘরের দেবতা বৈদ্যনাথের বিরুদ্ধে বড়ো হয়ে আমার বেশ একটা নালিশ রয়ে গিয়েছে— আমার মস্তকমুণ্ডনের ফলে আমার বা আমার পিতামহীর সুকৃতির বৃদ্ধি কী হল জানি না, কিন্তু বৈদ্যনাথকে মাথার চুল দিয়ে আসার পর যদি কম বয়সেই মাথায় টাক পড়ে (যা আমার বেলা ঘটেছে), তো দেবতার ওপর রুষ্ট তো হতেই হয়!

* * *

আমাদের বাড়িতে একটা ঘর আছে আজও যার নাম 'ঠাকুর ঘর', যদিও পূজা-অর্চনা সেখানে আর বড়ো একটা হয় না। আমার ঠাকুরমা এবং পরে আমার মা রোজ কিছুক্ষণ জপ করতেন, পুজো করতেন— ছোট্ট সিংহাসনে শালগ্রাম শিলা থাকত, আর কোশাকুশি ও অন্যান্য সরঞ্জাম। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত পদ্যে অনূদিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা একখণ্ড ছিল, যা থেকে সুর করে পড়া ছেলেবেলায় শুনেছি। ঠাকুরঘর কিন্তু ছিল যাকে আজকের কটমট পরিভাষাকণ্টকিত যুগে বর্ণিত হয় 'সর্বার্থসাধিকা' বলে (কেউ যেন এই শব্দটিকে 'শিবে সর্বার্থসাধিকে' সম্বোধনের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলেন!)। সেখানে দেয়াল-আলমারি একটি ছিল, যার মধ্যে রাজ্যের পুরোনো জিনিস, যা অন্ধকারে খুঁজে বার করা চোরেরও অসাধ্য ছিল। একটা আদ্যিকালের খাট ছিল (এখনো আছে) যেখানে নিতান্ত প্রয়োজন ঘটলে অবাঞ্ছিত অতিথিও পদ্মনাভকে স্মরণ করে রাত্রিযাপন করতে পারত। এই খাটের একটা কোণে দেওয়ালে উঁচু-করে লাগানো একটি তাক, যার ওপর এখনো থেকে গেছে গাদা-করা পুরোনো বই আর কাগজ, যা ফেলতে মায়া হয়েছে সর্বদা, অথচ যাকে গুছিয়ে রাখা অসম্ভব এক কাণ্ড। এই ঘরে আরো ছিল একটি প্রকাণ্ড কাঁঠাল-কাঠের সিন্দুক, ছোটো বড়ো নানা আকারের বাক্স এবং পেঁটরা, কয়েকটি ঠাকুর-দেবতার ছবি, কাঠের একটি লম্বা তাক-সংবলিত টেবিল, এবং লেপ কম্বল-জাতীয় বস্তু কিছুটা নিরাপদে ঝুলিয়ে

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায়?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্‌, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্‌ গার্ডন্‌স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্‌, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্‌
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

* রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্‌স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ইডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ইডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায়?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায়?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্‌, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্‌ গার্ডন্‌স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্‌, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্‌
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ইডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

> যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
> ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
> বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
> কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
> *অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
> কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
> সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
> ত্রৈলোক্য নাথো হরি॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্‌স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্‌।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্‌ ॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায়?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায়?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্‌, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈড্‌ন্ গার্ড্‌ন্‌স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্‌, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্‌
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্‌স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্‌।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্‌॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ইডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ইডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ইডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায়?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকৃতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

> যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
> ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
> বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
> কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
> *অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
> কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
> সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
> ত্রৈলোক্য নাথো হরি॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ইডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একে-বারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

> যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
> ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
> বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
> কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
> *অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
> কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
> সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
> ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

> যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
> ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
> বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
> কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
> *অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
> কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
> সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
> ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায়?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ইডন্ গার্ডন্‌স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ইডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায়?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্‌, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ইডন্‌ গার্ডন্‌স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্‌, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্‌
ত্রৈলোক্য নাথো হরি॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায়?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান ; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন ; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী ; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয় :

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যান-ধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্‌স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দ-গৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ঈডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

রাখার মতো কয়েকটি শিক। সাধারণত, এই ঘরটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার। কিন্তু পুজোর কল্যাণে বা যে কারণেই হোক, এর এখনো রয়েছে এক চরিত্রগুণ যার আকর্ষণ ঠেলে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরই সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের মা বহুদিন ছিলেন— ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের বাবা মারা যান; তার পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যে পঁচিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন, এই ঘরটিতেই মা থাকতেন। আজ সেখানে থাকেন আমাদের যে ভাই নিজের সংসার করলেন না অথচ ভাইবোন সকলের সংসারের দেখাশুনা বুক দিয়ে করে চলেছেন; বিরাট বিক্ষিপ্ত পরিবারের প্রতিটি শিশু যার প্রাণ; স্বার্থচিন্তামুক্ত, অদ্ভুত, অব্যক্ত শক্তির যে অধিকারী; আমি এ কটা দুর্বল পঙ্‌ক্তি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি জানলে যে রুষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠাকুরমার প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল এই যে আমি নাকি ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ আবৃত্তি করতে পারতাম। আর কোনো আয়াস না করে আমরা ভাই-বোনেরা তো সংস্কৃত শ্লোক শিখে ফেলেছিলাম শুনে শুনে, যার কয়েকটা এখনো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। কার কাছে শিখেছিলাম জানি না, কিন্তু কখনো ঘটা করে সূর্যপ্রণাম করতে কেউ না বললেও জানতাম কেমন করে বলতে হয়:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দাদু রোজ স্নান করে উঠে ব্রহ্মোপাসনা করতেন, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকতেন, পাশে থাকত উপনিষদের অনেকগুলো খণ্ড, সেগুলো থেকে একটু পড়ে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। খেতে বসে মুখে খাবার তোলার আগে ভগবানের নাম করতেন— কিছুটা বড়ো হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ, আর জবাব পেয়েছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপাতেই যখন মানুষের বেঁচে থাকার রসদ মিলছে, জীবনে অন্যান্য সর্ববস্তুরই মতো, তখন সেই পরমকারুণিক জগৎস্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বই-কি। একটু ওপরচালাকির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আরো বড়ো হয়ে, দেশে যখন রাজনীতির ঝড় বইছে, গান্ধী যখন দরিদ্রনারায়ণের কথা বলছেন, গরিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চিহ্ন ধারণ করার জন্য নেংটি পরছেন, হয়তো

তখন আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'কত লোক তো খেতে পায় না, একেবারে নিঃস্ব, দুঃখী, বঞ্চিত জীবন যাপন করে, তা হলে ভগবানের করুণা গেল কোথায় ?' দাদু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বকতেন না কখনো, বলতেন 'বড়ো হয়ে বুঝবে সব-কিছু। ঈশ্বরের লীলা কি সাধারণ মানুষ আমরা ধরতে পারি ?' বড়ো হওয়ার পর ব্যাপারটা দাদুর মতো করে বুঝি নি— কিন্তু যাক্, অনেকটা পরের কালের প্রসঙ্গ এখানে টেনে ফেলেছি, আপাতত ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

সচরাচর তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দু বাড়ির ধর্মবিশ্বাস আর ধ্যানধারণা মায়েরও ছিল, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কোনো কঠোরতা, কোনো বিশেষ অনমনীয়তা তাঁর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবং বাড়ির অন্যান্য সবাইয়ের দেখাশোনার মধ্যেই যেন ছিল তাঁর তপস্যা ; নিজের বিশ্বাস, ভক্তি, আচরণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু। বাবারও সময় থাকত না, হয়তো কখনো ইচ্ছাও হত না ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে— কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী সুধী ছিলেন অনেকে, সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে দেখেছি মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কে, আর অবিস্মরণীয়, বেদ উচ্চারণ শুনেছি তখনকার সুবিদিত বেদজ্ঞ হরিদেব শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তির মুখে। কদাচিৎ সময় পেলে রবিবারের দুপুরে আমাদের নিয়ে ইডন্ গার্ডন্স-এ বাবা ক্রিকেট দেখতে গেছেন, আবার ধর্মীয় কারণে না হোক্, অন্তত শব্দগৌরব ও ও ধ্বনিমাধুর্যের মোহে ভরা শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি, প্রমাণপটবঃ
কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥
*অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলম্
ত্রৈলোক্য নাথো হরি ॥

এমনি ভাবে, প্রায় নিজের অগোচরে মনের সঞ্চয়ে ঢুকে যায় অনেক আপ্ত বাক্য আর স্মরণীয় কাহিনী। এখনো হঠাৎ 'প্রভুমীশমনীশমশেষগুণম্' বলে আরম্ভ হয়েছে যে শিবাষ্টক, তা মনকে কেমন যেন নাড়া দেয়, ভাবতে মজা লাগে যে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের বিস্তৃত চত্বরে একটু জায়গা খুঁজে নিয়ে যদি বলতে থাকি :

শশীলাঞ্ছিতরঞ্জিতসম্মুকুটম্ কটিলম্বিতসুন্দরকৃত্তিপটম্
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটম্ প্রণমামি শিবম্ শিবকল্পতরুম্।

তা হলে চার দিকে কিছু লোক জোটাতে বোধ হয় পারি, হয়তো বা গ্রাসাচ্ছাদনের স্বল্প সম্বলও সেভাবে সংগ্রহ করতে পারি!

* * *

কারো যদি ধারণা হয় আশঙ্কা করে বলব যে আমরা ছেলেবেলায় যে-আবহাওয়াতে মানুষ হয়েছিলাম তাকে ধর্মীয় বলা ভুল হবে। ভগবানে ভক্তি বা দেবদেবীতে বিশ্বাস আমাদের হচ্ছে কি না হচ্ছে, তা নিয়ে অভিভাবকদের কোনো আগ্রহ বা দুশ্চিন্তার পরিচয় কখনো পাই নি। মনে আছে এক-একদিন সন্ধ্যায় হয়তো আমরা যারা ছোটো তাদের বলা হয়েছে ; 'তোরা চুপ করে বোস্, ভগবানের নাম কর্'— আর আমরা কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকেছি— কী ভেবেছি, তা আজ ঠাওর করতে পারছি না, কিন্তু একটু বাদেই, রাতের খাবার তৈরি হবার আগেই মা হয়তো গরম গরম পটল ভাজা (যার পুরুষ্টু চেহারা আজকের দিনে নিমন্ত্রণ বাড়িতেও বিরল!) কিম্বা একটু আলুর দম বা (সময়কালে) কড়াইশুঁটির কচুরি খেতে দেবে ভেবে মনটা বিরস হত না। আর ধর্মবিশ্বাস মনে কতটা ঢুকত জানি না, চিত্ত-বৃত্তির অনেকগুলো দরজা অন্তত খুলে যেত ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন স্বপ্ন আর কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একবার মাসব্যাপী দৈনিক কথকতার মধ্য দিয়ে এই পরিচয় ঘটেছিল মনোহর কাব্য-রসসিঞ্চিত পদ্ধতিতে। যিনি কথক ছিলেন তাঁর নাম ভুলে গেছি কিন্তু প্রতি রাত্রে কয়েকঘণ্টা ধরে বহু নরনারী এবং শিশুকে পর্যন্ত যে তিনি মুগ্ধ করতেন, তা বেশ মনে আছে। আরো মনে আছে যে, পরে তিনি একবার এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে, যখন তাঁর স্বর ভগ্ন, কণ্ঠ অক্ষম, স্বাস্থ্য নষ্ট— হয়তো বা দেখে মনে প্রশ্ন উঠেছিল যে পুণ্যকাহিনী বহুজনের মধ্যে

বণ্টন করেছিলেন যে পুণ্যাত্মা তাঁর এ শাস্তি কেন, যদি ঈশ্বরের ন্যায়রাজ্য বলে কোনো বস্তু থাকে ? জোর করে অবশ্য বলতে পারি না এ কথা, কিন্তু মনের নিভৃতে এ-ধরনের একটা চাঞ্চল্য ঘটেও থাকতে পারে তখন।

কথকতা বোধ হয় আজকাল উঠে গেছে একেবারে— শহরে এখনো যাত্রা নিয়ে উৎসাহের অভাব নেই, তবে যাত্রার চেহারা আর প্রকৃতি নিদারুণ বদলেছে, কিন্তু কথকতার উল্লেখ শুনিই না সম্প্রতিকালে, অনেক পুরোনো ধারার পুনরুজ্জীবনের প্রসঙ্গ ও প্রয়াস হতে থাকলেও কথকতা নিয়ে মাথাব্যথা বিশেষ কারো নেই। বাংলার বাইরে হরিকথা ইত্যাদি ব্যাপার বোধ হয় এখনো বেশ চালু। কিন্তু আমাদের সেই সাবেকী জলচৌকির ওপর বসে কথকঠাকুরের সুললিত ব্যাখ্যান আর মাঝে মাঝে গান আর যেন কোথাও শোনা যায় না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমরা যখন কিছুটা বড়ো হয়েছি তখন হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক কথকের কথা। কলেজ স্কোয়্যারের ধারে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির (যার নীচে একযুগ ছিল প্রসিদ্ধ বুক কোম্পানি এবং এখন আছে মনীষা গ্রন্থালয়) হলে-ও তিনি কথকতা শুনিয়েছেন। তাঁর কথা মনে পড়ছে এইজন্য যে তিনি ছিলেন (তখনকার দিনে) অল্পবয়সী, সুদর্শন, এবং একটু অভিনব পদ্ধতি অনুযায়ী কথক। এখনো ভুলি নি তিনি ব্যাখ্যানের গৌরচন্দ্রিকা করতেন গেয়ে উঠে :

অযুত ঋষির পদরজঃ পূত, পুরাণ প্রচারে ধন্য
জগতে অতুল মহান্ তীর্থ, নমো নৈমিষারণ্য !

*　　*　　*

আমার আট বা নয় বৎসর বয়স যখন, তখন ঠাকুরমা মারা যান— মৃত্যুর সঙ্গে সেই হল প্রথম পরিচয়। কিন্তু সে পরিচয় ছিল অস্পষ্ট। মনে আছে তিনি শুয়েছিলেন যাকে বলা হত (এবং এখনো হয়) পড়বার ঘরে— যেখানে বইয়ের আলমারির পাশাপাশি কাপড়চোপড়ের দেরাজ এবং আয়না ইত্যাদির সহাবস্থান, যেখানে বাড়ির কয়েকজনের রাতে শোবার জায়গা, তবে হয়তো কোনো অতীতে সেখানে পড়ার রেওয়াজও ছিল। আমাদের ছোটো বয়সে আমরা পড়তাম বড়ো একটা বারান্দায়, মাদুর পেতে রাত্রে হারিকেন লণ্ঠনের চার দিক ঘিরে, বেশ কয়েকজন ভাইবোন একত্র হয়ে

এবং সাধারণত আমাদের দাদুর তত্ত্বাবধানে। যাই হোক, ঠাকুরমা যেখানে শুয়েছিলেন সেখানে আমাদের ক'জনকে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় বুলিয়ে দেওয়া হল, কোনো কথা তিনি বললেন না, চারদিকে চাপাকান্নার একটা আবহাওয়া। তাঁর শ্মশানযাত্রার দৃশ্য মনে নেই, তবে মনের চোখে এখনো ছাপা আছে বাড়ির আষ্টেপৃষ্ঠে ম্যারাপ বেঁধে (তখন বর্ষাকাল) শ্রাদ্ধের আয়োজন, বহুজনের যাতায়াতে বাড়ি সর্বদা সরগরম, বাবার মুণ্ডিত মস্তক, শ্রাদ্ধবাসরে অভ্যাগতদের মধ্যে বিশ্রুতকীর্তি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগমন। আশুবাবুর কথা মনে থাকার একটা কারণ এই যে তৎকালীন মহারথীদের মধ্যে তাঁর নামের সঙ্গে আমাদের নিকট পরিচয় হয়েছিল, আমার বাবাকে তিনি স্নেহ করতেন, আমার পৈতে যখন হয় ১৯২০ সালে তখন দণ্ডিগৃহে এসে 'ব্রহ্মচারী'কে 'ভিক্ষা' দিয়েছিলেন।

* * *

সন-তারিখ মনে নেই, তবে আমার বয়স যখন দশেরও কম, একদিন আতঙ্কিত চিত্তে দেখেছিলাম দাদুকে হাত ধরে কজন বাড়িতে নিয়ে আসছে। তিনি বুঝি রাস্তায় গাড়ির ধাক্কায় কিম্বা মোটরগাড়ির হাওয়ার চোটে পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিলেন। বাড়িতেই চিকিৎসা হল, সেরে উঠলেন। কিন্তু তখন থেকে নিয়ম হল যে আজীবন অল্পদৃষ্টি আমাদের দাদুকে আর কখনো একলা কোথাও যেতে দেওয়া হবে না। যেখানেই যান-না-কেন, সঙ্গে কেউ-না-কেউ সর্বদা থাকবে। আমাদের ওপর তাই পালা পড়ত দাদুর সাথী হওয়ার, এবং কিছুকাল পর থেকে কাজের বরাতটা আমারই ওপর পড়েছিল সব চেয়ে বেশি। দাদু ছিলেন ছোটোখাটো মানুষ, নিজের সম্পর্কে কৌতুক করে বলতেন যে বিদ্যাসাগর মশায়ও তো ছিলেন বেঁটে। তাঁকেও তো ছাতা মাথায় আসতে দেখে লোকে বলত যে একটা ছাতা হেঁটে আসছে! আমার এই পিতামহের অসামান্যতা নিয়ে কোনো দাবি ছিল না। কিন্তু সেদিনের পরিবেশে তিনি প্রকৃতই ছিলেন বহুগুণান্বিত ব্যক্তি। সরল অথচ ঋজু চরিত্রের অধিকারী, একান্ত অহমিকাশূন্য এবং অপরের গুণগ্রাহী। সাহিত্য ব্যাপারে নিয়ত আগ্রহান্বিত, এবং পদাধিকারের চিন্তামাত্র না করে সাংবাদিকতার মোহরজ্জুতে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আবদ্ধ। 'ভিক্টোরীয়ন্' জীবনধারার ভারতীয় সংস্করণে অকিঞ্চিৎকরতার অভাব ছিল না, কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গে ছিল এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণতা যা সীমিত হলেও ছিল সৎ, এবং যাকে নিয়ে রহস্য করা সহজ হলেও উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। আমার দাদুর মতো মানুষকে ঋষিকল্প বললে তিনি নিজে প্রকৃতই কুণ্ঠিত হয়ে আন্তরিক আপত্তি করতেন, কিন্তু পক্ষপাতের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ঐ-বিশেষণ তাঁর সম্পর্কে আরোপ করতে আমি সংকুচিত নই। তাঁর স্নেহ ও সান্নিধ্যের মতো মহামূল্য সম্পদ আমার ব্যক্তিজীবনে অতি অল্পই আছে।

দাদুর তুলনায় বাবার সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলায় সংযোগ ছিল অনেক কম। এর কারণ বোধ হয় এই যে দাদুরা বাবাদের চেয়ে ঢের বেশি সময় দিতে পারে ছোটোদের দিকে— যা দেখছি নিজের ক্ষেত্রে, ছোট্ট পাঁচ বছরের দৌহিত্র কাছে এসেছে কমই, কিন্তু এলে তাকে নিয়ে জড়িয়ে থাকতে পারা গেছে এমন ভাবে যা নিজের মেয়ে আর ছেলের ছোটোবেলায় সম্ভব হয় নি। বাবা দাদুর চেয়ে রাশভারী কিছুটা ছিলেন বোধ হয়, কিন্তু এটাও জানতে আমাদের দেরি হয় নি তাঁর মন ছিল অত্যন্ত মায়াবী, নিছক বাঙালি মমতায় ভরা। তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, এবং অর্থোপার্জনে পারদর্শী হওয়ার প্রবৃত্তি ও সাধ্য না থাকলেও সাহিত্য, সদালাপ, রাজনীতি, রচনা ইত্যাদি নৈর্ব্যক্তিক আগ্রহে তাঁর জীবনকে বাঙালি মধ্যবিত্ত রিক্ততার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যৌবনে কৃতবিদ্য বলে তাঁর খ্যাতি ; অল্পকাল দেওঘর এবং কলকাতায় স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছিলেন ; মন কখনো ঠিক বসাতে না পারলেও ছোটো আদালতে এবং হাইকোর্টে বেরিয়েছেন, পসার না করলেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন ; পরবর্তীকালে রিপন (সুরেন্দ্রনাথ) আইন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন ; সর্বোপরি আজীবন সাহিত্য-চর্চা এবং সাংবাদিকতায় লিপ্ত হয়ে থেকেছেন— তাঁর স্নেহভাজন অনুজোপম বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, (যিনি 'তিন পুরুষ'-এর বন্ধুরূপে অজাতশত্রু জীবন যাপন করে আজও আমাদের আনন্দ দিচ্ছেন) লিখেছেন 'চলমান জীবন' গ্রন্থটিতে যে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রাতঃস্মরণীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন আমার বাবা, তিনিই অধিকাংশ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রভৃতি অন্যান্য বহু পত্রিকার সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বাংলার সাংবাদিক মহলে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশিষ্ট। ব্যবহারে 'সর্বতোভদ্র' বলে তাঁর খ্যাতি ছিল ; কিছুকাল কংগ্রেস দলভুক্ত হয়ে যখন কলকাতা

কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ছিলেন, তখন তাঁর অসামান্যতা স্বীকৃত ছিল; মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাই তাঁর অকালমৃত্যুর (১৯২৮) পর স্মৃতিসভায় বলেন যে শচীন্দ্রনাথ এই পৌরপ্রতিষ্ঠানে ছিলেন যেন 'বক মধ্যে হংসো যথা'! পুত্রের মুখে পিতার স্তুতি হয়তো সহজে আসে, কিন্তু একেবারে পক্ষপাত-বিবর্জিত নৈর্ব্যক্তিক বিচারের যথাসাধ্য প্রয়াসে নেমে বলতে পারি যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বাগ্মিতাভঙ্গির প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন, সেই ভঙ্গিতে ইংরেজীতে বক্তৃতাশক্তি আমার বাবার তুলনায় অতি অল্প লোকেরই দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে— যেটা আরো বড়ো কথা— বাংলায় অপূর্ব ভাষণ দেবার শক্তি তিনি রাখতেন। বড়ো হয়ে, বিলেত ঘুরে এসে, বহু প্রসিদ্ধ বক্তার ভাষণ শোনার পরও আমার মনে হয়েছে যে উনিশ শতকের ছাপ যদি একটু কম থাকত আর চিন্তা ও বাক্যের অনুপাত-বোধ একটু যদি বেশি থাকত তো আমার বাবার বক্তৃতা হত অতুলন। এখনো মাঝে মাঝে মনে পড়ে ছেলেবেলাকার এক সভার কথা— পুরোনো মলঙ্গা পাড়া পার হয়ে এখনকার বুদ্ধিস্ট টেম্পল্ স্ট্রীটে বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভায় উৎসব হচ্ছে, সভাপতি স্বয়ং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (যাঁর বহু উপাধির মধ্যে প্রায়-মহার্ঘতম ছিল 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী'), আর বাবা বক্তৃতা করছেন বুদ্ধচরিত সম্বন্ধে, উদ্‌ধৃত করছেন রবীন্দ্র-রচনা থেকে :

ব্যাকুল সুদাস কহে, প্রভু, আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা!

স্পষ্টোচ্চারিত ব্যঞ্জনাময় সেই কণ্ঠধ্বনি আজও কানে বাজে, বোঝাতে সাহায্য করে কেন শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, শব্দের শুধু যে মাধুর্য ও মহিমা আছে তা নয়, শব্দই যেন সৃষ্টির মূল শক্তি!

৫

যখন আমি মাতৃগর্ভে; তখন বুঝি আমার মার চোখ 'উঠেছিল' আর বোধ হয় সেজন্যই জন্ম থেকে আমি ক্ষীণদৃষ্টি— যা আমার অন্য কোনো ভাই-বোনের ক্ষেত্রে ঘটে নি। বেশ মনে আছে, যখন প্রায় বারো বৎসর বয়সে প্রথম চশমা পরি— তখনকার দিনে নেহাৎ ছোটোবেলাতেই চশমা ধরানোর রেওয়াজ ছিল না— গাছের পাতার গায়ে এবং ফাঁকে ফাঁকে যে কত কী দর্শনীয় আছে তার অজানা হদিস পেয়ে চম্‌কে উঠেছিলাম। যাই হোক্ সম্ভবত ক্ষীণদৃষ্টি বলেই খেলাধুলা সম্বন্ধে কেমন একটা আবেগ (যা আজও আছে) থাকলেও নৈপুণ্য গজায় নি— ছাদের ওপর থেকে ঘুড়ি ওড়ানোর মতো ব্যাপারেও আমার ভূমিকা থাকত গৌণ; মিস্ত্রী ছিলাম না, ছিলাম মাত্র মজুর। এদিক-ওদিক ছুটে জোগান দেওয়ার বেশি কিছুতে হাত দিতে পারতাম না। একবার কেটে-আসা একটা ঘুড়ি আমরা ধরার পর কারা যেন ছাদ লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে থাকে আর তার একটা এসে আমার ঠোঁটের ওপরে লাগে এবং একটু কেটে যায়। ছাদে আমাদের নেতা সেজদা-র (অবশ্য পিস্‌তুতো ভাই) পরামর্শে নীচে এসে বলা হল যে কলতলায় জল খেতে গিয়ে কলে মুখ ঠুকে গিয়ে আমার ঠোঁট কেটে গেছে। অভিভাবকদের কাছে অবশ্য এই ঠুন্‌কো অছিলা ধরা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক্ সামান্য ঐ কাটার দাগ আজও আমার রয়েছে। বিদেশযাত্রার দলিল পাস-পোর্টে সেই চিহ্নই বাহ্যত আমার পরিচায়ক বলে আজও বর্ণিত।

পরিত্যক্ত টেনিস বল কিম্বা নেকড়ার গোলা নিয়ে বাড়ির গলিতে (কিম্বা ছাদেও) ফুটবল খেলা মাঝে মাঝে চলত— এমনও ঘটেছে যে ছাদে খেলার চাপে নীচের ঘরে খানিকটা চুন-সুরকি খসে পড়েছে, বকুনি খেয়ে খেলা বন্ধ করতে হয়েছে। সে-খেলাতে আমি ছিলাম গৌণ— আমার ওপরে যে দাদা পরে কলকাতায় চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন, তিনি খেলাধুলায় চৌকস ছিলেন, আমার ছোটো এক ভাই, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্রিকেট ক্যাপটেন হয়েছিল, আর-এক ছোটো ভাইকে নাম

দেওয়া হয়েছিল 'রবি গাঙ্গুলি', সে-যুগের মোহনবাগানের এক প্রোজ্জ্বল ফরোয়ার্ড-এর নামে। বেশি না হলেও স্কুলে পড়ার সময় মাঝে মাঝে ছোটো দল বেঁধে একটা চার নম্বর ফুটবল জোগাড় করে ময়দানে যারা গেছে তাদের সঙ্গে থেকেছি— কিন্তু সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না, ভালো খেলা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হয় নি। বাড়ির মধ্যেও আমার ছেলেবেলায় যখন পিসতুতো দাদাদের নেতৃত্বে কালীপুজোর আগে সোরা, গন্ধক, কাঠ কয়লা ইত্যাদি মশলা দিয়ে তুব্‌ড়ি বানানো হত, তখনো আমি তুচ্ছ এক জোগানদার বই কিছু থাকতাম না। খুব একটা দৌড়ঝাঁপ-করনেওয়ালা পরিবার আমরা নই, কিন্তু তারই মধ্যে, হয়তো চোখে কম দেখতাম বলেই, খেলাধুলা সম্বন্ধে প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করা সত্ত্বেও আমার অপটুত্ব অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি।

হয়তো এ কথাকেই একটু ফাঁপিয়ে, অথচ সত্যকে বিকৃত না করে বলা যায় যে জীবনের বহুবিধ ব্যঞ্জনা অদ্যাবধি আমাকে অল্পাধিক নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করেও তার মধ্যে বাস্তব নিমজ্জনের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত রেখেছে। হয়তো এজন্যই জীবন-ব্যাপারে আমার মধ্যে আছে একাধারে প্রলোভন এবং পলায়ন প্রবৃত্তি— কর্ম বিষয়ে পরিপূর্ণ কদরের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব ও কল্পনার ছায়ায় স্বস্তি অন্বেষণের ঝোঁক। ছেলেবেলায় যে-খেলায় আমার ভূমিকা ছিল কতকটা মুখ্য, তা হল ছুটির দুপুরে দাদু, মা, বাবা-কে ডেকে কতকগুলো আবৃত্তি কয়েকজন মিলে শোনানো— তার মধ্যে থাকত কিছু সংস্কৃত শ্লোক (যা গুরুজন বাছাই করে দিতেন) আর আমাদের তৎকালীন অপরূপ এক আবিষ্কার, মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ থেকে মুখস্থ করা কবিতা। হয়তো "বঙ্গবীর" ('মোক্ষমুলর বলেছে 'আর্য',/সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য...') কিম্বা 'নব বৎসরে করিলাম পণ—/লব স্বদেশের দীক্ষা' জাতীয় কবিতা, আর 'কথা ও কাহিনী'-র মনোহর সম্ভার থেকে নেওয়া অনেক কিছু। এ-অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হত 'প্রাইজ', এবং বাস্তবিকই আশুতোষ লাইব্রেরির তালিকা থেকে কিম্বা (যতদূর মনে পড়ে) শিশির পাবলিশিং হাউসের উদ্যোগে প্রকাশিত শিশুসাহিত্য প্রভৃতি থেকে বাছাই-করা কিছু বই, যেমন "বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে" আমরা তখন পেতাম।

মনের ভিতরে অব্যক্ত অস্থিরতা বোধ হয় এভাবে ছেলেবেলা থেকেই

আমার জমে উঠে চলেছে, অথচ বাইরেটা দেখাত শান্ত। বলতে সংকোচ আসছে কিন্তু আজও কিছু পরিমাণে এটাই আমার চেহারা— মনে পড়ছে অস্ট্রেলিয়ায় খানার টেবিলে বিদেশী পার্শ্ববর্তীর মন্তব্য : 'মাপ করবেন, কিন্তু কথাবার্তায় এত শিষ্ট, শান্ত আপনি। অথচ বক্তৃতার সময় যেন অন্য মানুষ, কথায় তখন আগুনের ফুল্‌কি!' কেমন করে বোঝাই (আর নিজেও তো ঠিক বুঝি না) যে আমার মতো লোকের বক্তৃতা তখনই উৎরোয়, যখন দেহের এ-খোলসটা ছেড়ে কতকগুলো প্রত্যয় বাক্যের পরিচ্ছদে বহুজনসমক্ষে প্রকাশিত হতে থাকে! যাই হোক্, ছেলেবেলা থেকেই নিজেকে কতকটা নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখার অভ্যাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। এজন্যই বোধ হয় আমাকে একাধিকবার 'নিত্‌বর' করে পাঠানো হয়েছে, অনেকক্ষণ চুপ করে বিবাহসভায় বরাসনের কাছে বসে থাকতে পারব বলে। এজন্যই বুঝি দিদির সঙ্গে গেছি উত্তর কলকাতায় তার শ্বশুরবাড়িতে, বিয়ের পরদিন— এটা বেশ মনে আছে, কারণ সারাদিন অপরিচিত পরিবেশে থাকার পর সন্ধ্যায় ধৈর্যচ্যুতি হয়েছিল ; দিদির মেজাজ কেমন ছিল জানি না, আমার চোখে জল এসেছিল, সময় গুনছিলাম কখন বাড়ি থেকে কেউ এসে নিয়ে যাবে। ছেলেবয়সে একবার বানরের আঁচড়, আর-একবার সাইক্‌লের ধাক্কা খেয়েছিলাম— হয়তো বলা উচিত সাইক্‌ল-আরোহীই ধাক্কা খেয়েছিল, কারণ আমার বিশেষ লাগে নি অথচ সাইক্‌লটা ছিট্‌কে পড়েছিল! তখন শুনেছিলাম ঠাট্টার সুরে কারো কারো কাছে— মুশকিল হত গোরুর গাড়ি চাপা পড়লে, কারণ আইন নাকি বলে যে গোরুর গাড়ি চাপা যে পড়ে তারই জরিমানা হওয়া উচিত!

* * *

আমার বয়স যখন বছর দশেক, বোধ হয় তখন বাড়িতে একটা সোরগোল পড়ে যায়। কারণ আমাদের 'মেজদা' পালিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে চলে গিয়েছিলেন। ইনি স্কুলে ডানপিটে ছেলে ছিলেন ; তখনকার ক্যালকাটা হাই স্কুল, যার হেডমাস্টার হিসাবে আমার বাবা কিছুকাল ছিলেন এবং শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালে প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক মোহিত-লাল মজুমদার এবং আমাদের কাছে আরো স্মরণীয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যে "মাস্টার মশাই" সম্বন্ধে অনেক কথা পরে আমাকে বলতে হবে),

সেখানকার শাসন শৃঙ্খলা এই বুদ্ধিমান্ চট্‌পটে অথচ লেখাপড়ায় একান্ত অনীহাগ্রস্ত ছাত্রকে সায়েস্তা করতে পারে নি। আমাদের এই মেজদাকে নিয়ে বড়ো একটা উপন্যাস ফাঁদা শক্ত নয়, কিন্তু সে-কাজে হাত দেওয়ার সামর্থ্য বা মতলব আমার নেই। মেজদার ঠাকুরদা সম্বন্ধে গল্প শুনতাম, তিনি বেলঘরিয়া থেকে অফিসে রোজ যাতায়াত করতেন এবং সাহেবসুবোকে খুশি করার জন্য আর বন্ধুমহলে দর বাড়াবার জন্য বাজার থেকে ভালো 'অ্যাল্‌ফন্‌সো' আম কিনে অম্লানবদনে নিজের বাগানের ফল বলে চালিয়ে দিতেন! যখন হ্যাট-কোট-টাই পরার রেওয়াজ ছিল না বিশেষ, তখনই মেজদাকে দেখেছি সাহেব সেজে অফিস যেতে। শুনতাম অফিসের সাহেব প্রায় তাঁর পকেটে। অনেক হেরফেরের মধ্যে তাঁর জীবন কেটেছিল। কিন্তু অল্পবয়সে মাতৃপিতৃহীন এই মানুষটির চরিত্রে বহু বৈপরীত্য মিলে একটা অদ্ভুত আকর্ষণীয়তা ছিল— আমার মায়ের তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন, যদিও মাকে বহুবার তাঁর জন্য দুঃখ পেতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমাদের কাছে তিনি এবং আমাদের পিস্‌তুতো আর দুই দাদা, 'বড়ো' এবং 'মেজো', আজীবন অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছিলেন। যাই হোক্, মেজদাকে বোম্বাই থেকে ফিরিয়ে আনা হল— বাবাকে অনেক তদ্‌বির বোধ হয় করতে হয়েছিল, অবশ্য বয়সও তখন তাঁর অল্প, নাবালকত্ব সম্ভবত কাটে নি। এই তদ্‌বির ব্যপদেশে মনে আছে দাদুর সঙ্গে আমি একবার গিয়েছিলাম শিয়ালদহ নর্থ স্টেশনের গায়ে-লাগা এক বিরাট লম্বা বাড়ি, যা আজও অপরিবর্তিত আছে এবং যেখানে সম্ভবত যুদ্ধসংক্রান্ত কোনো অফিস ছিল। বাড়িটা মনে আছে কারণ তার বারান্দা যেন হেঁটে ফুরানো শক্ত মনে হয়েছিল আর দাদু বলেছিলেন, 'দেখ্ তো, এখানে এক পঙ্‌ক্তিতে কিরকম ব্রাহ্মণ ভোজন করানো যেতে পারে'!

বাইরে বিক্ষুব্ধ দুনিয়ার দুঃসাহসী সোরগোলের খবর বাড়িতে কিছু তোলপাড়ের সৃষ্টি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় করত নিশ্চয়, কিন্তু তার খুব বেশি আভাস মনের ছবিতে নেই— এটুকু মনে আছে যে জার্মানির জিত হোক এটা চাইত প্রায় সবাই, যদিও ইংরেজের পক্ষপাতী যে কেউ ছিল না তাও নয়। আর মনে পড়ে তখনকার দিনের প্রকাণ্ড সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো— 'বঙ্গবাসী' দেখেছি কম, যদিও মনে আছে দাদুর সঙ্গে গেছি কলেজ স্ট্রীট - হ্যারিসনরোড

মোড়ের কাছাকাছি ভবানী দত্ত লেনে বিরাট কাঠের সিঁড়ি বেয়ে "বঙ্গবাসী" অফিসে। 'হিতবাদী'ও খুব বেশি মনে নেই। তবে মনে আছে দাদু একবার নিয়ে গিয়েছিলেন কলুটোলা স্ট্রীটে তার অফিসে আর বলেছিলেন যে এককালে 'রবি ঠাকুর'ও বুঝি ঐ-কাগজে লিখতেন। 'সঞ্জীবনী'-র কথা একটু বেশি মনে আছে, কারণ তার সম্পাদকীয় স্তম্ভের মাথায় লেখা থাকত ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র; 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'। 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রকে বহুবার দেখেছি— সৌম্য, ঋষিপ্রতিম মূর্তি, স্বদেশীযুগের উগ্রপন্থী বলে খ্যাত হলেও তখন তিনি ধীর, স্থির, সংযত রাজনীতির সমর্থক। আমার দাদুর মৃত্যুর পর শোকসভায় তিনি ছিলেন সভাপতি। তাঁর জামাতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। তাঁকেও কয়েকবার আমাদের বাড়িতে এবং সভাসমিতিতে দেখেছি। প্রকৃত বাগ্মিতা শক্তি তাঁর ছিল। তৎকালীন সাপ্তাহিকের মধ্যে বেশি দেখেছি 'বসুমতী', যা ছাপাখানা থেকে টাটকা বেরিয়ে আসছে দেখেছি। তখনকার পক্ষে দারুণ তার বিক্রয়— পরে যখন 'দৈনিক বসুমতী' প্রতি সন্ধ্যায় (আরো পরে প্রতি সকালে) প্রকাশিত হল, তখনো তার তুলনায় মফঃস্বলে প্রচার সাপ্তাহিকের ছিল অনেক বেশি। এই চার বাংলা সাপ্তাহিক লম্বায় ও প্রস্থে এত বড়ো ছিল যে প্রায় মেঝেতে পেতে তার ওপর শুয়ে, তবে বেশ আরাম করে পড়া যেত— জানি না আর কোথাও এমন লম্বা-চৌড়া কাগজ প্রকাশিত হত কি না।

চেতনার জানলা খুলে গিয়ে বাইরের মুক্ত হাওয়া যখন বইতে শুরু করল, তখন এ দেশে গান্ধীযুগ আরম্ভ হয়েছে। আর সেজন্যই আজও গান্ধীজী সম্বন্ধে একধরনের মায়া ছাড়তে পারি নি আর কোনো কোনো মহল থেকে খোঁটা খেয়ে চলেছি। তার আগে মোটামুটি ছেলেবেলায় ছিল অল্পে সন্তুষ্ট, মোহময়, অ-জটিল, দংশনমুক্ত কালাতিপাত। বাড়িতে রোজ আসত বৈষ্ণব ভিখারী। খোলকরতাল খঞ্জনী বাজিয়ে গান শোনাত, পুজোর আগে গাইত আগমনী— —"গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী" কিম্বা "এবার আমার উমা এলে আর তারে ফিরাব না"। গলিতে ভিক্ষা করতে আসত বিচিত্র সাজে বহুরূপী (যাকে দেখে হত ভয়মিশ্রিত আনন্দ, তাই জানলার ঝিলমিলির ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখার সাহস হত না)। আসত মুসলমান ফকির, গাইত "মুসকিল আসান করে পীর গোরাচাঁদ"। বাসন

বেচতে, আলতা পরাতে আসত বাঙালি আর হিন্দুস্থানী মেয়েরা। শীতের সময় চিঁড়ে মুড়ি মুড়কির মোয়া আর পাটালিগুড়, (যার মধ্যে থাকত ফরিদ-পুরের সাদাটে রঙের পাটালি) আর কত কী সওদা নিয়ে অনেকে। হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে বহুকাল আগে এক ক্লান্ত অপরাহ্ণে পাশের বাড়ির দরজার ধারে ভিখারী গাইছে খুদিরামের গান—'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের দরাজ গলাতে পরে ঐ-গান শুনেছি। কিন্তু কোথাকার অজানা, অশিক্ষিত-পটুত্বসম্পন্ন সেই ভিক্ষুকের গলারই জিত হয়েছে আমার কানে! তখনকার অচঞ্চল দিনযাপনের তারে এক বহ্নিমান জীবনান্তের সহজ করুণ সুর অদ্ভুত ঋজু স্বাভাবিকতায় বেজে উঠে মনকে আবিষ্ট করেছিল।

* * *

আমাদের পাড়ায় চালের অনেক আড়তদার থাকায় তাদের বারোয়ারী উৎসব বেশ জাঁকজমক নিয়ে হত প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার মাসখানেক আগে। এজন্য আমরা উৎসুক হয়ে থাকতাম কারণ আমাদের প্রতিবেশী ধনীগৃহে পুজোর দালানের সামনে প্রকাণ্ড উঠোনের উপর ম্যারাপ বেঁধে যাত্রার আসর বসত। আমরা বাড়ির দোতালাবারান্দায় বসে যাত্রা শুনতে এবং দেখতে পেতাম, এবং যদিও সারারাত জেগে পালা শেষ পর্যন্ত থাকার অনুমতি কখনো পাই নি, বেশ খানিকটা উপভোগ যে আমাদের মিলত তাতে সন্দেহ নেই। মনে পড়ে কখন 'জগঝম্প' বেজে উঠবে যাত্রা আরম্ভের সংকেত হিসাবে, সেদিকে কান পেতে থাকতাম এবং একটু ইঙ্গিত পেলেই ছুটে পৌঁছানো যেত। যাত্রার সাজঘরে উঁকি মারলে কেউ বাধা দিত না, যদিও যাত্রাদলের কারো সঙ্গে কথা বলতে যাওয়া যে অশালীন, এ কথাটা আমাদের কি জানি কেন, জানা হয়ে গিয়েছিল। যাত্রার দলের মধ্যে তখন মথুর সাহার দল খুব নামজাদা; জানি না আজ সে দল আছে কিনা। সাধারণত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ছিল তখনকার যাত্রার পালা— ভীষণ ভালো লাগত যাত্রায় তলোয়ার খাপ থেকে বার করে লড়াই আর তার ঝন্-ঝন্ শব্দ, কিম্বা হঠাৎ উদ্ভট আওয়াজ করে লেজওয়ালা হনুমানের আবির্ভাব। অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে একেবারে তখনকার আদালতে উকিলদের পোষাক পরে গান ধরত 'জুড়ি'-রা— দু'জন একসঙ্গে গাইত বলেই কি এই নামকরণ?

অধৈর্য লাগত কারণ প্রথমত গান কিছুটা ওস্তাদী ধরনের যা ছোটোবেলায় ভালো মনে হওয়া সম্ভব নয়, আর দ্বিতীয়ত, মনে হত কানে হাত দিয়ে চীৎকার করে যারা গেয়ে চলেছে তারা অভিনয়ে একটা বাধাস্বরূপ ! অনেক পরে, বড়ো হয়ে, আমার দিদির শ্বশুর পরিবারের নিজ-গৃহ নাটাগড়ে দুর্গাপূজা কিম্বা গ্রীষ্মকালে জয়কালীপূজা উপলক্ষে যাত্রা শুনেছি— যাত্রার দলের বাছাই-করা গাইয়ে দিনের বেলায় জমিদার বাড়ির হলঘরে হার্মোনিয়ম আর ডুগি তবলা বাজিয়ে গান করেছেন। উপস্থিত সমঝদারেরা যথারীতি অঙ্গসঞ্চালন করেছেন, বাহবা দিয়েছেন। আর কেউ কেউ টিপ্পনী কেটেছেন যে 'আজকালকার গান— যা রবিঠাকুর লিখে থাকেন— তার মধ্যে আছে কী ? ও হল "জল পড়ে পাতা নড়ে" ছাড়া আর কিছু নয়।' বেশ মনে আছে, শুনে রাগ হয়েছিল, কারণ তখন রবীন্দ্র-রচনা বিষয়ে আমাদের প্রচণ্ড অহংকার— কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবি, যাত্রার গানে বস্তু বা মাধুর্য না থাকলেও সুর, লয়, তান সম্বন্ধে একটা দায়িত্ববোধ হয়তো ছিল যাকে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না— মনে পড়ছে অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে যাত্রায় বেহালা বাজাবার যে রেওয়াজ ছিল, তার মূল্য তো কম নয়। কিছু কিছু সেই বেহালার টানের মূর্ছনা তো অপটু কানেও আজ বাজছে, মনে করিয়ে দিচ্ছে এ দেশে সংগীত তো সাধনা—'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা'।

সার্বজনীন দুর্গাপূজার (এবং পরে অন্যান্য পূজা) রেওয়াজ আরম্ভ হয় ১৯২৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর থেকে— হিন্দুসংহতির আকারেই এর উদ্ভব। তখন আমরা বড়ো, কলেজে পড়ি, ছেলেবয়েসের মন তখন আর নেই। ভাবতে ভালো লাগে আগেকার কথা— আমাদের পাশের বাড়িতেই তো পূজা, পক্ষকাল ধরে সোরগোল, কাঁসর ঘণ্টা 'ঘড়ি' বাজানোর ঘটা, তখনকার দিনের পক্ষে প্রচণ্ড ধুমধাম। পুজোর বাজার প্রধানত করতেন দাদু, আর টুকিটাকি সব-কিছু কেনা হয়ে যাওয়ার পর মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বাবা নিজে নিয়ে যেতেন চিৎপুর রোডে সেন কোম্পানির দোকানে— যার স্বত্বাধিকারীরা ছিলেন তাঁর বন্ধু এবং যেখানে বিশেষ বাছাই-করা জামা আমরা পেতাম। মনে আছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ট্রাম চড়ে কালীতলার কাছে নামা, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট বেয়ে চিৎপুরে পৌঁছালেই আমাদের লক্ষ্যস্থল। যেতে যেতে শোনা গেল কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ, বাবা একবার একটা

লাইন আউড়ে বললেন, তোমরা কেউ আর এক লাইন মিলিয়ে দাও— একবার তখনই দিয়েছিলাম, আর মনে হয়েছিল যে ছন্দোবদ্ধ রচনা এত সহজ যে তা নিয়ে লেগে থাকা মজুরী পোষায় না (মনের কোণে এটা আজও জমে রয়েছে, যদিও প্রকৃত কবিতার কথা অবশ্যই ভাবছি না— যাঁরা তা লিখছেন তাঁরা তো নমস্য !) পুজোর কথা ভাবলে মনে পড়ে তখনকার আরতির কথা, সেখানে ছুটে যাওয়া এবং শেষ হলে ভূমিষ্ঠ হয়ে দেবীকে প্রণাম (যা সেই স্মরণাতীত কালে স্বাভাবিকভাবে করা যেত, ভক্তিরসের বিন্দুমাত্র সিঞ্চন বিনাই !)। একবার মাত্র বলি দেখেছিলাম— যে পাঁঠাকে আমাদেরই বাড়ির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বেশ ক'দিন বেঁধে রাখা হত, ঘাস খাইয়ে মোটা করা হত, তাকে বলি দেওয়া হল। অসহ্য লেগেছিল, পালিয়ে আসি, আর কখনো কোথাও বলি দেখি নি। ভক্তিমান্ পরিবার আমরা ছিলাম না— নইলে কালীঘাটেও বিশেষ যাই নি, বলি দেখি নি, কালীমূর্তি সেখানে দেখেছি কিনা মনে নেই, একেবারে আব্ছা মনে আছে কালীঘাটে একবার যেন মা-ঠাকুরমার সঙ্গে গিয়েছিলাম, পাণ্ডার মেটে ঘরের ঠাণ্ডা ছোঁওয়া ছাড়া আর-কিছু স্মরণে আসে না। দুর্গাপূজার সময় অবশ্য ঠাকুর দেখে বেড়িয়েছি কিছুটা —তবে চৌহদ্দী আমাদের বাঁধা ছিল, জানবাজারে 'মাড়ে'দের বাড়ি কয়েকটা বড়ো বড়ো ঠাকুর আর ওদিকে বৌবাজারে গণেশচন্দ্র, শ্রীনাথ দাস প্রভৃতির বাড়ি, এই হল আমাদের তখনকার দৌড়ের সীমানা। পুজো অবশ্য মনকে নাড়া দিত, এখনো কিছুটা দেয়— কলেজে পড়ার সময়ও রবীন্দ্রনাথের 'কাঙালিনী মেয়ে' কবিতার মায়ায় মজার মতো আবেগপ্রবণতা ছিল। ১৯৩০ সালে বিলাতযাত্রী জাহাজ থেকে বর্তমানে খ্যাতিমান্ সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুবকে লিখতে আটকায় নি 'বিজয়ার মধুর উৎসব' বিষয়ে, যদিও সেদিনের বন্ধু আইয়ুব তখনই ছিল বৈদগ্ধ্যে মার্জিত। হিন্দুর অনুষ্ঠানের মধ্যে পূজা-অর্চনার ভাগ কখনো আমাকে অভিভূত করে নি— অবশ্য অভিভূত হয়েছি অগ্নিসাক্ষী রেখে মন্ত্র উচ্চারণের একান্ত মহিমায়, অথবা তীর্থস্থানে বহুজনের সম্মিলিত আপ্লুতি দেখে (কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রবেশ করি নি, দর্শনযোগ্য কিছু আছে শুনি নি বলে, অথচ দশাশ্বমেধ ঘাট বা বিশ্বনাথের গলি আমায় মুগ্ধ করেছে)। এ হল অবশ্য কিঞ্চিৎ বয়ঃপরিণতির পরবর্তী ঘটনা, কিন্তু একটা ব্যাপার ছেলেবেলায় মনকে কেমন অদ্ভুত নাড়া দিত এবং আজও দেয়— আকাশপ্রদীপ

দেখে আমি আজীবন উতলা হয়েছি, আজও হঠাৎ তুচ্ছ এক গৃহশিখরে আকাশ-প্রদীপ জ্বলছে দেখতে পেলে অদ্ভুত এক আনন্দের অবধি আমার থাকে না।

* * *

বৈদ্যনাথ মন্দিরে মস্তকমুণ্ডনের পর আবার ছেলেবেলায় দেওঘরে গিয়েছি, যার স্মৃতি একটু উল্লেখ না করে পারছি না। বোধ হয় মাসখানেক সেবার ছিলাম, 'উইলিয়ামস্ টাউন'-এ 'রৈবতক' নামে বাড়ির একাংশে— অপরাংশে থাকতেন বাড়ির মালিকরা, যতদূর মনে পড়ে তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্ম এবং উপাধি ছিল ঘোষ। বেশ বড়ো হয়ে আবার দেওঘর গিয়ে উইলিয়াম্স্ টাউনকে চিনতেই পারি নি, তার আগেকার খোলামেলা চেহারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, বিরাট ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে সাপের মতো এঁকে-বেঁকে-চলা 'জম্‌নাজোড়' নদীকে যেন বাড়ির ভিড় কাটিয়ে খুঁজে বার করতে হচ্ছিল, আর বেজায় কষ্ট হয়েছিল 'জলসায়র'-এর চেহারা দেখে— যে চমৎকার দিঘির ধার দিয়ে চলতে চোখ জুড়িয়ে যেত, মন ভরে উঠত ছেলেবেলায়, তার দিকে আর যেন তাকাতে পারা যাচ্ছিল না। হয়তো আমারই মনের ভুল, কিন্তু বাজারের পাশে যে বাঙালী মিষ্টান্নের দোকান আগে কেমন এক ঘরোয়া শোভায় ভরা ছিল সেখানে মনে হল যে বিক্রি নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে কিন্তু তার মূর্তিতে কেমন বেয়াড়া ভাব। নন্দন পাহাড়ে চড়তে আগে চমৎকার লাগত, মাঠ দিয়ে আল পেরিয়ে ছোট্ট পাহাড়টার চুড়োয় কেমন ছোট্ট মন্দিরের ভাঙা ধাপে বসে মনে হত যেন ঊর্ধ্ব গগনের সঙ্গে একটু মোকাবিলা হচ্ছে— এ হয়তো দিক্‌ভ্রম, কারণ তখন চোখে দেখতাম কম (চশমা তখনো নেওয়া হয় নি) আর বয়স ছিল নেহাত কাঁচা। কিন্তু ১৯৪৯ সালে দেখা গেল যে নন্দন পাহাড় বলে একটা ঢিবির অস্তিত্ব অনেকে জানে বটে কিন্তু সেটা কারো ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ছেলেবেলায় দূরে দিঘড়িয়া পাহাড়ের ঘুমন্ত ভাব একটু যেন মোহ সৃষ্টি করত মনে, কিন্তু বহু দিন বাদে দেখলাম, উন্মুক্ত দিগন্ত কাঠামোর অরণ্যে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেছে বলে দিঘড়িয়ার রূপ হয়ে পড়েছে ফ্যাকাসে, আকাশ আর প্রান্তর সে-রূপকে আর আগের মতো উদ্ভাসিত করে তুলছে না। কেবল মাত্র ত্রিকূটই পরে হতাশ করে নি— 'তপোবন'কে এত ছিমছাম দেখলাম পরে যে চেনা যায় নি, কিন্তু ত্রিকূটকে (হয়তো দূর থেকে দেখেছি বলে) পূর্বের মতোই

মনোহারী লাগল। বুঝলাম কিছু পরিমাণে কেন কবি বিষ্ণু দে দেওঘর এড়িয়ে বারবার চলে যান সমীপবর্তী অথচ একান্ত ভিন্নমূর্তি রিখিয়া গ্রামে —যেখানে তাঁর সহৃদয় আতিথ্য উপভোগ করার সুযোগ একবার আমি পেয়েছি। তবে আমার মনকে এখনো টানে দেওঘর, হয়তো জীবনে প্রথম প্রকৃতির কিছুটা সান্নিধ্যে সেখানে আসতে পেরেছিলাম বলে।

একদিন দেওঘরে তিতির বা ঐ-ধরনের কোনো পাখি শিকার করে কারা যেন এনে দিয়েছিল, কিন্তু রাঁধবার জন্য সেই শিকার যখন তৈরি করা হচ্ছিল তখন তার চেহারা দেখে আমার অসম্ভব বিতৃষ্ণা জেগেছিল— আজও পর্যন্ত তা মনে আছে; হয়তো গান্ধী-আমলে বছর পাঁচ-ছয় নিরামিষাশী হওয়ার সেটা এক কারণ। তবে ছেলেবেলায় চিন্তার বালাই বাদ দিয়ে অনেক কিছু করে যাওয়া বোধ হয় রেওয়াজ আর কিছু পরিমাণে অবোধ নিষ্ঠুরতাও তখন কোনো কোনো ব্যাপারে ফুটে ওঠে। জল ছেঁচে একেবারে কুচো, পোকার মতো চেহারার মাছ ধরে আনায় কোনো বাহাদুরী নেই, স্ফূর্তিও তেমন হবার নয়, কিন্তু দেওঘরে এক পিসতুতো দাদার সঙ্গে সেই মাছ ধরার স্মৃতি একটু-আধটু রয়ে গেছে। আর-একটা কাণ্ডে অংশীদারী করা গিয়েছিল, যার জন্য এখনো মনে কেমন যেন অনুতাপ আসে। 'জম্না-জোড়ে'র কাছেই একটা অতি ছোটো ডোবা ছিল, যার উপর দিয়ে একটা মোটা পাথর ঠিক যেন বাঁকা সাঁকোর মতো দেখা যেত; অল্প পরিসরে একটু সৌন্দর্যের দূর স্পর্শ সেখানে লেগে ছিল সন্দেহ নেই। মাথায় কী ভূত চেপেছিল আমাদের মনে নেই, কিন্তু সেই পাথরটাকে ভেঙে ফেলে ডোবাটাকে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখনই হয়তো মনে একটু অনুশোচনা জেগেছিল, নইলে আজও সেই নগণ্য দৃশ্যটা মনের চোখে ফুটে উঠে একটু কষ্ট দেয় কেন?

পুরোনো দেওঘরের কথা ভাবলে মনে পড়ে যায় কুয়োর জলে স্নানের আরাম, মনে পড়ে বালানন্দ আশ্রমের বিরাট, গম্ভীর ইউকালিপ্‌টস গাছ, দাড়োয়া নদীর বালুবিস্তার, কুণ্ডায় কাদের যেন চমৎকার বাগান (সেখানে বোধ হয় এক আশ্রম পরে গজিয়েছিল), দেওঘর স্কুল-প্রাঙ্গণ, সম্ভবত সেখানেই অবস্থিত ব্রাহ্মমন্দির— দাদু ব্রাহ্মমন্দিরে না গিয়ে পারতেন না বলে আমারও গতিবিধি কিছুটা তদ্রূপ হত। ব্রহ্মোপাসনা আর ব্রহ্মসংগীতের

সঙ্গে আমার পরিচয় হিন্দু পরিবারের নিত্যকর্মপদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়ের চেয়ে কম ছিল না। এ বিষয়ে পরে কিছু বলতে হতে পারে, কিন্তু দেওঘর সম্পর্কে কথা উঠতেই মনে পড়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে শুনেছিলাম সেখানে প্রাতঃস্মরণীয় রাজনারায়ণ বসুর মাহাত্ম্যের বিবরণ— তেজস্বী, সত্যসন্ধ, দেশাভিমানী যে-ব্যক্তি প্রচলিত হিন্দু বিশ্বাস ও প্রথার পরম বিরোধী হয়েও 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, দেশ যখন প্রায় হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় ইংরেজ শাসনের গুণকীর্তনে অভ্যস্ত হতে চলেছে তখন অপর এক তুলনীয় মহাত্মা, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজনকে নিয়ে মুক্তিমন্ত্রের উদ্‌গাতা হয়েছিলেন। তৎকালে বালক রবীন্দ্রনাথ সাক্ষী ছিলেন সেই আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ উদ্যমের, যা তদানীন্তন পরিস্থিতিতে ছিল একযোগে হাস্যোদ্রেককর অথচ মহিমামণ্ডিত। রাজনারায়ণ বসুর দেওঘর-নিবাসের সঙ্গে সম্পর্ক বোধ হয় রয়েছে বৈদ্যনাথ মন্দিরের পাণ্ডা-পরিবারেও তুলনীয় পরিবেশে দুর্লভ দেশভক্তির উল্লেখযোগ্য উন্মেষ। দেবালয়ে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যাদের কারবার, সচরাচর রাজনীতির সঙ্গে তাদের সংযোগ থাকে না, কিন্তু বৈদ্যনাথধাম এর ব্যতিক্রম। বহু সন্ত্রাসবাদীর দেওঘরে গতায়াতের সঙ্গেও হয়তো এর সম্পর্ক আছে। আর ঐ পাণ্ডাদের মধ্য থেকেই বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু প্রয়াসে নিবিড়ভাবে লিপ্ত, সম্প্রতি মৃত বিনোদানন্দ ঝা-এর মতো ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে।

* * *

তখনকার দিনে আর-পাঁচটা বাঙালী ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের ধরনেই আমাদের জীবন চলত. বলা যেতে পারে মোটামুটি মন্দাক্রান্তা তালে— যদিও ছেলেবেলায় যারা বয়সে বড়ো তাদের সমস্যা ধরা বা বোঝার সামর্থ্য বা সম্ভাবনা ছিল না। মাঝে মাঝে ঝাপসাভাবে যেন জানা যেত কিছু কিছু সাংসারিক মুশকিলের কথা— কটু দারিদ্র্যের আস্বাদ পাই নি কিন্তু এক-এক সময় ছেলেবেলাতেই বুঝেছি যে অর্থাভাব বলে একটা বস্তু আছে যা মনোরম নয়। আমার পিতামহ সাহিত্য ও সাংবাদিকতার চর্চা করেছেন আজীবন, বহু উপলক্ষে সানন্দে ও স্বচ্ছন্দে কবিতা লিখেছেন (যাতে প্রধান প্রভাব পড়েছিল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাভঙ্গীর), কিন্তু তখনকার বিদেশী 'মার্চেন্ট অফিসে' কাজ করেছেন, সেই উপার্জনের জোরেই কলকাতায় বাড়ি

করেছেন, সাংবাদিকতার পারিশ্রমিক ছিল একান্ত নগণ্য। আমার বাবা শিক্ষকবৃত্তি নিয়েছিলেন— তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসের এক সকালে রিপন ল' কলেজে ঘর-ভর্তি ছাত্রের সামনে বক্তৃতা করতে করতে— ব্যবহারজীবীও তিনি ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতা এবং বহু-বিধ জনকল্যাণকর্মে লিপ্ত ছিলেন ; লক্ষ্মীর প্রসাদ অর্জন ব্যাপারে যে গুণাবলী আবশ্যক তা তাঁর ছিল না। মাত্র একবার বোধ হয় স্বদেশী যুগের প্রেরণায় আমাদের পরিবার বাণিজ্য বিষয়ে একেবারে ক্ষণস্থায়ী ও অসফল আগ্রহের পরিচয় দিয়েছিল ; কী একটা 'লিমিটেড কোম্পানি' সম্বন্ধে কতক-গুলো ফেলে-দেওয়া পুরানো কাগজপত্র এবং বাঁধানো খাতা ছেলেবেলায় বাড়িতে দেখেছি। যাই হোক, বাঙালী ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের পক্ষে অপরি-হার্য অর্থসংকট যে ঘটত, তার একটু অস্পষ্ট আভাস ছেলেবেলায় পেয়েছি যখন দাদু হয়তো মার সঙ্গে আলাদা কী কথা বলার পর চলে গেলেন বাড়ির প্রায় পাশে কর্পোরেশন স্ট্রীটে (পরে যার নাম হয় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড) হরিদাস দত্তের দোকানে (তালতলায় এখনো বহু সুবর্ণ বণিকের ব্যবসা ও নিবাস)। আমি দোকানের সামনে রকে বসে রাস্তা দেখতে থাকলাম, কিন্তু বুঝলাম যে টাকাকড়ির কিছু লেনদেন ভিতরে হচ্ছে। কি রকম একটা অস্বস্তির আবহাওয়া তখন বাড়িতে যেন অনুভব করতে পারতাম।

আজকাল আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাই জানে না, কিন্তু বসতবাড়ি বাদে দাদু আর-একটা ছোট্ট বাড়ির মালিক ছিলেন, যেটা পরে হাতছাড়া হয়ে গেছে। হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার আর কর্পোরেশন স্ট্রীটের মোড়ে একতলা সেই বাড়িটায় ছিল কাঙালী ময়রার দোকান— সামনে তখনকার দিনের পক্ষে মোটামুটি জমকালো মিষ্টান্নের পসরা, আর পিছনে থাকার জায়গা। ভাড়া আদায় হত দৈনিক এবং এমন কায়দায় যা আজকে কেউ শুনে হাসবে। দাদু বাজার করতে ভালোবাসতেন ; তাই তিনি (বা বাড়ির অন্য কেউ) তালতলা বাজারে (যা ঐ দোকানের প্রায় সামনা-সামনি) যাবার সময় ভাড়াবাবদে কিছু নিয়ে যেতেন, আর দৈনিক ভাড়া হিসাবে যে প্রাপ্য বাকী থাকত সেটা বিকেলে খাবার এনে তার দামে পুষিয়ে নেওয়া হত। আমরা বেশ বড়ো হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলছিল ; বাড়িটা

বিক্রি হয়ে যায় ১৯৩০-৩২ সালে, তখন আমি বিদেশে। ঠিক সেই জায়গায় পুরোনো ঘর ভেঙে তিনতলা বাড়ি উঠেছে, যা ঐ-জায়গায় বর্তমানে মহামূল্য সম্পত্তি বললে বাহুল্য ঘটে না। এর উল্লেখ যে করছি, তার একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। অর্থ বিষয়ে আমাদের পরিবারের সকলের অবজ্ঞা আছে বলার মতো বড়াই আমার নেই; কিন্তু অর্থ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ অবহেলার মনোভাব হয়তো অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের আছে। কেউ কখনো আমাকে স্পষ্ট করে বলে নি এই সম্পত্তি বিক্রয়ের কারণ কী ছিল— ১৯৩৪ সালে বিদেশ থেকে ফেরার পরও কিছুকাল দাদু বেঁচে ছিলেন কিন্তু কেউ আমাকে সে কারণ বলে নি। খোঁটা তো একেবারেই কেউ দেয় নি অথচ আমার সুনিশ্চিত অনুমান এই যে সরকারী স্কলারশিপ ফুরিয়ে যাওয়ার পর পৌনে দু'বছর আমার বিদেশবাসের জন্যই পরিবারের স্বল্প সংগতির উপর এই আঘাত পড়েছিল। এমনও হতে পারে যে আমার ছোটো বোনের বিবাহ-ব্যপদেশে অর্থসংগ্রহের প্রয়োজনও একটা কারণ, কিন্তু আমার স্থির সন্দেহ যে আমার বিদেশবাসই এই ঘটনার প্রধান হেতু। ব্যারিস্টার হয়ে এসে প্রচুর অর্থ উপার্জন করব, আমার উপর পরিবারের এই ভরসা যে ছিল তা তো স্পষ্ট জানি। সে-আশাকে আমার পরবর্তী কার্যক্রম চূর্ণ করেছে। কিন্তু এ নিয়ে গুরুতর অনুযোগ আমাকে শুনতে হয় নি কখনো। এমন-কিছু বিরাট ব্যাপারের কথা বলছি না, কিন্তু বাঙালী ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারে বোধ হয় এখনো এমন-একটা মূল্যবোধ আছে যাতে অর্থকে কিছু পরিমাণে অনর্থ মনে করা আমাদের পক্ষে কঠিন নয়। সামান্য হলেও একটু যেন অপরাধবোধ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার মনে থেকে গেছে, যদিও আবার বলি একে সামান্যের কিছু বেশি বড়ো করে দেখাবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার নেই।

* * *

আগেই বলেছি দাদু বাজার করতে ভালোবাসতেন— বহুমূত্র রোগে ভোগার ফলে তাঁর নিজের আহার ছিল স্বল্প, কিন্তু অপরকে খাওয়াতে ভালো-বাসতেন; তা ছাড়া তখনকার দিনে খাওয়াদাওয়া নিয়ে খোসগল্পের যে রেওয়াজ ছিল (অন্তত ফরাসী বিচারে যা হল সভ্যতার এক মাপকাঠি) তাতে খুশি মনে যোগ দিতেন, যদিও তাঁর মনের গড়ন ছিল গম্ভীর। হয়তো বসুমতী পত্রিকার মুদ্রক ('প্রিন্টার') পটলবাবু (যাঁর ভালো নাম পূর্ণচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় রোজ হাজার হাজার কাগজের নীচে ছাপা হত) জাঁকিয়ে সকালের বাজার নিয়ে গল্প ফেঁদেছেন, বলছেন লাউটা কিনেই ভাবলাম একটু কুচো চিংড়ি তো না নিলেই নয়, কিম্বা একটা ছাঁচি কুমড়ো কিনে তখনই ছুটতে হল ঝুনো একটা নারকোলের খোঁজে— কেউ হয়তো ফোড়ন দিলেন, 'বাজার করা কি সোজা কাজ মশায়, সেখানে গিয়ে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রান্না করতে হয়।' পটলবাবুর আবার ক্ষোভ যে 'আজকালকার' মেয়েরা কোনো কাজে মন দেয় না, অমন যে এক মোচা এনেছিলেন সেদিন, কিন্তু তাকে কুটে সারারাত ঠিকমতো ভিজিয়ে না রাখায় 'ঘণ্ট'টা জুৎসই হল না। এই পটলবাবু সরল-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, এবং একেবারে পুরোনো কলকতিয়া; শহর ছেড়ে কোথাও যেতে যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসত তাঁর। বোধ হয় ১৯২২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল চট্টগ্রামে; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন জেলে থাকায় সভানেত্রী নির্বাচিত হন তাঁর সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী। কী জানি কেন, স্থির হয়েছিল যে প্রতিনিধিরা অনেকে জাহাজে চট্টগ্রাম যাবেন। বসুমতী অফিসে এই নিয়ে একদিন আলোচনায় পটলবাবু শুনলেন যে ডেলিগেটদের কিছুটা পথ খাস সমুদ্র দিয়ে যেতে হবে— একটু থমকে যেন বলেছিলেন: 'সে কি মশায়? তা জাহাজটা ধার দিয়ে ধার দিয়ে যাবে তো?'

তখনকার দিনে নিমন্ত্রণ বাড়িতে ভোজের পঙ্‌ক্তিতে অন্তত কয়েকজনকে সর্বদা দেখা যেত যাদের খাওয়ার বহরটাও ছিল দেখবার মতো। হয়তো লিক্‌লিকে চেহারার এক ব্রাহ্মণ ('পেটুক' আর ব্রাহ্মণ, এই দুটো শব্দ যেন একসঙ্গে জোড়া মনে হত)— সচরাচর খুব বেশি খেতে পাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই শরীরে, কুচোকাচা কয়েকটি ছেলেমেয়ে, যারা হাত ধরে এবং ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে তাদেরও দেহ শীর্ণ, চাহনি সংকুচিত —অথচ চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সর্ববিধ ভোজ্যবস্তু গলাধঃকরণের ক্ষমতা অসামান্য— এ তখন একটা সাধারণ দৃশ্য বলেই পরিগণিত ছিল। তা ছাড়া মাঝে মাঝে দেখা যেত হৃষ্টপুষ্ট চেহারার কিছু ব্যক্তি, ভোজনপটু বলে যাদের খ্যাতি সুবিস্তৃত, এবং পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট বাকী সকলে সানন্দে অপেক্ষা করছেন এবং নানা রসোৎফুল্ল মন্তব্য করছেন তখন হয়তো ল্যাংড়া আম আর সন্দেশ আর হাঁড়িকে-হাঁড়ি দই দ্রুত বিলীয়মান হয়ে চলেছে। নানা কারণে

আগেকার সেই ভোজনবিলাস বিশেষ উপলক্ষেও আজকাল দেখা যায় না। হয়তো তা আজ সম্ভবও নয়— তা ছাড়া খাদ্যদব্য সম্বন্ধে, বিশেষত নিমন্ত্রণ বাড়িতে যা পূর্বে ছিল বিশেষ রুচিকর, সে-সম্বন্ধে বর্তমানে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাও একান্ত সীমিত হয়ে পড়েছে। নিমন্ত্রণ বাড়িতে পটল ভাজা বা কুমড়োর ছক্কার মতো জিনিস সামান্য হলেও অসামান্য হতে পারত; আগে কোনো কোনো বাড়ির সুনাম ছিল নিরামিষ রান্নার বহুবিধ পদ নিয়ে,কোথাও বা ছিল আমিষ বিষয়ে খ্যাতি— আজ এ-ধরনের ব্যাপার একেবারে বিস্মৃতির জলে তলিয়ে গেছে। বাঙালী— এবং বিশেষ করে, ব্রাহ্মণ— মিষ্টি খেতে গররাজী, এটা সেকালে প্রায় অচিন্তনীয় ছিল, অথচ আজ একটু বয়স্ক যারা, তারা মিষ্টান্ন বিষয়ে শঙ্কিত এবং তরুণদের কাছে বাঙালী মিষ্টান্নের বিচিত্র মোহনীয়তা প্রায় অজ্ঞাত। আমার দাদু বাবার জন্য রোজ বিশেষ মিষ্টান্ন কিনে আনতেন— একমাত্র পুত্র সম্বন্ধে হয়তো এ একটা দুর্বলতা তাঁর ছিল, কিন্তু এতে আমারও লাভ হত কারণ আমি প্রায়ই তাঁর সঙ্গী থাকতাম এবং নানা সুখাদ্যের সন্ধান (এবং কিঞ্চিৎ আস্বাদ) এভাবে পেতাম। কেন জানি না দাদুর কাছে ভীমনাগের চেয়ে তার পাশেই 'তস্য ভ্রাতা' শ্রীনাথ নাগের দোকান বেশি পছন্দসই ছিল— আজ ভীমনাগের দোকানের ধ্বংসাবশেষ বৌবাজারে রয়েছে, 'তস্য ভ্রাতা' এখন অন্তর্হিত। দাদু আরো পছন্দ করতেন হিদারাম বাঁড়ুজ্জে লেনে নব গুঁইয়ের দোকানের সন্দেশ (পরবর্তী যুগে বড়ো রাস্তাতেও এই দোকান বসেছে)। বাগবাজারে নবীন ময়রার রসগোল্লা পরখ করতে একবার যেন গিয়েছি; তবে রসগোল্লা সর্বভারতীয় আসরে যতই কদর পাক-না-কেন, ছেলেবেলা থেকেই জেনে এসেছি যে সন্দেশের কারিগরীতে বাঙালীর শিল্প-প্রতিভার স্পর্শ আছে অনেক বেশি, যদিও অবাঙালী মুখে সচরাচর সরেশ সন্দেশের আসল তার ধরা পড়ে না— জওয়াহরলাল নেহরু নাকি নলেন গুড়ের সন্দেশের ভক্ত ছিলেন কিন্তু তা বোধ হয় ব্যতিক্রম। ছেলেবেলাতেই জেনেছিলাম যে হাইকোর্ট পাড়ায় মিষ্টি এবং কচুরি সিঙাড়া জাতীয় খাবার বাস্তবিকই ভালো। একবার যেন দর্মাহাটায় কিছু ঘরোয়া দরকারে লাগে এমন জিনিসের সন্ধানে দাদুর সঙ্গে গিয়ে ফেরার পথে হাইকোর্টের কাছে এক দোকানে চর্ব্য চোষ্য আস্বাদের অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম। বসুমতী অফিসের কাছাকাছি এলাকায় দু-একটা

দোকান তখন ছিল যেখানে মুখরোচক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য সবাই জানত— পুঁটিরাম মোদকের দোকানে আজ চেয়ার-টেবিলের বাহার আছে বটে, কিন্তু মিষ্টান্নের স্বকীয়তা যেন ক্ষুণ্ণ। আগেকার বয়োজ্যেষ্ঠদের কথোপকথনে খাবার জিনিসের উল্লেখ এবং বিচার যে জায়গা নিয়ে থাকত, আজ আর তার তেমন চিহ্ন নেই। বড়ো হয়ে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাদের মধ্যে সুলেখক হিরণকুমার সান্যাল (হাবুলবাবু) ছাড়া আর তেমন কাউকে কলকাতায় খাবার দোকান সম্বন্ধে সানন্দ আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখি নি। অধুনা বিদগ্ধ বলে বর্ণিত যারা তারা কোথায় ভালো চীনা বা মোগলাই খাদ্য মেলে তা জানেন কিন্তু বাঙালী খাবার সম্বন্ধে নাকতোলা ও নিঃস্পৃহ। নিজে খাদ্যরসিক না হলেও ব্যাপারটা কেমন যেন উদ্ভট লাগে।

আজকের চেয়ে সেকালে দেশের লোক যে ভালো খেতে পেত, এ কথা বলতে পারি না। হয়তো গ্রামাঞ্চলে তারা পেত, কিন্তু অন্তত শহর আর আধা শহরে তখনকার দারিদ্র্য বর্তমানের তুলনায় বেশি বই কম ছিল না। জিনিসপত্রের দাম কম ছিল অনেক নিশ্চয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের রোজগারও ছিল ঢের বেশি কম। এখনো তো অনেক পুরোনো সংসারে, আগেকার দিনে ঝি-চাকর কত সস্তায় মিলত বলে হা হুতাশ প্রায়ই শোনা যায়। আর্থিক দিক থেকে আগেকার দিনগুলো যে আজকের চেয়েও অন্ধকার ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় বহুবিধ চাঞ্চল্য জীবনকে আজকের মতো অস্থির করে রাখত না বলে তখন প্রায় যেন একটা স্বাভাবিক স্বস্তি— যা ছিল মূলগত বিচারে একান্ত অল্পমূল্য— দৈনন্দিন কালাতিপাতকে বঞ্চনার বেদনা থেকে কিছু পরিমাণে নিস্তার দিতে পারত। বেশ মনে পড়ে বৌবাজার থেকে কয়েকটা ইলিশ মাছ একসঙ্গে কিনে আনা হচ্ছে— রাস্তা দূর নয় সুতরাং হেঁটেই ফেরা। হয়তো বা পরদিন অরন্ধন-বলে অন্তত গোটাচারেক ইলিশ সারা পরিবারের জন্য কিনে আনা হচ্ছে। পথে কত লোকের প্রশ্ন : 'কত দিলেন?' প্রশ্নের মধ্যে অসূয়া নেই, বিস্ময় নেই, আছে সুস্থ হৃষ্ট কৌতূহল। আরো মনে পড়ে দাদুর সঙ্গে গিয়েছি কুমারটুলি; সেখানকার প্রসিদ্ধ কবিরাজ বংশ সেন পরিবারের সঙ্গে আমাদের বহুদিনের সখ্য, চ্যবনপ্রাশ এবং মকরধ্বজ দাদু নিয়ে আসতেন। অনেক গল্প হচ্ছে, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনের মতো তখনকার শ্রুতকীর্তি চিকিৎসকের

বাড়িতেও কিছুক্ষণ বসা হচ্ছে— ফেরার সময়, সকালবেলাতেই কুমারটুলি ঘাট থেকে একেবারে তাজা গঙ্গার ইলিশ নিয়ে আসা। সারা রাস্তা ট্রামে এবং পদব্রজে বহু পথচারীর পুলকিত প্রশ্ন : 'এ মাছ কোথায় পেলেন, কত দিলেন ?'

'ভোজনে নৃত্যান্তে বিপ্রাঃ' বলতে ব্রাহ্মণরাও তখন লজ্জিত হতেন না। বসুমতী অফিসে ছেলেবেলা থেকে গিয়েছি— সেখানে প্রায়ই দেখেছি তখনকার সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মঞ্চে বিরাট পুরুষ সুরেশ সামাজপতিকে। বিদ্যাসাগরের এই দৌহিত্র ছিলেন প্রকৃতই ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু, মহাভুজ। অকরুণ, অকপট, ক্ষুরধার সমালোচক বলে প্রসিদ্ধ এই মানুষটির পরিচয় আমার কাছে ছিল একেবারে ভিন্ন— তাঁর বৈকালিক জলপানে ভাগ নিতে প্রায়ই আমায় ডাকতেন। যে-কথা সামান্য হলেও হয়তো আমার দাদুকে সোজাসুজি বলতে কিছু সংকোচ তা আমায় বলতেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো স্মরণীয় মানুষ, বাংলাগদ্যের ইতিহাসে যাঁর নাম মুছে গেলে আমাদেরই প্রত্যবায়, সুলেখক, সুবক্তা, সুপণ্ডিত যে-ব্যক্তির অবদানের আলোচনা আজকের বাঙালী গবেষকদের কাছে এখনো অবহেলিত, তাঁকে দেখেছি 'নায়ক' অফিসে, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে, দেখেছি 'বসুমতী'তে, কিম্বা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙালী' পত্রিকার কার্যালয়ে— দেখেছি আমাদের বাড়িতে এবং অন্যত্র। কথার ছটায় অতুলন এই মানুষটি প্রখর রাজনীতি আলোচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু নিচক্ বাঙালী ঘরোয়া কথা এবং ইতিহাসে তার পশ্চাৎপট সম্বন্ধে সহজ স্বচ্ছন্দ সুরসিক ব্যাখ্যা দিতেন— পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণে আছে পাঁচকড়িবাবুর দুধের সঙ্গে জিলিপি ভক্ষণের কথা, যার ভাগ তিনি অনুরাগীদের দিতেন এবং তীক্ষ্ণ অথচ মরমী বাক্যবাণ ইতস্তত নিক্ষেপ করতেন। ভোজন-ব্যাপারে শুধু যে ব্রাহ্মণরা পটু এবং আগ্রহী ছিল তা নয়— বাংলার তখনকার জীবনধারায় এর বিশিষ্ট স্থান ছিল। দাদুর বন্ধু, কয়েকজন প্রাচীন ব্রাহ্ম এবং 'ব্রাহ্মভাবাপন্ন' ব্যক্তি— যাঁদের মধ্যে সৌম্যদর্শন, দীর্ঘশ্মশ্রু দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ক্রীক রো -স্থিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অফিসে দেখার কথা বেশ মনে আছে— প্রতিবৎসর পয়লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে আত্মোৎকর্ষ-বিধায়িনী সভার আয়োজন করতেন, যেখানে বক্তৃতাদি অবশ্য হত, কিন্তু তার চেয়ে বেশি মনে আছে সভাশেষে চমৎকার

তরমুজের সরবৎ এবং সন্দেশাদি মিষ্টান্নের ব্যবস্থা। এখন যেখানে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌স্‌-এর মস্ত অফিস, তার কাছে ছিল (আজও আছে) বৌদ্ধ-ধর্মাঙ্কুর সভা। সেখানকার চট্টগ্রামবাসী বাঙালী কর্ণধার কৃপাশরণ মহাস্থবির ও গুণালংকার মহাস্থবির-এর মতো ভিক্ষু অবশ্য ছিলেন একান্ত মিতাহারী; প্রায়ই আমাদের বাড়ি তাঁরা আসতেন, সভার বিবিধ প্রয়োজনে। বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা ইত্যাদি উপলক্ষে সমাবেশ হত, বহু সজ্জনের সমাগম ঘটত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানী অধ্যাপক আর, কিমুরা কিম্বা তিব্বতী কোনো আগন্তুক প্রায়ই সেখানে আসতেন, বক্তৃতা করতেন, কিন্তু যারা আমাদের মতো বয়সে ছোটো তাদের কাছে সব চেয়ে আকর্ষণীয় ছিল সভাশেষে ভোজের ব্যবস্থা। চট্টগ্রামের 'মগ' সম্প্রদায় বৌদ্ধ হলেও আমিষ-সহ বিবিধ সুখাদ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত বলে সেই ভোজ মাঝে মাঝে চমৎকার হত। নিরামিষের ব্যবস্থাও ছিল সুন্দর; যাকে উত্তর জীবনে সাহেবী কেতায় 'ফ্রুট স্যালাড ও ক্রীম' বলে জেনেছি, সে-বস্তুর পরম উপাদেয় প্রথম আস্বাদ মেলে বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভায়। কিছুকাল আমার বাবা ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু 'সৎসঙ্গ' বলে এক সভা করতেন, পালা করে সভ্যদের বাড়িতে আয়োজন হত, গান হত, বক্তৃতা হত, আর কার্যক্রম সাঙ্গ হত মিষ্টান্ন ও সরবৎ পরিবেশনের সঙ্গে। একটু বেশি এ-সব আপাততুচ্ছ কথা হয়তো বলে চলেছি, কিন্তু সেদিনের বাঙালী জীবন সীমিত ও গভীর বিচারে অকিঞ্চিৎকর হলেও একটু যেন সহজ, আলাপচারি, সামাজিকতার স্পর্শে সজীব ছিল। আজকের পরিবেশ ভিন্ন, প্রশ্ন ভিন্ন, জীবনপ্রসঙ্গ ভিন্ন— তবুও একটু পশ্চাদব-লোকনের দাবি সেই পুরোনো দিন করতে পারে।

বাড়ির কাছাকাছি যে দুটো স্কুলের সঙ্গে আমাদের পরিবারের যোগা-যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল, তা হল শাঁখারিটোলা পাড়ায় নেবুতলা স্ট্রীটে (পরে শশি-ভূষণ দে স্ট্রীট) নারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ক্যালকাটা হাই স্কুল আর ডাক্তার লেনে জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তালতলা হাই স্কুল। এর আগে বলেছি যে ক্যালকাটা হাই স্কুলে, আমার জ্ঞান হওয়ার আগে, কিছুকাল আমার বাবা হেডমাস্টার ছিলেন, আর সেখানে আমার দাদারা পড়েছেন। স্কুলের বাড়িটা এখনো প্রায় একভাবে আছে— আগেকার দিনে বড়ো বাড়ি কেমন যেন ঢেঙ্গা তেরছা দেখতে, ছোটো এক উঠোন, পেল্লাই এক কাঠের

দরজা, কিন্তু হাত বদ্‌লে, নানা হেরফেরের ঘায়ে বাড়িটার মিইয়ে-যাওয়া চেহারা। নারায়ণ ভট্টাচার্য থাকতেন কাছাকাছি সার্পেন্টাইন লেনে—সত্যিই এ-রাস্তা সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে— পাড়া দিয়ে হেঁটে গেলে সবাই চিনত। তাঁর এক ভাইয়ের দশাসই চেহারা মনে রাখার মতো ছিল, ডাকসাইটে পরিবার— আজ তার চিহ্ন মুছে গেছে, 'বাসাড়ে'-র ভিড়ে পুরোনো পাড়ারও বড়ো কিছু নেই। আজ বৌবাজার স্ট্রীটের নতুন নাম-করণ হয়েছে যাঁর নামে সেই বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির মতো মানুষও যদি বেঁচে উঠে হেঁটে যান ঐ-রাস্তা দিয়ে, তো কেউ বড়ো একটা চিনবে না!

তালতলায় জয়কৃষ্ণবাবু ছিলেন নারায়ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কিছুটা পাল্লা দেওয়া চরিত্র— পাসের কোঠায় খুব বেশি না এগুলেও স্কুলের অঙ্ক শেখাবার ব্যাপারে দিগ্‌গজ, আর তার চেয়ে ঢের বড়ো কথা, একেবারে স্কুলগত প্রাণ। ভট্টাচার্য মহাশয় বোধ হয় বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাই ক্যালকাটা হাই স্কুল যখন অস্তাচলে ঢলে পড়ছে তালতলার তখন উঠ্‌তির সময় এসেছিল। এই তালতলা স্কুলে আমি ভর্তি হই ১৯১৫ সালে, তখনকার 'সেভ্‌ন্থ ক্লাসে (আজকের ক্লাস 'ফোর')—বহু পরে আমার মেয়ে আর ছেলে উভয়েই এই স্কুলে পড়েছে. যদিও কিম্বদন্তী শুনেছি যে 'সাহেবী' স্কুলে নাকি আমরা পড়েছি। আসল কথা এই যে আমাদের বাড়ির সবাই নির্ভেজাল স্বদেশী স্কুলের আবহাওয়াতেই বড়ো হয়েছি; যদি স্বাতন্ত্র্য কিছু থেকে থাকে তো এই যে বাড়ির আলোহাওয়ার মধ্যেই যেন লেখাপড়া মিশে ছিল।

একালেও শোনা যায় যে কোনো কোনো স্কুলকলেজ প্রায় যেন কিছু ব্যক্তির মালিকানায়। কিন্তু আগেকার যুগে নারায়ণ ভট্টাচার্য বা জয়কৃষ্ণ-বাবু স্কুলের উদ্‌বৃত্ত আয় থেকে হয়তো সংসার-যাত্রা নির্বাহ করলেও স্কুলকে যেভাবে আপন মনে করতেন সে-ধারা আজ নিশ্চিহ্ন। কায়মনোবাক্যে স্কুলকে নিয়েই তাঁদের জীবন চলত। স্কুলের শিক্ষক-ছাত্রদের নিয়েই যেন তাঁদের পরিবার ছিল, স্কুলের চিন্তা ছিল দিবারাত্রির স্বপ্ন। সরস্বতী পুজোয় দুপুরে জয়কৃষ্ণবাবুর বাড়ির ছাদে (যা ছিল স্কুলের সামনে) প্রসাদ-ভক্ষণের পঙ্‌ক্তি পড়ার মধ্যেও বেখাপ্পা কিছু লাগত না। আজকাল আরো শুনি যে স্কুলগুলো হয়ে পড়ছে বেমানান্, ছাত্র আর শিক্ষক প্রায় সবাই বুঝি লেখাপড়ার ব্যবস্থাটাকে একটা বেজায় বিরক্তি মনে করে, স্কুলের পালা শেষ

করেও কোনো সুরাহা না থাকায় তিক্ততা সর্বত্র, জীবন সহজ নয় বলে চার-দিকে অস্বস্তি আর আক্রোশ। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্কুলের চেহারা এমন যে তার মায়াজালে বড়ো একটা কেউ বাঁধা পড়ে না, সে-চেহারা বদলাবার সংগতি নেই বলে সংকল্পও প্রায় পরিত্যক্ত। একটু আতিশয্য হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আজকাল স্কুলকলেজের অধিকারীরা যেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ভাবেন বেশি নিজেদের কর্তৃত্বের কথা, শিক্ষাদানে আগ্রহের চেয়ে বহুজনের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার আকর্ষণ সম্ভবত বেশি। তাই স্কুলকে আপন ভাবেন এমন কর্তৃপক্ষীয়ের কথা বড়ো একটা কেউ বলে না। বর্তমান ব্যবস্থায় পরস্পর সম্পর্ক ক্রমশ নৈর্ব্যক্তিক হওয়ায় অবশ্য স্কুলকলেজেও তার ছায়া পড়েছে। যাই হোক্, সুনিপুণ আর সহৃদয় শিক্ষাব্রতী অবশ্যই আছেন। কিন্তু স্কুলের সঙ্গে মিশে-থাকা আর কঠোর-কোমল চরিত্রবলে ছাত্রদের আত্মীয় করে রাখার মতো মানুষ আজ আগেকার তুলনায় দেখা যায় কম।

আমার মধ্যে অল্পবয়সেই আসে কেমন যেন একাকিত্ব— মন অলস নয় অথচ তার বহিঃপ্রকাশ অল্প, একগুঁয়ে না হলেও একটু যেন একলসেঁড়ে ভাব ছিল, আত্মমগ্ন না হলেও কিছুটা অসামাজিক হয়তো ছিলাম। হয়তো এজন্যই একটু দূর থেকে দেখলেও বুঝতাম, স্কুলের সঙ্গে বহু নিতান্ত স্বল্প-বেতনভোগী শিক্ষকেরও কেমন যেন একাত্মতা রয়েছে— নীচের ক্লাসে পড়াতেন হরিপদ আর নিরাপদবাবু, দুই ভাই তাঁরা, দীর্ঘ ক্ষীণ দেহ, শাসনে কঠোর অথচ স্নেহশীল, পদাধিকারে নগণ্য অথচ তাঁদের বাদ দিলে স্কুল যেন ফাঁকা! বোধ হয় এই একাত্মতার ফলেই তখনকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের পড়াবার কায়দায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির লক্ষণ না থাকলেও একটা অদ্ভুত গুণ থাকত। আমাদের হেড পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থের মতো শিক্ষক বহুবিস্তৃত অভিজ্ঞতাতেও বড়ো একটা দেখি নি— পরে কলেজ জীবনে ভিন্ন পরিবেশে, তেমনই দেখেছি প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কুরুভিলা জ্যাকারিয়া, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীকে, যাঁরা ছিলেন প্রকৃতই অতুলন শিক্ষাগুরু। আবার স্বরটা একটু নামিয়ে বলতে পারি জিতেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। ইনি পরে তালতলায় হেডমাস্টার হয়েছিলেন; বিদ্যা বা ব্যক্তিত্বের দিক থেকে কোনো অসামান্যতা তাঁর দেখি নি, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাই কেমন করে খাস 'বাঙাল' দেশের মানুষ ইংলণ্ডের ভাষা ও জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়

বিন্দুমাত্র না রেখে ইংরেজী ব্যাকরণ আর রচনা-পদ্ধতির মতো জটিল অথচ আমাদের কাছে একান্ত বিদেশী ব্যাপারকে আয়ত্ত করে ছাত্রদের তা ধরিয়ে দিতে পারতেন। খাঁটি 'স্বদেশী' ব্যক্তিত্বে সামান্য আর অসামান্যের অনায়াস, অচেতন মিলন হয়তো সহজে ঘটে থাকে। বেশ মনে আছে, বহু কাল পরে, লোকসভায় কোনো এক বিতর্ক উপলক্ষে গীতা থেকে আমার এক উদ্ধৃতি উল্লেখ করে জওয়াহরলাল নেহরুর পরিহাস সংবাদপত্রে প্রকাশ হওয়ায় এই গাঙ্গুলিমহাশয় তালতলার রাস্তায় আমাকে দেখে একদিন বলেছিলেন : 'বাঃ, খুব ভালো কথা, হীরেন— কম্যুনিস্ট হও আর যাই হও, তুমি গীতা-টীতাও পড়েছ!'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যাপারে পরে আমার নামডাক যা হয়েছিল, তার আভাস স্কুলে থাকাকালে খুব স্পষ্ট হয় নি। 'ভালো' ছেলে বলতে যা বোঝাত, তা ছিলাম, কিন্তু একেবারে সেরা মনে করার কারণ ছিল না। নাম করার দরকার নেই, কিন্তু চার-পাঁচজন সর্বদাই ছিল যারা স্কুলের পড়ায় আমার চেয়ে নিরেশ নয়; চৌকস ছাত্র হিসাবে আমার চেয়ে সরেশ তো বেশ ক'জন নিশ্চয়ই ছিল। তালতলা স্কুলে তখন 'ইটিলি' (এণ্টালি) পাড়ার অনেক ছেলে পড়ত— মনে আছে সরস্বতী পুজোর আগে তারা 'গাইড্' হয়ে নিয়ে যেত কামারডাঙ্গা, ট্যাংরা, চিংড়িহাটা (প্রায় ধাপা-র কাছাকাছি) প্রভৃতি এলাকার বাগান থেকে ফুল আর পাতা জোগাড়ের জন্য, যে-সব এলাকার চেহারা আজ এমন বদলেছে যে আগেকার চোখে চেনা দায়। তালতলা স্কুলের আর-এক বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা— ওপরের ক্লাসে আবার বিহার থেকে আসা বেশ বয়স্ক, শ্মশ্রুমান্, 'তুর্কী' টুপি-পরা ছাত্র দেখা যেত, যারা (এবং বর্মী ছাত্ররা) ছিল যেন একটা আলাদা জাত। আরবী-ফারসী পড়ানোর ব্যবস্থা বিশেষরকম ছিল, কারণ সবাইকে 'বাড়্তি' বিষয় হিসাবে একটি 'ক্লাসিকাল' ভাষা তখন নিতেই হত, কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সত্ত্বেও বিদ্বেষ কম ছিল বলেই বোধ হয় অন্তত আমাদের দু'জন বাঙালী মুসলমান সহপাঠী— যতদূর মনে পড়ে তাদের নাম ছিল বুর্হান্ আর মহীউদ্দীন—'এডিশনল্' নিয়েছিল সংস্কৃত।

আমাদের পরিবারের মুসলমান বন্ধুসংখ্যা কম ছিল না— ছেলেবেলার

একটা স্পষ্ট স্মৃতি হল বর্ধমানের আবুল কাসেম সাহেব (যিনি স্বদেশী যুগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন প্রধান সহযোগী ছিলেন, এবং যাঁর পরিবার থেকে পরে এদেশের সোশ্যালিস্ট এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলন অনেককে পেয়েছে) আমাদের গলি দিয়ে আসছেন এবং বাড়িতে ঢোকার আগেই বাজখেঁয়ে গলায় 'শচীন' বলে আমার বাবাকে ডাক দিচ্ছেন! বেশ মনে আছে আমার দাদু বলতেন, তাঁর বন্ধু 'মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মুজিবর রহমান সাহেবের মতো মানুষ দেখা যায় না। দাদু নিজে ১৯২১ সালে 'খেলাফৎ সমস্যা' বলে বই লেখেন, বসুমতী সাহিত্য মন্দির তা প্রকাশ করে। তাঁর কাছে শুনতাম ব্রাহ্মসমাজের নেতা গিরিশচন্দ্র সেনের মতো ব্যক্তির কথা, যাঁরা ইসলামের ইতিহাস নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন এবং গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দাদুর সঙ্গে বহুবার গিয়েছি মেছুয়াবাজারে যে নববিধান মন্দিরে, তাকে স্থানীয় লোকে বলত 'কেশব সেনের গির্জে', যদিও মন্দির, মসজিদ ও গির্জার ত্রিবিধ স্থাপত্য ছিল তার বৈশিষ্ট্য। যাই হোক্, ছেলেবেলা থেকে, পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বিশ্রী লাগা সত্ত্বেও, মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষের কোনো ছাপ মনে পড়ে নি— আজও ভাবি, মওলালীর দরগাকে কেমন সহজে তখন আমাদের পল্লীর হিন্দু মুসলমান সকলে কদর করত। কলেজ জীবনে আমার এক বন্ধু (যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন এবং পরে বহু সাফল্য অর্জন করেন) ঠাট্টা করে বলত 'হীরেন-টা এই 'children' গুলোকে ("children of the Prophet") বড্ড পছন্দ করে!' বাস্তবিকই, আমার জীবনে যাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ভেবেছি তাদের একটা বড়ো অংশ হল মুসলমান। ধর্মান্ধতা থেকে হাজার অনর্থের সৃষ্টি হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু হয়তো সাংবাদিকতার সঙ্গে আমাদের বাড়ির গভীর সংস্রব ছিল বলে ছেলেবেলাতেই বুঝতে আরম্ভ করেছিলাম কেন স্বার্থের সংঘাতে সংখ্যাল্প বলে চিহ্নিত যারা তাদের মানসিকতায় এমন ছাপ পড়ে যা মনোরম নয়। আর এ কথাও তখন শুনেছি গুরুজনের মুখে যে সাম্প্রদায়িক বলে কি মুসলমানই শুধু চোর-দায়ে ধরা পড়েছে— পার্শীদের বেলাতে তা খুব কম নয়, এমন-কি, ব্রাহ্ম বা 'কলকাতার কায়েত' বলতে যে রীতিমতো শক্তিমান্ গোষ্ঠী বোঝাত তারাও কি নিজেদের দিকে তাকাতে পেছ্‌পাও?

স্কুলে নীচের দিকে পড়ার সময়কার কথা নিয়ে বাগাড়ম্বর করব না।

প্রায় 'গোপাল অতি সুবোধ বালক'-এর জীবনে ঘটনা থাকে কম। পাড়ার চেনা এবং লেখাপড়া-জানা ঘরের 'ভালো' ছেলে, সাজা কখনো তেমন পাই নি— বোধ হয় একবার মাত্র বেঞ্চির ওপর দাঁড়াতে (এর কিছুপরেই কেঁদে ফেলতে) হয়েছিল। মনে আছে 'ফিফ্‌থ্‌ ক্লাসে পড়ার সময় মাস্টার মশায় বুঝি বললেন অফিস ঘরে ঘড়ি দেখে এসে বলতে— পারি নি। অথচ বলিও নি যে চোখ খারাপ বলে দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা নজরে আসে না, এবং ঠাট্টার হুল ফোটা খেয়েছি। অঙ্কের ক্লাসে 'ব্ল্যাক্‌বোর্ডে' লেখাজোখা কিছুই বুঝতাম না। বিষয়টাও তাই শিখতে পারলাম না— অনুতাপ হল পরে, যখন ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষার ঠিক আগে তিন মাসের জন্য এক গৃহশিক্ষকের কল্যাণে দেখলাম যে অঙ্ক (অন্তত তখনকার বাধ্যতামূলক অঙ্ক) জলের মতো সহজ, জ্যামিতির থিওরেম্‌' গুলোর 'এক্সট্রা' কষা একেবারেই কঠিন নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় একশোর মধ্যে নিরানব্বই পেয়ে সবাইকে (এবং নিজেকে) অবাক্‌ করলাম। স্কুলে কিন্তু আমার দুর্নাম ছিল অঙ্ক পারি না। অথচ ইতিহাসের ক্লাসেই পরদিনের পড়া প্রায় মুখস্থ হয়ে যায়, ইংরিজী বাংলা সংস্কৃত প্রভৃতি বিষয়ও বেশ সড়গড়। নিজের মধ্যে নিজেকে কিছু পরিমাণে লুকিয়ে রাখার যে ঝোঁক গজিয়ে ছিল, তারই ফলে বোধ হয় কিছুকাল একটু তোৎলামি এসে গিয়েছিল— দারুণ মুশকিল ঘটত 'রাজতে-রাজেতে-রাজন্তে রাজসে-রাজেথে-রাজধ্বে ; রাজে-রাজাবহে-রাজামহে' এ-ধরনের ধাতুরূপ কণ্ঠস্থ করার পর আবৃত্তি করতে। স্কুলের সামাজিক জীবনের চেহারাও ছিল শান্ত— উদ্দীপক অধ্যায় এল কিছু পরে। সরস্বতী পুজোর সন্ধ্যায় হয়তো চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর 'কমিক্‌' হত (যা অসম্ভব ভালো লাগত) আর কিছুক্ষণ অন্ধকারের পর খোলা উঠোনে 'বায়োস্কোপ'— তখনকার যে নির্বাক চলচ্চিত্র আমাদের অবাক্‌ করে রাখত কিম্বা হাসিতে খিল্‌খিল্‌ করিয়ে তুলত, কিন্তু রাত বাড়ার আগেই বাড়ি থেকে ডাক আসত : অমুক বাড়ির অমুক চলে এসো ! মনে পড়ছে বাবার পরিচিত এই চিত্তরঞ্জন গোস্বামী তখন খুবই জনপ্রিয় ছিলেন— একবার ১লা বৈশাখ উপলক্ষে শুনেছিলাম তাঁকে 'তুমি যে সুরের আগুন ছড়িয়ে দিলে মোর প্রাণে' গাইতে— হাস্যের লঘিমা কাব্যের স্পর্শে বদলে গিয়ে অদ্ভুত মনোহর লেগেছিল।

* * *

কিছুটা একক, অধ্যয়নে আকৃষ্ট খেলায় আগ্রহী অথচ অপটু, দলে মিশে হৈ-চৈ করার শক্তি থেকে বঞ্চিত, অল্প বয়সেই আত্মসচেতন এবং সেজন্যই সংশয় আর দ্বিধা আর চিন্তাজ্বরে অকালকাতর কৈশোর বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে অনেকেই হয়তো আমার মতো তখন কাটিয়েছে। সে-জীবন অসুখী ছিল না, কিন্তু কেমন যেন ভারাক্রান্ত— রাজ্যের চিন্তা এসে সুস্থ স্বচ্ছন্দ, প্রফুল্ল কালাতিপাতে বাধা সৃষ্টি করত— একে পরাধীন দেশে জন্ম, তার ওপর ভারত-ইতিহাসের নিরাসক্তি আর নিরুদ্যমের উত্তরাধিকার, সঙ্গে সঙ্গে পিতৃপিতামহের জীবনবেদে উনিশ শতকী ইংরেজ সভ্যতার অসলংগ্ন অথচ সর্বত্রচারী প্রভাব, এই ত্র্যহস্পর্শের ফলাফল প্রায় অকাট্য না হয়ে পারে কি?

প্রতিবেশীদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক নিকট হলেও আমাদের পরিবারের একটা স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা ছিল। বিদ্যাচর্চা যে জীবনের প্রধান মূল্য, এ কথা অনুক্ত হলেও কেমন যেন মনে ঢুকে গিয়েছিল, আর ভাবতাম যে পাড়ার অধিকাংশ পুরোনো বাসিন্দাদের বাঁচবার ধরনই আলাদা। সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দেবার মন্ত্রে "বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ" যখন পুরোহিতের মুখে "বিদ্যাস্থানে ভয়েব চ" শোনাত তখন হাসির খোরাক আমরা পেয়েছি, অপরে বড়ো একটা পেত না। পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী অথচ হিন্দুত্ব পরিহারে অস্বীকৃত (কিম্বা শঙ্কিত) আমার পিতামহ বলতেন, ব্রাহ্মণের বৃত্তি হল 'যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন'। দেখা গেল পাড়ায় নবাগত নাহার পরিবারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রচুর আগ্রহ— বোধ হয় তাই অধিকাংশ প্রতিবেশীর কাছে যখন অর্থবান বলে তাদের মর্যাদা, তখন আমাদের মনোভাব ছিল ভিন্ন। পূরণচাঁদ নাহারের যে-শিল্পসংগ্রহ এখন আশুতোষ মিউজিয়মে, আমাদের ছেলেবেলায় প্রতিবৎসর তার প্রদর্শনী হত কুমারসিং হলে। কাদের উদ্যোগে মনে নেই, কিন্তু একই প্রাঙ্গণে অভিনয় দেখেছিলাম 'খাসদখল' নাটকের— মনে আছে শুধু যে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাবকে সবাই দারুণ সমীহ করছে দেখে তখনই ভেবেছিলাম ধনবান্‌কে দেখে ধন্য হয়ে যাওয়ার এ কি নোংরা স্বভাব মানুষের, আর মনে আছে একটা জোর-করে-হাসাবার দৃষ্টান্ত: প্রেমিক এক কবি 'শিশির'-এর সঙ্গে মিলের খোঁজে হয়রান হয়ে বলছেন—"ভূমিগতা পদ্মলতা,

তারে যদি দিই ব্যথা, কি লাভ হইবে ইথে তোমার···", আর বন্ধুরা চেঁচিয়ে উঠছেন 'পিসীর' !

অমৃতলাল বসুকে বোধ হয় সেকালে 'রসরাজ' বলা হত। তাঁর কোনো অভিনয় দেখি নি— অভিনয়-ব্যাপারে আমাদের বাড়ির মনোভাব ছিল প্রায় তদানীন্তন মহারথী হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মতো। গল্প ছিল যে হেরম্ববাবু হেঁটে যাচ্ছেন (তখনকার বড়োলোকরা প্রায়ই হাঁটতেন) আর এক পথচারী তাঁকে 'স্টার থিয়েটার কোন্ দিকে ?'— জিজ্ঞাসা করায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বলে ওঠেন, 'জানি না'। কিন্তু একান্ত নীতিনিষ্ঠ ও সত্যবাদী বলে তখনই অনুতপ্ত মনে আবার লোকটিকে ডেকে বলেন, 'দেখুন, আমি জানি, কিন্তু বলব না !' আমরা ছেলেবেলায় থিয়েটার দেখেছি এত অল্প যে না দেখারই মতো— মনে আছে মিনার্ভা থিয়েটারের খ্যাতনামা অভিনেতা হাঁদুবাবুর (বোধ হয় তাঁর ভালো নাম ছিল মন্মথ পাল) সঙ্গে আমাদের বাড়ির সদ্‌ভাব ছিল, তিনি দেখিয়েছিলেন "মিশরকুমারী", আর একবার যেন "মৃণালিনী" অভিনয় দেখি, যাতে ছিলেন সুবাসিনী নামে এক গায়িকা যার চমৎকার গলার স্বর এখনো মনে আছে, প্রায় যেন এখনকার লতা মুঙ্গেশকর-এর মতো। যাই হোক্, স্বয়ং অমৃতলাল বসু আমার দাদুর চেয়ে অল্প একটু বয়সে বড়ো হলেও 'তালতলার চটি'-র জন্য ঠিক তাঁকে সোজাসুজি না বলে আমাকে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে একবার বলেছিলেন, 'তুমি ভাই দাদুর সঙ্গে গিয়ে আমার একজোড়া চটি নিয়ে এসো, আমি তোমাকে থিয়েটার দেখাব !' চটি অবশ্যই তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর অভিনয় দেখার পুরস্কার আমার মেলে নি— এর দায়িত্ব অবশ্য অমৃতবাবুর নয়, দায়িত্ব হল আমাদের পারিবারিক পরিবেশের। অমৃতলালের সেই বৃদ্ধ-বয়সেও বাবুয়ানী চেহারা, ধবধবে বাবরি চুল, মিহি কুঁচোনো ধুতি আর পাঞ্জাবি আর নিজস্ব ঢঙের কোঁচানো চাদর আর শাদা নাগরা বেশ মনে আছে।

কথার পিঠে কথা চেপে খেই প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আবার বলা দরকার যে বাড়ির পরিমণ্ডলে ছিল তখনকার মধ্যবিত্তসুলভ নীতি-পরায়ণতা। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যেত যে তা ছিল অগভীর, কিছু পরিমাণে কৃত্রিম, বাস্তব বিচারে বহুদিক থেকেই জীবনসত্যের পরিপন্থী—কিন্তু কতকটা পশ্চিমের 'পিউরিটন' ধারার মতো এটা বোধ হয় ছিল উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী মনে ব্যাকুল অথচ কুণ্ঠিত আত্মচেতনার অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক।

'সদা সত্য কথা' বলবে, দুরন্ত না হয়ে সুশীল হবে, খেলাধুলো, হৈ-চৈ ইত্যাদি খারাপ নয় তবে ও-সব ব্যাপারে মাত্রাধিক্য ঘটেই থাকে, সুতরাং সাবধান হয়ে থাকো, ওদিকে না গেলেও ক্ষতি নেই, বরঞ্চ পড়াশুনায় মন দিতে পারার দাম ঢের বেশি— এধরনের কথা কেউ না বললেও যেন চিন্তায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাড়িতে খেলাধুলা বা আমোদ-প্রমোদের সরঞ্জাম প্রায় ছিলই না। পানটা রোজ সাজা হত বটে, কিন্তু তামাক, সিগারেট, বিড়ির পাট ছিল না বাড়িতে— লুকিয়ে কেউ খেত বলেও জানতাম না। একেবারে সহজ ও নির্দোষ তাসের খেলা কেউ কেউ জানত কিন্তু তাস-পাশার কোনো আয়োজন ছিল না। দাবা একটু-আধটু দেখেছি, কিন্তু তা নিয়েও উৎসাহ দেখি নি, যদিও শুনতাম ওতে মস্তিষ্কের কাজ খুব আছে। ক্যারম খেলা থেকে থেকে চলেছে, সব ভুলে খেলায় মেতে থাকার সুযোগ ক্বচিৎ কদাচিৎ এসেছে, কিন্তু বেশি নয় একেবারে। গান বাজনার রেওয়াজ বাড়িতে তেমন ছিল না— বরঞ্চ কেমন যেন সবাই বিরক্ত হতেন পাশের বাড়ি থেকে সখের অভিনয়ের মহড়ার আওয়াজে কিম্বা 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি' অথবা 'বাগ্‌দিনী সাজ সেজে চল্ মা আমার সঙ্গে চল্' গানের শব্দে। শুনতাম অবশ্যই 'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা'র মতো বাক্য ; আগেকার যুগের প্রকাণ্ড চোং-ওয়ালা গ্রামোফোনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগ্নী অমলা দাশের গানও শুনেছি ; বোনদের অল্প একটু সেতার শিক্ষা দেওয়ারও আয়োজন তখন হতে দেখেছি— কিন্তু ও-সব ব্যাপারে কেমন যেন একটা উপেক্ষা না হলেও অমনোযোগ ছিল, তাচ্ছিল্য না হলেও অসাড় ভাব ছিল। একটু আশ্চর্য লাগে কারণ এই সদাচারসর্বস্ব গুরুজনরাই বলতেন, 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী', অথচ আবৃত্তির মর্মবস্তু হল ছন্দ, হল সুর আর লয় আর তান। যাই হোক, সংগীতের কল্পলোক থেকে নির্বাসন তো অধিকাংশ মানুষেরই বিধিলিপি। তবে কখনো ভুলব না ছেলেবেলায় শোনা, মৃদুস্বরে গাওয়া গান "দারুণ অগ্নিবাণে" আর "তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে" ; গেয়েছিলেন আমার (পিসতুতো) দিদির স্বামী নলিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি খ্যাতনামা অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে একত্র 'আনন্দ পরিষদ' নামে এক অ্যামেচর সংস্থায় বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন, অকালমৃত্যু যাঁকে তাঁর প্রাপ্য খ্যাতি থেকে বঞ্চিত করেছে।

একটু গুরুগম্ভীর হলেও আমার ছেলেবেলার জগৎ যেন বেশ কতকটা বিস্তৃত ছিল ; আমার গতায়াত ঘটল, দৃষ্টিপাত হতে পারল এমন সব ক্ষেত্রে যেখানে আমার বয়সীদের প্রবেশাধিকার নেই। বাড়িভরা বই আর সাময়িক পত্র আমাকে একটু হয়তো অস্বাভাবিক ভাবেই টেনেছিল— সেখানে দেখতাম 'ভারতী' 'সাহিত্য' 'মানসী' (পরে 'মানসী ও মর্মবাণী') 'প্রদীপ' ইত্যাদি নানা বাঁধানো সম্ভার। 'বঙ্গদর্শন' ও 'আর্যাবর্ত' 'সাধনা' প্রভৃতিও দেখেছি, তবে কিছুটা অসম্বদ্ধ অবস্থায়। সঙ্গে সঙ্গে দেখতাম 'নারায়ণ' যাতে চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় লিখতেন বিপিনচন্দ্র পাল, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রমুখ অনেকে যাঁরা আজ বিস্মৃত— প্রায় যেন অপর পাল্লায় ছিল 'সবুজ পত্র', স্বয়ং বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) ছিলেন যার কর্ণধার, রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রায় লিখতেন, আর লিখতেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিদগ্ধ জন। 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' কিছু পরে 'মাসিক বসুমতী', আরো পরে 'বঙ্গবাণী' 'বিচিত্রা' প্রভৃতি সাময়িকীয় সঙ্গে পরিচয় অপরিণত বয়সেই আমার শুরু হয়েছে। বুঝি বা না বুঝি, ক্রমাগত এ-ধরনের জিনিস দেখেছি এবং যথাসাধ্য পড়েছি। মনের গড়নে নিশ্চয়ই কিছু ছাপ ফেলেছে অধুনা-বিস্মৃত মহাভাগ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত *Dawn* Magazine-এর পুরোনো সংখ্যাগুলো— কখনো ভুলব না পুরোনো বাঁধানো *Modern Review*-এ (সম্ভবত ১৯০৮ সালে) দুই বিশিষ্ট অধ্যাপক হীরালাল হালদার এবং জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিতর্ক— হালদার মহাশয় পাশ্চাত্য সভ্যতার এবং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচ্য সভ্যতার উৎকর্ষ প্রমাণ করতে চাইছিলেন। আজও মনে গেঁথে রয়েছে জিতেন্দ্রলালের (জে. এল. ব্যানার্জি নামে ইনি শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন) উদাত্ত নাদ : "Great in the greatness of her adversity, splendid even in the misery and desolation of her age, radiant with a light which is not of this world, what cares she [India] for the ephemeral dominance which the mushroom nations of yesterday perk and flaunt before her eyes ?" দেশাভিমান উদ্রিক্ত করেছিলেন ঐ বয়সে অভিভূত করার মতো বাক্‌মহিমায় : "Rome has gone, gone with her legions,

her eagles, her cohorts, her world-empire. Babylon the great, Babylon the mighty, even she has tumbled on the desert dust, and over her grave the lonely cicada sings her dirge of funereal grief. But India remains…" উদ্ধৃতি অতিরিক্ত হয়ে গেল কিন্তু সবই উদ্ধার করছি স্মৃতি থেকে, হাতের কাছে কোনো দলিল নেই। ভুলচুকও হতে পারে, তবে দিলাম বোঝাবার জন্য যে অল্পবয়সেই দেশাভিমান আর গভীর চিন্তার ভার এসে মাথায় ঢুকছিল সন্দেহ নেই— তাকে আত্মস্থ করার শক্তি কখনো হল কিনা তা ভিন্ন কথা।

*　　*　　*

মনের মধ্যে একটা নিরুত্তাপ কালাপাহাড় হয়তো ছিল, নইলে ধর্ম-বিশ্বাসী হয়ে উঠলাম না কেন, জানি না। হিন্দুর পূজাপার্বণের সঙ্গে পরিচয়ের কোনো কমতি হয় নি— রামায়ণ-মহাভারত আর পুরাণ-আখ্যান ইত্যাদি নেহাত কম পড়া হয় নি— বাংলা তরজমা-সমেত সবকটা উপনিষদ্ যে-কোনো সময়ে দেখতে পাওয়া কিছু কঠিন ছিল না— অনুষ্ঠানের বাহ্যিক সৌন্দর্য (যাকে বহুকাল পরে সুন্দরভাবে বর্ণিত হতে দেখেছি সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ ধর্মযাজক আর্চবিশপ Laud-এর ভাষায় : "the beauty of holiness") আর মন্দির-মসজিদ-গির্জার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের অনির্বচনীয় গরিমা প্রথম থেকে মনকে টেনেছে, আজও টানে— কিন্তু চিন্তার দিক থেকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ঘোষণাকে অভিবাদন করতে কিম্বা 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে'-র মতো অজর আহ্বানের মহিমা অনুভব করতে অপারগ না হয়েও ধর্মের তত্ত্ব ও আনুষ্ঠানিকতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চলতে পেরেছি। জীবনের অর্থ কী, এই যে প্রশ্ন নিয়ে পোলাণ্ডের যশস্বী দার্শনিক আদম শাফ্ প্রমুখ অনেকে গভীর চিন্তায় ব্যাপৃত থেকেছেন, তার পূর্ণ সদুত্তর নিজের কাছে রাখতে পেরেছি কি না জানি না— কিন্তু তদ্‌ব্যতিরেকেই নিরর্থক নয় এমন জীবনযাত্রার মানসিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পেরেছি বলে দাবি একেবারে অযথার্থ নয়। দর্পের কথা কিছু নয়, কারণ বহুজনই আমার পথের পথিক— কিন্তু জগৎপাতার উপর নির্ভর আমাদের নেই, ভাগ্যসন্ধানে গ্রহতুষ্টির চিন্তা আমাদের নেই, সততা ও বিবেকের অঙ্গীকারস্বরূপ অলৌকিক কোনো বিশ্বাসের প্রয়োজন আমাদের নেই— প্রকৃতি ও পুরুষের বাস্তব

লীলাক্ষেত্র এই জঙ্গম, পরিবর্তমান বিশ্বে মনুষ্যজন্মের সার্থকতা লোকায়ত দর্শনে স্বয়ংসিদ্ধ।

ভাদ্রোৎসব আর মাঘোৎসব উপলক্ষে দাদুর সঙ্গে প্রতি বৎসর বেশ কয়েক দিন ধরে নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে গিয়েছি, উপাসনা শুনেছি, কীর্তনে মাতোয়ারা হয়ে বয়স্ক লোককে নাচতে দেখেছি, কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে সুর করে টেনে বলা মন্ত্র : 'অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে আলোকে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও ; হে সত্যস্বরূপ'। এই টেনে বলার মধ্যে হাসির উপাদান থাকলেও মন্দিরে দণ্ডায়মান মন্ত্রোচ্চারণকারীরা অবশ্য হাসতেন না— ছন্দপতন নিবারণের জন্যই 'সত্যে-তে' এবং অমৃতে-তে'-র মতো বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে বটে,' কিন্তু এই হল মন্ত্র তরজমার মুশকিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে একবার মাত্র গিয়েছি— মনে আছে সেদিন গান হয়েছিল 'অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে' নারীকণ্ঠে, যা যতদূর মনে পড়ে নববিধান সমাজে অন্তত তখন নিষিদ্ধ ছিল। আমার দাদু কেশবচন্দ্র সেনের দারুণ ভক্ত ছিলেন, প্রায় তাঁকে অবতার বলে ভাবতেন, তাঁর অতুলন বাগ্মিতার কথা বারবার বলতেন, একবার বোধ হয় তাঁর বাসভবন 'কমলকুটীর'-এ (যেখানে ভিক্টোরিয়া ইন্স্টিটিউশন এখন রয়েছে) নিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন প্রতিবৎসর একদিন কেশবচন্দ্র গৃহভৃত্যদের সমাদর করতেন, যারা প্রতিদিন সেবা করছে তাদের সেবা প্রভুর পক্ষেও কর্তব্য এ কথা বোঝাতে চাইতেন— কেশব-মাহাত্ম্যের আরো বহু বিবরণ তখন শুনেছি। পরে বড়ো হয়ে সমালোচকের দৃষ্টিতে তার বেশ-কিছু গ্রহণীয় মনে করতে পারি নি, কিন্তু ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের বিবিধ ও বহুমূল্য অবদানের প্রকৃত বিচার না দেখতে পেয়ে ক্লিষ্ট বোধ করেছি। 'আচার্যের উপদেশ' বহুখণ্ডে বাড়িতে ছিল ; কেশবচন্দ্রের সরল, স্বচ্ছ, ঋজু গদ্যরীতি (যা সম্ভবত 'সুলভ সমাচারে' রূপায়িত হত) সে যুগে অদ্ভুত কৃতিত্ব মনে হয়েছে। বাঙালী ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রতিভার অপ্রতুল কখনো ঘটে নি, কিন্তু রামমোহন রায় বা কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে মরমী অথচ তীক্ষ্ণধী বাঙালী আলোচনা আজও চোখে পড়ল না।

'ফুটন্ত ফুলেরই মাঝে, দেখি যে মায়ের ছবি'—এটা বোধ হয় কেশব-চন্দ্রের একটি গান, 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল মনে আছে। আশ্চর্য

লাগে যে অসংখ্য গানের রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (‘ত্রৈ-না-সা’) আজ আমাদের কাছে বিস্মৃত, অথচ ব্রহ্মসংগীত রচনায় এমন প্রতিভাধর আর কোথায়? সম্প্রতি বাংলা গানের এক সঞ্চয়নে দেখলাম তাঁর দু-একটি মাত্র গান রয়েছে, পরিচয় বর্ণনা প্রায় নেই। কেমন যেন আঘাত বোধ করি এ-ধরনের ঘটনায়; বাংলা গানের বিবরণে ‘ত্রৈ-না-সা’র অনুল্লেখ বরদাস্ত হয় কি ভাবে? নববিধান সমাজে উৎসবের পরিসমাপ্তি উপলক্ষে নগর সংকীর্তনে উপস্থিত থেকেছি বালক বয়সে— জয়ঢাক শিঙা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছি, শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী চৌতালায় গান হয়েছে সর্বসমক্ষে: ‘ভুবনবিজয়ী নামে, চলে যাব শান্তিধামে, ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্, কি ভয় কি ভয়?’ বহুকাল পরে গণনাট্য আন্দোলনের উদ্যমে সমবেত সংগীতের সময় আমার মন মাঝে মাঝে ফিরে গেছে সেই নগর সংকীর্তনের দিনগুলিতে। ব্রাহ্ম বন্ধুদের বিশেষ করে প্রশ্ন করতে মন যায় —হয়তো বর্তমানে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রাথমিক আবেগ ও জীবন-প্রাসঙ্গিকতা আর নেই, কিন্তু সে-বিষয়ে আলোচনা কোথায়? কোথায় সেই বিশ্লেষণ যা থেকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো তেজস্বী এবং বিপিনচন্দ্র পালের মতো বহুগুণান্বিত মেধাবীর জীবনে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মেতর পর্যায়ের অর্থোদ্গম হতে পারে, কোথায় মিলবে সুস্পষ্ট চিন্তার অক্ষরে ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল্যায়ন?

ছোটো বয়সেই দাদুর সহচর হিসাবে বহুবার গিয়েছি গীতা সভায়, যার সম্পাদক আমার বাবা অনেক বৎসর ধরে ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে এই সভার উদ্যোগে ‘ক্লাস’ হত, যেখানে বর্ষীয়ান্ ভক্তেরা (অধিকাংশই মধ্য-কলকাতার সুবর্ণ বণিক) শুনতেন পণ্ডিতপ্রবর খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর ব্যাখ্যা। ঠিক স্কুল শিক্ষকের মতোই তিনি মাঝে মাঝে টেবিল চাপ্‌ড়ে সবাইকে শান্ত হয়ে শুনতে বলতেন, মৃদুস্বরে উচ্চারিত হলেও তাঁর কথা একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছুটে যেতে পারত, সহজ ও শান্তিপ্রদ হত না কি সেই বিশ্লেষণ। তাঁকে এবং দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মতো মহামহোপাধ্যায়কে আমাদের বাড়িতেও দেখেছি— তবে শুনতাম যে ‘শাস্ত্রী মশায়’-এর মতো গীতার ব্যাখ্যাকর্তা কেউ নেই। এ-বিষয়ে আমার মতামত গঠনের অবস্থা তখনো হয় নি। তবে

অনেক শ্লোক আপ্‌না থেকে জানা হয়ে যেত, আর বিশেষ উৎসব উপলক্ষে গান (প্রধানত কীর্তন) শোনা ছিল এক লাভ। পরিষ্কার মনে আছে এক-বার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বঙ্গবাসী কলেজের এক হলে দীনেশ ভট্টাচার্য নামে কীর্তনীয়া গাইলেন : 'সেদিন যেমন এসেছিলে প্রভু, আর কি তেমন আসবে না? সেদিন যেমন মা বলেছিলে, আর কি তেমন ডাক্‌বে না?' ঐ গায়কেরই অনিন্দ্য কণ্ঠে শুনেছিলাম ; 'এসেছে ব্রজের কানা, কালো সোনা, দেখবি আয়— রং ফিরেছে, ঢং ফিরেছে, কালো এখন চেনা দায়!' কলেজে পড়ার সময় সুগায়ক বন্ধু সুশীলকুমার দে-কে (পরবর্তী জীবনে আই. সি. এস. কর্মচারী রূপে খ্যাত) এই অভিজ্ঞতার কথা বলায় সুশীল উৎসাহিত হয়ে ওঠে, কিন্তু তখন আর দীনেশ ভট্টাচার্যের কোনো সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় নি।

সর্ব ধর্ম আর বিবিধ বিশ্বাসের সমন্বয়-ব্যাপারে হিন্দুমনের যে-ব্যুৎপত্তি তার সঙ্গে এভাবে ছেলেবেলাতেই পরিচয় হয়েছিল। বাড়িতে বিপুলকায় এক বাইব্‌ল্ তো ছিলই— যার পাতার মধ্যে দু-একটা শুকনো ফুল রেখে দেওয়া ছিল, আর বোধ হয় বাড়িতে নবজাতকের সংবাদও লিখে রেখে দেওয়া হত। বাবার লাইব্রেরিতে ধর্ম, দর্শন, ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ ছিল— ইসলাম সম্বন্ধে আমীর আলীর বইগুলি বেশ মনে আছে, পরে পড়েছি খুদা বক্স নামে এক বিদ্বানের ইসলামী সভ্যতা বিষয়ক মনোহর রচনা (এই অবাঙালী পণ্ডিতকে আমাদের বাড়িতেও দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি এক-জন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন)। আগেই বলেছি বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভায় আমাদের নিয়মিত যাতায়াত এবং বাঙালী বৌদ্ধদের সঙ্গে (বিশেষত ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়ার মতো গবেষকদের সঙ্গে) আমাদের পরিবারের সৌহার্দ্য ; আরো মনে পড়ে, মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ অনাগরিক ধর্মপাল বাড়িতে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন ; বাবার মৃত্যুর (১৯৩৮) পর থেকে ধর্মপালের পুত্র দেবপ্রিয় বলিসিংহ প্রমুখ মহাবোধি সোসাইটির নায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে যায়। যাই হোক্, 'যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি' শেখার সঙ্গে শিখেছি 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি,' শিখেছি 'নমো তস্‌সো ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌সো'—যা শুনে ১৯৪৪ সালে প্রখ্যাত সিংহলী চিত্রকর জর্জ কীট্ (Keyt) উত্তেজিত হয়ে আমাকে বোম্বাইয়ে জড়িয়ে ধরেছেন, ১৯৬৫ সালে

মোঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান্ বাটর্-এ বৌদ্ধমঠাধিপতির সৌম্য বদন স্নিগ্ধ হাস্যে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে, আমাকে দেখিয়েছেন নাগরী হরফে খোদাই করা মঠের প্রকাণ্ড দরজায়ঃ 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'।

* * *

গোঁড়া হিন্দু যে আমরা ছিলাম না তার একটা প্রমাণ হয়তো এই যে দাদু কিম্বা মা আর বাবা কোনো 'গুরু'র কাছে 'মন্ত্র' নেন নি, যদিও গুরুবংশ একটা আমাদের ছিল যার প্রতিনিধি নৈহাটি-নিবাসী পণ্ডিত রামসহায় বেদান্ততীর্থ কবিতার বই ছাপিয়েছিলেন (যা ডাঁই করা অবস্থায় আমাদের বাড়ির তাকে বহুকাল ছিল) আর সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত মানুষ হিসাবে যখনই আসতেন, তারস্বরে বাবা ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্য, কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-স্মৃতি আর অন্যান্য হাজার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতেন। দাদুর একটা উপাধি ছিল 'সাহিত্যনিধি', বোধ হয় ভারত ধর্মমহামণ্ডলের দেওয়া—মণ্ডলাধিপতি ছিলেন দারভাঙ্গার (দ্বারবঙ্গ) মহারাজা রামেশ্বর সিং, যাঁর দানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্ট হয়েছিল আর বিদ্যোৎসাহী বলে খ্যাতিতে ইংরেজরাজের ভক্ত বলে যার অখ্যাতি কতকটা ঢাকা পড়েছিল (এঁর পুত্র, কামেশ্বর সিংয়ের উপনয়ন উপলক্ষে দাদু অন্যান্য বহু বিশিষ্ট বাঙালীর সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়ে দারভাঙ্গা গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন আমার অগ্রজ (পরে কলকাতায় চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট) এবং হাতী চেপে যাওয়া যে কী লোমহর্ষণ (প্রায় আক্ষরিক অর্থে!) ব্যাপার তা জেনেছিলেন—পরবর্তী কালে রাজ্যসভাসদস্য রূপে কামেশ্বর সিংয়ের সৌহার্দ্য পেয়েছিলাম ১৯৫২ সালে)। বাবা 'বিদ্যাবারিধি' উপাধি পেয়েছিলেন নবদ্বীপের বিবুধজননী সভা থেকে—আজকাল এ-সব কাণ্ডের রেওয়াজ নেই, দামও তেমন নেই, কিন্তু তখন ছিল। আর হয়তো পরাধীন জীবনের বিবিধ বঞ্চনা থেকে কিঞ্চিৎ নিস্তারের আশাতেই সাহিত্যের মতো বস্তু নিয়ে মেতে থাকার অভ্যাস একটু সহজে আয়ত্ত হত। দাদুর মন তথ্যানুগ ছিল বেশি—একবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে—২৪ পরগনা সাহিত্য সম্মেলনের শাখা সভাপতিরূপে অভিভাষণে ঐ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু খ্যাত-অখ্যাত লেখকের বিষয়ে যে বক্তৃতা তিনি করেন তা বাস্তবিকই মহামূল্য। কলকাতায় এক সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে বাবা সুপ্রাচীন তালতলা

লাইব্রেরি ভবনে তাঁর বক্তৃতায় যেন অন্য ধরনের মানসিকতার পরিচয় দেন— সাহিত্যরসগ্রহণকে "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর" বলে উল্লেখ করেন "যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ, শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ, ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন", সেই পরম রূপদক্ষের কথা, শিল্পে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা সন্ধানের প্রয়াস করেন। স্বভাবতই আমাদের বৈঠকখানায় সাহিত্যপাগলদের ভিড় কিছুটা হত। এঁদের মধ্যে ছিলেন হালিশহরবাসী প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; 'সাহিত্যরত্ন' আর 'প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ' এই দুই উপাধি নিয়ে তাঁর বেশ একটু দুর্বলতা ছিল, তিনি পূর্বোক্ত সৎসঙ্গ সভার প্রতিষ্ঠাতা। এর অধিবেশন পালা করে বন্ধুদের বাড়িতে বসত (আমাদের বাড়িতেও হয়েছে), যেখানে সাহিত্যের চেয়ে ধর্মপ্রধান আলোচনাই বোধ হয় বেশি হত। সেখানে শুনেছি চট্টগ্রামের কবি জীবেন্দ্র-কুমার দত্তের আবৃত্তি ও গান— বিশেষ করে মনে আছে "আমার মেটে ঘরে শ্রীবৃন্দাবন— ডাকছে শালিক, ডাকছে টিয়ে, হরি করবেন আগমন"।

সাহিত্য আর বিদ্যাচর্চার একটা আবহাওয়া আমাদের বৈঠকখানায় যেন জড়িয়ে থাকত যার ছোঁয়াচ থেকে খুব দূরে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। হয়তো কোনো একদিন 'ক্যালকাটা লিটরারি সোসাইটি' নামে এক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্যামলাল দে (শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত এই মানুষটির মূর্তি দেখে মনে আসত ছবিতে দেখা রাজনারায়ণ বসুর চেহারা) বসে আছেন— অদ্ভুত এই ভদ্রলোক, সভাসমিতি নিয়ে মাতোয়ারা, সোসাইটির পক্ষ থেকে দেশবিদেশের কেষ্টবিষ্টুদের চিঠি লেখা আর জবাব আনা নিয়ে ব্যস্ত; মাথায় তাজ পরে লাটবেলাটকে (এবং কয়েকজন ভারতীয় হোমরা চোমরাকে) নিয়ে যা হোক একটা সভা ডেকে ছবি তোলাতে পটু; সাহিত্য বিষয়ে কাজ হোক বা না হোক, সাহিত্যের নামে কয়েকটা মিটিং করার জন্য পৈত্রিক যৎসামান্য সম্পত্তি উড়িয়ে দিতে এবং নিজের সংসারের দিকে বিন্দু-মাত্র দৃষ্টিপাত না করতে সর্বদা প্রস্তুত। শ্যামবাবু হয়তো কোনো মিটিঙের প্ল্যান করছেন এমন সময় এলেন হাবড়া থেকে দুর্গাদাস লাহিড়ী (যাঁকে নিজের পত্রিকাতেই পূজনীয় বলে বর্ণনা করা হত।) যিনি অন্যান্য বহুবিধ কর্মের মধ্যে ছিলেন বহুখণ্ডে প্রকাশিত "পৃথিবীর ইতিহাস"-এর সম্পাদক— প্রায়ই সঙ্গে থাকতেন পণ্ডিত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ, যাঁর একমাত্র নেশা ছিল কালিদাস বাঙালী ছিলেন প্রমাণ করা এবং সেজন্য রচনা ও বক্তৃতা মারফৎ অবিরাম

চেষ্টা করে যাওয়া। হয়তো এরই মধ্যে এসে পড়লেন পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর— বেশ গোটাকয়েক উদ্ভট শ্লোক আউড়ে আবহাওয়া হালকা করে দিলেন। এরই মধ্যে সম্ভবত এসে হাজির হলেন কবি মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী (একদা যিনি প্রচুর কবিতা লিখতেন এবং ছাপাতেন, এমন-কি, এক ইংরিজী বই ***Pulsations***, যার জোরে নোবেল্ প্রাইজ্ পাওয়ার কল্পনা মনে ঢোকাতেও কসুর করেন নি)। মুনীন্দ্রবাবুর সঙ্গে বাবার হৃদ্যতা ছিল, আর তখন তিনি থাকতেন শাঁখারিটোলায়, আমাদের বাড়ির কাছে— শরীর চর্চা করতেন চমৎকারভাবে, রোজ গঙ্গাস্নান (বহুক্ষণ সর্ষপতৈল মর্দনের পর) ছিল তাঁর অভ্যাস, হেঁটেই গঙ্গাতীরে যেতেন আর মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি ঘুরে যেতেন। আমাদের তালঠুকে দেখাতেন শরীরের পেশী, বাহুর গুলি ফুলিয়ে বলতেন, 'ছুঁয়ে দেখ্, কেমন পাথরের মতো শক্ত!' এই সর্বাধিকারী পরিবারে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মেছেন— রাজকুমার, সূর্য-কুমার, সত্যপ্রসাদ, দেবপ্রসাদ, মুনীন্দ্রপ্রসাদ, সুরেশপ্রসাদ, সুশীলপ্রসাদ। "আমরা প্রসাদ, প্রসাদপুরে, প্রসাদ সবার ভিক্ষা করি" লেখেন মুনীন্দ্রপ্রসাদ, যখন অগ্রজ দেবপ্রসাদ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চান্স্‌লর ও অন্যান্য ভূমিকায় যশস্বী) সুরী লেনে নবনির্মিত বাসগৃহের নাম দেন 'প্রসাদ-পুর'। প্রতিবেশী হলেও এই দেববাবুকেই উপহাস করা হয় 'জেলেপাড়ার সং'-য়ে (যা ছিল তখনকার এক বিশিষ্ট বার্ষিক আমোদের ঘটনা)—দেব-বাবু ভাইস্‌চান্স্‌লর থাকার সময় কয়েকবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস (তাঁর প্রতিপক্ষ, স্বয়ং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুচরদের এ কাণ্ডে জড়িত থাকা নিয়ে কাণাঘুষো তখন চলেছিল) হয়ে যায় আর সং-এর একটি গানে শুনেছিলাম : 'কোন্ দেবতার প্রসাদ তুমি, ভাইস্‌চান্স্‌লার?'

বাবার বন্ধুদের মধ্যে ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্র মাঝে মাঝে এসে আমাদের সবাইকে ডেকে কথা বলতেন ; কারো অসুখবিসুখে সবার আগে আসতেন তিনি, দরকার হলে বারবার এসে দেখতেন, সময়ের হিসাব থাকত না— কথা বলতেন তাড়াতাড়ি, নিজের প্রতিষ্ঠিত সমাজসেবাসংঘ (যা আজও টিম্‌টিম্ করে দীনেন্দ্র স্ট্রীটে রয়েছে) সম্বন্ধে বলতেন, আর মাঝে মাঝে বিদেশ যেতেন (১৯৩২ সালে বোধ হয় আমার সঙ্গে অক্সফর্ডে তিনি দেখা করেন), ফিরে কত কথা শোনাতেন, কাগজপত্র দিতেন (১৯২৮-২৯ সালের

সোভিয়েট সম্বন্ধে কাগজ তাঁর কাছে দেখেছি)। প্রায় প্রতিদিন আসতেন রবীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক, যাঁর গোটা পরিবার ছিল প্রচণ্ড 'সাহেব', বহুদিন ইংলণ্ড-বাসের ফলে পোষাকে-আষাকে প্রায় ইংরেজ। ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালিয়ন্ প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী (এবং উচ্চারণ ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্), ইনি এত নিকট ছিলেন আমাদের যে মেঘলা দিনে আমরাও তাঁকে বলতে পারতাম: 'আজ তো আপনার 'home' weather', আর তিনি হেসে বলতেন, 'ঠিক্ তো'। এঁর কাছে বিলাতযাত্রার পূর্বে ফরাসী আর জার্মান ভাষায় আমার হাতে-খড়ি, আর আমি জানি জীবনে অনেক ধাক্কা খাওয়া সত্ত্বেও এই দীর্ঘকায় মানুষটি লেখাপড়া সম্বন্ধে শিশুর মতো সরল শ্রদ্ধা পোষণ করে চলতেন, সাহিত্যের জটিলতা থেকে দূরে বসে ভাষার যথাসাধ্য চর্চা করতেন (বিশ্ববিদ্যালয়েও বহু বৎসর পড়িয়েছেন), আর ইংরিজীনবিশ হয়েও লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজের মধ্যে এক নিছক্ বাঙালী প্রাণ, যার দুর্বলতাও প্রকাশ পেয়ে যেত জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে এক অদ্ভুত মোহের মধ্যে। আমরা যখন বেশ বড়ো হয়েছি, তখন আর-এক বর্ষীয়ান্ বিদ্বান্ প্রায় প্রত্যহ আমাদের বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে গল্প করতেন; ইনি হলেন পাটনা কলেজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরিজী ভাষা এবং নির্ভুলভাবে ইংরিজী লেখা, এ ছাড়া আর কোনো নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা তাঁর ছিল মনে হয় না; শুধু জওয়াহরলাল নেহরু কেন, মায় বার্নার্ড শ-র ইংরিজীতে ভুল আবিষ্কার করা ছিল তাঁর নেশা ('অন্যে পরে কা কথা'?)। অজস্র ইংরিজী কবিতা এঁর মুখস্থ ছিল— মনে আছে মাঝে মাঝে আওড়াতেন Wordsworth-এর কতকগুলো পঙ্‌ক্তি যাতে নাকি বেদান্তচিন্তার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে!

বাড়িতে মাঝে মাঝে ছেলেবেলায় দেখেছি সুরেন্দ্রনাথের সহোদর ভ্রাতা ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ইনি সে যুগে বাঙালির যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন প্রচেষ্টায় প্রমুখ ছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে তাঁর পালোয়ানী চেহারা, একেবারে ছোটো করে ছাঁটা চুল, প্রায়-সামরিক সাহেবী পোষাক— দেখলেই বলতেন শরীর চর্চা করো, আর কিছু চাই না। দেখেছি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে, যিনি বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন— তবে তাঁকে খুব বেশি দেখেছি খাস্ বসুমতী অফিসে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় আসতেন, বই-

কাগজ দিয়ে যেতেন, রাজ্যের গল্প করতেন, তবে তখনো তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা ঘটাবার মতো অবস্থায় ছিলাম না (যা পরে ঘটানো গেছে, পবিত্রবাবুর চরিত্রের অসামান্য সারল্যের কল্যাণে)। বাবা সাংবাদিক বলে বহু বিখ্যাত ব্যক্তিও পদার্পণ করতেন আমাদের বাড়িতে— মনে আছে একবার এসেছিলেন মনীষী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন্। ঠিক জানি না, সম্ভবত বক্তৃতা লিখিয়ে নেওয়ার জন্য এসেছেন তৎকালীন মামুদাবাদের মহারাজা, যখন আমাদের বয়স যথেষ্ট কম। বর্ধমানের বিজয়চাঁদ মহতাব-এর সঙ্গে বাবার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল— যেটা জানলাম বাবার মৃত্যুর পরে, শ্রাদ্ধবাসরে সর্ব-প্রথম এসে হাজির হন তিনি। তবে ঢের বেশি মনে পড়ে একজন মানুষকে, যিনি ছিলেন স্কুলের সামান্য শিক্ষক, কিন্তু বাবার সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের সীমাপরিসীমা ছিল না। নিবারণবাবু রবিবার সারাদিন থাকতেন আমাদের বাড়ি, সকলের কাছে উনি 'মাস্টার মশাই', উচ্চকণ্ঠে আলোচনা ছিল তাঁর স্বভাব, সাহিত্য, বিশেষত কবিতা ছিল তাঁর দিবারাত্রির ধ্যান। একক জীবন যাপন, স্বপাক আহার, সম্পূর্ণ স্বাবলম্বন ছিল তাঁর অভ্যাস, অথচ মনের মধ্যে মমতার অন্ত ছিল না। তাঁর কাছে শুনতাম কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কথা, শুনতাম দেবেন্দ্রনাথের গৃহে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আসতেন তালতলায়, ছ্যাকড়া গাড়ী চড়ে ধুতি চাদর পরে— ভাবাই শক্ত মনে হত। কবিতা আবৃত্তি করতেন তিনি মহানন্দে, বিশ্লেষণে পটু ছিলেন না একটুও, কিন্তু কবিতার চেয়ে গরীয়সী যে কিছু নেই দুনিয়ায় এটা অন্যের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা রাখতেন। খর্বকায় হয়েও চেহারায় তাঁর ছিল এক বিশিষ্ট ঋজুতা; ঘরে গামছা পরে নিজের কাজকর্ম সেরে পথে বেরুতেন ধোপ্‌দস্ত্ ধুতিপাঞ্জাবী পরে, কাঁধে রেশমের (বা পশমের) চাদর পরিপাটী করে পাতা, পায়ে চক্‌চকে বার্নিশ করা জুতো। স্কুলে নাকি খুব কঠোর, কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে ছিলেন একান্ত স্নেহশীল, অথচ অন্যায়কে সহ্য করতে সর্বদা অস্বীকৃত। আমাদের বাড়িতে দেখেছি অমরেন্দ্রনাথ রায়-এর 'রবিয়ানা' নামে শ্লেষে ভরা লেখা, কিন্তু মনের আকাশ ছেয়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ; শুনেছি, কণ্ঠস্থ করেছি তাঁর অগণিত কবিতা, আর মাস্টারমশাইয়ের মতো মানুষের নৈকট্য থেকেই বুঝেছি কাব্যের অনির্বচনীয়তা (যার প্রথম, পরম আস্বাদ আমরা পাই রবীন্দ্রনাথে, অন্যত্র নয়)। আমার

কাছে তাই অপ্রত্যাশিত ছিল না যখন বহু বৎসর পরে দেখলাম মাস্টার-মশাই স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে'র মতো কবিকে শুধু গ্রহণ করছেন না, গভীর অভিনন্দন জানাচ্ছেন, এবং তাঁরাও এক অপরিচিত, বয়োবৃদ্ধ, সামান্যজনকে শ্রদ্ধা দিতে কার্পণ্য করছেন না। এ অবশ্য বহু পরের কথা— তবে এখানে শুধু স্মরণ করছি যে আপাত-তুচ্ছ জীবনের আচ্ছাদন ভেদ করে আমার এই পিতৃবন্ধুর চারিত্র্য প্রকট হওয়ার মধ্যে এক প্রকৃত অসামান্যতা যেন ছিল।

৭

বারো বছর বয়সে চশমা নিয়ে দুনিয়ার চেহারা একটু স্পষ্টভাবে দেখতে শুরু করেছি। কিন্তু শরীর আর মনের দ্বিবিধ চাপেই বুঝি অভ্যাস এমন হয়ে গিয়েছিল যার ফলে আজ পর্যন্ত বনের গাছগুলোর চেয়ে গোটাবনকে দেখাই আমার চোখের কাছে সহজ আর মনের কাছে অনুকূল। তেরো বছর পূর্ণ হতে মাস সাতেক যখন দেরি তখন পৈতে হল— অনুষ্ঠানে ত্রুটি হয় নি, দাদু শিখিয়ে দিলেন সন্ধ্যা আহ্নিকের পদ্ধতি, বেশ মুখস্থ হয়ে গেল সব মন্ত্র, কিন্তু সকাল এবং সন্ধ্যায় কোশাকুশি নিয়ে বসার পরীক্ষায় একবৎসর লেগে থাকার কিছু আগেই ভঙ্গ দিলাম। 'ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বস্তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।' এই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে পুণ্য অর্জনের লোভ বিনা ক্লেশে সংবৃত হয়ে গেল কারণ দ্বিজত্বপ্রাপ্তি অর্থাৎ নবজন্ম লাভ ঘটল ১৯২০ সালের চাঞ্চল্যকর পার্থিব ঘটনার আঘাতে। পারমার্থিক বিষয়ে আগ্রহের অব কাশ রইল না, শুধু থেকে গেল সংস্কৃতের ধ্বনিগৌরব নিয়ে গর্ব আর ভারতবর্ষের অপরিমেয় ঐতিহ্যের মায়া। সাংবাদিকতার পরিবেশে সাময়িক ঘটনা সহজে অভিভূত করতে পারে না, কিন্তু ১৯২০ থেকে আরম্ভ হল যে অধ্যায়, তাতে বারবার শুধু বিচলিত নয়, অভিভূত হওয়ার কারণও যথেষ্ট দেখা দিতে থাকল। তখনই ঘটেছিল পূর্ণ তেজে ভারতগগনে গান্ধীজীর অভ্যুদয়। ১৯১৯-এ যার সূচনা পরবৎসর তার ব্যাপ্তি— নজরুলের ভাষায় "কোন্ পাগল পথিক ছুটে এল বন্দিনী মা-র আঙিনায়, ত্রিশকোটি লোক সকল ভুলে গান গেয়ে তার সঙ্গে যায়!" আমাদের বোধোদয়ের সেই যুগের মন-মাতানো চেহারা ভুলব কেমন করে?

১৯২০ সাল আরম্ভ হল একটা খট্‌কা তুলে, যার জের আজও মনের মধ্যে খচ্‌খচ্ করে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ভালো করতে হলে হেয়ার বা হিন্দু স্কুলে আমার পড়া দরকার ভেবে তালতলা স্কুল থেকে 'ট্রান্সফর' (বদলি) নেওয়া বাড়িতে ঠিক হয়েছিল। এটা তালতলার কর্তৃপক্ষের মনঃপূত ছিল না; তাঁরা বললেন তালতলা থেকেই স্কলারশিপ পাওয়া যাবে না-ই বা কেন,

আর সঙ্গে সঙ্গে একটু চতুর ভাবেই জানালেন যে ২৩শে নভেম্বর ১৯২৩ তারিখে আমার ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হবে বলে তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযারী ১৯২৪ সালের আগে পরীক্ষা দিতেই পারব না, অথচ তালতলায় থাকলে ব্যাপারটা 'ম্যানেজ' হয়ে যাবে আর ১৯২২ সালেই পরীক্ষা দিতে পারব! আমার জন্ম তারিখ (২৩ নভেম্বর ১৯০৭) তালতলা স্কুলের রেজিস্টর-এ ছিল ; 'ট্রান্সফর' নিলে সার্টিফিকেটে তাই লেখা হবে, দু'বছর আমায় অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু ট্রান্সফর না নিলে স্কুল কর্তৃপক্ষ এমন ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে দুটো বৎসর আমাকে নষ্ট করতে হবে না! শুনেছিলাম যে আমার ওপরের দুই দাদারও এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় বয়স একবৎসর বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল ; পনেরো বৎসর বয়সে পরীক্ষা দিয়ে লেখানো হয়েছিল ষোল। আজকাল এই নিয়মের বালাই নেই। কিন্তু তখন ছিল। এতে একটু অস্বস্তিকর চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়তে হয়। সময় সম্বন্ধে আমরা বেহিসাবী বলেই কি বয়স এবং তার যাথার্থ্য নিয়ে আমরা ভাবিত নই? আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক আজও হয়তো অশিক্ষার দরুন নিজেদের প্রকৃত বয়স জানে না। কবে কে জন্মেছে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থাও বড়ো একটা নেই। কিন্তু শিক্ষিত এবং কিছু পরিমাণে সম্পন্ন যারা তারাও এ-ব্যাপারে অনীহাগ্রস্ত কেন? নিজের বয়স সম্বন্ধে সত্যকথন বিষয়ে আমাদের ঔদাসীন্য কেন? 'সরকারী' বয়স এবং আসল বয়সের তফাত অনেক সময় দেখানো হয় চাকরীতে মেয়াদ বাড়াবার জন্য। এ-কথা অপ্রতিভ না হয়ে বলতেও অনেকে সংকুচিত নন দেখেছি। বয়স না কমিয়ে বরং বাড়ানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায়, এ-কথা বলে গর্ব করার তো কিছু নেই, বরং উল্টো। আবার ষোলবছর পূর্ণ না হলে 'ম্যাট্রিক' দিতে পারা যাবে না, এটাও একটা অবিচার। আশু মুখুজ্জে মশায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যাবয়ের সর্বেসর্বা তখন এই নিয়ম ছিল ; অথচ তাঁরই স্বনামধন্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ জন্মেছিলেন ১৯০১ সালের জুলাই মাসে এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে যখন তাঁর ষোল বৎসর পূর্ণ হয় নি— কেমন করে এটা ঘটেছিল? যেমন আমার ক্ষেত্রে পৌনে দু'বছর তেমনই এ ক্ষেত্রে কয়েক মাস হলেও বয়স তো বাড়ানো-ই- হয়েছিল? অধ্যাপক হেমচন্দ্র দে-র পুত্র আমার বন্ধু ব্যারিস্টার ধীরেন দে ঠিক আমার অবস্থায়

পড়ে বয়স বাড়ান নি খাতায়। দু'বছর বসে ছিলেন পরীক্ষার আগে—এ-ব্যাপারে আমার নিজেকে একটু খাটো লাগে, আর সমস্ত বিষয়টি নিয়ে মনে অস্বস্তির কাঁটা ফুটতে থাকে।

যাই হোক, উপনয়নের জোরে দ্বিতীয় জন্ম ঘটল বলতে না পারলেও গান্ধীজীর কল্যাণে মনের দিক থেকে নতুন দিগন্ত খুলে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল ১৯২০ সালে। '১৭ সালে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট-এর সভাপতিত্বে আমাদেরই পাড়ায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের সভার কথা আগে বলেছি—তখনকার দিনের পক্ষে অনেক মোটরগাড়ি, পার্কের চার দিকে প্রচুর ভিড়, আর তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লম্বা কোর্তা টুপি পরে নামতে দেখা ছাড়া বেশি কিছু সে-বিষয়ে মনে নেই। ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে আলোড়নের কথা খুব স্পষ্ট দাগ মনে কেটেছিল কিনা জানি না— কয়েকটা ঘটনা শুধু জাজ্বল্যমান হয়ে রয়েছে তখন থেকে : ডক্টর কিচলু এবং সত্য-পালকে একসঙ্গে হাতকড়া বেঁধে অমৃতসরের রাজপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া (পরে প্রকৃত তেজস্বী নেতা ডক্টর কিচলুকে খুব কাছ থেকে জানার সুযোগ পেয়েছি), কোন্ এক গলিতে ভারতবাসীদের ওপর চালাও হুকুম, হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। কেমন যেন গা জ্বালা করে উঠত এ-সব শুনে— আর বাড়িতে রামধারী এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে শুনতাম গান্ধী মহারাজ নামে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি নাকি দেবতার অংশ, যখন যেখানে খুশি যেতে পারেন, ইংরেজ তাঁকে কয়েদ দিতে পারে না। 'গোলতলাও'-এ (ওয়েলিংটন স্কোয়ার) সভা হলে দলে দলে 'দেশওয়ালীরা' (হিন্দুস্তানী) জড়ো হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সবুর করে বসে থাকে, গাঁজা খায় (যদিও তা গান্ধীজীর মানা), বক্তৃতা শুনে বোঝে না কিন্তু জানে যে গান্ধীজীর হুকুমে কী একটা বড়ো ধরনের কাণ্ড দেশ জুড়ে ঘটছে! দাদু এবং বাবা গান্ধীজীর ভক্ত ছিলেন না; কথা উঠলে বলতেন লোকটার অসাধারণ শক্তি, কিন্তু কেমন যেন বেয়াড়া ধরনের, যুক্তির ধার ধারে না, কী করে যে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে হয় জানে না— বোমা পিস্তল নিয়ে যাদের কারবার, তাদের বরং বোঝা যায়, আর দেখতে যদি তোমরা সেই স্বদেশীযুগে 'বিদেশী বাণিজ্যে করি পদাঘাত' বলে ছেলেদের সেই চমৎকার দাপট! হয়তো সাংবাদিক চরিত্রে সর্বদাই থাকে রাজনীতি-বিশারদদের বিষয়ে একটা প্রায়-

অনপনের সংশয়। তা ছাড়া স্বদেশী যুগের অপরিণতি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের জয়, আর ইংরেজ-ঘেঁষা যে রাজনীতির কুহক এ দেশের শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ করে রেখেছিল তার প্রধান প্রতিভূ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈকট্য আমার অভিভাবকদের গান্ধীপন্থা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। অহিংস অসহযোগের দিনগুলিতে আমার দাদু 'দৈনিক বসুমতী'তে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু জলে বিচরণ-রত হাঁসের মতো গান্ধীপন্থার একফোঁটা ছোঁয়াচ দেহে বা মনে গ্রহণ করেন নি— গ্রন্থ লিখেছেন "খেলাফৎ সমস্যা" নিয়ে, কিন্তু গান্ধীবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরঞ্চ নিরাসক্ত ইতিহাস-জিজ্ঞাসু ভাবে, ঢের বেশি মনের আবেগ নিয়ে প্রায় একই সময় বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পক্ষ থেকে সম্পাদনা করেছেন রামপ্রসাদ সেনের রচনাবলী, হয়তো-বা রামপ্রসাদ স্বগ্রাম হালিশহরের পরম গৌরব বলে শান্ত উদ্দীপনা নিয়েই করেছিলেন। আমার বাবা বিশ ও ত্রিশের দশকে কিছুকাল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, মধ্য কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও হয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীপন্থাকে কখনো স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁরা কেউ হয়তো ১৯১৯-২০ সালে কল্পনাই করেন নি যে স্বদেশী যুগের চেয়ে বহুগুণ ব্যাপক ও শক্তিশালী গণ-অভ্যুত্থান ঘটবে ঐ "পাগল পথিক" "বন্দিনী মা-র আঙিনায়" ছুটে আসার ফলে।

'২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবার আমাদের 'গোলপুকুর', ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হল— সভাপতি লালা লাজপৎ রায়, অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি তৎকালীন প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। 'নরমপন্থী' 'গরমপন্থী' ঝগড়ার রেশ তখনো বোধ হয় চলছিল— মনে আছে বসুমতী অফিসে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ একদিন বলছেন : 'বরিশালের অশ্বিনী দত্ত মশায় হাজির অথচ vote of thanks কংগ্রেসে তাঁকে দিতে দেওয়া হল না, দিলেন আশু চৌধুরী (স্যর আশুতোষ চৌধুরী, প্রাক্তন হাইকোর্ট জজ)।' যাই হোক, এ-সব ছাপিয়ে তখন সব-কিছু আচ্ছন্ন করতে আরম্ভ করেছিল গান্ধীজীর অভ্যুদয়— নেংটি-ধারণ তখনো তিনি করেন নি (এটা বোধ হয় ঘটে ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে) কিন্তু 'দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে' এমন একজনের কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর অথচ উদ্দীপক উপস্থিতিতে দেশ উত্তাল হয়ে উঠছিল। চিরদুঃখী ভারতবাসীর হাজার

অসন্তোষকে ইংরেজী বক্তৃতার চটকে ফোটানো যায় নি— প্রায়োপবেশন করে, 'হরতাল'-এর ডাক দিয়ে, মুসলমানকে কোল দিয়ে, পাঞ্জাবের লাঞ্ছনায় ভারতের মর্মাহত চেতনাকে জাগিয়ে, স্বরাজের দাবি তুলে গান্ধীজী দেশকে মাতালেন। সূক্ষ্ম বিচার বিনাই তাঁর যুক্তিতে গলদ, কথায় কাজে অসামঞ্জস্য, আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট কতকগুলো ধারণা ইত্যাদি নিয়ে নিদারুণ সমালোচনা সম্ভব ছিল এবং কিছু পরিমাণে তখন প্রচলিতও ছিল। কিন্তু এ হল তুচ্ছ, নিতান্তই তুচ্ছ। ছেলেবেলায় রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' প্রভৃতি উপন্যাসে যেমন প্রচণ্ড কোনো ঘটনার পূর্বে পড়তাম 'ঝটিতি বহিতে লাগিল', তেমনই যেন এক অতুলন মহাত্মার ডাকে দেশজুড়ে সাড়া পড়ে গেল, অদৃষ্টপূর্ব এক ভাতি ফুটে উঠল ভারতবর্ষের "মলিনমুখচন্দ্রমা"তে, জনজীবন থেকে রাজনীতির ব্যবধান যেন মুছে গেল।

স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে (আজকের ক্লাস 'নাইন') যখন পড়ি, তখন '২০ সালে আগস্টের প্রথম দিনে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু হয়। প্রাক্-গান্ধী যুগে তিলক মহারাজের মতো জননায়ক এ দেশে দেখা যায় নি; তাই তাঁর মৃত্যুতে সারা দেশেই শোকের ছায়া পড়ে। তখন কলকাতায় 'স্টেট্‌স্‌মান' কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিলক সম্বন্ধে অশালীন বাক্য ব্যবহৃত হয়েছিল বলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, 'স্টেট্‌স্‌মান' কাগজ 'বয়কট' আন্দোলন আরম্ভ হয়। মনে আছে স্কুলে কারো বইয়ের মলাটে ঐ কাগজ থাকলে তা ছিঁড়ে দেওয়া হল আমার জীবনে প্রথম রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। তখনই আয়ত্ত হয়েছিল আর-একটি অভ্যাস— ক্লাস আরম্ভ হওয়ার আগে খড়ি দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে সেদিনের প্রধান খবর লিখে দেওয়া। (মনে আছে আয়র্লণ্ডের আইন সভা Dail Eireann শব্দটির সঙ্গে তখন পরিচয় হয়েছিল)। 'স্টেট্‌স্‌মান' প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পি. এন. গুহ (প্রিয়নাথ গুহ) নামে সেকালে সুপরিচিত একজনের কথা; তিনি বয়কটে পাণ্ডা ছিলেন, পরে আবার ঐ কাগজেই ভারতীয় হিসাবে প্রথম বড়ো চাকুরিয়া হন, "Political Notes" নামে বিশেষ কলম লেখেন। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা ছিল; আমাদের পাড়ায় থাকতেন, বাড়িতে বহুবার তাঁকে দেখেছি। এটাও মনে আছে যে ১৯২৪ সালে আই. এ. পরীক্ষায় আমি প্রথম হওয়ায় সে

খবরটা তিনি তাঁর প্রবন্ধে (অপ্রাসঙ্গিকভাবেই) ঢুকিয়েছিলেন এবং জল্পনা করেছিলেন আমি পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাংবাদিক হব কি না এই নিয়ে।

* * *

ছেলেবেলা থেকেই বই আর কাগজের গাদায় স্বচ্ছন্দ অবস্থানের ফলে এবং পিতামহের সহচররূপে বহু বর্ষীয়ানের সান্নিধ্যে আসায় মনের বয়স দেহের অনুপাতে দ্রুত বেড়ে উঠছিল— সাধারণ সাংসারিক ব্যাপারে অপটুতা স্বভাবের সহজাত সংকোচকে গাঢ় করতে থাকলেও চিত্তবৃত্তির অকাল-উন্মেষ ও চাঞ্চল্যে বাধা পড়ে নি। বয়ঃসন্ধির যন্ত্রণা এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়— আজকের সর্বংসহা (permissive) যুগে যাকে নিতান্ত মামুলী বলে একেবারে গায়ে মাখা হয় না, তা আমাদের কৈশোরে রীতিমতো গুরুতর ব্যাপার মনে করা হত। শরীর নামে যন্ত্র বিষয়ে চেতনা আর ঔৎসুক্য আর বিধুরতাকে গোপন করে রাখা এবং এর আনুষঙ্গিক ক্লেশ ভোগ তখন কিছু পরিমাণে ছিল অবধারিত ব্যাপার। পাঁজিতে লোমহর্ষণ বিজ্ঞাপন (যা আজও প্রকাশ হয় কিনা জানি না) আর কালিতে-ধ্যাবড়া, অস্পষ্ট অথচ ভীতিপ্রদ ছবি-সমেত তার ছাপ মনে পড়ে অদ্ভুত এক যন্ত্রণার সৃষ্টি যেন হত। তবে আমাদের বাঁচোয়া এই যে, সেই বয়ঃসন্ধি যুগে নৈর্ব্যক্তিক, প্রায়-সামগ্রিক একটা আবেগ মনকে ভরিয়ে দিতে চাইছিল বলেই হয়তো বহু ক্ষুদ্র অথচ তীক্ষ্ণ বয়সোচিত বেদনার আঘাত থেকে কতকটা নিস্তার পেয়েছি। কৈশোর যখন কাটে নি তখনই শুনলাম কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় : 'নগরীর পথে রোল উঠে আজ, গান্ধীজী, গান্ধীজী!' স্কুলের পালা শেষ করছি যখন, তখন "বিদ্রোহী" কবি নজরুল গেয়ে উঠছেন : 'এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা, মোদের অস্থি দিয়ে জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল!' সে-যুগ তো সামান্য নয়!

মনে আছে নেবুতলার রাস্তা দিয়ে দাদুর সঙ্গে বসুমতী অফিসে যাওয়ার পথে চোখে পড়ত বৌবাজার স্ট্রীটের কাছে বিস্তীর্ণ বেশ্যাপল্লী— খোলার ঘরের বিরাট বস্তি, সন্ধ্যার পর গাদাগাদি মেয়েদের ভিড়, সেজেগুজে মাথায় বেলফুলের মালা বেঁধে তারা পথচারীদের ডাক দিচ্ছে— প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হত না, পরে আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঔৎসুক্য

আর আতঙ্ক আর কেউ বিশ্বাস করুন আর না করুন, কেমন যেন মমতা ঐ "খারাপ" মেয়েদের সম্বন্ধে মনে জাগত। হয়তো এর একটা হেতু এই যে সকালে ঐ অঞ্চলেই দিনের পর দিন দেখতাম তাদের অনেককে— বাসন মাজছে রাস্তার কলে, হয়তো-বা স্নান করছে কি দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করছে। প্রায় কেউই তারা রূপসী নয়, যদিও রূপোপজীবিনী হল তাদের নাম, কিন্তু মোটামুটি দেখে মনে হত এরা "খারাপ" হতে যাবে কেন? এ-ও হতে পারে যে মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ সালে বরিশালে গিয়ে এদেরই ডাক দিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে সহায় হবার জন্য, বলেছিলেন পাপ তো এদের নয়, পাপ হল সমাজের— আমাদের মনে হয়তো গান্ধীজীর এ কথাই কিছুটা ঘুরছিল। যাক্ এ নিয়ে অনিবার্যভাবে অস্পষ্ট বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নেই। তবু বলব যে ছাত্রাবস্থার শেষ দিকে বন্ধুবর আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে H. G. Wells-এর *The World of William Clissold* নিয়ে— "Storm and Stress" অধ্যায়ে আছে ক্লিসল্ড্ চঞ্চল হয়ে ঘুরছে রাস্তায়, বারবণিতাদের "painted charms and cheap advances" শেষ পর্যন্ত তাকে লোভের হাত থেকে নিস্তার দিল— আমাদের উভয়েরই মনে হয়েছিল Wells আরো একটু গভীরে যাবার চেষ্টা করলে পারতেন। বহু বৎসর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-ফেরত এক বন্ধু সহৃদয় হয়েও যখন একটু যেন দাপট নিয়েই বলছিলেন যে 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' এই হল রূপোপজীবিনীদের সঙ্গে পুরুষের একমাত্র সম্পর্ক, তখন আপত্তি না করে পারি নি— একান্ত সাময়িক হলেও দেহমনের শান্তি অন্বেষণে যার কাছে যাত্রা তার সম্বন্ধে এমন অশ্রদ্ধা কেমন করে সম্ভব? ১৯৫২ সালে আমার লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্ভূ'ত ছিল মসজিদবাড়ি স্ট্রীট, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট এবং তার সংলগ্ন অঞ্চল। সেখানকার রূপোপজীবিনীদের কাছে ভোট চাইবার উপায় জানা ছিল না, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্থানীয় একজন প্রমুখ সহায় হলেন, 'উকিলবাবু' বলে ঐ অঞ্চলে তিনি সর্বজনপরিচিত. একাধিকবার আমায় নিয়ে গেলেন এমন বহু গৃহে যাকে বলা হয় 'পতিতালয়'— আমাদের এই দরিদ্র দেশে সেখানেও পরিবেশ রমণীয় নয়, কিন্তু স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও সহজ সৌজন্য পেলাম, ভব্যতার কোনো অভাব লক্ষ্য করলাম না, তাদের হাতে সাজা পান মুখে দিতে কুণ্ঠা বোধ করলাম না। নির্বাচন

কেন্দ্রের চৌহদ্দি পরিবর্তনের ফলে সে-অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটে নি, কিন্তু তার স্মৃতি আমার কাছে বিন্দুমাত্র বিস্বাদ নয়— সুগভীর মানবীয় বঞ্চনা ও যন্ত্রণার উপশমে সমাজের অসামর্থ্যের যারা বলি তারা ঘৃণার্হ হবে কেমন করে ?

* * *

১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে স্কুলের দরজায় পিকেটিং চলেছিল— গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ অনুযায়ী স্কুল-কলেজ বয়কট, আদালত বয়কট আর সদ্যপ্রবর্তিত মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার যে আইনসভা প্রবর্তন করল তার নির্বাচন বয়কটের আন্দোলন তখন জোর কদমে চলছে। কলকাতায় 'স্পেশাল' কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ অনেকে, কিন্তু ডিসেম্বরের (১৯২০) শেষে নাগপুর কংগ্রেসে তিনি এবং অন্যান্য বহু যশস্বী নেতা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে হাত মেলালেন, দেশজুড়ে প্রচণ্ড সংগ্রামী ঝড় তখন বইতে শুরু করল, আমাদের মতো নিতান্ত অল্পবয়সীরও মনে কেমন যেন অজানা ঝাপটা এসে লাগল, একটা আন্দোলন যে অন্তত কিছুকাল দেশের গোটা জীবনযাত্রাকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে তার প্রথম পরম আস্বাদ আমরা পেলাম। স্কুল-কলেজকে তখন বলা হত গোলামখানা, বিকল্প জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কতকটা প্রয়াসও হল, ১১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তখনকার দিনের পক্ষে প্রকাণ্ড বাড়ি 'ফর্ব্‌স্‌ ম্যান্সন্‌স্‌'-এ (যা আজও অবহেলিত চেহারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে) গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন স্থাপিত হল— আই. সি. এস. চাকরি প্রত্যাখ্যান করে তরুণ সুভাষচন্দ্র বসু বিলাত থেকে ফিরেই তার অধ্যক্ষ হলেন। আমরা শুনতাম, কাগজেও দেখতাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা পিকেটিং করছে, আশু মুখুজ্জে মশায় (যিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সর্বাধিনায়ক) বুঝি তাদের পায়ে ঠেলে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে ঢুকেছিলেন ইত্যাদি খবর। বিতর্ক কিছুটা চলত তখন অহিংস অসহযোগের নেতিবাচক দিক নিয়ে— জাতীয় শিক্ষার আয়োজন বিনাই স্কুল-কলেজ বয়কটের অযৌক্তিকতার কথা উঠত, যদিও গান্ধীজীর জবাব ছিল : 'শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজ পারে না'। অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌ তখন পূর্ণোদ্যমে আন্দোলনে নেমেছেন

—ঝড়ের মতো বেগে রূপক আর বিশেষণে ভরা চোস্ত্ (অথচ কেমন যেন অন-ইংরেজ) ইংরেজী বলিয়ে, কইয়ে তাঁর মতো আর ছিল না। চট্টগ্রাম কলেজের সহাধ্যক্ষ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী চাকরি ছেড়ে আন্দোলনে নামলেন— সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে, যাদের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব বা প্রয়োজনও নয়। স্কুল-কলেজ বয়কট ব্যাপারটা কিন্তু খুব বেশি এগোতে পেরেছিল মনে হয় না— আজকের তুলনায় ছাত্র আন্দোলন বলে বস্তু তখন ছিল না (স্কুলে তো নয়-ই), আর জাতীয় শিক্ষালয় গড়ে তোলার ব্যাপারে সাফল্য ছিল সীমিত। আমাদের স্কুলে মাস খানেক বোধ হয় হৈ-চৈ চলেছিল, গেট পর্যন্ত গিয়ে আমরা অনেকে আর ভিতরে ঢুকতাম না, কিন্তু ক্রমশ উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এল, স্কুলের পাঠ আরম্ভ হতে বাধা রইল না। মনে আছে একদিন আমাদের বলা হল ভিতরে আসতে ; হেডপণ্ডিত মশায় ক্লাস নেবেন (যদিও নির্ঘণ্টে তা ছিল না) জানানোতে অনেকে ঢুকলাম, তিনি কী-জানি-কেন পড়ালেন বাংলা, মাইকেল মধুসূদন থেকে আবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা করলেন : 'পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি'— বেশ মনে আছে তাঁর কণ্ঠস্বর আর তেজস্বী বাক্যব্যঞ্জনা— আর এতকাল পরে মনে হয়, যে তিনিও সেদিন বুঝি নিয়ম মেনে, স্কুলের মধ্যে বসে, আমাদের জানাতে চাইছিলেন দেশের চিত্তচাঞ্চল্য এবং প্রচলিত অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ।

পণ্ডিত মহাশয়ের 'কোচিং' ক্লাসে আমরা কয়েকজন এক বৎসর সংস্কৃত পড়েছিলাম। আমরা যেতাম পাড়াতেই তাঁর 'মেস্'-এ, যেখানে আরো কয়েকজন শিক্ষক থাকতেন ; তাঁদের মধ্যে একজন— ব্রজবাবু— অঙ্কের মাস্টার হিসাবে স্কুলে রীতিমতো ভীতিপ্রদ হলেও বাস্তবিক মানুষ হিসাবে যে কত সরল ও স্নেহশীল তা আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়েছিলাম। একদিন ঘরে ঢোকার মুখে শুনলাম পণ্ডিতমহাশয় নিবিষ্ট মনে গাইছেন : 'উঠ বীর-জায়া বাঁধ কুন্তল' (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রসিদ্ধ সংগীত)— আমাদের দেখে একটু যেন অপ্রতিভ হলেন, কিন্তু বললেন : 'জানিস্ আমার বাড়ি বিষ্ণুপুর, আমার বাপ-পিতেমো মস্ত গাইয়ে ছিলেন !' আমার একটা অভ্যাস ছিল, খাতায় কণ্ঠস্থ কবিতা (বা সংস্কৃত শ্লোক) নানা জায়গায় লিখে রাখা— একদিন 'তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং' এবং 'য একো বর্ণো বহুধা শক্তি-

যোগাৎ', এই পঙ্‌ক্তি নিয়ে শুরু দুই শ্লোক দেখে কোথায় পেয়েছি জিজ্ঞাসা করলেন, আর আমি বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯২১) বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতি-অভিভাষণের গোড়ায় দেখেছি বলায় আমার কাছে চেয়ে নিলেন সেই বক্তৃতায় মুদ্রিত বিবরণ (যা আমাদের বাড়িতে ছিল)। গান্ধীজীকে ঐকান্তিক উৎসাহ নিয়ে সমর্থন করার পর বিপিনচন্দ্রের মোহভঙ্গ হয়েছিল— ভুল কার জানি না, কিন্তু প্রকৃত সাহস নিয়ে বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন তিনি 'লজিক'-এ বিশ্বাস করেন, 'ম্যাজিক'-এ নয়, আর গান্ধীজীর কার্যক্রম এবং ভঙ্গীতে ক্রমশ যেন যুক্তির চেয়ে জাদুবিদ্যার ভাগ বেড়ে যাচ্ছে বলে আন্দোলনকে সমর্থন দেওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। এজন্য তখন বিপিনচন্দ্রকে বহু দুর্নামের ভাগী হতে হয়েছিল, কিন্তু নিজের মত থেকে টলতে তিনি রাজী হন নি।

১৯২১-২২ সালে এই গান্ধী 'ম্যাজিক' বাস্তবিকই দেশকে যে মুগ্ধ আর অভিভূত করে রেখেছিল এ-কথা হলপ্‌ করে বলতে পারি নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই। পূর্বেই আভাস দিয়েছি যে বাবা কিম্বা দাদু গান্ধীকে 'মহাত্মা' বলতে গররাজী না হলেও কিছুতেই তাঁকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি— কিন্তু বাড়ির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে গান্ধীবাদ নিয়ে পরম উৎসাহী বেশ কয়েকজন ছিলেন। যদি কোনো সকালে কালীঘাট থেকে হরিদাস হালদার ('স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি' গানের বোধ করি তিনিই রচয়িতা) আসতেন তো বৈঠকখানায় তুমুল তর্ক চলত, হরিদাসবাবু ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অসহযোগ প্রচারে। হয়তো-বা দেখতাম পিতৃবন্ধু ললিতমোহন ঘোষালকে, যিনি স্বদেশী যুগ থেকে বিশের দশক পর্যন্ত সভাসমিতিতে এক-জন প্রকৃত ওজস্বী বক্তা বলে সুবিদিত ছিলেন। প্রায়ই আসতেন আমাদের পাড়ারই সাময়িক বাসিন্দা আবদুল হাফীজ শরীফাবাদী, যাঁকে সর্বদা 'মৌলভীসাহেব' (কিম্বা একটু বিদ্রূপের সুরে মৌলানা) বলে অভ্যর্থনা করা হত (বসুমতী অফিসে-ও অনুরূপভাবে)। আপাতদৃষ্টিতে একান্ত সরল বলে তাঁকে ভাবা যেত, যদিও তখনই অসহযোগীদের মধ্যে কোনো কোনো উপদল তাঁর নিন্দার কসুর করত না। আমাদের মাস্টারমশায় কিছুতেই গান্ধীকে বাহবা দিতে চাইতেন না; ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর বিতর্ক নিয়ে তিনি বেশ মেতে ছিলেন,

তবে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই আবার তিনি মহাত্মার অনন্যসাধারণত্বকে অভিবাদন করতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। মাঝে মাঝে আসতেন বাবার এক বন্ধু যিনি বিলাতে বুঝি কিছুকাল লেবর পার্টির আদি যুগের নেতা কেয়র্ হার্ডির সঙ্গে কাজ করেছিলেন এবং দেশে ফিরে তৎকালীন সীমিত শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন—এঁর নাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, নরমপন্থী 'লেবর'-নেতা হিসাবে সরকারী মনোনয়নে তদানীন্তন বাংলা কাউন্সিলের সদস্য ইনি বেশ কিছুকাল ছিলেন। স্বভাবতই গান্ধী-আন্দোলন এঁদের মতো ব্যক্তিকে আকর্ষণ করতে পারে নি, কিন্তু যতদূর মনে পড়ে তখনকার আবহাওয়াতে গান্ধী-আবির্ভাবের ফলে প্রায় যেন একপ্রকার জাদু ছড়িয়ে পড়েছিল, শত্রু মিত্র কেউ তার ঘোর সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। যে-রাজনীতি ছিল বৃহৎ জনতার সংস্পর্শ-রহিত, মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের সংকোচবিহ্বল আচরণে যা ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে সীমায়িত, সেই রাজ-নীতির অভূতপূর্ব রূপান্তর তখন ঘটেছিল, 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ-নীরে' মঙ্গলঘট পূর্ণ করে ভারতমাতার আবাহন যেন হতে চলছিল। গান্ধী-পন্থার সমালোচকের অভাব ছিল না, কিন্তু কেমন যেন, সবাই তাঁরা থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কাউন্সিলে ঢোকার জন্য ভোটপ্রার্থী কেউ হবে না, কংগ্রেসের অসহযোগ প্রস্তাব তা চাইলেও নরমপন্থীদের ঠেকিয়ে রাখা গেল না—আজকের তুলনায় চাঞ্চল্যহীন হলেও নির্বাচন ঘটল, ছোটোখাটো কয়েকটা মিটিং-ও হল। আমাদের পাড়া থেকে সুরেন্দ্রনাথের অনুজ কাপ্টেন জে. এন. ব্যানার্জি দাঁড়ালেন এবং হারলেন স্বদেশী আমল থেকে অপেক্ষাকৃত অর্থে সামান্য একটু গরমপন্থী বলে পরিচিত ব্যারিস্টার এ. সি. (অশ্বিনীকুমার) ব্যানার্জির কাছে। পূর্বোক্তের কথা আগে একটু বলেছি; পরোক্ত জনও আমাদের পারিবারিক বন্ধু; তাঁর পুত্র ব্যারিস্টার অবনীকুমার ব্যানার্জির সঙ্গে পরবর্তী কালে আমার হৃদ্যতা হয়—মনে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে তাঁদের বাড়িতে অশীতি-অতিক্রান্ত অশ্বিনীকুমার রেডিওতে আমার বক্তৃতা শুনে আমার সব চেয়ে শ্লাঘ্য প্রশংসাবাক্য শুনিয়েছিলেন: 'হীরেন, তোমার বলা ইংরেজী শুনে আমার লালমোহন ঘোষের কথা মনে ভেসে আসে!' এঁরা একসময়ে খুবই 'সাহেবী' মেজাজের পরিবার হলেও এক ধরনের

অভিমানী স্বাদেশিকতারও অধিকারী ছিলেন। তালতলা পাড়ায় অশ্বিনী-কুমারের এক বন্ধু নাকি বিলাত না গিয়েই 'সাহেব' হবার এমন মতলব এঁটেছিলেন যে দাদুর কাছে শুনতাম তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল 'Would-be Barrister'— তখনকার এ-ধরনের রসিকতায় হয়তো অশ্বিনীকুমারেরও অংশীদারী ছিল। যাই হোক্, ১৯২১ সালের নির্বাচনে আমাদের পাড়ায় স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বক্তৃতা করতে দেখলাম— শুনলাম কমই, কারণ অসহযোগী একদল সভায় বাধা সৃষ্টি করায় সভা একেবারে জমল না। বাধাদানকারীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন পাড়ারই একজন 'অফিস কর্মচারী', যাঁকে তখনকার ইউনিয়ন, Employees' Association-এ আমি ইতিপূর্বেই দেখেছিলাম। এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রাণপুরুষ ছিলেন মুকুন্দলাল সরকার, যিনি পরবর্তীযুগে সুভাষচন্দ্র বসুর সহকর্মী ছিলেন, বহুবিধ ক্লেশকর অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাঁর জীবন কেটেছিল। আমার দাদুকে তিনি ভক্তি করতেন, দেখলেই সে-যুগের রীতিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেন; আমার বাবাকে তিনি নিয়ে যেতেন বউবাজার স্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে কেরানীদের সভায়— মনে আছে ১৯২০ সালের শেষ দিকে কি ১৯২১ সালের প্রথমে বিলাতের পার্লামেন্ট সদস্য ক্যাপ্টেন জে. সি. ওয়েজ্‌উড্ (J. C. Wedgwood) সেখানে আমার বাবার সঙ্গে বক্তৃতা করে একটু আশ্চর্য হয়ে বাবাকে বলেছিলেন যে তাঁর মতো বক্তার জন্যই ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারী স্বায়ত্তশাসন হওয়া উচিত! মুকুন্দলাল সরকারের সঙ্গে আমার শেষ দেখা ১৯৪৭ সালে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এক সভায়— চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন তোমায় কতটুকু দেখেছি আর আজ! যাই হোক্, সেই '২১ সালের কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নের কয়েকজন পাণ্ডার হাতে সুরেন্দ্রনাথের মতো মহারথীর নিগ্রহ দেখেছিলাম। আমাদের কাছে তাই বিস্ময়ের কিছু ছিল না যখন সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং ১৯২৪ সালের নির্বাচনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের মনোনীত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়-এর মতো চিকিৎসা ভিন্ন অন্য বিষয়ে তখন একান্ত অপরিজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন।

অশিক্ষিত হিন্দু জনসাধারণের কাছে গান্ধী তখন অবতার-বিশেষ। ইংরেজ-কর্তৃক তুর্কীর খলিফার রাজ্যচ্যুতি জগৎ জুড়ে মুসলমানদের মনে

উত্তেজনা ঘটায় ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের গান্ধী ডাক দিয়েছিলেন। অহিংস অসহযোগের উদ্দেশ্য ঘোষণা করলেন শুধু স্বরাজ নয়, প্রথমেই উল্লেখ করলেন পঞ্জাব এবং খেলাফৎ ব্যাপারে যে-অন্যায় সংঘটিত হয়েছে তার নিরাকরণের দাবি। হিন্দু-মুসলমানে মিলনের এমন সুযোগ একশো বৎসরেও আসবে না বলে তিনি খেলাফৎ এবং স্বরাজ সংগ্রামকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন। এর ঔচিত্য নিয়ে ত্রি-নয়ন-অধিকারী সেজে বহু কথা বলা যায় কিন্তু এটা তার স্থান নয়। এখানে শুধু সেদিনের বিপুল, বিরাট, অবিস্মরণীয় হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্যের যে ছবি মনে রয়ে গেছে তার আভাস দেওয়া যেতে পারে। খেলাফৎ সম্মেলনে গান্ধীজী (ও অন্যান্য অমুসলমান নেতা) পরম মর্যাদায় অভ্যর্থিত ; মৌলানা মহম্মদ আলী ও শৌকৎ আলী, মজহরুল হক, আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান, মুফ্‌তি কিফায়েতুল্লাহ্‌, হসরত মোহানী, উমর সোভানী ইত্যাদি বহু মুসলিম তখন সমগ্র দেশবাসীর অবিসম্বাদী নেতা। বিপুলবপু আলি ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে গান্ধীজী বলতেন তিনি তো তাঁদের পকেটেই অবস্থান করেন! মাঝে মাঝে চমৎকার কথা-কাটাকাটি হত— মাদ্রাজ থেকে শৌকৎ আলি ফিরে এসে অনুযোগ করলেন, সভায় হিন্দুরা বলে 'বন্দেমাতরম্' আর মুসলমান চীৎকার করে 'আল্লা-হো-আকবর,' এ কি একটা রেষারেষির ব্যাপার? গান্ধী সালিশ হয়ে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি ১৯২১) রায় দিলেন— এবং মৌলানা মেনে নিলেন— যে তিনরকম 'নারা' দেওয়া হোক : প্রথমে 'বন্দেমাতরম্' (এর আংশিক কারণ গান্ধীজীর ভাষায়, "the emotional superiority of Bengal"), দ্বিতীয় আওয়াজ হবে 'আল্লাহো আকবর' (কারণ ঈশ্বরের নাম অবশ্য উচ্চার্য), আর তৃতীয় এবং শেষ রব হবে 'ভারতমাতাকী জয়'! শৌকৎ আলির প্রশ্নের মধ্যে নিহিত ছিল ভবিষ্যতের আশঙ্কার সংকেত— ভুলে যাওয়া চলবে না যে কিছু পরিমাণে বালির বাঁধের উপর হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর ইমারৎ বানানো হয়েছিল, নইলে ১৯১৯ সালে যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীর জুম্মা মসজিদের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ভাষণ দিলেন, ইংরেজ সিপাহীর বন্দুকের সামনে প্রশস্ত বক্ষ উন্মোচন করে সারা দিল্লীর মানুষকে শিহরিত করেছিলেন জাতিধর্মনির্বিশেষে, সেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দকেই ১৯২৬ সালে সাম্প্রদায়িক আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হল। যাই হোক, ১৯২১ সালের

অভিজ্ঞতা আমারও মনে যে অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি জাগিয়েছিল তার উল্লেখ না করে পারছি না। এখনো যেন শুনতে পাই ১৯২১-এর ১৭ নভেম্বর তারিখে প্রিন্স অফ ওয়েলস্-এর বোম্বাইয়ে নামা উপলক্ষে সারা ভারত হরতাল— পূর্বদিন, ১৬ই নভেম্বর কলকাতার রাস্তায় মিছিলের পর মিছিল, মুসলিম সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে বেশি বই কম নয়। সবারই কণ্ঠে প্রতিবাদ, সংকল্প, সংগ্রামের একান্ত আকূতি। হয়তো একটু অতিকথন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, ইতিহাসের পরিবর্তিত এক পর্বে, ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারত জনতার ভাস্বর মূর্তির চেয়ে পুরোনো দিনের ছবি যেন আরো মনমাতানো বই কম নয়!

গান্ধী-জাদু শুধু জনতাকে, ইতর জনতাকে মন্ত্রার্পিত করেছিল বলাও ঠিক হবে না। বেশ মনে আছে গান্ধী বলতেন জোর করে, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ কিম্বা ৩১শে অক্টোবর ১৯২১, নিদেনপক্ষে এবং নির্ঘাত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২১ তারিখের মধ্যে স্বরাজ এসে যাবে। বিশ্বাস করতাম কি না মনে নেই, কিন্তু বাড়ির বড়ো কেউ করতেন না। তবে দেখেছি, নিজ কানে শুনেছি— নেবুতলার এক প্রতিষ্ঠাপন্ন চিকিৎসক দাদুকে রাস্তায় থামিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন: দেখুন তো, আপনারা খবরের কাগজের লোক, সব বোঝেন-সোঝেন, এই যে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ আসছে— তা আমার কোম্পানির কাগজ আর উঁচুদরের নোটগুলোর কী ব্যবস্থা করি? দাদু হেসে জবাব দিয়েছেন, ভাববেন না, স্বরাজ সরকার এ-সব দেনা তো ফেলে দেবে না, দিলে সব-কিছু ছত্রভঙ্গ, তা হবার ভয় নেই! ডাক্তারবাবু যেন একটু শান্ত মনে চলে গেলেন, কিন্তু একেবারে নির্ভয় নিঃশঙ্ক বোধ হয় হলেন না। অপর দিকে তখন গুরুগম্ভীর আলোচনাও শুনেছি— সেনাপতির কথায় অকুণ্ঠ আস্থা না রাখলে একটা দেশ লড়তে পারে না, গান্ধী যা বলেছেন তা আমরা বিশ্বাস করব-ই: পড়েন নি গীতায় 'যত্র যজ্ঞেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ, যত্র পার্থঃ মহাভুজঃ, তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি, ধ্রুবা নীতির্মতি-র্মম'? সম্পর্কে আমার খুল্লতাত কালীপদ মুখোপাধ্যায় তখন আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন; প্রতিবেশীদের মধ্যে ছিলেন আমার দাদাদের বন্ধু সন্তোষ-কুমার মিত্র (পরে ১৯৩২ সালে হিজলী বন্দিশালায় পুলিশের গুলিতে নিহত), যিনি কৃতী ছাত্র হয়েও এম.এ. ক্লাস বর্জন করে অসহযোগী হলেন,

তাঁকে বহুবার আমাদের বাড়িতে দেখেছি, তাঁর পিতার সঙ্গে পথে দাদুর প্রায় রোজ দেখা এবং কথা হত। আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন আমার মধ্যমাগ্রজের অন্তরঙ্গ মিত্র জগদ্বন্ধু দত্ত, যিনি আত্মগরিমালোলুপ না হয়ে আজ বিস্মৃত, কিন্তু একদা বাঁকুড়ার দেশভক্ত মহলে সম্মানিত ছিলেন। এঁরা সবাই অটল বিশ্বাসী ছিলেন মহাত্মার প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি প্রতিশ্রুতিতে, প্রতিটি যুক্তিবিন্যাসে। এই বিশেষ আবহের প্রভাব আমার অপরিণত চিন্তা আর আবেগে ধাক্কা কম দেয় নি— হয়তো টলে পড়তাম, কিছুদিনের জন্য ভেসে-ও যেতে পারতাম, তবে বয়সটা ছিল অল্প, বেপরোয়া হওয়ার সংগতিটুকুও ছিল না। আর সাংবাদিকতার আবহাওয়াতে ক্রমাগত সময় কাটিয়ে গতানুগতিকতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস নিজের অজ্ঞাতেই মনে প্রবেশ করায় হয়তো দ্রুত-উৎসারিত আবেগের রাশ টেনে রাখা কঠিন হয় নি।

*　　　*　　　*

পূর্বেই বলেছি, বেশ কয়েক বৎসর ধরে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে পিতামহের সহচর রূপে প্রায় প্রতিদিন একাধিকবার আমার যাতায়াত চলেছিল। আজকাল 'বসুমতী' বলতে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিতর্কিত সাংবাদিক প্রতিভা এবং অশোককুমার সেনের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাগরিকের বহুবিধ কর্মকাণ্ডের গুণাগুণ নিয়েই আলোচনা সচরাচর ঘটে থাকে। দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক বসুমতী এখনও আত্মপ্রকাশ করে, সুতরাং এমন কিছু একটা ওলটপালট হয় নি বলেই বোধ হয় অনেকেই ভেবে থাকেন। কিন্তু আমার চোখে বসুমতী সাহিত্য মন্দির কিছুকাল ধরে একটা ধ্বংসস্তূপের মতো ; তার যে চরিত্র, বহু দোষ দুর্বলতা সত্ত্বেও একপ্রকার যে মাহাত্ম্যও ছিল তা বসুমতী-প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ এবং তৎপুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্ধান করেছে। এই মুখোপাধ্যায়দের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সৌহার্দ্য ছিল— বেশ মনে পড়ে দাদুকে উপেনবাবু বলেছেন : 'দাদা, এ সবই তো আপনার'। আর দাদু জবাব দিচ্ছেন : 'হ্যাঁ ভাই, তা ঠিক বটে। তবে কিনা শুধু চাবিকাঠিটি তোমার !' আহিরীটোলায় নিমু গোঁসাই লেনে (ভয়ংকর সরু গলি বলে মনে আছে) এঁদের বাড়িতে সরস্বতীপুজা এবং অন্যান্য অগণিত উপলক্ষ্যে গিয়েছি। এঁরা ছিলেন

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরম ভক্ত— আবার বোধকরি বৈষয়িক কারণে দারভাঙ্গা মহারাজার বিশেষ অনুগত (যে-কারণে হয়তো মাঝে মাঝে বসুমতী সম্পাদকরা একটু বিব্রত বোধ করতেন !) কিন্তু এ হল তুচ্ছ কথা— আমার মনে হয় বাংলাসাহিত্য বসুমতী এবং উপেন্দ্রনাথের কাছে যে ভাবে ঋণী, তেমনভাবে আর কোনও প্রকাশকের কাছে নয়। শুধু তাই নয়। সাহিত্য বিতরণে এঁদের আগ্রহ মূলগত শিল্পপ্রেরণা বিনা সম্ভব নয়; সতীশচন্দ্র ('খোকাবাবু' নাম ছিল যাঁর পরিচয়) যে আশ্চর্য অতিবর্ণাঢ্য বিজ্ঞাপন লিখতেন, তার তুলনা যে ছিল না তা তো বটেই, কিন্তু তারই মধ্যে সূচিত হত বাংলাভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যকীর্তির বিবিধ নিদর্শন বিষয়ে অনতিক্রম্য শ্রদ্ধা, সর্বজনে সেই সাহিত্যবোধের প্রসার সম্বন্ধে প্রগাঢ় চিত্তাবেগ। বসুমতী-প্রকাশিত 'হাজার জিনিষ' সাহিত্য সৃষ্টি নয়, নিতান্ত বাস্তব সাংসারিক প্রয়োজন মিটাবার নানাবিধ প্রক্রিয়াকেই সহজে তাতে বর্ণনা করা হয়েছে— কিন্তু সে-বইয়ের কথা থাক্ বাংলার আবালবৃদ্ধ বণিতার কাছে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যস্রষ্টার কীর্তিকে অল্পমূল্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজ বসুমতী সাহিত্য মন্দির যেভাবে করেছে তা প্রকৃতই অতুলনীয়। 'ভারতবর্ষ'-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আট-আনা সিরিজ উপন্যাস প্রকাশ করে নিশ্চয়ই মূল্যবান্ কাজ করেছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি কৃতিত্ব ও প্রশংসা প্রাপ্য হল বসুমতী-র। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশের ফলস্বরূপ সাহিত্যসম্রাটের উত্তরাধিকারীদের সে-যুগে প্রায় দুই লক্ষ টাকা 'রয়ালটি' দিতে পারা (যা আমরা শুনেছিলাম) যে কী বিরাট ব্যাপার তা বোঝা শক্ত নয়। গল্প পদ্য, নাটক, আলোচনা— সর্ববিধ রচনার সমাবেশ সুলভ আকারে প্রচার কি সহজ কাজ আমাদের দেশে ? জানি না বসুমতী-প্রকাশিত রচনাবলীর সম্পূর্ণ সংগ্রহ আজ কোথাও আছে কি না। কিন্তু জানি যে তা বিনা বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, সে যুগে নারায়ণ ভট্টাচার্য নামে একজন গল্পকার ছিলেন যাঁর নামোল্লেখ পর্যন্ত কোথাও দেখি না অথচ পল্লীবাসী বাঙালীর বঞ্চিত জীবনের মর্মস্পর্শী কাহিনী তিনি অজস্র লিখে যেতেন। বসুমতী বোধ হয় তাঁর গ্রন্থাবলী ছাপিয়েছিল যেমন করেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের এবং বেশ একটু খেয়ালী ও হেঁয়ালী ধরনের চাঁচা-ছোলা গল্পলেখক, সমান

ভাবে বিস্মৃত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের রচনা সম্পর্কে। আমাদের স্মৃতি যে কত স্বল্প তা বোঝা যায় যখন আজ গল্পকারদের মধ্যে রমেশচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ বা জগদীশ গুপ্ত পর্যন্ত বিস্মৃত। নারায়ণ ভট্টাচার্যের কথা বিশেষ করে মনে আসে কারণ তাঁর আগে অমন ভাবে বাংলা কাহিনীর ক্ষেত্রে নির্বিত্তের আবির্ভাব বোধ করি হয় নি— সহজ এবং সস্তা হৃদয়াবেগ অবশ্য একটু বেশি ছিল, কিন্তু সেটাও তো বাঙালী জীবনে সত্য। আমার মনে হয় বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের বিবিধ প্রকাশন বিষয়ে গবেষণায় দেশের উপকার আসবে— যেমন আসবে, সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেকালে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর "বঙ্গবাসী"-প্রকাশিত হিন্দু ধর্ম ও আচার -বিষয়ক গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা থেকে। তথাকথিত বাংলা 'রেনেসাঁস্' নিয়ে প্রভূত বাক্যব্যয় হয়েছে, অথচ প্রকৃষ্ট প্রগতির কল্যাণেই হিন্দু ঐতিহ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস 'গোঁড়া হিন্দুয়ানী'-র দিক থেকে হয়েছিল তার বিচার প্রয়োজন— রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে নিয়ে ভাববিলাস বেশ একটু আধিক্য নিয়েই হয়ে চলেছে, কিন্তু শশধর তর্কচূড়ামণি, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার (যিনি সেযুগে 'আচার্য' নামে সুবিদিত এবং বাংলাগদ্য-রীতিতে বিপুল শক্তিধর ছিলেন), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্বন্ধে আজকাল কোথাও কোনো অবগতি আছে মনে হয় না।

আমার দাদুর বসুমতী অফিসে একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল, অথচ স্বভাব-বিনয়ী ভঙ্গীতে ঐকান্তিক শৃঙ্খলা সহকারেই তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্য নিয়মিত-ভাবে করে যেতেন। সম্পাদকপ্রবর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আমার বাবার বিশেষ বন্ধু হিসাবে দাদুকে সর্বদা সম্মান দেখিয়ে চলতেন। দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন বলে আমার পিতার মৃত্যুর পরও হেমেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রথম থেকে তারিফ করতাম তাঁর চমৎকার গ্রন্থসংগ্রহ— বাবার সংগ্রহও রীতিমতো উল্লেখযোগ্য, কিন্তু হেমেন্দ্রপ্রসাদ কাগজপত্র আরো ভালো করে গুছিয়ে রাখতেন। আগেকার শ্যামবাজার স্ট্রীটে তাঁর বাসায় বহুবার গিয়েছি। আমাকে খুব ভালোবাসতেন তাঁর অগ্রজ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। অনেক কাল আগে ইনি মারা যান, কিন্তু বেশ মনে আছে তাঁর রসালো গল্প কিম্বা ট্রামে বসে হঠাৎ স্থির করা যে টিকিটটা যখন এস্‌প্লানেড পর্যন্ত চলে তখন মাঝপথে নেমে গন্তব্যস্থলে

যাওয়াটা লোকসান! এঁদের 'দেশ' যশোর জেলায়, তাই এঁদের কাছে (এবং বাড়িতেও) অনেক শুনেছি 'অমৃতবাজার' বিষয়ে কথা। কিছুটা স্বদেশিয়ানার তাগিদে আর কিছুটা ইংরেজি ভাষাকে বিদ্রূপ করে অমৃত-বাজার পত্রিকায় 'বাঙালী ইংরিজীর' মনোরম রেওয়াজ এককালে ছিল—'সরকার কি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে' 'ডুবে ডুবে জল খাওয়া' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ হত চমৎকারভাবে। আরো শুনতাম শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ সম্বন্ধে কাহিনী— ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ সংসার-চেতনা অথচ অনাবিল দেশাভিমান এই দুই কীর্তিমানের ব্যক্তিত্বকে অসামান্যতায় মণ্ডিত করেছিল। শুনতাম গান্ধী স্বয়ং শয্যাগত মতিলালের কাছে আশীর্বাদ চাইতে গিয়েছিলেন, সম্ভবত ১৯২০ সালে। ছেলেবেলায় বাড়িতে মাঝে মাঝে দেখেছি অমৃতবাজার পরিবারের পীযূষকান্তি ঘোষকে— উচ্চকণ্ঠ, গলা প্রায় সর্বদা একটু যেন ভাঙা, দারুণ মিশুক মানুষ। অনেক বড়ো হয়ে সান্নিধ্য ও সম্প্রীতি পেয়েছি শিশিরকুমারের পুত্র সর্বজনবিদিত তুষারকান্তি ঘোষের। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় যে 'মহাত্মা' শিশিরকুমারকে হয়তো বা কিছু লোক আজ প্রধানত শ্রীচৈতন্যের প্রমুখ ভক্ত বলেই জানে, অন্য ব্যাপারের খোঁজ রাখে না। আর মতিলাল ঘোষ বুঝি একেবারেই বিস্মৃত!

বসুমতী অফিসে প্রায় নিয়মিত আসতেন ১৯২১ সালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাঁকে বসুমতীর বিজ্ঞাপনে বর্ণনা করা হত "বঙ্কিমচন্দ্রের শূন্য সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী" বলে, এবং তিনি এলেই রহস্য করে দেখিয়ে দেওয়া হত একটি আরাম কেদারা, বলা হত ঐটিই সেই "শূন্য সিংহাসন"! সেখানে পা ছড়িয়ে বসে তিনি আলবোলায় টান দিতেন—তবে, বলতে ভুলছিলাম যে হালিশহরে মামাবাড়ি সুবাদে আমার পিতামহকে গুরুজন বলে তাঁর পায়ের ধুলো নিতেন, প্রতিদিন নিতেন বলেই বিশেষ করে মনে আছে। তখন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণ বেগে চলেছে। হাওড়া জেলাকংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র; বেশ কয়েক বৎসর (১৯২৬ সালের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় পর্যন্ত) রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ খুব ছিল, বিশেষত সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে হৃদ্যতায় জন্যই সম্ভবত। ১৯২১ সালে নেবুতলা দিয়ে যাবার সময় দাদু লক্ষ্য করেছিলেন একটা সদ্য স্থাপিত দোকান যেখানে পূর্ববাংলার কিছু লোক চরকা বিক্রয় করতেন এবং আশি নম্বর সুতো

চরকায় কাটা হয়েছে বলে প্রচার করছিলেন। তখনকার দিনে চরকায় অমন মিহি সুতো খুবই বিরল ছিল; তাই দাদু এই গল্প বসুমতী অফিসে করায় শরৎ চাটুজ্জে মশায় উৎসাহে মেতে ওঠেন এবং আমাকে টেনে নিয়ে বলেন, 'খোকা, তুমি আমায় দোকানটা দেখিয়ে দাও, আমি এখনই যাব।' পরবর্তী ঘটনা মনে নেই, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে সেই দোকানে আমি গিয়েছিলাম।

অমৃতলাল বসুর মতো শরৎবাবুও তালতলার চটির অনুরাগী ছিলেন, যেমন ছিলেন বসুমতী অফিসে সুরেশ সমাজপতি, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি অনেকে। আমরা তালতলারই বাসিন্দা আর দাদু বলতেন খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানোৎসাহী মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি প্রাক্তন মহারথীর তালতলার চটি সম্বন্ধে আগ্রহের কথা। দাদুর চেয়ে বয়সে সবাই ছোটো বলে চটির ফরমায়েস তাঁকে কেউ দিতেন না, দিতেন আমাকে, এবং জানতেন যে আমার পিতামহ যথাস্থান থেকে তা এনে দেবেন। এখনো সম্ভবত তালতলার চটি নামে একবস্তু বাজারে মেলে, কিন্তু আসল জিনিসের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য নেই। তখনই একজনমাত্র অতিবৃদ্ধ মুচির হাতে প্রকৃত তালতলার চটি তৈরি হত— যার রঙ ছিল কমলালেবু আর গোলাপির এক মনোহর সংমিশ্রণ এবং যার শোভা ছিল ছোট্ট একটু রেশমের শুঁড়, বুড়ো মুচি যাকে বলত 'এশম'! এর বাস ছিল আলিমুদ্দিন স্ট্রীট পার হয়ে রিপন স্কোয়ার-এর সামনে বস্তিতে, আর দারুণ দুঃখ ছিল যে তার একমাত্র 'লাতি' বিলিতি জুতো তৈরি করা নিয়ে মত্ত, তালতলার চটি তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। অনুমান মিথ্যা প্রমাণ হয় নি। কিন্তু সে কথা যাক্। তবে বলতে ইচ্ছে করছে যে একবার সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের বিপুল পায়ের মাপ দেখে চমকে ওঠায় দাদু যখন বলেন যে এ হচ্ছে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের নাতির পা, তখন সে বলে, 'তা হোক বাবু। এ যে বে-অন্যেয়ে পা!'

মনে তখন স্বদেশী আবেগ ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে— সাবান, দাঁতের মাজন, দেশলাই সব চাই স্বদেশী, যা তখন সর্বদা মিলত না। দেশলাই পাওয়া যেত শুধুমাত্র যা হল 'made in Sweden'— আর বসুমতী অফিসে শুনতাম তখনকার নামকরা গল্পলেখক সরোজনাথ ঘোষ যিনি 'সাহিত্যে' বহু

বিখ্যাত বিদেশী গল্পেরও অনুবাদ করেছিলেন) চঞ্চল হয়ে বলছেন ফ্রান্সে বিপ্লবের যুগে সবাই সংকল্প করেছিলেন বলে ফ্রান্সে তৈরি ছুঁচ একদিনের মধ্যে বাজারে নাকি এসেছিল। সাবান এবং সাধারণ প্রসাধনদ্রব্য উৎপাদনে পূর্ব যুগে এইচ. বসু কোম্পানি (অধুনালুপ্ত 'কুন্তলীন'-এর নির্মাতা) এবং আমাদের সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর অবদান খুবই বিশিষ্ট। কত মনোযোগ এবং আনন্দ নিয়ে আমরা বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন পড়তাম এবং তারিফ করতাম শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন-এর (পরে পরশুরাম রচনায় যিনি ছিলেন চিত্রকর) আঁকা ছবির। ১৯২১-২২ সালে এল ক্যালকাটা কেমিক্যাল এবং তাদের মার্গো (নীম) সাবান এবং 'নীম' টুথপেস্ট (যা সুখের বিষয় আজও সগৌরবে চলছে)। স্বদেশী দেশলাই নিয়ে হেফাজৎ কম ছিল না; কাঠি থেকে বারুদের ছোট্ট ছোঁওয়াটুকু প্রায়ই খসে পড়ত আগুন জ্বলে ওঠার আগে; বর্ষা হলেই বাক্স এমন স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠত যে তা দিয়ে কাজ অচল। তবুও সেই স্বদেশী দেশলাই সংগ্রহের জন্য হেঁটে মানিকতলা মেন রোডে গিয়েছি— এক gross (বারো ডজন) কিনে এনে আত্মীয়স্বজনের কাছে জোরজার করে বেচেছি। বাড়ির পাশে ঘোষ পরিবারে এক সমবয়সী বন্ধু এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গী হত। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কিছুতেই মনের বিরক্তি ঠেকাতে পারি না যখন কাউকে দেখি অনিবার্য কারণ বিনাই বিদেশী জিনিস ব্যবহার করতে— পরবর্তী জীবনে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছি দেখে যে বামপন্থী রাজনীতি করনেওয়ালাদের অনেকেই স্বদেশী পণ্য বিষয়ে আগ্রহ রাখেন না, বিদেশে তৈরি না হলেও বিদেশী নামাঙ্কিত ব্যবহার্য দ্রব্য (যেমন Forhan's) তাঁদের অনেকেরই পছন্দসই। হয়তো যুক্তি দিয়ে বলেন (কিন্তু আমি মানি না) যে মালিক মজুর কারো আলাদা দেশ বা জাতি নেই।

*　　*　　*

তখনকার খেলাধুলাও ছিল আমাদের কাছে স্বদেশিয়ানারই একধরনের প্রকাশ। এটা ফুটত সবচেয়ে বেশি ফুটবলে, কারণ ঐ খেলা ছিল সব চেয়ে জনপ্রিয় আর গোষ্ঠ পালের নেতৃত্বে মোহনবাগানকে ("বসুমতী"তে একে বিশেষণ দেওয়া হত 'মোহনিয়া') মনে করা হত দেশের জাগৃতির প্রতীক। ক্রিকেট নিয়েও তখন রঞ্জির অদেখা গৌরবে আমরা গর্বিত, বোম্বাইয়ে

ভিঠল-বালু-নায়ুডু-দেওধরের খেলায় উল্লসিত, কলকাতায় দৌড় ঝাঁপে সাহেব আর ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বলাই চাটুজ্জে, ফণী মিত্তিরের কৃতিত্বে আহ্লাদিত। বেশ মনে আছে ১৯২০ সালে আই. এফ. এ. শীল্ডের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান হারাল দুর্ধর্ষ গোরা টীম D.C.L.I.কে দু'গোলে—যা নিয়ে (পরবর্তী ব্যর্থতা সত্ত্বেও) আমাদের জাঁক চলেছে বহুকাল ধরে। কলেজেও পাঠ সাঙ্গ করা পর্যন্ত ফুটবল দেখা নিয়ে যে দারুণ উৎসাহ ছিল তার প্রধান হেতু যে ছিল স্বাজাত্যাভিমান তাতে সন্দেহ নেই। মনে আছে স্কুলের পুরোনো বন্ধুদের নিয়ে গোলপুকুরে (অর্থাৎ ওয়েলিংটন, বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার— যেখানে এককালে পুকুর ছিল কিন্তু জায়গাটা গোল নয়— ঠিক যেমন কলেজ স্কোয়ার গোলদিঘি-ও গোল নয়!) খেলা দেখে বা না দেখে সন্ধ্যার পর আড্ডা বসত। 'ফষ্টিনষ্টির'র চেয়ে অন্য কথাই যেন একটু বেশি হত। ভাবসাব দেখে একবার এক অবাঙালী মাঝবয়সী সুপুরুষ, হক্‌সর তাঁর নাম, যোগ দিলেন, স্বাদেশিকতার কথা বললেন—মোহনবাগান ১৯২৩ সালে শীল্ড ফাইন্যালে ওঠার সময় তার জয় কামনা করে কদিন ধরে সামনে ভিখারী পেলেই তাকে পয়সা দিয়েছি— এতে অবশ্য ফল হয় নি, কিন্তু মনের মধ্যে পুকোনো এই কৌতুককর কুসংস্কার ভুলতে পারি না। তবে অনুরূপ কিছু পরে যে করি নি তা বলতে পারি। একটু জোর করেই বলতে পারি যে একদম ছেলেবেলায় সোনার হার এবং পৈতার সময় আংটি কয়েক দিন পরলেও জীবনে কখনো তাগা তাবিজ নীলা ইত্যাদি ধারণ করি নি, কোষ্ঠীবিচার করাই নি, কখনো হাত দেখাতে জ্যোতিষীর কাছে যাই নি। (যদিও আমারই ন'মামা, হাইকোর্টের উকিল হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হস্ত-গণনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বহু বিদগ্ধ জনের তাঁর কাছে ঐজন্য আসা-যাওয়া ছিল), নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ জানবার জন্য কোথাও কখনো ছোটাছুটি করি নি, সজ্ঞানে কখনো লটারির টিকিট পর্যন্ত কিনি নি, দৈবীশক্তিকে তুষ্ট করে সুফল সংগ্রহের চিন্তা মনে কখনো স্থান পায় নি। আমারই ছেলেবেলায় নাকি 'বৈদান্তিক মহাশয়' নামে এক হিন্দুস্থানী সাধু আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকগুলো কথা (যেমন আমার বুঝি খুব খ্যাতি হবে, আমি 'রাজরোষে' পড়ব ইত্যাদি) বলা সত্ত্বেও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর ঐ প্রলোভনে পড়ি নি।

হয়তো এর একটা কারণ যে সাংবাদিকতার আবহাওয়ায় মনের মধ্যে

গজায় একধরনের অবিশ্বাসপ্রবণতা, সাংবাদিক ভবী সহজে ভোলে না। বাড়িতে দেখতাম গান্ধীমাহাত্ম্যে বেশ কিছুটা অনাস্থা, রাজনীতিতে অলৌকিক প্রভাব সম্পর্কে একটু যেন অবজ্ঞা— আর বসুমতী অফিসে শুধু সেদিনের মাতোয়ারা রাজনীতি চোখে পড়ত তা নয়, শুনতাম এক ভদ্রলোক নাকি পুলিশের চর, যদিও তিনি প্রায় সব মিটিংয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করতেন, চেয়ার সাজানোতেও হাত দিতেন এবং বসুমতী অফিসে খুবই আসতেন (তবে এলেই সবাই যেন একটু সতর্ক !)। মহৎ ব্যক্তিদের মহত্ত্ব যে অনাবিল নয় এ কথাও আপনা থেকে শেখা হচ্ছিল ; মনে আছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্বন্ধে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল (এবং কলেজে তাঁর অনুরক্ত প্রাক্তন ছাত্র) হয়েও একবার হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কিম্বা সত্যেন্দ্রকুমার বসু বসুমতী সম্পাদকীয় কক্ষে বলেছিলেন : "নিজের খবরটা দিতে গিয়ে 'আচার্য-দেব' বাক্যটি নিজের সম্বন্ধে ব্যবহার করলেন দেখলে ?" একবার বাড়িতে ১৯২১-২২ সালে দেখেছিলাম বাবার কাছে এসেছেন এক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র-সম্পাদক, যাঁর গ্রেফ্‌তার হওয়ার আশঙ্কা ছিল এবং তা এড়াবার জন্য বাবাকে (তখনকার মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক মন্ত্রী) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে সংকটমোচনের অনুরোধ করেছিলেন (যতদূর মনে পড়ে, সুরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক দ্বেষদ্বন্দ্ব ভুলে উপকারটি করেও ছিলেন)। কিছু পরে, যখন উগ্র রাজনীতিতে মন্দা পড়েছে, তখন আবার দেখেছিলাম, বাড়িতে এক বিখ্যাত বিদ্বান্‌ নেতাকে, যিনি বুঝি তখনকার এক 'এন্‌গ্রেভিং' কোম্পানির সহায়তায় জাল নোট রেসের মাঠে চালিয়ে দেওয়া ব্যাপারে জড়িত হয়ে সুরেন বাঁড়ুজ্জে মশায়ের শরণ খুঁজছিলেন (এক্ষেত্রেও বুঝি সুরেন্দ্রনাথ সহায় হয়ে ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেন)।

বেশ একটু বেশি এসে যাচ্ছে এমন সব স্মৃতি যা হয়তো অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তুচ্ছ আর তুচ্ছ নয় এই উভয়কে নিয়েই তো জীবন, আর উভয়ের মধ্যে সীমারেখা খুঁজে পাওয়াও তো দুষ্কর। যাই হোক্‌, স্কুলের পর্ব তখন শেষ হয়ে আসছে। ১৯২২ সালের এপ্রিলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য যখন তৈরি হতে হচ্ছে, তখন নিছক্‌ লেখাপড়া নিয়ে মনকে বাঁধার চেষ্টা পর্যন্ত সম্ভব হয় নি, দেশ জুড়ে ভূমিকম্পের কাঁপুনি থেকে নিস্তার ছিল না। ১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর কলকাতায় হরতাল একেবারে অজ্ঞাতপূর্ব অবিস্মরণীয় ঘটনা—

শহরের কর্তৃত্ব সেদিন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে, ইংরেজ শাসন যেন অন্তর্হিত। ডিসেম্বরে ঘটতে থাকল একের পর আর চাঞ্চল্যকর ঘটনা— স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রেফতার হওয়া ছাড়া যেদিন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী, ভগ্নী উর্মিলা দেবী এবং পুত্র চিররঞ্জন গ্রেফতার হলেন, সেদিন সারা শহর বিহ্বল তো বটেই, রাত্রে তৎকালীন বড়োলাট লর্ড রেডিং-এর সম্মানে ভোজসভা থেকে নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক (যিনি কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান এবং পরে বিলাতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য হন) প্রতিবাদ জানাবার জন্য অভ্যাগতদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। ২৪শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ যুবরাজের কলকাতা আগমন উপলক্ষে আবার হল বিরাট হরতাল— রাজকীয় মিছিল জনতাকে প্রলুব্ধ করল না, মরিয়া হয়ে 'স্টেট্সম্যান্' ছবি দেখাল যে প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে ২৬শে রেসের মাঠে (যা অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু সেখানে কাজ করে জুয়ার মোহ, যুবরাজের বদনশোভা অবলোকনের আনন্দ নয়)। কলকাতা শহরকে অগণিত আলোকে সজ্জিত করা হয়েছিল কয়েকদিন, হয়তো সেজন্য ভিড়ও হয়েছিল, হওয়াই আমাদের মতো রিক্ত দেশে স্বাভাবিক, কিন্তু আমার মনে আছে রোশ্‌নাই দেখতে যাই নি, এমন-কি তিনতলার ছাদে উঠে **'লেডল বাড়ি'** ইত্যাদি কাছাকাছি মঞ্জিলের দীপ্তি দেখতে অস্বীকৃত হয়েছিলাম। আরো মনে আছে যে দুঃখ হয়েছিল বাড়ির কেউ কেউ আলোকসজ্জা দেখতে যেতে কুণ্ঠিত হন নি বলে।

এ কথা বলা নিজের গুণগানের উদ্দেশ্যে নয়। বঞ্চিত দেশে বিপুল এক উৎসবের ছটা থেকে সবাই চোখ ফিরিয়ে রাখবে নিছক্ রাজনীতির ডাকে, এ সম্ভব নয়। তা ছাড়া আগেই বলেছি গান্ধী-আন্দোলন সম্বন্ধে বাড়িতে অনেকের সংশয় এবং সমালোচনা ছিল, আমারও মনে পড়ে, দেখেছি 'হক্ কথা' আখ্যা দিয়ে অনেক ইস্তাহার—তাতে বুঝি প্রাক্তন বিপ্লবীরা অনেকে গান্ধীজীর বিরোধিতা করেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী, ব্যক্তিগতভাবে একান্ত সজ্জন অথচ রাজনীতির দিক থেকে ইংরেজ সরকারের একান্ত অনুগত সতীশরঞ্জন দাশ (বোধ হয় বাংলার তৎকালীন অ্যাড্-ভোকেট-জেনারেল) সংবাদপত্র মারফৎ জানিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে পূর্বোক্ত বিপ্লবীদের সংস্পর্শ আছে। বাড়িতে বহুবার দেখেছি হিন্দু আইনে বিশেষজ্ঞ

বিদ্বান্ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে (অনেকে 'পাগলা জোগীন' বলত তাঁকে), যিনি স্বদেশী যুগের ধারা চালিয়ে বহু বাঙালী যুবককে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার জন্য জার্মানি, জাপান, আমেরিকায় পাঠাবার ব্যবস্থাকল্পে এক সংঘের কর্মকর্তা ছিলেন, এবং জোর গলায় বলতেন যে তাঁর কাজই গঠনমূলক অথচ গান্ধীর কাজের ফলে দেশ যাবে রসাতলে! তখন ঠিক বুঝতাম না সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ বসে ভাবতে গেলে অবশ্যই মনে হয় যে সেদিনের উন্মাদনার মধ্যে ফাঁকি (যাকে বলা যায় 'phoney' ব্যাপার) কম ছিল না— তা বলে সে-উন্মাদনাকে অসার্থক কিছুতেই বলব না, কিন্তু একটু থমকে ভাবব। যাক্— কথার পিঠে কথা এসে বৃত্তান্ত ভারাক্রান্ত হচ্ছে, পরিচ্ছেদের দাঁড়ি তাই এখানেই টানতে চাইছি। বলে নিতে চাই শুধু যে ১৯২২ সালের প্রথমার্ধে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করে কলেজ জীবনের চিত্তব্যাপ্তিতে প্রবেশাধিকার যখন পেলাম, তখন আমার মনের বিকাশে সবচেয়ে আলোড়ক শক্তি হল গান্ধী-আন্দোলন আর তার আনুপূর্বিক ঘটনাস্রোত— কাজ এবং কথায় উল্‌টোপাল্‌টা অনেক কিছুই গান্ধী দেখিয়েছিলেন, কিন্তু মনের শিকড়-গুলোর কোথায় যেন এমন নাড়া লেগেছিল যে সেদিনের প্রায় মূক অধীরতা থেকেই আমার সত্তার ইতিবৃত্ত শুরু।

* * *

১৯২১ সাল শেষ হল, অথচ মহাত্মা গান্ধীর বহু-প্রতিশ্রুত স্বরাজ এল না। আহ্‌মদাবাদে কংগ্রেসে সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ তখন জেলে বলে তাঁর স্থান নিলেন হাকিম আজমল খান। কাগজে দেখলাম 'পূর্ণ স্বাধীনতা' নিয়ে মৌলানা হসরৎ মোহানীর সঙ্গে গান্ধীর বিতর্ক হল; প্রচণ্ড একটা আশাভঙ্গ ঘটেছিল সন্দেহ নেই। পরে জেনেছি, তখন খুব ভালো করে জানতাম না যে ১৯২১ সালের শেষদিকে ইংরেজ শাসকরা সন্ত্রস্ত হয়ে মিটমাট চেয়েছিল। হয়তো বা মোটামুটি সম্মানজনক শর্তে একটা-কিছু ব্যবস্থাও অসম্ভব ছিল না, কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায়, আবুলকালাম আজাদ, আলী ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি সেরা নেতারা জেলে থাকায় গান্ধীজীর পক্ষে একরোখা পথে চলা সহজ হয়েছিল— অহিংসানীতি আঁকড়ে ছিলেন বলে আন্দোলনকে উচ্চতর পর্যায়ে তুলতে তিনি রাজী ছিলেন না, অথচ গ্রহণযোগ্য মিটমাট করার মতো নিছক্ রাজনৈতিক বিচক্ষণতাও তাঁর ছিল না! আহ্‌মদাবাদ

কংগ্রেসে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে কিছু কাগজপত্র বিলি হয়েছিল ; খুব সম্ভব ঐ সময় আমাদের বাড়িতেও দেখেছি (সংবাদপত্র অফিস থেকে পাওয়া) *Vanguard* কাগজ। বিদেশে ছাপা। শুনতাম নাকি মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে এক বিপ্লবীর লেখা। হসরৎ মোহানী পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তুলে এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সর্ববিধ সম্পর্ক ছেদের প্রস্তাব করে গান্ধীজীর সমালোচনা করেন ; ইনি মৌলানা বলে গণ্য হয়েও ছিলেন উর্দু ভাষার এক প্রধান কবি—১৯৩৬ সালে আমরা কজন মিলে সূত্রপাত ঘটিয়ে যে প্রগতি লেখক সম্মেলনের আয়োজন করি লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে, সেখানে তিনি মনোহর বক্তৃতা করেন।

২১শে ডিসেম্বর ১৯২১ স্বরাজ আসবেই এই স্বপ্ন ভেঙে গেলেও অবশ্য গান্ধীজীর ইন্দ্রজাল তখনো জনমনে সক্রিয়। কংগ্রেস তাঁকে সর্বাধিনায়কের ক্ষমতা দিল, বাছাই-করা কয়েকটি জায়গায় খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের উদ্যোগ হল, ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯২২) বড়ো একটা কিছু ঘটবে সবাই জানল। কিন্তু আবার এল এক চকিত আঘাত— উত্তর প্রদেশে অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জনতা চৌরীচৌরা ফাঁড়ির মধ্যে আটক কয়েকজন পুলিশকে জ্বালিয়ে মারায় গান্ধী বললেন, প্রায়শ্চিত্ত করব, "হিমালয়সদৃশ ভুল" আবার করেছি, 'স্বরাজ আমার নাকে নোংরা দুর্গন্ধ এনে দিচ্ছে'। আর প্রত্যাহার করলেন খাজনা বন্ধ ইত্যাদি সর্ববিধ লড়াই। এবার বাস্তবিকই এল দেশজুড়ে বিপুল এক নৈরাশ্য যার ঝাপটা উদ্যত জনতার বুক ভেঙে দিল, বিরাট এক আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলস্বরূপ ক্রমশ আনল একান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটল, জনতা ছত্রভঙ্গ হল।

নিজের স্মৃতি থেকেই কিন্তু বলব যে জনমানসে গান্ধীজী যে মায়া বিস্তার করেছিলেন তা এত বড়ো অসাফল্য সত্ত্বেও কাটল না— কাটবে কেমন করে, তিনি প্রকৃতই যে ছিলেন অতুলন নেতা। বেশ মনে আছে দেশবন্ধু দাশ জেল থেকে বেরিয়ে ব্যবস্থাপক সভায় আসন দখল করার কথা তুলে কংগ্রেসের মধ্যে লড়লেন। মধ্যপ্রদেশে অমরাবতীর মতো স্থানে বক্তৃতায় গান্ধীর নাম করে অকুণ্ঠে বললেন "You bungled and mismanaged", কিন্তু সভাপতি হয়েও যে গয়া কংগ্রেসে (১৯২২) অধিকাংশ প্রতিনিধির সমর্থন তিনি পেলেন না, সেখানে মহাত্মা বিষয়ে বলতে দ্বিধা করলেন না : "Though he may be

jeered and laughed at by thc people of importance, the people 'with a stake in the country'—Scribes and Pharisees of the days of Christ—he will ever be remembered, now and always, by the nation which he led from victory to victory". ইংরিজী উদ্ধৃতিই দিলাম, কারণ কথাগুলো আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরে আমার কণ্ঠস্থ, যেমন ভুলি নি দেশবন্ধুর ভাষণসমাপ্তি শেলী-র 'Prometheus Unbound' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। গান্ধী-সম্বন্ধে এক প্রকার মায়া যে অহেতুক নয়, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ (অন্তত আমার কাছে) ১৯২২ সালের মার্চ মাসে আদালতে বিচারের সময় তাঁর বিবৃতি। নিজেকে চাষী আর তাঁতি বলে বর্ণনা করে বিচারককে তিনি বললেন আইনের সবচেয়ে কঠোর শাস্তি দিতে, কারণ ইংরেজের "শয়তানী" সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে "আগুন নিয়ে খেলা" তিনি করেছেন এবং করে চলবেন-ই। আরো বললেন আইনের দিব্যি-দেওয়া এই শাসন চলে জনগণের শোষণকে ভিত্তি করে— বললেন এ দেশের শহরবাসীরা ("town dwellers", গান্ধীর ব্যবহৃত শব্দ, যেটা হল শব্দান্তরে 'bourgeois', বুর্জোয়া) ছিটেফোঁটা আরাম পায় সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের পক্ষে "দালালী" করে, আর "মুনাফা এবং দালালী উভয়ই হল সাধারণ জনতার কাছে শোষণ করে নেওয়া বস্তু"! দৃপ্তকণ্ঠে জানালেন : "আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের শহরবাসীদের জবাবদিহি করতে হবে— যদি ঊর্ধ্বে ভগবান থাকেন— কারণ মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে এত বড়ো পাপ ইতিহাসে কখনো অনুষ্ঠিত হয় নি।"

যেদিন গান্ধীর ছয় বৎসর কারাদণ্ডের খবর এল (১৮ মার্চ ১৯২২) সেদিনের কথা এখনো মনে জেগে রয়েছে। বসুমতী অফিসে সম্পাদকীয় লিখলেন সত্যেন্দ্রকুমার বসু, কৃতী সাংবাদিক ও সুলেখক হয়েও যিনি আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত— প্রবন্ধের আখ্যা হল "রাজরোষে গুরু গন্ধী" (বসুমতীতে সর্বদাই 'গন্ধী' লেখা হত)। সম্পাদকীয় কক্ষে তা পড়া হল। শ্রোতাদের মধ্যে অর্বাচীন আমিও উপস্থিত এবং শ্রবণকালে বাস্তবিকই রোমাঞ্চিত। হয়তো আজ সে প্রবন্ধ আবেগ জাগাবে না, কিন্তু সেদিনের অনুভূতি অবিস্মরণীয় থেকে গেছে। আরো মনে পড়ে মাসিক বসুমতী-র প্রথম প্রকাশের আয়োজন তখন চলছে— মাঝে মাঝে দেখি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' -রচয়িতা একদা-

খ্যাত অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তকে এবং একবার শুনলাম সমসাময়িক জগৎ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধ, যাতে উল্লিখিত পোঁয়্যাকারে, ক্লেমাঁসো, অর্লাণ্ডো, নিট্টি, লেনিন, ট্রটস্কি, সুন্ইয়াৎসেন, আনওয়ার পাশা, কামাল পাশা— এবং গান্ধী। তার চেয়েও অনেক বেশি চাঞ্চল্য দেখেছিলাম বসুমতী অফিসে যেদিন প্রথিতযশা প্রমথ চৌধুরী ("বীরবল") গান্ধীজীর বিচার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠালেন— যিনি ছিলেন মহাত্মার চিন্তা ও কর্মের কঠোর সমালোচক, তিনিই বিচারকালে প্রদত্ত গান্ধী-বিবৃতিতে মুগ্ধ হয়ে বললেন এমন "স্থিতপ্রজ্ঞ" ও সাহসী মানুষের সন্ধান কখনো তো মেলে নি। খুব সম্ভব মাসিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়— কোথাও এর পুনর্মুদ্রণ কখনো দেখেছি মনে হয় না। চৌরীচৌরা সত্ত্বেও গান্ধী-মহিমায় তখন আমার মন অভিভূত— 'সত্যের আহ্বান' নিয়ে কয়েক মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্কে গান্ধীর পক্ষে হৃদয় রায় দিয়েছে (বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ তখনো হবার কথা নয়), বিলিতি কাপড় জ্বালানো ব্যাপার নিয়ে বন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ-এর জবাবে গান্ধীর দৃপ্ত নির্ঘোষ চমৎকৃত করেছে— 'জগৎকবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব' বলে যাকে শিরোমণি করে সবাই রাখতে চেয়েছি তাঁর সঙ্গে গান্ধীর মতানৈক্যে একটু ক্ষুব্ধ হয়েও আবার তখনই দারুণ হৃষ্ট হয়েছি ১৯২১ সালের প্রথম ভাগেই বিদেশে থাকাকালীন গান্ধী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রোজ্জ্বল বিবৃতি লক্ষ্য করে: কথাগুলো মনে নেই, কিন্তু গান্ধীর মাহাত্ম্য বিষয়ে অমন অকুণ্ঠ এবং ভাবাঢ্য প্রশস্তি কেউ তখনো করে নি।

* * *

একটু আতিশয্য হয়ে পড়লেও আজও ইচ্ছা করে বলতে যে ভগীরথের মতোই যেন গান্ধী এই ঊষর দেশে নতুন গঙ্গা জীবনের সব খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন, কিন্তু মরা গাঙে বান্ কখনো আপনা থেকে বা কোনো একজন ব্যক্তির ইঙ্গিতে ডাকে না। তার কারণ থাকে জীবনের বাস্তবে প্রোথিত হয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯১৪-১৮) উত্তালতারই এক প্রকাশ ছিল সেদিনের জনজাগরণ, যদিও গান্ধীর মতো মহারথীর অবদান সর্বথা অনঃস্বীকার্য। এরই উদাহরণ হল সাহিত্যক্ষেত্রে নব নব উন্মেষ, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে শুধু বিক্ষোভ নয়, বিদ্রোহ, মনুষ্যহৃদয়ের মর্ম অন্বেষণে

সমাজের সর্বস্তরে বিচরণ ও সম্বোধির প্রয়াস। বাড়িতে এবং বসুমতী অফিসে বহুজনকে তখন দেখেছি, যাদের মধ্যে ছিল বহুবিধ অথচ সাহিত্যকেন্দ্রিক কর্মব্যস্ততা। শুনতাম সাহিত্য-সম্মেলনের কথা; দেখতাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অক্লান্ত সেবক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের মতো প্রায় আধ-পাগল মানুষকে, সাহিত্যের নেশা-পেয়ে-ধরা যেমন কাউকে বড়ো একটা দেখেছি বলে জানি না; যেতাম সভাসমিতিতে যেখানে বলতেন কাশিমবাজারের মহারাজা দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কিম্বা প্রাতঃস্মরণীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সদাশয় মহাভাগ, সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ সাধ্যাতীত হলেও যাঁদের সাহিত্যাবেগ ছিল প্রশ্নাতীত— আবার দেখতাম যেন ভিন্ন জাতের মানুষ 'ভারতী' সম্পাদক দীর্ঘকায় সুপুরুষ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে। বসুমতীতে সংবাদিকতা শিক্ষা-ব্যপদেশে কাজ করতেন বাংলায় সদ্যস্থাপিত এম.এ. পরীক্ষা পাস করে ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরে 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক) প্রমুখ কয়েকজন; সেখানে আসতেন বিশ্বপতি চৌধুরী প্রভৃতি সেযুগের নবীন সাহিত্যিক। আর আনকোরা নতুন কাগজ 'কল্লোল'-এর সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ, যিনি মাসিক পরিচালনায় গোকুলচন্দ্র নাগের সহযোগী ছিলেন, কিন্তু যাঁকে প্রথমে জানতাম চিত্রশিল্পী, বিশেষত ব্যঙ্গচিত্রে সুকৌশলী বলে। মাসিক বসুমতী প্রকাশের পিছনে বোধ হয় ছিল একটা নিপুণ ব্যবসায়িক তাগিদ— চাহিদা উঠছে জেনে তাকে মিটাবার জন্যই সম্ভবত তখন আগ্রহ। সন তারিখ ঠিক মনে পড়ছে না, তবে এই কাছাকাছি সময়েই 'বঙ্গবাণী' প্রকাশ হতে আরম্ভ হল, সম্পাদক হলেন নৃতত্ত্ববিশারদ বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং আশুতোষ-তনয় রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে হাইকোর্টের বিচারপতি)। কয়েক বৎসর 'বঙ্গবাণী' সাফল্য ও সৌষ্ঠব নিয়ে চলেছিল— যদি ভুল না হয়ে থাকে তো বলব যে এর প্রধান এবং স্মরণীয় কৃতিত্ব হল ধারাবাহিকভাবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পথের দাবী" (এবং কিছু পরে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস") প্রকাশ করা।' আমার যে সীমিত জগৎ সেখানেও অনেক কিছু ঘটছে বা ঘটতে চলেছে, এমন একটা ধারণা তখনই মনে এসেছিল সন্দেহ নেই।

* * *

চৌহদ্দি যে একটু বাঁধা ছিল তা বোঝা যাবে যখন বলি যে 'কল্লোল' 'কালিকলম' নিয়ে যে উত্তাপ, তার আঁচ তেমন যেন পাই নি। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ বাদ দিলে সবচেয়ে সরেশ লাগত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প— একটু মজা মনে হত 'মানসী ও মর্মবাণী'র যুগ্মসম্পাদক (নাটোরের মহারাজা) জগদিন্দ্রনাথ রায়ের বর্ণাঢ্য গদ্যরীতির পরিচয় পেয়ে; শুনতাম বসুমতী অফিসে গল্প যে মহারাজার মতো সহৃদয় মানুষ আর নেই, পরিচিত প্রায় সকলকে 'তুমি' এমন-কি 'তুই' বলে সম্বোধন করতে তাঁর দেরি লাগত না, তবে কিনা তাঁকে ঐ ভাবে প্রতি-সম্বোধন ঠিক বরদাস্ত ছিল না! দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্র সম্বন্ধে কি জানি কেন প্রথম থেকে একটু নাক-তোলা ভাব আমাদের ছিল, যদিও তাতে দিলীপকুমার রায় লিখিত 'মনের পরশ' উপন্যাসে (যা ভিন্ন নামে পরে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে) তৎকালীন ইয়োরোপ-প্রবাসী বাঙালী তরুণের চিন্তার মাধ্যমে বিশ্বের বৃত্তান্ত মুগ্ধ করত। বাড়িতে সমাদর প্রকৃত প্রস্তাবে পেত অবিস্মরণীয় সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রবাসী' এবং (ইংরেজী) 'মডার্ন রিভিউ'। বিশ্বে প্রবহমান বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন এবং ভারতবর্ষ যেখানে গরীয়ান্ তার সন্ধান প্রাপ্তি, এই উভয় প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে আমাদের দেশাভিমানকে প্রতিষ্ঠিত করতে ঐ দুই সাময়িকীর তুলনা আমাদের কাছে ছিল না। সত্যসন্ধ বলে রামানন্দবাবুর পরিচিতি আমাদের বাড়িতে কীর্তিত হত; আতিশয্য সত্ত্বেও তা ছিল আমাদের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল— শুনেছি যে প্রথিতযশা গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর "বিবিধ প্রসঙ্গে" রামানন্দবাবু বলেন যে ঐ 'সুপরিজ্ঞাত' নাট্যকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তাঁর জানা নেই বলে লেখাও সম্ভব নয়! প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউতে স্বদেশী ও বিদেশী পত্রিকা থেকে সঞ্চয়ন ছিল এক অপূর্ব বস্তু। দুনিয়ার যেখানে হোক্-না কেন, ভারতবাসীর কৃতিত্ব সংবাদ কিম্বা ভারতীয় মাহাত্ম্যের স্বীকৃতি-বিষয়ক তথ্য আমরা সেখানে পেতাম সবচেয়ে বেশি। উগ্র স্বাদেশিকতা সত্ত্বেও 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি চিত্রশিল্পে প্রাচ্য রীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, আবদুর রহমান্ চুঘতাই প্রভৃতি শিল্পীকে ব্যঙ্গ করে বোধ হয় 'মানসী ও মর্মবাণী'-তে যতীন্দ্রকুমার সেন "রাজ্ঞী পক্ষী নিরীক্ষণ

করছেন" বলে একটি ছবি তখন আঁকেন। কিন্তু আমাদের দেশাভিমানী চক্ষুর তৃষ্ণা মিটাবার আয়োজন করতেন প্রধানত রামানন্দবাবু— আমাদের বাড়ির কাছে তখনকার হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সের "সমবায়" ভবনে প্রাচ্য-কলা প্রদর্শনী হত, কিন্তু ত্রিবর্ণে মুদ্রিত ছবি প্রধানত দেখতে পেতাম প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-এর কল্যাণে। আবার 'প্রবাসী'-তেই পড়লাম কলেজ জীবনের প্রারম্ভে রমাঁ রলাঁর 'আত্মদর্শন' (ডক্টর কালিদাস নাগ-কৃত অনুবাদ,) কিম্বা উচ্ছ্বাস বোধ করলাম একদা-খ্যাত কথা-শিল্পী মণীন্দ্রলাল বসুর "রমলা" উপন্যাস এবং "অশোক" গল্পটি নিয়ে। রামানন্দবাবুই জানালেন গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয় মহাত্মার অপরিমেয় সৌসাদৃশ্যের কথা। মাঝে মাঝে যুক্তিনিষ্ঠার কিঞ্চিৎ বিকৃতি ঐ সম্পাদকশিরোমণিকে (বহু কাল পরে রামানন্দবাবুর হিন্দী 'বিশাল ভারত' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীবেনারসীদাস চতুর্বেদীর মতো গুণী ও সজ্জন এই বিশেষণ ব্যবহার করেন) কিছুটা খর্ব করেছে, হিন্দু মহাসভার মতো প্রতিষ্ঠানের দিকেও একদা ঠেলতে পেরেছে, কিন্তু এই বহুগুণান্বিত মানুষটির কাছে আমাদের সমসাময়িকদের (এবং সারা দেশের) ঋণ অপরিশোধ্য।

আমাদের বাড়িতে 'কল্লোল' বা 'কালিকলম' অথবা কিছু পরে 'শনিবারের চিঠি' ধরনের পত্রিকা সম্বন্ধে একটা যেন অনীহা ছিল, কিন্তু স্বল্প পরিচয় সত্ত্বেও 'কল্লোল' যে হাওয়া এনেছিল, তার স্পর্শ মনে না লেগে পারে নি— দীনেশরঞ্জন দাশের কথা আগে বলেছি, কিন্তু কেমন যেন মনে রয়ে গেছে যে তিনি ছিলেন চিত্রকর মাত্র। এটাও জানি যে যতীন্দ্রমোহন সিংহের মতো অনধিকারী "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা"-শীর্ষক প্রায় হাস্যকর যে সমালোচনা খাড়া করছিলেন তাকে একেবারে অকিঞ্চিৎকর ভাবতে আমাদের দেরি হয় নি। বোধ হয় মনের পরিধি আর সাহিত্যরসাস্বাদের অভিজ্ঞান স্থির করে দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত "সাহিত্যধর্ম" প্রবন্ধের মাধ্যমে। যতদূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন জীবনবোধের সত্যতার উপর— বললেন, যেখানে বাস্তবিকই আমাদের মনের "হাট" বসে নি সেখানে "হট্টগোল" সৃষ্টি করা এমনই অনৃতাচরণ যা প্রকৃত রসস্রষ্টার অকর্তব্য। এ নিয়ে বিতর্কের ইঙ্গিত করছি না, শুধু জানিয়ে যাচ্ছি ঘটনা, আর কথা বাড়াতে

চাইছি না কারণ সাহিত্য ও শিল্পের সূক্ষ্ম বিচারে অপারগতা স্বীকার করতে আমার কুণ্ঠা নেই।

* * *

সম্প্রতি কোন্ একটা বইয়ে দেখলাম যে আমেরিকায় বুড়ো-বুড়ীদের নিঃসঙ্গ জীবন আরো দুঃসহ হয়ে ওঠে এজন্য যে বয়স্ক ছেলেমেয়েরা নিজেদের সন্তানদের তাদের কাছ থেকে দূরে রাখতে চায়, বুড়োবুড়ীর সঙ্গ ছোটোদের 'বুড়োটে' করে তুলতে পারে এই আশঙ্কায়। আমাদের দেশে এখনো এ পরিস্থিতি আসে নি— যত খাসা নামই দেওয়া হোক্-না কেন, Old People's Homes-এ যমে-না-নেওয়া পূর্বপুরুষদের ঠেলে দিতে হয়তো এ দেশে এখনো অনেক সময় লাগবে। তবে পূর্বোক্ত আশঙ্কাটা যে অমূলক, তা বলি কেমন করে, যখন দেখি যে সম্ভবত বয়স্কদের সঙ্গে ছেলেবয়সে অনেক সময় কাটাবার ফলে কিছুটা 'বুড়োটে' ভাবও আমার মনে অকালে এসে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে যে-সব হাসিঠাট্টা মনে থেকে গেছে সেগুলোও প্রায়ই হল পরিণত বয়সের কথা। বহুকাল আগে শুনলাম, আর ভুলি নি, যে সুরেশ সমাজপতি মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় মাসিক সমালোচনায় লিখছেন: 'বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু— পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায়-এর "জগৎ ও ব্রহ্ম" চলিতেছে'; মাসের পর মাস ধরিয়া সর্ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী 'ভারতবর্ষ'-এ লিখিতেছেন, "য়ুরোপে তিনমাস"— অনুমান করি, দেবপ্রসাদ-বাবু গরুর গাড়ী করিয়া ইয়োরোপ পরিভ্রমণ করিয়াছেন'। বসুমতী অফিসে কিম্বা বাড়িতে (কাঁটালপাড়া থেকে সমাগত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের মতো ব্যক্তির উপস্থিতিতে) হয়তো শুনলাম গল্প যে বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন ক্লাস থেকে ছাত্রেরা পার্শ্ববর্তী বাড়ির অন্তঃপুরে উঁকি দেওয়ার-অভিযোগ এলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার নাকি বলেন: 'ঈশ্বর, তুমি বিচার করো— আমি মদনমোহন, ক্লাসে পড়াচ্ছি কুমারসম্ভবম্, আর আমার ছেলেরা যদি একটু এদিক সেদিক তাকায়, তো সেটা কি একটা ব্যাপার?' প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর লণ্ডনে জয়োৎসব দেখে এসে মাসিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখলেন, মেয়েরা অবলীলাক্রমে চুম্বন করছে পথচারী যোদ্ধবেশধারী যুবাদের, এবং *Times* এর মতো সনাতনপন্থী পত্রিকা ব্যাখ্যা দিয়েছে "the nation's young defenders"

সম্বন্ধে দেশের কৃতজ্ঞতার উল্লেখ করে— হেমেন্দ্রপ্রসাদের টিপ্পনী হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' থেকে উদ্ধৃতি :

কি বা কানন বল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই,

নবীন তমালে দিব ফাঁস !

হয়তো বা পূর্বতন থিয়েটার জগতের যিনি শিক্ষিত সমাজেও সমাদৃত ছিলেন, সেই অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর কথা শুনলাম। তখনকার দিনে নাকি বিজ্ঞাপন দেওয়া হত, অভিনয় শুরু হবে সন্ধ্যায় ("at candle light")। আরম্ভ হতে চিরাচরিত বিলম্ব ঘটায় ক্ষুব্ধ ইংরেজীনবিশ দর্শক "Is this candle light?" বলতে সমান পাল্লায় এবং তৎক্ষণাৎ অর্ধেন্দুশেখর জবাব দেন, "No, it is gas light!" সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ছেঁচে আনা রসালো বাক্য মাঝে মাঝে কানে এসে যেত, কিন্তু সেগুলো একটু যেন উদ্ভট আর জটিল (পূর্ণচন্দ্র দে 'উদ্ভট-সাগর'-এর কথা আগে উল্লেখ করেছি) বলে হয়তো মনে গেঁথে যায় নি— বহুকাল পরে পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলে সোভিয়েট দেশে গিয়ে (১৯৬৮) জর্জিয়ার রাজধানী টিবিলিসি-র সুরম্য হোটেলে উড়িষ্যার সংসদ সদস্য শ্রীশ্রদ্ধাকর সূপকার যখন 'উদ্ভট' উদ্ধৃতি দিতে থাকেন তখন পাল্লা দিতে আমার পক্ষে 'সীতায়াঃ পাতালপ্রবেশঃ' ইত্যাদি বিষয়ে অতি-বিশুদ্ধ শ্লোক আউড়েই তুষ্ট থাকতে হয়েছিল! সম্প্রতি আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু এবং সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কর্মে সহযোগী চিন্মোহন সেহানবিশ বলছিলেন টালিগঞ্জের দিকে 'বস্'-যাত্রার বিড়ম্বনার কথা— যাত্রী উঠলেন তখন তিনি যেন উত্তমকুমার, কিছু পরে ভিড়ের চাপে ঊর্ধ্বে দুই নিরালম্ব হাত রেখে মনে হল অভিনয় করছেন নদের নিমাই ভূমিকায়, আরো পরে যেন বামাক্ষ্যাপা এবং অবশেষে গন্তব্যস্থানে উপনীত যখন হলেন তখন মূর্তি হল যেন তৈলঙ্গ স্বামী! শুনে মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে শোনা কথা—শীতকে পরোয়া করেন না এই জাঁক করার পর ব্রাহ্মণকে গাত্রাচ্ছাদন বিনা শয্যাগ্রহণ করতে বলা হল, আরদেখা গেল 'প্রথম রাত্রিতে ঠাকুর ঢেঁকি অবতার; দ্বিতীয় রাত্রিতে ঠাকুর ধনুকে টঙ্কার; তৃতীয় রাত্রিতে ঠাকুর কুকুরকুণ্ডলী; চতুর্থ রাত্রিতে ঠাকুর বেনের পুঁটুলি!'

অনেক মজার কথা তখন শুনতাম, কিন্তু তাতে লঘু ছন্দ যেন থাকত একটু কম—প্রায় সব সময়ে একটা গুরুত্ব, একটা মহার্ঘতা বুঝি তাতে

লুকোনো থাকত। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে নিয়েও ঠাট্টা শুনেছি— মরবার কিছু-দিন আগে তিনি নাকি বলেছিলেন শিষ্যদের উদ্দেশ করে: 'তোরা সবাই আমাকে "ভগবান্, ভগবান্" বলে ডাকছিস, এদিকে ''ভগবান্'' মরতে বসেছে ক্যান্সারে!' জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি সম্বন্ধে শুনতাম রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমন প্রকৃত সংসার-বৈরাগী মানুষ ছিলেন— একটু ইঙ্গিত থাকত যে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি এবং ভক্তবৃন্দ-কর্তৃক "ঋষি" বলে বন্দিত হলেও সংসার ব্যাপারে একেবারেই হাবাগোবা ছিলেন না, পিতার কল্যাণে জমিদারি পরিচালনাতে তাঁর দক্ষতা ছিল। কবে যেন কন্যাদায়গ্রস্ত কে এসে দ্বিজেন্দ্রনাথকে অর্থের জন্য আবেদন জানালে তিনি হাতে কাঁচা-টাকা না থাকায় ঘরের কার্পেটটি দান করতে উদ্যত হলে কর্মচারীরা নাকি তাঁকে বোঝায় যে সংসারে টানাটানি যাচ্ছে, আর শিশুর মতো সরলমতি দ্বিজেন্দ্রনাথ হতবুদ্ধি হয়ে বুঝি বলেন: 'সে কি কথা, আমরা তো রোজই লুচি খাচ্ছি!' স্বদেশীর কথা উঠতে শুনতাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাহাজের ব্যবসা ফাঁদার গল্প— ম্যাক্‌নীল কি অন্য কোন্ বিদেশী স্টিমার কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে শুধু জাহাজ ভাড়া কমানো নয়, যাত্রীদের জন্য বিশেষ জলখাবারের ব্যবস্থা এবং ব্যবসার ভরাডুবির কাহিনী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তখন দেশজোড়া প্রচণ্ড সুনাম— কিন্তু সংবাদপত্র অফিসে 'দাশ সাহেব'-এর বিচিত্র জীবন নিয়ে সরস (এবং কিঞ্চিৎ নির্দোষ শ্লেষযুক্ত) আলাপ কানে না এসে পারত না। মহৎ ব্যক্তিদের কীর্তিকলাপ যে সুপরিকল্পিত প্রচারের অপেক্ষা রাখে, 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি' বিহার যে শুধু কল্পরাজ্যেরই ব্যাপার, তা তুচ্ছ ঘটনার মৌখিক আখ্যান থেকে জানা যেত। মহদাশয় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল হয়েও কেউ হয়তো সহাস্যে একদিন জ্ঞাপন করলেন, তাঁর বিদেশযাত্রার পূর্বেই যথাবিহিত (তৎকালে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যথাসম্ভব) প্রচার-ব্যবস্থা কেমন ভাবে হচ্ছে— এটা লিখতে গিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালীন অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (যিনি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েও স্বভাবদাক্ষিণ্যের গুণে কলাবিভাগে আমাদের মতো ছাত্রেরও একান্ত শুভানুধ্যায়ী শিক্ষক ও বন্ধু ছিলেন) একবার কবিদের স্বতঃস্ফূর্ত রচনা নিয়ে রহস্য করলেন: 'আরে, বর্ষার কবিতা প্ল্যান করে মাঘ-ফাল্গুনে না লিখলে

আষাঢ়-শ্রাবণের 'প্রবাসী'-তে বার করবে কেমন করে?' ভারতবর্ষে ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যের অধ্যাপকদের মুখে কখনো শুনি নি এ-ধরনের কথা যে Tennysonকে বলা যায় "a Victorian moonbeam manufacturer", কিন্তু কাছাকাছি যেতে পারে এমন কথা দুর্লভ ছিল না সাংবাদিকতা আর সাহিত্যজিজ্ঞাসার মিশেলী যে আবহাওয়ায় তখন অনেকটা সময় কাটত। মাহাত্ম্যে যে খাদ কিছু পরিমাণে থাকাটাই স্বাভাবিক, এ-বোধ যেন অজ্ঞাতে এবং কতকটা অকালেই মনের মধ্যে প্রবেশ করছিল।

* * *

মাট্রিকুলেশনের পালা সেরে আমাদের পরিবারের অধিকাংশের মতো আমিও ঢুকলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে; ক্লাস শুরু হল ১৯২২ সালের জুলাই থেকে। মাসে দশটাকার 'স্কলারশিপ' পেয়েছিলাম (যা তালতলা স্কুলের ক্ষেত্রে ছিল অভূতপূর্ব)— কিন্তু তা নিয়ে জাঁক মনের কোণে একটু উঁকি দিয়ে থাকলেও চুপ্সে গেল যখন দেখা হল বহু 'ভালো' ছেলের সঙ্গে, যাদের ভিড় ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের বৈশিষ্ট্য। বেশ মনে আছে, কলেজে প্রকাণ্ড সিঁড়ির পিছনে টাঙানো 'রুটিন্' টুকে আনতে গিয়ে সবাই লক্ষ্য না করে পারল না বেঁটেখাটো, আচকান-পরা আর উচ্ছল এবং ব্যগ্র একটি ছেলেকে —যে পরবর্তী জীবনে সমসাময়িকদের মধ্যে সব চেয়ে খ্যাতিমান হয়েছিল: হুমায়ুন জহীর উদ্দীন আমীর-ঈ-কবির। আচকান আর সে বড়ো একটা পরে নি; কিন্তু খর্বাকৃতি সত্ত্বেও অতীব সপ্রতিভ ও কথোপকথনপ্রিয় মানুষটি প্রথম থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রথম দিনই জানলাম সে মাসে পনেরো টাকার স্কলারশিপ নিয়ে এসেছে। নম্বর পেয়েছে সাতশোর মধ্যে ৬০১ (আমি ৫৮৫-এর ওপর উঠতে পারি নি!) ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যান্য যে-ক'জনের সঙ্গে আলাপ হল, তাদের মধ্যেও ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু উজ্জ্বল রত্ন, আকাশের তারার মতোই যাদের কেউ কেউ একেবারে মিলিয়ে গেছে আবার কারো কারো দ্যুতি অন্তত কিছুকাল থেকেছে। তালিকা দিতে বসি নি, তাই নামোল্লেখ বেশি করব না— তবে বলতেই হয় যে সে যুগের প্রেসিডেন্সি কলেজের পরম্পরানুযায়ী অভিজাত বংশের অনেকে ভর্তি হয় বলে আগে-অজানা ধরনের কিছু ছেলের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। এদের মধ্যে ছিল বর্ধমানরাজকুমার উদয়চাঁদ মহতাব প্রমুখ

কয়েকজন। 'রোল নম্বর' মাফিক বসতে হওয়ায় আমার আসন পড়েছিল ঠিক দিঘাপতিয়ার তুষারকুমার রায়ের পাশে; স্বভাবতই ভাব হয়েছিল, মাঝে মাঝে চড়া যেত তার Baby Austin গাড়িতে, যা সে নিজে চালাত এবং যেটা দেখে সাহেব প্রিন্সিপাল একদিন 'this lovely toy cart' (মৃচ্ছকটিক!) বলে বাহবা জানালেন। ক্রমে দেখলাম, পরীক্ষায় আমার চেয়ে 'ভালো' অনেকে থাকার দরুন কিম্বা অন্যবিধ মাধ্যাকর্ষণের টানে আমি গিয়ে পড়লাম যে দলে সেখানে পরীক্ষা নিয়ে ব্যতিব্যস্ততা কম। 'আই. এ.' ক্লাসে পড়ার সময় তাই অধিকাংশ অধ্যাপকদের তেমন নজরে পড়ি নি, পড়ার চেষ্টাও কোনোকালে করি নি— হৃদ্যতা ছিল হুমায়ুনের সঙ্গে, ঢাকা থেকে পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আসা পঞ্চানন চক্রবর্তীর (পরবর্তীকালে কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপকরূপে সুবিদিত) সঙ্গে, অরুণকুমার সেনের (পরে সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল) সঙ্গে, কিম্বা আতাউর রহমানের (এই প্রকৃত প্রতিভাধরের পরবর্তী সংবাদ জানতে না পারা আমার একটা বড়ো খেদ) সঙ্গে, কিন্তু আমাদের আড্ডা বেশি জমত একটু অন্যত্র, যেখানে শচীন বসু মল্লিক, রবি গুপ্ত- তুষার রায় প্রভৃতি ছিল নেতা। ক্রমশ জড়িয়ে পড়া গেল প্রেসিডেন্সি কলেজের মায়ায়— দুঃস্থ স্কুলে যা ছিল না, এখানে তার কিছুটা সাক্ষাৎ পাওয়া গেল: বিরাট সৌধ, বিপুল প্রাঙ্গণ, প্রশস্ত পাঠাগার আর গবেষণাগৃহ; ভুলতে-পারা-যায়-না এমন সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেন এক নতুন জগৎ, যেখানে মেলে মনের ব্যাপ্তি, যেখানে দেখা যায় দেশবিশ্রুত শিক্ষকদের, যেখানে বাংলা দেশে নামকরা প্রায় প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই উচ্চশিক্ষা ঘটেছে, যেটা বিদেশী সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েও যেন দেশের স্বকীয় ও বহুশ্লাঘ্য বিদ্যাস্থান।

প্রিন্সিপাল ব্যারো সম্বন্ধে সকলের একটা সম্ভ্রম আর ভয় ছিল— বিশেষ করে এইজন্য যে তাঁর ইংরাজি বড়ো কেউ বুঝতে পারতাম না। হোম্ সাহেব ছিলেন ইংরিজী বিভাগে, কিন্তু আমরা তাঁর কাছে পড়ি নি, শীঘ্রই তিনি অবসরও নিয়ে গেলেন। স্টার্লিং প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতেই আমাদের বাইব্‌ল্ পড়ালেন কয়েক মাস— আমুদে লোক, ক্লাসের মস্ত জানলায় বসে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার-রত কাকের দিকে তাক্ করে খড়ি ছুড়ে আর যীশুখ্রীস্টের কাহিনী পড়াতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর নাম করে আমাদের আনন্দ দেবার ক্ষমতা তাঁর

ছিল, যদিও সন্দেহ নেই যে এ-দেশবাসীর তুলনায় ইংরেজ চরিত্রের একান্ত উৎকর্ষ এবং ভারতে ইংরেজ শাসনের ন্যায্যতা তাঁর কাছে ছিল অবধারিত। পরে এম. এ. পড়ার সময় তিনি যখন প্রিন্সিপাল এবং আমি ইউনিয়নের সম্পাদক, তখন বেশ কাছ থেকে স্টার্লিংকে দেখেছিলাম— আমার ওপর তাঁর স্নেহ কিছু পরিমাণে পড়েছিল, বহু বৎসর পরেও তার আশ্চর্য পরিচয় পেয়েছি। সে কথা থাক্, সাহেব অধ্যাপক বোধ হয় আর-একজন তখন ছিলেন—পদার্থ-বিজ্ঞানে ডক্টর হ্যারিসন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্টেপ্‌লটন্‌এর মাথায় ঢুকেছিল যে কলাবিভাগের ছেলেদের বিজ্ঞান শিক্ষকদের কাছে এবং বিজ্ঞানের ছাত্রদের কলাবিভাগে শিক্ষকদের কাছে 'টিউটোরিয়ল' ক্লাস করা দরকার ; তাই হ্যারিসনের কাছে কিছুকাল মাঝে মাঝে আমরা গিয়েছি, করণীয় বা শিক্ষণীয় অবশ্য বিশেষ কিছুই উভয় পক্ষ আবিষ্কার করতে পারি নি। যাই হোক্,আমাদের সময় থেকেই সাহেবপ্রাধান্য কলেজে কমছিল ; এই ক'জন ছাড়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (যিনি পরে 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদক হন) আর র‍্যাম্‌স্‌বোথাম অধ্যক্ষ হয়েছিলেন অল্পকালের জন্য— মাঝারি ধরনের পণ্ডিত, মানুষ মোটামুটি অমায়িক এরা প্রায় সকলেই কিন্তু 'আহামরি' করার মতো গুণ তাদের দেখি নি। স্টেপ্‌লটন সম্বন্ধে কিছু কথা পরে বলতে হবে ; বেশ খানিকটা দুর্নাম তাঁব ছিল, হাবভাব-মতিগতিতে কিপ্‌লিং-এর যুগ-ঘেঁষা গন্ধ থাকত, মিষ্টি কথা বললেও সেটা যেন বিশ্বাসযোগ্য ভাবা যেত না, অব্যক্ত হলেও সর্বদা একটা সন্দেহ আর পরস্পর-বৈরিতা আমাদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল।

সাহেবদের চেয়ে স্বদেশী অধ্যাপকদেরই তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে নাম ডাক ছিল বেশি। ইতিহাসে কুরুভিলা জ্যাকারিয়া, দর্শনে আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রভুদত্ত শাস্ত্রী, ইংরিজীতে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্থনীতিতে জাহাঙ্গীর কয়াজী ও পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞান বিভাগে সুবোধচন্দ্র ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য— আরো বহু কৃতবিদ্য যাঁদের তালিকার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রফুল্লবাবু তখনো বুকবন্ধ কোট-প্যান্ট পরতেন (যা অচিরে তিনি বর্জন করলেন) ; কলেজ জীবনের প্রথম দিকে তাঁকে নিকট থেকে জানার সুযোগ পাই নি, একটু ভয়ও করতাম তাঁকে— তবে ভয় যেন কেটে গেল যেদিন কয়েকজন

বন্ধুর সঙ্গে দেখলাম, ফুটবল মাঠে টিকিট ঘরের সামনে ভিড় ('কিউ'-এর যুগ তখনো আসে নি) ভাঙাবার জন্য ঘোড়-সওয়ার তাড়া করায় ছত্রভঙ্গ জনতার মধ্যে প্রফুল্লবাবু এবং শ্রীকুমারবাবুও রয়েছেন! অশ্বারোহী প্রহরীর লগুড় পিঠে পড়ে নি কারো, কিন্তু সেই সন্ত্রস্ত জনসংস্পর্শে তখনো দূরাবস্থিত আচার্যদের সঙ্গে একটু যেন সমাত্মক ভাবেরই উদ্রেক হয়েছিল। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাচ্ছে ২৫।৩০ বৎসর পূর্বে পর্যন্ত প্রচলিত এক সুখকর ধারা ; রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক হয়েও কয়েক-জন সহকর্মী নিয়ে ফুটবল মাঠের 'গ্যালারি'-র সস্তা টিকিট (সম্ভবত চার আনা) নিয়ে ঢুকে দেখা গেল প্রথম সারিতে বেঞ্চে বসে আছেন (পরে দাঁড়াতে হবে, যেমন আজও হয়) কিছু-আগে-আসা আমাদেরই কলেজের শ্রুতকীর্তি অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, প্রশান্ত মনে গল্প করছেন পার্শ্বে উপবিষ্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ সুধীর ভট্টাচার্যের সঙ্গে! গত বিশ-পঁচিশ বৎসরে এ-ধারা যেন বদ্‌লে গেছে একবারে ; রবীন্দ্রনারায়ণের মতো ব্যক্তি সাধারণের ভিড়ে গা ঘেঁষে কোনো খেলাই দেখবেন না, আর যদি দেখেন তো সংগঠকদের আনুকূল্যে নিমন্ত্রিতদের আসনে ছাড়া কোথাও বসবেন না। ন্যায়-অন্যায়ের কথা তুলছি না, কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয় এতে—জীবনের সহজ, সরল, সহৃদয় সাযুজ্য যেন হারিয়ে গেছে।

আই.এ. ক্লাসে জ্যাকারিয়া সাহেব আমাদের বেশিদিন পড়ান নি, কারণ আমাদের পক্ষে ঠিক তাঁর সরেশ ইংরিজী এবং চিন্তার দ্রুত গতি অনুসরণ করা কঠিন ছিল। তাঁকে খুব নিকট থেকে জেনেছিলাম বি. এ. ক্লাসে, এবং একেবারে ভক্ত বনে গিয়েছিলাম। তবু বেশ মনে আছে, তিনি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে এলেন প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস পড়াতে ; প্রথম দিনই আনলেন একটি মানচিত্র, সবাইকে বললেন ম্যাপ আঁকতে হবে কারণ তা না হলে অনেক কিছু বোধগম্য হবে না, এবং স্মিতমুখে মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বিষয়টি বোঝালেন। তথ্যগুলি বুঝি বা না বুঝি, অন্তত এটুকু বুঝলাম যে ইতিহাস ব্যাপারটার একটা নিজস্ব মায়া আছে, যার জালে ধরা পড়তে পারাটা একটা দামী অভিজ্ঞতা। পরে আমাদের গ্রীক ইতিহাস পড়ালেন বিনয়কুমার সেন, রোমের ইতিহাস পড়ালেন উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, আর ইংলণ্ডের

ইতিহাস পড়ালেন সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। প্রথমোক্ত দুজনের সম্বন্ধে পরিণত বয়সের পূর্ব পর্যন্ত একটা দূরত্ব বোধ ছাত্রদের ছিল; পরে আমরা জেনেছি তাঁদের চরিত্রমাধুর্য এবং বিশেষভাবে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতি ব্যাপারে ডক্টর ঘোষালের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা। উভয়েই এখন স্বর্গত; সুখের বিষয়, মজুমদার মহাশয় আজও জীবিত, আর আমরা কখনো ভুলব না ছাত্রদের আত্মীয় করে নেওয়ার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা— বিদ্যাদানের গভীর স্তরে প্রবেশের চেষ্টা তিনি করতেন না, চাইতেন শুধু ছাত্রদের নিম্নতম প্রয়োজন মেটাতে, পরীক্ষায় সুফল অর্জন ব্যাপারে কার্যকর সহায়তা করতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্নেহ দিয়ে পরস্পরকে নিকট-সম্পর্কিত করে রাখতে। এ বড়ো অল্প কথা নয়—প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন গুরুগম্ভীর পরিবেশে এর মূল্য ছিল প্রচুর।

লজিক-এর ক্লাসে খ্যাতনামা আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রাশভারি ধরন যে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি ঘটাবে না তা বুঝতে আমাদের দেরি হয় নি। আরো অবাক্ হওয়া গিয়েছিল রজনীকান্ত দত্তকে দেখে: চেহারা এবং চলা-ফেরা সাহেবী (অনতিবিলম্বে জানা গেল তিনি ধর্মে খ্রীস্টান), ক্লাসে নিখুঁত শৃঙ্খলা রক্ষায় সুদৃঢ়, অথচ কিছুটা বিলম্বে আবিষ্কার করা গেল যে কুসুম-কোমল এক অন্তঃকরণ যেন গোপন করে রেখেছেন। রিপন কলেজের কাছে ইনি থাকতেন: আমার বাবা রিপন ল কলেজে পড়িয়ে বহুবার এঁর বাড়িতে কিছু সময় কাটিয়ে আসতেন; আমার সঙ্গেও পরবর্তী জীবনে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, আর তখন বহু পরিচয় পেয়েছি এই আপাতদৃষ্টিতে কঠোর মানুষটির প্রাণের দাক্ষিণ্যের। সংস্কৃত পড়াতেন তীক্ষ্ণচেতা নীলমণি শাস্ত্রী আর কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে 'শাস্ত্রীমশায়' বলে বন্দিত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়; আরো কাছাকাছি এসেছিলেন ভাটপাড়ার শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য— কালিদাস শুধু নয়, মল্লিনাথের টীকা পর্যন্ত যাঁর ছিল কণ্ঠস্থ, যিনি নিছক্ স্মৃতি থেকে পড়িয়ে যেতেন "রঘুবংশ", এবং এমন চমৎকারভাবে, যে প্রধানত তার কল্যাণে বহু অনবদ্য শ্লোক আমাদেরও কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। সংস্কৃতের 'বাঙালী' উচ্চারণ আমার কানে লাগে, ধ্বনিমাধুর্য কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হলে আমার খেদ, কিন্তু 'গুণসন্নিপাতে' ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই 'একো হি দোষঃ' নিমজ্জিত হয়ে যেত। আজও যে প্রয়াগে ত্রিবেণীসঙ্গম রেলব্রিজ

থেকে দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় সেই অপূর্ব চারটি শ্লোক যার সমাপ্তিতে রয়েছে মনোহর দুই পঙ্‌ক্তি :

ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

তার সাধকতম কারণ হল কলেজে ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'রঘুবংশ'-ব্যাখ্যান।

ইংরিজী যাঁরা আমাদের আই. এ. ক্লাসে পড়াতেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে বি. বি. রায়ের (বীরেন্দ্রবিনোদ) কথা। পরে ইনি সরকারী কর্ম ত্যাগ করেন, 'স্টেট্‌স্‌মান্‌' পত্রিকার একজন প্রধান লেখক এবং রিপন কলেজের অধ্যাপক হন। চট্টগ্রামবাসী হয়েও ইংরিজী উচ্চারণ ইনি এমনভাবে চোস্ত্‌ করেছিলেন যে তা লক্ষ্য না করে চলত না— এবং পড়াতেন ভালো। Rupert Brooke-এর কবিতা পড়ালেন এমনভাবে যে ভোলা যায় না, অন্য আরো কত কবিতা— আজকের যুগে ছেলেমেয়েরা হাসবে, শেলী দূরে থাক্‌ কীট্‌স্‌-ও আজ প্রায় বাতিল, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নাম করলে একঘরে হতে হয় কি না কে জানে, কিন্তু আমরা ইংরিজী কবিতার ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হয়েছিলাম, আজও কিছু পরিমাণে বাতিল ইংরিজী কবিতার (এলিয়ট্‌ও নাকি এখন কাব্যকলার চৌহদ্দীর বাইরে!) মোহে বাঁধা আছি। স্কুল জীবন থেকে শুরু করে কবিতা মুখস্থ হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল; শুধু কবিতা কেন, কিছু গদ্যও মুখস্থ হয়ে যেত, যেমন অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাসেরও কোনো কোনো অংশ— কেমন যেন মনে হত অধরবাবু নানা বাধা সত্ত্বেও দেশভক্তি ফুটিয়ে তুলছেন (মন তখনো তেমন সজাগ নিশ্চয়ই ছিল না, কিন্তু একটা তফাত যেন বুঝতাম যখন পড়তে হত 'England's Work in India', যা আমাদের ছাত্রাবস্থায় এবং সম্ভবত স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাস ছাত্রদের কাছে অবশ্যপাঠ্য ছিল)। কলেজের আদিপর্বে অভিভূত হতাম টমাস্‌ মুর-এর 'Pro Patria Mori' পড়ে— আমাদেরই ক্ষুদিরাম, কানাইলালের মতো আয়র্লণ্ডের তরুণ, Robert Emmet-এর ফাঁসি নিয়ে লেখা :

Ah, blest are the lovers and friends who shall live
The days of thy glory to see,

But the next dearest blessing that Heaven can give
Is the pride of thus dying for thee !

অনুভূতির অস্পষ্ট অভিভূতি অবশ্যই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু নিছক সত্যকথনের উদ্দেশ্যেই বলছি, উপরোক্ত লাইনগুলি লিখতে গিয়ে কেমন যেন বুকে ধাক্কা লাগছে। আর মনে পড়ে যাচ্ছে যা হয়তো শিল্পবিচারে এবং আজকের মানসিকতার মানদণ্ডে অধর্তব্য, সেই ছাত্রাবস্থা থেকে কণ্ঠস্থ Byron-এর 'Isles of Greece' :

Place me on Sunium's marble steep,
Where nothing save the waves and I
Shall hear our mutual murmurs sweep,
Here, swan-like, let me sing and die !
A land of slaves will never be mine,
Dash down you cup of Samian wine !

* * *

মাঝে মাঝে একটু আশ্চর্য লাগে যে সন্ত্রাসবাদী দলে 'রিক্রুট' করায় ব্যস্ত যে বিপ্লবী 'আড়কাটি'-দের কথা পরে শুনেছি তাদের কারো সঙ্গে কলেজ জীবনে মোলাকাৎ হয় নি। এর কারণ সম্ভবত আমাদের পারিবারিক পরিবেশ, আর তা ছাড়া কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের মতো আত্মীয় এবং সন্তোষকুমার মিত্রের মতো পারিবারিক বন্ধু তখন গান্ধীধারার অনুগত বাহক। তবু এ কথা আতিশয্য নয় যে মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারই'-ধরনের চিন্তা মনকে সেই বয়সে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল— ফলে জীবনপ্রাচুর্যের দিক থেকে হয়তো এসেছে কিছু রিক্ততা, কিন্তু স্বার্থচিন্তার ক্ষুদ্রতা থেকেও বোধ হয় রক্ষা পেয়েছিলাম। বাড়ি বোঝাই বই থেকে খুঁজে বার করতাম বর্তমানের গ্লানিকে মুছে দেবার মতো প্রাচীন ভারতীয় গৌরবের কাহিনী ; জীবিত মহা-পুরুষদের তালিকা করে যাওয়া প্রায় একটা ছোটোখাটো নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অরবিন্দ ঘোষ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, এমন নামও সেদিন অপ্রতুল ছিল না। যখন আই.এ. ক্লাসে পড়ি, তখন অনেক খেটে একটা প্রবন্ধ লিখি, কলেজ-পাঠ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বহির্ভূত—

প্রাচীন ভারতের গরিমা নিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে সে-রচনার কোনো চিহ্ন আজ নেই; নিশ্চয়ই তা ছিল একেবারে কাঁচা, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতের (যেমন তাঁর গ্রন্থ *India ! What can it teach us ?* থেকে) উদ্ধৃতি-কণ্টকিত। মনে আছে ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম (তখনো প্রবাসী) অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের; সে-যুগে নানা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের ভাব-মূর্তি তুলে ধরার প্রয়াসে লেগে থেকে কিঞ্চিৎবিদ্রূপের ভাগী তিনি হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর বহু রচনা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। নিচক্ ভারতগর্বী হয়ে উঠি নি — যদি হতাম তা হলে নিশ্চয়ই ভুলে যেতাম ১৯২১ সালে কলকাতায় Oriental Conference-এ ফরাসী মনীষী সিল্‌ভ্যাঁ লেভি-র সতর্ক বাণী: "Old India, the mother of numberless children who have passed through days of triumph and ages of sorrow, the ever-rejuvenating mother of numberless children to come, stands before you, anxious about her way. It is not enough to worship your mother. Help her !" মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত ব্যাপারও মনের এই ধারাকে পুষ্ট করেছে; বি. এ. পরীক্ষায় ইংরিজী প্রশ্নপত্রে দেখলাম প্রবন্ধ ("essay") লিখতে পারি বেশ মনোমত বিষয়ে: 'Love thou thy land, with love far brought, from out the storied past'। আই. এ. সংস্কৃত পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম হওয়ায় হরিশচন্দ্র কবিরত্ন 'প্রাইজ' যখন পেলাম, তখন সেই টাকায় কেনা বইয়ের মধ্যে ছিল প্রায় সদ্য-প্রকাশিত *Hindu Polity* (দেশাভিমানী বিদ্বান কে. পি. জয়স্‌ওয়াল্‌-এর বিখ্যাত গ্রন্থ) আর ম্যাকডনেল-কৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।

বসুমতী অফিসে দাদুর সঙ্গে যাওয়া এই সময় থেকে একটু কমতে আরম্ভ করে; আমার ছোটো ভাইরা তখন সেই কাজে অংশীদারী শুরু করছে। তবুও ১৯২৬।২৭ সাল পর্যন্ত সেখানে যাতায়াত অল্প ছিল না। সেখানে এক-দিন দেখলাম (বোধ হয় ১৯২৩ সালে) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিয়ে এলেন মেঘনাদ সাহাকে, পরিচয় দিলেন বলে: "Here comes a greater man than Dr Ray"—মনে আছে, পরে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যেন একটু চোখ টিপে কাকে বললেন: 'Greater, অর্থাৎ উনি নিজে 'great' তো বটে-ই !' সম্ভবত, ঐ-সময় নাগাদ খুব কাছ থেকে দেখলাম আচার্য রায়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বন্যা-

ত্রাণে প্রবৃত্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে। বসুমতী অফিসে দেখতাম মৌলানা আকরম খান, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামাদের। মাঝে মাঝে আসতেন রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি ব্যাপারে সুকৌশলী, পরে প্রভূত কিন্তু মিশ্র খ্যাতির অধিকারী নলিনীরঞ্জন সরকার। দিল্লী থেকে আসতেন উষানাথ সেন। তিনি পরে ইংরেজ সরকারের 'নাইট্' খেতাব পেয়েছিলেন, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য কেশবচন্দ্র রায়ের প্রধান সহকারীরূপে সাংবাদিক মহলে তিনি অবিস্মরণীয়। বহু বৎসর পরে পার্লামেণ্টে এসে দেখেছি দিল্লীতে তাঁর প্রতিপত্তি; তবে তাঁর সম্বন্ধে আমার স্মৃতি একেবারে ব্যক্তিগত এবং মধুর— বেশ মনে পড়ছে বসুমতীর অনেককে ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পানিহাটিতে তাঁর বাড়িতে খাইয়ে এবং নলিনীকান্ত সরকারের উদাত্ত কণ্ঠে নজরুলের গান শুনিয়ে ফেরত দিচ্ছেন; শীতের রাত্রে রেল স্টেশনে গাড়ির অপেক্ষায় সবাই; আকৃতিতে সুদর্শন আর পরিচ্ছদে ছিম্‌ছাম্‌ উষানাথ মাথায় শাল জড়িয়ে বলছেন 'তোমরা বুঝবে না হে, এই টাক্‌ মাথা নিয়ে কত বিড়ম্বনা!'

যেদিন বসুমতী অফিস যাওয়ার পালা না পড়ে, সেদিন সন্ধ্যায় প্রায়ই নিশীথ ঘোষ, নন্দ কুণ্ডু, মৃগাঙ্ক চৌধুরীর মতো স্কুল বন্ধুদের সঙ্গে বেড়ানো বা আড্ডা চলত। আড্ডার জায়গা ছিল 'গোলপুকুর' (অর্থাৎ ওয়েলিংটন, বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) আর বিষয় মোটামুটি হালকা হলেও স্বদেশাভিমান থেকে দূরাবস্থিত নয়। ফুটবল দেখার পিছনেও ছিল স্বদেশীচিন্তা; মোহনবাগান তখন ছিল খেলার ময়দানে আমাদের স্বাজাত্যের প্রতীক, গোষ্ঠবিহারী পাল আজও তার জীবন্ত সাক্ষী। ইংরেজ নাকি 'sporting' জাত শুনতাম। কিন্তু দেখতাম (হয়তো অতিরিক্ত বড়ো করে দেখতাম) তাদের পক্ষপাত— মোহনবাগানকে হারাবার জন্য বিচক্ষণ অথচ (আমাদের বিচারে) দুরাশয় 'রেফারী' ক্লেটনের অনাচার, কিম্বা ক্যালকাটা মাঠে জমায়েৎ কয়েক হাজার সাহেবের মোহনবাগানকে পরাজিত করার উল্লাস। পরে নানা কারণে এবং বিশেষ করে অনেকগুলি সুনিপুণ ভারতীয় দলের অভ্যুদয়ে এই অবক্র জাতিবোধ ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রতিযোগিতা ব্যাপারে কিছুটা পরিবর্তিত হল। কিন্তু আমাদের কাছে সেই পুরোনো দিনের সুখদুঃখে মেশানো অনুভূতি বড়ো হয়ে রয়েছে। খেলার মাঠে রীতিনীতি কী হওয়া

উচিত, জানি ; জাতিবর্ণনির্বিশেষে বিভিন্ন ক্রীড়ায় যারা পারঙ্গম তাদের সাধুবাদে কুণ্ঠা নেই ; ভারতীয় ক্রীড়াবিদ্‌দের গুণাগুণ বিচারে অসত্য কথনেও প্রস্তুত নই। কিন্তু পরাধীন দেশে বিজেতা জাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যারা আমাদের বুক দশ হাত ফুলিয়ে দিত— যাদের মধ্যে ছিল ধ্যানচাঁদ, রূপসিং, ফিরোজ, দারা প্রভৃতি হকি-র জাদুকর, আর অমন অপরূপ সাফল্যের অধিকারী না হয়েও ছিল গোষ্ঠ পাল, ননী গোঁসাই, নূর মহম্মদ, কুমার, সামাদ প্রভৃতির মতো 'ফুটবলার', কিম্বা ক্রিকেটে নায়ুডু, মার্চেন্ট, মুশতাক, নিসার, অমর সিং, মানকড়-এর মতো কৃতী— তাদের কথা ভাবি শুধু খেলার সুবাদে নয়। ভাবি আমাদের লাঞ্ছিত জীবনের লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারেরই ইতিবৃত্ত রূপে।

নন্দ কুণ্ডুর সঙ্গে শুধু খেলার মাঠে নয়, যেতাম খাদি আর স্বদেশী প্রদর্শনীতে, যেতাম মির্জাপুর পার্ক (বর্তমানে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) ও অন্যত্র কংগ্রেসের মিটিঙে। এভাবে বক্তৃতা শুনেছি গান্ধীর, বিপিনচন্দ্র পালের, চিত্তরঞ্জন দাশের ; দেখেছি দলিলদস্তাবেজ আর একটা যেন ছোটো সিন্দুক-সমেত এসেছেন সৈয়দ মাহ্‌মুদ, তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের হিসাব সম্বন্ধে প্রশ্নের জবাব দিতে ! (বহুকাল পরে পার্লামেণ্টে এই বর্ষীয়ান নেতাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনেছি, মির্জাপুর পার্কের মিটিঙের কথা বলেছি) এভাবে লাজপৎ রায়, মদনমোহন মালব্য, মোতিলাল নেহরু প্রভৃতিকে দেখেছি। রাজনীতি নিয়ে আমার চেয়েও মেতেছিল মৃগাঙ্ক ; সে পরবর্তী জীবনে কাঁদীতে ওকালতি করেছে আর আমি জেনে পরম আনন্দ পেয়েছি যে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে কুণ্ঠিত হয় নি। নন্দ কুণ্ডুর কাছে আমি আজও প্রায়ই গিয়ে থাকি ; বঙ্গবাসী কলেজে উচ্চশিক্ষা পেয়েও সে পৈতৃক মশলা এবং মনোহারী দোকান নিজ হাতে চালায়, যেখানে অবসর পেলেই আমি গিয়ে বসি। নেবুতলার ছোটো চৌমাথায় এই দোকান পাড়ার সকলের চেনা, চারদিকের বাসিন্দারা পার্লামেণ্টে আমার নির্বাচক কিন্তু সে-টানে আমি যাই না। যাই নন্দর সঙ্গে দুটো কথা বলতে, অন্যান্য পুরোনো বন্ধুদের খবর নিতে (নন্দ বলে, দোকানে সে যেন ঘাঁটি আগলে আছে, সবাইকে কখনো না কখনো ঐ রাস্তা দিয়ে যেতেই হবে !) নন্দর জ্যাঠামশাইয়ের মস্ত দোকান কাছেই ; তিনি বহুদিন মৃত, কিন্তু ছিলেন নিষ্ঠাবান সংবাদপত্র-

পাঠক— মনে পড়ছে আমার দাদুকে একবার বললেন: "আচ্ছা মুখুজ্জে মশায়, ইহুদী-আরবে গণ্ডগোল কেন? ইহুদীরাও তো আরব।" এমন মূল্যবান কথা তো বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্‌দের মুখেও সচরাচর শুনি না।

এই সময়টা আমি সর্বদা খদ্দর পরতাম— বছর পাঁচেক এরই আনুষঙ্গিক-ভাবে নিরামিষাশী হয়েছিলাম। ১৯২৯ সালে বিলাত যখন গিয়েছি, সঙ্গে গেছে খদ্দর ধুতি। খাদি-পরিধানে বিড়ম্বনা কম ছিল না, বিশেষ করে আমাদের বাড়িতে— এ-অভ্যাসে আমি ছিলাম একা, তাই মাঝে মাঝে ঠাট্টার খোরাক জোগাতাম। মনে আছে একদিন বর্ষার দুপুরে ভিজে খাদি ধুতিকে লুকিয়ে পাখার হাওয়া দিয়েছি— নইলে নিত্যস্নানের পর কেচে-দেওয়া কাপড় কিছুতেই শুকোয় না আর সবাই আমার দুর্দশায় হাসে! বাড়িতে হয়তো কেউ গান্ধীর নিন্দা করল, আমার মন ভারী হয়ে উঠল, খাতায় লিখতে লাগলাম আমেরিকান পাদরী John Haynes Holmes-এর সদ্য-আবিষ্কৃত উক্তি: "When I think of Romain Rolland, I think of Tolstoy. When I think of Lenin I think of Napoleon. But when I think of Gandhi, I think of Jesus Christ. He lives His life, he speaks His word, he suffers, strives, and will one day nobly die for His Kingdom on earth." মস্ত সান্ত্বনা যেন পেয়েছিলাম যখন কলেজে (বোধ হয় ১৯২৩ কি ১৯২৪ সালে) 'বিদ্রোহী' কবি নজরুল ইসলামকে দেখবার সুযোগ হল ("আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী সুত, বিশ্ববিধাতৃর")— তেজঃপুঞ্জ মূর্তি, গেরুয়া পাঞ্জাবী-আলখাল্লা পরনে, উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন আর সারা সভা মেজেতে পা-ঠুকে তাল দিতে থাকল: 'এই শিকলপরা ছল মোদের এই শিকলপরা ছল'। নজরুলের জন্মদিনে তাঁর জীবন্মৃত মূর্তি দেখতে কখনো যেতে পারি নি, কারণ আমার মনে জ্বলছে অন্য স্মৃতি, আজও কানে বাজছে সেই কণ্ঠ:

> তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়।
> সেই ভয়ের টুঁটি ধরুব টিপে, করুব তারে লয়।
> মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়।
> মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল।

৯

সুখ আর দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করার মতো গীতা-কথিত প্রজ্ঞা লেশমাত্র আমার নেই, তবে এটা ঠিক যে ১৯২৪ সালের আই.এ. পরীক্ষায় যখন নিজেকে এবং অপর সবাইকে আশ্চর্য করে প্রথম হবার খবর গেজেটে প্রকাশ হবার আগেই বসুমতী অফিসে একদিন জানলাম, তখন মনে তেমন কোনো ভাবান্তর ঘটে নি। এ কথা মনে আছে এজন্য যে তখনই সেখানে আমার মুখের চেহারার কোনো পরিবর্তন না আসা সম্বন্ধে মন্তব্য শুনেছিলাম। খেলার মাঠে সাহেবদের গোলে স্বদেশী খেলোয়াড় ফুটবলকে ঢুকিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে যে স্বচ্ছন্দ উল্লাস দেখা দিত, পরীক্ষায় বিপুল সাফল্য সংবাদ শুনে তার ভগ্নাংশমাত্রেরও উদ্রেক যে হয় নি, তা হলপ্ করে বলতে পারি। বিদেশে অবস্থানের পূর্ব পর্যন্ত পরীক্ষার ব্যাপারে ক্লেশকর সংবাদ কখনো পেতে হয় নি ; পরে যখন কিছুটা পেয়েছি, তখন মন নিশ্চয়ই জখম হত— সুতরাং এ-ধরনের দুঃখে যে আমি বিচলিত নই তা একেবারেই নয়। পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্যে কিঞ্চিৎ চিত্তপ্রসাদ যে হত না বলা মিথ্যাচরণ হবে, কিন্তু আনন্দের আতিশয্য যে অনুভব করি নি তা ঠিক। হতে পারে একটা কারণ, কিছু পরিমাণে অকালে 'বুড়োটে' হয়ে যাওয়া (যাকে আমার বিধিদত্ত মুখমণ্ডল সাহায্যই করেছে)। তা ছাড়া বোধ হয় কতকগুলো শোনা এবং শেখা কথার মায়া মনকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। কেমন যেন ভালো লাগত নিজেকে বলতে : 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্'— আজও ভালো লাগে, যার প্রমাণ রয়েছে আমার এক অকৃতী প্রবন্ধ-সংকলনের 'অল্পে সুখ নেই' নামকরণে। যাই হোক্, মা-বাবা দাদু যে পরীক্ষায় আমার কৃতিত্বে আনন্দ পেয়েছিলেন তা বুঝতে দেরি হয় নি। যদিও তারও কোনো বাহুল্যের লক্ষণ দেখি নি। পরে যখন বি. এ. এবং এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে প্রায় যেন একটা বেয়াড়া বাড়াবাড়ি দেখিয়ে ফেললাম, তখন ঐ সুবাদে একদিন বাড়িতে পরিবারের এবং আমার নিকট-বন্ধুদের খাওয়ানো হয়েছিল, যা পূর্বে অনেকের অনুযোগ সত্ত্বেও কখনো হয় নি।

ইংরিজীতে তিনশোর মধ্যে দুশো পঁচিশ নম্বর পেয়ে তিনজন প্রথম হয়েছিলাম, হুমায়ুন কবির, পঞ্চানন চক্রবর্তী এবং আমি। ইতিহাস ও লজিকে আমি ছিলাম প্রথম; সংস্কৃতে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়, কলেজ থেকে প্রথম। আমার চেয়ে ইংরিজীতে পড়াশুনা হুমায়ুনের অন্তত বেশি ছিল সন্দেহই নেই, আমার ধারণা পঞ্চাননেরও। ইতিহাসে আমার চেয়ে অনেক খুঁটিয়ে পড়া এবং জানা ছিল শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সতীর্থের। লজিকে আমার প্রথম হওয়ার কোনো হেতু আবিষ্কারই করতে পারি না; সংস্কৃতে অনুরাগ সত্ত্বেও আমার পারদর্শিতা ছিল সীমিত। বাংলায় খারাপ করি নি, কিন্তু এমন-কিছু 'আহা-মরি' নম্বর মেলে নি— তবে কী জানি কেন, শুনতাম যে বাংলায় ভালো নম্বর পাওয়া দুরূহ। পরীক্ষাতে ফাঁকির একটা জায়গা সর্বত্রই থেকে যায়, তবে আমি যে কিছু-পরিমাণে ফাঁকির জোরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো পরীক্ষায় নিদারুণ এগিয়ে থেকেছি, তাতে সন্দেহ নেই। ইংরিজী লেখাটা অনেকের তুলনায় সহজে আসত, আর বই থেকে বাছাই করা চোস্ত্ অনেক বাক্য কণ্ঠস্থ থাকায় সেগুলো একটু বুদ্ধি খাটিয়ে উত্তরের মধ্যে উদ্‌গার করে দিতে পারলে পরীক্ষক উদার হাতে যে নম্বর ঢেলে দিতেন, তাতে সন্দেহ নেই। হয়তো মধ্যযুগীয় স্কটলাণ্ডের জননেতা উইলিয়ম্ ওয়ালেস সম্বন্ধে উদ্ধৃত করলাম Andrew Lang-এর কথা: "Like her [Joan of Arc], he receives a sword from the Saint; like her, he wins a great victory; like hers, his bones are scattered by the English; not gentle and winning like the Maid [of Orleans], but he shares her immortality.··· The whole wide world, as Pericles said, is the brave man's common sepulchre. Wallace has left a name in crag and camp, like a wild flower all over his dear country." কথাগুলো এমন-কিছু মূল্যবান্ হয়তো নয়। কিন্তু এখনো কণ্ঠস্থ রয়েছে, আর সম্ভবত পরীক্ষক খাতার পর খাতায় ক্লান্তিকর কতকগুলো অর্ধ-তথ্যের ভিড়ের মধ্যে এটা দেখে ভাবলেন ছেলেটার মাথায় কিছু বস্তু আছে, দেওয়া যাক্ তাকে মোটা অঙ্কের বখ্‌শিস্! রানী এলিজাবেথ সম্বন্ধে অনেক খবর জ্ঞানবান্ ছাত্রেরা লিখলেও আমি যখন, হয়তো বা একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবেই লিখলাম: "A true Tudor

in that she understood her people, even better than her ministers did; unlovable in character, yet romantically beloved; served throughout her reign with wonderful loyalty, yet as parsimonious in her reward of it as she was with her money; vain, untruthful, capricious, even mean; yet with all these defects, indubitably great"—তখন পরিশ্রান্ত পরীক্ষক প্রফুল্ল হয়ে বিরক্ত কার্পণ্য পরিহার করলেন, আর উপকৃত হলাম আমি! এমন দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে যেতে পারি সহজে, কিন্তু তার কোনো দরকার নেই। মোদ্দা কথা, আমার পরীক্ষা-সাফল্যে বেশ কিছু ফাঁকি ছিল—বনের ছবি আঁকতে পারতাম, কিন্তু গাছপালার বিবরণ থাকত কম। তবে ইংরিজী লেখায় হাত একটু সরেশ থাকায় এদেশে ফাঁকি তেমন ধরা পড়ত না, পড়েছিল বিদেশে, কারণ সেখানকার ভাষাই হল ইংরিজী. একটু ভালো ইংরিজী দেখে পুলকিত হওয়ার কারণ পরীক্ষকদের ক্ষেত্রে ঘটার কথা নয়।

নিজের প্রতি অবিচার করব না বলেই সঙ্গে সঙ্গে বলব যে ইতিহাস বিষয়ে একটা গভীর অনুরাগ যথাসাধ্য মনে জেগেছিল, মানুষের জীবনকথা সাহিত্যরস-সংস্পৃষ্ট এবং মোহময় রূপেই অন্তরকে আকর্ষণ করেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের বিরাট ল্যাবরেটরি দেখে প্রথমে দুঃখ হত কেন বিজ্ঞান পড়ার সংগতি আয়ত্ত করি নি। লক্ষ্য করতাম রাত্রেও গবেষণাগারে আলো জ্বলছে, ইচ্ছা করত ঐভাবে জ্ঞানানুসন্ধিৎসায় লেগে থাকতে—বিদ্যার সঙ্গে চিত্তের আবেগ কিছুটা সম্মিলিত হয়েছিল। ভাবতে ভালো লাগে যে এ-ধরনের জিনিস ছিল সম্ভবত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো মহাভাগের অন্বিষ্ট। তিনি চেয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে পরাধীন ভারতবর্ষের চিত্তবৃত্তি পরিপুষ্ট হয়ে উঠুক, অন্য সর্ববিধ সুফল তখন সহজ হবে। হয়তো এজন্যই উচ্চশিক্ষাকে তিনি যথাসম্ভব সহজলভ্য করে দিয়েছিলেন, শিক্ষার পরিমাণ-বৃদ্ধি ঘটলে তার গুণগত পরিবর্তনও যে নিশ্চিত এই বিশ্বাস করতেন। হয়তো এজন্যই তাঁর আমলে ম্যাট্রিকুলেশন, আই. এ., বি. এ. প্রভৃতিতে ইংরিজী সাহিত্য থেকে বাছাই-করা বহু সুন্দর রচনার সঙ্গে সহজে পরিচয় ঘটিয়ে শিল্পবোধ ও রুচিকে উদ্রিক্ত করতেহ তিনি চাইতেন, সুগভীর অনুশীলনের ভিত্তিস্থাপনকেই তিনি মহৎ কর্ম মনে করতেন। এজন্যই তাঁর আমলে হয়তো

সস্তায় 'ডিগ্রী' অনেকে পেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গবেষণায় নেমেছেন বহু ভারতীয় তরুণ যাঁদের অনেকে আজও প্রাতঃস্মরণীয়। ভারতবর্ষকে জগতের গবেষণার মানচিত্রে স্থান করে দেন প্রথমে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—তিনিই উদ্যোগী হয়ে দারভাঙ্গার মহারাজা, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, খয়রার মহারাজা প্রভৃতির দান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন, বিজ্ঞান কলেজের পত্তন ঘটান, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বহুবিধ বিদ্যার মূলকেন্দ্র কলকাতায় স্থাপনা করেন। জগদীশ-চন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ কোবিদ সম্মান পেলেন; বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতায় এলেন চন্দ্রশেখর ভেকট রামন্, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ্, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, গণেশপ্রসাদ, সালাহ্ উদ্দীন খোদাবক্স, লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়, অনন্তকৃষ্ণ আয়ার, ভি. এস. রাম, বেণীপ্রসাদ, মুহম্মদ জুবের সিদ্দীকি, মনোহরলাল প্রভৃতি বহু বিদ্বান্; মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশিরকুমার মিত্র, গিরীন্দ্রশেখর বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি তৎকালীন বহু তরুণ প্রতিভাবান্ জ্ঞানবিজ্ঞানের মাধ্যমে ভারতবর্ষের আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব করার সুযোগ পেলেন। বিদেশী পণ্ডিতদের তিনি আহ্বান করলেন; স্বনামধন্য সিল্ভাঁ লেভি এলেন কলকাতায়, অন্য অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে 'অনারারি' ডিগ্রী পেলেন, গেলেন বিশ্বভারতীতে— যা প্রতিষ্ঠিত হল, ১৯২১ সালে, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে—'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেক নীড়ং' এই বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে।

আরো বহু তথ্য সেদিনকার সম্পর্কে মনে আসছে। কিন্তু স্মৃতির লাগাম টেনে ধরতেই হয়। এত কথা বলতে হল কারণ ১৯২৪ সালের মে মাসে আশুতোষের মৃত্যু হয়, যার অনুল্লেখ একান্ত অনুচিত হবে। আশুতোষের দুর্নাম কম রটে নি; বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে এমন ভাবে ছিল যে কিছু পরিমাণে স্বৈরাচারী অপবাদ অমূলক নয়; অসহযোগের সময় যারা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলামখানা' বলে বর্জন করার আন্দোলনে নেমেছিল, তাদের বিপক্ষে গিয়ে কটু কথা তাঁকে কম শুনতে হয় নি; ইংরেজ সরকার সম্বন্ধে মতামত তাঁর যাই থাকুক্ কেন, হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে তিনি

গণ-আন্দোলনের শরিক কখনো হতে পারেন নি, তাঁর পুরোনো সমাবর্তন-ভাষণে 'রাজভক্তি' লক্ষ্য করা গিয়েছে। কিন্তু এহেন ব্যক্তির মৃত্যুতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতায় প্রথম নির্বাচিত 'মেয়র' হিসাবে যে বক্তৃতা করেন, তা স্মরণীয়। মূলগতভাবে আশুতোষের এই প্রশস্তি ছিল সংগত। বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে এই প্রতিভাধরের ব্যুৎপত্তি ছিল প্রশ্নাতীত; আজও কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে তাঁর সংগৃহীত পুস্তকাবলী দেখলে সেই ব্যুৎপত্তি ও অনুরাগের কিঞ্চিৎ পরিচয় মেলে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড়ো হল উচ্চ-শিক্ষা ও দেশপ্রেমের যে সমন্বয় ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। একদা রাজভক্ত এই ভাইসচান্স্‌লর তাই ১৯২২-২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটকে উদ্ধত সরকারকে 'যুদ্ধং দেহি' বলতে আহ্বান করেন: "Forget the Government of Bengal. Forget the Government of India. Do your duty as Senators of this University. Freedom first, freedom second, freedom always."

এ-ধরনের কথা মনের পরদায় লেপ্‌টে আজও রয়েছে— তাই ভুলতে পারি না অতুল বসু মহাশয়ের আঁকা 'Bengal Tiger' ছবিটি: খালি গা, লোমশ দেহ, 'গুম্ফ সরস্বতী' বলে প্রায়শ বর্ণিত মহাভাগের প্রতিকৃতি, কণ্ঠে উপবীত, তেজস্বী বাঙালীর অবিস্মরণীয় সেই মূর্তি। আর মনে পড়ে, জীবন-সায়াহ্নে, সম্ভবত তাঁর শেষ সমাবর্তন-ভাষণে কোনো এক যোদ্ধকবির রচনা থেকে উদ্ধৃতি:

I vow to thee, my country, all earthly things above,
Entire and whole and perfect, the service of my love,
The love that asks no question, the love that stands the test,
That lays upon the altar the dearest and the best,
The love that never falters, the love that pays the price,
The love that makes undaunted the final sacrifice.

* * *

ইতিহাসে 'অনার্স' নিয়ে পড়ার দরুন অন্যান্য ক্লাসে মোটামুটি দায়সারা উপস্থিতি আমার ছিল। তবু মাঝে মাঝে আমার পক্ষে অস্বস্তি এবং অপরের পক্ষে মজার ব্যাপার দু-একটা ঘটত। অর্থনীতি পড়াতে গিয়ে অধ্যাপক

দুর্গাপতি চট্টরাজের হয়তো খেয়াল হল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় যারা হয়েছে তাদের কেরামতির একটু পরখ করা। সবাই ভাবি তাঁর চোখ রয়েছে দেয়ালের দিকে, অথচ তিনি ঠিকই নজর রাখতেন— তাই 'রোল নাম্বার' ডেকে প্রশ্ন করলেন, দাঁড়িয়েই আবার বসে পড়লাম, কারণ জবাব জানি না। একদিনের কথা বেশ মনে আছে ; অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ আমার পিতৃবন্ধু হলেও তখনো কাছে ঘেঁষি না, ইংরিজী 'পাস্' ক্লাস চলছে, সামনের বেঞ্চিতে ভালো ছেলেরা (বিশেষত অনার্স-ওয়ালারা)। একেবারে পিছন দিকে যথাস্থানে আমি— হঠাৎ প্রিন্সিপালের বেয়ারা নোটিস্ আনল আমার তলব পড়েছে কারণ 'গোয়ালিয়র স্বর্ণপদক' আমাকে দেওয়া হবে। নোটিস্ পড়ে প্রফুল্লবাবু আমাকে দাঁড়াতে বললেন, আর সামনে ঝুঁকে ভক্ত ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন : Is he the man ? Is he the man ?

তবে আমিও অচিরে প্রফুল্লবাবুর ভক্ত হয়ে পড়লাম। আর তার প্রথম কারণ হল যে অমন ইংরিজী পড়ানো কোথাও দেখি নি। বিদেশী ভাষার স্বচ্ছ, স্পষ্ট নির্ভুল উচ্চারণ— কিন্তু এ তো তুচ্ছ কথা, খাস 'সাহেব' অধ্যাপকও তো বহু দেখেছি। যা দেখলাম তা হল ভিন্ন জাতের পড়ানো— শেক্স্পীয়র-এর নাটকের ভিতর নিজে মশগুল হয়ে অপরকে মশগুল করে তোলা ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিশেষ ক্লাস নেওয়া (রবিবারে পর্যন্ত), যেখানে উপস্থিত থেকে 'পারসেণ্টেজ' মেলে না অথচ সবাই আসে, ভালো, মন্দ, মাঝারি সব ছেলে আসে ; একাধারে নাটকের বিশ্লেষণ এবং অভিনয় যেন আমরা দেখতে পাই। তাই মুখস্থ হয়ে গেল 'Merchant of Venice'এর অনেক অংশ— আজও কিছু কিছু রয়েছে। 'Othello' পড়ালেন অধ্যাপক বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়— কৃতী শিক্ষক, মূল্যবান্ তাঁর ব্যাখ্যা, কিন্তু প্রফুল্লবাবুর তুলনায় তা ম্লান. প্রায় যেন অস্তিত্ববিহীন। H.M. Percival-এর কথা তিনি বলতেন, শেক্স্পীয়র ব্যাখ্যায় তাঁর সমকক্ষ বুঝি কেউ ছিল না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না যে প্রফুল্লবাবুর মতো কেউ পড়াতে পারেন। শাইলক্‌কে যেন জীবন্ত দেখলাম— শুনলাম সে বলছে 'Hath not a Jew eyes ? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions ? ...' দৃপ্ত ধ্বনি কানে এল 'The villainy you teach

me I will execute, and it shall go hard, but I will better the instruction'। হয়তো পরাধীন ভারতবাসী বলেই আমাদের সহানুভূতি ছিল পুরোপুরি শাইলকের দিকে— আর পোর্শিয়া-র কাছে পরাজিত শাইলক যখন বলছে 'I am not well, send the deed after me', তখন তারও মতো আমরাও যেন শ্রান্ত—এ সব-কিছু যে প্রফুল্লবাবুর পড়াবার গুণে, তাতে সন্দেহ নেই।

শেক্স্‌পীয়র-ভক্ত প্রফুল্লবাবু ইংরিজী রোমান্টিক কবিদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিদ্রূপ করতেন— পরে যখন আমরা কলেজে আরো একটু লায়েক হয়েছি। পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসের খবর রাখি, তখন হয়তো বহুমানভাজন অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'রোমান্টিক'-দের নিয়ে মস্তিষ্কপীড়ার লিখিত বিবরণ সম্বন্ধে কৌতুক করলেন। হয়তো বা নিজেরই অনুজপ্রতিম, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কোনো প্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়ে রহস্য করলেন। আমরা কিন্তু ক্লাসেও তাঁর অন্য একটা চেহারা দেখেছি— এবং আশ্চর্য হয়েছি। হঠাৎ কি খেয়াল হল সেদিন শেক্স্‌পীয়র পড়াবেন না। তুলে নিলেন Thomas Hood-এর কবিতা : 'One more unfortunate, weary of breath, Rashly importunate, gone to her death'। পড়তে গিয়ে চোখ জলে ভরে গেল : 'Take her up tenderly, lift her with care, Fashion'd so slenderly, young and so fair!' নিঃসন্দেহে 'সেন্টিমেণ্টাল' এই কবিতা কেমন করে ভালো লাগে প্রফুল্লবাবুর, যখন কাব্যবিচার ব্যাপারে তিনি একেবারে ঋজু, প্রায় কঠোর! এর কারণ হয়তো প্রোথিত রয়েছে তাঁর সত্তার একাংশে এবং তাঁর জীবনের সুখদুঃখের অভিজ্ঞতায়— কোথায় কোন্ ধাক্কার ঘা বোধ হয় তাঁর শুকোয় নি। যা আমরা আন্দাজ করেছি পরে বহু কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। হয়তো এজন্যই দেখেছি আমাদের কিছুদিন বাইব্‌ল্ থেকে সংকলিত কতকগুলি অংশ পড়ালেন— প্রাণ দিয়েই পড়ালেন 'Faith, hope, charity··· and the greatest of these is charity'— বিনা আয়াসে কণ্ঠস্থ করিয়ে দিলেন : 'The day is far spent and the night is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armour of light···

প্রেসিডেন্সি কলেজের বারান্দায়, আরো বেশি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে

তাঁর বাড়ির সামনে পাথরের বেঞ্চিতে বসে কত কথা হয়েছে এই অধ্যাপকের সঙ্গে, যাঁকে একদা দুর্ধর্ষ ভেবে ভয় পেতাম। ধুতি পরে আসতেন, স্বদেশাভিমানী মানুষ, ইংরিজীর মায়ায় আটক অথচ লিখতে সতত কুণ্ঠিত—'জানো আমি লিখতে পারি "On Nothing", বলে কী প্রাণখোলা হাসি! বিলাত যাবার জন্য ব্যগ্র নন, অথচ লণ্ডনের মানচিত্র যেন নখাগ্রে— যান বা না যান ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর বোধ আশ্চর্যভাবে স্বকীয় ও অনবদ্য (যা লক্ষ্য করে ১৯৩৬-৩৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপক, আমাদের বন্ধু হম্ফ্রি হাউস্ বিস্মিত হয়েছিল) ঠিক যেন 'অজ্ঞাতনামা ভারতীয়ের আত্মজীবনী'-র অধুনা বিখ্যাত লেখকের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিছুকাল তাঁর বাড়ির প্রায় সামনে ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়— সেখানে তাঁর সমনামা কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে একদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছিল, চারদিকে কোলাহল 'Down with Praphulla Ghosh!' —বাড়ি ঢুকবেন কি না ঢুকবেন এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে থমকে দাঁড়াবার পর মনে হল ঘটনাটা তাঁকে লক্ষ্য করে নয়— বর্ণনা করতে গিয়ে হাসি আর তাঁর থামে না। কলেজে তাঁর বিদায় সংবর্ধনা দিবসে এর উল্লেখ আমি করেছিলাম— এমন মানুষ শিক্ষক সমাজ থেকে আজ অন্তর্হিত। এ দৈন্য পূরণ হবে কেমন করে?

উপরোক্ত বিদায়-সভায় শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক জ্যাকারিয়া, যিনি তখন হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কিম্বা শিক্ষাবিভাগের অধিনায়ক —পরে একদিন মুচকি হেসে আমাকে বললেন, 'Hiren, I heard you holding forth...' বুঝলাম তাঁর প্রায়-গ্রীক-ছাঁচে গড়া মন চাইছে আমায় সতর্ক করতে: 'Avoid excess'—'বাড়াবাড়ি কোরো না'। স্বীকার করব, বলায় এবং লেখায় প্রায় বাড়াবাড়ি করে ফেলি— উপায়ই বা কি? 'যদি করিস্ মানা, ওগো বন্ধু, / মানি এমন সাধ্য নাই' ধরনের জবাব দিতে না চাইলেও দিতে হয়! সে যাক্, আমাদের এই মৃদুবাক্ ঋজুচিত্ত অধ্যাপকের সান্নিধ্য আমার জীবনে এক মহার্ঘ অভিজ্ঞতা। এত ভালো ইংরিজী বলতে এবং লিখতে অন্য কোনো ভারতীয়কে আমি দেখেছি মনে হয় না। অতি অল্প যে কজন ভারতীয় অক্সফোর্ডে ইতিহাসে 'ফার্স্ট ক্লাস্' পেয়েছে, তিনি তাদের অন্যতম এবং অসাধারণ বলে আমাদের সময়েও (১৯২৯-৩৩)

সেখানে অবিস্মৃত। তাঁর চেয়ে ভালো ইতিহাস কেউ পড়াতে পারে এ কথা আমরা স্বীকার করি না— অথচ কোথাও সস্তায় কিস্তিমাতের চেষ্টা তাঁর নেই, সব-কিছু নিখুঁতভাবে করাই তাঁর কাম্য (যার একটা অন্তত কুফল এই যে অমন প্রতিভা লিখিত সাক্ষ্য প্রায় কিছুই রেখে গেল না)। বলতে একটু সংকোচ হচ্ছে কিন্তু দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র তাঁর ধরন এবং বক্তব্য বুঝে উঠতে পারছে না, কিন্তু সেটা তাদেরই দুর্ভাগ্য। আমরা দেখেছি প্রচণ্ড পরিশ্রম করে lecture notes তৈরি করতেন যা ছিল প্রায় বেণুবনে মুক্তা ছড়ানোর মতো। পরে Oxford গিয়ে এবং নানা ঐতিহাসিক রচনার সঙ্গে পরিচয়ের পরে বুঝেছি যে অল্প একটু সুযোগ ঘটলে অধ্যাপক জ্যাকারিয়া বিলাতে Professor Maitland-এর মতো খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন। অবশ্য তাঁর এ নিয়ে লেশ-মাত্র দুশ্চিন্তা ছিল না— ধর্মে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, হঠাৎ ঘরে ঢুকে একবার তাঁকে প্রার্থনারত দেখেছি, কর্তব্য পালন করে যেতেন, মানুষের সঙ্গে মিশতেন কম অথচ— অন্তত নিজের পক্ষ থেকে বলতে পারি— ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির আস্থা পেতেন প্রচুর। কেরালায় খ্রীস্টান পরিবারে তাঁর জন্ম; বিয়ে করেছিলেন বাংলায়; মনটা কেমন যেন বাঁধা ছিল ইয়োরোপের তারে (এর মনোরম উদাহরণ পরে দু-একটা দিতে হবে), যা আমাদের চোখে ছিল তাঁর একমাত্র ত্রুটি। এটা জানলাম পরে— বি.এ. ক্লাসে যখন পড়ি তখন তাঁর কোনো সমালোচনাই সহ্য হত না।

'অনার্স্' ছিল না বলে শ্রীকুমারবাবুর পড়ানো খুব কাছ থেকে বেশি দেখি নি— শুনতাম কাব্য বিশ্লেষণে তিনি অনন্য। (উত্তরকালে বাংলা উপন্যাস বিষয়ে তাঁর বহু বিদগ্ধ আলোচনার কাছে আমরা সবাই ঋণী)। 'পাস্' ক্লাসে অবশ্য তাঁকে দেখেছি— পড়াতেন *Golden Treasury*-র চতুর্থ খণ্ড। যে যাই বলুক, এমন বই ক'টা আছে দুনিয়ায়? আর অমনোযোগী আমরা শ্রীকুমারবাবুর ব্যাখ্যা একটু-আধটু শুনে নিজেরাই ডুবে যেতাম শেলী কীট্স্ বায়রন ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ-কে নিয়ে। ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তো মাথা কিছু পরিমাণে খেয়ে রেখেছিলেন: 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে'— আলোচনা হয় রবীন্দ্রনাথের কোন্ দুটো বই সবচেয়ে ভালো? 'চিত্রা' আর 'ক্ষণিকা'? বি. এ. যখন সাঙ্গ হয় নি, বেরলো

'পূরবী'— রবীন্দ্রনাথ আমাদের কম ভোগান নি তখন! হঠাৎ মনে পড়ে যায়: 'এই গন্ধবিধুর সমীরণে, কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে'— হাল্কা কাণ্ড সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা বেশ বিচলিত। এমন সময় এল *Golden Treasury*— 'Oh, lift me from the grass, I die, I faint, I fail!' পড়লাম:

> Here, where men sit and hear each other groan,
> Where palsy shakes a few sad, last gray hairs,
> Where youth grows pale and spectre-thin and dies;
> Where but to think is to be full of sorrow and
> leaden-eyed despairs···

বেশ মনে আছে, অন্তর-যাতনা (যা ফাঁকা ফানুস্ মাত্র ছিল বলেই আজ আশঙ্কা) জানাব কাকে ভেবে শেষ পর্যন্ত পত্রাঘাত করলাম অধ্যাপক জ্যাকারিয়াকে— সৌভাগ্য এই যে তার নকল নেই, থাকলে নিশ্চয়ই লজ্জা পেতে হত। ডাকে ফেলে চিন্তা হল, কাজটা ঠিক হল না। আর আশা করলাম যে জবাব আসবে না— কিন্তু এল, পত্রপাঠই এল। আমাকে আশ্বস্ত করে জানালেন আমি তাঁকে লিখে ঠিক করেছি, আর যখন আমার মতো ছাত্র এ ভাবে শিক্ষককে লেখে তখনই মনে হয় যে শিক্ষকের বৃত্তি অসার্থক হয় নি! এই মহামূল্য চিঠি আমি হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু কতকগুলো কথা স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বলেছিলেন জীবনে কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা অনিবার্য ("ineluctable"— এ কথার প্রথম ব্যবহার আমি এতে দেখি), কিন্তু তাতে বিধুর হয়ে অসহায় ও ব্যর্থ বোধ করা দুর্বলতা—"One should learn to see the rainbow in the rain." 'বর্ষণের মধ্যে রামধনুর সন্ধান' এই কথা তখন থেকে আমার আত্মস্থ; অগণিত উপলক্ষে এর ব্যবহার করেছি, আর স্মরণ করেছি ঐ ঋষিকল্প শিক্ষককে, যাঁর ব্যক্তিত্বে আত্মবিলোপ-প্রবণতা না থাকলে প্রতিভার বিভূতিতে তিনি ভাস্বর হয়ে থাকতেন।

চেতনার উন্মেষ থেকে মনে রাজনীতির যে ঘোর লেগেছিল তা অবশ্য মুহূর্তের জন্যও কলেজ জীবনে কেটে গিয়েছিল বলা যায় না। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত গান্ধীজী জেলে; নিজের পূর্বপ্রচারিত মত বদলে হাসপাতালে

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ অপারেশনে তিনি রাজী হয়েছিলেন, শল্যশাস্ত্রী কর্নেল ম্যাডক্-এর সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলেন এবং অস্ত্রোপচারের পর মুক্তি পেলেন, যদিও ১৯২২ থেকে ছ'বৎসর ছিল মেয়াদ। রাজনীতির গগনে তখন সূর্যের মতো বিরাজ করছেন চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুকে তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ নিয়ে। ১৯২৩ সালের অক্টোবরে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল, মওলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতি—দেশবন্ধু-নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল কাউন্সিল প্রবেশের অনুমতি মোটামুটি সেখানে পেল। এই সিদ্ধান্তই বলবৎ রইল ঐ বৎসরের শেষে অন্ধ্রপ্রদেশের কোকোনাদা শহরে কংগ্রেসের অধিবেশনে। কোকোনাদায় সভাপতি ছিলেন মওলানা মুহম্মদ আলী— অসামান্য এই শক্তিধরের বিচিত্র জীবন-আলেখ্য নিয়ে সমুচিত পর্যালোচনা হল না আজ পর্যন্ত, যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় শুধু আমাদের কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতা-কলঙ্কিত ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে। আধুনিক চিন্তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন অথচ মুসলিম ধর্মধারার মধ্যযুগীয় কুহকে মুগ্ধ হয়ে থাকার বিড়ম্বনা এঁর জীবনে দেখা যায়, কিন্তু অমন বহুগুণান্বিত ব্যক্তিকে যথাযোগ্য মনের খোরাক ও কাজের বোঝা জুগিয়ে দেওয়ার শক্তি এদেশের তৎকালীন রাজনীতির ছিল না বলেই পরিতাপ। অক্সফর্ডে-পড়া এই মানুষটির মনে নানাবিধ সংস্কার লুকিয়েছিল; গান্ধীকে বাস্তবিকই ভক্তি করতেন (যদিও পরবর্তীকালে ছাড়াছাড়ি ঘটে) বলে কংগ্রেস সভাপতির মঞ্চ থেকে বললেন গান্ধীজী স্বপ্নে বাণী দিয়েছেন স্বরাজ্য-দলকে কাউন্সিল প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হোক্! ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর থেকে দেশজোড়া নৈরাশ্য আর নিরুদ্যমের নোংরা প্রকাশ দেখা দিল ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক কলহে— যার অশুভ সূচনা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোহাট অঞ্চলকে পর্যুদস্ত করল। মুহম্মদ আলী গর্জন করে উঠলেন : 'If *azans* and peepul trees and noisy processions are our "horizon's utter sum", then let us ring down—this farce is nothing worth!' ১৯২৪ সালে দিল্লীতে মুহম্মদ আলীর বাড়িতেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ রোধ করতে গান্ধীজী তিন সপ্তাহ উপবাস করলেন— তাঁর শয্যাপার্শ্বে 'Unity Conference' বসল, কলকাতার Lord Bishop Dr. Foss Wescott এবং *Statesman* পত্রিকার সম্পাদক বলে

বিখ্যাত Arthur Moore প্রার্থনায় যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি রূপে মুহম্মদ আলী সাম্প্রদায়িক মৈত্রী সম্পর্কে বিশেষ উদ্যোগী হতে চেয়েছিলেন; তৎকালীন কংগ্রেস-সম্পাদক জওয়াহরলাল নেহরুকে লিখলেন: 'My dear Jawahar, let us to work…' জানালেন স্বয়ং মোতিলাল নেহরু দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় 'Malaviya-Lala gang'-এর মতলব ভালো নয় বুঝতে পারছেন। যে বিষ আমাদের জাতীয় সত্তাকে কলুষিত করে রেখেছে তার বিবিধ বিকৃতি তখন দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রাম পরিহার করে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি হানাহানি শুরু হচ্ছিল। হিন্দু নেতারা কেউ কেউ 'শুদ্ধি' আর 'সংগঠন' আন্দোলনে মাতলেন, মুসলিম পক্ষ থেকে জবাব এল 'তাঞ্জিম' আর 'তব্‌লিখ'— জড়িয়ে পড়লেন একদিকে লালা লাজপৎ রায় আর অন্য দিকে সৈফুদ্দীন কিচ্‌লুর মতো ব্যক্তি, প্রস্তুত হতে লাগল সেই নোংরা জমি যার ফসল হল ১৯২৬ সালে কলকাতার দাঙ্গা আর স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা।

গভীর বিচক্ষণতা আর প্রচণ্ড সাহস নিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই কলুষ মোচনের প্রয়াসে নামলেন। বাঙালী মুসলমানকে কোল দিয়ে স্বাক্ষর করলেন Bengal Pact: জানালেন আইনসভায় লোকসংখ্যা অনুপাতে মুসলমানের স্থান থাকবে, সরকারী চাকরিতেও তাই, এবং ইতিমধ্যে সরকারী বিভাগগুলিতে মুসলমান সংখ্যা যথাযথ যতদিন না হয় ততদিন তাদের বেশি সংখ্যাতেই নিযুক্ত করতে হবে— বললেন, হিন্দু মুসলমান যদি ভ্রাতৃবোধ না রাখে, পরস্পরকে বিশ্বাস না করে তো রাজনীতির অর্থ কি? কলেজ স্কোয়ারে হাফপ্যান্ট পরা ছেলেদের নিয়ে লিয়াকৎ হোসেনের 'বন্দেমাতরম্‌'-শোনা আমাদের মনে নাড়া লাগল। অসম্ভব সাড়া জাগল বাঙালী মুসলমান মনে— আর সঙ্গে সঙ্গে মামুলী রাজনীতির বাইরে যেতে যারা অপারগ তারা দেশবন্ধুর বিরোধিতা করল। বেশ মনে আছে কলেজ স্কোয়ার এবং অন্যত্র 'মাইক'-হীন অথচ বৃহৎ সমাবেশ, যেখানে দেশবন্ধুর 'বেঙ্গল প্যাক্ট' ছিল আলোচ্য। শেষ পর্যন্ত বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্বকে ঠেলতে না পেরে 'প্যাক্ট'-কে গ্রহণ করল, স্বরাজ্য দলে তখন মুসলমান সদস্যদের বিপুল উৎসাহ— নোয়াখালির হাজি আবদুর রশীদ

খান্, চট্টগ্রামের নুরুল হক্ চৌধুরী, কুমিল্লার আশ্‌রফ্‌উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, ফরিদপুরের তমিজ্‌উদ্দীন খান্, ময়মনসিংহের ওয়াজেদ আলি খান্ পন্নি ('চাঁদ মিঞা'), খুলনার জালালুদ্দীন হাশেমী, যশোহরের নওশের আলী, আরো কত নাম মনে পড়ছে। অসহযোগের যুগে যাঁরা এসেছিলেন এগিয়ে, মওলানা আকরম খান্-এর মতো, কিম্বা ওয়াহাবী-ফরাজী যুগের হাজি শরিয়ত-উল্লাহ ('দুধু মিঞা')-এর বংশধর ফরিদপুরের পীর বাদশা মিঞার মতো, তাঁরা তো উৎফুল্ল হলেন-ই। ১৯২৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রবর্তিত নূতন আইন অনুযায়ী নির্বাচিত কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হলেন চিত্তরঞ্জন স্বয়ং, এবং তাঁর ডেপুটি বাছাই হলেন প্রতিভাবান্ তরুণ, হুসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দি— উত্তরকালে সাম্প্রদায়িক নেতা বলে কত অখ্যাতি যাকে কুড়োতে হয়েছে। যাই হোক্, বেঙ্গল প্যাক্ট যদি সর্ব-ভারতীয় স্তরে কংগ্রেস গ্রহণ করত তো ইতিহাসের ধারাই এদেশে বদলাবার সম্ভাবনা ঘটত। তা হল না; কংগ্রেস ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিল, নির্দেশ দিল লাজপৎ রায় এবং ডাক্তার আনসারী এ বিষয়ে পরে রিপোর্ট করবেন (যা তাঁরা যে করবেন না, করতে চাইবেন না, করলেও এক কথা বলবেন না, তা সবাইয়ের জানা ছিল)।

কোকোনাদা কংগ্রেস থেকে কিছুটা ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরলেও বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বজায় রাখতে দেশবন্ধু কৃতসংকল্প ছিলেন। বিপদ এই যে তাঁর অনুচরদের মধ্যে বহুলাংশের মতিগতি ছিল ভিন্ন; কেতাবী রাজনীতি অনুসরণ করে তাদের মত হল যে দেশবন্ধু সদিচ্ছাসত্ত্বেও মুসলিম তোষণ করছেন; হয়তো মূলগতভাবে তারা জানত যে বাংলার চাষী অধিকাংশ যখন মুসলিম, তখন তাদের হাতে ক্ষমতা যেতে থাকলে জমিদার পুঁজিদার মালদার শ্রেণীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দেশবন্ধুর জীবদ্দশায় তারা তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে নি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই দেখা দিল স্বরাজ্য দলনেতাদের নিজ নিজ শ্রেণীমূর্তি ধারণ— ১৯২৬।২৭ সালে বাংলার ভূমিস্বত্ব আইন বদলাবার নামে কৃষককে প্রবঞ্চিত করা হল, বিস্তৃত পল্লী অঞ্চলে কংগ্রেসের কৃষক-বিরোধী চেহারা ফুটে উঠল। তাই মুসলিম লীগ এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক সাফল্য সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠল। ১৯২৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ক্রমাগত হিন্দু-মুসলিম সংহতি সাধনে যে বাধা এসেছে,

তার প্রথম পরিচয় পেল বাংলা— দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদার, ভবিষ্যদ্দর্শী সৃষ্টিধর্মী রাজনীতি পরাজিত হল, হয়তো ঐ মহাভাগের অকালমৃত্যুকেও সে আঘাত ত্বরান্বিত করল।

*　　*　　*

সেদিনের রাজনীতি কিন্তু শুধু ব্যবস্থাপক সভা আর স্বরাজ্যদলের কর্মকাণ্ডে পর্যবসিত ছিল না। স্বরাজ্যদলের সাফল্যে দেশ কথঞ্চিৎ উল্লসিত বোধ করত, সন্দেহ নেই। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে চমকপ্রদ ঘটনা কিছু ঘটল; ভিঠলভাই পাটেল সভাপতি হওয়ার পর তো বিশেষ করেই ঘটল— কিছু পরের ঘটনা, কিন্তু ১৯২৮।২৯ সালে 'Public Safety Bill-এ উভয়পক্ষে সমান ভোট পড়ায় সভাপতি বিপক্ষে ভোট ('casting vote') দিলেন। বাধ্য করলেন সরকারকে 'অর্ডিনান্স্' জারি করতে। স্বরাজ্যদলে ছিলেন বাংলার বিশিষ্ট প্রতিনিধি হিসাবে তুলসীচরণ গোস্বামীর মতো তরুণ দেশাভিমানী, যাঁর অনবদ্য ইংরিজী ভাষণের ছটায় শত্রুমিত্র মুগ্ধ হত। তখনকার দিনের মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভে (Central Provinces and Berar) স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভাকে অচল করে দিতে পেরেছিল; "consistent, insistent and persistent opposition" এমন জোরে চলে যে সভা ভেঙে দিতে সরকার বাধ্য হয়। সেখানেও অবশ্য ফাঁকি ছিল, কারণ স্বরাজ্যদলেরই তাম্বে (Tambe)-নামধারী এক ধুরন্ধর ডিগ্‌বাজী খেয়ে Executive Councillor-এর মোটা মাহিনার চাকরি গ্রহণ করেন। বাংলায় চাঞ্চল্য কম ছিল না; স্বয়ং দেশবন্ধু কাউন্সিলে স্বরাজ্যদলের নায়ক ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় 'স্ট্রেচর'-এ এসে ভোট দিয়েছেন। সরকারকে বহুবার ভোটে হারিয়েছেন— তবে হয়তো বলা যায়, সর্ষের মধ্যে ভূত তখন থেকেই এদেশের পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে আমদানী হয়েছে। শোনা গেল নলিনীরঞ্জন সরকারের মতো করিৎকর্মার কেরামতির কথা— কোন্ এক ধনবান রাজভক্ত সদস্যকে ভোটের দিন আটকে রাখার জন্য তার 'রক্ষিতা'কে দিয়ে প্রভাব বিস্তার বুঝি নলিনীরঞ্জন ভিন্ন স্বরাজ্যপার্টির অন্য কোনো কর্মকর্তার সাধ্য ছিল না! কিছু পরিমাণে 'কাউন্সিল' আর 'অ্যাসেম্ব্লি' নিয়ে মাতামাতির মধ্যে ডুবে থাকা রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। গান্ধীজী তখন দূর থেকে দেখছেন; বেলগাঁওতে কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯২৪)

সভাপতিত্ব তিনি করেছেন বটে, কিন্তু জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন দাশ এবং নেহরুকে। গড়ছেন নিজের খাস দল, হরিজন সেবক সংঘ, সারা ভারত সুতা কাটুনী সংঘ, সারা ভারত পল্লী শিল্প সংঘ ইত্যাদিকে ঘিরে— আশ্রম চালাচ্ছেন, 'ইয়ং ইণ্ডিয়া, এর পরে 'হরিজন' পত্রিকায় অবিরাম লিখে চলেছেন, দাঁড়াবার জমি শক্ত করছেন। দেশবন্ধু কতটা দেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি পরিবর্তনের কথা ভেবে মন স্থির করতে পেরেছিলেন, বলা যায় না— সময় তো পান-ই নি।

দেশবন্ধু এবং সুভাষচন্দ্রের মতো তাঁর অন্তরঙ্গ অনুচর যে শুধু কাউন্সিল-অ্যাসেম্ব্লি নিয়ে ভাবতেন, মনে করা ভুল এবং অন্যায় হবে। গান্ধীযুগের প্রথম অধ্যায় দেশকে আলোয় ঝল্‌মল্‌ করে তুলে আবার যখন অন্ধকারের আবর্তে ফেলে দিল, তখন অনিবার্যভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সন্ত্রাসবাদ, যা ১৯২০-২১ সালে গান্ধীকে পরীক্ষামূলক ভাবে কিছু সময় মাত্র দিতে রাজী হয়েছিল। তাই ১৯২৩-২৪ সালে আবার অনেক দুঃসাহসী কাণ্ড ঘটতে শুরু করল। আমাদের পাড়ার পাশে শাঁখারিটোলা পোস্ট অফিসের উপর হানা পড়ল, আজকে অনেকেরই কাছে বিস্মৃত গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হল পুলিশ কমিশনার ভেবে ডে-নামে এক ইংরেজকে গুলি করে মারার অপরাধে। গান্ধী এবং চিত্তরঞ্জনের মধ্যে তুমুল তর্ক হল উপরতলায়— দেশবন্ধু চাইলেন, ভুলপথে গিয়ে থাকলেও গোপীনাথ সাহার নির্ভয় দেশ-প্রেমকে বাহবা দিতে, কিন্তু গান্ধী তাতে স্বীকৃত নন, অহিংসানীতিতে তিনি অটল। ১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র বসু সমেত বহু নেতাকে সরকার বিনা বিচারে আটক করল— অভিযোগ এই যে তাঁরা সন্ত্রাসবাদীদের সহায়তা করেছেন। কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে দেশবন্ধু তখন অপূর্ব তেজস্বী ভাষণ দিয়েছিলেন: 'If love of country is a crime, then I am a criminal···If Subhas Chandra Bose is a criminal, then I am a criminal'। কর্পোরেশনে তাঁর বক্তৃতা শুনি নি, পড়েছি রিপোর্ট, দেখেছি *Capital*-পত্রিকায় তদানীন্তন নামজাদা সাহেব সম্পাদক Pat Lovett-এর মন্তব্য দেশবন্ধুর দৃপ্ত ওজস্বিতা বিষয়ে, কিন্তু নিজ কানে শুনেছি কলকাতা টাউন হলের বাইরে উপ্‌চে-ওঠা জনতার সামনে দেশবন্ধুর উদাত্ত আহ্বান। হলের ভিতর তিলার্ধ স্থান নেই, তাই 'overflow' সভা— আজ টাউনহল ঘরের হাল দেখে ভাবাই

যায় না সেখানে অনতিকালপূর্বে প্রচণ্ড সমাবেশ হত। 'মাইক'-বিবর্জিত সভাতেও কেমন করে যে মোটামুটি বক্তৃতা শুনতাম আজ তা কল্পনা করা কঠিন। বিনাবিচারে আটকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শহর ভেঙে পড়েছে টাউনহলের চারদিকে আর দেশবন্ধু বক্তৃতা করছেন: 'জ্বেলে দে মা আগুন···', আর কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে এসেছে, আমরাও যেন রুদ্ধশ্বাস, মর্মস্থল পর্যন্ত দুঃখ আর রোষ-মিশ্রিত আবেগে আলোড়িত।

১৯২৫ সালের ১৬ জুন বাংলার বুকে বজ্রাঘাত ঘটল, দার্জিলিঙে 'Step Aside' গৃহে দেশবন্ধুর জীবনাবসান হল। কলকাতায় মিছিল অনেক দেখেছি, কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরদিন শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কেওড়াতলা শ্মশান পর্যন্ত যে শোকযাত্রা, আমরা যারা ছিলাম সেই জনস্রোতে কখনো তাকে ভুলতে পারব না। গান্ধী ছিলেন, ভবানীপুরে দেশবন্ধুর বাসভবনের দ্বার-প্রান্তে বসে শোকসন্তপ্ত পরিজনকে সান্ত্বনা দিলেন, লিখলেন পরদিন দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, যার শিরোনামা হল 'Long live Deshbandhu'—'Deshbandhu is dead; long live Deshbandhu!' লিখতে সংকোচ আসছে কিন্তু আজও মনে পড়ে, সেদিন ক্রমাগত আমার স্মৃতিতে ভাসছিল চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠস্বর: 'জ্বেলে দে মা আগুন···'। ভাবি কথাগুলো এমন কিছু তো নয়, কিন্তু অমনভাবে আমার সত্তাকে নাড়া দিল কেন?

বলা উচিত যে গান্ধীভক্তি আমাকে দেশবন্ধু সম্পর্কে কিছুটা সমালোচক করে তুলেছিল; তখন আমি গান্ধী প্রভাবে নিরামিষাশী (যা ছিলাম বছর পাঁচেক); খদ্দর ছাড়া পরি না; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু (তখনকার সেন্ট্রাল কলেজের) কিম্বা এটর্নি কুমারকৃষ্ণ দত্তের মতো ব্যক্তিদের উদ্যোগে খাদি প্রদর্শনী হলেই স্কুলবন্ধু নন্দ কুণ্ডুকে নিয়ে ছুটে যাই; বাসি ধুতি রোজ বাড়িতে কেচে দেয়, অথচ বর্ষায় মোটা খাদি শুকোয় না বলে অপরের খোঁটা এড়াবার জন্য লুকিয়ে ঘরের মধ্যে বৃষ্টির দিনে ধুতির গায়ে পাখার হাওয়া দিই! দেশবন্ধুর সভায় অবশ্যই যাই, কিন্তু নেংটি-পরিহিত গান্ধীর তুলনায় সাদা মোটরগাড়ি চড়ে আসা এবং সাদা ধুতি পাঞ্জাবী চাদর আর সাদা নাগ্‌রা-পরা চিত্তরঞ্জনকে কেমন যেন একটু দূরের মানুষ বলেই ভাবতাম (সুভাষচন্দ্র বসু এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত,

দেশবন্ধুর এই দুই প্রধান শিষ্যও গুরুর মতো শ্বেতাম্বর পরিধান করতেন, সাদা নাগরা তো বটেই; দেশবন্ধুর সাদা মোটরখানি ছিল সকলের চেনা)। সব দূরত্ব যেন কেটে গেল— আকস্মিক জীবনান্তের আলোয় দেশবন্ধুর সমগ্র রূপ যেন উদ্ভাসিত বোধ করতে পেরেছিলাম। পঞ্চান্ন বৎসরের এই মহদাশয় জীবন ভারতমানসের যে বিরাট সম্পদ তা যেন বুঝলাম।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। পরিণত বয়সে মৃত্যু নিয়ে খেদ নেই, কিন্তু অমন বহুগুণান্বিত দেশ-ভক্তের তিরোধান সামান্য ঘটনা নয়। বেশ মনে আছে দেশবন্ধুর দেহা-বসানের পর সুরেন্দ্রনাথের আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ সবাইকে মুগ্ধ করেছিল; রাজনৈতিক বিরোধ একটা স্তরে উঠলে মানবিক অনুভূতি ও ঔদার্য কিছু পরিমাণে খণ্ডিত হয়ে যায়, কিন্তু বেশ বোঝা গেল যে সুরেন্দ্রনাথ তার উর্ধ্বে ছিলেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার আইন যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করল, তাতে সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন; বৎসরে বেতন ছিল চৌষট্টি হাজার, 'পাঁচ হাজারি মনসব্‌দার' বলে তাঁকে বিদ্রূপ করা হত। বেশ মনে আছে কলেজ বন্ধুদের মধ্যে কথা হচ্ছে, হয়তো একজন বলল, 'সুরেন বাঁড়ুজ্জে হলেন Browning-এর "The Lost Leader" : 'Just for a handful of silver he left us, just for a ribbon to stick in his coat,' ঠিক মিলে যায়, তাই না?' যিনি একদা 'Surrender Not' বলে খ্যাত ছিলেন, তিনি ইংরেজ রাজার কাছ থেকে 'নাইট্‌' খেতাব নিলেন, মন্ত্রী হলেন, রাজনৈতিক লড়াই ছাড়লেন। সে যাই হোক্‌, সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দূর থেকে শুনেছি এবং জেনেছি এমন কথা যাতে তাঁর মনের প্রসার আর অন্তরের ঔদার্য বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তাঁর রাজনীতি আমার যুব-চিত্তে ছিল অগ্রাহ্য, কিন্তু তাঁকে অপমান করার যে প্রবৃত্তি ও প্রয়াস তখনকার কোনো কোনো মহলে দেখা যেত তা আমার কাছে নিন্দনীয়। বৌবাজার স্ট্রীটে 'বেঙ্গলী' অফিসে বৃদ্ধ বয়সেও দৌড়ে মস্ত চওড়া সিঁড়ি ভাঙ্‌তে আমি তাঁকে দেখেছি; বিরোধী-পরিবৃত হয়েও নির্বাচনী সভায় তাঁকে নিজের কথা বলার চেষ্টা করতে দেখেছি; ঝাপ্‌সাভাবে মনে আছে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে কোন্‌ এক সভায় তাঁর কম্বুকণ্ঠের উত্থানপতন। কাহিনী শুনেছি তাঁর সম্বন্ধে: টেলিফোন ধরবেন না, রোজ ট্রেনে ব্যারাকপুর ফিরবেন,

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাঁধা তাঁর ঘোরাফেরা, দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভায় বা অন্যত্র কাজ থাকলেও রাত ন'টায় শয্যাগ্রহণ করবেন, বড়োলাট ডাকলেও তার হেরফের হবে না। অন্য দেশে হলে সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন-এর মতো বিচিত্র গভীর চরিত্র নিয়ে কত নিপুণ আলোচনা হত, কিন্তু যাক্ সে কথা।

* * *

আমাদের বি.এ. ক্লাসে পড়ার সময় বাংলার তদানীন্তন গভর্নর লর্ড লিটন একবার পুলিশের বিরুদ্ধে নারী ধর্ষণ অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে এমন ভাষা ব্যবহার করে ফেলেন যা এদেশের স্ত্রীজাতির চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসিত কটাক্ষ বলে প্রতীয়মান্ হয়। তৎক্ষণাৎ সারা বাংলা জুড়ে বিক্ষোভ দেখা দেয়, দাবি ওঠে যে লাটসাহেব হোন্ বা যাই হোন্, লিটনকে ক্ষমা চাইতে হবে। আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র ছিল সভা আর সমাবেশ— এটা যে আক্রোশের কথঞ্চিৎ পঙ্গু প্রকাশ, সন্দেহ নেই, আমরা বুঝতাম কেন সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হয়, মনে আসত 'বঙ্গবীর' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যথাতুর ব্যঙ্গ :

আর কিছু তবে নাহি প্রয়োজন,
সভাতলে মিলে বারো তেরো জন,
শুধু তরজন আর গরজন
এই করো অভ্যাস!

তবে এটাও জানতাম পরাধীন, নিরস্ত্র জনতাকে সংহত ও শক্তিধর করে তুলতে সভা ও সমাবেশের প্রয়োজন সর্বাধিক, চোখের সামনে দেখা গিয়েছিল গান্ধী-নেতৃত্বে জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুদয়। তাই লিটনের নিন্দা করে সভা হল বহু— একটার কথা মনে আছে, আবাব কলকাতার টাউন হলে, এসেছেন সরোজিনী নাইডু, অনিন্দ্য কণ্ঠে অলংকারবহুল ভাষায় অথচ একান্ত তেজস্বিতার সঙ্গে বলছেন: 'Pure as the waters of the Ganges, resplendent as the naked heavens, is the honour of Indian women'— স্বর কখনো উচ্চগ্রামে তুলে, আবার কখনো মৃদু তারে নামিয়ে অথচ সর্বদা স্পষ্টোচ্চারিত বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বলা কথাগুলো আজও মনে আছে। পরে শ্রীমতী নাইডুকে একাধিকবার খুব কাছে থেকে দেখেছি, সম্ভবত ১৯৩৬ সালে স্পেনে ফ্যাশিস্ট দৌরাত্ম্যের বিপক্ষে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে এক মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করেছি, তাঁর স্বচ্ছন্দ আলাপচারিতায় মুগ্ধ হয়েছি, তাঁর

ভ্রাতা ভগ্নী পুত্রকন্যাদের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সব চেয়ে জাজ্জ্বল্যমান স্মৃতি আজও হল টাউনহলের সিঁড়িতে শোনা ঐ কথাগুলি।

কলেজে তখন অধ্যক্ষ স্টেপ্‌লটন-এর কুখ্যাত রাজত্ব আরম্ভ হয়েছে। Founders' Day (January 20) উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হত, তাতে রেওয়াজ ছিল মাঝে মাঝে লাটসাহেবকে ডেকে আনা। কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক তখন ছিলেন এম.এ. ক্লাসের ছাত্র সুরেশচন্দ্র রায়, যিনি সম্ভবত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-লিখিত "বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার"-শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এবং আচার্যদেবের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত কিয়ৎ-পরিমাণে অনুসরণের চেষ্টায় পরবর্তী জীবনে বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য দেন, শিল্পক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় সফল বাঙালীর অন্যতমরূপে আজও তিনি পরিচিত। কেমন করে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে লিটনকে Founders' Dayতে প্রধান অতিথি করতে রাজী হলেন জানি না; খুব সম্ভব প্রিন্সিপালের চাপ এড়াবার শক্তি তাদের ছিল না। যাই হোক্, তৎকালীন পরিস্থিতিতে লিটনকে ডেকে আনার বিরুদ্ধে ছাত্রমহলে প্রচণ্ড আপত্তিও দেখা দিল, কিন্তু কোনো উপায় ছিল না লাটসাহেবকে পাঠানো নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিয়ে নেওয়ার। বেশ বোঝা গেল, কলেজের অধিকাংশ ছাত্র একেবারে চায় না লিটনের আসা, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন নৈতাদের হাত করে অনমনীয় ভাব দেখাল, আয়োজন চলতে লাগল। আমাদের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ইউনিয়নে প্রতিনিধি ছিল সুকুমার ভট্টাচার্য (উত্তর-কালে ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট্‌স্ কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি এবং বিশ্বভারতীর প্রধান ইতিহাসাধ্যাপক)— আমাদের উপরোধ না মেনে সে সুরেশবাবুর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এতে আমাদের বন্ধুতায় কিছুকাল চিড় পড়েছিল, না বলে পারছি না; তবে সুকুমার সাবধানী মানুষ হলেও ছিল অত্যন্ত সজ্জন, পরে বহু মতভেদ সত্ত্বেও তার সঙ্গে সৌহার্দ্য নষ্ট হয় নি, তার জীবনের শেষ দিকে আমার সঙ্গে তার সম্পর্কও আবার ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। মনে আছে এক-দিন কলেজের উঠোন পার হতে দেখলাম সুরেশ রায়কে, অনভ্যস্ত কোট-প্যাণ্ট-টাই পরা অবস্থায়— হয়তো লাটের আগমন ব্যাপারে ব্যবস্থাব্যপদেশে এমন মহলে তাকে ঘুরতে হচ্ছিল যেখানে ধুতি পাঞ্জাবী প্রায় বরবাদ! এ

নিয়ে আমাদের মধ্যে হাসাহাসি হয়েছিল কম নয়— তুচ্ছ ব্যাপার হলেও খুব মনে আছে।

আমরা বাকি সবাই যে খুব বীরপুরুষ ছিলাম, তা বলতে চাইছি না। তবে লিটন মানুষ হিসাবে যাই হোন্‌-না কেন, পুলিশের স্বপক্ষে একটা দুর্বৃত্ত বক্তৃতা করে যখন তার দেশজোড়া দুর্নাম, তখন তাকে কলেজে এনে সমীহ করার মেজাজে আমরা কেউ ছিলাম না। আমাদের মধ্যে কারো বয়স তখন এমন ছিল না যে অসহযোগ আন্দোলনে প্রকৃত ভাগীদারী করার দাবি চলত, তবে বয়সে কিছু বড়ো, কিন্তু একেবারে সকলের সঙ্গে সহজ সখ্যে মিশে থাকা একজন আমাদের মধ্যে ছিল; এর নাম প্রকাশচন্দ্র মল্লিক; অসহযোগের যুগে কী যেন কারণে rusticated হয়ে প্রায় বছর চারেক এর নষ্ট হয়ে ছিল। প্রকাশ আমাদের মোটামুটি নেতা হয়ে দাঁড়াল; উত্তর কালে প্রায় যেন তার ছাত্রজীবনের ধারাকে পাল্‌টে সে কলকাতা হাই-কোর্টের জজ হয়, এই লেখার অল্প কয়েকমাস আগে সে মারা গেছে। সদাহাস্যময়, বন্ধুবৎসল, মিষ্টভাষী এই মানুষটির মধ্যে অন্তত এক সময় আগুন যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই— কিন্তু বলছিলাম যে কথা তাই বলি। ঐ সময় কলেজে আমরা ক'জন অ্যালবার্ট হলের তিনতলায় নাম-করা ফোটোগ্রাফার চারু গুহ মশায়ের কাছে গিয়ে একটা ছবি তোলাই— একটা আখ্যা দেওয়া হয় মজা করে, 'Flowers of Presidency College'! দলে যারা ছিল তাদের অন্তত একজন (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়) পরে আই.সি.এস্‌. হয়, আরো কয়েকজন (যেমন অধ্যক্ষ অরুণকুমার সেন, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বলা চলে। সে যাক্‌, ছবি নিয়ে একদিন কলেজের একতলা বারান্দায় গুল্‌তান করা যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ আবির্ভাব প্রিন্সি-পাল স্টেপ্‌ল্‌টন-এর। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা: 'হাতে কী তোমাদের?' একটু ত্রস্ত হয়ে সাহেবকে দেখানো ছাড়া উপায় ছিল না— ইংরেজের চতুর সৌজন্য দেখলাম, সাহেবের মুখে একগাল হাসি, তবে বললেন প্রকাশের চেহারার দিকে আঙুল দেখিয়ে: 'At least one of you is not a flower!'

কারা মিলে স্থির হল মনে পড়ছে না, কিন্তু আমরা ধরে নিলাম Founders' Day বয়কট করতে হবে। কর্তৃপক্ষও জানল ছেলেরা গণ্ডগোল করতে পারে, তাই 'সাজ, সাজ' রব তাদের মধ্যে উঠল। চিরকাল ঐ দিন ছুটি

থাকত; বিকেলে সানন্দে সবাই আসতাম অনুষ্ঠানে। এবার উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য কলেজ ছুটো অবধি খোলা রইল; যারা থাকবে 'বেকার লেবরেটরি' গৃহে তাদের জন্য প্রচুর জলপানের আয়োজন হল। আমাদের মতো যারা 'স্কলারশিপ' পেতাম, তাদের পাকেপ্রকারে জানানো হল যে সেদিন লাটসাহেবের সভায় হাজির না থাকলে বিপদ হতে পারে। সুরেন মজুমদার মশায়ের মতো যে অধ্যাপকরা ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, তাঁদের দিয়ে অনেককে প্রভাবিত করার চেষ্টা হল। অনুষ্ঠানের দিন দেখা গেল ছুটোর সময় কলেজের প্রধান 'গেট্' বন্ধ; যে কেউ বেরিয়ে যাবে, তাকে যেতে হবে হেয়ার স্কুলের দরজা দিয়ে, আর তার পাশে বিভিন্ন বিভাগের জাঁদরেল অধ্যাপকেরা চেয়ার পেতে বসলেন, যাতে কারা যাচ্ছে তা লক্ষ করতে পারেন আর সম্ভব হলে নৈতিক প্রভাব খাটাতে পারেন! বেশ মনে আছে, চলে যাবার সময় দেখলাম, ইতিহাসের অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনকে; অবশ্য তিনি কিছু বললেন না, বারণ করলেন না, তবে কাজটা যে অপছন্দ করলেন তাতে সন্দেহ নেই।

কলেজ-সংলগ্ন ঈডন্ হিন্দু হস্টেল ছিল বয়কট-আন্দোলনের একটা ঘাঁটি। পরে শুনেছিলাম সেখানকার বাসিন্দা, অথচ 'সরকারী' দলের এক পাণ্ডার জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল— রাতে ফিরে হয়তো সে আবিষ্কার করল তার গৃহদ্বারে মনুষ্যদেহনিঃসৃত মলমূত্র! ছেলেমানুষি এবং কিঞ্চিৎ নোংরামি সন্দেহ নেই, কিন্তু সেদিনের অর্ধ-অসহায় যুবচিত্তবৃত্তিরই এ এক ধরনের প্রকাশ। 'ভালো' ছেলেদের অধিকাংশকে টেনে আর দুর্বলচিত্ত অথবা চিন্তা-রহিত বহু ছাত্রকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে সেদিনের সভা নাকি ভরাবার চেষ্টা হয়েছিল। তবে Founders' Day জমে নি একেবারে, সন্দেহ নেই। আগে নিয়মিত আসতেন মোহনবাগান মাঠে দর্শক ও খেলার রসালো টীকাকার হিসাবে প্রসিদ্ধ কাশীবাবু— যাঁর 'ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়' গানটি বাংলা এবং ইংরিজীতে একান্ত অকিঞ্চিৎকরতা সত্ত্বেও সহজ আনন্দ দিত। তিনি এলেন না; আরো এলেন না প্রাক্তন ছাত্র হরেন্দ্রনাথ দত্ত, হাওড়া-বাসী এই হাই-কোর্টের তরুণ উকিলকে সবাই জানতাম (তাঁর অকালমৃত্যু কয়েক বৎসর পরে এক শোকাবহ ঘটনা), আর আমি একবার হাইকোর্ট ক্লাবের ময়দান তাঁবুর সামনে বসে তাঁকে গাইতে শুনেছিলাম: 'আগে চল্, আগে চল্ ভাই'।

এ কথা বলছি কারণ আজও মনে আছে সুরেলা গলায় গাওয়া যে কথাগুলি তিনিই আমার কণ্ঠস্থ করে দিয়েছেন :

চিরদিন আছি ভিখারীর মতো জগতের পথপাশে,
যারা চলে যায়, কৃপাচক্ষে চায়, পদধুলা উঠে আসে,
ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে, মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পারো, চেয়ে দেখো তবে, ঐ আসে রসাতল ভাই!

অনেকের কাছে যোগসূত্র অদৃশ্য থাকবে, কিন্তু হরেনবাবুর গাওয়া এই কথাগুলি বার বার মনে এসেছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক 'তিমির-বিদার-উদার-অভ্যুদয়'-এর কালে— ভেবেছি এবার বুঝি আমাদের 'ভিখারী' ভূমিকা পরিত্যাগের লগ্ন এসেছে।

কটাক্ষ করে লিখছি না, কিন্তু মনে আছে যে 'রাজভক্ত' বলে তৎকালে পরিচিত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি লিটন-সমাগমে উপস্থিত না হওয়ার কারণ খুঁজে পান নি। একটু মজা লেগেছিল যখন জানা গেল যে কলেজের বর্তমান বা প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে তখনই প্রথিতযশা দিলীপকুমার রায়ের মতো বহু সুগায়ক থাকা সত্ত্বেও কাউকে মেলে নি, মিলেছিল মাত্র একজনকে, যিনি (শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার) 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটি বাংলা এবং তার ইংরিজী অনুবাদে গেয়েছিলেন। সামাজিক নানাগুণ-সম্পন্ন এই ব্যক্তির মনের গড়নে কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল হয়তো ছিল। 'শচীন'-কে তিনি ইংরিজীতে লিখতেন 'Sochyn'।

কলেজে এই পর্বে আবার দেখা গেল বিক্ষোভ—'ম্যাগাজিনে' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য নিয়ে। সম্পাদক ছিলেন (একাধিক বৎসর) উত্তর জীবনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজীর অধ্যাপক-রূপে খ্যাতনামা সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। ঠিক কী লিখেছিলেন, আজ মনে নেই, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের দেহাবসানে ভারাক্রান্ত আমাদের মনে ধারণা হল যে প্রেসিডেন্সি কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাক্তন ছাত্রদের অন্যতম এই দেশনেতার প্রকৃত মর্যাদা সম্পাদকীয় বিবৃতিতে লঙ্ঘিত হয়েছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নায়ক চরিত্র রূপায়নের চেষ্টা হয়েছে কিছুটা 'সরকারী' দৃষ্টিকোণ হতে, দেশবন্ধুর মনীষা, ত্যাগ, ঐকান্তিকতা, আবেগ, কর্মশক্তি, সব কিছুকেই লঘু করে দেখানো হয়েছে। সুরেশচন্দ্র রায়ের মতো সুবোধ সেনগুপ্তও তখন

আমাদের কাছে নিন্দনীয় বলে প্রতিভাত হলেন। ছাপা 'ম্যাগাজিন' ছিঁড়ে আমরা কলেজের বারান্দায় ছড়িয়ে বেড়ালাম, এর বেশি অবশ্য কিছু ঘটল না; কিন্তু ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল যে দেশজুড়ে যে অশান্তি তার ছায়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ছে কলেজে আমাদের আপাত-সুরক্ষিত জীবনে, কর্তৃপক্ষও কলেজের মধ্যে বিক্ষোভকে তখনই কড়া হাতে দমনের সাহস পাচ্ছে না বলেই হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এই ধোঁয়া ক্রমে ঘন হয়ে সৃষ্টি করল মেঘ, যার গর্জন আর বর্ষণ দেখা গেল কিছু পরে, ১৯২৮-২৯ সালে, যখন বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র প্রমোদকুমার ঘোষালের নেতৃত্বে প্রিন্সিপাল স্টেপ্‌লটন্‌-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করল, বাংলার সুগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করল।

* * *

সেদিনের ভারতবর্ষে, যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের ছাত্রজীবনের মধ্যাহ্ন, বহু দিগন্ত তখন খুলতে আরম্ভ করেছে, বয়সের ধর্ম টানছে নানা-দিকে, আর—অসত্য বলছি কি?—প্রায় যেন সব ছাপিয়ে 'দেশ, দেশ' এই চিন্তা মনের আকাশ ছেয়ে থাকছে। লেখাপড়া করছি একরকম, নিয়মিত পাঠাভ্যাস কোনোকালেই স্বভাবে নেই, কিছু মেধা আছে, সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত স্মৃতিশক্তি (আর দ্রুত ভুলে যাওয়া) এবং কোন একটা বিষয় খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে মোটামুটি সমগ্রভাবে ধরে ফেলার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক —তাই তথাকথিত 'ভালো' ছেলে হয়েও ঠিক্ 'ভালো' ছেলে ছিলাম না। কিছুটা মিল হয়তো ছিল পঞ্চানন চক্রবর্তীর মতো 'ভালো' ছেলের সঙ্গে —হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে বন্ধুতা সত্ত্বেও কেমন যেন একটু তফাৎ থাকত; সে উত্তর-জীবনে নানা ধরনের রাজনীতি করেছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছে, বহুগুণান্বিত বলে অনেক কৃতিত্ব নানাক্ষেত্রে দেখিয়েছে, কিন্তু ছাত্রাবস্থায় দেশের রাজনীতি বিষয়ে তার যেন ছিল অনীহা, তখনকার রাজনীতি তার কাছে হয়তো একটু বিস্বাদই লাগত। বি.এ. ক্লাসে নতুন কিছু বন্ধু জুটল, রংপুরের চন্দ্রশেখর লাহিড়ী আর বিনয়ভূষণ রায় (পরে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর), কৃষ্ণনগরের শচীন সেন এবং আরো কেউ কেউ। হুমায়ুনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলেছিল আমাদের জুনিয়র ব্যাচ'-এর কয়েকজন— সুশীলকুমার দে আর

রঞ্জিতকুমার (রায় উভয়েই পরে আই. সি. এস.), ওবেদুর রহমান (পরবর্তী জীবনে স্বাধীন ভারত সরকারের প্রধান বৈদেশিক প্রচারবিদ) প্রভৃতির মতো কয়েকজন, যাদের সঙ্গে (বিশেষত সুশীলের সঙ্গে) অন্তরঙ্গতা হল, কিন্তু কেমন যেন একটু দূরত্ব রেখে। প্রকৃত রাজনীতি কিছু করি বা না করি, রাজনীতি নিয়ে মস্তিষ্কপীড়া এদের চেয়ে বেশি থাকার ফলেই বোধ হয় একটা ব্যবধান কোথায় বুঝি থেকে যেত।

বোধ হয় বি. এ. পড়ার সময়ই হুমায়ুনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ স্বপন-পসারী প্রকাশিত হল। যতদূর মনে পড়ে, তার কিছু আগে রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' বেরিয়েছে, এবং কিছু পরিমাণে আর বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের মাতিয়েছে। খুব সম্ভব ঐ সময়েই 'প্রবাসী'তে মাসের পর মাস বেরুতে থাকত সদ্য আই. সি.এস. পাস-করা অন্নদাশঙ্কর রায়ের "পথে প্রবাসে"। আজ আবার পড়লে কেমন লাগবে জানি না, কিন্তু তখন অপরূপ লেগেছিল, আশা করি আজও লাগবে। একটু ধৃষ্টতা মনে হবে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে যাদের কাছে বাস্তবিকই বিরাট প্রত্যাশা ছিল, অন্নদাশঙ্কর তাদের অন্যতম, অথচ বহু চিন্তা-ও সংবেদনশীল রচনা তাঁর হাত থেকে বেরুলেও আমি যেন কোথায় তিনি মনকে চোখ ঠেরে গোঁজামিল দিয়ে চলেছেন ভেবে একটু বিচলিত। তাঁকে নিয়ে আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, এ ভাবে কিছু বলাও অনুচিত হবে। কিন্তু যেহেতু তিনি মহৎ লেখকের বিবিধ উপলক্ষণ নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আজও আমাদের সীমিত পরিবেশে শিল্পপথপরিচায়ক বলেই সম্মানিত, ঠিক সেহেতু আমার মনের খেদ (এবং সঙ্গে সঙ্গে যা পেয়েছি সেজন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা) প্রকাশ না করে পারছি না। সংসারে অনেকটা গতানুগতিকতা বর্জন করার পর যেন তাঁর মননের হাঁফ ফুরিয়ে আসছে আশঙ্কা করে কি দুঃসাহসী মৌলিক সমাজ-চিন্তার ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টি ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস থেকে তিনি নিবৃত্ত হয়ে রইলেন?

মনের বয়স তখন আমাদের বাড়ছে, তবে বহুবিধ আগ্রহকে সংহত করার মতো সংগতি ছিল না, আজও নেই। পরীক্ষার পড়ায় অবহেলা করে এবং রীতিমতো পরিশ্রম যথাসাধ্য করে, কলেজ ম্যাগাজিনে লিখলাম ইংরিজী প্রবন্ধ "Hindu View of Monarchy"— কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল

প্রমুখ পণ্ডিতকে অনুসরণ করে এদেশে রাজতন্ত্র যে স্বৈরাচারী ছিল না প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তখন আমাদেরই অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল *A History of Hindu Political Theory* শীর্ষক মহা মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। দেশভক্তির সস্তা আতিশয্যে তাঁর একান্ত তথ্যনিষ্ঠ (এবং কিয়ৎপরিমাণে আমাদের দেশাভিমান-প্রণোদিত পক্ষপাতের পরি-পন্থী) আলোচনাকে সানন্দে গ্রহণ করতে পারি নি— ভিন্‌সেণ্টস্মিথ-জাতীয় সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকের মুখের মতো জবাব দিচ্ছেন জয়সওয়াল কিম্বা বিনয়কুমার সরকার ভেবেছি। পরে অবশ্য বুঝেছি মনের ভুল; ইতিহাসের তথ্যের আংশিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কখনো দেশভক্তির উৎকর্ষ সম্ভব নয় জেনেছি, তথ্য থেকে সত্যে যথাসাধ্য উত্তরণ যে কত দুরূহ তা বুঝেছি।

খুব সম্ভব 'প্রবাসী'তে সুনীতি চাটুজ্জে মশায়ের এক লেখায় দেখেছিলাম যে নিজের দেশ ছাড়াও কয়েকটা দেশকে আপন মনে করা অসংগত নয় এবং দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন বিপ্লবের পীঠভূমি ফ্রান্স এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মস্থল গ্রীস। অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার পড়ানোর প্রভাবেও হয়তো প্রাচীন গ্রীস সম্বন্ধে একটা অসম্ভব আগ্রহ তখন জন্মেছিল— আজও অ্যাথেন্সে গিয়ে 'পার্থেনন' দেখতে না পারার চেয়ে বড়ো খেদ আমার অল্পই আছে। Zimmern-এর বইয়ে পড়া কথা আজও ভুলতে পারি নি: "The Athenian had loved the Acropolis rock when it was still rough and unlevelled, when the sun, peeping over Hymettus, found only ruddy crags and rude Pelasgian blocks to illumine. He loved it tenfold more now, when its marble temples caught the first gleam of the morning or stood out, in the dignity of perfect line, against a flaming sunset over the mountains of the west"। সম্প্রতি বুলগেরিয়া যাবার সুযোগ হয়েছিল, ভারতীয় রাষ্ট্র-দূত গোপাল সিং আমার বন্ধু, রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য, পাঞ্জাবী ও ইংরিজীতে সুলেখক, চেয়েছিলেন আমাকে অনতিদূর অ্যাথেন্সে নিয়ে যেতে, সময়াভাবে ঘটে নি। 'Yarrow Unvisited'-এর মতো অ্যাথেন্স্-দর্শনও আমার স্থগিদ্ থাক্, তবে মনে পড়ছে অক্সফর্ডে পড়তে গিয়ে পুরো একটা 'টর্ম্' নষ্ট করেছিলাম পাঠ্যপুস্তক ফেলে রেখে প্রাচীন গ্রীক 'federalism'

সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে। মতলব ছিল প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় জিতব (যার কোনো আশাই ছিল না) এবং পুরস্কার হিসাবে Hellenic Travellers' Guild যে জাহাজ নিয়ে গ্রীস যাবার ব্যবস্থা করেছিল তাতে বিনামূল্যে স্থান পাব এবং অক্সফর্ডেরই জগদ্‌বিখ্যাত অধ্যাপক গিলবর্ট মরে-র (Regius Professor of Greek) পরিচালনায় প্রাচীন গ্রীসের গৌরবকে চাক্ষুষ করতে পারব।

কলেজপাঠ্য গ্রন্থের বাইরে যথাসম্ভব পড়ার চেষ্টা আমার পক্ষে সেদিন আরো অনেকের মতোই অসংগত ছিল না। কলেজ স্ট্রীটের বই-পাড়ার বাহার তখন কম ছিল না, যদিও আজকের নিদারুণ পাঁচমিশেলী ভিড় তখন ছিল না। কলেজের সামনেই হিন্দু স্কুলের গায়ে চক্রবর্তী চ্যাটার্জির দোকান ছিল আমাদের ঘাঁটি। বুক কোম্পানি একটু দূরে (আজ যেখানে 'মনীষা'); তার প্রাণপুরুষ গিরীন মিত্রের কথা তখন শুনেছি কি শুনি নি, মনে নেই। বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় চঞ্চল করে তুলেছে; Principles of Social Reconstruction' মুগ্ধ করেছে, কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে "A Free Man's Worship" প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশ— *Mysticism and Logic* গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত এটি। মনে পড়ছে বন্ধুদের কাছে উচ্চৈঃস্বরে বলেছি যদি আজ কারো পায়ের ধুলো মাথায় দিতে সংকোচ করব না তো সে হল বার্ট্রাণ্ড রাসেল! পরীক্ষা দিতে বসেও ভেবেছি রাসেল-এর কথা— বেশ মনে আছে প্রাচীন গ্রীক নাটক, বিশেষত 'ট্র্যাজেডি' সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন এসেছিল 'অনার্স' পরীক্ষায় আর জবাবে উদ্ধৃত করেছি রাসেল-এর বাক্য : 'The Past does not change or strive. Like Duncan in Macbeth, "After life's fitful fever it sleeps well." What was eager and grasping, what was petty and transitory, has faded away. The things that were beautiful and eternal shine out like stars in the night।' আরো মনে আছে, পরীক্ষক ছিলেন জ্যাকারিয়া সাহেব; তিনি আমার এ-ধরনের 'gimmick'-এ অন্যান্য পরীক্ষকদের মতো অতিরিক্ত পুলকিত হতেন না, তাই আমাকে সব চেয়ে বেশি 'মার্ক' দিলেও একশোর মধ্যে ৬৪।৬৫-র বেশি দিলেন না!

মামুলী কেতায় ডিকেন্স-এর মতো লেখকের বই তখন কিছু পড়েছি, তবে

স্বীকার করতে অপ্রতিভ মনে হয় যে Hall Caine নামে বিস্মৃত এক ঔপন্যাসিকের লেখা তখন মুগ্ধ করত—*The Eternal City* পড়ে অবাক্ হয়েছিলাম, '*The Woman of Knockaloe*'-নামে ছোটো উপন্যাসকে মনে হয়েছিল নিখুঁত। তখন আবার ধূম পড়েছিল স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ন্ উপন্যাস পড়া—Knut Hamsun, Johan Bojer প্রভৃতি আমাদের হাতে হাতে, তাদের আলোচনা মুখে মুখে। সম্ভবত যখন এম. এ. পড়ি, তখন এই নিয়ে সজনীকান্ত দাস (ও বোধ হয় নীরদচন্দ্র চৌধুরী)-সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'-তে এক মজাদার টিপ্পনী বার হয়। বাংলা আর ইংরিজী এই দুটো ভাষা শিখতে গিয়ে আমরা দুটোই ভুলছি, সুতরাং আশ্চর্য হবার কথা নয় যে আমাদের লেখকরা এখন সুইডিশ আর নরউঈজিয়ন্ পড়ছেন এবং সব-কিছু তালগোল পাকিয়ে বসছেন!

আবার বলতে হচ্ছে আগে-বলা কথা: আমাদের মনের গগনে সূর্যের মতো বিরাজ করছেন রবীন্দ্রনাথ। বি. এ. ক্লাসে পড়বার সময় ম্যাডান থিয়েটারে (বর্তমান এলিট্ সিনেমা) শুনলাম, দেখলাম অপূর্ব সুন্দর অনুষ্ঠান— বর্ষামঙ্গল। বোধ হয় খবরের কাগজের টিকিট নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই আসন ছিল সামনের সারিতে। 'দারুণ অগ্নিবাণে' দিয়ে শুরু এবং 'বাদলধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর' দিয়ে শেষ— মধ্যস্থলে শিলামূর্তির মতো উপবিষ্ট স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, চোখ বুজে রয়েছেন, কখনো গানে যোগ দিচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে দশদিক আলো করছে তাঁর আবৃত্তি। পরে কবি-গৃহে তাঁর পদপ্রান্তে বসে গান এবং আবৃত্তি শুনেছি। কিন্তু ম্যাডান থিয়েটারের অভিজ্ঞতা যেন সব-কিছু ছাপিয়ে রয়েছে— 'বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে ছিনু আমি তব ভরসায়' বলে যখন আরম্ভ করলেন কবি, তখন যেন স্থাবর জঙ্গম মোহাবিষ্ট হয়ে রইল।

আমার স্কুলবন্ধু মৃগাঙ্ক চৌধুরীর এই সময়ে খেয়াল হয়েছিল তার একটা 'অটোগ্রাফ' খাতা চাই এবং রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর নিয়ে বউনি করবে। স্কটিশচার্চ কলেজে তার অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল বলে তাঁর পরামর্শ চাইতে গিয়ে শুনল যে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে হুট্ করে 'অটোগ্রাফ' আদায় করা সোজা কাজ নয়, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে যা মৃগাঙ্কের সাধ্য নেই। মৃগাঙ্ক কিন্তু নাছোড়বান্দা; সে

একদিন কাউকে না জানিয়ে বাঁধানো খাতা বগলে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হাজির। কী সুবাদে এসেছে জেনে ঠাকুরবাড়ির কে একজন খাতাটি রেখে দিয়ে আবার সন্ধ্যার দিকে তাকে আসতে বললেন। মৃগাঙ্কের নিজের কথা— সন্ধ্যার কিছু আগে গিয়ে প্রথমেই তাকে আসনে বসে এক প্লেট মিষ্টান্ন ভক্ষণ করতে হল এবং তারপর খাতাটি এল, যাতে এক পাতা ভরে গোটা একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের শ্রীহস্তে লেখা! খাবার আগে ভদ্রভাবে একটু-আধটু গুঁইগাঁই করায় বুঝি তাকে বলা হয়েছিল যে ঐ সময় ঠাকুরবাড়িতে কেউ এলে মিষ্টিমুখ না করে যেতে পারে না। আমরা তো মৃগাঙ্কের সৌভাগ্যে ঈর্ষিত; কেউ কেউ জল্পনা করলাম এই অপ্রকাশিত কবিতা তো 'collector'-দের কাছে মহামূল্য— সে গুড়ে বালি অবশ্য পড়ল, কারণ কবিতাটি পরে দেখলাম 'প্রবাহিনী'-গ্রন্থে। সে যাক্, পরে যা ভালোভাবে জেনেছি তার প্রথম পরিচয় এই ঘটনার মধ্যে পেলাম— রবীন্দ্রনাথের সীমাহীন চরিত্রদাক্ষিণ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বহু অনুচরের আলাদা চেহারা।

হয়তো বলা দরকার, তখন অগাধ পাণ্ডিত্যখ্যাত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অতুলন বাংলা গদ্য মুগ্ধ করেছিল। মহেঞ্জোদড়ো হড়াপ্পা আবিষ্কারের কৃতিত্ব প্রধানত যাঁর, সেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (এঁর সহযোগী দয়ারাম সাহনি সমানভাবেই উল্লেখযোগ্য) 'ধর্মপাল' 'করুণা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এঁদের কথা কেন যে আজ শোনা যায় না বুঝে ওঠা কঠিন, কিন্তু সেটাই তো ঘটনা। রাখালদাসের পুত্র অদ্রীশ কলেজে আমাদের 'জুনিয়র'; প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে সে নাম করেছিল, কিন্তু কোনো খবরই তার সম্বন্ধে আর জানি না।

১৯২৬ সালে যখন কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, তখন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধে। বিশ বৎসর পরে যে নিদারুণ কেলেঙ্কারি ঘটে, তার তুলনায় সেই দাঙ্গা একটু যেন পোকার কামড়, সমাজদেহে খানিকটা আঁচড় মাত্র। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক নৈরাশ্যের প্রকাশ ঘটছিল বিভিন্ন প্রান্তে অনুরূপ সর্বনাশা কাণ্ডের মধ্য দিয়ে। ১৯২৫ সালে কানপুর কংগ্রেসে সভানেত্রী ছিলেন সরোজিনী নাইডু; ১৯২৬ সালে কংগ্রেস বসল গৌহাটীতে। সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। অধিবেশনের প্রাক্‌কালে খবর এল স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যার; ঐক্য সম্মেলন বারবার আহূত

হতে থাকল, কিন্তু সুফল সুদূরপরাহত হয়ে থাকল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র অধ্যাপক কর্মচারী সবাই আমরা বিহ্বল হয়ে পড়লাম এক মর্মান্তিক সংবাদ পেয়ে। কলেজে ছিল সর্বজন-পরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় এক দরোয়ান; খর্বকায় অথচ গুম্ফশোভিত ও উদার-উদর এই দ্বারপাল ছিল প্রায় প্রতিটি ছাত্রের বন্ধু ও সতত শুভার্থী। কলেজের পিছনেই কলাবাগান বস্তিটা ঠিক মনোরম স্থান ছিল না, বহু দুর্জনের সেখানে নিবাস বলে সারা শহরেই রটনা। কিন্তু সকলেরই ধারণা ছিল আমাদের কলেজের দরোয়ানের মতো অজাতশত্রু মানুষের গায়ে হাত দেবে না। কিন্তু সেই ঘটনাই ঘটল— আর অন্তত আমাদের চোখে প্রেসিডেন্সি কলেজ যা ছিল তা আর রইল না।

১০

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর কিছু পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন বসে কৃষ্ণনগরে। ধুমধাম হয় যথেষ্ট; উদ্‌বোধনী গান করেন স্বয়ং নজরুল ইসলাম; সদ্য-রচিত 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' মনমাতানো সুরে সবাইকে শোনান। প্রায় যেন ঐ গানেরই মর্মবস্তুকে পরিহাস করে সম্মেলন দেশবন্ধুর 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নাকচ করে দেয়। প্রজাস্বত্ব আইন বিষয়ে কংগ্রেস নেতাদের প্রধান বক্তব্য হল, শুধু প্রজা নয় জমিদারের প্রতিও সুবিচার করতে হবে, স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে তদনুযায়ী বিবৃতি প্রকাশ হল! বাংলার চাষী— যাদের অধিকাংশ মুসলমান— তখনো নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে তৈরি নয়, কিন্তু তারা বুঝল 'স্বদেশী'-ওয়ালাদের মেজাজ কী এবং দৌড় বা কতটা। যে সর্বনাশী ধারা অতিক্রম না করতে পারার দরুন দেশকে ১৯৪৭ সালে দ্বিখণ্ডিত হতে হল, তা তখন থেকেই প্রকট হতে আরম্ভ হল। সমাজদেহে আলোড়নকে বিত্তবান্‌দের স্বার্থে স্তিমিত ও স্তব্ধ করার যে রাজনীতি, তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সাম্প্রদায়িক কলহ ও সংঘর্ষে— সঙ্গে সঙ্গে 'ভব্য' রাজনীতির ক্লৈব্য ও ব্যর্থতাকে নিন্দিত করতে থাকল হঠাৎ-আলোর-ঝল্‌কানির মতো সন্ত্রাসবাদী সাহসিকতা, যার ছটায় বাংলা থেকে পঞ্জাব মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত হতে লাগল। '২৭, '২৮, '২৯ সালে আমাদের কানে আরো এল সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের কথা, কলকাতার জনপথে দেখা গেল মেহনতী মানুষের সংহত, সতেজ পদক্ষেপ, দেখা গেল তার এ-যাবৎ অনভ্যস্ত ভূমিকায় আবির্ভাব, কণ্ঠে বিপ্লবের আহ্বান— '২৭, '২৮ সালের কয়েকটি অবিস্মরণীয় দিনে কলকাতার আকাশ যেন প্রতিধ্বনি করল: 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'!

নির্বিত্ত জনতা যে ইতিহাস গড়তে পারে, তা এদেশের রাজনীতিতে তখনো স্বীকৃত নয় (আজও প্রকৃতপ্রস্তাবে তা ঘটে নি, গতানুগতিকতার জালে আজও আমরা বাঁধা)। সমাজবিপ্লব কথাটা ব্যবহৃত হতে থাকলেও রাজনীতিক্ষেত্রে তখনো তা উপহসিত, কতকটা অবজ্ঞাত তো বটেই, তবে

একেবারে তাকে অগ্রাহ্য করাও সম্ভব ছিল না। হৃদয়ের আবেগ নিয়ে দেশবন্ধু বলেছিলেন, তাঁর কাম্য হল শতকরা নিরানব্বই জনের জন্য স্বরাজ ('Swaraj for the 99 per cent'), মুষ্টিমেয় ব্যক্তির জন্য নয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং তার তাৎপর্য কিছুটা বুঝতেন বলে লালা লাজপৎ রায়ের পক্ষে সংগত ও স্বাভাবিক হয়েছিল ১৯২০ সালে কলকাতার বিশেষ কংগ্রেসে সভাপতির কাজ সেরে বোম্বাই গিয়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্‌বোধনী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা। কংগ্রেস সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান, সুতরাং শ্রমিক কিম্বা কৃষকের স্বতন্ত্র সংগঠন নিষ্প্রয়োজন— তবে সেগুলো গড়ে উঠলে তাকে কংগ্রেসেরই কুক্ষিগত অংশবিশেষ বিবেচনা করা সমুচিত, এই ছিল সেদিনের রাজনীতির হিসাব। এজন্যই দেশবন্ধু ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। আরো হয়েছেন মোতিলাল নেহরু, জওয়াহরলাল, সুভাষচন্দ্র বসু— বেশ একটু অস্বস্তি নিয়েই হয়েছেন, নানা ঝগড়া-ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই হয়েছেন। এদের মধ্যে জওয়াহরলালের সমাজচিন্তায় কতকটা স্বচ্ছতা ছিল (যদিও কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন গান্ধীরই অনুগামী) আর সেজন্যই তাঁর মনের জিজ্ঞাসা আর সংকোচ আর অসন্তোষ থেকে থেকে প্রকাশ করতেন। ১৯২৮ সালের এপ্রিলে গান্ধী তাঁকে যা লেখেন তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায়: 'আমি তোমার সঙ্গে একমত যে এবার আমাদের আন্দোলন করতে হবে ধনীশ্রেণী আর বাক্যবাগীশ শিক্ষিতদের বাদ দিয়ে— কিন্তু সে-সময় এখনো আসে নি।' আশ্চর্য হওয়ার কথা নয় যে গান্ধীর হিসাবে কোনো কালেই সে-সময় এল না, জওয়াহরলালও তা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

কলেজের লেখাপড়ায় সোশালিজম্-এর নামগন্ধ তখন বড়ো একটা ছিল না। C.E.M. Joad, C. Delisle Burns প্রভৃতির বই থেকে একটু-আধটু খবর মিলত; বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর *Roads to Freedom* পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত বলেই খানিকটা মাতিয়েছিল, সোশালিজম অ্যানার্কিজম্ সিণ্ডিকালিজম্ কী বস্তু তা জানতে সাহায্য করেছিল— এখনো মনে আছে বইটার শেষ বাক্য: এই পুরোনো, খারাপ দুনিয়াটার অবসান ঘটবে 'burnt in the fire of its own hot passions and out of its ashes will rise a new world, full of fresh hope, with the light of the morning in its

eyes' এ-ধরনের পাঠ কিন্তু ছিল ব্যতিক্রম, কলেজের কেতাব বড়োজোর বলত যে সোশালিজ্‌ম্ ভালো জিনিস সন্দেহ নেই কিন্তু 'স্বর্গের স্বর্ণদ্বারে'র এধারে তার দেখা মেলার সম্ভাবনা নেই। তখন অবশ্য স্বর্গ বা নরক উভয় রাজ্যের দরজাই এতদূরে অবস্থিত যে অমন কথায় মন সায় দিতে চাইত না, পরাধীন দেশে যুবচিত্তে স্বাভাবিক যে-অধীরতা তার বেদনা বেড়ে চলত। কেমন যেন উপশম একটু হত নজরুলের রচনার স্বাদ নিয়ে। হয়তো বা 'বিজলী' 'আত্মশক্তি' -ধরনের তৎকালীন সাময়িকীর কোনো মন্তব্য দেখে অথবা 'মডার্ন রিভিউ' আর 'প্রবাসী'-তে বিদেশী পত্রিকা থেকে সঞ্চয়নের অংশে সোশালিজম-বিষয়ক কিছু বিবরণ লক্ষ্য ক'রে। আনাতোল ফ্রাঁস আর একেবারে ভিন্ন মেজাজের স্রষ্টা রম্যাঁ রলাঁ মুগ্ধ করতেন, কিন্তু তাঁদের সোশালিস্ট সত্তা আমাদের অজানা ছিল। কতকটা বুঝি নিজেদের ওয়াকিবহাল কল্পনা করা গেল যখন ১৯২৭ সালে এদেশে এলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম কমিউনিস্ট সদস্য, বোম্বাইয়ের খাস টাটা-পরিবারের শাপুরজী সাক্‌লাতওয়ালা; বক্তৃতা করলেন সেদিনের অ্যালবার্ট হলে (আজ যেখানে কফি হাউস), উদ্‌বোধনী গান হল 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'। গাইলেন আমাদেরই কলেজের রঞ্জিত ('টুলু') সেন, যে বোধ হয় পরবর্তী জীবনে দিল্লীর মাঝারি চাকুরিয়ার ভিড়ে হারিয়ে গেল। অসাধারণ বক্তা ছিলেন সাক্‌লাত্‌ওয়ালা; অতুলন বললে অত্যুক্তি হয় না। ব্রিটেনের নির্বাচক মণ্ডলীকে বিদেশী এবং কমিউনিস্ট হয়েও মন্ত্রমুগ্ধ করার মতো মুখের এবং মনের জোর তাঁর ছিল। স্পষ্ট, সতেজ, নিঃশঙ্ক, অসংকোচ ভাষা ভাব ও ভঙ্গীর ঔজ্জ্বল্যে যেন অমোঘ শক্তি পরিগ্রহ করত— ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে ভারতীয় জনজীবনের প্রকৃত যোগসূত্রের সন্ধান যেন তাঁর কথা থেকে মিলত। পরে অক্স্‌ফর্ড-এ ভারতীয় মজলিশে আবার সাক্‌লাত্‌-ওয়ালাকে দেখেছি এবং বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু কলকাতার সেই সভা স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আরো মনে পড়ছে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং পত্রালাপ— দেশাত্মবোধের নতুন উন্মেষ আবছাভাবে হলেও তখন যেন অনুভব করা গিয়েছিল। আনন্দের কথা যে সম্প্রতি সাক্‌লাত্‌ওয়ালার জীবন নিয়ে তরুণ গবেষক ডক্টর পঞ্চানন সাহা সশ্রদ্ধ আলোচনা প্রকাশ করেছেন।

* * *

বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল জমকালো কায়দায়। শুধু ইতিহাস নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগে গণিত-সমেত সবকটা বিষয়ে যারা পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে বহু-ঈপ্সিত 'ঈশান' স্কলারশিপ আমার কপালে জুটল। এমন ব্যাপার নাকি শ্রুতকীর্তি বিদ্বান্ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর পর অন্য কোনো প্রার্থীর ভাগ্যে ঘটে নি। ইতিহাসের মতো বিষয়ের পক্ষে একটু মারাত্মক রকমের বেশি 'মার্ক' পেয়েছিলাম; আমার পরেই ছিল শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, উভয়ের মধ্যে তারতম্য খুব বেশি ছিল না, আর যে-নম্বর সে পেয়েছিল তা অন্য অনেক বছর 'ঈশান'স্কলারও পায় নি। এবারও বুঝলাম আমার সাফল্যের পিছনে কিছু পরিমাণ ফাঁকি —দ্রুত কণ্ঠস্থ করার শক্তি আর কতকটা ইংরিজী লেখার হাত। ইতিহাস ছাড়া 'পাস্' ইংরিজীতেও বুঝি প্রথম হয়েছিলাম, যার একটা কারণ তখনই আন্দাজ করেছিলাম। একটা প্রশ্ন ছিল শেলী আর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-এর 'Skylark' কবিতার তুলনামূলক আলোচনা নিয়ে; আমার মনে লেগেছিল H. W. C. Davis-এর *Medieval Europe* গ্রন্থে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপলক্ষে বলা একটা কথা যা লাগিয়ে দিলাম শেলীর কবিতার অনুকূলে: 'prefer with Shelley "enlistment in the forlorn hope of idealism".' আমার সন্দেহ নেই এই বাক্য পরীক্ষকের চিত্ত জয় করেছিল! কেউ যেন অবশ্য না ভাবেন যে শুধু ধাপ্পা দিয়ে পরীক্ষায় চমকপ্রদ সাফল্য অর্জনের ইঙ্গিত জানিয়ে উদ্ভট বিনয় দেখাচ্ছি— ধাপ্পা যে তা ছিল না, তার অকাট্য প্রমাণ এই যে অন্তত জ্যাকারিয়া সাহেব আমাকে 'ফার্স্ট ক্লাস' (এবং প্রথম) নম্বর অকারণে কখনো দিতেন না।

প্রসঙ্গটা যখন উঠেছে, তখন একটু এগিয়ে এম. এ. পরীক্ষার (১৯২৮) ফলাফল নিয়ে কিছু বলা দরকার। এম. এ.-র আট 'পেপারের' প্রত্যেকটিতে আমার নম্বর ছিল সেরা— প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ্ সুরেন্দ্রনাথ সেন আমার সম্বন্ধে জোর করে এ কথা বলে আনন্দ পেতেন, ছাত্রের সাফল্যে শিক্ষকের প্রসন্নতা সেদিনের এক বৈশিষ্ট্য যেন ছিল। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমার মনে সংশয় কিছু আছে। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (*Political History of Ancient India* প্রমুখ মহার্ঘ গ্রন্থের রচয়িতা) আমাদের পড়াতেন; বিস্মিত হতাম তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আর অনবদ্য বিশ্লেষণক্ষমতা দেখে;

ভারতবর্ষের ইতিহাস বাস্তবিকই ছিল যেন তাঁর নখদর্পণে ; বিনা আড়ম্বরে অথচ নিখুঁত পদ্ধতিতে তাঁর ব্যাখ্যা আমার অভিজ্ঞতায় অনতিক্রান্ত। পরীক্ষার সময়ে উদার হাতে 'মার্ক' দেওয়ার খ্যাতি তাঁর ছিল না, বরং রটনা ছিল তিনি কৃপণ, কঠোর, নিষ্করুণ। তাই যখন শুনলাম তিনি আমাকে পঞ্চাশের মধ্যে চুয়াল্লিশ দিয়েছেন তখন বিশ্বাস করা শক্ত হয়েছিল। আবার 'International Law' বিষয়ে বাঁকুড়া কলেজের সাহেব পাদরী Brown আমাকে দিলেন পঞ্চাশের মধ্যে আটচল্লিশ— খুবই বিদ্বান্ তবে একটু পাগ্‌লাটে বলে ব্রাউন সাহেবের নাম ছিল, তবে এটা ঠিক যে মামুলী কেতায় প্রশ্ন-মাফিক্ জবাবের হিসাবে আমার পক্ষে আটচল্লিশ পাওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য হতে পারে যে তিনটের মধ্যে একটা কি দুটো প্রশ্ন খুব ভালোভাবে জবাব দিলে গোটা 'পেপার'-এর মূল্যায়ণে তার ছাপ পড়ে, গুণে গুণে 'মার্ক' দেওয়া হয় না। পরে যেমন অক্সফর্ডে দেখেছি, একটা কি দেড়টা প্রশ্নের সরেশ উত্তর দিয়ে ছ'টা প্রশ্নের নিরেশ (কিম্বা মাঝারি) জবাবের চেয়ে ভালো ফল মিলতে পারে। পরীক্ষার্থী কতটা জানে আর কতটা বোঝে, এই উভয় বস্তুরই যাচাই করা উচিত পরীক্ষা এবং অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ বোধ হয় তখনো চলছে ; ভাইস্‌চান্স্‌লর ছিলেন দেশের ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে অবিসম্বাদীভাবে যিনি পুরোধা, আচার্য যদুনাথ সরকার— নানা কারণে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না, সেদিকে আগ্রহান্বিত ছিলেন বলেও মনে হয় না ; ইংরেজ শাসনকে কিছুটা অনুরাগের চক্ষেও তিনি দেখতেন ; কিন্তু জীবনযাত্রায় ও গবেষণায় তাঁর ছিল ঋজু একাগ্রতা আর প্রখর সত্যানুসন্ধিৎসা, যে-গুণ দেশে সুপ্রতুল ছিল না বলেই তাঁর চারিত্র্য সীমিত হলেও স্মরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব নিয়ে হয়তো বিসম্বাদ চলত, কিন্তু সে-ব্যাপারে জানাবার মতো কোনো খবর আমার কাছে নেই। বহু বিদেশী বিদ্বান্ তখন আসতেন— Winternitz, Sten Konow (শান্তিনিকেতনে আচার্য শৈল কণ্ব নামে পরিচিত), J. Ph. Vogel, K. J. Saunders প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যার নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন, 'Tagore Law Professor' হিসাবে এলেন অক্সফর্ডের অধ্যাপক C. K. Allen-এর মতো পণ্ডিত। একবর্ণও বুঝব না তবু গেলাম, ভিড় করে সবাই বসলাম প্রশস্ত হলে যখন জগদ্‌বিখ্যাত গণিত ও পদার্থবিদ্ Sommerfeld জার্মান ভাষায়

বক্তৃতা করলেন। অনেক সময় বিদেশী পণ্ডিতদের বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করতেন অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ্, সমাপ্তিভাষণে ইংরিজীর ফুলঝুরি ফুটিয়ে আমাদের পুলকিত করতেন। আগন্তুক বিদ্বান্‌দের কেউ কেউ আসতেন প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের ইউনিয়নের আমন্ত্রণে— যেমন এসেছিলেন C. K. Allen, একটু পরিচয়ও জমেছিল তাঁর সঙ্গে, পরে অক্সফর্ডে গিয়ে একটু আশ্চর্য ও বিরক্ত হয়েছিলাম যখন দেখলাম *The Sources of Law* নামে তাঁর বই, কারণ তাতে কোথাও কলকাতায় নিজেরই Tagore Law বক্তৃতার কোনো উল্লেখ ছিল না যদিও বিষয় ছিল একই এবং 'টেগোর ল' বক্তৃতামালা ছাপিয়ে প্রকাশ করাই রীতি। কেমন যেন, তখনকার স্পর্শকাতর মনে, ধারণা হয়েছিল যে ব্যবহারে চোস্ত হলেও অ্যালেন একজন পাকা সাহেব, 'নেটিভ্' জগতের সংস্পর্শ অস্বীকার তাই স্বাভাবিক !

সাহেবদের মধ্যে 'ভালো' লোক অবশ্য তখনো যে ছিল না, তা নয়। এককালে ইংরিজীর প্রধান অধ্যাপক ডক্টর Stephen-কে সবাই ঋষিকল্প বলে জানত, আমরা দূর থেকে দেখেছি, জীবনের মেয়াদ তখন তাঁর ফুরিয়ে আসছে। শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজের ডক্টর George Howells সুবক্তা ছিলেন, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল-এর বহুমুখী প্রতিভা বিষয়ে তাঁকে বলতে শুনেছি। ভাইসচান্স্‌লর হিসাবে হাইকোর্টের জজ গ্রীভ্‌স্ খুব কৃতিত্ব হয়তো দেখান নি কিন্তু মিশুক ছিলেন, সদ্‌বুদ্ধিপরায়ণতার পরিচয় দিতেন— কলেজে একবার বলেন যে সেদিন দুর্দিন হবে যেদিন 'our young men and women will cease to dream dreams and see visions', কথাগুলো সামান্য হলেও মনে রয়েছে আজও, দাগ কেটেছিল বলে। Wordsworth প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষপদ ছেড়ে 'স্টেট্‌স্‌মান' পত্রিকায় যোগ দেন, অধ্যাপক সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক তখনো রেখে চলেন, আর হিসাবী লোক হয়েও মোটামুটি এদেশ সম্বন্ধে একটা সহানুভূতির ভাব বজায় রাখতেন। আগেই বলেছি কলকাতার 'লর্ড বিশপ' Foss Wescott আর সাংবাদিক Arthur Moore-এর কথা ; যথাসম্ভব জনপ্রিয়তা তাঁদের ছিল বলা বাড়াবাড়ি হবে না। স্কটিশচার্চ কলেজের বিচক্ষণ Dr. Urquhart, সেণ্ট পল্‌স্ কলেজের অধ্যক্ষ Dr. Bridge (ইনি কিছুটা গান্ধীভক্ত ছিলেন) অনেকের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন ; সেণ্ট পল্‌স্-এ জ্যাকারিয়ার বন্ধু

Crabtree-কে আমার ভালো লেগেছিল, তবে মনে হত তিনি প্রচণ্ডভাবে নিঃসঙ্গ এবং তা আমরা সবাই সর্বদা বুঝতে পারছি। ঐ কলেজেরই Milford দম্পতির সঙ্গে আমার যোগাযোগ কখনো হয় নি; তবে অন্যমুখে তাদের অনেক কথা শুনেছি।

এম. এ. ক্লাস যখন শুরু হল তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল হলেন স্টার্লিং; আগে এঁর কথা বলেছি, এবার যোগাযোগ বাড়ল কারণ আমাকে সবাই প্রায় জোরজার করে ইউনিয়নের সম্পাদক বানিয়ে দিয়েছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেউ করে নি। এ হল যেন 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হওয়ার মতো ব্যাপার, কারণ কলেজ ইউনিয়ন থেকে দূরেই আমার অবস্থান ছিল— 'অনার্স' পড়ার সময় ইতিহাসের 'সেমিনার'-এর শুধু ভার পেয়েছিলাম। অনেক বই ঘাঁটার সুযোগ সেভাবে হয়েছিল তাতে, কিন্তু 'ফিজিক্স্ থিয়েটারে' (যেখানে কলেজের সব বড়ো 'মিটিং' হত) কখনো মুখ খুলি নি, সে ব্যাপারে হুমায়ুন কবির-প্রমুখ কয়েকজন ছিল পাণ্ডা। যাই হোক্, কারা যেন ঠিক করল যে হুমায়ুন হবে কলেজ ম্যাগাজিনের আর আমি হব ইউ নিয়নের সম্পাদক— আপত্তি কিছুটা করেছিলাম কিন্তু তা বাতিল হয়ে গেল। হঠাৎ আবিষ্কৃত হল যে বড়ো সভায় আমি ভালো বক্তা; ইংরিজী উচ্চারণের বাহবা ছড়িয়ে পড়ল —শুনেছি অধ্যাপকদের ঘরে উদ্ভট জল্পনা নাকি হয়েছিল যে ছেলেবেলায় আমার বুঝি মেম 'গভর্নেস্' ছিল! আমি শুধু বলতে পারি যে ইংরিজী শব্দ সম্বন্ধে অনেক দিন থেকে আমার কান সজাগ থেকেছে; কম বয়সে চেঁচিয়ে পড়তে হত বাড়িতে, একবার মনে আছে বাবা শুধ্রে দিলেন 'ruthless-এর উচ্চারণ (বলা বাহুল্য, বলছিলাম 'রাথ্লেস্', যা হল ভুল)। কলেজে দু-একজন খাস সাহেবের এবং তারও বেশি জ্যাকারিয়া সাহেব এবং প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের ইংরিজী নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছিল, আর বুঝেছিলাম যে উচ্চারণ ঠিক না হলে ইংরিজী কবিতা পড়াই যায় না (সুতরাং অর্থোদ্গম করা যাক্ বা না যাক্, তাকে উপভোগ করা যায় না)। যাই হোক, অধ্যক্ষ স্টার্লিং-কে অনেকটা কাছ থেকে জেনেছিলাম— মনে হয়েছিল তিনি সদিচ্ছাপরায়ণ, কিছুটা ভারতহিতৈষী অথচ ইংরেজ চরিত্রের উৎকর্ষ এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যের ঔচিত্য সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয়। শীঘ্রই তিনি মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই অবসর নিয়ে দেশে যান— বহু বৎসর পরে আমার সহপাঠী সুকুমার

ভট্টাচার্য বিলাতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে, ফলে আমারও সঙ্গে পত্রবিনিময় ঘটে। বুঝেছিলাম যে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ Poetry Society এবং কয়েকটা ক্লাবে আনাগোনা করেন, আধুনিক জগৎ সম্বন্ধে খবর বিশেষ রাখেন না, প্রেসিডেন্সি কলেজের কথা ভাবেন, সুকুমারের কাছে জানতে চান তাঁর farewell address-টা কার লেখা, আমার না হুমায়ুনের না সুবোধ সেন-গুপ্তের, কারণ লেখাটা নাকি সরেশ ছিল খুব, এবং চাই কি 'উইলে' লেখকের জন্য একটা ছোট্ট 'token legacy' দেওয়ার কথাও নাকি মনে ঘোরে!

ইউনিয়ন-সম্পাদক হওয়ায় আমার পরিচয়ের গণ্ডী বাড়ল। স্বভাবের দোষে মিশুক যাকে বলে তা হওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমা বৃদ্ধি পাওয়ায় লাভ আমার কম হয় নি। কলেজের সব অনুষ্ঠানে গানের জন্য যাকে চাই-ই, সেই সুশীলকুমার দে-র সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আরম্ভ হল। ভালো করে জানলাম ছাত্রদের 'কমন রুম্'-সেক্রেটারি বিভূতি মুখোপাধ্যায়কে, যার সহযোগিতা বিনা আমি ছিলাম পঙ্গু, যে ছিল ছাত্রমহলে দারুণ জনপ্রিয়, কদাচ হলেও সুন্দর কবিতা লিখত, আর যে থাকত জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর-বাড়ির একেবারে সংলগ্ন বাড়িতে, পারিবারিক সুবাদে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের কাছে যার ছিল অবাধ গতি। পূর্বাভ্যস্ত সংকোচ সম্বরণ করে ইউনিয়নের কাজে অধ্যাপকদের ঘরে ঢুকে কথাবার্তা হল, ভিন্ন ভাবে তাঁদের জানা হল। কলেজ অফিসের কেরানি কিম্বা বেয়ারা দরোয়ান প্রভৃতির সঙ্গেও জানাশোনা হতে লাগল এমনভাবে যা পূর্বে সম্ভব ছিল না। ইউনিয়নেরই মারফৎ গণিতের প্রধান অধ্যাপক ভূপতিমোহন সেন-এর (পরে কলেজের অধ্যক্ষ) মতো স্বল্পভাষী, ঋজুচিত্ত অথচ স্নেহশীল বিদ্বান্‌কে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলাম—যেমন পরিচিত হলাম বিদেশ থেকে প্রত্যাগত মনস্বী, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে, শুনলাম তাঁর মুখে ভারতবর্ষীয় দর্শন-শাস্ত্রী বলে পরিচিত পণ্ডিতের আমেরিকা মহাদেশে বহু বিচিত্র ও কৌতুককর অভিজ্ঞতার কথা। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো বরণীয় মহাভাগের সান্নিধ্যলাভ একান্ত সাময়িক হলেও সেদিনের স্মৃতির মধ্যে রয়েছে; জগদীশচন্দ্রের সৌম্য প্রশান্তি মুগ্ধ করেছিল, আর প্রফুল্লচন্দ্রের আপাত-অস্থিরতার মধ্যেই যেন ফুটে উঠত সরল, সহৃদয় চরিত্রমাহাত্ম্য—এই

মহানুভবযুগল তখন আমাদের অহংকার। আর কলেজেরই সুবাদে সম্ভব হয়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া, পদপ্রান্তে বসা, কথামৃত শোনা— হয়তো বা প্রায়-তন্ময়তা থেকে সহর্ষে জেগে ওঠা, যখন কোথা থেকে অবনীন্দ্রনাথ এসে হাঁক দিয়ে বলছেন : 'ওরে এই ছেলেগুলোর জন্যে মিষ্টি নিয়ে আয়!'

*　　　*　　　*

এম. এ. পড়ার সময় ক্লাস করতাম ইউনিভার্সিটির দারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে, তবে 'টিউটোরিয়ল' হত কলেজে, আর বিচরণ ঘটত প্রধানত কলেজের বারান্দা, উঠোন, লাইব্রেরি ইত্যাদি জায়গায়। পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগের অধ্যাপকদের মধ্যে মনে রাখার মতো অনেকে ছিলেন— বিনা আড়ম্বরে জ্ঞানান্বেষণের যে পরম্পরা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অবদান তা তখনো সমুজ্জ্বল। বিজ্ঞান কলেজের কথা বলব না, কিন্তু কলাবিভাগে তখন অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে ছিলেন হীরালাল হালদার ও কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো দার্শনিক, ইংরিজীতে জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (পরে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে খ্যাতিমান, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল) ও অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষক, অর্থনীতিতে 'মিণ্টো' প্রোফেসর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী প্রমুখ, গণিতে গণেশপ্রসাদ ও শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃতে মহামহোপাধ্যায়-সমাগমে যেন অষ্টবজ্র-সম্মেলন— তালিকা একেবারে অসম্পূর্ণ কিন্তু একে দীর্ঘ করা ঠিক হবে না। ট্রামে দ্বিতীয় শ্রেণীতে হয়তো দেখলাম যাঁকে, সেই বঙ্গবিদ্যাবারিধি আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বোধ হয় তখনো সামান্য পরিচ্ছদ ও স্বভাবসিদ্ধ বৈষ্ণব বিনয়ে সুবিপুল বিদ্যাকে সমাচ্ছন্ন রেখে বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। আর ইতিহাসে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ছাড়াও ছিলেন দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. জে. এস. তারাপুরওয়ালা, কালিদাস নাগ, হেমচন্দ্র রায় প্রভৃতি বহু কোবিদ। শিখ ইতিহাসে মৌলিক গবেষণায় একজন পথিকৃৎ হয়েও ইন্দুবাবু যে উৎসাহ নিয়ে মিশরের প্রাচীন ইতিহাস পড়াতেন এবং ছাত্রদের প্রতি অনায়াস ও অনতিব্যক্ত প্রীতি পোষণ করতেন, তা মনে রাখার মতো। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মিণ্টো অধ্যাপক অন্য ব্যক্তি) ছিলেন আশুতোষের

জামাতা; তাঁর অনুজ শম্ভু আমার সহপাঠী বলে আমাদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ; বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন বহুপ্রতাপান্বিত— কিন্তু তার চেয়ে বড়ো পরিচয় হল অধ্যাপনার বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করে, বিবিধ জটিলতার ইঙ্গিতমাত্র দিয়ে, সারাংশ বারবার স্পষ্টোচ্চারিত ভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালকবর্গের অন্যতম তিনি ছিলেন; পরে স্বাধীনতার যুগে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত একবার হয়েছিলেন, কিন্তু এ হল পরের কথা। বিশিষ্ট বাক্‌পটুতা তখন লক্ষ্য করতাম বিচিত্র ব্যক্তিত্ববান্ ও সুদর্শন কালিদাস নাগ এবং কতকটা তাঁরই মতো অথচ বয়সে ছোটো, রাষ্ট্রতত্ত্ববিভাগের নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে— নির্মলবাবুর সঙ্গে উত্তরকালে বহু যোগাযোগ ঘটেছে যার কিছু বিবরণ পরে দিতে হবে। ত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাশয় আমাদের পড়াতেন ব্রিটিশ 'কন্‌স্টিট্যুশনল্' ইতিহাসের ষোড়শ শতাব্দী থেকে আধুনিক পর্ব— পড়াতেন এমন স্মৃতিশক্তির সম্পদ এবং আবেগ নিয়ে যা ভোলা যায় না। এরই প্রকাশ আজও দেখি তাঁর রামায়ণ-মহাভারত-উপনিষদ্ ইত্যাদির অপরূপ ও ওজস্বী ব্যাখ্যানে, কিন্তু সে কথা এখন থাক্, পরে অন্য সুবাদেও ত্রিপুরারিবাবুর কথা বলতে হবে। আমাদের ছাত্রজীবনের মেয়াদ যখন প্রায় শেষ, তখন কিছুদিন পড়ালেন সদ্য-বিদেশ-প্রত্যাগত সুশোভনচন্দ্র সরকার; তখন আমরা তাঁকে আমল তেমন দিই নি, পরে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়েছি, বুঝেছি কেন এই ব্রীড়াশীল, সত্যসন্ধ বিদ্বান্ ত্রিশবৎসরাধিক কাল বাংলার শ্রেষ্ঠ ইতিহাসছাত্রদের চিত্তজয় করেছেন।

কলেজে তখন স্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্র-পরিষদ— বারবার কবি এসেছেন ফিজিক্‌স্ থিয়েটারে, ডাকলেই এসেছেন, এ ব্যাপারে ছাত্রদের প্রধান সহায় ছিলেন অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিজ্ঞানী হয়েও (হয়তো বা বিজ্ঞানী বলেই) যাঁর সাহিত্যানুরাগের মধ্যে একটা বিশিষ্ট প্রগাঢ় বাস্তবতা ছিল, যিনি বিশ্বভারতী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সহকারী ছিলেন, যাঁর মতো ছাত্রবৎসল, সদাশয় মানুষ চোখে বড়ো একটা আজকাল পড়ে না। প্রথম থেকে পরিষদের সভাপতি ও প্রাণপুরুষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত— ভারতীয় দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক যে সাহিত্যেও পারংগম ছিলেন তা তাঁর অগণিত ভাষণ থেকে আমরা বুঝতাম, প্রায় প্রতি সান্ধ্যসভায় নিয়ে

আসতেন কন্যা মৈত্রেয়ীকে, যিনি উত্তরকালে নিজগুণে খ্যাতিমতী হয়েছেন। কতকটা যেন রবীন্দ্র-পরিষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে (যদিও প্রকাশ্যে তা সর্বদা অস্বীকৃত হত) প্রতিষ্ঠিত হল বঙ্কিম-শরৎ সমিতি— মাঝে থেকে সাবেকী বাংলা সাহিত্য সমিতি চাপা পড়ার উপক্রম হলেও অবশ্য এতে ক্ষতি ছিল না, উভয় সংঘেই অনেকে সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই যে কিছু পরিমাণে শিক্ষিত বাঙালী মনোবৃত্তিতে যে বিসম্বাদপরায়ণতা বর্তমান, তারই প্রকাশ এখানে দেখা দিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ-এর মতো মনস্বী ('রবিয়ানা'-রচয়িতা অমরেন্দ্রনাথ রায়ের নাম একত্র উচ্চারণ সম্ভব নয়) রবীন্দ্রপ্রতিভাকে মুক্তমনে অভিবাদনে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন, এবং তাঁদেরই চিন্তার জের টেনে রবীন্দ্রসৃষ্টিতে দেশজ উপাদানের স্বল্পতা ও বিশ্ববিরাজী চিত্তবৃত্তির কৃত্রিম, পেলব প্রকাশের প্রাধান্য নিয়ে ঠুন্‌কো অভিযোগ তখনো হয়তো মিলিয়ে যায় নি। কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদ আর বঙ্কিম-শরৎ সমিতির মধ্যে কোনো অশোভন সংঘর্ষ কখনো ঘটে নি, কিন্তু কেমন যেন একটা মুচ্‌কি-হাসা পরস্পর-বিরূপতা থেকে গিয়েছিল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নামকরা অধ্যাপক অবশ্য সোৎসাহে উভয় সমিতিতে বক্তৃতা করতেন— কে আজ বিশ্বাস করবে যে আপাতগম্ভীর শ্রীকুমারবাবুকে ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জলসায় গলা ছেড়ে ওস্তাদী গান গাইতেও আমরা দেখেছি!

কলেজে এবং সংলগ্ন হিন্দু 'হস্টেলে' গানের অনুষ্ঠান মাঝে মাঝে জমিয়ে দিতেন দিলীপকুমার রায়। তিনি গাইতেন স্বদেশীগান আর সঙ্গে সঙ্গে 'বল্ রে জবা বল্, কোন্ সাধনায় পেলিস্ রে তুই, মায়ের চরণতল'-জাতীয় ভক্তিমূলক গান। তাঁর লেখা আমরা দেখতাম পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (যার সম্পাদক জলধর সেন বহুকাল ধরে সাহিত্যক্ষেত্রে সার্বজনীন 'দাদা' বলে পরিচিত ছিলেন) এবং অন্যত্র ; তখনই তাঁর খ্যাতি বিস্তীর্ণ, তবে নিন্দুকেরও অভাব ছিল না— শোনা যেত তাঁর গলা মিঠে কিন্তু ওস্তাদরা যাকে সুরেলা বলে থাকে, তা নয়, আর কোথায় নাকি তাই শুনতে হয়েছিল : 'বাবুজী, তব্‌লা নহী চলেগী" ! বহুকাল পরে দিলীপকুমারের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি ; বিচিত্র কর্মকাণ্ডে তৃপ্তি না পেয়ে তিনি এখন সন্ন্যাসী, অরবিন্দ-সকাশে এবং ভিন্‌দেশী শ্বেতাঙ্গ সাধু শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-এর মতো ব্যক্তির

সংস্পর্শে তিনি পরমার্থের সন্ধান পেয়েছেন, বর্তমানে পুণাতে হরিকৃষ্ণ মন্দিরে তাঁর অবস্থান, দেশবিদেশে বহুজন তাঁকে গুরু বলে মানে, অথচ আজও রচনা, সংগীত, আলাপচারিতা ও নানাবিধ সৎকর্মে তিনি নিয়ত নিযুক্ত —রহস্য করে কিছুদিন আগে তাঁকে বলেছিলাম সংসার পরিহার করে আপনি যে সংসারের মায়াতেই বাঁধা হয়ে রইলেন! আশ্চর্য নয়, কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র স্বাদেশিকতায় যে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা স্বভাবজ হয়ে গিয়েছে, সংসার ত্যাগ করেও সংসারবিমুখিতা হল স্বভাববিরুদ্ধ, তুরীয় মার্গ অনুধ্যানের বিষয় হলেও এই মাটির পৃথিবীতেই তাঁর সর্বসত্তার অধিষ্ঠান। ভারতমানসের পরম্পরার মধ্যে যে দো-টানা থেকে গেছে, তার চাপেই দিলীপকুমারের মতো প্রতিভাধর বেশ কিছুকাল ধরেই সর্বজনসমক্ষে উপস্থিত থাকছেন না; মাঝে মাঝে সংগীত-নৃত্যকে উপলক্ষ করে যে তাঁর সাক্ষাৎ মেলে, এটাই আনন্দের কথা।

কলেজ ইউনিয়নে একবার এসেছিলেন আমেরিকা ও ইয়োরোপে মল্ল-যুদ্ধে বিপুল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তখন সদ্য স্বদেশ-প্রত্যাগত 'গোবর'-বাবু ('জে.সি.গুহ')। বিদেশে ভারতের মুখোজ্জ্বল কেউ করেছেন জানলে তখন আমরা আহ্লাদে আটখানা হতাম; আজ স্বাধীন ভারতে বড় একটা খোঁজ রাখি না খুরানা বা চন্দ্রশেখর বা রাজচন্দ্র বসু মার্কিন দেশে কী করলেন—প্রয়োজন নেই কারণ দেশ তো আমাদের দুঃখী হয়েও আজ স্বাধীন! যেমন করে হোক্ পরাধীনতার নোংরা বোঝা হালকা করার দায় আমাদের নেই, কিন্তু সে যুগে ছিল। গোবরবাবু বক্তৃতা করলেন গান্ধী-টুপি মাথায় দিয়ে; শালপ্রাংশু মহাভুজ তাঁর মূর্ত ফিজিক্স থিয়েটারে বেশ মানিয়েছিল। কিছুকাল আগে গোয়াবাগানে তাঁর আখ্ড়ায় দেখা হয়েছিল; লোকসভা নির্বাচনে ভোটভিক্ষা ব্যপদেশে সেখানে আকস্মিক ভাবে যাওয়া, দেখলাম দশাসই মানুষটি অর্ধ-অথর্ব হলেও অটল ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্য নিয়ে বসে রয়েছেন। আখড়ার তদারকি করে চলেছেন, সংসারে অন্য কোনো বাঁধন নেই, শুধু যুবজনকে বলশালী করে তোলার একান্ত কামনা —বললেন কয়েকটি কথা আজকের জীবন নিয়ে, যা অত্যন্ত মূল্যবান। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে; বাঙালী স্বাদেশিকতার ইতিবৃত্তের একটি পরিচ্ছেদ সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে।

হুমায়ুন কবির যখন কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক, তখন অধ্যাপক জ্যাকারিয়া "A Fortnight in Greece" বলে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখলেন— অনবদ্য বিবরণ প্রাচীন গ্রীসের ধ্বংসাবশেষ বিষয়ে আমার মনের আকুলতাকে বাড়িয়ে দিল। কিছুকাল পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে ইংরিজীর অধ্যাপক জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে হুমায়ুন জোগাড় করে আনল "Blind Spots" নামে এক লেখা ; মামুলী সব ধারণাকে ধূলিসাৎ করার স্পষ্ট ইঙ্গিত এতে ছিল, জানলাম Voltaire বুঝি Shakespeare-কে 'savage' বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি, Bernard Shaw-র কিছু চোখা-চোখা বাক্যে গতানুগতিকতার অন্ত্যেষ্টিপ্রয়াস দেখলাম। বিলাতে প্রবাসকালে জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার সুযোগ আমার হয়েছিল, দেখেছিলাম কিছুটা স্বয়ংসৃষ্ট প্রতিকূলতার প্রভাবে একজন প্রকৃত প্রতিভাশালী বিদ্বান্ এবং মরমী মানুষ বিদেশের মূলত অনাত্মীয় পরিবেশে তিলে তিলে নিজের সত্তাকে পরাজিত হতে দিচ্ছেন— কিন্তু সে কথা পরে হবে। কলেজ ম্যাগাজিনের পুরোনো সংখ্যাগুলো আজ আমার কাছে নেই— নিজে যে বৎসর সম্পাদক ছিলাম, তার 'ফাইল' পর্যন্ত নেই, ছাত্রাবস্থায় ম্যাগাজিনে বিভিন্ন রচনার (সম্পাদকীয় বাদে) নকল নেই। শুধু মনে আছে এম.এ. পড়ার সময় আনন্দ পেয়েছিলাম ভিন্তরনিৎস্-এর (Winternitz) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ক বক্তৃতা অনুবাদ করে ; এর আগে বাংলায় পূর্ণাঙ্গ রচনা আমার কোথাও প্রকাশ হয় নি।

পোস্টগ্রাজুয়েট দর্শন বিভাগের সেরা ছাত্র আমাদের সময়ে ছিলেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে আসা সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। বিশেষ করে বিলাত থেকে ফেরার পর প্রায় দশ বৎসর এঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল— অধুনা বিস্মৃত হলেও বাংলাদেশে মার্ক্স্বাদী চিন্তা ও কর্ম-ব্যাপারে এঁর বিপুল অবদান সমসাময়িকদের কাছে অসন্দিগ্ধ। পরিবার-পরম্পরায় পণ্ডিত ও প্রায় শ্রুতিধর এই ছাত্রের প্রতিভা তখন সুপরিজ্ঞাত। কিছুকাল মানবধর্মশাস্ত্র বিষয়ে এঁর প্রগাঢ় প্রতীতি জন্মেছিল ; তারপর শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন-গুণে উত্তরণ মার্ক্স্বাদে, ১৯৩৪-৩৬ সালে যে-পর্ব সম্পূর্ণ। অকালে মৃত (১৯৪৪) এই অবিস্মরণীয় বান্ধবের কথা যথাস্থানে একটু বিশদভাবে বলার চেষ্টা করব।

এম. এ. পড়ার সময় হুমায়ুন 'স্টেট স্কলারশিপ' নিয়ে অক্সফোর্ড যাবার সুযোগ পেল, কিন্তু সে অপেক্ষা করল বৎসরাধিককাল, এম. এ.-র পালা সাঙ্গ করে তবে রওয়ানা হয়েছিল। বাংলা সরকার তখন একজন মুসলমান এবং একজন হিন্দু ছাত্রকে বিদেশে পাঠাত, সাধারণত একজন কলকাতা এবং অপরজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে— আমার সুযোগ এসেছিল পরের বার। আমাদের 'জুনিয়র' সুশীলকুমার দে বিলাত গেল 'টাটা' স্কলারশিপ নিয়ে (যা পরে সুদসুদ্ধ পরিশোধ করতে হ'ত) এবং সেখানে আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাস করেছিল; পরবর্তী জীবনে ইউনাইটেড নেশন্‌স্‌-এর Food and Agriculture Organisation-এ সে একজন কর্তৃপক্ষীয় হয়ে রোমে বহুদিন ছিল; সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্তির পর বোলপুর শান্তিনিকেতনে তার জীবনাবসান ঘটেছে। বেশ মনে পড়ে এদেশে এবং বিদেশে চলছে তার ভাবী বধূ এবং আমার পিতৃবন্ধু ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা বুলবুল (ইন্দিরা) সম্বন্ধে কত কথা। ভুলব না একদিন সুশীল গেয়েছে কলেজের সভায় দুটো গান— রবীন্দ্রনাথের 'আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে দিবস গেলে করব নিবেদন' আর অতুলপ্রসাদ সেনের 'ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে': দুটোর মধ্যে প্রথমটা আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছে জেনে যেন সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল! রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে তখন আমাদের কত গর্ব, কত গৌরব— কোথাও তার একটু লাঘব তখন যেন সহ্য হ'ত না।

অধুনা রবীন্দ্রসৃষ্টির সব চেয়ে মনোজ্ঞ সমালোচক বলে সুবিদিত আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর নাম এইসঙ্গে মনে পড়ছে। আইয়ুব কলেজে আমাদের 'জুনিয়র'; বি. এস্‌সি.-তে পদার্থবিজ্ঞানের একজন সেরা ছাত্র বলে তার নাম ছিল, পরে দর্শনশাস্ত্রে তার ব্যুৎপত্তি ও বৈদগ্ধ্য সকলের জানা। কলেজে তাকে লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না; বাঙালী চেহারার তুলনায় কিঞ্চিৎ দীর্ঘ অথচ শীর্ণ দেহ, পুরুষের পক্ষে আলুলায়িত কেশ, প্রসন্ন মুখাবয়ব, পরিধানে খদ্দরের শ্বেতবস্ত্র, পদযুগল পাদুকাহীন— আড়ালে কেউ 'পেলব'-বাবু বা 'লালিমা পাল (পুং)' যদি বলত (তখন 'পরশুরাম'-কৃত অমর কাহিনীগুলি প্রকাশ হয়েছে বা হচ্ছে) তো ভ্রূক্ষেপ করার পাত্র আইয়ুব ছিলেন না। সর্বতোভাবে মার্জিত এই মানুষটির লালিত্যপূর্ণ বহিরঙ্গ থেকে তার চিন্তার ব্যাপ্তি ও বলিষ্ঠতা অনুমান করা সহজ ছিল না। যখন আবিষ্কার

করা গেল ইনি বাঙালী নন, উর্দু এঁর মাতৃভাষা, তখন শুধু বাংলায় পারদর্শিতা নয়, ব্যক্তিত্বের কোন্ ঐশ্বর্যের আভাস পেয়েও মুগ্ধ হতে হল। আইয়ুবকে দেখে আমার মনে পড়ে যেত কিছুটা অনুরূপ কিন্তু দেহসৌষ্ঠবে মহীয়ান্ বয়োজ্যেষ্ঠ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ; কলকাতা ময়দানে তাঁকে বহু বার দেখেছি গেরুয়া খাদি পরে, ঝাঁকড়া চুল নিয়ে, নগ্নপদে— কী জানি কেন, সঙ্গে থাকত যষ্টিহস্তে হিন্দুস্থানী দেহরক্ষী। এই বহুগুণধর অথচ কর্মকাণ্ডে প্রায়শ ভ্রান্ত ও ব্যর্থমনোরথ ব্যক্তির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘটলেও কখনো ঘনিষ্ঠ হয় নি ; তবুও মাঝে মাঝে এঁর কথা পরে কিছু উঠবে। আইয়ুব ছিল ভিন্ন স্তরের এবং ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ; তার সঙ্গে আমার বহুবিধ বিতণ্ডা ও মতভেদ হয়েছে, সম্পর্কও ক্ষীণ হয়ে এসেছে, কিন্তু সংবেদন ও সৌহার্দ্য কখনো বোধ করি মূলগতভাবে ক্ষুণ্ণ হয় নি।

* * *

১৯২৭ সালের মার্চ মাস নাগাদ সময়ে আমার বাবা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখনো কর্পোরেশনের দুর্নামের যুগ শুরু হয় নি ; ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি কাউন্সিলর পদে ছিলেন— হেরেছিলেন সে-বৎসর, কংগ্রেসের ভিতরকার দলাদলির ধাক্কায়। '৩৩ সালে আমি ছিলাম বিলাতে ; ফিরে কিছুটা জেনেছিলাম বাবার পরাজয় কেন ঘটেছিল। কংগ্রেস বাংলায় তখন বুঝি দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল— প্রতিবেশী বিজয়সিং নাহার যুবাবয়সেই তৎকালীন কংগ্রেসী রাজনীতিধারায় বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিলেন, নির্বাচনের নানা কৌশল সম্পর্কে তাঁর নৈপুণ্য আজও সর্বজনবিদিত, তিনিই বাবাকে হারিয়েছিলেন। 'বড় মিঞা' নামে পল্লীতে সকলের পরিচিত শামসুল হক্ সাহেব কর্পোরেশনী শঠ রাজনীতিতে ধুরন্ধর ছিলেন ; তাঁরও অনেক নির্বাচনী কীর্তিকলাপের কথা শুনেছিলাম। যাই হোক্, ১৯২৭ সালেই বাংলা কংগ্রেসে দলাদলি জোর কদমে চলছিল ; তখন যে কতবার প্রাদেশিক কংগ্রেস সংগঠন দ্বিখণ্ডিত হচ্ছিল, কেন্দ্রকে সালিশী বসাতে হচ্ছিল, মহাদেব শ্রীহরি অণে-র (Aney) মতো নেতা এসে রায় দিচ্ছিলেন, 'ad hoc' কমিটি বসানো হচ্ছিল, তার বিবরণ এখানে দেওয়ার দরকার নেই। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর গান্ধীজী 'দেশপ্রিয়' যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্তকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, স্বরাজ্য দলের নেতা

এবং কলকাতার 'মেয়র' এই ত্রি-মুকুট ('triple crown') পরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সবাই ভালো মনে মেনে নেয় নি, অস্বস্তির আবহাওয়া চলছিল, ঝগড়া মাঝে মাঝে ফেটে পড়ছিল। 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় রাজনীতি কী বিড়ম্বনা টেনে আনে, তা তখন দেখা যেত। কিরণশংকর রায়ের মতো ব্যক্তি সাধারণত সংগঠনকে আঁকড়ে থাকতেন, আর অন্য বিশিষ্ট নেতার অনেকে চাইতেন সংগঠনের নবরূপ— নীতি নিয়ে ঝগড়ার চেয়ে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বই ফুটে উঠত, চিন্তা ও মেজাজের দিক থেকে অনেক প্রভেদ সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও নলিনীরঞ্জন সরকার-কে 'Big Five' নাম দিয়ে খবরের কাগজে লেখা প্রকাশ হ'ত, রাজবন্দী শিবিরে এবং বাইরে বাম-দক্ষিণের সংঘর্ষ এরই সঙ্গে জুড়ে একটা প্রায় উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি তখন হ'ত। আশ্চর্য হবার নয় যে এই অবিন্যস্ত রাজনীতির যুগে একবার স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসুকে 'মেয়র' পদের জন্য দাঁড়িয়ে ব্রিটিশরাজের ভক্ত বলে পরিচিত 'এটর্নি' বিজয়কুমার বসুর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

১৯২৭ সালের কর্পোরেশন ইলেক্শনে আজকের তুলনায় ভোটার-সংখ্যা ছিল অনেক কম কিন্তু হেফাজৎ কম ছিল না। কিছু 'ক্যানভাসার' মাইনে দিয়ে রাখতে হ'ত; চা-জলখাবারের আয়োজন বেশ কয়েক সপ্তাহ রোজ চালিয়ে যেতে হত; ভোটের দিন ভোর থেকে মোটর গাড়ির পিছনে প্রার্থীর নাম ছাপানো দর্মা বেঁধে ভোটার পাক্ড়ে আনা শুরু হ'ত। স্নায়ুর ওপর ধকল যে কিছু পরিমাণে অনিবার্য ছিল, তা মনে আছে; পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে স্বাধীন ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট-নির্বাচনে নিজে কমিউনিস্ট-প্রার্থী হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল একেবারে অন্য বস্তু। বাবার প্রথম নির্বাচনের (১৯২৭) দিন মনে আছে যে ভোরবেলা গাড়ি দেরি করায় এবং যথেষ্ট সংখ্যায় না আসায় মুশকিল হয়েছিল; এর পিছনে হয়তো কারো কারসাজিও ছিল। আরো মনে আছে যে তখন গাড়ি সরবরাহের কারবারটি চালাতেন বাবার গুণগ্রাহী (এবং হয়তো বা প্রাক্তন ছাত্র) হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মজলিসী মানুষ হিসাবে যাঁর ছোট্ট দোকানটিতে অনেক নামকরা লোক বসে আড্ডা দিতেন, পরে উদয়শঙ্করের নৃত্যানুষ্ঠান (এবং অনুরূপ বহু উদ্যোগ) ব্যাপারে 'impresario' রূপে যাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং ১৯৪৬-৪৭

সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার শেষ পর্যায়ে যাকে অজাতশত্রু হয়েও আততায়ীর নির্মম আঘাতে, চাঁদনীর অফিসে কর্মরত অবস্থায়, প্রাণ দিতে হয়েছিল।

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯২৪ সালে কর্পোরেশনের পরিচালনাভার গ্রহণ করেছিল; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী হয়ে যে আইন করেন, তারই কল্যাণে এই জয় সম্ভব হয়। বেশ কয়েকবৎসর কর্পোরেশনের কাজে প্রকৃত গুণগত উন্নতি দেখা যায়; 'নেটিভ্' পাড়ার রাস্তা পিচ্ দিয়ে বাঁধা হল; প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ঘটল, প্রতি 'ওয়ার্ডে' স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল— আজ প্রায় অবিশ্বাস্য এ-সব কথা, কারণ কর্পোরেশনের কুৎসার অন্ত নেই, 'চোরপোরেশন' তার ডাকনাম দাঁড়িয়ে গেছে বলা চলে! তবে বাবা যখন কাউন্সিলর (১৯২৭-৩৩), তখনই বোঝা যেত যে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে কংগ্রেসের জনসেবী চরিত্র ম্লান হতে আরম্ভ হয়েছে। কলকাতার কংগ্রেস সংগঠন কর্পোরেশন নিয়ে এমন মেতে থাকল যে আসল রাজনীতি প্রায় শিকেয় ওঠার উপক্রম ঘটেছিল; এটা আমার ধারণা, জোর করে বলতে চাইছি না— শ্রীযুক্ত অমর বসুর মতো বর্ষীয়ান্ নেতা এ-বিষয়ে বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাখেন, সন্দেহ নেই। কর্পোরেশনকে অবলম্বন করে নতুন ধরনের কিছু লোক কংগ্রেস নেতৃত্বে প্রবেশ করতে পারল, যেটা হয়তো খুব সুফলপ্রদ হয় নি। বাবা অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন কর্পোরেশনের প্রতিটি অধিবেশনে যাওয়া ব্যাপারে; সহজ বাগ্মিতা ছিল বলে ব্যাপক বিষয় উঠলেই তিনি বলতেন; কিন্তু অর্থ ও ক্ষমতা বিষয়ে বিন্দুমাত্র লোলুপতা না থাকায় মালিন্য কখনো তাঁকে স্পর্শ করে নি। এ কথাই বলেছিলেন ১৯৩৮ সালে বাবার স্মৃতিসভায় সভাপতি-রূপে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত— বলেছিলেন শচীন্দ্রনাথ কর্পোরেশনে ছিলেন 'বকমধ্যে হংসো যথা'।

ঈশান স্কলারশিপের চারশো আশী টাকা (তখনকার দিনে আমাদের কাছে 'ঐশ্বর্য'!) একসঙ্গে হাতে আসার পর মার কাছ থেকে তার একাংশ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম ১৯২৭ সালের 'ঈস্টর' ছুটির ক'দিন পুরী, কোণার্ক, ওয়ালটেয়র, চিল্কা হ্রদ দেখতে। সঙ্গে ছিল হুমায়ুন কবির; এই প্রথম বাড়ির কাউকে না নিয়ে আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছি, অতদূর ভ্রমণও ইতিপূর্বে ঘটে নি। পুরীতে সমুদ্রতীরে 'আর্যনিবাস' আর 'ভিক্টোরিয়া

বোর্ডিং', এই দুটো থাকবার জায়গার সন্ধান ছিল ; শুনেছিলাম আর্যনিবাস শুধু হিন্দুদের জন্য, তাই দুজনে গেলাম দ্বিতীয়োক্ত স্থানে। হুমায়ুনের চেহারা জামাকাপড় কিছুই কোনো সন্দেহের উদ্রেক না করায় ঘর পেলাম। স্নানাহার করলাম, প্রাণভরে সমুদ্রের সামীপ্য উপভোগ করলাম— কিন্তু বিপদ ঘটল বিকেলে, যখন বোর্ডিংয়ের রেজিস্টারে নামধাম লেখার পর ম্যানেজার শুধু আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন যে মুসলমান অতিথিদের তাঁরা রাখেন না, তবে কিনা আমার বন্ধুকে যখন দেখে কেউ মুসলমান ভাববে না তখন ব্যাপারটা চেপে যাওয়া যাক্, শুধু রেজিস্টারে হুমায়ুনের নাম বাদ দিয়ে আমার 'একবন্ধু' হিসাবেই লেখা হবে! ভদ্রলোক একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বললেন যে তাঁর নিজের কোনো 'কুসংস্কার' নেই, কিন্তু রাঁধুনী-চাকর ইত্যাদিদের নিয়েই ভয়, তারা জানলে হুলস্থূল বাধাতে পারে! আমরা অবশ্য এ ধরনের কাণ্ডের জন্য তৈরি ছিলাম না ; হুমায়ুনের সঙ্গে আলোচনা করলাম, দু'জনেই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ মনে ভাবলাম যে চলে যাব সোজা বি. এন. আর. হোটেলে, যেখানে অন্তত এ ধরনের নোংরামি নেই, কিন্তু তখনই চাবুক-খাওয়ার মতো মনে পড়ে গেল যে পকেটে সে-পরিমাণ সংগতি নেই। মনের দুঃখ মনে চেপেই থেকে যেতে হয়েছিল, ম্যানেজারকেও কোনো গণ্ড-গোলে পড়তে হয় নি— কিন্তু আবার মন বিদ্রোহ করেছিল যখন দুদিন বাদে হোটেলের খাবার নিয়ে মোটরে কোণার্ক যাবার পথে হোটেলবাসী এক বাঙালী ভদ্রবেশী সঙ্গী কথায় কথায় ১৯২৬ সালের দাঙ্গার উল্লেখ করে তখনকার Executive Councillor Sir Abdur Rahim-এর বর্ণনায় 'শালা নেড়ে' কিম্বা ঐ রকম কোনো কুবাক্য অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করল। হুমায়ুন যে মুসলমান তা জানলে হয়তো বলত না, কিন্তু তা থেকে সান্ত্বনা তো নেই, বরং উল্টো। হিন্দু, বিশেষত আপাতদৃষ্টিতে ভদ্র শিক্ষিত হিন্দুর মনোভাব ও ব্যবহার যে মুসলমানের ক্রোধ, ঘৃণা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকট হয়ে ওঠার জন্য বিপুল পরিমাণে দায়ী, এটা সেদিন মর্মান্তিকভাবেই বুঝেছিলাম। হুমায়ুনের জায়গায় আমি তখন কী ব্যবহার করতাম বলতে পারি না, কিন্তু সে কঠোর, নীরব হয়ে বসেছিল, তার মনে কী ঝড় উঠেছিল তা শুধু অনুমান করতে পারি।

পরিহাস মনে হবে, কিন্তু একটু যেন পরিশোধ নিয়েছিলাম যখন হুমায়ুন

এবং আমি নগ্নপদে পুরীর মন্দিরে ঢুকেছি, গর্ভগৃহেও গিয়েছি। হঠাৎ আবার মনে পড়ছে যে বহু পরে হুমায়ুন যখন কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী, তখন Central Advisory Board of Archaeology-র সভা হয়েছে ভুবনেশ্বরে, লিঙ্গরাজ মন্দির-প্রাঙ্গণে ও অভ্যন্তরে অনেকে তখন গিয়েছি, কিন্তু অহিন্দু বলে স্বয়ং মন্ত্রী হুমায়ুন এবং অপর কয়েকজনকে বিধর্মীদের জন্য নির্মিত মন্দির-বহির্ভূত একটি চত্বর থেকে মন্দির শোভা দেখতে হয়েছিল! ভারতবর্ষীয় জীবনের এ-বিড়ম্বনা যে কতকাল আরো চলবে কে জানে? যাই হোক্, পুরীতে মাতিয়েছিল জগন্নাথ মন্দিরের চেয়ে ঢের বেশি পুরীর অনুপম সমুদ্র-তট— দুনিয়ার নানা দেশ দেখেও যাকে বলব তুলনারহিত, যার দীর্ঘব্যাপ্ত তরঙ্গভঙ্গের মধুরিমা আমার অভিজ্ঞতায় অনতিক্রান্ত, জ্যোৎস্নাপ্লাবনে যার পুলক আর মেঘাচ্ছন্ন নিশায় যার রূপান্তর, যার হাসি, খেলা, তর্জন-গর্জন সবই যেন অনুভূতিতে এনে দেয় এক অনির্বচনীয় মানবিক প্রসাদ। ওয়াল-টেয়র এবং সংলগ্ন বিশাখাপত্তনম্-এ একত্র গভীর নীলসমুদ্র আর পাহাড়ের সারি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম; যেখানে আজ বিরাট বন্দর আর জাহাজ তৈরির কারখানা, সেখানে ছোট্ট মজবুৎ স্বদেশী নৌকায় সমুদ্রের যে ফালি ডাঙায় ঢুকেছে তা পার হয়ে Dolphin's Nose পাহাড়ে চড়েছিলাম, পথশ্রম লাঘব করেছিল টাটকা ডাবের জল আর ঝিরঝিরে বাতাস। পুরীর অভিজ্ঞতার ফলে ওয়ালটেয়রে বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টা করে ডাকবাংলোয় ওঠা গিয়েছিল, খানসামাকে খুঁজে পেতে এনে যা হোক্ একটা ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল। মনের প্রসন্নতায় গায়ে মাখি নি জুতো জোড়ার লোকসান— তৃতীয় শ্রেণীর বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটানোর খেসারৎ স্বরূপ স্টেশনে নামবার মুখে আবিষ্কার করা গেল যে পাদুকাযুগল অন্তর্ধান করেছে, আন্দাজ করা গেল যে কিছু আগে বিজয়নগরম্ স্টেশনে ওঠা-নামায় ব্যস্ত যাত্রীদেরই কেউ কর্মটি করেছেন। যা হোক্ এক জোড়া চটি জোগাড় করে কলকাতা ফেরা গেল— পথে রম্ভা স্টেশনে নেমে চিল্কা হ্রদ দর্শন, কিছুক্ষণ নৌকায় ঘোরা এবং খাস উড়িয়া রান্না আস্বাদ ভালোই লেগেছিল। কিন্তু সব ছাপিয়ে— না, শুধু সমুদ্রদর্শন বাদ দিয়ে আর সব কিছু ছাপিয়ে প্রাণমনকে স্পর্শ করে রইল কোণার্কের পরিত্যক্ত মন্দির ও চত্বরের দিব্য জ্যোতি। বহুকাল পরে মন্ত্রী হুমায়ুন এক বিদ্বৎসভায় কোণার্ক-এর আখ্যা দিয়েছিল 'The Hindu

Taj' ; আমার বিচারে এই অ্যাখ্যার শিল্পসংগতি নেই, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে হুমায়ুনের মনকেও কোণার্ক একান্ত গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। কোণার্কের উল্লেখে বহু কথা মনে এসে ভিড় করছে, কিন্তু বাক্‌বিস্তার সংবরণ করতে হবে। এখানে শুধু স্মরণ করছি অল্পবয়সের সরল নয়নে দেখা ঐ অনন্য শিল্পমহিমার হীরকদীপ্তি। এর কত আভরণ হরণ করেছে কাল, আর তার চেয়ে বেশি, মানুষের লোভ আর নির্বুদ্ধি আর দুঃশীলতা, কিন্তু এই কালজয়ী সৃষ্টি তো আমারই দেশের মানুষের কীর্তি!

১১

আঁতুড় ঘরে ছ'দিনের দিন বিধাতাপুরুষ বুঝি শিশুর কপালে তার ভবিতব্য লিখে দেন ; যাই হোক্, ভ্রমণযোগ আমার ভাগ্যে কম ছিল না। ১৯২৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষ থেকে পঞ্চানন চক্রবর্তী এবং আমি গেলাম কাশী— বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে নিখিল ভারত ইংরিজী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। ভোর-বেলা স্টেশন থেকে উঁচু একায় চড়ে দূরাবস্থিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়েছিল মনে আছে ; তারপর আর কখনো বোধ হয় ঐ বিচিত্র যানে চড়া হয় নি, আজকাল এর চলনও খুব কম, মাঝে মাঝে উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে দেখলে মজা লাগে, যেমন লাগে কেমন-যেন-ঘিয়ে-ভাজা-দেখতে উটের মুখটি তুলে চলা দেখে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শ্মশ্রুমান্ ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বেশ মনে আছে, কারণ অমন চোস্ত্ আদব-কায়দার সঙ্গে আগে কোনো পরিচয় হয় নি। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রতিযোগিতা হল ; বহুমানভাজন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পুত্র গোবিন্দ মালব্যের বাগ্মিতায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম, পরে প্রথম লোকসভায় এঁকে আবার দেখেছি, কিন্তু বাচনশক্তি তখন যেন স্তিমিত ও নিষ্প্রভ। বিতর্কের বিষয় ছিল জাতীয়তা বনাম আন্তর্জাতিকতা ; এখন ভাবতে একটু অবাক লাগে, কিন্তু তখন এ-ধরনের বিষয়নির্বাচন মামুলী প্রথায় প্রায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমি জাতীয়তার পক্ষে বললাম এবং পঞ্চানন আন্তর্জাতিকতার পক্ষে ; প্রথম পুরস্কার পেল বারাণসীরই এক ছাত্র যে আন্তর্জাতিকতার সপক্ষে বলেছিল আর দ্বিতীয় পুরস্কার (এটিও ভারী স্বর্ণ-পদক) পেলাম আমি। কলেজ এতে খুশি হয় নি, কিন্তু সে কথা যাক্।

চট্ করে সারনাথ আর কাশীর গঙ্গা, বিশ্বনাথের গলি ইত্যাদি দেখা সেরে ফেরার মুখে রেলস্টেশনে হঠাৎ দেখা ফিলিপ স্প্র্যাটের সঙ্গে। কলেজের খরচায় আমরা আসছিলাম সেকেণ্ড ক্লাসে, কিন্তু স্প্র্যাট্ খাস গোরা হওয়া সত্ত্বেও ভিড় ঠেলে উঠলেন তৃতীয় শ্রেণীতে, যাবার আগে আমাকে দেখে

বললেন যে বিতর্কে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং বিচারক হলে আমাকেই প্রথম পুরস্কার দিতেন! স্প্র্যাট-এর নাম তখন আমরা কাগজপত্রে দেখেছি, শুনেছি; অক্সফর্ড্ বা কেম্ব্রিজের মেধাবী ছাত্র, সফল সহজ জীবনযাত্রা ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন শ্রমিককৃষকের লড়াই-সংগঠনের কাজে; ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির তখন তিনি সভ্য ছিলেন। ১৯২৯ সালে বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় এঁকে জড়ানো হয়েছিল এবং কড়া সাজা দেওয়া হয়েছিল; সঙ্গে ছিলেন Lester Hutchinson-এর মতো ইংরেজ, যিনি স্প্র্যাট-এর মতো একাগ্র, সর্বত্যাগী কর্মী না হয়েও তখনকার জার্মান সাম্যবাদী প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। হচিন্‌সন্ সম্বন্ধে পরবর্তী খবর জানি না; শুধু *Conspiracy at Meerut* এবং *The Empire of the Nobobs* আখ্যা দিয়ে দুটি চমৎকার গ্রন্থের কথা অনেকেই জানবেন। স্প্র্যাট যে প্রকৃত কায়মনোবাক্যে এদেশের মেহনতী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এবং বিপ্লবী চেতনা জাগরূক করার কাজে নেমেছিলেন, তার অনেক বর্ণনা পরে শুনেছি বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, গোপেন চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, ধরনী গোস্বামী, রাধারমণ মিত্র প্রভৃতির মুখে— বাউড়িয়ার মতো জায়গায় টিনের ঘরে বাস, ছারপোকা-ভরা খাটিয়ায় শয্যা, গামছা-পরিধান, তেলেভাজা দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং মাইকহীন সভায় গলা ফাটিয়ে অনিচ্ছুক শ্রোতার ভিড় জমাবার করুণ (এবং কঠোর!) প্রয়াস ইত্যাদি বহু গল্প! বহু পরে স্প্র্যাট যখন হাল ছেড়ে দিলেন, এদেশবাসী একটি মেয়েকে বিয়ে করে দক্ষিণ-ভারতে বসবাস করলেন, ক্রমশ মার্কস্‌বাদ পরিহার করলেন, কিছু পরে হয়ে দাঁড়ালেন সর্ববিধ প্রগতিমূলক আন্দোলনের ঘোর শত্রু, যোগ দিলেন (সম্প্রতিকালে) স্বতন্ত্র পার্টির মতো দলে, রাজাগোপালাচারির দক্ষিণ হস্ত বনে গেলেন, 'স্বরাজ্য' পত্রিকায় সাম্যবাদ বিষয়ে বিষোদ্‌গার করলেন, তখন যেন দেখা গেল প্রকৃতিরই পরিহাস। এতে খেদ হয় বটে, কিন্তু বিস্ময়ের কিছু নেই— বিপ্লবের ইতিহাসে ব্যক্তির পদস্খলন অগণিতবার ঘটেছে, নতুন সমাজ আর নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করার পথ যে সুগম, অবক্র, অজটিল, অকঠোর তা মনে করার কোনো কারণ নেই, বিপুল দুরূহ পৌনঃ-পুনিক পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হওয়া তো কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা বা যুগের পক্ষে সহজ কর্ম নয়।

কাশী থেকে সোনার 'মেডল্' আনার পর একদিন হঠাৎ সকাল সাড়ে দশটার সময় দ্বারভাঙ্গা বিলডিং থেকে আমার ভাই (যে তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে) প্রেসিডেন্সি কলেজে ডেকে নিয়ে গেল, কারণ প্রিন্সিপাল স্টেপলটন্ নাকি আমায় খুঁজছিলেন আর স্বয়ং বাংলার তৎকালীন লাট সর্ স্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন (এককালে ইংলণ্ডের ডাকসাইটে ক্রিকেট ক্যাপ্টেন) বুঝি কলেজে হাজির। কিছুটা শঙ্কিতচিত্তে, অপ্রস্তুত চেহারায় এবং একেবারে অ-ধোপদস্ত ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত অবস্থায় গেলাম, একতলায় কমনরুমে তখন লাটসাহেব দাঁড়িয়ে, স্টেপল্‌টন্ পরিচয় করে দিলেন আমার স্বর্ণপদকপ্রাপ্তির কথা বলে। ঘটনাটার উল্লেখ করতাম না, এভাবে মনেও থাকত না, যদি স্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন একটা দামী কথা না বলতেন। খুব বেশি দিন তখন তাঁর এদেশবাস ঘটে নি, তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'বারাণসীতে বিতর্ক কোন্ ভাষায় হয়েছিল—সম্ভবত হিন্দীতে, তাই না?' ইংরিজী ভাষা জানা নিয়ে গর্বকরা আমাদের কানে প্রশ্নটা বেশ যেন ধাক্কা দিল, প্রিন্সিপাল তাঁর ছাত্রদের ইংরিজীতে পারদর্শিতা নিয়ে দু-একটা কথা গুঁইগাঁই করে বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেমন যেন তার কেটে গেল, সকলেরই কম-বেশি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। আমার কিন্তু মজা লাগে ভাবতে যে স্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন যতই ভারতবিরোধী রাজনীতি করুন-না কেন, তাঁর অন্তত একটা স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধি ছিল। যে-বুদ্ধিতে বলে যে অপর দেশের ভাষায় ছাত্রদের কেরামতি দেখাবার কসরৎ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, যা ঘটতে পারে শুধু আমাদের মতো পরাধীন দেশে।

আর-একটা অস্বাভাবিক রেওয়াজ ইংরেজ রাজত্বের কল্যাণে এদেশে চালু হয়ে পড়েছিল: বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় ভালো করলেই তার ওপর সবাই জোরজার করবে তখনকার সবচেয়ে কাম্য চাকরি 'আই.সি.এস্.'-এর জন্য চেষ্টা করতে। আগেই বলেছি আমাদের বাড়িতে লেখাপড়ার চর্চা এবং মর্যাদার সহজ স্বীকৃতি সকলের মনে ছিল, কিন্তু পরিবেশের চাপে আর অর্থের প্রয়োজনে অভিভাবকদের আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল আমি যেন 'আই. সি.এস.' চাকরি পেতে পারি। 'বুনো রামনাথ'-এর কাহিনী আমাদের কালে ছেলেবেলায় সকলেরই জানা থাকলেও 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে', এই অত্যদ্ভুত প্রবাদবাক্যও তখন প্রচলিত। হয়তো

এরই প্রতিক্রিয়ার দেখা যেত লৌকিক রচনা: 'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে—মৎস্য ধরিবে, খাইবে সুখে'! যাই হোক্, ইংরেজ শাসনের বহুবিধ বিড়ম্বনার সঙ্গে নানাভাবে মোকাবিলার ফলে বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ বড়ো চাকরি সম্বন্ধে একটু বিশেষ ধরনেরই মোহ পোষণ করত; তাই আমাদের মতো পরিবারেও আমার ওপর চাপ্ পড়তে থাকল—'আই.সি.এস.' পরীক্ষাটা দেওয়া নিতান্ত দরকারী। আমার মন বিদ্রোহ করেছিল, প্রবল আপত্তি বারবার এবং বহুদিন ধরে জানিয়েছিলাম, অবশেষে নির্বন্ধাতিশয্যের ফলে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাস 'আই.সি.এস.' পরীক্ষার (যা তখন এদেশে এবং বিলাতে হত) পূর্বে 'মেডিকাল' পরীক্ষায় যেতে হয়েছিল এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম যখন দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার দরুন সেখানেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলাম। বেশি 'পাওয়ার'-এর চশমা পরি বলে এ-ভয় আমার অভিভাবকদেরও ছিল, এবং বন্ধুদের পরামর্শে পরীক্ষার আগে এক-জন জাঁদরেল 'স্পেশালিস্ট'-এর কাছে চোখ দেখাতে হয়েছিল। খুব সম্ভব ইনি নিজেই 'মেডিকাল বোর্ডে' ছিলেন, এবং সেজন্যই বিশেষ করে মোটা 'ফি' দিয়ে এঁর কাছে যাওয়া। খুব স্পষ্ট না হলেও মনে আছে ভারিক্কি মানুষ, 'মেজর' বা 'কর্নেল' তাঁর উপাধি, ভারতীয় হয়েও ইংরিজী ছাড়া মুখে বাক্য সরে না, গম্ভীরভাবে চোখ পরীক্ষা করলেন— আমাকে যে পরে 'পাস' করান নি, এটাই বাঁচোয়া।

* * *

আমরা যখন এম এ. পড়ি, তখন A. E. R. Gilligan-এর নেতৃত্বে Marylebone Cricket Club (M.C.C.) প্রথম সরকারীভাবে এদেশে এক প্রতিনিধিস্থানীয় ইংরেজ ক্রিকেট দল পাঠিয়েছিল (১৯২৭-২৮)। ঈডেন্ .গার্ডেন্স্-এ খেলায় সেকালের হিসাবে প্রচণ্ড ভিড় হ'ত, শহরে খেলা নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। নিছক খেলা বলে নয়, আমাদের আহত গুম্‌রে-থাকা দেশাভিমান এমন উপলক্ষে খেলা নিয়ে আগ্রহের গায়ে বিশেষ একটা ছোপ্ লাগিয়ে দিত—আজও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই উপাদান আছে। 'অলিম্পিক্' এবং অন্যত্র জয়পরাজয়ের একটা স্বকীয় চরিত্র আছে, কিন্তু পরাধীন অবস্থায় সতত মর্মদংশী বেদনা উপশমের প্রত্যাশায় ইংরেজ 'টীম্'-এর সঙ্গে স্বদেশী খেলোয়াড়দের পাল্লা প্রকৃতই এমন আকুলতার

সৃষ্টি করত যা ভরসা করি আজকের পরিস্থিতিতে অবাস্তব। ফুটবলের রেওয়াজ ঢের বেশি বলে গোষ্ঠ পাল, ননী গোঁসাই, কুমার, রবি গাঙ্গুলি, সামাদ-এর মতো মহারথীকে নিয়ে আমরা গর্ব করতাম, কিন্তু ক্রিকেট সম্পর্কেও আবেগ স্বদেশীয়ানার সঙ্গে বেশ কিছুটা আমাদের মিশে গিয়েছিল। ময়দানে এরিয়ান্ ক্লাব-এর প্রাণপুরুষ দুখিরামবাবুকে (ভালো নাম 'ও মজুমদার', "ও" যে কী-শব্দের পরিচায়ক ছিল জানি না) দেখতাম, খর্বাকৃতি মানুষ, নিজের সাইকেলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছেন, খোলা মাঠে চারপাশে সবাইয়ের তিনি চেনা, মাঝে মাঝে টিপ্পনী করছেন এবং শুনছেন— তিনি নাকি ফুটবল, হকি, ক্রিকেট সব ব্যাপারে গুণী ছেলেদের খুঁজেপেতে আনতেন, শেখাতেন, এরিয়ান্ ক্লাবে খেলাতেন, পরে কেউ মোহন-বাগান বা অন্যত্র চলে গেলেও গায়ে মাখতেন না: 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে...।' ঈডন্ গার্ডন্স্-এ এরিয়ানের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা বিশেষ অভ্যাসসিদ্ধ ধৈর্য ধরে নির্ভুল খেলার পরিচয় দিতেন দুখিরামবাবুর শিক্ষায়। যাই হোক, অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়কে (রঘুবংশের টীকাকার এবং গণিতে পণ্ডিত) দেখেছি ব্যাট্ করতে; দীর্ঘশ্মশ্রু, বিশ্ববিদিত W. G. Grace-এর সঙ্গে তুলনীয় মূর্তি, ব্যাট্ স্কন্ধে নিয়ে উইকেটে দাঁড়িয়েছেন, তখন বয়োবৃদ্ধ বলে সঙ্গে একজন 'runner', যে তাঁর হয়ে দৌড়োবে! আবছা মনে আছে দেখেছি Middle-sex এবং পরে অস্ট্রেলিয়ার Frank Tarrantকে যিনি ছিলেন বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ চৌকস্ ক্রিকেটার; স্পষ্ট মনে আছে দেখেছি নামকরা বাঙালী ক্রিকেটার হেমাঙ্গ বসু, মণি দাস প্রভৃতিকে (বহুখ্যাত বিধু মুখার্জি তখন বোধ হয় পরলোকগত)। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবে ল্যাগ্‌ডেন, হোজি, ক্যাম্বেল, জন্‌স্টন, লংফীল্ড্ প্রভৃতি সাহেব ধুরন্ধরের সঙ্গে পাল্লা দিতে দেখেছি শৈলজা রায়, আসাদ আলি, কালাধন মুখার্জি, গণেশ ও কার্তিক বসু প্রভৃতিকে। আর শীতের দুপুরে খেলা দেখার অবসরে জমানো আড্ডার গল্প শুনেছি— বোম্বাইয়ে Quadrangularএ ভিঠল আর বালু, দেওধর আর ওয়াজির আলী কত কেরামতি দেখাচ্ছেন, কেউ হয়তো থামিয়ে বললেন, 'আরে ছোঃ, আজকের খেলোয়াড়দের দৌড় কতদূর? দেখতে যদি খোদ রঞ্জি-র খেলা, সে-রামও নেই অযোধ্যাও নেই; আগের মতন এখন কুচবিহার নাটোরের মহারাজা আর Lord Harris-এর মতো দোর্দণ্ড সাহেব আর

কোথায় 'টীম্' নিয়ে আসছে?' এককোণ থেকে অর্বাচীন কণ্ঠ শোনা গেল: 'রেখে দিন দাদা পুরোনো কথা—দেখতেন যদি নাইডু-র খেলা, সি. কে. নাইডু, ক্রিকেট মাঠে বোম্বাইয়ে যে ভেল্কি দেখিয়ে চলেছে!'

এই সি. কে. নাইডুকে নিয়ে অহংকার সারাজীবন পোষণ করে চলেছি—বহুবার দেখেছি দেশে এবং বিদেশে, এবং ভারতীয় ব্যাটিংয়ের যে জাদু Neville Cardus-এর মতো একই সঙ্গে সংগীত আর ক্রিকেটের বিবিধ ব্যঞ্জনায় অতুলন প্রবক্তার বর্ণনায় অভিব্যক্ত হয়েছে, তার খোঁজ পেয়েছি সবচেয়ে নাইডুর খেলায়। ঈড্‌ন্‌গার্ডেন্‌স-এ M. C. C.-র বিরুদ্ধে খেলায় সেই বোধ হয় নাইডুর প্রথম কলকাতার মাঠে অবতরণ; আমাদের প্রত্যাশা ছিল অফুরন্ত, কারণ বোম্বাইয়ে ঐ সাহেবদেরই বল ঠেঙিয়ে এগারোটা ওভার্ বাউণ্ডারি আর ষোলটা বাউণ্ডারি নাকি তিনি হাঁকড়েছিলেন! কলকাতায় কিন্তু নাইডু আমাদের হতাশ করলেন; এক 'ইনিংস্'-এর খেলা, একবারই তাই নামলেন, মাত্র ন-টা রান করে আউট হয়ে গেলেন— কিন্তু এখনো ভুলি নি 'লেগ'এর দিকে একটি 'গ্লান্স', যা মুহূর্তের ঝলকে বাউণ্ডারি চলে গেল, কব্‌জির অতি ক্ষিপ্র অথচ ধীর সঞ্চালনে ব্যাটের বিদ্যুৎ-স্পর্শে বল্ ছুটল নিরুদ্দেশ যাত্রায়, খেলোয়াড় দর্শক সবাই অবাক বিস্ময়ে ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল চাক্ষুষ করল, মুহূর্তের জন্য সারা মাঠ যেন সূর্যের কাছ থেকে হঠাৎ চেয়ে আনা অজানা এক আলোয় ঝলমল করে উঠল।

ইংরেজ দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন এ. ঈ. আর গিলিগান্ যিনি বহুবার দেশের নেতৃত্ব করেছেন ক্রিকেট মাঠে। দলে ছিলেন সেদিনকার বিশ্ববিখ্যাত বোলার Tate, তা ছাড়া Geary, Astill, Parsons, Wyatt, Sandham (যিনি Jack Hobbs-এর সঙ্গে বহু বৎসর এক সঙ্গে ব্যাটিংয়ে নামতেন)। Tate-এর বলে আউট হওয়া অপমানের কিছু নয়; কিন্তু মণি দাস একেবারে এক বলে বোল্‌ড হওয়ার দুঃখ এখনো মনে আছে। আরো মনে আছে নামকরা বাঙালী খেলোয়াড়দের অসাফল্য, অথচ তাদেরই মধ্যে উইকেট কীপার নীরজা রায় এবং বল তাড়নায় পারদর্শী বলে 'তাড়ু' নামে পরিচিত হাবুল মিত্তির নির্ভয়ে আর নিঃসংকোচে বোলিং-কে আক্রমণ করে দেখালেন যে সাহেবদের বিক্রম এমন কিছু নয়। কদিনের খেলায় দেখা গেল কলকাতার Guy Ford, Carbery প্রভৃতি ফিরিঙ্গী খেলোয়াড় তেমন

সুবিধা করতে পারলেন না ; সম্ভবত এর প্রধান কারণ ছিল স্নায়বিক দুর্বলতা, যা আশ্চর্য নয় এম. সি. সি.-র মতো দুর্ধর্ষ দলের সঙ্গে খেলায় নেমে। হকি এবং ক্রিকেটে কলকাতার ফিরিঙ্গীদের ভূমিকা তখন বেশ গৌরবের ছিল ; কাস্টম্‌স্‌, রেঞ্জার্স, সেন্ট জেভিয়ার্স, পোর্ট কমিশনার্‌স্‌, পুলিশ প্রভৃতি দলে তাদের বেশ কিছু খেলোয়াড় প্রকৃত গুণী ছিল সন্দেহ নেই। অলিম্পিক হকিতে ভারতবর্ষের গৌরব বর্ধনে অ্যালেন থেকে ক্লডিয়স্‌ পর্যন্ত ফিরিঙ্গী খেলোয়াড়ের ভূমিকা অবশ্য স্মরণীয়। তাদের কেউ কেউ অস্ট্রেলিয়া বা পশ্চিম জার্মানি বা অন্যত্র গিয়ে সেখানকার হকির হাল বদলে দিয়েছে শোনা যায়। কিন্তু একটা গোটা সম্প্রদায়, যা স্বাধীন ভারতবর্ষে অত্যন্ত সংখ্যাল্প হয়েও পার্লামেন্টে দুটো আসনে মনোনয়নের মর্যাদা পেয়েছে, খেলার ক্ষেত্রে এমন ভাবে নিভে গেল কেন (বিশেষত পশ্চিমবাংলায়), তা ভাববার বিষয়।

হকির কথা এসে পড়ায় মনে আসছে Greer Sporting-এ রাঁচী অঞ্চলের সাঁওতাল খেলোয়াডদের কৌশল আর কৃতিত্ব (সম্ভবত এদেরই সঙ্গে খেলতেন হকিতে মুষ্টিমেয় বাঙালী গুণীর অন্যতম দেবেন পাল)। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে লক্ষ্ণৌ থেকে আগত চমৎকার খেলোয়াড়ের দলকে (যাদের মধ্যে সম্ভবত ছিলেন পরবর্তীকালে দিল্লীতে পাকিস্তানী হাই কমিশনার গজন্‌ফর আলী খান্‌)— মনে পড়ছে কাস্টমস্‌ দলের অতুলন ফরোয়ার্ড, আসাদ আলি ('শর্টকর্নার' পেলে গোল যার ছিল অব্যর্থ) আর 'সেন্টার-হাফ' শৌকৎ। সব-কিছু ছাপিয়ে অবশ্য মনে পড়ছে জাদুকর ধ্যানচাঁদকে— প্রথম বোধ হয় আসেন ঝান্সীর এক দলের সঙ্গে। আশ্চর্য, প্রায় অবাস্তব, তাঁর ক্রীড়াকৌশল ; শিল্পের অনির্বচনীয়তা যেন প্রতিটি ভঙ্গিমায় ; হকির মাঠে এই সব্যসাচীর কোনো তুলনা কোথাও নেই। ১৯২৮ সালে এবং পরবর্তী অলিম্পিক খেলায় ভারত-বর্ষের প্রথম এবং পরম গৌরব অর্জনে তাঁর সহকারীদের অবদানও অবশ্য সামান্য একেবারেই নয় ; ধ্যানচাঁদের ভাই রূপসিং, ফিরোজ, দারা, কার প্রভৃতির কথা আজকাল বড়ো একটা শুনি না। ধ্যানচাঁদ আর রূপসিং একবার (বোধ হয় ১৯৩৬।৩৭ সালে) আমাদের বাড়িতে আসেন, আমার এক ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুতার সুবাদে— পরেও সাক্ষাৎ আর আলাপ হয়েছে। হকি কর্তৃপক্ষীয়দের এঁদের সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত অবহেলা লক্ষ্য করে

আশ্চর্য হয়েছি, কিন্তু ধ্যানচাঁদ যেন কিছুই গায়ে মাখেন না। এ-বিষয়ে কতবার কথা হয়েছে অলিম্পিক-এ প্রথম ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন জয়পাল সিংয়ের সঙ্গে— কিন্তু তা এখন মুলতুবী থাক্, জয়পালকে আমি প্রথম কাছে থেকে দেখি ১৯৫২ সালে প্রথম লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর।

*　　*　　*

অ্যালবার্ট্ হলে সাক্‌লাতওয়ালার বক্তৃতার কথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু কেতাবী বিত্তায় আবছাভাবে অল্প কিছু সমাজবাদ-সাম্যবাদ সম্বন্ধে জানলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই তখন বুঝতাম না। ১৯২৭-২৮ সালে কিন্তু কলকাতায় মাঝে মাঝে একটা যেন ভূমিকম্পের আভাস পাওয়া যেত। হাইকোর্টের দুই প্রধান উকিল, অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে আরো বেশি যশস্বী, ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং অতুলচন্দ্র গুপ্ত— নরেশবাবু সাহিত্যের প্রাঙ্গণে নির্বিত্ত, নির্যাতিত, নিঃসহায়দের টেনে আনছিলেন এবং তখনকার সীমিত পরিবেশে সাম্য ও মৈত্রীর নবসমাজ সংগঠনের কথা সতেজে বলতেন ; আমরা শুনতাম ('২৮-২৯ সালে সম্ভবত) যে অতুলবাবুর হাইকোর্টের জজ হওয়া (যা ছিল সেদিন বাঙালী শিক্ষিত মানসে চতুর্বর্গ-লাভেরই প্রায় সমগোত্রীয় ব্যাপার) একেবারে বাঁধা, কিন্তু মজুর-কৃষক সম্মেলনে যোগ দিয়ে সে-সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল ! বেশ মনে আছে গোটা ধর্মতলা স্ট্রীট জুড়ে বিরাট মিছিল চলেছে ; সবাইয়ের মুখে নতুন এক ধ্বনি 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', যার অর্থোদ্গম তখন আমাদের করে নিতে হ'ত। ১৯২০-২১ সালের মিলিত হিন্দু-মুসলিম মিছিলের যে তেজ ইতিমধ্যে প্রায় নির্বাপিত হয়েছিল তারই পুনরুজ্জীবন যেন দেখা দিল। তবে তখনো এই অভিনব আন্দোলনের পরিধি আগেকার মতো সর্বব্যাপ্ত নয়, বোধ হয় সচেতনভাবেই একে নির্বিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন হিসাবে চালনা করা হত। দরদী যে যেখানে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে একত্র জড়ো করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল অনেক পরে, নিজস্ব গণ্ডীর বাইরে সকলের সম্বন্ধেই তখন ঘোর সন্দেহ। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই কারণ যে-কোনো বিপ্লবী প্রচেষ্টা অন্তত প্রথম দিকে কিছু পরিমাণে সংকীর্ণ না হয়ে পারে না। যাই হোক্, প্রকৃত আন্দোলন তখন দেখেছি বলতে পারি না, কিন্তু দেখেছি একটা আলোড়ন— সে-বিষয়ে তখন কতটা ভেবেছি মনে নেই, কিন্তু চিন্তার গহনে সে অভিজ্ঞতা একটা ছাপ যে

রেখেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তা নইলে আজও চোখ বুজলে ধর্মতলার গোটা রাস্তা জুড়ে সেই মিছিলের ছবি দেখি কেমন করে?

বোধ হয় অর্ধ-বিচলিত গান্ধী-ভক্তির দিক থেকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম একটা বই সম্বন্ধে, যার খবর সম্ভবত প্রথম জানিয়েছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর দুই বিখ্যাত মাসিকের মাধ্যমে। এটা হল René Fulop-Müller-কৃত *Lenin and Gandhi*; কিছুকাল পরে একখণ্ড সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম, এখনো হয়তো অগোছাল বইয়ের গাদায় তার সন্ধান পেতে পারি। প্রকাণ্ড বই, তখনকার প্রচলিত জার্মান কায়দায় বিস্তৃত পৃষ্ঠপটে ফাঁদা। মনে রাখতে হবে যে তখনই চারদিকের দুন্দুভি-নিনাদে অভিভূত হয়ে পরীক্ষাপাসের পারিতোষিক হিসাবে পাওয়া বই কিনেছিলাম Oswald Spengler-এর অতি দুর্বোধ্য *The Decline of the West* ধরনের বই, কিম্বা পুরোনো লেখার মধ্যে Nietzsche-র *Thus spake Zarathustra*। ফুলপ-ম্যুলর আর-একখানি বই লেখেন *The Mind and Face of Bolshevism*— সেটিও অতিকায়, কয়েকটা দুর্লভ ছবির জন্যই আজও মূল্যবান্। খুব একটা প্রভাব যে মনে পড়েছিল বলতে পারি না; তবে প্রবাসী-মডার্ন রিভিউতে নানাবিধ চয়ন থেকে সোভিয়েট সম্বন্ধে অল্প কিছু খবর পেয়ে মন অতৃপ্ত থাকত বলে বেশ একটু আশা নিয়ে ১৯২৮ সালে কিনলাম জওয়াহরলাল নেহরুর সদ্য-প্রকাশিত 'সোভিয়েট্ রাশিয়া' শীর্ষক গ্রন্থ। মোটামুটি ভালো লেগেছিল, আগ্রহ পুষ্ট হয়েছিল, এইটুকু বলতে পারি, কিন্তু তার বেশি নয়। তখন জওয়াহরলালের ইতস্তত বক্তৃতা কিছু কিছু পড়েছি। আর দু-একবার শুনে থাকলেও মনে হত ভদ্রলোক বক্তৃতা তেমন দিতে পারেন না কিন্তু যা বলেন তার লিখিত বিবরণ পড়ে একটু আশ্চর্য হতে হয়, কারণ তখন আবিষ্কার করা যায় যে ভাববার এবং ভাবাবার মতো কথা যেন বেশ রয়েছে। পরবর্তীকালে জওয়াহরলালের অগণিত ভাষণ শুনেছি; ঐতিহাসিক ভূমিকা মাঝে মাঝে বক্তৃতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, কিন্তু কদাচ নিছক বক্তৃতা হিসাবে তাকে সরেশ বলতে পারি, যদিও বক্তব্যে সারবান্ ও চিন্তাশীল উপাদান প্রায় সতত তাতে ছড়িয়ে থেকেছে। 'সহী বাত্' আখ্যা দিয়ে জওয়াহরলালের বহু হিন্দী বক্তৃতা ছোটো ছোটো পুস্তিকায় মুদ্রিত হতে দেখেছি; সেগুলি সবই বহুজনের সামনে,

'আম-জমায়েতে' অনেকক্ষণ ধরে বলা কথার অনুলিখন। ইংরিজীর প্রসাদগুণ সত্ত্বেও জওয়াহরলালের ইংরিজী বক্তৃতার চেয়ে এগুলি আমার ভালো লেগেছে, বেশি দামী মনে হয়েছে— তবে থাক্, অনেক পরের কথা এখানে এসে গেল।

আইনের 'প্রিলিমিনারি' পরীক্ষায় একেবারে ধাপ্পার ওপর প্রথম শ্রেণীতে জায়গা পেয়েছিলাম, কিন্তু দেশে আর আইন পড়ি নি। বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়ে শুধু সেই সুবাদে একটা বিষয়ে পরীক্ষা থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। ১৯২৮ সালে এম.এ. পাসের কথা আগেই বলেছি; লেখাপড়া ব্যাপারে ওয়াকিবহাল মহলে তখন আমার খ্যাতি জমজমাট; কখনো কখনো কলেজ পাড়ায় 'জুনিয়র' ছেলেদের মুখেচোখে আমাব 'কীর্তি, সম্বন্ধে সমীহ লক্ষ্য করে বিব্রত হয়েছি; কলেজে অনুজদের মধ্যে নীরেন দে (বর্তমানে ভারতের অ্যাটর্নি জেনারল) কিম্বা আরো ছোটো, অজিত রায়-এর (এখন সুপ্রীম কোর্টের জজ) মুখে পরে শুনেছি আমি ছিলাম তাদের একরকম 'হীরো'। সুরেন্দ্রনাথ সেন-এর মতো স্থিতধী বিদ্বান্ আমার জন্য যে সুপারিশ লিখেছিলেন, তা পড়লে আজ নিশ্চয়ই লজ্জা পাব (সুখেব বিষয় সার্টিফিকেটের যে বাণ্ডিল ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বোধ হয় ছিল তা কোথায় হারিয়ে গেছে)। অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার একটা কথা কিন্তু মনে রয়েছে; সেই কাগজটি খুঁজে পেলে আজও একটু সুখী হতে পারি— তিনি বলেছিলেন আমার সম্বন্ধে নানা কথা-ব্যপদেশে: 'A certain diffidence and self-criticism will only make his work more interesting'। সিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন বলেই বোধ হয় তাঁর তৃতীয় নেত্রে আমার ভিতরটা কিছু পরিমাণে ধরা পড়েছিল। পরে দেখেছি কমিউনিস্ট মহলে (যেখানে বিচরণ বহু বৎসর আমার জীবনের মুখ্য কর্ম ছিল) 'self-criticism' বাক্যটির প্রচলন প্রচুর। অবশ্য বলছি না যে অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার কথার জোরে সেখানে জাঁকিয়ে বসতে পেরেছি— কিন্তু গুরুবাক্য তো মিথ্যা নয়, 'diffidence' কথাটি যে তিনি প্রথমেই জুড়ে দিয়েছিলেন।

হুমায়ুন কবির 'স্টেট স্কলারশিপ' নিয়ে ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বর নাগাদ চলে গেল অক্স্ফর্ডে। আমার গমনযোগ ছিল পর বৎসর, কিন্তু এই 'জলপানি' পাওয়ার কাহিনীটাও সংক্ষেপে বলি। বাছাই হওয়ার আগে কয়েকটা স্তর

তখন ছিল ; প্রথম প্রয়োজন হত ইউনিভার্সিটির সুপারিশ এবং একদিন বাবা বাড়িতে বললেন যে স্বয়ং অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ তাঁকে কোন্ এক পার্টিতে আলাদা ডেকে জানিয়েছেন যে আমার নাম যাচ্ছে ইউনিভার্সিটি থেকে। তখনকার বাংলা সরকার ছিল সিদ্ধান্ত করার মালিক, আর ঠিক সেই সময়, সম্ভবত স্বরাজ্য পার্টির দাপটে, ব্যবস্থাপক সভার ঝাঁপ বন্ধ ছিল শিক্ষামন্ত্রী বলে কোনো রাজনীতিকের হাতে ক্ষমতা ছিল না, ছিল A.J. Dash নামে I.C.S. সেক্রেটারির হাতে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন কিছু পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন অপূর্বকুমার চন্দ ; তখন তাঁর খ্যাতি মধ্যগগনে, কারণ সবাই শুনতাম যে রবীন্দ্রনাথের সদ্য-প্রকাশিত 'শেষের কবিতা'-র 'অমিট্ রে' চরিত্রটি নাকি তাঁরই ছাঁচে গড়া! সুদর্শন, মিষ্টভাষী (ইংরিজী উচ্চারণে কিঞ্চিৎ 'আদুরে' এবং— পরে জেনেছি—'সিলেটী' ঢঙ), ভাবে ভঙ্গীতে আমাদের চোখে 'স্মার্টনেস্'-এর চূড়ান্ত, এই ব্যক্তির আকর্ষণ বুঝেছি পরে ; তখন তাঁর কাছে পড়ি নি, কাছে থেকে জানারও সুযোগ পাই নি। তবে নামজাদা ছাত্র হিসাবে আমি পরিচিত ছিলাম বলে একদিন কলেজের বারান্দায় আমাকে 'স্টেট স্কলারশিপ' বিষয়ে যা বললেন তাতে বিদেশ যাওয়ার আশা প্রায় ভেঙে গেল। তাঁর কাছে শুনলাম যে সরকার কলকাতা থেকে কাউকে বাছাই করলে আর একজনকে বাছবে ঢাকা থেকে, একজন হিন্দু হলে অপর জন হবে মুসলমান, আর কলকাতা থেকে 'বটানি'-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে হেদায়েতুল্লাহ্ যখন বাছাই হবে-ই তখন ঢাকা থেকে হিন্দু ছাত্রকে পাঠিয়ে সরকার দাঁড়িপাল্লার ওজন ঠিক রাখবে। এমত অবস্থায় কিছুটা ম্রিয়মাণ অনুভব করেছিলাম নিশ্চয়, কারণ কথাটা পরিপূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত ছিল। আমার ধারণা যে তখন যদি মন্ত্রী কেউ থাকত শিক্ষাবিভাগে, তা হলে রাজনৈতিক হিসাবে আমাকে 'স্কলারশিপ' থেকে বঞ্চিত করা ছাড়া রাস্তা ছিল না। যাই হোক্, রাইটার্স বিলডিং-য়ে জীবনে প্রথম পদার্পণ করতে হল সেক্রেটারি ড্যাশ-এর সঙ্গে মোলাকাতের জন্য ; বেশ মনে আছে, ছ-ফুটের ওপর লম্বা লোকটি, প্রথমে বেশ একটু উদাসীন অথচ আমার কথার ধরনে যেন চাঙ্গা হয়ে বসলেন, জিজ্ঞাসা করলেন এম.এ. পাস করে অক্স্‌ফর্ডে 'অনার্স স্কুলে' পড়তে যাচ্ছি কেন— জবাব দিলাম, অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের

কাছে শোনা কথা আউড়ে, যে সেখানকার 'grind' একটা মূল্যবান্ অভিজ্ঞতা হবে বলে ধারণা, আর বললাম যে তিন বছরের বদলে দু'বছরে অনার্স ডিগ্রী নিয়ে বাকি সময় (স্কলারশিপের মেয়াদ তিন বৎসর) গবেষণা করব। কোন্ বিষয়ে গবেষণা আমার পছন্দ জানতে চাইতে বলে দিলাম 'কন্স্টিট্যুশনল হিস্ট্রি' নিয়ে করার ইচ্ছা— বোধ হয় সাহেব 'ইম্‌প্রেস্‌ড' হয়েছিলেন, তবে মৃদুকণ্ঠে এটাও বলে রাখি যে সেদিন যেন বেশ চোস্ত, অপ্রত্যাশিত ইংরেজীতে ইংরেজনন্দনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, যাতে তার অনিচ্ছুক মন বোধ হয় একটু ভিজেছিল! যাই হোক্, বুঝলাম খুব সম্ভব অপূর্ববাবুর আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ হবে আর দুজন কলকাতার ছাত্রকেই বিদেশ যাত্রার বৃত্তি দেওয়া হবে।

হেদায়েতুল্লাহ্ এবং আমি শেষ পর্যন্ত স্কলারশিপ পেয়ে কলকাতা থেকে ট্রেনে বোম্বাই আর সেখান থেকে জাহাজে লণ্ডন পর্যন্ত একসঙ্গে গিয়েছিলাম। বর্ধমান-নিবাসী এই মেধাবী মানুষটির মতো নরম মন আমি খুব কম দেখেছি। লণ্ডনে 'ডক্টরেট' সংগ্রহ করে দেশে ফিরে সরকারী উচ্চপদে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। বহুকাল আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই, কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে ভাবি তাঁর কথা, অল্পদিনের মধ্যে আমাদের একটা আত্মীয়তা গজিয়ে উঠেছিল, কিন্তু সংসার এমনই বিচিত্র যে বহুক্ষেত্রে আত্মীয়তা-বোধ এবং পরস্পরদূরত্বের সহাবস্থান অনিবার্য হয়ে পড়ে। যাই হোক, বিদেশযাত্রা ঘটেছিল ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে ; তার আগেকার কয়েকটা কথা একটু এখানে বলে নেওয়া দরকার।

* * *

১৯২৭ সালে মাদ্রাজ শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা জাতির উদ্দেশ্য বলে ঘোষণার চেষ্টা হয়েছিল ; সদ্য-সোভিয়েট-ফেরত জওয়াহরলাল এবং এবম্বিধ ব্যাপারে সতত উৎসাহী সুভাষচন্দ্র বোধ হয় একযোগে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি ডক্টর আন্সারি অবস্থা কিছুটা বেগতিক দেখে উঠে পড়ে লাগেন এবং প্রশ্নটি আপাতত মুলতুবী রেখে শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র বিষয়ে রিপোর্ট দেবেন, যেটি বিবেচনা করবে পরবর্তী কংগ্রেস কলকাতার অধিবেশনে (১৯২৮)।

১৯২৭-২৮ সালে সারা দেশে আলোড়ন এসেছিল 'সাইমন্ কমিশন' বয়কট আন্দোলন নিয়ে; মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড আইন (১৯১৯) অনুযায়ী দেশশাসনে সামান্য ভগ্নাংশের কর্তৃত্ব পেয়ে ভারতবাসী কতটা তার 'যোগ্যতা' প্রমাণ করল বিচার করার জন্য সার্ জন সাইমন্-এর নেতৃত্বে পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে এক কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল; এতে ছিলেন বোধ হয় সপ্তরথী, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ক্লেমেণ্ট্ অ্যাট্‌লী, যিনি পরবর্তী যুগে ব্রিটিশ শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী হন এবং দেশবিভাগের বিনিময়ে ভারত ও নবসৃষ্ট পাকিস্তানের হাতে 'স্বাধীনতা'— ইংরেজের সতর্ক ভাষায় 'ক্ষমতার হস্তান্তর' (Transfer of Power)— তুলে দেওয়া ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং এদেশের বহু বিশিষ্ট জনের প্রচুর সাধুবাদ পেয়েছেন। দেশের মেজাজ সেদিন এমন ছিল যে অনেক নরমপন্থীর পক্ষেও এই কমিশনে সমান মর্যাদায় ভারতবাসীকে স্থান দিতে একান্ত অস্বীকৃত সাম্রাজ্যবাদের অপমানকর প্রস্তাবকে হজম করা শক্ত ছিল। 'সাইমন্ কমিশন' বয়কটের ধুয়ো তাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল; যেখানে তারা যায়, কেবল শোনে 'সাইমন, ফিরে যাও' ('Go back, Simon!') আত্মজীবনীতে জওয়াহরলাল নেহরু লিখেছিলেন যে তখনকার নয়া দিল্লীতে বাস করার সময় কমিশনের পক্ষ থেকে নালিশ আসে যে রাত্রে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত করছে 'সাইমন, ফিরে যাও' ধ্বনি, কিন্তু খোঁজ করে ধরা পড়ে যে আওয়াজটা মানুষের কণ্ঠ থেকে নয়, আসছে শেয়ালের গলা থেকে! এটা গল্প নয়, বাস্তব সত্য— সাইমন কমিশনের শ্বেতাঙ্গ সদস্যেরা আমাদের এই কৃষ্ণাঙ্গ দেশে স্বস্তি যে পান নি, তা ঠিক; আমরা স্বাধীনতার 'যোগ্য' হয়ে উঠেছি এ-সিদ্ধান্ত যে তাদের কাছ থেকে আসে নি, তা তো অবধারিত ছিল।

দেশ জুড়ে যে আলোড়ন, তারই প্রতীক হল সাইমন-বিরোধী মিছিলে যোগ দিয়ে লালা লাজপৎ রায়-এর মতো সর্বজনমান্য (অথচ সেদিনের পরিবেশে অনতি-উগ্র) নেতার মৃত্যু; পুলিশের প্রচণ্ড প্রহার সেই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করল। উত্তরপ্রদেশের প্রমুখ নায়ক, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, ক্রমাগত লগুড় আঘাতকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চললেন, শক্তিমান বলেই একেবারে ভেঙে পড়লেন না, পঙ্গু হলেন না, কিন্তু আমৃত্যু এই বিরাটবপু

মানুষটি নিজ দেহে বহন করেছিলেন সেদিনের স্মৃতি— শির, হস্ত, পদ ও তাঁর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় সর্বসময় নড়তে থাকত, অথচ কেমন করে বিপুল কর্মভার যে পালন করতে পেরেছিলেন তা এক বিস্ময়। লাজপৎ রায়কে দূর থেকে ছাড়া কখনো দেখি নি; পন্থ-জীর কাছাকাছি আসতে পেরেছি পার্লামেন্টারী জীবনে। যথাসময়ে এই প্রভূত শক্তিধর, বহু-ব্যাপারে রক্ষণশীল অথচ প্রকৃত তেজস্বী মানুষের কথা বলতে পারব।

এই সময় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দ্বেষকে অতিক্রম করে একটা দেশজোড়া সমঝোতার সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়েছিল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে জাতীয় নেতৃত্ব সেই সুযোগের সদ্‌ব্যবহারে অসমর্থ প্রমাণিত হল। ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছিল; হয়তো কিছুটা বিকৃত মানসিকতা নিয়েই 'অস্পৃশ্য' জনতার নেতা ডক্টর আম্বেদকর তাঁর এক গ্রন্থে এই-সব দাঙ্গার এক বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সন্দেহ নেই যে তাঁর মতো ব্যক্তিকে মুক্তি আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে দূরে ঠেলে রাখার দায়িত্ব আমাদেরই ক্ষুদ্রচেতা রাজনীতিকে বহন করতে হবে। সে যাই হোক, ১৯২৭-২৮ সালে আবার সংগ্রামের সম্ভাবনায় জন-মানসে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয় তারই প্রতিফলনে দেখা গেল নিছক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আসর তেমন জাঁকিয়ে বসতে পারছে না। মুসলিম নেতৃত্বে মহম্মদ আলি জিন্না প্রমুখ অনেকে সাইমন কমিশন বয়কটে বৃহৎ ভূমিকায় নামলেন, নরমপন্থা যাঁদের মজ্জাগত তাঁরাও অনেকে সাইমন কমিশনকে সহযোগিতা দিতে অস্বীকৃত হলেন, মোটামুটি খয়ের-খাঁ-জাতীয় ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ কমিশনের সহায়ক হিসাবে কাজ করতে রাজী হলেন না। মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তাতে, যতদূর মনে পড়ে, ছিলেন সার তেজবাহাদুর সপ্রু, সার আলি ইমাম, সুভাষচন্দ্র বসু ও শোয়েব কুরেশী— সর্বদলের অভিমত সংগ্রহ করে কমিটি রিপোর্ট দিল, বিতর্ক উঠল কারণ কমিটি ব্রিটিশ সম্পর্ক না কাটিয়ে 'ডোমিনিয়ন স্টেটস্' পেলেই চলবে বলায় অনেকেই আপত্তি জানালেন, সুভাষচন্দ্র বসুও স্বভাবত এ ব্যাপারে মতভেদ প্রকাশ করলেন, দেশ জুড়ে জওয়াহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ হল। ১৯২৮ সালের শেষ ভাগে কলকাতায় বসল কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন

প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হল সর্বদলীয় সম্মেলন, মুক্ত ভারতের রাষ্ট্রিক রূপ নির্ধারণে ব্যাপকতম জাতীয় ঐক্য গঠনের প্রচেষ্টা ঘটল, সদ্যজাগ্রত মেহনতী মানুষও এগিয়ে এল নবলব্ধ সংহতি ও আত্মবিশ্বাসের জোর নিয়ে। কলকাতা কংগ্রেসের মেজাজ আর সমারোহ যে ছিল অভূতপূর্ব, তা শুধু এখানে কংগ্রেসের প্রতাপ আর প্রভাবের পরিচায়ক নয়, সেদিনের আবহাওয়ায় মুক্তি আর তার পরিপূর্ণ আস্বাদের জন্য আকুলতা দেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল বলেই কংগ্রেস এবং তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলোর মূর্তি হল একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির।

মহাত্মা গান্ধী কোনোমতে সেদিনের আবেগকে প্রশমিত করে পূর্ণ স্বাধীনতা বিষয়ে একটা সামঞ্জস্য কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করিয়ে দেন। স্থির হয় যে ইংরেজ সরকারকে এক বছরের 'নোটিস' দেওয়া হবে এবং তার মধ্যে দাবি গৃহীত না হলে আগামী অধিবেশনে কংগ্রেস ঘোষণা করবে তার লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা, 'ডোমিনিয়ন স্টেটস্' দেশকে তুষ্ট করবে না। ইংরেজ অবশ্য অনুগ্রহ করে নি, আর উপায়ান্তর না থাকায় অনিচ্ছুক নেতারাও লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯২৯) পূর্ণ স্বাধানতা প্রস্তাবে সায় দেন। চল্লিশ বৎসর বয়স্ক জওয়াহরলাল নেহেরু সেবার সভাপতি; বোধ হয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং আবুল কালাম আজাদ ছাড়া আর কেউ অত অল্প বয়সে কংগ্রেস সভাপতি হন নি। গান্ধীজী অগ্রণী হয়ে জওয়াহরলালের এই রাজনৈতিক অভিষেক ঘটিয়েছিলেন; সন্দেহ নেই যে তাঁর হিসাব ছিল সূক্ষ্ম আর শাণিত, কারণ দ্রুত-জায়মান বামপন্থী শক্তিকে একই সঙ্গে তুষ্ট আর সংযত করতে হলে দরকার ছিল জওয়াহরলালকে সামনে রাখা। সারা দেশে আগুয়ান আদর্শনিষ্ঠ বামপন্থী বলে জওয়াহরলালের সমাদর, অথচ সর্ববিধ মতভেদকে উত্তরণ করে গান্ধীজীর প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত, সংকট সময়ে দোদুল্যমানতা ছিল তাঁর চরিত্রের অঙ্গ। বিপ্লবের জন্য লালায়িত অথচ প্রকৃত বিপ্লবী পদক্ষেপে সদাসংশয়াপন্ন ও দ্বিধাজড়িত বলে এই খণ্ডিতমানস ব্যক্তিকেই দেশনায়ক পদে অধিষ্ঠিত করা ছিল গান্ধীজীর কাছে সব চেয়ে অনুকূল ব্যবস্থা। লাহোরে সভাপতির ভাষণ হল ভাষার দিক থেকে অনবদ্য, রাজনীতি বিশ্লেষণে নিপুণ ও মর্মস্পর্শী; মধ্যরাত্রে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ এবং নদীতীরে নির্দিষ্ট দিনে (২৬

জানুয়ারি) স্বাধীনতার অঙ্গীকার গ্রহণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে জওয়াহরলালের ভূমিকা স্মরণীয়। কিন্তু ১৯৩০-৩২ সালে যখন কঠোর পরীক্ষা এল, দেশ-বাসী অদৃষ্টপূর্ব শৌর্যের পরিচয় দিল বহুস্থানে, অথচ মূলত গান্ধীভূমিকার দ্বৈত চরিত্রের জন্যই সংগ্রাম তার সংগত পথে চলল না। আবার রাশ টেনে অধীর, আকুল জনতাকে অভ্যুত্থানের উত্তালতা থেকে নিবৃত্ত করা হ'ল; জওয়াহরলালকে সামনে রাখা গান্ধীজীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল; সাধারণ মানুষ যখন বামপন্থায় আকৃষ্ট তখন সেই বামপন্থারই প্রধান প্রবক্তাকে সংগঠনের নায়ক বানিয়ে দেশ আর সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থের নামে আন্দোলনের রাশ টেনে রাখলেন গান্ধীজী। বর্দোলি সত্যাগ্রহের 'সর্দার' বল্লভভাই পাটেল সেবার কংগ্রেস সভাপতি হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীর নির্দেশে তাঁকে ধৈর্য ধরে জওয়াহরলালের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হল। এত কাণ্ড সত্ত্বেও যে ১৯৩০ সালের এপ্রিল থেকে দেশজোড়া লড়াইকে ঠেকানো যায় নি, তার কারণ হল এই যে অসন্তোষ তখন প্রকৃতই দেশের গভীরে প্রবেশ করেছিল— এ ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার (বোম্বাইয়ে গিরনি কামগড় ইউনিয়নের সুদীর্ঘ সফল ধর্মঘট এর উদাহরণ), এবং সেই জোয়ারকে ঠেকাবার জন্য ১৯২৯ সালে সরকার কর্তৃক মীরট ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা; আরো সাক্ষ্য দিচ্ছে বহুতর ঘটনা, যেমন লাহোর জেলে ১৯২৯ সালে যতীন দাসের স্বেচ্ছামৃত্যু থেকে ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো অভূতপূর্ব এবং রোমাঞ্চকর কাণ্ড।

* * *

কালানুক্রমের দিক থেকে একটু এগিয়ে পড়া গেছে, কারণ ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের সময়কার কিছু কথা না বললে চলবে না। এখন যেখানে পার্ক সার্কাস - তিলজলা এলাকা, সেখানে বিরাট প্যাণ্ডাল, মস্ত প্রদর্শনী (আজও এর স্মৃতি বইছে 'কংগ্রেস এক্সিবিশন রোড') আর হরেক-রকম আয়োজন হয়েছিল— প্রায় অসম্ভব অব্যবস্থার মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত একটা চমৎকার ব্যাপার অন্তত কিছুদিনের জন্য গড়ে তোলার যে বিশিষ্ট বাঙালী প্রতিভা রয়েছে, তার পরিচয় তখন মিলেছিল। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বেশ একটা চলনসইয়ের চাইতে সরেশ সামরিক চেহারা দেবার

চেষ্টা করেন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু; 'জেনারল অফিসার কমাণ্ডিং' (G. O. C.) বাক্যটিকে 'গক' বলে বিদ্রূপ করার লোকের অবশ্য তখন অভাব হয় নি; পূর্ণ সামরিক বেশ-পরিহিত সুভাষচন্দ্রের সেই মূর্তিকে নিয়ে পরিহাস করেছিলেন বিশেষভাবে সজনীকান্ত দাস ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী -সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'— পরবর্তীকালে এঁদের সগোত্ররাই সুভাষচন্দ্রকে "খোকা ভগবান্" বলে কৌতুক করতে কুণ্ঠিত হন নি, প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য আরো পরে করেছেন সুভাষচন্দ্রের 'নেতাজী' ভূমিকার সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিয়ে। যাই হোক, কংগ্রেস-সপ্তাহ জুড়ে কলকাতা ঠিক তার মেজাজ মাফিক নিদারুণ সরগরম যে হয়ে উঠেছিল, তা বেশ মনে আছে। মোতি-লাল নেহরুর বক্তৃতায় স্মরণীয় তেমন কিছু ছিল মনে হয় না; তবে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে 'দেশপ্রিয়' যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 'Asiatic *zollverein*' বাক্যটি ব্যবহার করে এশিয়ার সংহতি সম্পর্কে জোর দিয়েছিলেন, যা হল সেদিনের হিসাবে বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস প্যাণ্ডালে বিবিধ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল; ছাত্র ও যুবকদের জন্য নিখিল ভারত বিতর্ক প্রতিযোগিতা একটা হয়, যেখানে অনেকে আগ্রহ করেছিলেন যাতে আমি যোগ দিতে পারি। একটু লজ্জা এবং খেদের সঙ্গে স্মরণ করছি যে, সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিদেশে পড়তে যাওয়ার দরখাস্ত বোধ হয় তখনো বিচারাধীন বলে বিজ্ঞ বন্ধুরা জোর করে পরামর্শ দিলেন যে, আমার পক্ষে কংগ্রেস-আয়োজিত বিতর্কে যোগদান সমীচীন হবে না। কলেজে আমার 'জুনিয়র', বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অসহযোগ আন্দোলন-খ্যাত অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র) তখন সর্ববিধ প্রগতি-মূলক কর্মে উৎসাহী; বেশ মনে আছে বিতর্কে আমার যোগদান সম্বন্ধে তাঁর নির্বন্ধাতিশয্য— বলেছিলেন ছাত্রেরা দারুণ হাঙ্গামা করবে যদি কংগ্রেসের ছোঁয়াচের দরুন আমাকে সরকার বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করে! শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কথাই মানতে হয় আমাকে— বহু পরে যখন পার্লামেণ্টে অনেক বৎসরের সহকর্মী, বোম্বাইয়ের জোয়াকিম অ্যালভা-র কাছে শুনি যে, সে বুঝি সেবার কলকাতায় একটা পদক পেয়েছিল, তখন ভাবি যে প্রখর কঠিন রাজনীতির দিনে আমাকে একদা পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল, একটা সোনা বা রুপোর 'মেডাল' হয়তো বা পেতাম, কিন্তু

লোকসান আরো বেশিই ঘটে গেছে। বিনয়েন্দ্রনাথ বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত থাকার পর বর্তমানে শান্তিনিকেতনে অবস্থান করছেন; যোগাযোগ আমাদের ক্ষীণ হয়ে গেছে, তবু মাঝে মাঝে ভাবি তাঁর মতো মানুষ ছেলেবয়সেই মনের মধ্যে যে আগুনের সন্ধান পেয়েছিলেন তার কিছু বিবরণ জানতে পারলে বেশ হ'ত।

রাস্তায় মাঝে-মাঝে মিছিল দেখা ছাড়া ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজান্টস্ পার্টির কথা তখন তেমন জানতাম না। তবে পরে শুনেছি কলকাতা কংগ্রেসের সময়কার এক ঘটনা যার উল্লেখ না করে পারছি না। ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, রাধারমণ মিত্র প্রভৃতি মীরট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বন্ধুদের কাছে শোনা এই ঘটনা; সম্ভবত সেই সময় কংগ্রেসেরই একনিষ্ঠ কর্মী বলে খ্যাত বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ও এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মেহনতী মানুষের এক মিছিল নিয়ে এঁরা কংগ্রেসের প্যাণ্ডালে হাজির হন, দাবি করেন জাতীয় নেতৃত্বের সামনে শ্রমিকের বক্তব্য রাখতে দিতে হবে, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' প্রভৃতি তখনকার নেতাদের অপছন্দ অনেক আওয়াজ বজ্রকণ্ঠে উঠতে থাকে। একান্ত শৃংখলানুরাগী সুভাষচন্দ্র এভাবে কংগ্রেসের-গাম্ভীর্যকে ব্যাহত হতে দিতে প্রস্তুত নন বলে তাঁর অপ্রসন্ন ভাব জানিয়ে যান; কী কারণে যেন জওয়াহরলাল এগিয়ে আসেন অশ্বপৃষ্ঠে, মিছিলকে স্থানত্যাগের অনুরোধ কঠোরভাবে জানাতে, কিন্তু বোধ করি মনুষ্যভার বহনে বিরক্ত অশ্বটিই বিচলিত হয়ে আরোহীকে অকস্মাৎ ধরাসাৎ করে দেয় এবং জওয়াহরলাল বিড়ম্বিত হয়ে নিবৃত্ত হন! এই উভয় অর্বাচীনের তুলনায় কূটবুদ্ধিতে পারংগম মহাত্মা গান্ধী এবং স্বয়ং সভাপতি মোতিলাল নেহরু স্থির করেন যে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে, পরে যথাসময়ে শ্রমিকদের স্পর্ধার সদুত্তর দেওয়া কঠিন ব্যাপার নয়— তাই মিছিলকে প্রবেশ করতে দেওয়া হল প্রশস্ত সভাপ্রাঙ্গণে, স্বভাবসিদ্ধ শান্ত মনে শ্রমজীবী জনতা গান্ধী ও মোতিলালের সদুপদেশ শুনল, হৃষ্টমনে প্রত্যাবর্তন করল। এ ঘটনার প্রতীকী তাৎপর্য কিন্তু অবহেলার বস্তু নয়; এই প্রথম, অন্তত অল্পকালের জন্য, কংগ্রেসকে অধিকার করেছিল মেহনতী মানুষের মিছিল— অনেকে নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন এই বুঝি আসন্ন ঘটনার পূর্বচ্ছায়া, কিন্তু খেদ এই যে ঘটনার গতি ঠিক সেভাবে চলে নি।

সেই সময়ে কতটা ভেবেছিলাম মনে নেই, কিন্তু কংগ্রেসের অব্যবহিত-পূর্বে কলকাতায় যে সর্বদলীয় সম্মেলন বসেছিল স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক চেহারা ঠিক করার মতলব নিয়ে, সে-বিষয়ে পরে খুব বেশি চিন্তাকুল হতে হয়েছে। ১৯০৬ সালে 'মিণ্টো-মর্লি রিফর্মস্'-কে উপলক্ষ ক'রে হিন্দু-মুসলমানে যে ভেদাভেদকে চতুর সাম্রাজ্যবাদ তার নিজস্ব উদ্দেশ্যে পাকিয়ে তুলেছিল, তার জবাবে ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলিম চুক্তি দেশের একটা জোরদার হাতিয়ার হয়েছিল; লক্ষ্ণৌয়ে বিপিনচন্দ্র পাল মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের সামনে বক্তৃতা দিয়ে সেই সমঝোতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। ১৯২৩ থেকে গান্ধী-আন্দোলন-প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়ারূপে যে সাম্প্রদায়িক কলুষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, পরস্পরের রাজনৈতিক উপলব্ধি ও মিলিত সংগ্রামের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে সেই কলুষ নিবারণের প্রকৃষ্ট সুযোগ এসেছিল ১৯২৭-২৮ সালে। ভারতবর্ষের রাজনীতি-সচেতন মুসলমানদের তখন প্রধান দাবি ছিল তিনটি: কেন্দ্রীয় সংসদে প্রতিনিধিদের এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ; বাংলা এবং সিন্ধু প্রদেশে (যেখানে মুসলিম সংখ্যাধিক্য) ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যানুযায়ী মুসলমান সদস্যের স্থান নির্দেশ; ভারত সংঘের সংবিধানে বিভিন্ন প্রদেশের হাতে 'residuary rights' (বিবিধ ধারায় অনুল্লিখিত অধিকারসমূহ) সমর্পণ। অর্থ হল, কেন্দ্রে সংখ্যাল্পতাকে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, কিন্তু অন্তত মুসলিমপ্রধান দুটো অঞ্চলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অঙ্গীকার প্রয়োজন। পরে যখন হিন্দু-মুসলিম মনোমালিন্য নানাভাবে কটু হতে থাকে এবং অবশেষে পাকিস্তানের মতো আপাতদৃষ্টিতে অযৌক্তিক (মুসলমান প্রধানদের মুখ থেকেই 'অযৌক্তিক' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে) দাবি নিয়ে গোটা দেশকে ছারখার করার মতো দুর্দশা আমাদের সইতে হয়, তখন অবাক্ হতে হয় ভেবে যে ১৯২৮ সালে সামান্য কয়েকটা মুসলিম দাবি নিয়ে কত ব্যর্থ, বেয়াড়া বিতণ্ডা চলেছিল! মওলানা মুহম্মদ আলী একবার বিরক্ত হয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলে ওঠেন: 'তোমরা ইহুদী, তোমরা বেনিয়া; ইংরেজের সঙ্গে মিটমাটের আশায় পূর্ণ স্বাধীনতার বদলে ডোমিনিয়ন-স্টেটসে তুষ্ট হতে পারো, আর মুসলমান শতকরা ৩৩ ভাগ প্রতিনিধিত্ব চাইলে বলো যে পঁচিশের বেশি এক কড়াক্রান্তি দেওয়া হবে না!' কিছুটা পরবর্তী কথা

এসে যাচ্ছে, কিন্তু মুসলিম লীগ (যা গান্ধীযুগের মধ্যাহ্নগৌরবের যুগে অন্তর্ধান করেছিল) যখন জিন্নার মারফৎ এগারো দফা দাবি আনে, তখন তাতে মারাত্মক এমন কিছু ছিল না—(অন্তত পাকিস্তানের তুলনায়)—কিন্তু গান্ধী, জওয়াহরলাল, বল্লভভাই পাটেল, সুভাষচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কেউই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তার মোকাবিলায় সাফল্য পেলেন না। বেশ মনে পড়ছে জিন্না একবার কুপিত হয়ে বললেন যে তিনি চাইছেন এগারো দফা দাবি মেটানো হোক আর গান্ধী যেন ঢঙ করে বলছেন যে, স্বদেশী কাগজের উপর স্বদেশী কালিতে ডুবিয়ে স্বদেশী কলমে তিনি 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' সই করে দিতে রাজী কিন্তু ওটা হল নাটক, আসল প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া কিছু নয়! যাই হোক, ২৮ সালে দেখা গেল সংবিধান-ব্যাপারে দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলে পরিচিত তেজবাহাদুর সপ্রু এবং জয়াকর নানাবিধ তর্ক তুলে জল ঘুলিয়ে তুললেন এমন ভাবে যে, উভয়পক্ষের ঘোর সাম্প্রদায়িক যারা চুক্তি চায় নি, দেশকে সাম্প্রদায়িক মিলনের ভিত্তিতে লড়াইয়ে নামবার যারা বিরোধী ছিল, তাদেরই হল পোয়াবারো। ব্যাপারটা গড়িয়ে চলল এমন ভাবে যে, ইংরেজ শাসক যা চায় তাই ঘটল—প্রমাণ হল নিজেদের ঘর সামলাতে আমরা অক্ষম, ঘরোয়া ঝগড়ার নিষ্পত্তি করতে পারে একমাত্র সদাশয় ইংরেজ সরকার।

নিজে তখন অতশত নিশ্চয়ই ভাবি নি, কিন্তু কেমন যেন আমার মনে বিশেষত আমার গান্ধীভক্তিপুষ্ট সত্তায় ধাক্কা লেগে চলছিল। কংগ্রেসের ভিতরকার ঝগড়ার কথা কিছু কিছু জানতে পারতাম: একদিকে সুভাষচন্দ্র বসু, অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে সামনে রেখে যে ক্ষমতার লড়াই চলত তার পরিচয় অনেকবার পেয়েছিলাম; বিভিন্ন অগ্রগামী গোষ্ঠীও কি ভাবে এই মূলত অকিঞ্চিৎকর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িত হয়ে পড়ে তা একটু-আধটু জানতাম, নিজের দুর্বলতাও মনকে মুষড়ে দিয়েছিল—অন্তত স্বাস্থ্যপরীক্ষাতেও যে আমাকে আই.সি.এস. পরীক্ষার্থী সাজতে হয়েছিল জেনে ধিক্কার আসত, কংগ্রেসের আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যোগ না দিতে পারার পিছনেও ছিল পরাধীন জীবনের নারকীয় বিড়ম্বনা ও বিষাদ। তাই সহজ ও স্বাভাবিক উদ্দীপনা নিয়ে ১৯২৯ সালের কংগ্রেস সপ্তাহের বহুবিধ সমারোহে শামিল হতে পারি নি; নিজেকে নির্যাতন করার জন্যই অনেক

অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকার দুঃখ তখন বেছে নিয়েছি। বাস্তবিকই তখন অস্পষ্ট অথচ অধীর এবং অক্ষম দেশপ্রেম ভিন্ন অন্য কোনো গভীর ধারণা মনে দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। এজন্যই বোধ হয় ১৯২৮-২৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের কুখ্যাত অধ্যক্ষ স্টেপ্‌লটন-এর বিপক্ষে সমসাময়িক প্রমোদকুমার ঘোষালের নেতৃত্বে যে ছাত্র-আন্দোলন হয় তাতে শামিল হওয়ার মতো মনের পুঁজি তখনো আমার ছিল না। প্রমোদবাবু কিছুকাল আগে মারা গিয়েছেন; রাজনীতি জীবনে বহু ব্যর্থতা তাঁর ভাগ্যে ছিল। কিন্তু মতান্তর সত্ত্বেও ১৯৫২ থেকে বেশ কিছুকাল তাঁর সমর্থন ও সাহায্য আমার রাজনীতি-কর্মে পেয়েছি। সেদিনের অপরিণত ছাত্র-আন্দোলনে আমার মতো মানুষের স্থানও হয়তো ছিল না, কিন্তু একটু দুঃখ হয় যে অচিরে বিদেশযাত্রার ভরসায় সেদিনের পরিব্যাপ্ত আবেগে প্রাণ ভরে অংশীদারী করার সংগতি আমার ছিল না। নৈর্ব্যক্তিক প্রচেষ্টায় একটু লেগেছি, যেমন অধ্যাপক সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারকে Presidency College Register প্রণয়নে সাহায্য করে (এ-বিষয়ে আমার বাবা যে প্রচুর সহায়তা দেন, তাকে সরবরাহ করাই ছিল আমার প্রধান কাজ)। কিন্তু এ-ধরনের কাজে সময় শুধু কেটেছিল, কলেজের সমুজ্জ্বল ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান বেড়েছিল, কিন্তু মন ভরাবার মতো ব্যাপার তা ছিল না।

* * *

হুমায়ুন কবির ১৯২৮ সালে অক্স্‌ফর্ড গেল; আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আর এক বৎসর, রওনা হয়েছিলাম ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। গোটা কলেজ-জীবনে স্কলারশিপ বাবদে কিছু প্রাপ্তিযোগ নিয়মিত ছিল; এবার দু-এক জায়গায় অধ্যাপনার কাজ পাওয়া খুব দুরূহ না হলেও অচিরে বিদেশযাত্রা করতে হবে বলে সেদিকে নজর দিতে হয় নি। তবে মাস-তিনেক দুজন বি.এ. অনার্স পরীক্ষার্থীকে সাহায্য করে প্রতি মাসে দেড়শো টাকা (যা সেদিনের পক্ষে নিতান্ত অল্প নয়) রোজগার করেছিলাম। তাদের একজন হলেন বর্তমানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য এবং বিশেষ করে মারাঠা ইতিহাসের একজন অগ্রণী গবেষক, ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। তাকে কলেজ থেকেই জানতাম, রবীন্দ্র পরিষদে সে কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল, ছাত্রদের অভিনয়েও তার পারদর্শিতা সুবিদিত ছিল। সেই সুবাদে তার স্বনামধন্য

পিতা অতুলচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাগার দেখতে পেয়েছিলাম, সামান্য একটু সংস্পর্শেও আসতে পেরেছিলাম। অনেক পরে অতুলবাবু সাহিত্য-বিচারে আমার ধ্যানধারণাকে অর্বাচীন ভ্রান্তি মনে করলেও বহু বিষয়ে প্রভূত উৎসাহ ও সহায়তা দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে একটু প্রীতিও তাঁর পেয়েছি— নইলে ১৯৫২ সালের নির্বাচনের আগে পুরীতে তখনকার বি.এন.আর. হোটেলে হঠাৎ বলবেন কেন আমায়, 'তোমার ম্যানিফেস্টো আমি লিখে দেব?' যাক্ সে কথা; কিন্তু তিনমাসের গৃহশিক্ষক হয়ে প্রতুলের কোনো উপকার করতে পারি নি, হয়তো একটু অপকারই করে বসেছিলাম, কারণ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরে আমার ধরন ছিল মূল কথাটা বুঝে নিয়ে, তথ্যের ভার হালকা রেখে, শোভন সাজে বক্তব্য পেশ করে পরীক্ষককে মোহিত করা, অথচ প্রতুলের মনের ঝোঁক খুব সম্ভব ছিল সর্বত্র হাতড়ে তথ্য সংগ্রহ করার দিকে, যেজন্য সে হয়েছে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্, যা আমার সবচেয়ে অহংকারী মুহূর্তেও দাবি করতে পারি না।

পোস্টগ্রাজুয়েট 'মেস' ছেড়ে যে বন্ধুত্রয়ীকে বুড়ো বয়সেও আলাদা দেখা যায় নি, সেই বিনয় রায়, শচীন সেন, চন্দ্রশেখর লাহিড়ী ৬৭/সি, মলঙ্গা লেনে এক ছোটো, ঢেঙ্গা বাড়ির তেতলায় বাসা জমিয়েছিল, সেখানে প্রায়ই দেখা যেত পঞ্চানন চক্রবর্তী এবং অন্যান্য অনেক বন্ধুকে। কোনো আড্ডায় আমি কোথাও বোধ হয় তেমন খাপ খেতাম না কিন্তু এখানকার আড্ডায় মাঝে মাঝে জমে যেতাম— এরই স্মৃতি হিসাবে বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে একখানা 'চয়নিকা' আমাকে দিয়েছিল ঐ ত্রি-মূর্তি। আজও প্রথম দিকে পাতার কোণে শুধু '৬৭/সি' লেখা আছে প্রায় ছিন্নপত্র সেই 'চয়নিকা'-র, তবে তার গৌরব এই যে ১৯৩০ সালের মে মাসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অক্স্‌ফর্ডের এক ছাত্রসভায় আমার ঐ-'চয়নিকা' শ্রীহস্তে ধরে আবৃত্তি করেছিলেন: 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে…' কিন্তু থাক্ সে কথা, যথাস্থানে সে-বিষয়ে কিছু বলব।

বিনয়, শচীন এবং আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন দার্জিলিঙে অধ্যাপক সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, যখন ১৯২৯ সালের সম্ভবত জুন মাসে তিনি স্ত্রী এবং ছোটো ছেলেমেয়েদের হাওয়া বদলাতে নিয়ে যান। হিমালয় দর্শন প্রথম এ ভাবে তাঁর স্নেহানুকূল্যে আমার ঘটেছিল— শচীন আর বিনয় বোধ হয়

পূর্বেও দার্জিলিং দেখেছিল; এ থেকে তখনকার শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের একটা দিকও ধরতে পারা যাবে, সুরেনবাবুর পরিবারে তখন এবং পরবর্তী কালে আমরা আপনজন হয়ে গিয়েছিলাম। সুরেনবাবু ভাড়া করেছিলেন 'লাসা ভিলা', যার নির্মাতা প্রথিতযশা পর্যটক ও বিদ্বান শরৎচন্দ্র দাস দুর্গম তিব্বতে বহু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; বাড়ির মালিক তখন ছিলেন শরৎচন্দ্রের পুত্র প্রবোধকুমার যিনি হাইকোর্টে ওকালতি করতেন, সৌম্যদর্শন সজ্জন বলে সুপরিচিত ছিলেন, আমার বাবার সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৪৬-৪৭ সালের হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের সময় পার্ক সার্কাসে স্বগৃহে তিনি আততায়ীর হাতে মারা যান। তাঁরই ঘরে বসে কিছুকাল আগে আমরা ক'জন সর্বদলীয় শান্তিকমিটি পল্লীভিত্তিতে গঠন করা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম, কিন্তু নিজের এলাকা উপদ্রুত বলে সেখান থেকে সরে যেতে অস্বীকৃত মানুষটিকেই প্রাণ দিতে হল!

দার্জিলিঙে 'লাসা ভিলা' ছিল কার্ট রোডের একটু নীচে, বর্ধমান মহারাজার বিরাট বাড়ির একরকম সংলগ্ন। আমাদের প্রাক্তন সহপাঠী উদয়চাঁদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাই দেখা হয়ে যেত, দু-একবার বোধ হয় মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব-এর সামনাসামনিও পড়ে গিয়েছি। তবে যে ছবি মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে তা হল দার্জিলিঙের যত্রতত্র বহুস্থান হতে, এমন-কি, বাসগৃহের জানলা থেকে দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘা আর তার সমীপবর্তী তুষারশৃঙ্গগুলির অনন্তপার মহিমা। মেঘের রাজ্যে প্রায়ই তাকে আচ্ছন্ন থাকতে হত সন্দেহ নেই, কিন্তু অবগুণ্ঠন মোচন ঘটলে যে অপরূপ শোভার মহোৎসব আকাশে বাতাসে ফুটে উঠত, তার তুলনা কোথায়? বর্তমানের কলেবর বৃদ্ধি ও কথঞ্চিৎ শ্রী-হানি তখনো দার্জিলিঙের হয় নি; হাওয়াগাড়ির উৎপাত পথচারীর প্রায় বিন্দুমাত্র ছিল না— মোটরকারের প্রতিশব্দ হিসাবে কথাটা মনে পড়ে গেল কারণ তখনো 'হাওয়াগাড়ি' মার্কা সিগারেটের চলন ছিল, 'কাঁচি' (scissors) সিগারেটের চেয়েও তা ছিল সস্তা, যা জানতাম ও-রসে বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও। জলাপাহাড় বা 'বার্চ হিল'-এ চড়া তো ছিল 'নস্যি'; অক্‌ল্যাণ্ড রোড ধরে ঘুম গিয়ে হেঁটে ফিরে আসাও ছিল সহজ— কম বয়সে তো বটেই, আর মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও পদব্রজে ঐ পথে ঘুরেছি বিনা ক্লেশে! যাই হোক, সেবার ফেরার মুখে শিলিগুড়িতে থেমে

কালিম্পং রোড পর্যন্ত গিয়েছিলাম, তিস্তা নদীর ধার দিয়ে যে আশ্চর্য সুন্দর রেলপথ তখন ছিল (যাকে হত্যা করা স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের একটা অপরাধ মনে করি) সে পথে গিয়েছি, রূপসী প্রকৃতির উদাসীন মায়ায় মন মেতেছে— পরে একাধিকবার গেছি সেই অঞ্চলে কিন্তু অল্পবয়সের মোহাবেশ আর ঘটে নি, প্রবীণত্বের বোঝা এজন্যই ভীতিপ্রদ আর তাই বহু দেশে বহু অদ্ভুত মাধুর্য ও প্রকৃতির ব্যঞ্জনা চাক্ষুষ করে মনে হয়েছে দেখা উচিত ছিল কম বয়সে। অল্পবয়স্কদেরই যেন ভারতদর্শন করানো হয়, বিশ্বদর্শনেরও যথাসাধ্য চেষ্টা হয়, কারণ তাদেরই চোখ আর মন হল এই সুন্দরী মোহময়ী পৃথিবীর মধুরিমা আস্বাদের জন্য শুধু আকুল নয়, উপযুক্তও বটে।

আমার এক বোনের প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু জানিয়েছিলাম যে হিমালয় দর্শনে অভিভূত হয়েছি বটে কিন্তু পুরী-ওয়ালটেয়ার-দেখা আমার চোখে তখনো সমুদ্রেরই জয়। মোটামুটি এই মত আজও আমার রয়েছে, যদিও গিরিরাজ্যে বহু অনিন্দ্য শোভা চাক্ষুষ করে মাঝে মাঝে সন্দেহ জেগেছে। এর কারণ হল যে সমুদ্রকে কেমন যেন মনে হয়েছে আত্মীয়— অপরিমেয় প্রশান্তির সঙ্গে সঙ্গে তার যে অশান্তি, কূলে এসে যে চঞ্চলতা, এমন-কি, যে চাপল্য, যে ক্রীডালুতা, তা মানুষকে টানে— অন্তত আমি এখনো অনুভব করি সমুদ্র দেখলে কেমন যেন এক নৈকট্য, মন চায় ঝাঁপিয়ে পড়তে, অন্তত একটু স্পর্শ করতে, একটু বুঝি কথা বলতে। বিলাতযাত্রার সময় আমাদের পারিবারিক বন্ধু এক সাহেব পাদরীকে জাহাজে এ-ধরনের কিছু বলায় তিনি হেসে বলেন, সমুদ্রের রুদ্র রূপ তো আমি দেখি নি— না, দেখি নি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' তার বর্ণনা (যা সব বাঙালী জানে) থেকে কেমন যেন মনে থেকে গেছে রুদ্রের 'দক্ষিণ-মুখ', তার দাক্ষিণ্যের, প্রসাদের, মহত্ত্বেরও এক ছবি।

তিস্তার ধারে পাহাড়িয়া ঝরনার জলে স্নান করাটা বোধ হয় দুঃসাহসিক ছিল, কারণ ফিরবার কিছু পরে জ্বরে পড়ি— এর আগে (কিম্বা পরেও) শারীরিক অস্বাস্থ্য নিয়ে বড়ো একটা ভুগি নি। মাসকয়েক বাদে বিলাত-যাত্রার কথা, তাই বাড়ির অনেকের একটু দুশ্চিন্তা ঘটেছিল, কিন্তু পিতৃবন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের সদাপ্রফুল্ল চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সেরে উঠলাম, যোগ দিতে পারলাম বিদেশ গমনের বিবিধ আয়োজনে। আগে কখনো সাহেবী কেতায়

কাঁটা ছুরি চামচে ইত্যাদি নিয়ে খাবার টেবিলে বসার অভ্যাস ছিল না; পরনে সাহেবী কায়দা পুরো বর্জনই করে চলতাম; তখন চৌরঙ্গীতে 'ফারপো'-র রেস্তোরাঁ 'নেটিভ'-দের অগম্য ছিল, শুনতাম একা তুলসীচরণ গোস্বামী নাকি ফিনফিনে আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবী আর কোঁচানো ধুতি প'রে সেখানে যেতে পারতেন, বাকি সব দেশী লোককে সাহেবী ধড়াচূড়া না পরলে ঢুকতে দেওয়া হত না। অভিজ্ঞ লোকদের কাছে শোনা যেত যে এদেশে বানানো 'স্যুটে' বিলাতে বেমানান দেখাবে, সেখানে নতুন 'স্যুট' করাতেই হবে, তবে কিনা এখানকার কামিজের দাম কম এবং জিনিসও ভালো— বিশেষ করে সিল্ক্ শার্ট পরার শখ থাকলে বিদেশে সে-বস্তুর মূল্য মারাত্মক অথচ এদেশে এমন-কিছু নয়। তখন রেওয়াজ ছিল আটপৌরে ব্যবহারের জন্য 'ফ্ল্যানেল' পাৎলুনের; নিউ মার্কেটে চলনসই জিনিস পাওয়া যেত, কিন্তু অন্তত একটা 'স্যুট' করাবার জন্য যেতে হল 'Tom Lit' নামে এক দোকানে, যে-অদ্ভুতনামা প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক যিনি কিছুকাল বিলাতে দরজির কাজ কিছুটা নাকি শিখেছিলেন। 'টমলিট' নামকরণ হয়েছিল নিশ্চয়ই একটু আঁশটে বিলাতী গন্ধ দোকানে ঢোকাবার জন্য। আমাদের পাড়াতেই, ধর্মতলাস্ট্রীটে ছিল আর-এক দোকান যার নাম পুরোপুরি সাহেবী— ফ্রান্সিস্ মরিসন অ্যাণ্ড কোম্পানি! মালিক ছিলেন পাড়ারই এক ভদ্রলোক, বাঙালী ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম কিন্তু বিলাতে সামান্যকাল 'cutter'-এর কাজ শিখে দোকান খুলেছিলেন, শুনতাম অনেক চটকলের সাহেবদের 'অর্ডার সাপ্লাই' তিনি করতেন। তাঁর দোকানে এক-বার যাই বিলাত যাবার আগে; ভালো না বললেও দোকানে ইংরিজী ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতেন না খরিদ্দারের সঙ্গে, আমাকে বলেছিলেন: 'So, you are going *home*?' বলা বাহুল্য, 'home' অর্থ হল সাহেবদের 'হোম'; তখনকার ইংরিজী কাগজে বিজ্ঞাপন থাকত 'home sailings'-এর, বিলাতগামী জাহাজ কবে কোথা থেকে ছাড়বে ইত্যাদি, 'home weather' বললে বোঝাত কুয়াসাচ্ছন্ন, অল্প বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা হাওয়া চলছে এমন দিন! 'মিস্টার মরিসন্' প্রশ্ন করায় এমন হতভম্ব হয়েছিলাম যে জবাব দিতে পারি নি।

এই 'home weather' বাক্যটি নিয়ে যাঁর সঙ্গে তখনই আমরা হাসা-

হাসি করেছি, সেই পাকা-বিলাতফেরত পূর্বোক্ত পিতৃবন্ধু মৌলিক 'সাহেব' বিলাতযাত্রার প্রাক্‌কালে আমার ভার নিয়েছিলেন বলা চলে। বহুভাষা-বিদ এই সরল মানুষটি তাঁর জানা প্রাক্‌-প্রথম-বিশ্বযুদ্ধ ইংলণ্ডের কথা ভেবেই অনেক উপদেশ দিতেন, যার কিছুটা কাজে লাগলেও আবার কিছুটা বাতিল হয়ে গেছে দেখেছিলাম। তা হলেও অশন-বসন-ব্যাপারে তাঁর সহায়তা কম পাই নি, কিন্তু তার চেয়ে ঢের দামি সহায়তা পেয়েছি ফরাসী আর জার্মান ভাষা তাঁর কাছে শিখতে পেরে। Chardenal-কৃত দুটো *French Reader* শেষ করেছিলাম; জার্মান-টা শিখেছিলাম কিছু কম; *Hugo's German Simplified* ছিল সম্বল, Otto-র ব্যাকরণ এক খণ্ড সংগ্রহ করি কিন্তু এগুতে পারি নি। বহুকাল পরে, ১৯৫২ সালে, দিল্লীতে কথাপ্রসঙ্গে জওয়াহরলাল নেহরু যখন জিজ্ঞাসা করেছেন আমি 'linguist' কতদূর, তখন হেসে জবাব দিয়েছি যে আমার সংগতি হল 'a little French and less German'। উচ্চারণ-ব্যাপারে মৌলিক সাহেবের একান্ত নিষ্ঠা ছিল আর তা খাপ খেত আমারও মেজাজের সঙ্গে; দুটো ভাষাই ঠিক সড়গড় হয়ে ওঠে নি, কাজ চালাতে হোঁচট খেতে হত (এবং আজও খুব হয়), কিন্তু কথাগুলোর উচ্চারণ অন্তত বিদেশীর পক্ষে যথাসম্ভব সঠিক বোধ হয় করতে পারি। মৌলিক সাহেব ব্যাকরণ বিষয়েও আগ্রহী ছিলেন; রেলস্টেশনে 'ক্লোক্‌রুম' কোথায় জানতে চাইলে 'Ou est la consignée'? ('Where is the cloak-room?') না বলে 'La consignée, ou trouve-t-elle?' ('Where does the cloak-room find itself?') বলাই যে 'ইডিয়ম'-সংগত, তা তিনি আমাকে বোঝাতেন! তাঁরই কল্যাণে আমি যে শুধু একা ফ্রান্স বা জার্মানীতে মোটামুটি স্বচ্ছন্দে ছাত্রাবস্থায় ঘুরতে পেরেছি তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে রসগ্রহণ করতে পেরেছি আনাতোল ফ্র্যাঁসের *Le Livre de mon Ami* (*My Friend's Book*) কিম্বা হাইনে-র জার্মান গীতিকবিতার মতো বস্তু মূলে পড়তে গিয়ে। ১৯৭২ সালে অকস্মাৎ পশ্চিম-আফ্রিকার কামেরুন দেশে ইণ্টারপার্লামেণ্টারী সম্মেলনে গিয়ে ফরাসীর শরণ নিতে পেরেছি কিছু পরিমাণে, ঐ বৎসরই রোম শহরে ভিয়েৎনাম-বিষয়ক সভায় ছোট্ট বক্তৃতা করতে পেরেছি ফরাসীতে— এমন-কিছু ব্যাপার এগুলো নয়, কিন্তু মৌলিক সাহেবের শিক্ষা বিনা এটুকুও সম্ভব হত না।

আগেই বলেছি, বাড়ির বৈঠকখানায় পিতৃবন্ধুদের নিয়মিত সমাগম হত —মাস্টারমশাই (নিবারণ মুখোপাধ্যায়), মৌলিক সাহেব, 'সৎসঙ্গে'র কর্ণধার প্রভাস মুখোপাধ্যায় (যাঁর একটা M.R.A.S. উপাধি নিয়ে নিদারুণ দুর্বলতা ছিল), কবি মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী, এঁরা প্রায় ছিলেন 'habitué', প্রথম দু'জন তো কখনো অনুপস্থিত থাকতেন না। প্রায়ই আসতেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ— মাঝে মাঝে আসতেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মৃণালকান্তি বসু-র মতো সাংবাদিক। নামের তালিকা বাড়িয়ে কাজ নেই, কিন্তু সেদিনের আড্ডায় প্রায়ই যে অট্টহাস্য উঠত তা যেন আজকালকার বাঙালী জীবন থেকে অন্তর্ধান করেছে— গালগল্প করার মতো লোক কেউ তাঁরা তেমন ছিলেন না, হাসিঠাট্টা মস্করা যাকে বলে তাও সেখানে তেমন চলত না, কথাবার্তা বেশির ভাগ হত নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার নিয়ে, কিন্তু তা থেকেও প্রবল হাসির খোরাক আমাদের জ্যেষ্ঠেরা জোগাড় করতে পারতেন। আমার দাদুর কাছে শুনেছিলাম রাজনারায়ণ বসুর হাসি ছিল শিশুর মতো সরল, প্রাণখোলা, প্রবল— আমাদের পূর্বজেরা তারই কিছু উত্তরাধিকারসূত্রে বোধ হয় পেয়েছিলেন।

বিলাত থেকে বাবাকে লিখলেন তাঁর বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক (তখন India Council-এর ভারতীয় সদস্য) যে অক্সফর্ডে নামজাদা কোনো কলেজে আমার ভর্তির চেষ্টা তিনি করবেন— পারেন নি, কারণ ভারতীয় High Commission সাধারণত এদেশের ছাত্রদের সাহায্য না করে উলটো কর্মটিই করে বসত, তাদেব মাথাব্যথা ছিল শুধু 'I.C.S. probationer'দের জন্য যথাসম্ভব 'ভালো' কলেজে জায়গা করা নিয়ে, তাও সব সময় পেরে উঠত না। লোকমুখে শুনি, স্বাধীনতার পরেও এদেশের হাই কমিশন ভারতীয় ছাত্রদের সহায় একেবারেই নয়। সে যাই হোক, অক্সফর্ড-কেম্‌ব্রিজে কলেজের মধ্যে তারতম্য কিছু-পরিমাণে থাকলেও 'lectures' যা হয় তা সকলের জন্য— শুধু 'টিউটোরিয়ল'-এর ব্যবস্থা করে কলেজ। তারতম্য তাই খুব একটা নিদারুণ কিছু নয়, তবে ঐতিহ্যের দিক থেকে প্রভেদ যা আছে সেটা অল্প নয় এবং মাঝে মাঝে কলেজের খ্যাতি ছাত্রের পক্ষেও নানাভাবে অনুকূল হয়ে থাকে। এ-বিষয়ে এখন থাক্‌, হয়তো পরে কিছু বলতে হতে

পারে। ইতিমধ্যে আমার বিলাতযাত্রা নিয়ে আমাদের বৈঠকখানাতেও জল্পনাকল্পনা কিছু যে চলছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

দেশ ছাড়ার আগে দেখতাম আমার মা কখন রাত্রে আমার পাশে এসে শুয়েছেন, ঘুম ভেঙে উঠে দেখতাম তাঁকে, সারা গায়ে তাঁর স্নেহস্পর্শ লেগে থাকত। আমার মা কখনো খুব বেশি কথা বলতেন না, মনের অনুভূতি মনেই তাঁর থাকত। সেপ্টেম্বরের যে সন্ধ্যায় বোম্বাই মেলে আমি রওনা হই, সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়েছিল, স্টেশনে যাওয়াই একটু দুরূহ মনে হয়েছিল —মা যান নি, বাড়ি থেকেই বিদায় দিয়েছিলেন, চোখের জল ফেলেন নি, শুধু ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় নয়, এমনি অশ্রুকে রোধ করে রেখেছিলেন। বাবা, ভাই বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব মিলে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ছোটোখাটো ভিড় জমেছিল— হেদায়েতুল্লাহ্ আর আমি একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা জুড়ে ছিলাম, ফুলে ঘর ভরে গিয়েছিল, সঙ্গীর তুলনায় আমি শক্ত ছিলাম, কারণ কোমলহৃদয় হেদায়েতুল্লাহ্ অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। আমার বন্ধুদের মধ্যে বিনয় রায় (যিনি পরে কর্পোরেশন কাউন্সিলর হয়েছেন, ব্যবসাবাণিজ্যে সাফল্য লাভ করেছেন) নাকি ট্রেন ছাড়ার পর সর্বসমক্ষে কেঁদে ফেলেছিলেন— এ সবই তুচ্ছ কথা জানি, কিন্তু অন্তত তখনকার বাঙালী জীবনের ছবির এটাও একটা অঙ্গ। বিদেশযাত্রা নিয়ে চিত্তাবেগ আজকের দিনে প্রায় হাস্যার্হ, কিন্তু আমরা যখন ছাত্র তখনো কেউ বিদেশ গেলে তাকে বিদায় সম্বর্ধনা না জানিয়ে ছাড়া হত না, একসঙ্গে বসে ফোটোগ্রাফ তোলা হত (আমার পুরোনো স্কুলবন্ধুদের সঙ্গে একটি ফোটোগ্রাফে বন্ধুর বন্ধু হিসাবে ছিলেন উত্তরকালে যশস্বী, কিন্তু তখন অপরিচিত তরুণ গায়ক পঙ্কজকুমার মল্লিক) এবং 'জয়যাত্রায় যাও গো' কিম্বা 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাবার আগে' জাতীয় রবীন্দ্র-রচনা গাওয়া হত।

বোম্বাইয়ে একরাত কাটিয়ে, হোটেলবাসের প্রথম আস্বাদ পেয়ে, দোতলা ট্রামে ঘুরে, তখনো যে কলকাতা বোম্বাইয়ের চেয়ে সুদৃশ্য না হয়েও সরেশ শহর এই অভিজ্ঞতায় তুষ্ট হয়ে, পরদিন Ballard pier-এ অপেক্ষমান সেকালের মস্ত জাহাজ (১৬,০০০ টন) "রাওয়ালপিণ্ডি"-তে দু'জনে আমরা চড়লাম। ট্রেন থেকেই বাবা পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন ব্যাপ্‌টিস্ট পাদরী

হার্বার্ট অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে; তিনি সস্ত্রীক দেশে ফিরছিলেন, সরলচিত্ত ভারতহিতৈষী বলেই তাঁর খ্যাতি ছিল, এদেশের রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতিও ছিল সুবিদিত—জাহাজে খাবার টেবিলে তাঁরাই স্থির করে দিলেন আমার স্থান, তাঁদের দু'জনের ঠিক মাঝখানে, উভয়ে আমার অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালেন বললে অত্যুক্তি হয় না, যাকে বলে 'table manners' তা আয়ত্ত করতে হল তাঁদের স্নিগ্ধ লক্ষ্যের ছায়ায়। জাহাজ ছিল সে যুগে বিখ্যাত P. & O. কোম্পানির—সরকারী বৃত্তিভোগী হিসাবে অন্য, যেমন ইতালিয়ান, জাহাজে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাই হোক্, সময় হলে জাহাজ ছাড়ল, 'All friends ashore' বলে বিদায়-সম্ভাষকদের ফিরিয়ে দেওয়া হল, রেলিং ধরে আমরা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলাম ক্রমশ ভারতভূমির দিগ্‌বলয় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, হয়তো বুকটা খচ্‌ করে উঠেছিল যখন আর দেশের চেহারা দেখা গেল না। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী জীবনের ঘটনাবিরলতা অপরিচিত পরিবেশে কী আকার নেয় তা জানার কোনো উপায় তখন ছিল না। ইংরেজ জাহাজে, শ্বেতাঙ্গের ভিড়ে, প্রচুর আরাম অথচ কিঞ্চিৎ অস্বস্তি নিয়ে আপাতত চললাম। মেঘান্তরিত রৌদ্রে অর্ধ-আচ্ছন্ন আরব সমুদ্রের দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল সে নির্বিকার; পুরীর সমুদ্রতটের ক্রীড়াচঞ্চল আন্দোলনের মতো কোনো লক্ষণ কোথাও নেই; শুধু মাঝে মাঝে বইছে মৃদু, ঈষৎ-উত্তপ্ত বায়ু যা যেন বলে যে শান্তি কোথাও নেই, কিঞ্চিৎ উপশমের চেয়ে অন্য কোনো আশা সংসারে নেই—হঠাৎ যেন ভেবেছিলাম আমার দেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকলেই বুঝি ভালো ছিল।

১২

'পি-অ্যাণ্ড-ও' জাহাজ ছিল সে যুগে ইংরেজ রাজত্বেরই ভাসমান এক খণ্ড —গোটা প্রাচ্যে ইংরেজের ছড়ানো সাম্রাজ্যের চেহারা ফুটে থাকত অষ্ট প্রহর। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সবাই হয় ছুটিতে ঘরমুখো সরকারী চাকুরিয়া, নয়তো ব্রিটিশ 'Raj'-এর কল্যাণে মোটা মুনাফার ব্যবসাবাণিজ্য আর তার আনুষঙ্গিক ব্যাপারে ব্যস্ত—এদের মধ্যে স্তরেরও হরেক তারতম্য (মন্‌সবদার থেকে বরকন্দাজ, 'ডাইরেকটর' থেকে 'অ্যাসিস্টাণ্ট্' ইত্যাদি) যা প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে কঠোর গণ্ডীভেদে পরিষ্কার দেখা যেত। অস্ট্রেলিয়া, চীন, মলয়, ব্রহ্ম, সিংহল, ভারতবর্ষ থেকে যাত্রী এবং সাপ্তাহিক ডাক নিয়ে জাহাজ পাড়ি দিত—সাহেবমেমের ভিড়ে কৃষ্ণাঙ্গেরা যেন অবাঞ্ছিত ও অবান্তর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রোমে যুদ্ধজয়ের পর মিছিলে পরাজিত বন্দীদের মতো সাম্রাজ্যদর্পাগ্নির ইন্ধনও বটে। খালাসীদের মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা কম ছিল না; মাঝে মাঝে দেখা যেত জাহাজের প্রতিটি ইঞ্চি পরিষ্কার করে রাখার কাজে যারা প্রবৃত্ত থাকত তাদের। তবে সর্বদা মোলাকাৎ হত ক্যাবিনে এবং খাবার ঘরে 'গোয়ানীজ' খানসামাদের সঙ্গে—দ্রৌপদীকে হার-মানানো রাঁধুনী নাকি তারা, অথচ 'বেঙ্গল', 'মাদ্রাজ', 'বোম্বাই', 'সিঙ্গাপুর', নাম দিয়ে বিচিত্র মাংসের 'কারি' যা বানাত, তার স্বাদে 'আহা মরি' বলার মতো কিছু মিলত না, বরং মনে হত একই বস্তু ভিন্ন নামে পরিবেশন করে লোক ঠকাচ্ছে। যাত্রীদের এরা অবশ্য কিছুটা তুষ্ট রাখার চেষ্টা করত; 'ডেক স্ট্যুয়ার্ড' খাস গোরা হয়েও 'Sir' বলতে ত্রুটি করত না যাত্রাশেষে বখ্‌শিসের প্রত্যাশায়, যদিও গোরা এবং কালা যাত্রীদের প্রতি ব্যবহারে তফাৎ সহজেই লক্ষ্য করা যেত। মস্ত 'ডাইনিং সেলুন'-এ দেখা গেল কিছুটা স্বাভাবিকভাবে আর কিছুটা অলিখিত আইনের জোরে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গদের বসবার জায়গা পৃথক হয়ে যাচ্ছে; আমাদের টেবিলে অ্যাণ্ডারসন-দম্পতির অবস্থান প্রায় যেন ব্যতিক্রম বলে লক্ষিত হল। 'গোয়ানীজ' খানসামাদের হাবভাব থেকেও মনে হত যে

তারা— হয়তো ব্যতিক্রম বাদে— নিজেদের পর্তুগীজ-বংশাবতংস ভেবে নিছক 'নেটিভ'-দের একটু যেন কৃপা করার ভাব দেখায়।

ভারতীয় দলে ছিল কিছু 'আই.সি.এস. প্রোবেশনার'— যারা এদেশে পরীক্ষা পাস করে বিলিতী শিক্ষানবিশী করতে যাচ্ছিল। সেখানে তাদের মেজেঘষে সাহেবী কেতাদুরস্ত করে 'নেটিভ'-শাসনের উপযুক্ত বানাবার জন্য প্রধানত অক্স্‌ফর্ড ও কেম্‌ব্রিজে জায়গা ঠিক করা ছিল। কয়েকবার পি.অ্যাণ্ড.ও. ভ্রমণে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যারা পরবর্তী জীবনে ভারত এবং পাকিস্তানের নামজাদা আমলা। আবার বলব, ব্যতিক্রম বাদে এরা যেন 'সাহেব' বনে যাওয়ার পথে এগিয়ে যেতে বেশ পুলকিত বোধ করছে মনে হত— হেদায়েতুল্লাহ্‌ আর আমি তাতে একটু রুষ্ট হতাম, অস্বস্তি পেতাম। জাতিবৈর আমাদের মনে ছিল, তবে খুব জর্জর বোধ করি নি প্রধানত পাদরী অ্যাণ্ডারসনের কল্যাণে। শুধু খাবার টেবিলে খাঁটি ইংরেজ কায়দা তিনি শেখান নি, সাধারণ আচরণে মনের প্রসার সাধনে সাহায্য করেছিলেন। কিছুতেই আর দশবছরের বেশি দেরি হওয়া উচিত নয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘটতে, এ কথা (১৯২৯ সালে) একদিন জাহাজের 'ডেক্‌'-এ বেড়াবার সময় অত্যন্ত সহজ ও দরদীভাবে বলে সুখী করেছিলেন— সমরসেট ম'ম-এর গল্প পড়ে পরিচিত মনে হয় এমন বহু সাম্রাজ্যপ্রান্তবাসী সাহেবের ভিড়ে দীর্ঘদেহ এক ব্যক্তিকে পিছনে হাত জুড়ে দৃপ্তভঙ্গীতে পায়চারি করতে দেখে একরাত্রে আমায় বললেন, 'দেখো, ঐ লোকটা যেন ধরাকে সরা দেখে, কিন্তু খুব সম্ভব ওর মনটা নিরেট, পেটে বোম মারলেও একটা 'আইডিয়া' বেরুবে না!' এই অ্যাণ্ডারসন-পরিবারের বাড়িতে আমি থেকেছি, মাঝারি শ্রেণীর ইংরেজ সংসারের বহু সদ্‌গুণ চাক্ষুষ করেছি, দেখেছি জীবনযাত্রায় তারা পরিশ্রমী ও আত্মনির্ভর, চিত্তের ব্যাপ্তি থেকে প্রায়শ বঞ্চিত হয়েও তারা সচরাচর সদ্‌বুদ্ধিপরায়ণ, যদিও সাম্রাজ্যগরিমার সম্মোহনে বারবার সানন্দে প্রতারিত হওয়া তাদের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কিছু নয়। মনে পড়ে যাচ্ছে যে স্বয়ং কার্ল মার্কস ইংরেজ শ্রমিকশ্রেণীর কাছে প্রচুর প্রত্যাশা রেখে বারবার বিড়ম্বিত হওয়া সত্ত্বেও কখনো তাদের কতকগুলো সমুজ্জ্বল গুণের তারিফ করতেও সংকুচিত হতেন না।

আজকাল বিমানযাত্রা এত বেশি প্রচলিত যে একটু অবাক্‌ হতে হয়

জাহাজে চড়ে বিদেশগমনের রেওয়াজ এমন চট্ করে প্রায় বাতিল হল দেখে (অবশ্য সময় সংক্ষেপ একটা মস্ত যুক্তি— আজ রওনা হয়ে কাল পৌঁছতে পারি দুনিয়ার সর্বত্র— কিন্তু অধুনাতন জীবনে অবসর কি বাস্তবিকই অপসৃত হতে চলেছে? দিল্লীর সংসদভবনে রাজ্যসভা থেকে লোকসভা কক্ষে দ্রুতপদচারী, সদাব্যস্ত জওয়াহরলাল নেহরুর পথ রোধ করে একবার ইংরেজ কবির ভাষায় বলেছিলাম : What is this life, if full of care, we have no time to stand and stare?' বাস্তবিকই যেন একটু দাঁড়িয়ে চোখ ভালো করে মেলে দেখার সময় আজ কারো নেই— অস্ট্রেলিয়াতে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী কনফারেন্সে দেখেছি বৃদ্ধ অ্যাট্‌লী সোজা লণ্ডন থেকে উড়ে এসে প্রায় মুহ্যমান, কিন্তু সময়ের তো প্রচুর সাশ্রয় হয়েছিল জাহাজে না চড়ে বিমানে আসায়। রেল বা জাহাজের বদলে হুট করে প্লেনে গন্তব্য স্থানে হাজির হওয়ার অভ্যাস তো আমাদেরও অনেকের আজকাল হতে পারছে। বিমান থেকে দর্শনীয় বহু বস্তু অবশ্যই আছে; সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়ের আশ্চর্য মহিমা, মেঘের রাজ্য ভেদ করে উঠে উপর থেকে তার কখনো স্থির কখনো চঞ্চল, কখনো ক্রুদ্ধ গম্ভীর কখনো হাসিভরা চেহারার মায়া, প্রকাণ্ড এক ফুটন্ত ফুলের মতো সোজা হাত-বরাবর চাঁদের অবস্থান, হিমালয় ডিঙিয়ে বরফমোড়া গিরিশৃঙ্গের মিছিল আর পামীরের অভ্রংলিহ শিখর নীরবতা এবং আরো কত অবিস্মরণীয় আস্বাদ দিয়েছে বিমান-ভ্রমণ— তার নিন্দা তো করতে পারি না কিছুতেই। কিন্তু জাহাজে আর ট্রেনে, তুলনায় মন্থরগতিতে, দেশ দেখার পক্ষেও অনেক কিছু বলার আছে। সূর্যাস্তের আগে সমুদ্রের বুকে যেন স্বর্গে যাবার আলো দিয়ে আঁকা সিঁড়ি তো অন্য কোথাও দেখি নি। বিলাত-যাত্রাকালে আরো চোখে না পড়ে পারত না জাহাজে খাওয়া থেকে গল্প, খেলা, সাঁতার, পায়চারি ইত্যাদি একত্র বিচরণের ফলে বেশ কয়েকজন সদ্যপরিচিত স্ত্রীপুরুষের যুগল বিহার— জ্যোৎস্নারাত্রে একেবারে ওপরকার 'ডেক্'-এ (যেখানে 'লাইফ বোট'গুলো থাকত) উঠলে আমাদের মতো বেরসিককে তো অপ্রতিভই হয়ে পড়তে হত! প্লেনেও বুঝি কোনো কোনো বীরপুরুষ হৃদয় জয়ের অভ্যাস চালিয়ে যান, কিন্তু মোহিনী পরিচারিকা বা সহযাত্রিনীর অভাব না হলেও সময় ও সুযোগ যে একেবারে সীমিত।

উপরোক্ত রসে বঞ্চিত আমাদের মতো যারা তাদেরও সময় জাহাজে একরকম মন্দ কাটত না। একটু সইয়ে নিতে পারলে খাওয়া হত প্রচুর এবং নিদারুণ ভালো। প্রথম কয়েকদিন সমুদ্রের দোলানিতে বমি-বমি ভাব কাটিয়ে উঠলে কেবলই জলরাশির একঘেয়ে সান্নিধ্যে বিরক্ত অনুভব করা ছাড়া অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য অস্বস্তি ছিল না। তৎকালীন ইংরেজ কায়দার কতকগুলো ক্লান্তিকর দৃষ্টান্তে কষ্ট পেলে অবশ্য ভিন্ন কথা— আরব সমুদ্রে, এমন-কি, লোহিত সাগরের প্রচণ্ড গরমেও ডাইনিং সেলুনে শার্টের ওপর কোট চাপিয়ে যেতে হত, সুয়েজ খাল পার হবার আগে পর্যন্ত সাম্রাজ্যের শ্বেতাঙ্গ পাহারাদারদের মেজাজে অশ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে একটু যেন কৃপামিশ্রিত প্রতিকূলতা থাকত, তবে বরফ গলার মতো ভূমধ্যসাগরে পৌঁছে (হয়তো বা মনের আনন্দে) সেই মেজাজ শরীফ হয়ে উঠত, অবাঞ্ছিতদের সম্বন্ধে একটু সহনীয়তার আভাস তখন দেখা যেত! আমাদের একটা নিজস্ব গোষ্ঠীও ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছিল— যাতে একদিন যোগ দিল অক্স্‌ফর্ডে খেলাধুলায় সেরা কলেজ Brasenose-এ সদ্য ভর্তি-হওয়া ছাত্র অ্যাটকিন্‌স, যে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'-পাঠরত আমাকে দেখে পাশে বসে শুনতে চাইল কবিতার ধ্বনি এবং বলে উঠল এ যে গানের মতো শোনায়! অ্যাটকিন্‌সের বাবা পঞ্জাবে পাদরী ছিলেন ; কথায় কথায় সে বলল অমৃতসর বাজারে বিপুলদেহ শিখদের সে দেখেছে, আর ভেবেছে যে ইংরেজ নিশ্চয়ই চালাকির জোরে জিতেছিল— নইলে সম্মুখসমরে এদের সঙ্গে পেরে উঠল কেমন করে?

যাবার পথে আমরা এডেন দেখলাম— তখনো অনেক জাহাজ কয়লায় চলত ; দেখা গেল বন্দর থেকে প্রচুর কয়লা বোঝাই হচ্ছে। শুকনো, ন্যাড়া, পাহাড়ে জায়গাটা খুব মনোরম মনে হল না। শোনা গেল শহরে ঢুকলে চোর-ছ্যাঁচড়ের পাল্লায় পড়তে হতে পারে। সুয়েজ খালের মুখে পৌঁছাবার আগে লোহিতসাগরের গরম মনে করে রাখবার মতো ; দু'ধারে মরুভূমি, তাই দিনে দারুণ গরম আর রাত্রে জাহাজ জলে ভাসমান বলে মরু অঞ্চলের শৈত্য থেকেও বঞ্চিত। পকেট ভারি থাকলে সকালে সুয়েজ খালের মুখে জাহাজ ছেড়ে মোটরে পিরামিড দেখে এসে পোর্ট সৈয়দে রাত্রে জাহাজ ধরা যেত, কিন্তু পকেটের অবস্থা তেমন ছিল না বলাই বাহুল্য। সারাদিন সুয়েজ খালের দুদিকের একঘেয়ে দৃশ্য দেখা গেল। সন্ধ্যার মুখে পোর্ট সৈয়দে

পৌঁছে একটু শহর ঘোরা আর হরেকরকম আড়কাটি-জাতীয় জীবের উপদ্রবে জাহাজে ফিরে এসে নিশ্বাস ফেলা গেল। বেশ কয়েক ঘণ্টা জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল, দেখলাম খাল-নির্মাতা ফরাসী ইঞ্জিনিয়র দ্য লেসেপস্‌-এর প্রস্তর মূর্তি যেন ভূমধ্যসাগরকূলে দাঁড়িয়ে পূর্ব-পশ্চিমে গতায়াতের প্রকাণ্ড হাতছানির মতো বিরাজ করছে।

ছোট্ট দ্বীপ মল্‌টায় জাহাজ থামল; সেখানে ইংরেজ রাজত্ব, ইংরিজী ভাষা চালু, মানুষের চেহারা অবশ্য ইতালিয়ান ধাঁচের, স্বভাবও ইংরেজ থেকে আলাদা। বোটে করে পারে যাওয়া গেল, উঁচু নীচু বাঁধানো রাস্তায় ফীটন-জাতীয় যানে চড়ে শহর দেখলাম, ঐতিহ্য-ভারাক্রান্ত না হলেও মোটামুটি দক্ষিণ ইয়োরোপের মনোরম একটা জায়গা— এবং সবচেয়ে জরুরি কথা, ইংরেজের মস্ত নৌঘাঁটি। কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি দেখলাম দূর হতে, তারপর স্পেনের কূল বেয়ে জাহাজ থামল ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে। এখানে জাহাজ ছেড়ে রেল চাপা এবং প্যারিস হয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হলে চব্বিশঘণ্টায় বিলাত পৌঁছানো যেত, কিন্তু আমাদের টিকিট ছিল খোদ্‌ লণ্ডন পর্যন্ত। অনেক যাত্রী নেমে গেল, একটু ভ্রমণে অভিজ্ঞ যারা তারা তো বটেই, কিন্তু তখনো আনাড়ী আমরা থেকে গেলাম। অবশ্য মার্সাই শহর দেখলাম, ফ্রান্সের দ্বিতীয় নগরী হিসাবে তার গুরুত্ব কম নয়। চট করে দ্রষ্টব্য স্থান-গুলো ঘুরে আসা গেল, সামান্য ফরাসী জ্ঞান একটু কাজে লাগল, মোপা-সাঁ-র গল্প পড়া মনে শহরের একটা ছবি ছিল, কতটা মিলল জানি না। আবার চলল জাহাজ, স্পেন প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে থামল ইংরেজের প্রবল ঘাঁটি জিব্রলটারে— দেখলাম দুর্গ যা ইয়োরোপ আর আফ্রিকার মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে, বিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষায় ইংরেজের আর-এক কেরামতি চাক্ষুষ করলাম। অতলান্তিক মহাসাগরে পড়ার আগে পার হতে হল 'বিস্‌কে' উপসাগর যার দুর্নাম হল যে সমুদ্র সেখানে প্রায় সর্বদা উত্তাল, কিন্তু আমাদের ভাগ্য ছিল প্রসন্ন, মার্সাইয়ের দক্ষিণে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত দোদুল্যমানতা ভিন্ন অপর কোনো অভিযোগের কারণ ঘটে নি। জাহাজে অ্যাণ্ডারসন আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন গ্রীক ইতিহাসের পণ্ডিত T. R. Glover-এর সঙ্গে; তাঁর বই দেশে পড়েছিলাম। কেম্‌ব্রিজের লোক, অক্স্‌ফর্ড-কেম্‌ব্রিজ রেষারেষি বিষয়ে কিছু মজাদার কথা বললেন। সময়

এবার যেন কাটছিল না, কিন্তু সব-কিছুরই সমাপ্তি আছে— ক্রমশ ইংলিশ চ্যানেলে জাহাজ ঢুকল, পোর্টসমথ্ বন্দরে একবার থেমে পৌঁছাল গিয়ে লণ্ডন থেকে মাইল ত্রিশ দূরে টিল্‌বরি ডক্‌স্-এ। সেখানে স্থলে অবতরণ এবং রেলে অল্পক্ষণের মধ্যে হাজির হওয়া লণ্ডনে 'য়ুস্টন্' কিম্বা সেণ্ট প্যাক্রাস্ স্টেশনে। টিলবরিতেই হুমায়ুন এবং সুশীল (দে) আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল; অনভ্যস্ত পথিকও তাই পথ ভোলার কোনো অছিলা পেল না, অজানা মুল্লুকে বন্ধুর মুখ দেখে খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তেই লণ্ডনে পদার্পণ ঘটল।

* * *

হেদায়েতুল্লাহ্ লণ্ডনে পড়বেন, তাই গেলেন ক্রম্‌ওয়েল রোডের বিখ্যাত ভারতীয় ছাত্রাবাসে, আর আমাকে হুমায়ুনেরা কয়েকদিনের জন্য তুলল লণ্ডনের কেন্দ্রস্থলে রাসেল স্কোয়ারের কাছে এক বাড়িতে যেখানে শোবার একটা ঘর এবং প্রাতরাশের জন্য দিতে হত রোজ পাঁচ শিলিং— যা আজ অবশ্য বিলাতে অভাবনীয় ব্যাপার। এলাকাটা গরিব, কিন্তু আমাদের দেশের তুলনায় পরিষ্কার, কাছেই টিউব স্টেশন, সুতরাং ভূগর্ভ রেলে চড়া আর চলন্ত সিঁড়িতে ওঠানামার অভিজ্ঞতা ঘটল, পিকাডিলিকে কেন্দ্র করে কয়েকটা জায়গা চট করে দেখে নেওয়াও শক্ত হল না। ৫০ নং হাণ্টার স্ট্রীট, ডবলু-সি ১, যে-বাড়িতে ছিলাম, সেটি ১৯৬৬ সালে লণ্ডনের থাকার সময় দেখলাম যুদ্ধকালীন বোমাবর্ষণে অদৃশ্য হয়েছে, গোটা এলাকার চেহারা একেবারে না হলেও অনেকটা বদ্‌লেছে, কাছাকাছি অবস্থিত লণ্ডন ইউনি-ভার্সিটির বহুতল সৌধ একালের কায়দায় আকাশ ঠেলে উঠেছে— তবে আশ্বস্ত বোধ করলাম যে ব্রিটিশ মিউজিয়ম এক রকম অক্ষত অবস্থায় তার মোটা থামে ঘেরা ভারিক্কি চেহারা বজায় রেখেছে। লণ্ডনে প্রথম ক'দিন অস্বস্তি লেগেছিল, অক্টোবরের আবহাওয়া ছিল অপ্রসন্ন, কুয়াসার ঘোমটা-টানা শহরের চেহারায় মাদকতা ছিল না, রাস্তাঘাট মনে হত কলকাতার চেয়ে সামান্য একটু সরেশ বই কিছু নয়, তার বিরাটত্বে মুগ্ধ হয়ে ক্রমশ আত্মীয় বনে যাওয়া কখনো আমার সম্ভব হয় নি। বহুবার লণ্ডন যাতায়াত করতে হয়েছে, কিন্তু মনে হত সর্বদাই যে সেখানে আমার স্থান নেই কোথাও।

প্রথম দিকে যেতে হল ভারতীয় হাই কমিশনরের অফিসে এবং যথারীতি

বাহ্যিক সৌজন্য ভিন্ন অন্য কোনো উপকার বা সহায়তা সেখানে মিলল না। চট করে ন্যাশনাল গ্যালারি ইত্যাদি দর্শনীয় কতকগুলো জায়গা দেখে যেতে হয়েছিল অক্স্‌ফর্ডে, কিন্তু আমার মুরুব্বি হুমায়ুন কী একটা দরকারে গেল কেম্‌ব্রিজে, আমাকেও টেনে নিয়ে গেল সঙ্গে— তাই অক্স্‌ফর্ডের পূর্বে কেম্‌ব্রিজ দর্শন আমার ঘটেছিল। মনে আছে যাতায়াত করেছিলাম বাস-এ, এবং কলকাতা থেকে যে ওভারকোট নিয়েছিলাম সেটি ভুলে গাড়িতেই ছেড়ে আসি এবং পরে অফিসে খোঁজ নিতেই ফেরত পাই— বুঝি যে একেবারে ফালতু চুরি এদেশে তেমন নেই। কোটটি অবশ্য জ্যাকাবিয়া সাহেবের উপদেশ মতো কিছু পরে দাতব্য করেছিলাম— কারণ সেটা স্বদেশে চলনসই হলেও সেদেশে যেন একটু বেমানান। 'টম্‌ লিট'-এর বানানো স্যুট্‌টাও কয়েকমাস পরে বর্জন করাই শ্রেয় মনে করা গেল। লণ্ডনে বোধ হয় প্রথম-দিকেই গিয়েছিলাম গাওয়ার স্ট্রীটের বিখ্যাত ভারতীয় ছাত্রাবাসে— কিন্তু অভিজ্ঞতাটা সুখকর হয় নি। মনে হয়েছিল সেখানে হল্লা বড্ড বেশি, খাবার ঘরে মশলার গন্ধ অত্যন্ত তীব্র এবং অনেকেরই খাওয়ার কায়দা আমার জাহাজে-শেখা চোখে এবং সর্বব্যাপারে ভব্যতার বিচারে ক্লেশকর। মানুষগুলিও কেমন যেন 'না ঘরকা না ঘাটকা'-ধরনের। হুমায়ুন বোধহয় নিয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ মিউজিয়মের খুব কাছে স্টুডেণ্ট্‌স ক্রিশ্চান মুভ্‌মেণ্টের আস্তানায়— সেখানে নানাদেশের ছাত্রছাত্রীর সমাগম, ভিড অল্প এবং পরিস্থিতি বান্ধব (এবং উদ্যোগী ও ভাগ্যবানের ক্ষেত্রে বান্ধবী) সংগ্রহের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু আমরা ছুটলাম কেম্‌ব্রিজে, দেখলাম সেখানকার কয়েকটা নামজাদা কলেজ, শীর্ণকায়া 'ক্যাম'-নদী যেগুলির পিছন দিয়ে বয়ে চলেছে, আর সৌন্দর্যের জাঁক করে সব কলেজ তার সামনের চেহারা নিয়ে নয়, বলে দেখো আমাদের 'backs'! পরে আবার কেম্‌ব্রিজ গিয়েছি, কিন্তু সেবার দেখেছিলাম ট্রিনিটি কিম্বা কিংস্‌ কলেজের প্রাঙ্গণ ধীরে পার হচ্ছেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী জে.জে.টম্‌সন্‌। শান্ত, সৌম্য, বয়োবৃদ্ধ মূর্তি। কিন্তু একটু চমক লেগেছিল, বুঝেছিলাম এসেছি এমন এলাকায় যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আটশো বছরের ইতিহাস যেন জীবন্ত, তার একটু স্পর্শ নিয়ে যেতে পারা হল সৌভাগ্য।

অক্স্‌ফর্ডে আমার কলেজ ছিল সেণ্ট্‌ ক্যাথারিন্‌স্‌, যার আভিজাত্য

কম এবং যেখানে বিদেশী ছাত্রসংখ্যা প্রায় সব চেয়ে বেশি। অধিকাংশ কলেজের মতো আবাসিক ব্যবস্থা এর ছিল না, পরে যা হয়েছে তা বুঝি সামান্যই— তাই প্রথম থেকে বহু ছাত্রের সঙ্গে এক বিরাট, প্রাচীন, মধ্যযুগীয় বাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা হয় নি। থাকতে হয়েছিল ইউনিভার্সিটি থেকে 'লাইসেন্স্'-দেওয়া এবং ইউনিভার্সিটির নিয়মকানুন মানতে প্রতিশ্রুত lodgings-এ, যেটা আমার ক্ষেত্রে হল ৪নং সুইনবার্ন রোডে বসবার এবং শোবার দুটি ঘর। ইউনিভার্সিটির ছাপা তালিকা নিয়ে কিছু সময় বাড়ি খুঁজতে হয়েছিল। দামের তারতম্য ছিল (যেমন দেখা গেল আফগানিস্তানের প্রগতিপন্থী আমীর আমানুল্লার বেগম সোরায়ার ভাই যেখানে ছিল সেই বিলাসীসুলভ ঘরের ভাড়া আমার পক্ষে একেবারে অতিরিক্ত), দু-এক জায়গায় আভাসে বোঝা গেল যে অশ্বেতাঙ্গ ছাত্র বুঝি বাঞ্ছিত নয় (যদিও অক্সফর্ডের মতো স্থানে বর্ণবিদ্বেষ প্রায় লক্ষ্য করা যায় না বলা যেতে পারে, লণ্ডনের তুলনাতে তো বটেই)। ল্যাণ্ডলেডির স্বামী ও দুই শিশুকন্যা নিয়ে সংসার; গৃহস্বামী মরিস্ কারখানার শ্রমিক, লেবর পার্টির উৎসাহী সভ্য। আমার ওপর কেমন যেন উভয়ের প্রথম থেকে মায়া পড়ে গিয়েছিল—হুমায়ুন হেসে বলল মনে আছে, 'you have sized him up!' যখন তাদের কথা থেকে বোঝা গেল আমার সম্বন্ধে ধারণা— মানুষটি আমি নিশ্চয়ই ভালো, প্রায় যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পারি না, মোটামুটি এ কথাই তারা বলেছিল। আমি যে নির্ঝঞ্ঝাট-প্রকৃতির মানুষ তা কেম্ব্রিজেও আমার দুদিনের ল্যাণ্ডলেডি বুঝেছিল যখন আমার পরিত্যক্ত বিছানা দেখিয়ে সে বলে. যে শয্যা দেখে কেউ যে এতে শুয়ে রাত কাটিয়েছে তা মনেই হয় না, অথচ ঘর পালিয়ে বাইরে যে আমি রাত কাটাই নি তাও সে জানে!

অক্স্ফর্ড্ কিন্তু এমন শহর যে প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়া স্বাভাবিক আর অনেকদিন একত্র কাটিয়েও সে-প্রেমে চিড়্ পড়ে না। কলেজ বাড়ির স্থাপত্যে কেম্ব্রিজ কম যায় না, কিন্তু সেখানকার চারদিকে সমতল জমি, আগে ছিল বহু জলা; প্রকৃতির প্রসাদ অক্স্ফর্ডে ঢের বেশি। প্রধান রাস্তায় মধ্যযুগীয় ছায়া কেম্ব্রিজে একটু বেশি মনে হতে পারে, কিন্তু অক্স্ফর্ডেও আছে পাথুরে-ইঁটে বাঁধানো সরু গলি, যেখানে Merton-এর মতো কলেজের অবস্থান, সময় সেখানে যেন স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করছে। আর অক্স্ফর্ডের

হাই স্ট্রীটকে তো সবাই বলে তুলনাহীন, মড্‌লীন (Magdalene) কলেজের গম্বুজ যার এক প্রান্তের নিশানা আর ইউনিভার্সিটির গির্জা -সমেত 'অল্‌-সোল্‌স্‌'-এর মতো কয়েকটি কলেজ-বাড়ি নিয়ে 'বেড়-খেয়ে-যাওয়া চেহারায় যার অদ্ভুত অনির্বচনীয়তা। শহর থেকে একটু দূরেই ছোটো পাহাড়—Iffley, Cumnor, Headington, Boars' Hill (সেখানে তখন বাস করতেন কবি রবার্ট ব্রিজেস্‌, "Testament" of Poetry নামে ভাষণ দিলেন বিশ্ববিদ্যা-লয়ে), সবই সহজে টহল দিয়ে আসার মতো জায়গা আর সুদৃশ্য তো বটেই। দেশটা ছোটো হলে কি হবে, সৌন্দর্যে বাস্তবিকই ভরা— একটু যেন সাজানো, কিন্তু তাও হল প্রকৃতির দান, শুধু মানুষের হস্তক্ষেপে নয়। লণ্ডনের প্যাডিংটন স্টেশন থেকে রেলে অক্স্‌ফর্ড্‌ আসতে পথে টেম্‌স্‌ নদীর এক ছোট্ট বাঁকে রয়েছে Goring and Streatley নামে গ্রাম। অদ্ভুত কমনীয়তায় ভরা জায়গাটা ; সবুজ পাহাড়ী জমির উচ্চাবচতা যেন মোহিনী নারী-তনু নিয়ে বিরাজ করছে, সূর্যালোকে তার মধুর লাস্য, মেঘের বিষণ্ণ ছায়ায় বিশ্বের বিধুরতা যেন তার বরবপুতে বিধৃত— ভারতবর্ষীয় নিসর্গ সৌন্দর্যের নক্ষত্রচুম্বী মহিমা কোথাও নেই, কিন্তু আছে নিবিষ্ট নিকট আত্মীয়-তার স্পর্শ। জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষের একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসছে। Boars' Hill-এ বেড়াতে বেড়াতে জার্মান সঙ্গী করছে প্রাকৃতিক শোভার দার্শনিক বিশ্লেষণ, ফরাসী উৎফুল্ল হয়ে দেখাচ্ছে নরনারীর প্রেমকুঞ্জ চারদিকে যেন ছড়ানো, আর ইংরেজ মুখ বুজে পথের ধারে পাথরের বুকে সবুজ মখমলের মতো এঁটে-থাকা শ্যাওলার গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিল— সর্বাঙ্গে তাঁর তখন কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

যেখানে থাকতাম তার খুবই কাছে নদী— এ সেই বিখ্যাত টেম্‌স্‌! আমাদের নদীর তুলনায় শীর্ণ, নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সেদেশে তার অনেক গরিমা— কুরূপাও তাকে বলা যায় না, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার সংগতি স্পষ্ট। অক্স্‌ফর্ডে টেম্‌স্‌ নদীর নাম দেওয়া হয়েছে Isis (বিখ্যাত ছাত্র-পত্রিকারও ঐ নাম) এবং এরই শাখা Cherwell (এটিও এক ছাত্র-পত্রিকার নাম) শীর্ণতর রূপে বয়ে গেছে মড্‌লীন কলেজের পাশ দিয়ে, যার বুক চিরে স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মের দিনে ভেসে চলে ছাত্রছাত্রীদের নৌকা, কোথাও বা কূলে তরী বেঁধে নিদাঘসম্ভোগের দৃশ্য। সবকটা কলেজের বাৎসরিক বাচ্‌-

খেলা হয় আইসিসে, আর কেম্‌ব্রিজের সঙ্গে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় গোটা ব্রিটেনকে একদিন সর্ববিধ ভাবনা থেকে সরিয়ে এনে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাচ্‌-খেলা নিয়ে মাতিয়ে তোলে, তার অনুষ্ঠান ঘটে লণ্ডনের কাছাকাছি অঞ্চলে, যেখানে টেম্‌স্‌ ক্রমশ সমুদ্রাভিমুখী বলে অনেকটা চওড়া, আমাদের কলকাতার গঙ্গার মতো। কেম্‌ব্রিজের কাছে এই খেলায় অক্স্‌ফর্ড্‌ বেশি হেরেছে বলে একটু খেদ যে মনে নেই তা বলতে পারি না, তবে বহুকালই ও-সব চিন্তা অনেকটা অবান্তর হয়ে গেছে। কৌতুক লাগে যখন দেখি যে দিল্লীতে এখনো ব্রিটিশ হাই কমিশনের বাড়িতে Boat Race Night-এ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের একত্র মিলে রেডিয়োতে বাচ্‌-খেলার রিপোর্ট শোনা এবং নৈশভোজনান্তে (অবশ্য চাঁদা দিয়ে) প্রসন্ন কিম্বা বিষণ্ণ মনে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হয়। এই অনুষ্ঠানে বহুবার নিমন্ত্রিত হয়েও যাই নি— আমার অনুজপ্রতিম অজিতনাথ রায় (বর্তমানে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি) শুনে আঁত্‌কে উঠবে কারণ অক্স্‌ফর্ড বিষয়ে আবেগ তার আজও অটল, একটু হ্রাস ঘটেছে কোথাও শুনলে সে বিচলিত। কিন্তু স্বীকার করছি অক্স্‌ফর্ড্‌-গর্ব কিছু পরিমাণে হয়তো পোষণ করা সত্ত্বেও ক্লান্তিকর লাগে ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে মাতামাতি। ওদেশেও সম্প্রতি 'Oxbridge' সম্পর্কে মোহ অনেক কমেছে— এখন মজা লাগে যদি কেউ বলে, 'Are you Oxford or the other shop?' ধারণাটা মোটামুটি এই যে বাকি দুনিয়াটা তেমন ধর্তব্যই নয়!

কথার পিঠে কথা এসে অক্স্‌ফর্ড্‌ আসলে যে কারণে বরণীয় তা বলা হয়ে উঠল না। নতুন কিছু নয় কিন্তু বারবার বলার অপেক্ষা রাখে, যা বহুবছর পূর্বে বিজ্ঞানী এডিংটনের লেখায় দেখেছিলাম— অক্স্‌ফর্ড্‌-কেম্‌ব্রিজের দোষ-ত্রুটি কম নয়, মধ্যযুগ থেকে বিপুল সম্পত্তির মালিক এদের বিদ্যায়তনগুলি, বাছাই-করা অধ্যাপক এবং ছাত্রমণ্ডলী শুধু বিদ্যাচর্চা নয়, মোটামুটি নিশ্চিন্ত আরামে কালযাপনের সুযোগ পায় বলে সমাজ-ব্যাপারে রক্ষণশীলতার ঘাঁটি হয়ে তারা দাঁড়ায়, শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীভেদের কটু উদাহরণও অনেক, কিন্তু যখন ভাবতে হয় যে প্রায় আটশো বৎসর ধরে সেখানে জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের জন্য, পুরুষানুক্রমে অগণিত জিজ্ঞাসু মানুষ অন্তরের উদ্দীপনা নিয়ে যেন তপশ্চর্যায় লিপ্ত, তখন বিচারের দাঁড়িপাল্লায় প্রতিকূল অভিযোগের

ওজন একান্ত লঘু বলেই প্রতিপন্ন হবে। এই তপশ্চর্যারই ছবি যেন দেখেছি বিশ্ববিশ্রুত Bodleian গ্রন্থালয়ে, যার প্রাচীনতম অংশে রয়েছে অজস্র পুঁথির সযত্নরক্ষিত সংগ্রহ, যার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে আশঙ্কা করে বোধ হয় ১৯২৮ সাল পর্যন্ত সেখানে বিজলী বাতির ব্যবস্থাও নিষিদ্ধ ছিল— শুনেছিলাম 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকার টিপ্পনী যে 'বড্‌লীয়ন'-এ ঢুকতে পেয়ে ইলেক্‌ট্রিসিটি সব চেয়ে দামী 'সার্টিফিকেট' পেল! নিয়ত যেখানে দেশ-বিদেশের মনস্বীসমাগম, সেখানে স্বাভাবিক এবং সহজ দৃশ্য হল যেমন একদিন হাই স্ট্রীটে দেখলাম হেঁটে চলেছেন স্বয়ং অধ্যাপক আইন্‌স্টাইন। কয়েকদিন আগে শুধু তাঁকে চাক্ষুষ করার লোভে গিয়েছিলাম মাঝারি আকারের এক সভায় যেখানে তিনি জার্মান ভাষায় কোনো এক অবোধ্য বিষয়ে ভাষণ দিলেন। বক্তৃতায় উল্লেখ করলেন সভায় উপস্থিত E.R.Milne-এর নাম; মনে আছে এজন্য যে Milne-এর বৈজ্ঞানিক খ্যাতি তখন বিপুল এবং একবার চায়ের টেবিলে আমার জানা এক 'don'-এর বাড়িতে তাঁকে দেখেছিলাম— বয়সে নবীন, আলাপে-আগ্রহী, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বে স্বচ্ছন্দ। ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের অপরূপ বক্তৃতামালা চলল বহুদিন ধরে, নিয়মিত যেতাম এবং এক দিন যে পার্শ্ববর্তীর পরিচয় পেলাম, তিনি হলেন শিল্পবেত্তা E. B. Havell, অবনীন্দ্রনাথ যাঁকে কিছুকাল গুরু বলে বরণ করেছিলেন, প্রাচ্যকলার পুনরুজ্জীবনে যাঁর বিপুল অবদান, Ananda K. Coomara-swamy-র সঙ্গে যাঁর কীর্তি এবং যশ ভারতমানসে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বেশ মনে পড়ছে তিনি বক্তৃতান্তে আমায় বললেন : 'আচ্ছা, Professor কিন্তু (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণণ্‌) 'আনন্দম্‌-এর ইংরিজী প্রতিশব্দ করলেন 'perfection'; 'joy' বা 'ecstasy' বললেন না কেন?' জবাব নিশ্চয় কিছু একটা দিয়েছিলাম, মনে নেই, তবে স্পষ্ট মনে আছে সেই প্রশ্ন। সম্ভবত এ কথা রাধাকৃষ্ণণ্‌কেও জানিয়েছিলাম— হয়তো বা শহরের 'বাস্‌'-এ চড়ে তাঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসার সময়, যা এখন মনে হতে পারে অবাস্তব ঘটনা, কিন্তু বিদ্যাপুরীর পরিবেশে তা ছিল সহজ ও সংগত।

* * *

ওখানে যাকে বলে 'Subfusc' পোশাকে, অর্থাৎ গাঢ় রঙের সুট্‌ পরে শাদা টাই বেঁধে, মাথায় 'ক্যাপ' এবং কাঁধে গাউন চাপিয়ে কালো জুতো

পায়ে ল্যাটিন বাক্য উচ্চারণান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যপদে প্রবেশ করতে হয় সকলকে। নামেরও ল্যাটিন রূপান্তর ঘটায়, যদিও তা আমাদের ভারতবর্ষীয় নামের ক্ষেত্রে সচরাচর সম্ভব হত না— ১৯২৯-৩০ সালে অক্স্‌ফর্ড-পর্ব যার শেষ হল সেই শ্রুতকীর্তি পতৌদির নবাব (আজকের ক্রিকেটর মনসুর আলি খান্ যার পুত্র) বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী কাগজপত্রে বর্ণিত 'Princeps de Pataudi' বলে! বিদ্যাপীঠের অনুশাসনাবলীতেও প্রাচীন পরম্পরার প্রাধান্য। ছাত্রছাত্রীদের মেলামেশা সম্বন্ধে কানুন রীতিমতো কড়া— অবশ্য তখনই কেউ তাকে আমল দিত না, কিন্তু আজ তা একান্ত হাস্যকর মনে হলেও বোধ হয় সম্পূর্ণ বর্জিত হয় নি। আমরা যখন ওদেশে পড়ি, তখন ছাত্রীরা Oxford Union-এর সভ্য হতে পারত না, বিতর্ক শুনতে হলে তারা বসত ওপরের গ্যালারিতে। পরীক্ষায় সাফল্য তালিকায় কেম্‌ব্রিজের মেয়েদের নাম আলাদা ছাপা হত— বোধ করি আনুষ্ঠানিক ভাবে ডিগ্রীও ঠিক তারা পেয়েছে বলে মনে করা হত না, ছাপা বইয়ে দেখা যেত নামের পাশে B.A. বা M.A. লেখা নেই, শুধু আছে 'of Newnham College (কিম্বা Girton), Cambridge'— তা হলেই ধরা যেত তিনি কেম্‌ব্রিজের গ্র্যাজুয়েট। এদিক থেকে অক্স্‌ফর্ড্ তবু একটু এগিয়ে ছিল, আর দেখা যেত যে ছেলে-মেয়েদের সাক্ষাৎকার এবং একত্র বিহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের বিবিধ বিধান মুদ্রিত গ্রন্থেই প্রায় নিবদ্ধ। শৃঙ্খলা রক্ষার আয়োজন অবশ্য ছিল ; কলেজ-গৃহে যারা আবাসিক, বিনা অনুমতিতে গভীর রাত্রে তারা ফিরতে পারত না, কলেজের প্রকাণ্ড 'গেট্' বন্ধ হয়ে গেলে বিরাট উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢোকা ছাড়া আর উপায় ছিল না, আর তা শুধু যে প্রচণ্ড ক্লেশ ও কৌশল -সাপেক্ষ ছিল তা নয়, আরোহণ কিম্বা অবরোহণ-রত অবস্থায় কলেজেরই কারো অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শকের চোখে পড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ অভিযুক্ত এবং পরদিন Proctor-এর বিচারে দণ্ডিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শৃঙ্খলারক্ষীদের কথ্য ভাষায় নামকরণ ছিল "bulls" এবং খাস কলেজ অঞ্চলে তাদের চোখ এড়ানো সহজ ছিল না— রাত এগারোটার পর কলেজে ফেরা প্রায় অসম্ভব, এমন-কি, যারা বাইরে, তুলনায় কিছুটা শৃঙ্খলামুক্ত অবস্থায় বাস করে, তারাও এগারোটার বেশি রাত করে ফিরলে বিশ্ববিদ্যালয় তার রিপোর্ট পেত (যদিও স্থলবিশেষে তার ব্যবস্থা যে

অসম্ভব ছিল, তা নয়) এবং অপরাধীকে সাজা না পেলেও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনেকের সামনে মিষ্টিমধুর কিছু বাক্য অন্তত শুনতে হত (যা প্রায়ই বিদ্রূপমিশ্রিত হওয়ায় যেন আরো মর্মান্তিক)। প্রতি 'টর্ম্' শেষ হওয়ার পূর্বে কে কেমনভাবে লেখাপড়া এবং কালাতিপাত করছে তার একটা হদিস্ কর্তৃপক্ষ মোটামুটি জানত এবং দরকারমতো কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রসমক্ষে জানাত।

কেউ যদি ভেবে বসেন যে এ হল কড়া পাহারায় বদ্ধ জীবন যাপন, তো তা হবে একেবারে ভুল। এদেশ থেকে গিয়ে তো বোঝা গেল স্বাধীন ছাত্র-সত্তা কাকে বলে— কোনো ক্লাস করা নিয়ে বাধ্যবাধকতা বিন্দুমাত্র নেই, 'টর্ম' শুরু হওয়ার আগে ছাপা প্রোগ্রাম পাওয়া গেল, কোথায় কোন্ কলেজ-ভবনে কে কখন কোন্ বিষয়ে 'লেক্‌চর্' দিচ্ছেন এবং যেখানে য'দিন খুশি যাওয়া বা না যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা সকলের। কলেজে নিজস্ব 'টিউটর' যিনি, তিনি বড়ো জোর পরামর্শ দিতে পারেন (যদি ছাত্র পরামর্শ চায়), কিন্তু তার বেশি নয়। সপ্তাহে দশঘণ্টা ক্লাস করে যে ছাত্র সে তো বইয়ের পোকা বলে পরিচিত— তবে শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই যশস্বী, তাই কিছুটা চেখে বেড়াবার ঝোঁক প্রথমদিকে থাকা অস্বাভাবিক নয়। 'টিউটর' অবশ্য প্রতি সপ্তাহে পাঠ্য বিষয়ে অন্তত দুটো প্রবন্ধ লিখিয়ে নেবেন এবং সাহায্য করবেন কোন্ কোন্ বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে তার হদিস দিয়ে। এভাবে কিছু সময় লাইব্রেরিতে কাজ না করে কেউই বড়ো একটা পার পায় না— কলেজের পাঠাগার ছাড়া রয়েছে বড্‌লীয়ন্ গ্রন্থশালা যার অভ্যন্তরে প্রবেশই যেন বিদ্যার্চনা, তবে আমাদের প্রয়োজনীয় বইপত্র অধিকাংশ মিলত তার আধুনিক শাখায়, যে-সংগ্রহ ছিল Radcliffe Cameraতে, সংক্ষেপে যার নামকরণ হয়েছিল 'Radder', রাত দশটা অবধি যেখানে অধ্যয়নমগ্ন মানুষের শান্ত সমারোহ। 'টিউটর'-এর সঙ্গে ক্রমশ একটা আত্মীয় সম্পর্ক গজিয়ে ওঠে। কলেজের ঘরে কিম্বা তাঁর স্বগৃহে সামনে বসে স্বলিখিত প্রবন্ধ ছাত্র পাঠ করবে, শিক্ষক সিগারেট এগিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। বাড়িতে হলে হয়তো বলবেন কিছু পানীয় চলবে কিনা। কলেজে আমার 'টিউটর' ছিলেন Trevor Davies, ওয়েল্‌স্-এ বাড়ি, দশাসই চেহারা, বৃত্তিতে পাদরী, স্পেনের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিতে

কট্টর রক্ষণপন্থী, চিন্তায় সীমিত, ব্যবহারে সজ্জন— দূরত্ব একটু থাকলেও তা অস্বস্তিকর মনে হত না। আলোচনা হত যেন সমানে সমানে, অথচ বুঝতাম অনেক নতুন জিনিস শিখছি কিম্বা পুরোনো জানা কথা নতুনভাবে শিখছি। একেবারে গোড়ার দিকে, প্রায় ধাক্কা খাওয়ার মতো বোঝা গেল যে দেশে আমরা পরীক্ষার খাতায় (এবং অন্যত্র) বাগাড়ম্বর বড়ো বেশি করে থাকি সুতরাং শিখতে হল বক্তব্য স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত করতে, ভাষার যে ঝালর দেশের পরীক্ষককে পুলকিত করত তাকে নির্মমভাবে সরিয়ে রাখতে। Trevor Davies-এর অভ্যাস ছিল আমার পড়া শুনতে শুনতে 'পাইপ' টেনে যাওয়া, বাড়িতে হলে একটু পানীয় গলাধঃকরণ করা আর পাঠ সাঙ্গ হলে বলা, 'Oh, its a good piece of work, a very good piece of work' এবং একটু থেমে বলা : 'as far as it goes'— এই দ্বিতীয় বাক্যার্ধের অর্থ হল যে বেশ কিছু জরুরি কথা বাদ পড়ে গিয়েছে কিম্বা তথ্যসজ্জা বা বিশ্লেষণে গলদ ঘটেছে! প্রধানত এই 'টিউটোরিয়ল' ব্যবস্থার মারফৎ কোনোরকম জোরজার না করে মোটামুটি ছাত্রদের মনের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করার একটা পরম্পরা যেন চলে এসেছে— পরীক্ষায় ফেল কেউ বড়ো একটা করে না, যদিও প্রকৃত ভালো ফল করা রীতিমতো দুঃসাধ্য। আর আহার, বিহার, ব্যায়াম, বিনোদন, বিদ্যাচর্চা এবং অজস্র জিজ্ঞাসা নিয়ে অহরহ নিরত থাকার বহুবিধ উপকরণ নিয়ে সেখানে যুবজনের যে সমারোহ তার মূল্য অবশ্য সমগ্র সমাজকে বইতে হয়, কিন্তু তা শুধু যে মনোরম তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে যুগোপলব্ধি অনুযায়ী সমাজের প্রতি ঋণ পরিশোধও অক্স্‌ফর্ড্‌-এর মতো সংস্থা বহুকাল ধরে করে এসেছে।

ভারতবর্ষ তখন সদ্য (১৯২৮ সালে) অলিম্পিক্ হকিতে সোনার মুকুট পরে বসেছে। তাই কলেজে ঢুকতেই প্রশ্ন শুনতে হয় হকি খেলি কি না, কারণ তাদের ধারণা যে ভারতবাসী মাত্রই বুঝি হকিতে ধুরন্ধর! সেদিনের অক্স্‌ফর্ডে পতৌদি ক্রিকেটে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিল; টেনিসে আমাদের সেণ্ট ক্যাথ্‌রিন্সের খণ্ডা এবং রাজনারায়ণ ইউনিভার্সিটির 'হাফ-ব্লু' পেয়েছিল। খেলোয়াড়-খ্যাতির মূল্য সেখানে অনেক; কিন্তু তা থেকে আমাদের মতো ছাত্র ছিল বঞ্চিত। বলিয়ে-কইয়ে এবং মিশুক বলে হুমায়ুন (Exeter Collegeএর ছাত্র) বেশ নাম করেছিল; যে Union Society-র

বিতর্কে ছাত্র বক্তারা ওদেশের অগ্রগণ্য নেতাদের সঙ্গে সমানতালে কথা বলত সেখানে হুমায়ুন একটা বিশিষ্ট জায়গা করে নিতে পেরেছিল। তবে আমি অচিরে আবিষ্কার করলাম যে সেখানে ক্রমশ পরিচিত হওয়ার ধৈর্য পরীক্ষা আমার পোষাবে না আর নিজেকে জাহির করার সামর্থ্য (এবং প্রবৃত্তি) যখন নেই তখন ও-পথে পা বাড়াতে না যাওয়াই ভালো। কলকাতায় ছাত্রজীবনে অকস্মাৎ বক্তৃতা খ্যাতি মিলেছিল বলে হয়তো এভাবে হার মেনে নিতে একটু অস্বস্তিও হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তখনই দেখেছিলাম যে ইংরিজীতে বাস্তবিকই চমৎকার বক্তা আমার বন্ধু ফ্র্যাঙ্ক মোরেস্ (যে আমার কলেজেরই সহপাঠী ছিল এবং পরবর্তী জীবনে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক বলে পরিগণিত হয়েছে) অক্স্‌ফর্ড্ ইউনিয়নের মতো ডাকসাইটে প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা পায় নি কিম্বা পাবার চেষ্টাও তেমন করে নি। তখনো অক্স্‌ফর্ড্ ইউনিয়নে কোনো ভারতবাসী সভাপতি নির্বাচিত হতে পারে নি; শুনতাম আমাদের পূর্ববর্তী Correia Afonso নামে একজন সিংহলী আর চেট্টুর নামে এক তামিল অনেকটা এগিয়েছিল, আর দেখতাম হুমায়ুনের স্বীকৃতি বাড়ছে— শেষ পর্যন্ত মাত্র কয়েকটা ভোটের ব্যবধানে সে সভাপতি হতে পারে নি। কিছু পরে আমাদেরই থাকাকালীন (বহুকাল 'কারেন্ট' পত্রিকার যশস্বী সম্পাদক) ডি.এফ.কারাকা ইউনিয়নের প্রথম ভারতীয় সভাপতি হবার সম্মান পেয়েছিল। কেম্‌ব্রিজে বহু পূর্বে বোধ হয় প্রাতঃস্মরণীয় আনন্দমোহন বসু সেখানকার ইউনিয়নের প্রথম ভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন; আমাদের সময়ে এস.এস. ধাওয়ান (কিছুকাল পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল) ঐ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। অক্স্‌ফর্ডে কারাকার কৃতিত্ব হল পুরোনো পরম্পরাকে ভেঙে দেওয়া; তার সম্বন্ধে কিছু কথা পরে বলতে হবে, সুতরাং এখন থাক্। আজকের দিনে এ-ধরনের ব্যাপার আমাদের বেশি আগ্রহ জাগায় না, বেশ ক'জন ভারতীয় ও পাকিস্তানী ইউনিয়ন-সভাপতি হয়েছে, কিন্তু এদেশ যখন ইংরেজের পদানত, তখন ইংরেজেরই পীঠস্থানে ভারতবাসীর পদাধিকার ও মর্যাদা নিয়ে গৌরববোধ নেহাৎ কম ছিল না।

ওদেশে সেকালেই ছাত্রদের যে কতটা সাবালক বলে স্বীকৃতি তার পরিচয় পেলাম যখন র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডনাল্‌ড্, লয়েড জর্জ, উইন্‌স্টন চর্চিল প্রমুখ প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাকে দেখা গেল ইউনিয়নে বিশিষ্ট ছাত্রবক্তাদের

সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে — দুর্ধর্ষ বাক্‌পটুতা এদের, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু দূর থেকে (বিশেষত ইংরেজ সম্বন্ধে মোহাবিষ্ট ভারতীয় চোখে) যতটা 'আহা মরি' এদের ভাবা হত, তা সামীপ্যের কল্যাণে শুধ্‌রে যায়। বক্তা হিসাবে এদের চেয়েও মনোগ্রাহী লেগেছে এককালে প্রায়-কমিউনিস্ট এবং 'লেবর' পার্টির ভাবী আশা বলে কীর্তিত, অথচ ঘটনাচক্রে ব্রিটিশ ফ্যাশিজ্‌ম্‌-এর প্রধান প্রবক্তা Oswald Mosley-কে। একেবারে প্রাণখোলা, মনমাতানো 'no nonsense' বক্তা হিসাবে শাপুরজী সাক্‌লাত্‌ওয়ালার সমকক্ষ কাউকে দেখি নি; অক্স্‌ফর্ডে ভারতীয় 'মজলিস'-এর সভায় এঁকে শুনলাম, কলকাতায় ১৯২৭-এ তাঁর বক্তৃতার স্মৃতি চাঙ্গা হয়ে উঠল। ইউনিয়নে বোধ হয় একাধিকবার শুনেছি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবর পার্টির অজাতশত্রু নেতা জিম্মি ম্যাক্স্‌টন্‌কে— সারল্য আর সহৃদয়তা শুধু কথায় নয়, চোখে মুখে ফুটে উঠে এমন অসামান্যতা দিত ভাষণকে যা হয়তো চর্চিলেরও ঈর্ষা উদ্রেক করত— কিন্তু না, চর্চিলের চিত্তবৃত্তিতে সম্ভবত ছিল এমন স্বয়ম্ভর নিশ্চিতি যা ম্যাক্স্‌টনের মতো মানুষের সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ মমতা পোষণ করলেও আসলে তাকে করুণার পাত্র বলেই ভাবত। ওদেশের বক্তৃতায় রহস্য আর কৌতুকের ভূমিকা লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না— বহুক্ষেত্রে তা আগে থেকে তৈরি করা হলেও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বহু চমৎকার উদাহরণ দেখেছি, আমাদের দেশের সাধারণত গুরুগম্ভীর আবহাওয়ায় যা দুর্লভ। এ নিয়ে একটা গোটা অধ্যায় লেখা চলে, কিন্তু প্রয়োজন কি? তবে সম্প্রতি র‍্যামজে ম্যাক্‌ডনাল্‌ড্‌-এর পুত্র ম্যালকম্‌ ম্যাক্‌ডনাল্‌ড্‌-এর লেখা থেকে জানা একটা কথা উদ্ধৃত করার লোভ হচ্ছে। ম্যালকম্‌ ভারতে কিছুকাল ব্রিটিশ হাই কমিশনার ছিলেন; দিল্লীতে আমার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাদাৎ আলি খানের মধ্যস্থতায় কয়েকবার দেখা হয়েছে— আমরা দুজনেই অক্স্‌ফর্ডে History Schools-এ পড়েছি, দু'জনেরই অল্পের জন্য পরীক্ষায় 'ফার্স্ট' ফস্‌কে গিয়েছে, তবে কিনা আমি তাকে "রক্তচোষা সাম্রাজ্যবাদী" ("blood-sucking imperialist") নিশ্চয়ই ভাবি, ইত্যাদি মজাদার কথা ম্যালকম্‌-এর মুখে শোনা যেত। ম্যালকম্‌ বুঝি পার্লামেন্টে যুদ্ধ ও শান্তি সম্বন্ধে ১৯৩৮ সালে এক বক্তৃতার শেষে উল্লেখ করে জেরুজালেম শহরের, যেখানে "the Prince of Peace" (যীশুখ্রীস্ট) জন্মেছিলেন। প্রধান মন্ত্রী নেভিল্‌ চেম্বারলেন তখন হিটলারকে তুষ্ট করে

দলীয় কাগজপত্রে "Princc of Peace" বলে তখন প্রায়ই বর্ণিত; তাই ম্যালকমের বলার সঙ্গে সঙ্গে চর্চিল বিরোধী পক্ষের আসন থেকে স্বগতোক্তি (অথচ সর্বশ্রাব্য কণ্ঠে) করে ওঠেন: "আরে, আমি তো জানতাম না যে নেভিল্ জন্মেছে জেরুজালেমে!" প্রবল হাস্যরোলে সভাকক্ষ ভেঙে পড়ল; ম্যালকম্-এর সযত্নরচিত উপসংহার কৌতুকের বন্যায় ভেসে গেল! প্রকৃতপক্ষে চর্চিলের ভাষণ-প্রতিভা নিছক্ বাগ্মিতায় নয়; বক্তব্য যাই হোক্-না কেন, সুষম বাক্যচয়নের অসাধারণ ক্ষমতা, গুরুতর বিষয়ে বক্তৃতা সযত্নে প্রস্তুত করার অভ্যাস, এবং বিতর্ককালে কখনো অপ্রস্তুত না হওয়ার মতো ক্ষিপ্র বুদ্ধি ছিল প্রধান পুঁজি। অক্স্‌ফর্ডে দেখলাম ছাত্রবক্তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন দেশের শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

ইউনিয়নে ছেলেরাই কর্তা। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের (O.U.D.S.) বাৎসরিক অভিনয়ের সময় মঞ্চে দেখা যেত একাধিক প্রথম সারির অভিনেতা-অভিনেত্রী যারা দেশজোড়া খ্যাতি সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা করতে কুণ্ঠিত নয়। ক্লাব-এর সংখ্যা অগুন্তি— ভূত প্রেতে বিশ্বাসী কিম্বা অলৌকিক ব্যাপারে যাদের ঔৎসুক্য তাদেরও নিজস্ব সংস্থা; এমন কোনো মত (বা দুর্মতি) নেই দুনিয়ায় যা নিয়ে আলোচনার সুযোগ থেকে কেউ সেখানে বঞ্চিত— এজন্যই হয়তো অক্স্‌ফর্ড-এর সুবিদিত বর্ণনা হল: 'home of lost causes, forsaken beliefs and impossible loyalties'! 'লেবর', 'কন্‌সার্ভেটিভ্', 'লিবারল্' প্রভৃতি দলের ক্লাব তো ছিলই; 'ইম্পারিয়ল' ক্লাবও একটি ছিল, আর অন্য দিকে আমাদের সময় প্রতিষ্ঠিত হল 'অক্টোবর' ক্লাব, অর্থাৎ কমিউনিস্টদের আড্ডা। এখানে ১৯৩০ কিম্বা ১৯৩১ সালে স্বয়ং বার্নার্ড্ শ' একবার এলেন— তখন সত্তর বছর বয়স সত্ত্বেও তড়াক্ করে লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠলেন, স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বক্তৃতা করলেন। মনে আছে সজ্জাদ জহীর তাঁকে প্রশ্ন করতে গিয়ে 'Mr. Shaw has made a colossal mistake' বলে শুরু করেছিল আর জবাবে শ' শেষ করলেন এই বলে: 'Lend him to the Tories'! তুমুল হাসি অবশ্য দু'বারই শোনা গেল, কিন্তু বড়ো কথা এই যে জগদ্‌বিখ্যাত এক মনীষীকে অমন অসংকোচে ভ্রান্ত বলার দুঃসাহস তরুণ ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে সহজ ও সম্ভব হয়েছিল অক্স্‌ফর্ড-এর নিছক নিজস্ব আবহাওয়ারই কল্যাণে। মস্ত বড়ো বিদ্বান্‌রা কলেজে কলেজে বক্তৃতা করছেন

—কোথায় কার ক্লাসে বসে অধ্যাপককে ধন্য করা যাবে এ-সিদ্ধান্ত ছাত্রেরাই করছে, প্রায়ই তাদের দেখা যাচ্ছে 'mid-morning coffee'-র পেয়ালা নিয়ে গল্পগুজব করতে, অথচ তাদেরই মধ্যে রয়েছে অনেক ডাকসাইটে ছাত্র। আমাদের মতো মোটামুটি নগণ্য ব্যক্তির সঙ্গে এভাবে আলাপ জমেছে বহু জনের—যাদের মধ্যে বেশ মনে রয়েছে Patricia Spens-কে, (তাকে ডাকা হত 'পিটর্' বলে) যে তখনই বয়সের বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও খোদ্ বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্-এর বান্ধবী (এবং পরে বোধ হয় তাঁর তৃতায় বা চতুর্থ পত্নী)।

দেশ থেকেই ভালোভাবে জানা G.D.H.Cole-কে সেখানে ক্লাস নিতে দেখা গেল। লণ্ডনে একদিন স্কুল অফ ইকনমিক্স্-এ বন্ধু সুশীল দে নিয়ে গেল হ্যারল্ড্ ল্যাস্কি-র ক্লাসে—আবিষ্কার করলাম তাঁর বক্তৃতা এবং প্রবন্ধাদিতে বহুব্যবহৃত একটি কথা 'specialising in omniscience', যা আমার মনে লেগে রইল এবং বহুকাল পরে ভারতীয় পার্লামেণ্টে জওয়াহরলাল নেহরু সম্পর্কে একটু শ্লেষ-সহকারেই প্রয়োগ করেছিলাম। 'লেবর' ক্লাবে শুনেছিলাম অধ্যাপক R.H.Tawney-র বক্তৃতা; অমন সর্বতোভদ্র অথচ প্রখর সুপণ্ডিত ও সুলেখক ওদেশে তখন খুবই কম, আজও তাঁর তুলনা খুঁজে পাওয়া শক্ত। অর্থনীতির অধ্যাপক D.H. MacGregor-এর পড়াবার ধরন ছিল এমন যে, মনে হত যে-বিষয় নিয়ে বলছেন তা তাঁর মনকে একেবারে দখল করে রেখেছে, জগতে তখন যেন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব নেই। Gilbert Murray. A. D. Lindsay, R. R. Marrett, W. D. Ross, Nicol Smith, George Gordon প্রমুখ যশস্বী বিদ্বান্দের কাছ থেকে দেখা যেত—একটু 'ছি-ছি' রটল The Queen's College-এর (এই 'the'-টি কোন্ এক অজানা কারণে বাদ দেওয়া বারণ!) 'লেবর'-সদস্য শিক্ষক Elton ১৯৩১ সালে পার্টিভঙ্গকারী র‍্যামজে ম্যাক্ডনাল্ড্-এর কাছ থেকে 'লর্ড' উপাধি পুরস্কার নিলেন। শোনা যেত ইনি পরীক্ষায় নিজের কলেজের ছাত্রদের সম্বন্ধে নাকি পক্ষপাতও করতেন (যে-ধরনের অপবাদ ওখানে বিরল)। অধ্যাপক মহলের কেচ্ছা মাঝে মাঝে শোনা যেত আমাদের চেয়ে কিছু আগেকার A.L. Rowse-এর কাছে; ইনি তখন Fellow of All Souls, বিদ্বৎমহলে লেবর পার্টির একজন উঠতি চাঁই বলে তখনই পরিচিত; একেবারে দেশের একান্তে কর্নওয়াল্ 'কাউণ্টি'র লোক বলেই বোধ হয় একটু যেন একগুঁয়ে এবং

নিজের শ্রমিক পশ্চাৎপট নিয়ে অহংকারী— সম্প্রতি শেক্স্‌পীয়র এবং তাঁর প্রেমজীবন নিয়ে চমকপ্রদ কতকগুলো সংবাদ প্রকাশ করে গবেষণার মৌচাকে ঢিল মেরেছেন! আমার কলেজবন্ধু Charlie Noall ঐ একই প্রান্তবর্তী জেলার লোক এবং 'লেবর' পার্টির উৎসাহী কর্মী বলে যোগাযোগটা ঘটেছিল। তখন Rowse ছিলেন Noall-এর 'হীরো', আমাদের কাছে দেখাবার মতো এক ব্যক্তি। কি জানি কেন, আজও Rowse-এর বিষয় ভাবলে সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে আসে H. G. Wells-এর রচিত সেকালে-বিখ্যাত উপন্যাস 'Kipps'-এর যে নায়ক তার গুরু এক বৃদ্ধ সোশালিস্টের কথা, যাঁর দুঃখ তাঁর উপদেশ অনুযায়ী দুনিয়া চলল না, "এক ডজন রাজার চেয়েও বুদ্ধিবৃত্তি ঢের বেশি" হওয়া সত্ত্বেও! বিলাতে আজও Rowse-এর খ্যাতি অল্প নয়, কিন্তু ব্রিটিশ সমাজবাদের প্রবক্তা রূপে সে-যুগে তাঁর যে উচ্চাশার কথা তখন জেনেছিলাম তা যে কত অপূর্ণ থেকেছে তা ঢাকার প্রচেষ্টাই যেন তিনি আজীবন করে চলেছেন।

* * *

অক্স্‌ফর্ডে যাবার কিছু পরেই পরিচয় হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজী বিভাগে প্রাক্তন শিক্ষক, আমাদের সকলের অগ্রজোপম বন্ধু জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। এঁর কাছে আমার ঋণের ভার এত বেশি যে তা বলে বোঝানো শক্ত। মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যদি তা কিছু পরিমাণে প্রকাশ হতে পারে তো ভালো; গুছিয়ে তার বিশ্লেষণ আমার অসাধ্য। শুধু বলতে পারি যে সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি -বিষয়ে সৎ শুচি চেতনার প্রয়াসে প্রবৃত্ত হওয়ার সংগতি আমি হয়তো তাঁর কাছ থেকেই স্বচ্ছন্দে সংগ্রহ করতে পেরেছি, আর বিদ্বান্ অথচ মিশুক মজলিসী মানুষ হয়েও যে-নিঃসঙ্গতায় তিনি আজীবন জর্জর তা হয়তো যেন কোথায় আমার স্বভাবের সঙ্গে সামীপ্য আবিষ্কার করেছিল এবং ফলে তিনি হলেন আমার ওপর একান্ত স্নেহশীল। প্রায় অর্ধশতাব্দী তিনি প্রবাসী; প্রথম জীবনে প্রভূত যশ পেয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্যকার Otway সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থ প্রামাণিক বলে ইয়োরোপে স্বীকৃত; অক্স্‌ফর্ডের সুবিখ্যাত Clarendon Press থেকে তা প্রকাশিত হয়েছিল। পরে Edward Thompson অবসর নিলে তিনি কিছুকাল অক্স্‌ফর্ডে বাংলার 'লেক্চরর' ছিলেন (যা অবশ্য কিছু একটা

ব্যাপার নয়। আই. সি. এস্. শিক্ষানবীশদের মোটামুটি বাংলা শিখিয়ে দিলেই যার কাজ শেষ)। কয়েক বৎসর Leeds-এ পড়িয়েছেন, এবং জেনেছেন যে ওদেশে 'কালা আদমী'-কে তার গুণানুযায়ী মর্যাদা না দেওয়ার একটা অলিখিত অথচ সুস্পষ্ট আইন রয়েছে। কী যেন একটা সম্মান (বোধ হয় একটা সাহিত্যিক পেনসন্) অবশ্য তিনি ওদেশে পেয়েছেন, কিন্তু 'লীড্‌স্' বা অন্যত্র ইউনিভার্সিটি 'চেয়ার' তাঁর প্রাপ্য হলেও পান নি। তবুও সম্পূর্ণ একক জীবন সেখানে আজও কাটাচ্ছেন— আমি তো বলি যে স্বদেশের প্রতি একান্ত মমতা এবং কেমন যেন একটা নিরুদ্ধ অভিমানবোধ তাঁকে প্রবাসী করে রেখেছে। বেশ কিছুকাল আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে মনোজ্ঞ একটি গ্রন্থ লিখে বুঝি একটু দায়মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে ঘটনাচক্রে এবং অনুকূল আবহের অভাবে এক দুর্লভ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অবদান থেকে বাংলা ও ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে।

রহস্যব্যপদেশে গভীর কথা শুনিয়ে দেবার সরস শক্তি তাঁর ছিল। তাঁরই কাছে শুনেছি সম্ভবত ১৯২৬-২৭ সালে চীনপরিভ্রমণান্তে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রভক্তদের এক বিদগ্ধ সমাবেশের কথা। কোনো এক বন্ধু তাঁকে সেখানে টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু কবির কয়েকটি মধুর কথা যখন শেষ হল, যখন তিনি বললেন তাঁর মনে কেবল ধাক্কা দিচ্ছিল "গানের পর গান", তখন বুঝি ভক্তেরা বিমূঢ় হয়ে পড়লেন কিম্বা শুধু প্রশস্তি (যা আন্তরিক হলেও অবান্তর) উচ্চারণ করতে লাগলেন, তখন জ্যোতিশ্চন্দ্র আর থাকতে না পেরে বলে উঠেছিলেন; "আচ্ছা, চীনেরা ইঁদুর-আরশোলা-ব্যাঙ খায় বলে শোনা যায়। আপনি সে সব কিছু দেখতে পেয়েছিলেন?" তখন নাকি মুহূর্তের জন্য "সভা হল নিস্তব্ধ", ভক্তেরা প্রায় স্তম্ভিত। কিন্তু স্বয়ং কবি উচ্চহাস্য করে ওঠায় আবহাওয়া সহজ ও মনোরম হয়ে পড়ে, প্রশ্নের জবাবও একটা তিনি পেয়েছিলেন।

বেশ মনে আছে, ১৯৩০ সালের মে-জুন মাসে, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ অক্স্‌ফর্ডে Walton Street-এ যে বাসায় থাকতেন, সেখানে এক সকালের কথা। ডক্টর ঘোষ এবং আমি তাঁর সঙ্গে গল্প করছিলাম আর হঠাৎ বাইরে রোদে-ঝল্‌মল্ আকাশের দিকে চেয়ে জ্যোতিশ্চন্দ্র বললেন: "আচ্ছা, প্রোফেসর, আপনার কী দুর্ভাগ্য! এখানে আপনার কত নাম, রাস্তায়

ঐ আলখাল্লা-মার্কা পোশাকে বেরুলেই সবাই জানবে বিদেশী 'কেষ্ট-বিষ্টু' আপনি— অথচ এমন সোনালী দিনে, মেয়েরা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে রঙ-বেরঙের হালকা জামা পরে গ্রীষ্ম বিহারে বেরিয়েছে, আপনি গিয়ে তাদের কারো সঙ্গে ভাব জমাতেও পারবেন না!" রাধাকৃষ্ণণ অবশ্য হার মানার পাত্র নন, ঘোষকেও তিনি বিলক্ষণ ভালোভাবে জানতেন, তাই হেসে উঠে জবাব দিলেন: "তুমি কি মনে করো যে আমি রাস্তায় বেরিয়ে একটা মেয়ের প্রেমে পড়তে পারি না? নিশ্চয়ই পারি, কিন্তু আমি তা করব না। ('Do you think I can't go out and fall in love with the next girl? I can, but I won't!')।" কথাটার গূঢ়ার্থ নিয়ে ব্যস্ত হবার মতো হাস্যকর বোকামি করছি না, কিন্তু আমার মনে এটা লেগে আছে— রাধাকৃষ্ণণের উচ্চারিত ইংরিজী শব্দগুলি যে তাঁর, তা হলপ করে বলতে পারি! আর ভাবি যে রহস্যছলে স্বতঃউৎসারিত এক মন্তব্যে বোধ করি আমাদের ভারতবর্ষীয় মনে (অন্তত বহু ক্ষেত্রে) আসক্তি এবং নিরাসক্তির এক বিচিত্র সহাবস্থানই সূচিত হচ্ছে।

'বিলেত দেশটা মাটির'— এ-আবিষ্কার আমাদের বহু পূর্ববর্তীরাই করেছিলেন, তাই সেখানে 'মেথর-মুচি-মুদ্দফরাস' সবাই যে শ্বেতাঙ্গ, তা দেখে কিছু একটা আশ্চর্য ঠেকে নি; পরশুরাম-কৃত 'উলট-পুরাণ' তখনই আমাদের পড়া। তবে ছাত্রজীবনে, দেহ ও মনের বিশিষ্ট একটা বয়সে, ইয়োরোপে নরনারীর স্বচ্ছন্দ সহজ বিচরণের দৃশ্য, অন্তত আমাদের সময়ে, চোখের এবং চিন্তার অনেক পুরোনো পর্দা যে ছিঁড়ে দিত, তাতে সন্দেহ নেই। সাদা চামড়া সম্বন্ধে আর্য যুগ থেকে উত্তরাধিকারে পাওয়া কুসংস্কার আমাদের আছে; পার্শী মেয়েরা প্রায়ই কুদর্শনা হলেও গায়ের রঙের জোরে তাদের রূপের প্রশস্তি বাঙালী চোখ আর মন কেমন করে বরদাস্ত করে জানি না, কিন্তু ছেলেবেলাতেই অনেকের মুখেই তা শুনেছি। অথচ এই বাংলাতেই কচি কলাপাতার মতো রঙের কদর, আর কিঞ্চিৎ বর্ষণ-স্নিগ্ধ গোধূলির ছটাকে 'মেয়ে দেখানোর' আলো বলার মধ্যে মনের একটা মধুর ঝোঁক-ও যেন প্রকাশ পায়। বেশ মনে পড়ছে লণ্ডন শহরের রাস্তায় একদিন হুমায়ুনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম ওদেশের মেয়েরা আমাদের মেয়েদের চেয়ে বাস্তবিকই সুন্দর কি না যাচাই করার জন্য। ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে

চলেছে, একটু দূর থেকে দেখায় যেন নয়নাভিরাম, কিন্তু কাছে এলে (কতকটা খুঁটিয়ে দেখলে) ধরা পড়ে নানান্ খুঁত— তাই কয়েক মিনিট বিচারের পর রায় আমাদের হল যে সুঠাম আকারের দিক থেকে (সম্ভবত স্বাস্থ্য ও ব্যায়ামের অভাব হেতু) ইংরেজ মেয়েদের কাছে আমাদের মেয়েরা হারলেও রূপের বিচারে তারা হারবে না, বিশেষত যদি রঙ নিয়ে বেয়াড়া আর্যামি বর্জন করার সুবুদ্ধি আমাদের হয়। মনে পড়ছে একবার আমাদের অক্স্‌ফর্ডে কিছুকাল সহপাঠী গুণোত্তম ("রাজা") হাতী সিং (যে পরে জওয়াহরলালের ছোটো বোন কৃষ্ণা ("বেটি") নেহরুকে বিয়ে করেছিল) সোৎসাহে বলছে সে ছুটিতে বোম্বাই ঘুরে এসেছে (শেঠ কস্তুরভাই লালভাইয়ের আত্মীয় বলে তার অর্থাভাব বলে কিছু ছিল না) এবং দেখেছে সেখানে এমন সুন্দরী মেয়ের মেলা যাদের তুলনা ইয়োরোপে নেই। এই হাতী সিং-এর আচার-ব্যবহার বেশ লক্ষ্য করার মতো ছিল; কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর প্রতি দারুণ আকর্ষণ আবার কিছুটা বিতৃষ্ণাও বটে, পোশাকে সৌখীন, একটু বেমানান্ দেখাবার জন্যই পকেট ঘড়িতে লাগানো লিক্‌লিকে সরু সোনার চেন্, মুখে হাসি এবং "বিপ্লবী" কথার ফুলঝুরি। পরে সোশালিস্ট দলে দেশে কিছুকাল সে থেকেছে, সুভাষচন্দ্র এবং জওয়াহরলালের ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির সঙ্গে যুক্ত থেকেছে, হরিপুরা কংগ্রেসে তাকে দেখেছি আমাদের কম্যুনিস্ট ক্যাম্পে গল্পগুজব করতে; কিছুকাল আগে মৃত এই বন্ধুর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয় ইন্দিরা গান্ধীর পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে। অবান্তর কথা বাড়িয়ে বলা যায় যে অক্স্‌ফর্ডে কতকটা হাতী সিং-য়ের সঙ্গে তুলনীয় ছিল ইশাৎ হবিবুল্লাহ্ (যার দাদা হলেন লক্ষ্ণৌবাসী মেজর জেনারল হবিবুল্লাহ্), অসম্ভব মিশুক এবং নানা ধরনের মানুষের প্রিয়পাত্র, যে ছিল ধরনধারণে অভিজাত অথচ মতামতে একেবারে "আগুনে-তাতা লাল" কম্যুনিস্ট, সজ্জাদ জহীর বা মহ্‌মুদুজ্জাফরের মতো যারা ওদেশেই কম্যুনিজমের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল তাদের তুলনায় ঢের বেশি আগে-বড়্‌নেওয়ালা, যদিও অবশ্য উত্তর জীবনে তার আগেকার উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, ইম্পীরিয়ল্ টোব্যাকো কোম্পানির পাকিস্তান শাখার বড়ো সাহেব কয়েক বছর আগে সে হয়েছিল, হয়তো এখন অবসর নিয়ে কোথাও রয়েছে, জানি না। বড়ো বেশি অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছে কথাগুলো, রাশ টানা যাক্।

Texts and Pretexts-শীর্ষক সঞ্চয়নে অল্‌ডস্‌ হক্স্‌লি উদ্ধৃত করেছেন চতুর্দশ শতকের এক খ্রীস্টান পাদরীর কথা : 'A young man and a young maiden, in a green arbour, on a May-morning ; if God does not forgive them, I will !" এ কথায় আজ কেউ চমকাবে না, তখন চমকাত। ওদেশে কিছুকাল বাস করলে, বিশেষত অক্স্‌ফর্ডের মতো জায়গায় থাকলে মেয়েদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা একটা সম্ভব এবং স্বাভাবিক ব্যবহার নয় ; সীতার পায়ের দিকে ছাড়া অন্য কোথাও তাকাবে না এমন পণ যে-দেশের লক্ষ্মণ করেছিল সে-দেশের ছেলেরাই বিশেষ করে পারে না ! অল্পবিস্তর বন্ধুতা মেয়েদের সঙ্গে ঘটেই থাকে, ক্ষেত্রবিশেষে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিও কিছু অভাবনীয় ঘটনা নয়, দুশ্চিন্তারও উপলক্ষ নয়, রাধাকৃষ্ণণকে জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ যে ছবির কথা বলে কৌতুক করেছিলেন, তার মনোহারিতা অস্বীকার করা তো প্রায় অমানুষিক কাণ্ড। ভারতবর্ষীয় তরুণ মনও তাই অবধারিত ভাবে মুগ্ধ হয় ও-দেশে আমাদের চেয়ে ঢের বেশি সুস্থ, স্বচ্ছ জীবন ও যৌবনের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে। কামস্পর্শ-রহিত (যদি তা সম্ভব মনে করা যায়) হলেও স্ত্রী ও পুরুষের বন্ধুত্বে যে এক বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে তার সন্ধানও তখন মেলে। আর স্বাভাবিক বিধানে যৌন আকর্ষণ ও অনুভূতির যে আনন্দ আর বেদনা তার পরিচয়ও সে-দেশের পরিবেশে দুর্লভ বস্তু হয়ে থাকে না। অবশ্য বলতে পারি যে সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণণ যে চিত্তবৃত্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন তা-ও ভারতীয় মানসে অবাস্তব নয়। দেশাভিমান বহু ক্ষেত্রে ওদেশের জীবনে জড়িত হয়ে পড়ার বিড়ম্বনা বিষয়ে সত্তাকে সতর্ক করে দিয়েছে ; প্রেমের ফাঁদ যখন সারা ভুবনেই পাতা, তখন বিদেশী বিজেতার দেশে সেই ফাঁদে পা না দেওয়াই সর্বথা সমুচিত মনে হয়েছে ; সাময়িক বিভোরতার কাছে পরাজয় স্বীকার থেকে নিবৃত্তি এসেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আধুনিক বিশ্বের একজন মহামনীষী, আমেরিকান নীগ্রোদের বহুমানভাজন প্রবক্তা, W. E. du Bois-এর আত্মজীবনী ; ছাত্র হিসাবে জার্মানী থাকার সময় সেদেশের এক মেয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চায়, তাঁরও মন চেয়েছিল, কিন্তু নিজেকে এবং তাকে নিবৃত্ত করেন কোনোক্রমে বুঝিয়ে যে তৎকালীন আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গিনীর পক্ষে নীগ্রোর সহধর্মিণী হয়ে থাকার মতো পরীক্ষা হবে প্রচণ্ড এক অভিশাপ।

এই কথা বলতে গিয়ে তিনি এক জার্মান কবিতা উদ্ধৃত করেন: "Es war so schön gewesen, Es hat nicht sollen sein" ("It was so lovely that it could not be!)"

* * *

জওয়াহরলাল নেহরু কেম্ব্রিজ বাসকালে বড়ো ঘরের পাকা ইংরেজ ছেলের মতোই ঘোরাফেরা করতেন, তখনো তাঁর সযত্নলালিত অস্তিত্বে দেশাভিমানের বোধোদয় ঠিক ঘটে নি, কিন্তু কোথায় যেন মনের নিভৃতে আগুনে ভরা অরণি স্তূপীকৃত হচ্ছিল— তাই পরম পিতৃভক্ত হয়েও মাঝে মাঝে মোতিলাল নেহরুর তদানীন্তন ইংরেজভক্তি নিয়ে চিঠিতে খোঁচা দিয়েছেন এবং একবার লিখেছেন উদ্ভট দৃশ্যের কথা যখন আমন্ত্রিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'অনরারী ডিগ্রী' দিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্স্লর দাঁড়িয়েছেন সম্মান দেখাবার জন্য সকলের ক্ষেত্রে, শুধু দাঁড়ান নি ভারতবর্ষের আগা খাঁ এবং বিকানীর মহারাজার বেলায়। এ-ধরনের দুঃশীলতা আমরা দেখি নি, তবে আন্দাজ করতে পেরেছি— আমাদের সময় বরং কটু লেগেছে শহরে 'Town'এবং 'Gown', অর্থাৎ শহরবাসী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিকদের মধ্যে ব্যবধান, জাতিবৈর থেকে বিভিন্ন অথচ একান্ত বাস্তব শ্রেণীবৈরিতা চোখে পড়েছে এবং দেশের চেয়ে অনেক বেশি মনে লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে জেনেছি আইরিশ ছাত্রদের কাছ থেকে কিভাবে আয়র্লণ্ড্ স্বাধীন হয়েও সেখানে জনতার মুক্তি আসে নি— স্বাধীনতার প্রকৃত পরিণতি যে সামাজিক সম-সুযোগে, তার সম্ভাবনা বিকশিত হয় নি। ক্ষীণভাবে হলেও বুঝতে আরম্ভ করেছি যে জাতীয় মুক্তিই যথেষ্ট নয়, তাকে আরো বহুধা পরিব্যাপ্ত না করলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সার্থকতা অসম্ভব। ক্রমে ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধ জুড়ে জগৎব্যাপী বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিপর্যয় এবং তাকে সামাল দেবার জন্য তথাকথিত গণতন্ত্রপ্রেমীদের আনুকূল্যে ও সহায়তায় ফ্যাশিজম্-এর আবির্ভাব প্রভৃতি যুগান্তকারী ঘটনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল; অনেকটা অকুস্থলে উপস্থিতির ফলে পরিচয়টা একটু নিবিড়ই হয়েছিল। সে কথা এখন থাক্; বিদেশ গিয়ে গোড়ার দিকে নিছক দেশাভিমানী অনুভূতিই ছিল মনের বিন্যাসে প্রথম ও প্রধান উপাদান। সেই অল্লাধিক আগুনে ইন্ধন পড়ল নানাদিক থেকে। ভারত সরকারের বেতনভুক্ এক আই.সি.এস. কর্মচারী

ছিলেন, উইলিয়ামসন নামধেয় সেই ব্যক্তির কাজ ছিল অক্স্‌ফর্ডে ভারতীয় ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করা। অর্থাৎ প্রধানত আই.সি.এস. 'প্রোবেশনর'দের দিকে নজর রাখা এবং অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদেরও দেখাশুনা (প্রকৃত প্রস্তাবে গোয়েন্দাগিরি) করা, শহরের উপকণ্ঠে হেডিংটন পাহাড়ে তার গৃহে মাঝে মাঝে চায়ের নিমন্ত্রণ হত; ১৯৩০ সালে সারা ভারতবর্ষ যখন উত্তাল, তখন তার কাজ হল ছাত্রদের সাম্‌লে রাখা, উগ্ররাজনীতির দিকে যাতে না ঝোঁকে সেই চেষ্টা করা। মনে আছে নিষেধ না এলেও সরকারী বৃত্তি-ভোগী হুমায়ুন এবং আমার কাছে মৃদু কণ্ঠে পরামর্শ এসেছিল যে ২৬শে জানুয়ারি ভারতীয় ছাত্রেরা প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যে সভা ডেকেছিল (নিতান্ত নির্দোষ মধ্যাহ্নভোজনই ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান ব্যাপার) সেখানে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

১৯৩০ সালে ভারতবর্ষের ঝটিকাচঞ্চল মূর্তি দেখার সৌভাগ্য হয় নি। ষোলো হপ্তার লম্বা ছুটির (Long Vacation) সময় এক-পিঠ ভাড়ায় 'পি-অ্যাণ্ড-ও' জাহাজে দেশে ঘুরে যাওয়ায় লোভ সামলাতে না পেরে যখন জুলাই নাগাদ কলকাতায় এসে প্রায় সাত-আট হপ্তা কাটিয়ে যাই, তখন আন্দোলনের আগুন যেন নিভন্ত অবস্থায়; মনমাতানো তেমন কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আসে নি। কিন্তু ১৯৩০ সালের প্রথম থেকেই বিদেশে বোঝা যেত দেশে প্রচণ্ড কিছু একটা ঘটতে চলেছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের খবর আর গান্ধীমহারাজের 'ডাণ্ডি' সত্যাগ্রহ আলাদা জাতের কাণ্ড হলেও বোঝা যায় যে সব-কিছু মিলে মিশে একটা ভূমিকম্প-গোছের কিছু ঘটেছিল। বিলাতের কাগজে এদেশের খবর ফলাও করে দেয় না। তবুও মেদিনীপুরে শোলাপুরে পেশাওয়ারে দেশের মানুষ দেখিয়েছিল তারা দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজের তোয়াক্কা করে না, প্রাণ দিতে এবং নিতে তারা তৈরি— এ এমন খবর যাকে চেপে রাখা চলে না। বিদেশবাসী ভারতীয় ছাত্রমন তাই তখন উদ্বেল হয়েছিল; যতই ভিন্ন পরিবেশে (এবং কিছু পরিমাণে কুহকী আবহাওয়ায়) অবস্থান হোক্-না কেন, দেশের সঙ্গে একটা নাড়ির টান অনুভব করবার সময় ছিল সেটা।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তখন অক্স্‌ফর্ডে এসেছিলেন Hibbert Lectures দেবার জন্য—*The Religion of Man* বলে যা পঠিত এবং প্রকাশিত হয়।

ছিদ্রান্বেষী মনের পক্ষে কটু কিছু বলার মতো খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু বিদেশে, বিজেতার বাসভূমিতে তাঁর সৌম্য, ভাস্বর ব্যক্তিত্বের ভাতিতে ভারতের মলিনমুখচন্দ্রমা ক্ষণিকের জন্যও উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে দেখার সৌভাগ্যকে ভোলা যায় না। ম্যাঞ্চেস্টার কলেজের 'হলে' উচ্চাসনে তিনি উপবিষ্ট, কাঁচের বিরাট চিত্রবিচিত্র জানলা বেয়ে একফালি রোদ পড়ে তাঁর তেজঃপুঞ্জ অবয়বে যেন এক অতিমানবিক দীপ্তি এনেছে; আমাদেরই আপনজন তিনি, অথচ বুঝি সঙ্গে সঙ্গে অন্যগ্রহবাসী— সভাগৃহ স্তব্ধ, শ্রোতারা রুদ্ধশ্বাস, শোনার চেয়ে কবিকে বোধ হয় দেখছেই তারা বেশি, দেখছে আর অবাক হয়ে থাকছে। অধ্যাপক গিলবর্ট মরে, ডক্টর এ. ডি. লিন্‌ড্‌জে (Master of Balliol), এল. পি. জ্যাক্‌স্‌ প্রভৃতি বিদগ্ধজন সেখানে, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মামুলী কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁর আগমনে বিশেষ কোনো চাঞ্চল্য দেখায় নি— হয়তো তখনো চলছিল ওদেশের 'Establishment' মানসিকতায় 'নাইটহুড্'-ত্যাগী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উষ্মাজনিত অবহেলা। তাতে কিছু এসে যায় নি অবশ্য—আমাদের শুধু অল্প বিরক্তি ঘটেছিল কবির চতুষ্পার্শ্বে কয়েকজন 'ভক্ত' আগ্রহাতিশয্যে এবং অকারণে তাঁর দেহরক্ষী হবার অশোভন প্রচেষ্টা করছিলেন বলে। বিলাতে বহুকাল ধরে ভারতীয় ছাত্রদের সহায় ও বন্ধু বলে পরিচিতা শ্রীমতী মৃণালিনী সেনও (কেশবচন্দ্রের পুত্রবধূ) এটা পছন্দ করেন নি। কিন্তু সে কথা থাক্। রবীন্দ্রনাথ একসন্ধ্যায় এলেন ভারতীয় ছাত্রসভা 'মজলিস্'-এ। সভাপতি মহমুদ্‌উজ্জাফর পরম শ্রদ্ধায় সম্ভাষণ জানালেন। কিন্তু একান্ত শিষ্টভাষায় অভিবাদন জ্ঞাপন করার পর মনের গহনে সবার যে প্রশ্ন তার আভাস দিলেন— আর সজ্জাদ জহীর আরো এগিয়ে প্রশ্ন করলেন, কটুভাবে না হলেও প্রায় যেন সভার তাল কেটে দিয়ে বললেন 'কবি, আজ আপনি এখানে কেন? আমাদের দেশ যে আজ মাতোয়ারা, গান্ধীজীর পাশেই কি আপনার স্থান নয়? আমাদের মন যে তাই চাইছে!'

একটু চঞ্চল হয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ক'জনের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার কোনো বই কাছাকাছি আছে তোমাদের?' শুনেই বন্ধু মহীন্দ্রলাল ('জজি') মিত্র (পরবর্তী জীবনে ব্যারিস্টার, হিন্দুস্থান স্টীল-এর সেক্রেটারি) তার মোটরে আমাকে নিয়ে ছুটে গেল, 'চয়নিকা' নিয়ে এলাম অবিলম্বে; উপহার-পাওয়া আমারই এই 'চয়নিকা' হাতে নিয়ে কবি বললেন: 'তোমাদের

আবেগ আমি বুঝি। তবে তোমরা বুঝবে কিনা জানি না, মহাত্মাজী বোঝেন, আমার অস্ত্র হল ভিন্ন। দেশ থেকে দেশান্তরে ভারতবর্ষের চারণ হয়ে আমি ঘুরি, স্বাধীনতার লড়াইয়ে এটাই আমার কাজ।' যখন বললেন এ কথা, তখন গলাটা কেমন যেন ভার-ভার, আর তার পরই যেন অবসন্ন কণ্ঠকে জাগিয়ে নিয়ে পড়লেন "দুঃসময়" কবিতাটি :

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

নিজেরই অন্তরতম কবিকৃতি বিষয়ে অপরিমেয় আস্থার সেই উদাত্ত নির্ঘোষ আজও ভুলতে পারি নি। চরাচরব্যাপ্ত যাঁর প্রতিভা, সেই অতুলন স্রষ্টার দেশাভিমানে আঘাত পড়েছিল বলেই সেদিন সেই অবিস্মরণীয় আবৃত্তি শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। অনেক পরে জেনেছি এরই সঙ্গে সংগতি রেখে প্রায় অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েট-যাত্রা, যেখানে তিনি দেখেছিলেন "ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ"; অভিবাদন করেছিলেন সমাজদেহ থেকে লোভ নামে মৃত্যুশেল উৎপাটিত করার বিরাট বিপুল ব্যাপক প্রয়াসকে।

মাস দু:য়ক দেশে কাটাবার সময় কলকাতায় তেমন কোনো বিস্ফোরক ঘটনা দেখি নি। তবে শুনলাম মনমাতানো কতকগুলো ঘটনার কথা, আর কেমন যেন বুঝলাম যে বাস্তবিকই এমন ধাক্কার পর আন্দোলন যেন দম নিচ্ছে, মনের আগুন কোথাও নিভে যায় নি। পরে বিদেশে গিয়ে জেনেছি অনেক ব্যাপার—ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টি ছাপিয়েছিল *India under British Terror*, পেশাওয়ার এবং মেদিনীপুরে গণঅভ্যুত্থান এবং সরকারী অত্যাচারের বিবরণ এবং অনেক কিছু, যা আরো পরে কৃষ্ণ মেনন্, এলেন উইল্‌কিনসন্ এবং লেনার্ড ম্যাটার্স্-এর সম্পাদনায় *The Condition of India* গ্রন্থে প্রকাশ পায়। দেশে এসে আরো বুঝেছিলাম তৎকালীন

জগদ্‌ব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের মার্ক্‌স্‌বাদী ব্যাখ্যার যাথার্থ্য— জিনিসপত্রের দাম পড়ে গেছে, কিন্তু তবুও সব-কিছু জনসাধারণের নাগালের বাইরে (মনে রাখতে হবে এ-বিষয়ে কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল তার ষষ্ঠ কংগ্রেসে [১৯২৮] যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে, তাকে উপেক্ষা করেই তখন বিলাতের এবং পশ্চিম ইয়োরোপের তথাকথিত সোশালিস্টরা মার্ক্‌স্‌কে Henry Ford অসার প্রমাণ করেছেন এবং J.M.Keynes সব বিপদের ভঞ্জন করবেন বলে রব তুলেছিল !)। তখন অবশ্য আমার প্রধান অভিপ্রায় ছিল বাড়ির সবাইকে দেখে যাওয়া এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব— অক্স্‌ফর্ড্‌-এর পড়াশুনা ব্যাপারে এতে যে গাফিলতি ঘটে গেল সে-বিষয়ে যথাসময়ে ঠিক চেতনা ছিল না, একটু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই বরং ছিল। খুঁটিনাটি বর্ণনার দরকার নেই, শুধু বলতে হয় যে আশ্চর্য হয়েছিলাম দেখে যে এম. এ. ক্লাসে আমাদের সময়ে দর্শনের শ্রেষ্ঠ ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী তখন মনু নিয়ে মেতেছেন। মানবধর্মশাস্ত্রে আমাদের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান মেলে এই চিন্তায় তিনি মশগুল এবং সবাইকে বোঝাবার জন্য ব্যগ্র— সম্ভবত এটা ছিল সেদিনের আলোড়ক দেশপ্রেমেরই একধরনের প্রকাশ। পরে প্রগতিলেখক আন্দোলনে এবং বাংলায় সমগ্র কম্যুনিস্ট কর্মকাণ্ডে সুরেনবাবুর মহৎ অবদানের কথা বলতে হবে, কারণ তাঁর সঙ্গে আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চলেছিল— কিন্তু তখন তিনি দেশের সুপ্রাচীন পরম্পরার মায়ায় একেবারে আটক। ত্রিশ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে যখন দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করলাম, তখন আমাকেও তো আবার নতুন করে জানতে হল দেশের মাটির মায়া। প্রথম-বারের চেয়ে যেন বেশি করেই এবার ধাক্কা লাগল— রামরাজাতলা ছাড়িয়ে ট্রেন-থেকে-দেখা 'বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ-'র দল আপনমনে কলসীকাঁখে চলেছিল, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করে নি। কিন্তু সে মোচড় আজো ভুলি নি, এদেশের বাইরে জীবনের কথা ভাবতে মন হু হু করে উঠেছে।

১৩

দেশ ছাড়ার আগে অধ্যাপক জ্যাকারিয়া একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন যেটা গ্রহণ করার সুবুদ্ধি আমার ঘটে নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমি তাঁরই মতো দেশের ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও যেন পুরো তিন বছর কাটিয়ে অক্স্ফর্ডের ডিগ্রী নিই এবং দু'বছরে 'কোর্স' শেষ করার লোভ সংবরণ করি— যুক্তি দ্বিবিধ, কারণ পরীক্ষায় খুব ভালো ফল সম্বন্ধে যথাসম্ভব নিশ্চিত হওয়া এবং তার চেয়ে কম কথা নয়, ভারি চমৎকার একটা 'দ্বিতীয় বর্ষ' সেখানে যাপন করা! হয়তো আমার মনের নিভৃতে দেশে পরীক্ষায় একাদিক্রমিক সাফল্যের ফলে আত্মতুষ্টি লুকিয়ে ছিল; তা ছাড়া সময় বাঁচিয়ে আর-একটা 'রিসর্চ' (গবেষণা-গত) ডিগ্রী জোগাড় করা এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের পাঁচের মতো ব্যারিস্টারী তকমাটাও বাগিয়ে আনার লোভ ছিল। ব্যারিস্টারীর কামনাটি অবশ্য আমার নিজস্ব নয়; বরঞ্চ বলতে পারি, সেটা ছিল বাড়ির বিশেষ বাঞ্ছা। লেখাপড়া সম্বন্ধে গভীর না হলেও একটা স্বাভাবিক মোহ আমার ছিল— যার প্রায় নির্বোধ প্রমাণ হল বিলাতে পৌঁছানো মাত্রই বিজ্ঞাপন দেখে *Encyclopaedia Britannica*-র সদ্যপ্রকাশিত চতুর্দশ সংস্করণটি সংগ্রহ করা। চমৎকার এক 'মেহগনি' টেবিলসমেত বইগুলি আজও কথঞ্চিৎ মলিন অবস্থায় আমার জিম্মায় থেকে গেছে (টেবিলের দাম বুঝি তখনই ছিল নয় গিনি, বই-গুলির সঙ্গে বিনামূল্যে গ্রাহকরা পেয়েছিল)। প্রথমে এক পাউণ্ড নগদ দিয়ে আর প্রায় আড়াই বৎসর ধরে প্রতিমাসে কিস্তি মাফিক্ পুরো দাম আমায় শোধ করতে হয়েছিল। অক্স্ফর্ডের ব্রড্ (Broad) স্ট্রীটে ব্ল্যাকওয়েল-এর বিখ্যাত বইয়ের দোকান চষে বেড়ানো ছিল এক বিলাস— অন্যান্য দোকান, যেমন Parker, Thomson ইত্যাদি, থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র যেন ফুটে উঠত সব চেয়ে সুন্দরভাবে ব্ল্যাক ওয়েলের দোকানে। নাম ঠিকানা দিলেই ধারে বই বাড়ি পাঠিয়ে দেবে— সাধ্যমতো দাম দিয়ে যাওয়া চলবে। অক্স্ফর্ড্ ছাড়লেও হিসাব গুটিয়ে নেবার দরকার নেই, ফরমায়েস মতো বই পাঠাবে ঠিকই, দামের জন্য তাগাদা দেবে না। যে-কোনো সময়ে দেখা যাবে বহুজন

বই ঘাঁটছে, দাঁড়িয়ে পড়ছে, কেনবার নাম নেই, কিন্তু দোকানের কেউ কিছু বলছে না, এমন-কি লুকিয়ে যে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে তাও মনে হয় না। ছাত্রদের পক্ষে কোনো ক্লাসে যাওয়াই বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু তবুও যে-কটা ক্লাসে যোগ দিলে পরীক্ষার দিক থেকে উপকার পেতাম সেখানেও না গিয়ে এবং একেবারে অতি অল্প কয়েকটা 'লেক্‌চার' সপ্তাহে শুনে আমি সময় কাটাতাম ব্ল্যাকওয়েল বা অন্যান্য বইয়ের দোকানে— যারা বই ভালোবাসে, বই শুধু পড়া নয়, তাকে হাতে ধরা, তার গন্ধ শোঁকা যাদের আনন্দ দেয়, তারা বুঝবে এ জিনিসের মাধুর্য। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের Radcliffe Camera-তে বইয়ের খোঁজে যাওয়া ছাড়া ইউনিয়ন সোসাইটির চমৎকার গ্রন্থাগারে সময় কাটাতাম অনেক— শুধু পাঠ্য পুস্তকের সন্ধানে নয়, হাজার রকমের বইয়ের তল্লাসে এবং সাময়িক পত্রিকার মোহে। অচেনা না হলেও একটা নতুন অবাধ জগতের মাদকতাময় আস্বাদে পরীক্ষাপ্রস্তুতির কথা হয়তো তুচ্ছ মনে করেছিলাম।

পূর্বেই বলেছি গ্রীস-যাত্রার প্রলোভনে প্রথম 'term' প্রায় নষ্ট করেছি এবং গ্রীষ্মের ছুটি দেশে কাটিয়ে পরীক্ষার পড়ায় ফাঁকি দিয়েছি। তা ছাড়া প্রথম দুটো ছুটিও (ছয় হপ্তা করে) বেড়ানোয় কাটানো গিয়েছে— দুবারই সঙ্গে ছিল হুমায়ুন। কেন্টের সমুদ্রতীরে র‍্যাম্‌স্‌গেট বলে জায়গায় হুমায়ুন, সুশীল দে এবং আমি কিছুকাল ছিলাম। এক ইংরেজ সহপাঠির বাড়িতে বড়দিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। মনে আছে সুশীল একদিন বলল লণ্ডনে তার বাড়িতে যুবতী ঝি তাকে একদিন কাঁদো-কাঁদো মুখে অনুরোধ জানায় চেঁচিয়ে গান না করতে, কারণ গানের আওয়াজ শুনে তার মন খারাপ হয়ে যায়, ভাবে কাউকে বুঝি কবর দেওয়া হচ্ছে— অনেক রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে নাকি ওয়েল্‌স্‌-এর 'Funeral' সুরের মিল আছে! ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব কূলে ছোট্টখাট্ট পাহাড় আছে, সাগরতীরে খড়ির ঢিবি আছে, ক্যাণ্টারবরির মতো স্থানে বড়ো গির্জা (যা দেখার মতো) আছে, কিন্তু অভিভূত করার মতো কিছু নেই— সব ছিমছাম, ছোটো পরিধির মধ্যে সুদৃশ্য, মনকে নাড়া দেয়, মাতাতে পারে না। দ্বিতীয় ছুটিতে আমরা গেলাম প্রথমে প্যারিস, এবং সেখান থেকে দক্ষিণে লিয়ঁ, দিজঁ ইত্যাদি স্থান পার হয়ে গ্রেনব্‌ল্‌ (Grenoble) শহরে পুরো একমাস এক ফরাসী পরিবারের সঙ্গে ছিলাম। এরা

ফরাসী ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানত না, তাই আমাদের হল ফরাসী 'প্র্যাকটিস্' করার সুযোগ— আমার উচ্চারণ ছিল বিদেশীর পক্ষে অনেকটা নির্ভুল, তাই বাড়ির গিন্নীর মুখে সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম 'Monsieur n'aime pas causer, mais quand il parle nous comprenons tous' (অর্থাৎ আমি বেশি কথা বলতে পছন্দ করি নি, কিন্তু যখন কিছু বলি তখন সবই তাদের বোধগম্য হয়)। গ্রেনব্ল্ পুরোনো শহর; সেখানকার ইউনিভার্সিটিরও অনেক বয়স এবং খ্যাতি; নদী বয়ে গেছে শহরের মাঝখান দিয়ে আর কাছেই পাহাড়ের শ্রেণী। যে বাড়িতে ছিলাম, সেটি বেশ পুরোনো, ব্যবস্থাও একটু আদিম— পায়খানায় খবরের কাগজ কেটে রাখা (টয়লেট পেপার-এর বদলে) আর 'ফ্লশ' টানার বদলে একটা হাতল তুলতে হয়! গ্রেনব্ল্কে ঘাঁটি করে আমরা গেলাম আল্প্স পর্বতরাজির ফরাসী শাখার কিছুটা দেখতে, এবং বিশেষ করে 'La Grande Chartreuse' বলে স্থানে, যেখানে আছে মধ্যযুগীয় এক খ্রীস্টান মঠ (সেখানকার সন্ন্যাসীদের বহুকাল ধরে খ্যাতি চমৎকার এক মদ তৈরি করার পারদর্শিতা নিয়ে!) আর আছে বাস্তবিক যেন জাদুতে ভরা চমৎকার পাহাড়ী দৃশ্য। আজ গেলে হয়তো সেই জাদুকে খুঁজে পাব না, কিন্তু বুড়ো বয়সের চোখকে বেশি বিশ্বাস করার তো কোনো কারণ নেই।

সম্প্রতি ক'মাস আগে আকাশ থেকে আজকের প্যারিস্ দেখলাম, Orly বিমান বন্দরে কিছুক্ষণ কাটালাম— মনে হল প্যারিসের চেহারা বদলেছে, ঢেঙা বাড়ির সংখ্যা বেড়ে কোনো কোনো পুরোনো এলাকাকে হয়তো বেমানান করেছে, কিন্তু একটু হাতে সময় থাকলেও শহরে ঢুকতে তেমন ঝোঁক হল না, হয়তো বা মোহভঙ্গেরও ভয় কিছুটা ছিল। বাস্তবিকই প্যারিস সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে ঐ 'মোহ' শব্দটি মনে পড়ে সব চেয়ে আগে— বিপুল, বিরাট, অনাত্মীয় লণ্ডন থেকে প্যারিস পৌঁছেই মনে হত কোন্ মন্ত্রবলে শহরের আকাশে বাতাসে এক অদ্ভুত প্রসন্নতা, কেউ যেন অনাহূত নয়, অবাঞ্ছিত নয়। কথাগুলো একটু আতিশয্য লাগতে পারে, কিন্তু 'সেন্' নদীর ধারে প্রকাণ্ড টিনের প্যাঁট্রায় ভরে রাখা পুরোনো বইয়ের দোকানের সারি যে দেখেছে, রাস্তার ফুটপাথ জোড়া রেস্তোরাঁয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে বসেছে, হঠাৎ পথের বাঁকে পুরোনো বাড়ির গায়ে ম্লান রোদের প্রলেপ দেখে যে চমকেছে,

কিম্বা ১৪ই জুলাইয়ের মতো দিনে (ফ্রান্সের জাতীয় দিবস, 'বাস্তিল্' দুর্গ পতনের বার্ষিকী) অচেনা ছেলেমেয়ের হাত ধরে শহরের পথে পথে যে ঘুরেছে, তার মনে এ কথাই কেবল আসে। এ থেকে কারো যেন ধারণা না ঘটে যে প্যারিসকে নিখুঁত বলার একটা গোলপাকানো চেষ্টা হচ্ছে— একেবারেই নয়, অন্তত প্যারিস-এর মতো শহরের হাজার খুঁত বার করা অতি সাধারণ ও সহজ ব্যাপার। তবে প্রকৃতই কেমন একটা মায়া জড়িয়ে আছে প্যারিসের সঙ্গে—একদা বিশ্বে বিপ্লবের পীঠভূমি বলে বন্দিত এই নগরীর সর্ব-মানবীয় চেতনা ও চরিত্র তাকে যেন একটা অদ্ভুত মনোরম বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। শুধু সৌন্দর্য এর কারণ নয়— প্রৌঢ় চোখে দেখা হলেও লেনিনগ্রাদ বা টিবিলিসি, সোফিয়া বা বুদাপেস্ট বা আল্মা আটা কম মনোহারী নয়— কিন্তু প্যারিসের মায়ায় আছে এক ধরনের অনির্বচনীয়তা, হয়তো যার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় মানসে নিয়ত অধিষ্ঠিত বারাণসীর মাহাত্ম্য (যার মূল ও অনুষঙ্গ সম্পূর্ণ পৃথক্) কতকটা তুলনীয়। কিঞ্চিৎ বাচালতা ঘটে যাচ্ছে ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি, কিন্তু ইয়োরোপীয় সভ্যতার গরিমা যদি পূর্বদেশবাসী আমাদের কোথাও অন্তরের টানে বাঁধতে পারে তো সে স্থান হল প্যারিস।

১৯৩১ সালের গোড়ার দিকে একটা ছুটি কাটিয়েছি ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলের নিকটবর্তী Isle of Wight-এ— সেখানে অল্প একটু ফরাসী প্রভাব কিন্তু সেটা ব্রিটেনেরই অন্তর্ভূত। বাস্-এ করে ছোট্ট দ্বীপটা ঘুরে ফেলা সহজ ছিল; শান্তভাবে (এবং সস্তায়) দিন গুজরান্ করা গিয়েছিল সমুদ্র-মেখলা পল্লীপ্রকৃতির পরিচ্ছন্ন পরিবেশে। তার আগে বড়োদিনের সময় কিছুকাল ছিলাম বেলজিয়মের কয়েকটা জায়গায়— বেশ মনে আছে লণ্ডন ছেড়েছিলাম বড়োদিনের ভোরে, পথ জনহীন, টিউব ট্রেনও প্রায় তথৈব, দিন তিনেক (এবং বিশেষত ২৫শে ডিসেম্বর) ইংলণ্ডের সব-কিছুরই ঝাঁপ বন্ধ, শুধু ঘরে ঘরে উৎসব, আহার্য ও পানীয়ের যথাসাধ্য প্রাচুর্য, আত্মীয়বন্ধু-সমাগম, কিন্তু সবই রুদ্ধদ্বার গৃহকক্ষে। সন্ধ্যার সময় যখন বেলজিয়মের রাজধানী ব্রাসেল্‌স্ পৌঁছলাম, তখন একেবারে উল্টো ছবি। ক্যাথলিক দেশের মানুষ ধর্মানুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান্ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের আনন্দে তাদের অবাধ উৎসাহ, 'প্রটেস্টাণ্ট' ইংলণ্ডের 'পিউরিটন্' কুণ্ঠা থেকে তারা মুক্ত, ঘরে বসে পারিবারিক স্বস্তিতে তাদের তুষ্টি নেই, পথেঘাটে সর্বত্র তাদের উল্লাস।

ব্রাসেল্‌স্‌ থেকে Bruges, Ghent, Antwerp প্রভৃতি দেখা গেল— মধ্যযুগীয় আবহাওয়া এখনো রয়েছে ব্রুজ-এর মতো শহরের প্রায় সর্বত্র, ঘুরে আসা গেল ওয়াটার্লু-র প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। ভ্রমণবৃত্তান্ত এটা নয়, তাই কথা বাড়াব না। শুধু বলতে ইচ্ছা করছে যে পুরোনো শহরগুলোর 'মার্কেট স্কোয়ার' জাতীয় জায়গায় প্রায় আমাদেরই মতো হাট ; মাথায় ওড়না-বাঁধা, মুখরা, প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিশালবপু পসারিণীর দল আমাদের এদেশেও নেহাত বেমানান্‌ হত না। ইংলণ্ডের তুলনায় ফ্রান্স এবং ফ্রান্সের তুলনায় বেলজিয়ম বেশ কম পরিষ্কার, যেটা অবশ্য আমাদের ভালো বই খারাপ লাগে না, কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হয়! ইংলণ্ডের তুলনায় সেখানে বর্ণবৈষম্যও কম— সাম্রাজ্যের ব্যবসা ফাঁদ্‌লেও তাদের মনোভাব (এবং সাম্রাজ্যচালনার কায়দা এবং মতলব) ইংরেজদের থেকে তফাত। অবশ্য ফ্রান্সেও বর্ণচেতনা এবং শ্বেতাঙ্গের উৎকর্ষবোধ যথেষ্ট; আমাদের কালে অত্যন্ত প্রিয় গল্পলেখক মোপাসাঁ-র একটা বর্ণনা আছে—ফরাসী সিপাহীর মা কিছুতেই, বহু চেষ্টা করেও, কাফ্রী পুত্রবধূকে বরণ করতে পারল না, বার বার পরীক্ষা করেও স্থির করল 'মেয়েটি লক্ষ্মী, কিন্তু বড্ড কালো!' কিন্তু ইংলণ্ডের তুলনায় ঐ-সব দেশে গিয়ে আমাদের স্বস্তি হ'ত, বোঝা যেত যে রঙটা আমাদের সবাই লক্ষ্য করছে বটে কিন্তু দৃষ্টি এমন নাকতোলা নয় যে, তা গায়ে এসে ফুটবে।

খুব সম্ভব এই সময় একবার লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া (রেল) স্টেশনে চ্যানেল পার হবার জন্য Boat train ধরতে গিয়ে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল যা ভুলতে পারি নি। ইংলণ্ডের বাইরে যাচ্ছি বলে পাসপোর্ট সঙ্গে ছিল এবং যেহেতু ট্রেন একেবারে Dover কিম্বা Folkstone-এর বন্দরে হাজির হবে তাই ট্রেনে ওঠার আগেই প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সময় টিকিট এবং পাসপোর্ট দেখাতে হল। আমার কপালে টিকিট চেকার-টি ছিল 'বব্বলে', আর তাই আমার কাগজপত্র দেখে এবং একটু কৃপানেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল: 'Ah, my boy, you have a *British* passport. With a *British* passport you are safe anywhere!' আজকের পাঠককে মনে পাড়িয়ে দিতে হবে যে তখন ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশের সম্পত্তি এবং আমাদের মতো অভাগাদের বিদেশ যাবার ছাড়পত্রে বড়ো বড়ো হরফে লেখা থাকত 'British

Indian Passport' যা হল মহামান্য রাজপ্রতিনিধি বড়োলাট সাহেবের হুকুমনামা। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে হঠাৎ যখন বাচাল রেল কর্মচারীর উচ্ছ্বাস স্মরণ করিয়ে দিল আমার কোনো নাগরিক সত্তা নেই, আমি ব্রিটিশের প্রজা মাত্র এবং আশ্রিত বলেই যৎকিঞ্চিৎ আমার অধিকার, তখন কেমন যেন জ্বালা অনুভব করেছিলাম যা এখনো স্মরণ করতে পারি। 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হওয়ার গ্লানি আর বেদনা, তা যেন অহরহ বিদেশের আপাতমনোরম দিন-যাপনের মধ্যেও খচ্‌খচ্‌ করত মনের মধ্যে— ধন্যবাদ দিই ঐ-ইংরেজকে যে তার সাম্রাজ্যগর্ব প্রকাশ করতে গিয়ে আমার সত্তায় অমন কশাঘাত করে জানিয়ে দিয়েছিল আমরা কোথায়।

* * *

যাকে ওখানকার অপভ্রংশে বলে 'Schools', সেই পরীক্ষা (Honour School of Modern History) দিলাম ১৯৩১ সালের জুন মাসে— ফল বেরুলে দেখলাম জীবনে প্রথম 'ফাস্ট্‌' (ক্লাস) অল্পের জন্য ফস্‌কে গেছে (ওখানে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি বলে নাম সাজায় না, শুধু ক্লাসের উল্লেখ করে, যদিও অনন্যসাধারণ পরীক্ষার্থী কেউ থাকলে সেটাও জানাজানি হয়ে পড়ে)। এই শিক্ষাটার দরকার ছিল, কারণ ক্রমান্বয়ে বহুবার এবং কতকটা ফাঁকির জোরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় একটা 'রেকর্ড' সৃষ্টি করে ফেলা গিয়েছিল— অস্বাভাবিক নয় যে সমসাময়িকদের মধ্যে অন্তত একজন বাঁকা রসিকতা করে আমার এক বন্ধুকে বলেছিলেন, 'কী হে, তোমাদের 'show-bottle'-এর কী হল?' মৌখিক প্রশ্নোত্তর ('Viva voce') চলেছিল মিনিট বিশেক, যা থেকে বুঝি আন্দাজ করা যায় যে পরীক্ষকরা তখনো ঠিক মনস্থির করতে পারেন নি। যাই হোক্‌, মনে একটা আঘাত পড়েছিল সন্দেহ নেই, অনভ্যাসের ফলে দুঃখকে ওদেশে অনেক ছাত্রের মতো অন্তত সাময়িকভাবে 'drowning in drink'-ও সম্ভব হয় নি! আগের বার ফ্র্যাঙ্ক মোরেস্‌ 'ফাস্ট' পায় নি, এ-ধরনের খবরে সান্ত্বনা ছিল না। একটু আশ্চর্য যে তখনো অক্স্‌ফর্ডে কোনো বাঙালী ছাত্র ইতিহাসে 'ফাস্ট ক্লাস' পায় নি, আমাদের পূর্ববর্তী সুশোভন সরকারের মতো মেধাবীও না। যতদূর জানি, আমাদের সময় পর্যন্ত ইতিহাসে যে তিনজন ভারতবাসী 'ফাস্ট' পেয়েছিল তারা সবাই কেরালার লোক— কুরুভিলা জ্যাকারিয়া,

কে. এম. পনিক্কর আর কে. পি. এস. মেনন। আমাদের আগে এবং পরে অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যখন বাস্তবিক ভালো ভারতীয় ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতেও জায়গা না পেয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে থেকেছে; অক্স্‌ফর্ডে বন্ধু পূর্ণেন্দুনাথ ঠাকুর মজা করে বলত যে ফ্রান্সে বেড়াবার সময় রেলস্টেশনের মুটে 'Quelle classe, monsieur?' ('কোন্ ক্লাস মশায়?) জিজ্ঞাসা করলে যেমন তার মামুলী জবাব, 'Troisiéme' ('তৃতীয়'), এ যেন তাই। উত্তর জীবনে শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে খ্যাতিমান্ অনেকেরই ছাত্রভাগ্যে এই বিড়ম্বনা ঘটেছে, কিন্তু তার উদাহরণের কোনো প্রয়োজন নেই।

ইতিমধ্যে Lincoln's Inn-এ নাম লেখানো হয়েছিল ব্যারিস্টারীর সনদ নিয়ে ফেরার জন্য; উপার্জনের রাজপথ বেয়ে চলতে পারব আশা করেই পরিবারের অপ্রতুল ভাণ্ডার থেকে একযোগে দুশো পাউণ্ড (যা সেযুগে কম টাকা ছিল না) জমা দিতে হয়েছিল, সুতরাং ব্যারিস্টারীর পরীক্ষাগুলো সব তখনো বাকি। তা ছাড়া ব্যারিস্টারীর বিষয়ে মনের ঝোঁক না থাকায় মতলব ছিল অক্স্‌ফর্ডেই গবেষণা করে আর-একটা ডিগ্রী নেবার। তখনো স্কলারশিপের মেয়াদ ছিল আরো পনেরো মাস— বাবার বন্ধু তখনকার একজন যশস্বী মানুষ, যতীন্দ্রনাথ বসু, চেষ্টা করেছিলেন যাতে তাঁর একান্ত অনুরাগী (স্যর্) ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র (তখন ইংলণ্ডে ভারতীয় হাই কমিশনর) আরো একবছর ঐ-মেয়াদ বাড়িয়ে দেন, কিন্তু ফল হয় নি। যতীনবাবুর সঙ্গে লণ্ডনে দেখা হয়; অমন অমায়িক ব্যবহার সে-যুগেও দুর্লভ ছিল; পল্লীতে (উত্তর কলকাতা) তাঁর জনপ্রিয়তা এমনই ছিল যে নির্বাচনে তিনি অপরাজেয় ছিলেন, শুধু ১৯৩০ সালে স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু প্রার্থী হয়ে তাঁকে হারাতে পারেন। 'লিবারল' রাজনীতির ঘাঁটি এই বসু পরিবারে পরে কম্যুনিস্ট ভাবধারার প্রভাব ও প্রসার কলকাতার একটা ঘটনা; যতীন্দ্রনাথের পুত্র সুনীলকুমার বসু (ন্যাশনাল বুক এজেন্সির একজন প্রধান), তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাক্তন লোকসভাসদস্য কমলকুমার বসু প্রভৃতি বেশ কয়েকজনেরই নাম এই প্রসঙ্গে করা চলে।

কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় গ্রীস ছাড়া ইয়োরোপের আরো একটা দেশ দেখার আকুলতা জন্মেছিল— সেটা হল Johan Bojer-এর নরওয়ে। ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মে সেই ইচ্ছা কিছু পরিমাণে পূরণ হয়েছিল— লণ্ডন থেকে ট্রেনে

নিউকাস্‌ল্‌ (কয়লার পীঠস্থান) গিয়ে সেখান থেকে জাহাজে বল্‌টিক সাগর পার হয়ে Bergen বন্দরে নামলাম। আর তারপর Hardanger এবং Sogne এই দুই fjord (সমুদ্রের শাখা) আর তার মধ্যবর্তী নানা মনোরম এলাকা তখন দেখেছিলাম। ও দেশে ইংরিজীর চলন বেশি বলে ঘোরা-ফেরায় কোনো অসুবিধা ছিল না; থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সুন্দর, রাস্তাঘাট ভালো, পাহাড় আর ঝরনার শোভা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। 'ফিয়র্ড'গুলো যেন সমুদ্রের বাহু যা স্থলপথে গভীর খাত কেটে দু পাশে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ঠেলে চলেছে, তার আঁকেবাঁকে নিসর্গের বহুবিচিত্র হাতছানি, সব মিলে চমৎকার লেগেছিল। আজকের চোখে কেমন মনে হবে জানি না, কিন্তু তখন যে মন ভরে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই; তবু খেদ ছিল যে অর্থ পর্যাপ্ত ছিল না বলে আরো উত্তরে যাওয়া ঘটে নি, যেতে পারি নি Hammer-fest-এর মতো জায়গায়, যেখানে জুনমাসে মধ্যরাত্রেও বুঝি সূর্যালোক থাকে (অবশ্য বহু পরে লেনিনগ্রাদের মতো স্থানে গ্রীষ্ম কাটিয়েছি, যেখানে রাতের অন্ধকার বলে কোনো বস্তুই যেন নেই)। এখনো মনে জাগে Sognefjord-এর ধারে হোটেল-বারান্দা থেকে দেখা পূর্ণ চাঁদের ছবি, জলের বিস্তৃতি আর পাহাড়ের গাম্ভীর্য— আর আব্‌ছা-আলোর মাঝখানে মস্ত এক চাঁদ, কিন্তু রঙ যেন একটু ফিকে, ভাব যেন একটু বিষণ্ণ— কলেজে-পড়া শেলীর লাইন: 'Art thou pale for weariness, wandering compa-nionless…' তখন যে আজকের চেয়ে অনেক বেশি আত্মীয়! এখনো চোখের সামনে দেখতে পারি, হোটেলের বাগানের দুদিকে নেমে গেছে পাহাড়ের ঢল্‌, ডাইনে বাঁয়ে তুমুল শব্দ করে ঝুলছে দুই বিরাট ঝরনা— দু'ধারে উঁচু পাহাড়ের মাঝ দিয়ে অন্ধকার, ঘোরালো পথ, অথচ উপরে ঝলমল্‌ রোদ, আর কিছু পরে Gudvangen-এর 'ফিয়র্ড'-কূলবর্তী ছোট্ট বন্দর। তিনধারে পাহাড়, গ্রীষ্ম ঋতুতেও তার চূড়ায় কিছু বরফ। স্টীমারে খাওয়ার ঘরে গ্রাম্য কাঠের টেবিল চেয়ার, ভাজা মাছের গন্ধ চার দিকে। মানুষের ভিড় কিন্তু উৎসুক চোখেও অশিষ্টতা নেই। 'ফিয়র্ড'-এর ধারে ছোটো ছোটো বন্দরে স্টীমার থামছিল— এক জায়গায় দেখলাম গ্রাম্যবধূ প্রিয়জনকে বিদায় দিতে এসেছে, মুখে বিরহবিধুর সারল্য এমন একান্ত ছাপ দিয়েছে যার তুলনা বোধ হয় কখনো দেখি নি (হয়তো এটা কল্পনা, কিন্তু সে-ছবি

আজও মনে আছে)। আর এক জায়গায় রাত্রি যাপনের পর সকালে খাবার ঘরে দেখলাম এক যুগলমূর্তি, উভয়ে নিতান্ত তরুণ, একেবারে নিজেদের মধ্যে মগ্ন, শুধু একবার জানলা দিয়ে ঝলকে-আসা রোদের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসল। পরস্পরের কাছে অবোধ্য ভাষায় কিছু কথা হল, পরে মোটরে একসঙ্গে যাবার সময় পথে এক গ্রামে তারা নেমে গেল, পাহাড় বেয়ে হাত ধরাধরি করে ওঠার সময় কয়েকবার ফিরে রুমাল নাড়ল—আমার মনে আসছিল রবীন্দ্রনাথের লাইন : 'গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতন ছড়িয়ে পড়ে'। কেমন যেন মনে হয়েছিল যে ঐ দুজন অন্তত তখনকার মতো একান্ত এবং একাত্মভাবে সুখী, আর সুখের ভাগ অপরকেও তারা দিতে চাইছে। কেবলই নরওয়েতে মনে হ'ত যে চার দিকে নিসর্গ শোভা যেখানে অত বেশি, সেখানে মানুষ বোধ হয় সুখী, বোধ হয় পরস্পরের সুখও সেখানে সবার কামনা— কিন্তু জানি এ হল স্বপ্নবিলাস, জীবনের কঠোর কঠিন জটিলতার লয়-সাধন কোনো ভূস্বর্গেরই কর্ম নয়। পরে তো আমাদেরই নিজস্ব কাশ্মীর বারবার দেখেছি, প্রকৃতির অপার শোভা আর মানুষের অপরিমেয় দৈন্য সেখানে আজও সহাবস্থান করছে।

একত্রিশ সালের দীর্ঘ গ্রীষ্মকালে আর-একবার বার হওয়া গেল মোটরে ওয়েল্‌স্‌ এবং ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ-বন্দিত Lake District হয়ে স্কটল্যাণ্ডের Trossachs হ্রদ পর্যন্ত— ফেরত পথে ওয়াল্টার স্কট-এর Abbotsford এবং তারপর Durham, York, Lincoln প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত শহর দেখে আসা। গাড়িটি ছিল দেখবার মতো— পুরোনো বাজার থেকে বোধ হয় পাউণ্ড পাঁচেক দিয়ে কিনে তার ওপর আরো পাঁচ সাত কিম্বা মেরে কেটে দশ পাউণ্ড মেরামতী খরচ করে তাকে খাড়া করে দেখা গেল খাসা জিনিস; কতকটা রঙ-চটা 'টব'-এর মতো দেখতে হলেও ক্ষতি কি? 'ভার্সিটি'-র (Varsity) খ্যাতিও ওদেশে এমন যে ছিটগ্রস্ত মানুষও সেখানে বেমানান্‌ নয়, সাধারণ বিচারে 'বেঢপ্‌' গাড়িরও কোনো অমর্যাদা নেই। তুলনীয় এক গাড়িতে কলকাতায় পরে বহুবার চড়েছি আমার স্নেহভাজন পার্টি-সাথী শ্রীমান্‌ দিলীপকুমার বসুর কল্যাণে— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চৌরঙ্গী কিম্বা রেড রোডে 'জীপ' থেকে মুখ-বাড়ানো আনুনাসিক মার্কিন গলা থেকে একবার দিলীপ শুনেছিল : 'Hi, buddy, why don't you sell this tub

and buy a nice rickshaw ?' যাই হোক্, অক্স্‌ফর্ডে এই বিচিত্র গাড়ির মালিকও কম বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন না। আমাদের চেয়ে বয়সে বেশ বড়ো, অথচ সর্বদা হাসিতে উচ্ছল; লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজী পড়াতে পড়াতে এসেছিলেন বিদেশী ডিগ্রীর সন্ধানে; নামটি বেশ জমকালো, Francis Theodore Roy, উত্তর প্রদেশের খ্রীস্টান বংশে তাঁর জন্ম; 'F.'T.' ওরফে 'Fatty' নামেই পরিচয় ছড়িয়ে পড়েছিল। সদাপ্রফুল্ল মানুষটিকে কেউ বয়স্ক ভাবতে পারত না। মেদাধিক্যের উল্লেখে তাঁর বদন আরো হাস্যোৎফুল্ল দেখাত। এঁর সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল স্কটিশচর্চ কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র এবং শিক্ষক মহীমোহন বসুর, যিনি আমাদের কিঞ্চিৎ 'সিনিয়র' হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩০ সালে অক্স্‌ফর্ডে Oriel College-এ যোগ দেন। সমাজ-সেবায় শ্রুতকীর্তি খ্রীস্টান পরিবারের এই মানুষটির বৈশিষ্ট্য কলকাতার বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু আমার আশঙ্কা যে তাঁর গুণাবলীর পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্র বোধ হয় এখানে কতকটা সংকুচিত থেকেছে। আমার সঙ্গে তাঁর মিত্রতা বহু বিষয়ে পরস্পর মতভেদ সত্ত্বেও অটুট থেকেছে— লিখতে বসে মনে পড়ছে আমায় তিনি একবার একটা মস্ত সাহায্য করেছিলেন। ১৯৩২ কিম্বা '৩৩ সালে অধ্যাপক জ্যাকারিয়া আমাকে জানান যে আমি যদি তাঁর জন্য অক্স্‌ফর্ডের High Street-এ Minty নামে যে furniture-এর দোকান আছে সেখান থেকে এক ধরনের আরাম-কেদারা এনে দিতে পারি তো তিনি সুখী হবেন। আমি নিজে আলুসে এবং অকেজো মানুষ; জ্যাকারিয়া সাহেবের অক্স্‌ফর্ড-প্রীতি যে এতদূর যাবে ভাবতে পারি নি। হাসিও পেয়েছিল এই মমতার আধিক্যে, কিন্তু তাঁকে 'না' বলতে মন সরছিল না। মহীমোহন বসুকে বলতেই তিনি সানন্দে রাজী হয়েছিলেন; একেবারে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ-ভবনে চেয়ার পৌঁছে দিয়ে এবং জ্যাকারিয়ার আনন্দে অংশীদারী করে তিনি আমায় এক দায় থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

'রয়' এবং বোস্‌-এর সঙ্গে মোটরবিহার ছিল একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা। প্রথমে শেক্‌স্‌পীয়রের জন্মস্থান স্ট্র্যাটফর্ড্‌-অন্‌-এভন্‌ হয়ে উর্স্টার (সুন্দর 'কেথাড্রল' এবং নদী) হেরেফর্ড ইত্যাদি পার হয়ে ওয়েল্‌স্‌-এর Bettys-y-coed নামে এক আশ্চর্য রমণীয় গ্রাম দেখা, পরে Snowdon পাহাড়ে (ব্রিটেনের সর্বোচ্চ) চড়া, কার্নারভন্‌ প্রাসাদ ইত্যাদি দেখে এবং উত্তর ইংলণ্ডের

শিল্পনগরগুলো কাটিয়ে Lake District-এ কিছুকাল যাপন, ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের Dove Cottage দেখা (উচ্চারণ ওখানে করে 'ডুভ') এগিয়ে Cheviots গিরিশ্রেণী ডিঙিয়ে স্কটল্যাণ্ডে, এডিনবরার প্রাচীন অথচ মনোহারী রূপ উপভোগ করা, ছুটে চলা স্কটিশ হ্রদগুলোর দিকে এবং Trossachs-এর ধারে হোটেলবাস, ফেরার পথে Durham, York এবং Lincoln-এর গম্ভীর সুন্দর গির্জা ('কেথীড্রল্') দেখা— গোটা ব্রিটেন না হলেও তার অনেকটার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় তখন হয়েছিল। স্বীকার করতে বাধা নেই, ভারি সুন্দর লেগেছিল দেশটাকে; উত্তরে বহু জায়গায় আছে এক ধরনের রূঢ়তা যা ভালো লাগে দক্ষিণের কেমন যেন সাজানো নৈসর্গিক শোভা থেকে তফাত বলে। ভালো লেগেছিল আধা-শহর এবং পল্লী অঞ্চলের মানুষকে; সাম্রাজ্যবাদী কুসংস্কারে তাদের মন ভরা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষ হিসাবে তাদের খারাপ ভাবতে মন চায় নি। রাস্তায় মোটর যারা চালাচ্ছে তাদের মধ্যে পরস্পর সৌজন্যের ছবি আজও মনে আছে, কারণ দেশে তার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখি না। যাই হোক্, ফেরা গেল স্বস্থানে। অক্স্‌ফর্ড্‌ই তখন যেন ঘরবাড়ি, জীবনযাত্রার পুরোনো সূতোগুলো আবার ধরা গেল— হুমায়ুন থেকে গেল গবেষণা করবে বলে, ফ্র্যাঙ্ক মোরেস্ বা মহমুদুজ্জাফর বা ইফ্‌তিখারউদ্দীন, গোবিন্দ স্বামীনাথন্-এর (ঝান্সীর রানী ব্রিগেডের নায়িকা ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর ভ্রাতা, বর্তমানে মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট জেনারেল) মতো বন্ধু তখন চলে গেছে, নতুন মুখ আসছে বা এসেছে দেশ থেকে— যেমন Eric da Costa (পরবর্তী জীবনে কিছুকাল *Eastern Economist*-এর সম্পাদক) প্রশান্তকুমার বসু (বঙ্গবাসী কলেজের অজাতশত্রু অধ্যক্ষ), গোপালচন্দ্র ব্যানার্জী (বোম্বাইয়ের D. P. I.) এবং এলফিন্‌স্টোন্ কলেজের অধ্যক্ষ) কে. সি. আঢ্য (সেণ্ট পল্‌স্ কলেজের অধ্যক্ষ), স্বনামধন্য সাহিত্যিক অমিয় চক্রবর্তী, মহীশূরের বিখ্যাত দেওয়ান স্যর মির্জা ইসমাইলের ছেলে হুমায়ুন মির্জা আর শেষের দিকে আন্‌কোরাদের মধ্যে শঙ্কর মিত্র (স্যর্ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের সুকণ্ঠ পুত্র), জে. কে. ('মক্কি') অটল (তেজবাহাদুর সপ্রুর দৌহিত্র, আই. সি. এস্., পাকিস্তানে কিছুকাল ভারতীয় রাষ্ট্রদূত), ভারতী সারাভাই (ইংরিজী কবিতা-লিখিয়ে), হিম্মৎসিং (বর্তমানে গুজরাটের এক প্রমুখ নেতা)। তালিকা বাড়ানো যায় কিন্তু থাক্; এদের সম্বন্ধে কিছু কিছু

কথা পরে উঠবেই, নইলে ছবিতে ফাঁক পড়ে যাবে। আবার আরম্ভ হল বিদ্যাপুরীর জীবন, যেখানে অধ্যয়ন প্রকৃতই তপস্যা অথচ সঙ্গে সঙ্গে হাসি খেলা, প্রমোদ আর হাজার গভীর প্রশ্ন নিয়ে সবাই মেতে থাকে। মনে পড়ছে George Webb Medley Scholarship পরীক্ষা দেবার আগে Eric da Costa আমার কাছে এসে তখনকার সদ্য উত্থিত 'Oxford Movement' (যাকে অবলম্বন করে 'Moral Rearmament'-খ্যাত ফ্র্যাঙ্ক বুখমান্ প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন) নিয়ে কথা বলছে, আমি ঠাট্টা করলেও গম্ভীর হয়ে বলছে সব চেয়ে জরুরি হল 'Perfect Love, Perfect Honesty, Perfect Unselfishness, (কিম্বা ঐ রকম কোনো প্রবচন), অনেকে মিলে ধ্যান করা এবং প্রত্যেকের পাপ স্বীকার ('confession') করা— তখন কিন্তু এরিক্ সোশালিজম্-এর শত্রু ছিল না, পরে Buchman-এর মতোই নিদারুণ কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী হয়েছিল। মনে পড়ছে কারাকা, Tony Greenwood (পরে লেবর সরকারে ক্যাবিনেট মন্ত্রী) প্রভৃতি কজন বন্ধু আমার 'digs'-এর পিছনে বাগানে টেনিস বলে ক্রিকেট খেলছে, জলন্ত সিগারেট কারো জিম্মায় দিয়ে বল করতে ছুটছে! মনে পড়ছে Balliol কলেজের ঘরে কে. সি. আচ্যের খ্রীস্টান বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক— ঈশ্বরে বিশ্বাস বিনা জীবনদর্শন তাদের কাছে যেন অকল্পনীয়, ভারতীয় চিন্তায় নিরাসক্তি বিষয়ে দু-একটা প্রায় অজ্ঞ মন্তব্যেই তারা বিমূঢ়, কিন্তু জিজ্ঞাসু মন তাদের বিচলিত, নিদিধ্যাসনের জন্য উদ্যত।

* * *

বছর দেড়েকের মধ্যে D. Phil. ডিগ্রী পাওয়া আকাশকুসুমের মতো ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও নাম লেখালাম, আর তখন মনে যে নির্বুদ্ধিতা ঢুকেছিল তারই ফলে কিছুটা দর্পভরে ভাবলাম যে ওদেশে ভারতীয় গবেষকদের মতো ভারতবর্ষের ইতিহাস-সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে কাজ না করে ওদেরই ইতিহাস নিয়ে লিখব। টিউটর-এর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল যে আমার 'থীসিস' হবে 'English Constitutional History and Political ideas from the Death of Oliver Cromwell to the Fall of Clarendon 1659-67'— আমার কাজের তদারকী করলেন প্রথমে G. N. Clark, যাঁর *The Seventeenth Century* তখন প্রকাশিত হয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, পরে তিনি

হন Chichele Professor of Economic History, প্রকৃতই তাঁর বিদ্যায় প্রতিভার ছটা ছিল। তাঁর কাছ থেকে আমরা কয়েকজন কিছুকাল biblio-graphy বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলাম— আমার সঙ্গে ছিল M. P. Ashley, যে পরে সপ্তদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাসেব একজন মুখ্য বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত হয়। ক্লার্ক্-এর চিন্তাধারা ছিল 'লিবারল'; তবে বাস্তবিকই ব্যুৎপত্তিতে ছিল মানসিক ঔজ্জ্বল্যের লক্ষণ এবং লিখনভঙ্গীও ছিল আকর্ষণীয়। কেম্‌ব্রিজে Ford Lectures দিতে যাওয়ায় তিনি আমাব কাজ 'Supervise' করার ভার দিয়ে যান আর-এক বিখ্যাত অক্স্‌ফর্ড্ বিদ্বানের কাছে— Keith Feiling থাকতেন Christ Church-এ, ভারতবর্ষের সঙ্গে তিনি একটু পরিচিত, রাজনীতিতে কঠোর 'Tory' (*A History of the Tory Party till 1713* নামে তাঁর গ্রন্থের সুখ্যাতি তখন সর্বত্র), কেমন যেন সাম্রাজ্যবাদী গন্ধ থাকলেও ব্যবহারে নিখুঁত। একেবারে শেষের দিকে তৃতীয় এক 'don' আমার কাজ দেখছিলেন— নাম তাঁর হল David Ogg, চিবিয়ে কথা বলেন, সুরসিক অথচ কৌতুক সর্বদা একটু খাপে ঢাকা, মতামত প্রকাশে অকুণ্ঠ। চতুর্দশ লুই সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থে আছে চূড়ান্ত চমকপ্রদ রায়: "The most criminally stupid man in history, he [Louis xiv], exercises on posterity an influence, second only to that of Napoleon, in its baneful fascination for the shallow and flashy mind." নিউ কলেজে তাঁর ঘরে গিয়ে কাজ ও অকাজ সম্পর্কে বেশ সরস আলোচনা হ'ত —তখন নিউ কলেজের Warden ছিলেন বৃদ্ধ হার্বার্ট ফিশার, ইতিহাসে কলেজের খ্যাতি ছিল, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সজ্জাদ জহীর (এবং তার পরিবারেব আরো কয়েকজন) সেখানকাব ছাত্র। যাই হোক্, গবেষণা চলতে থাকল মন্দাক্রান্তা চালে; বড্‌লীয়ন লাইব্রেরিতে, লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ এবং পাবলিক রেকর্ড অফিসে ও অন্যত্র সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থ, পুস্তিকা আর বিশেষ করে হস্তালিপি ('manuscripts') ঘেঁটে আনন্দ মিলেছিল। তবে ভুল করেছিলাম এই যে S. R. Gardiner, Charles Firth, J. R. Tanner-এর মতো মহারথী যে এলাকায় কাজ করে গিয়েছেন সেখানে আমার মতো অর্বাচীনের প্রবেশাধিকার ছিল না; ইংরিজী প্রবচন তো সুবিদিত যে নির্বোধ ছুটে চলে সেদিকে যেখানে দেবদূতেব পদক্ষেপও কুণ্ঠিত।

১৯৩১ সালের Michelmas term-এর (অক্টোবর-ডিসেম্বর) গোড়ার দিকে অক্স্‌ফর্ডে পদার্পণ করলেন মহাত্মা গান্ধী ; তিনি এসেছিলেন বড়োলাটের সঙ্গে চুক্তির ফলে লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে ; একাই কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করলেন যদিও সঙ্গে ছিলেন সরোজিনী নাইডু আর মদনমোহন মালব্য। ভারতীয় মজলিসে একরাত্রে এলেন শ্রীমতী নাইডু এবং বৈঠকে যোগদাত্রী অপর দুই মহিলা— বেগম শাহ্‌ নওয়াজ ও শ্রীমতী রাধাবাঈ সুব্বারায়ন্‌। বাগ্মিতায় শ্রীমতী নাইডুর তুলনা নেই, কিন্তু সেদিন তাঁর বক্তৃতায় দীপ্তি থাকলেও কেমন যেন কৃত্রিমতার আভাস ছিল ; বলার ধরন এবং ইংরিজী কতকটা নিরেশ হলেও বেগম শাহ্‌ নওয়াজকে মন্দ লাগল না, আর চমৎকার লাগল শ্রীমতী সুব্বারায়নের সহজ সারল্য। পণ্ডিত মালব্যের একটা বক্তৃতা কলকাতায় দূর থেকে শুনেছিলাম, মনে ছাপ ছিল না ; বিদেশে ভালো লাগল, মনে হল সুমার্জিত ব্যক্তিত্বের আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছে, ভারত-সংস্কৃতির স্থিতধী প্রতিনিধি যেন তিনি। গান্ধীর আগমনে সারা ব্রিটেনে চাঞ্চল্য পড়েছিল— বিপদ হল এই যে প্রচারের চাপে এবং স্বয়ং গান্ধী মহারাজের ধরনধারণের ফলে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, সংগ্রামী জননেতা রূপে সর্বসমক্ষে প্রতিভাত না হয়ে সাধারণের চোখে তিনি দেখা দিলেন কেমন যেন এক অসাধারণ অথচ উদ্ভট মানুষ হিসাবে, যাঁকে জগদ্‌-গুরু বলে কেউ কেউ মানতে চাইলেও স্বাধীনতার কঠোর লড়াইয়ের নায়ক ভাবা শক্ত। এর জন্য দায়ী প্রধানত তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেরা— বিশ বৎসর আগের রবীন্দ্রনাথকে যেমন ঋষি আর 'mystic' বলে প্রচারের ফলে তাঁর সহস্রমনা সৃষ্টির সংবাদ বিদেশে অবিদিত থেকে গিয়েছিল, তেমনই ১৯৩১ সালে গান্ধীর বেলায় পাশ্চাত্যের লোক যেন ভারতবর্ষের 'জনগণমন-অধিনায়ক'-কে দেখল এক বিচিত্র অথচ সৎ, সাহসী, স্পষ্টভাষী সাধুকে, সংগ্রাম যার স্বভাব নয়, কূটনীতির খেলায় যিনি পরাজিত হয়েও গ্লানিবোধ করেন না, দেশের মুক্তির চেয়ে অহিংসা নীতির প্রচারই যাঁর মুখ্য অন্বিষ্ট।

সরকারী আতিথ্য গ্রহণ না করে গান্ধীজী রইলেন তাঁর সহকর্মী Quaker-দের এক আড্ডায়। সেখানে অত্যন্ত সাদাসিধে কায়দায় চলল তাঁর কয়েক সপ্তাহের জীবন ; ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে দ্রুত প্রাতঃভ্রমণ (যার চাপে সঙ্গী দুই ইংরেজ গোয়েন্দার মন 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছেড়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু

অদ্ভুত মানুষটির মায়ায় তারা মুগ্ধ হয়, যাত্রাশেষে সানন্দে পকেটঘড়ি উপহার নেয়); ছাগদুগ্ধ সেবন, কটিবস্ত্র পরিধান করে থাকা (শীত এড়াবার জন্য মাত্র একটি আলোয়ান জড়ানো), ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিত আলাপ, বিচরণ, বক্তৃতা, নিয়ত কর্মব্যস্ত হয়েও সদা হাস্যানন। স্বয়ং চার্লি চ্যাপ্‌লিন গিয়ে দেখা করলেন; গান্ধী বুঝি পূর্বে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানার অবকাশ পান নি— মনে হয় অবিশ্বাস্য ঘটনা, কিন্তু গান্ধীর ক্ষেত্রে একেবারে সত্য— কিছু তাতে আটকায় নি, বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী পরিতৃপ্ত হলেন গান্ধীর সাহচর্যে, নিজের অজ্ঞাতসারে গান্ধীও যে ছিলেন এক প্রকৃত জীবনশিল্পী। বার্নার্ড শ' গেলেন— যে শ' সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড্‌ রাসেল লিখেছেন যে, একবার Henri Bergson-কে শ' বললেন আপনার 'Creative Evolution' দর্শনটা তাঁর চেয়ে শ'-ই বোঝেন ভালো আর বের্গসঁ ক্রুদ্ধ অথচ কেমন যেন অপ্রতিভ ধরনে শ'য়ের দীর্ঘ ব্যাখ্যা শুনলেন এবং গোমরালেন; যে শ' নাকি চেকো-শ্লোভাকিয়ার জনক বলে খ্যাত অধ্যাপক Masaryk কে হতভম্ব করেছিলেন তাঁর বৈদেশিক নীতি একেবারে ভুল এই কথা দশ মিনিটে ঝড়ের মতো বুঝিয়ে দিয়ে এবং মাসারিক-এর জবাব না শুনে (এটাও রাসেলের গল্প)। গান্ধীর সঙ্গে লণ্ডনে দেখা করে শ' স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় বললেন যে তিনি স্বয়ং হলেন 'Mahatma Minor' এবং গান্ধী হলেন 'Mahatma Major'! আমাদের অক্স্‌ফর্ডে গান্ধীর পুরোনো অনুরাগীদের মধ্যে ছিলেন Gilbert Murray. H. A. L. Fisher, A. D. Lindsay প্রভৃতি। শোনা গেল বেশ খানিকটা সময় নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে যে আলোচনা তাঁরা করেন তা বুঝি খুবই উচ্চস্তরের ছিল, সওয়ালজবাবে গান্ধী তাঁর কোট বজায় রাখতে পেরেছিলেন। শুনে আমরা কিছুটা উল্লাস বোধ করি, কারণ গোলটেবিল বৈঠকে, একেবারে একা কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে, চতুর ভেদাভেদবিদ্যাবিশারদ ইংরেজ রাজনীতিকদের (ব্যাম্‌জে ম্যাকডনাল্‌ড, স্যামুয়েল হোর, লর্ড স্যাঙ্কি ইত্যাদি) সঙ্গে পাল্লা যেন দিতে পারছিলেন না, হিন্দুমুসলিম সমস্যার সমাধানভার শেষ পর্যন্ত দুঃশীল সাম্রাজ্যবাদীদের হাতেই তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল। যাক্‌ সে কথা— বেশ মনে আছে তিনি গেলেন বাকিংহাম প্রাসাদে রাজা পঞ্চম জর্জ-এর সঙ্গে দেখা করতে, কটিবস্ত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটল না, বিস্মিত সাংবাদিকরা তাঁর পরিধেয়ের স্বল্পতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে জবাব দিলেন:

'তোমাদের রাজার পরিধানে ছিল এত বেশি জামা-কাপড় যে তা আমাদের দুজনের পক্ষে পর্যাপ্তেরও অনেক বেশি!' সবাই হাসল এবং বুঝল যে মানুষটির হৃদয়ের অভ্যন্তরে কোথায় যেন আছে অফুরন্ত আনন্দের উৎস, যা তাঁর সব-কিছু কৃচ্ছ্রসাধনকে ছাপিয়ে ওঠে। একদিন বললেন ইংরেজ সাংবাদিকদের 'আজকাল দেখি তোমরা অনেকে পরছো 'plus-fours'; তা ভালো, আমার পোষাক কিন্তু হল 'minus-fours'!'

কাগজে পড়লাম ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর যাওয়ার খবর— সেখানকার কাপড়-কলের শ্রমিকরা প্রথমে ছিল একেবারে খাপ্পা, কারণ গান্ধীর খাদি আন্দোলনে তাদের অনেক লোকসান ঘটেছে। কিন্তু কোন্ এক মায়ামন্ত্রে গান্ধী তাদের মুগ্ধ করলেন, ল্যাঙ্কাশায়ারের বহুস্থানে তাঁর অভ্যর্থনা হল বিপুল। নিজের চোখে দেখলাম আত্মিক মহিমার ছবি, যখন অক্স্‌ফর্ডের এক হলে তাঁর সভা হল; পায়ে চপ্পল, পরনে খাদি কটিবস্ত্র, ছাই রঙের একটা মোটা আলোয়ান গায়ে জড়ানো, সেদেশের অক্টোবর মাসের পক্ষে নিতান্ত অযথেষ্ট এই পরিচ্ছদ, কিন্তু কোথায় যেন এই নিঃস্ব, তুচ্ছ, দীনহীন ভারতীয়ের মধ্যে ছিল এক প্রচ্ছন্ন অথচ প্রোজ্জ্বল রাজকীয়তা— তাই তাঁর প্রবেশমুহূর্তেই সবাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তিনি আসন গ্রহণ না করা পর্যন্ত কেউ বসল না। কেউ কাউকে বলে নি দাঁড়াতে, সেদেশে সাধারণত সভায় ওভাবে দাঁড়িয়ে কাউকে সম্মান জানাবার রেওয়াজও নেই (যদি না বিশেষ ব্যতিক্রমের কারণ ঘটে), অথচ কোন্ এক অনুক্ত নির্দেশ সবাই মানল, চোখের সামনে ভারত-আত্মার মূর্ত বিগ্রহকে দেখছে বলে যেন মাথা নত করল।

আমার পূর্বাভ্যস্ত গান্ধীভক্তি কিন্তু কিছুকাল ধরে যে হ্রাস পাচ্ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ত্রিশের দশকে জগৎজোড়া অর্থসংকট ব্যাপারটাকে ওদেশে বাস করে অন্তত একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা না করা সম্ভব ছিল না। বিপন্ন বোধ করে ধনিকশ্রেণী তার স্বার্থসিদ্ধির রাস্তা খুঁজছিল— ইতালীতে বিশেষ পরিস্থিতিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে যে ফ্যাশিজ্‌ম্‌-এর উদ্ভব ঘটেছিল তারই বিবিধ সংস্করণ নানা দেশে দেখা দিচ্ছিল। ব্রিটেনে কম্যুনিস্ট পার্টির দিকে ঘেঁষে অভিজাত-বংশোদ্ভব Oswald Mosley নাম কিনে উলটো পথে গেলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন একদল যা পরে খোলাখুলি British Union of Fascists নামে কুখ্যাতি কুড়োল (ফ্রান্সে কতকটা অনুরূপভাবে দেখা গেল

Jacques Doriot-কে)। 'কনসার্ভেটিভ' লিবারল এবং ভাঙা 'লেবর' দলের একাংশ নিয়ে র‍্যামজে ম্যাক্‌ডনাল্‌ডের 'জাতীয়' সরকার যে চেহারা দেখাল তা আমাদের মতো পরাধীন দেশ থেকে আসা ছেলেদের চোখে ছিল কদর্য। তখন এবং পরে সারা বিশ্বের ফ্যাশিস্ট দুষ্কর্মের সাফাই গেয়েছে এবং তাকে মদদ্ দিয়েছে 'গণতন্ত্রপ্রেমী, ব্রিটিশ সরকার— চীনের বিপক্ষে জাপানী ফ্যাশিজ্‌ম্-এর প্রথম নোংরা দৌরাত্ম্যের সবচেয়ে ধুরন্ধর সমর্থক তখনকার 'লীগ্ অফ নেশন্‌স্'-এ ছিল ব্রিটেন, আর বুর্জোয়া বিপ্লবের পীঠস্থান ফ্রান্স ছিল তার পার্শ্বচর। আমাদের সঙ্গে যে সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরোধ, গণতন্ত্রের নামাবলী-পরা তার ভণ্ড মূর্তি ওদেশে বসে দেখতে পাওয়া সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। পরাধীনতার যাতনা কী বস্তু তা বিদেশবাসকালে নিরন্তর অনুভব করা যেত, সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ত এমন বহু ব্যাপার যার অর্থ আধুনিক জগৎকে বোঝবার প্রখর প্রয়াস বিনা বোধগম্য হত না। ফলে সাম্রাজ্যবাদের বহুরূপী কৌশল ও দৌরাত্ম্য বিষয়ে চেতনা জাগরূক হওয়ার সম্ভাবনা ঘটত। ইংলণ্ডের মতো গণতন্ত্রে অগ্রসর বলে পরিচিত দেশে শ্রেণীভেদ যে কত কুটিল এবং কঠোর, সেখানকার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় জনতাকেও যে কত অসাম্য ও দুর্ভোগ সহ্য করে চলতে হয়, তার দৈনন্দিন পরিচয় মিলত। তা ছাড়া ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধ জুড়ে ইউরোপে সাম্যবাদী চিন্তা ও প্রভাবের বিপুল ব্যাপ্তি ঘটেছিল, আর আমরাও সেই অভিজ্ঞতায় কথঞ্চিৎ অংশীদারী করতে পেরেছি। তবে আমাদের সর্ব-কর্ম-চিন্তা-আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভারতবর্ষ বলে সমসাময়িক সমাজে বিবর্তন বা বিপ্লবের বিবিধ আভাস বিদেশে বসে বুঝতে গিয়ে বোধ করি মূলগতভাবে ভারতবর্ষীয় পরিস্থিতিকেই অনেকটা বুঝতে পেরেছি। দূরায়ত দৃষ্টির হয়তো একটা বিশেষ মূল্য আছে— তাই ইংরিজী কবিতার পঙ্‌ক্তি একটু বদলে বলা যায়: 'What does he know of India who only India knows?'

ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি আমাদের তৎকালীন আকর্ষণের প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে ছিল এই যে তারা ভিন্ন সেদেশে আর কেউ ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার অকুণ্ঠ সমর্থক ছিল না। অন্য কোনো গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষ ঐ বর্ণ-চেতনার দেশে আমাদের মতো কৃষ্ণাঙ্গকে একেবারে সহজ এবং স্বচ্ছ মনে সৌহার্দ্য দিতে প্রস্তুত ছিল বলেও মনে হয় না। প্রায় অসম্ভব পরিস্থিতিতে

শত্রুশক্তিপুঞ্জের প্রচণ্ড এবং প্রবল চক্রব্যূহ ভেদ করে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে একক হয়েও সোভিয়েট সোশালিস্ট সংঘের অভ্যুদয় তখনকার জ্যোতির্ময় ঘটনা। ১৯২৮ সালে কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহে একদেশ-দর্শিতা ছিল কিনা, এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক চলে চলুক, কিন্তু সমাজসত্য অনুধাবনে এবং বাস্তব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিপ্লবের সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা আমরা পেয়েছি তখনকার ইংলণ্ডে নাতিদুর্লভ কম্যুনিস্ট সাহিত্য থেকে। বেশ কিছুকাল আমার মনে ছিল ট্রট্স্কি সম্বন্ধে প্রভূত শ্রদ্ধার অনুভূতি; Gollancz যখন তিনখণ্ডে ট্রট্স্কির লেখা রুশ-বিপ্লবের ইতিহাস প্রকাশ করেন, তখন বেশ কিছু উন্মাদনাই তা থেকে পেয়েছি, এবং বিচলিত হয়েছি সোভিয়েট নেতৃত্ব থেকে ট্রট্স্কির নির্বাসন লক্ষ্য করে। তখনো স্টালিনের Problems of Leninism ইত্যাদি রচনা পড়ি নি, সোভিয়েটের বিচিত্রবীর্য কীর্তির সংবাদ তেমন রাখি নি, বিপ্লবী অতি-নাটকীয়তা যে মনোহর হলেও বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ তা জানার মতো অবস্থায় পৌঁছাই নি। আরো মনে আছে যে অক্স্ফর্ড্‌ বাসকালে সজ্জাদ জহীর প্রমুখ আমার যে বন্ধুরা Communist Party of Great Britain (CPGB)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের সঙ্গে তর্ক হয়েছে, বলতাম পার্টির মুখপত্র *Daily Worker*-এর চেয়ে Independent Labour Party-র সাপ্তাহিক *New Leader* (যার সঙ্গে Maxton, Brockway প্রভৃতি সম্পর্কিত) আমার পছন্দসই, কারণ 'ডেলি ওয়ার্কারে' বুর্জোয়াদের লক্ষ্য করে গালাগালে কেমন যেন আতিশয্য! পার্টির কাগজের আজ নাম *Morning Star*, ওদেশে এখন সর্বত্র অবাধে বিক্রয়ও হয়; কিন্তু আমাদের কালে *Daily Worker* স্পর্শ করত না W.H.Smith প্রভৃতি বিরাট সংবাদপত্রবিক্রেতারা— কিনতে হত বিশেষ জায়গায় বিশেষ লোকের হাত থেকে। *Labour Monthly* পড়ে যেতাম— রজনী পাম দত্তের অকাট্য তথ্যসমাবেশ আর স্পষ্টোচ্চারিত যুক্তির দীপ্তি ছড়িয়ে থাকত তাঁর দীর্ঘায়ত বাক্যবিন্যাসে— ভাবতাম কম্যুনিজম্‌-এর তত্ত্ব এমন অমোঘ অথচ তার জনসমর্থন এত সীমিত আজও কেন— মাঝে মাঝে মনে ঢুকত একটা চিন্তা যে কম্যুনিস্টদের ব্যবহারে সচরাচর একধরনের গোঁয়ার্তুমিই বুঝি ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে— তখন জানা বা বোঝা সম্ভব ছিল না যে এই সমাজ থেকে বেরিয়ে অথচ এর মধ্যেই থেকে কম্যুনিস্ট হতে পারা সোজা ব্যাপার নয়।

তখন জানতাম না যে নিজেদের বদলানো আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা সমাজকে বদলানোর কাজ হুট্ করে শেষ করা যায় না, তৈরি থাকতে হয় পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে লড়াই চালিয়ে যাবার কাজে, যে-লড়াইয়ের পথ কখনো সোজা কখনো বাঁকা, যাতে কখনো যুদ্ধ কখনো শান্তি অথচ যা নিয়ত নানারূপে বিদ্যমান বলে তার সাচ্চা সিপাহী হতে পারা বড়ো সহজ কাণ্ড নয়।

অক্স্‌ফর্ডে একদিন শুনলাম পাশের বাড়ির ছোটো ছেলে মাকে বলছে: 'Mummy, mummy, there's a gentleman and a man fighting on top of the road there!' দুজনে নাকি হাতাহাতি হচ্ছিল কোনো কারণে, তাদের একজন 'gentleman', অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির ছাত্র এবং ঐ সুবাদে 'ভদ্রলোক' এবং অপর জন শুধুমাত্র একটা 'লোক'! অক্স্‌ফর্ডের মতো জায়গায় পুরাকালে 'Town' এবং 'Gown-এর লড়াই হ'ত; কিন্তু সে যাই হোক, আমাদের সময় এবং সম্ভবত আজও দেখা যাবে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ নগরবাসীর মধ্যে সবদিক থেকে প্রচণ্ড প্রভেদ— হাবভাবে, ধরনধারণে, জামাকাপড়ে, এমন কি চেহারাতেও। কলকাতাতেও ছেলেবেলায় দেখা গেছে গোরা সিপাহীরা অধিকাংশই আকৃতিতে বেঁটে, অথচ লালমুখো সাহেব (সম্ভবত সওদাগর অফিসের) সাধারণত লম্বা চওড়া— অক্স্‌ফর্ডে ইউনিভার্সিটিতে সম্পন্ন ঘরের ছেলেরা আসত বলে বেশ কটু ভাবেই চোখে পড়ত ঐ সুসভ্য, মার্জিত, অগ্রসর স্বাধীন দেশের শ্রেণীবৈষম্যের চেহারা। খাস অক্স্‌ফর্ড ডিক্‌শ্‌নারিতে দেখেছি dinner গরিব খায় দুপুরে, ধনী খায় রাত্রে; lunch-এর অভিধাও শ্রেণীসাপেক্ষ! লণ্ডনের গরিব পাড়া 'ঈস্ট এণ্ড'-এর দৃশ্য এবং অন্যান্য বহু সাক্ষ্য বহু উপলক্ষে দেখে বোঝা যেত শ্রেণীভেদ কী বিকট বস্তু। খবরের কাগজে ছবি দেখেছি ছোট্ট একটা ছেলে মস্ত দোকানের কাচের জানলায় নাক লাগিয়ে তাকিয়ে আছে লুব্ধদৃষ্টিতে, সাজিয়ে রাখা কমলালেবুর ডাঁই— তলায় টিপ্পনী যে হয়তো আপাতত বেকার ঘরের এই ছেলে জীবনে কখনো কমলালেবুর আস্বাদ পায় নি। ঠিক সেই সময়েই বোধ হয় কাগজে খবর বেরত যে অর্থসংকটের ফলে দাম পড়ে গেছে জিনিসের এমনভাবে যে মোটা মুনাফা মিলবার আশা না থাকায় লক্ষ লক্ষ কমলালেবু সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কফি জমির মধ্যেই চষে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি!

আমাদের দেশে বর্তমানে যেমন্ আলোচনা চলে রোজ খাদ্যবস্তু বাবদে কত খরচ করতে না পারলে জীবন ধারণ অসম্ভব এবং দেখা যায় যে কোটি কোটি লোক অভুক্ত আর অর্ধভুক্ত থাকে, দেশজুড়ে আমাদের বহু কোটি শিশু রাত্রে যখন ঘুমোতে যায় তখন তাদের পেটে চন্‌চনে খিদে, তেমনই ত্রিশের দশকে ইংলণ্ডে একবার অর্থনীতিবিশারদ্দের মধ্যে তুমুল বিতর্ক উঠল বেকার ভাতার পরিমাণ নিয়ে— হু'দল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মত দিলেন, প্রাণ ধারণের জন্য সপ্তাহে খাই-খরচ পাঁচ শিলিং এগারো পেনিতে হয়, না আরো সাড়ে পাঁচ পেনি কমিয়ে সরকারের কিছু সাশ্রয় করানো যেতে পারে! আমাদের আজকের স্বাধীন ভারতে দেখা যায় যে ওপরতলার মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বিলাসব্যসনে ডুবে থাকায় টাকা হু'হাত ভ'রে খরচ করছে আর সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি লোক রয়েছে বুভুক্ষু। তাদের পেটে অন্ন নেই, পরনের বস্ত্র নেই, মাথার উপর আচ্ছাদন নেই; একেবারে আক্ষরিক অর্থে তো কলকাতার মতো শহরে কয়েক লক্ষ মানুষের 'ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে'। বিলাত বাসকালেও দেখা গেল যে সম্পন্ন শ্রেণীর বিলাস যখন অব্যাহত তখন বেকার ভাতার সাড়ে পাঁচ পেনি নিয়ে বিপুল দরকষাকষি— সহজে কি দেখা গেল কম্যুনিস্ট Wal Hannington-এর নেতৃত্বে ইংরেজ বেকারদের বিপুল আন্দোলন, দেখা গেল অক্স্‌ফর্ডের মতো রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার পীঠস্থানে কম্যুনিস্ট প্রভাবের বিস্তার? বেশ মনে আছে একবার ছিলাম ছাত্রছাত্রীদের বেশ মস্ত এক মিছিলে; ভাইসচান্সলর-এর (তখন Worcester College-এর Provost) কলেজ-সংলগ্ন বাসভবনের সামনে দিয়ে 'নারা' (slogan) দিয়ে যাওয়া, যা ছিল ওখানকার পক্ষে অভূতপূর্ব। বোধ হয় ১৯৩২ কি ৩৩ সালে অক্স্‌ফর্ড ইউনিয়নের এক প্রস্তাব সারা ব্রিটেনকে তোলপাড় করল—"This house will not fight for king and country"— যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। আমরা দেশে ফেরার পর, সম্ভবত ১৯৩৫ সালে আর-এক প্রস্তাব ইউনিয়নে পাস হয়ে চাঞ্চল্য জাগায়—"This House recognises no flag but the Red Flag"! অবশ্য এই মেজাজ বেশি দিন থাকে নি, এর মধ্যে তারল্য ও চাপল্যও কিছু পরিমাণে ছিল তবে আমরা ছিলাম এবম্বিধ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

* * *

বিদেশ যাবার কিছু আগে বোধ হয় রাধাকৃষ্ণনের আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা 'The Hindu View of Life' পড়ে পুলকিত হয়েছিলাম, তৎকালীন সহজ দেশাভিমানও তা থেকে কিঞ্চিৎ পুষ্টি পেয়েছিল। রওনা হবার অব্যবহিত পূর্বে সম্ভবত এসেছিল 'Today and Tomorrow Series'-এ বিলাতে প্রকাশিত কয়েকখানা ছোটো অথচ দামী বই, যাদের মধ্যে ছিল রাধাকৃষ্ণনেরই *Kalki or the Future of Civilization* এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর *What I believe*— দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থে 'the good life'-এর সংজ্ঞা ছিল "inspired by love and guided by knowledge"। সেদিনের কতকটা সরল, চর্চাবঞ্চিত চিন্তায় বেশি মাত্রায় থাকত বিশ্বাস এবং আবেগপ্রবণতা, যাকে একটু ধাক্কা দিয়ে টলিয়ে ভারসাম্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে ইয়োরোপ-প্রবাসের অবদান স্বীকার করতে হয়। *Times Literary Supplement*, *Spectator*, *New Statesman and Nation* (তখনকার নাম) ইত্যাদি যুগপৎ সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেখতে থাকলে, T.S.Eliot-এর ত্রৈমাসিক *Criterion* কেমন যেন অবোধ্য ঠেকলেও চোখে পড়লে এবং তদুল্লিখিত বিবিধ গ্রন্থ (বিশেষত অক্স্‌ফর্ড ইউনিয়ন লাইব্রেরির কল্যাণে) মোটামুটি টাটকা অবস্থায় চাকৃতে পারলে মনের জিজ্ঞাসু ভাব বৃদ্ধি পায়, চিন্তায় প্রশ্নপ্রবণতাও ঘনীভূত হতে থাকে। দেশে থাকার সময় আনাতোল ফ্রাঁস, রমাঁ্যা রলাঁ আর রুশ ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ সাহিত্যিক দিকপালদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অল্পবিদ্যা সংগ্রহ করা গিয়েছিল। কিন্তু ভিক্টর হ্যুগো থেকে মোপাসাঁ-র সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় থাকলেও বাল্‌জাক্-এর সীমাহীন ঐশ্বর্য একরকম অজানা ছিল, ফ্লোবেয়র-স্তাঁদাল ছিলেন নামমাত্র, প্রাস্ত্ (Preust)-এর সম্ভবত উল্লেখও শুনি নি, টমাস মান-কে তখনো জানি নি। ইংরিজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে James Joyce, D. H. Lawrence, Aldous Huxley প্রভৃতিকে দেশ ছাড়ার আগে তেমন জানতাম মনে হয় না—Joyce-কে অবশ্য কোনো কালেই (আজ পর্যন্ত) বুঝে উঠতে পারি নি ('Dubliners'-এর মতো গল্পগুচ্ছ অপূর্ব লাগলেও), Hardy আর Shaw আর Wells-কেই দেশ থেকে মোটামুটি জানতাম। তালিকা বানাতে বসেছি ভাবলে ভুল হবে, কারণ বলতে চাইছি শুধু এই যে ওদেশে মনের দরজা যেন খুলতে থাকল একটু ভিন্নভাবে— দেখলাম

Aldous Huxley-কৃত ভারত ও দক্ষিণ এশিয়া ভ্রমণ-বিষয়ক গ্রন্থের নামকরণ *Jesting Pilate*—যীশুখ্রীস্টের বিচারক যে পাইলেট 'সত্য কি?' এই প্রশ্ন উত্থাপন করে আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেন নি। মুগ্ধ হলাম Norman Douglas-এর *South Wind, Alone* প্রভৃতি রচনার আস্বাদ পেয়ে। পরিচয় শুরু হল আমার প্রিয় লেখক Somerset Maugham-এর সঙ্গে—যাঁর এক গল্পশেষে এক চরিত্র অপরকে বলছে: 'There's one job I do not fancy— God's on Judgment Day'। পশ্চিম জগতের জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প চারুকলার বিভূতির স্বল্প স্পর্শই যে মোহ সঞ্চার করেছিল তা স্বীকার না করা অনৃতকথন হবে। খুব একটা গুরুগম্ভীর সুর এসে পড়েছে দেখে কৌতুক মনে হচ্ছে, কিন্তু সেটা অনুদ্দিষ্ট। বরঞ্চ বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এরই একটা বাঁকা অথচ লঘু শোনালেও গুরুতর কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসছে: 'It matters little what you believe so long as you don't altogether believe it'— যিনি *What I Believe* লিখে একদা মোহিত করেছিলেন তাঁরই এই আপ্তবাক্য!

বার বার যাঁর নামোল্লেখ করেছি সেই জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ আমার মস্তিষ্কের মাটিকে খুঁড়ে ছড়িয়ে আবাদ ফলাবার সম্ভাবনা সন্ধানের সেই অপরিণত দিনগুলিতে মস্ত সহায় ছিলেন। গভীরভাবে একাকী হলেও এই বাক্‌পটু স্নেহশীল মানুষটির কাছে বয়সের ব্যবধান দূর হয়ে যেত; সর্ববিধ সহজ বিশ্বাস বিষয়ে (বিশেষত যে-বিশ্বাস প্রকৃত প্রয়াসলব্ধ নয়) সরস ব্যাজোক্তি ছিল তাঁর কথোপকথনের বৈশিষ্ট্য, অথচ মনের গহনে বোধ করি স্পর্শ পেয়েছিলেন সনাতন ভারতবর্ষেরই মতো চাঞ্চল্য ও প্রশ্নবিধুরতাকে অতিক্রম করে যাওয়া অনির্বচনীয় এক প্রশান্তির— মনে আছে একবার কোন্ খেয়ালে লেখেন ইংরিজী এক নাটিকা (যা বুঝি T. S. Eliot পছন্দ করেন কিন্তু যার প্রকাশক জোটে নি কিম্বা সন্ধান করে ওঠার মেহনৎ তিনি করেন নি), যার নাম দিয়েছিলেন: 'This Above All' (স্বভাবতই মনে আসবে বাকি কথাগুলি: 'To thine own self be true')। জ্যোতিশ্চন্দ্রের সঙ্গে বহুবার অক্স্‌ফর্ডে গিয়েছি সিনেমায়, কিম্বা লণ্ডনে একবার গিয়েছি উদয়শঙ্করের নৃত্যানুষ্ঠান দেখতে, যা তাঁর খুঁতখুঁতে এবং শিল্পবিচারে নিয়ত দ্বিধাকাতর মনকেও উল্লসিত করেছিল (উৎসাহের

চোটে স্টেজের পিছনে গিয়ে উদয়শঙ্করের সঙ্গে আমরা দেখা করি, যা ছিল ডক্টর ঘোষের মতো মেকি 'ভারত-শিল্প'-এর কঠোর সমালোচকের পক্ষে অপ্রত্যাশিত— উদয়শঙ্করের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলা সেই আমার প্রথম এবং শেষ, আর মজা লেগেছিল দেখে যে তিনি ভেবেছিলেন আমরা বুঝি 'কেষ্টবিষ্টু', বললেন দেখেছি আপনাদের সামনের আসনে, অথচ বসেছিলাম আমরা পাঁচ-সাত লাইন পিছনে, কারণ পয়সা থাকত সর্বদাই 'বাড়ন্ত'!) জ্যোতিশচন্দ্রের সাহচর্যে ইংরেজ সাহিত্যিকদের দলাদলি আর 'ক্ষুদ্রামি'-র কিছু কিছু খবর পেতাম, Middleton Murry (তখনকার *London Mercury* পত্রিকার প্রধান) কিম্বা St. John Ervine-এর মতো ব্যক্তি সম্বন্ধে অথবা Leonard এবং Virginia Woolf-এর মতো দম্পতি বিষয়ে গল্পগাছা শোনা যেত। অক্স্‌ফর্ডে প্রায়ই তিনি আমাকে টেনে নিয়ে যেতেন চা-খানায়, একটু বসে তারপর যে-কোনো সিনেমা হলে ঢুকে সময় কাটাতে— ছবিগুলো সাধারণত খুবই ক্লান্তিকর, যদিও মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম অবশ্যই চোখে পড়ত। তখনো 'Women's Lib.'-জাতীয় ব্যাপার ঘটে নি, 'permi-ssive society'-র আবির্ভাব হয় নি, কিন্তু বিশেষত মার্কিন ছবিতে অনুভূতি আর আবেগের সস্তা রঙচঙে ফানুস্ বেশ উড়ত, আর পাত্রপাত্রী চুমু খেতে শুরু করলে ডক্টর ঘোষ গুন্‌তে আরম্ভ করতেন 'এক, দুই..', কতক্ষণ কাণ্ডটা চলে, দেখে নিতেন! মাঝে মাঝে গল্প করতেন প্রথমবার বিদেশ থেকে ফিরে দেশে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে, ব্যক্তিগত জীবনের খবর একটু-আধটু দিতেন, কোথায় ঘা খেয়েছিলেন তাও কিছুটা জানাতেন, কোন্ অস্বস্তি তাঁকে আবার বিদেশ ধাওয়া করালে তার ইঙ্গিত দিতেন। একবার যা প্রত্যাশা করি নি তা শুনলাম তাঁর কাছে— কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে তখন ইংরিজীর প্রধান অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে দেশে এবং বিদেশে মাঝে মাঝে আমরা হাসাহাসি করেছি, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ইংরিজী Romantic কবিদের সম্বন্ধে তাঁর লেখা সম্বন্ধে কঠোর অথচ সরস ও সর্ববিধ ক্লেদমুক্ত সমালোচনা সহাস্যে করতেন, আমরা শুনেছিলাম জয়গোপালবাবুর ছাত্রসমক্ষে এক ঘোষণা যে তাঁর প্রতিটি বাক্যের ভিত্তি-ভূমি নির্মাণ করেছে দশহাজার গ্রন্থ— এমন যে মানুষ তাঁর বিষয়ে ডক্টর ঘোষ বললেন, একবার কলকাতায় চা-য়ে তাঁকে ডেকে বুঝেছিলাম কত

গভীরভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি তাঁকে এক অদ্ভুত স্থৈর্য ও ব্যবহারসৌজন্যে মণ্ডিত করেছে, তুলনায় রাধাকৃষ্ণন্ নিষ্প্রভ কারণ প্রতিভা, প্রভূত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে আছে কেমন যেন মৌলিক চিত্তচাঞ্চল্য, স্থিতধীর প্রশান্তি থেকে তিনি বঞ্চিত।

সামুদ্রিক বিদ্যা বিষয়ে ঔৎসুক্য বা আগ্রহ নেই, কিন্তু প্রায় মেলামেশার ফলে লক্ষ্য করেছিলাম যে রাধাকৃষ্ণনের হাতের তালুতে রেখার পর রেখা পরস্পর কাটাকাটি করে এক বিচিত্র জাল যেন বানিয়ে রেখেছে, কে যেন বলেছিল মনের মধ্যে অসম্ভব এক টানাপোড়েনের চাপ বিনা অমন ব্যাপার হয় না। মনের গহনে কী আছে না আছে তার সন্ধানে নামি নি, শুধু যা দেখেছি তার কথা সাজাবার চেষ্টা করছি। পরবর্তী জীবনে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্‌কে ভারতের রাষ্ট্রপতি রূপে অনেকটা নিকট হতে দেখেও ধারণা হয়েছে যে দর্শনশাস্ত্রী হয়েও রাধাকৃষ্ণনের আছে একটা শিল্পীসত্তা যা বহুধা আকৃষ্ট এবং কেমন যেন সদা-অতৃপ্ত। ভারতচিন্তার মহিমা প্রচারে অপূর্ব ওজস্বিতা সত্ত্বেও তাঁর অন্তরে আছে এক অকাট্য মানবীয় অশান্তি যা কিছুতেই তুরীয় মার্গে উত্তরণবলে প্রশমিত হবার নয়— C. E. M. Joad-এর মতো পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষক (*Counterattack from the East* গ্রন্থে) রাধাকৃষ্ণন্ সম্বন্ধে অন্য কথা বলেছেন কিন্তু বোধ হয় ভারতীয় চক্ষে দেখা আমার এ ছবি আরো নির্ভুল। যাই হোক্, এই মহামতির সঙ্গে কতকটা ঘনিষ্ঠতা যে হয়েছিল তার জন্য যদি কাউকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তো তিনি হলেন জ্যোতিশ্চন্দ্র। লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে গিয়ে রাধাকৃষ্ণনের ঘরে হাল্‌কা গল্প করা গেছে, শুনেছি সদ্য Gifford Lectures দিয়ে (*Idealist View of Life* গ্রন্থে যা প্রকাশিত) তিনি বলছেন আমাদের যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ বাহবা দিয়েছেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে: 'আমি দর্শনশাস্ত্রকে বহুজনের কাছে উপভোগ্য ধরনে ব্যাখ্যা ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু আপনার মুখে যা শুনলাম তেমনটি কখনো শুনি নি'। একবার রাধাকৃষ্ণন্ তখনকার Empire Universities Congress-এ কলকাতার একজন প্রতিনিধি হয়ে এসে-ছিলেন— লণ্ডনে Russell Square-এর ধারে Imperial Hotel-এ তিনি উঠতেন, তার এক ঘরে বসে হাসিমুখে অথচ একটু বিরক্তি ফুটিয়ে অপর একজন ভারতীয় প্রতিনিধি (নাম করছি না, কারণ উচিত হবে না) সম্বন্ধে

বললেন (যা ঘোর না থাকলে কখনো বলতেন না): 'আরে ছি ছি, ব্রেকফাস্ট্-টেবিলে অমুক আজ দেরি করে এল, খুশিতে ডগমগ হয়ে, কী ব্যাপার জিগ্যেস্ করায় বলল, "তুমি একটা বেরসিক, কিছু বোঝ না, আজ ঘরে 'মেড্'-টা ঢুকতেই তার হাতে একটা দশ শিলিং নোট গুঁজে দিয়ে বুঝ্লে কি না···" আমি যখন বলি এই বিদেশে এমন হ্যাংলা বেহায়া কাজ করলে কেমন করে, তখন স্রেফ্ জবাব দেয়, "বেশ করেছি, দেহের কতক-গুলো corpuscles বেরিয়ে গেল, কারো ক্ষতি নেই এতে, বরং তার উল্টো", বলে মহানন্দে প্রাতরাশ ভোজনে লাগল।' ঘটনাটা এবং দার্শনিকের ঈষৎ পুলকিত অথচ বিরক্ত প্রতিক্রিয়া মনে করে রাখার মতো।

১৪

কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে আছে এক বিখ্যাত শ্লোক :

ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতির্ষুর্দুস্তরম্ মোহাদ্ উডুপেনাস্মি সাগরম্॥

মহাকবির অমিত স্বাভিমানের উপর সমাজ-প্রচলিত বিনয়ের মনোরম আচ্ছাদন বিস্তৃত করে তিনি বলেছিলেন, 'অল্পমতি আমি কেমন করে তেজঃপুঞ্জ রাজবংশের কথা বলি, এ যেন ভেলায় চড়ে দুস্তর সমুদ্র পার হওয়ার মোহ আমাকে পেয়ে বসেছে!' এটা মনে আসছে, কারণ ভাবছি কেমন করে অল্পকথায় এবং অন্তত কিছুটা অর্থবহ তথ্যের ভিত্তিতে সাড়ে চার বছর ইয়োরোপ-বাসের জোরে আধুনিক জগতের সব চেয়ে শক্তিধর ও সৃষ্টিশীল মহাদেশের ষড়ৈশ্বর্যমণ্ডিত সত্তার সামান্য একটু পরিচয় প্রদানের প্রয়াস করি! সভয়ে বলে রাখি যে এ-বিষয়ে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রকৃত মহার্ঘ তত্ত্ব দিতে পারতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে ছড়ানো ভাবে গভীর চিন্তার আভাস তাঁর কাছে পেলেও ইয়োরোপ-সম্বন্ধীয় তাঁর রচনায় ফাঁক, এমন-কি ফাঁকিও আছে— 'অন্যে পরে কা কথা?' বাংলাভাষায় অবশ্য আছে 'ইয়োরোপা' ধরনের বই, যা প্রশংসাও মোটামুটি হয়তো পেয়েছে, কিন্তু তাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে পারছি না। সে কথা যাক, কালিদাস প্রতিভাবলে অবলীলাক্রমে ভেলায় চড়ে সাগরে পার হতে পেরেছিলেন, যা আমার অসাধ্য— তাই ক্ষান্ত হব। শুধু ক্ষীণ একটা প্রত্যাশা প্রকাশ করব— ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের এই ধ্যানক্লান্ত অথচ আজও বহ্নিমান ভারতবর্ষের সাম্মুখ্য নিয়ে দণ্ডী-কৃত 'কাব্যাদর্শ-বর্ণিত 'শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ এবং কান্তি'— এই নবরত্নখচিত রচনা যেন কখনো দেখতে পারি! অন্নদাশঙ্কর রায়-এর মতো শক্তিমান হয়তো দেখাতে পারতেন যে এটা অসাধ্য নয়, কিন্তু সম্ভবত অচেতনে অল্পায়াসতুষ্টিপ্রমাদফলে ভাবের ঘরে কিঞ্চিৎ চুরির অপরাধ আমাদের প্রায় সকলেরই যেন চরিত্রগত হয়ে পড়েছে বলে সৎ, সাহসী, সুশোভন সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য যে সুকঠোর সংযম ও

সাধনা, অল্পমতি আধুনিক বাঙালীকে তার আহ্বান যেন টেনে জাগাতে পারছে না।

Renaissance কথাটার বাংলা প্রতিলিপি একটা চালু হয়ে পড়েছে: 'রেনেসাঁ'—কোন্ এক গুহ্য কারণে শেষের 'স'-টা উধাও হয়েছে জানি না, কিন্তু দেখে মজা লাগে, যেমন মজা মনে হয় যখন প্রায়ই আজকাল দেখি 'Sartre'-এর নাম অনেকে বাংলায় লেখেন 'সার্ত্রে' অথচ আবার হয়তো তারাই 'শার্জে দা ফেয়র'-কে লিখবেন-ই 'শার্জ্ দ্যাফেয়র'। আগেকার পণ্ডিতমশায়দের মতো 'ষত্বণত্ব'-জ্ঞান নেই বা 'হ্রস্ব-দীর্ঘ' তফাত কেউ বোঝে না বলে চটে উঠছি না, কিন্তু কেমন যেন উদ্ভট লাগে যখন অনেক বাংলা লেখায় (এমনকি, বিদেশী ভাষায় পণ্ডিতম্মন্য 'রম্য রচনা'-বিশেষজ্ঞদের হাতেও) Paris-কে দেখি 'প্যারী'-রূপে। ইংরিজী ছাড়া অন্য বিদেশী ভাষার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করেই যখন আমাদের বিদগ্ধ সমাজ রয়েছেন, তখন ইংরিজী কেতায় 'প্যারিস' বলতে আপত্তি কী, কে জানে? যদি ফরাসী উচ্চারণই করতে হয় তো সহজগ্রাহ্য 'পারী' ('ঈ'-টি একটু দীর্ঘই করতে হবে) ব্যবহারে কুণ্ঠা কেন? যদি জবাব পাই ফরাসী 'cheri'-র অনুবাদ 'প্যারী' ('রাজার নন্দিনী প্যারী, যা করেন তাই শোভা পায়') বাঙালী রসিকজন বাছাই করে নিয়েছেন তো পুলকিত হব। 'প্রিয়ানাম ত্বা প্রিয়তমম্ হবামহে' বলার মতো যদি শহরের মধ্যে কেউ থাকে তো তা হল প্যারিস। কোন্ বিদেশী পথিক না প্যারিসের প্রেমে পড়েছে— উদাসীন, নির্মম, চপল, কুটিল, গভীর অথচ অবয়বের প্রতি কুঞ্চনের মধ্যে আসক্তির মধুরিমা ছড়িয়ে রেখেছে ঐ মায়াপুরী (১৯৭২ সালে বিমানবন্দর থেকে প্যারিস শহরে ঢুকি নি কয়েক ঘণ্টা হাতে থাকা সত্ত্বেও, কারণ ভয় ছিল যে বুড়ো চোখে কমবয়সের মোহ ভেঙে চুরমার হবে!) এই প্যারিসের Louvre Museum-এ (তথা রোম, ড্রেসডেন, লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি তীর্থে) এবং অন্যত্র শিল্পসম্ভারের বিস্ময়কর সমারোহ সাক্ষ্য দিচ্ছে ইয়োরোপের অপরিমেয় মহিমার— আর পথে, বিপণীতে, পানাহারগৃহে, নাট্যালয়ে, বিদ্যাপীঠে, কর্মশালায়, জনস্রোতে, সর্বত্র জীবনের যে বিচিত্র চিত্র, মনের চোখে তার অস্পষ্ট প্রতিলিপিকেও মনে হয় এক অসামান্য স্মৃতি। 'রেনেসাঁস', 'রেফর্মেশন', 'রেভল্যুশন' তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে বুর্জোয়া যুগকে যে রূপ দিয়েছে তাতে কালিমার অভাব নেই কিন্তু

গরিমার ভাতি তো কয়েক শো বৎসর ধরে ইতিহাসের আকাশকে প্রোজ্জ্বল করে রেখেছে, আজ সমাজবাদী বিপ্লব ও বিবর্তনের পর্যায়ে আছি বলে তাকে নস্যাৎ করা তো সম্ভব এবং সংগত নয়। ভারতবাসী বলেই বুঝি আমরা সেই ভাতিকে সহজে ও অসংকোচে অভিবাদন করতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ভিত্তিভূমিতে সত্তাকে প্রোথিত রেখে আহ্বান জানাতে পারি, যেমন রবীন্দ্রনাথ ডেকেছিলেন তাঁর 'বিশ্বভারতী'-তে: 'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেক নীড়ম্' ('যেখানে বিশ্ব এক পাখির নীড়')।

লণ্ডনে Burlington House-এ পারস্য ইতালী ও ফ্রান্সের শিল্পকলার অপরূপ প্রদর্শনী দেখেছিলাম— সম্ভবত একবছর হলাণ্ডের চিত্রসমারোহও হয়েছিল। মনে সব চেয়ে গভীর দাগ কেটেছিল ফ্রান্সের ছবি। পারসীক চিত্র (আর আশ্চর্য সুন্দর গালিচা) নয়নমনোহর সন্দেহ নেই; ইতালীর অতুলন শিল্পৈশ্বর্য বিষয়ে বাক্‌বিস্তার করব না, কিন্তু কেমন যেন হাঁফ ধরিয়ে দিয়েছিল ছবির পর ছবির অদ্ভুত জমাট চাপ, আর চোখ আর মন ইতালীর শ্রেষ্ঠ যুগে ক্রমাগত খ্রীস্টীয় পুরাণ থেকে নেওয়া বিষয়-বস্তুর পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্তি বোধ করত। চিত্রশিল্পসম্পর্কে বিন্দুমাত্র দাবি আমার নেই কিন্তু উনিশ এবং বিশশতকের ফরাসী ছবি হঠাৎ যেন চোখের পর্দা টেনে একেবারে নতুন, অস্থির অথচ স্নিগ্ধ আর মায়াময় আলোর সন্ধান দিয়েছিল। Impressionism, Post Impressionism, Cubism, Surrealism, Dadaism ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করে কিছু বোঝাতে পারব না। কিন্তু অকস্মাৎ একেবারে থমকে দিয়েছে Cezanne বা Pisarro— আর কখনো ভুলতে পারব না Gauguin-এর ছবি, দক্ষিণ সমুদ্রের নিতম্বিনী, হাতে ধরা থালায় কয়েকটা আম, আর সর্ব বিশ্ব যেন সেখানে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোণার্ক আর কাঞ্চী, মহাবলিপুরম্ আর এলিফ্যাণ্টা গুহায় অনুভব করেছি সতত সঞ্চরমান বিশ্বকে স্তব্ধ করার শক্তি রাখে মানুষের শিল্পসৃষ্টি। কিন্তু জীবনে প্রথম ছবির মেলায় দাঁড়িয়ে প্রায় যেন বিশ্বরূপদর্শনের আভাস পেয়েছি ইয়োরোপের অনাত্মীয় মাটিতে— ভুলতে চাইলেও তা ভুলতে পারব না।

'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা' ইত্যাদি কথা শোনা গেলেও বাড়িতে গানের চর্চা ছিল না। কালোয়াতী বিষয়ে গল্প শুনতাম যে দিলীপকুমার রায় শরৎ চাটুজ্জে মশায়কে কোন্ এক ওস্তাদের গান শোনাবার জন্য জেদ্ করায়

শরৎবাবু বলেন, 'হাঁ ভাই, তোমার ঐ ওস্তাদ গায় ভালো তো বটেই, কিন্তু থামে তো?' ব্রহ্মসংগীত থেকে রবীন্দ্রসংগীত (আর কিছু নজরুল, অতুল-প্রসাদ প্রভৃতির রচনা) মোটামুটি অপরিচিত ছিল না, তবে উঁচুদরের যন্ত্রসংগীত তখন তেমন শুনেছি মনে হয় না। ওদেশে সুযোগ এল Kreisler বা Kubelik-এর বেহালা শোনার। একবার তখনকার রুচিতে অবোধ্য (এবং অত্যন্ত কোলাহলবহুল) পিয়ানো শোনা গেল স্বয়ং Stravinsky-র হাতে। রেকর্ডে Bach, Beethoven, Strauss প্রভৃতিকে মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়াও একটা অজ্ঞাতপূর্ব সৌভাগ্য। কচিৎ কদাচিৎ লণ্ডনে দেশ দেশান্তর থেকে আসা Philharmonic Orchestra-র ধ্বনি-ঐশ্বর্যে মন ভরে উঠেছে। সাধারণে প্রচলিত, সহজ গান— যেমন আমাদের ছাত্রকালে 'Romola', 'My Blue Heaven', 'Parlez moi d' amour' ইত্যাদি কিম্বা সপ্তদশ শতকের লেখা Ben Jonson-এর Drink to me only with thine eyes' -এর মতো বস্তু— ভালো লাগলেও এমন কিছু আশ্চর্য মনে করার মতো ছিল না। গালিকুর্চির নিখুঁত গলায় 'La Paloma', কিম্বা Caruso-র গাওয়া 'O sole Mio', অথবা Paul Robeson-এর 'Old Man River' কণ্ঠ-সংগীতের একটা আলাদা স্তরে যেন নিয়ে গেল— অনধিকারী হয়েও দেশের গানের সঙ্গে তুলনার একটা অনিবার্য ইচ্ছা এসে পড়ল। এখানে বলি একটু কথা, আমার অনুজোপম সুহৃৎ শঙ্কর মিত্র (তখনকার বিখ্যাত 'স্যর্' ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের পুত্র) সম্বন্ধে। সে চমৎকার গাইতে পারত; অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র ছাত্র; গুরুর শেখানো অনেক গান তার মুখে শুনেছি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে বসে তখনকার পক্ষে নতুন লেখা "একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু কথা শুনি" গেয়েছিলেন শুনে একদিন সে যেন মেতে উঠে তখনই গুন্‌গুন্ করে সুন্দর সুরটা ভেঁজেছিল। অক্স্‌ফর্ডে ভর্তি হওয়ার আগে মৌখিক পরীক্ষায় চমৎকার তার একটা জবাব মনে আছে; এ জন্যই বোধ হয় তাকে ভর্তি করে নিতে বিলম্ব ঘটে নি। লণ্ডন থেকে ট্রেনে অক্স্‌ফর্ড্ আসার সময় সব চেয়ে বেশি কী লক্ষ্য করেছে জিজ্ঞাসা করায় শঙ্কর মিত্র তৎক্ষণাৎ বলে 'Carter's Little liver pills'! বাস্তবিকই রেলপথের ধারে এই ওষুধের বিজ্ঞাপন দৃষ্টিকটু হলেও অসংখ্যবার চোখে পড়ত— এ যেন উনিশ শতকে কোন্ এক গির্জা মেরামত করে দিয়ে সেখানকার উপাসনায়

ব্যবহার্য ধর্মসংগীতের মধ্যে Beecham's Pills-এর সর্বরোগহর গুণ-বিজ্ঞাপনের কাছাকাছি! শঙ্করের একটা কথা ভারি ভালো লেগেছিল বলে মনে আছে: পশ্চিমের উঁচুদরের গানে এক-একটা কলি অদ্ভুত বৈভবে ভরা— কারুজো যখন বলেন 'মা-না-তু-সো', তখন অর্থের অপেক্ষা করতে হয় না, ধ্বনিগৌরব দশদিক জুড়ে থাকে!

হয়তো নিছক নির্বোধের মতো বাক্‌বিস্তার করে চলেছি, কিন্তু কেমন যেন মনে হয়েছে ইয়োরোপের সংগীত যেখানে শ্রেষ্ঠ সেখানে বহুজনসমক্ষে নিখুঁত আনুষ্ঠানিকতাকে পশ্চাৎপটে রেখে বুঝি আকাশ থেকে মানুষ কোন্ এক অনির্বচনীয় মহিমাকে টেনে আনে— আর আমাদের সংগীত যেখানে শ্রেষ্ঠ সেখানে সাধক যেন ক্রমশ আরোহণ করেন ঊর্ধ্বে, পূর্বসৃষ্ট গৌরবকে নক্ষত্রকুলের কাছ থেকে আহরণ করে সাধক সহর্ষে সবাইকে দেখাচ্ছেন না, সমুচ্চ উত্তরণের আয়াস ও আনন্দ যুগপৎ তাঁকে সমাহিত রেখেছে। পাশ্চাত্যে যেন পাই মানুষের দৃপ্ত জয়গাথা আর ভারতবর্ষে যেন শুনি প্রশান্ত বিশ্ববন্দনা— পাশ্চাত্যের ঔজ্জ্বল্যের পাশে যেন ভারতবর্ষের কমনীয়তা, একদিকে বুঝি শিল্পমহত্ত্বে পরিপূর্ণ প্রতীতি, অপর দিকে বিশ্বরহস্যের জটিলতাজাত বিনম্রতা। এই দ্বিধারায় মনকে অভিষিক্ত করার সাধ্য মানুষ যেদিন পাবে সেদিন তো সে তুরীয়ানন্দ!

কয়েক হাজার বছরের এক সভ্যতার উত্তরাধিকারী আমরা কেউ কেউ হয়তো একটু সহজে তুরীয় মার্গে অবস্থান কল্পনা করতে পারি। কিন্তু মনে হয় সে-কল্পনা 'phoney', তাতে ফাঁকির ভাগ বড়ো বেশি। রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতা শুনে কৃতবিদ্য ইংরেজকে বলতে শুনেছি 'Oh, what superb wisdom!' অথচ আমার সন্দেহ হয়েছে ভাষণটা যথেষ্ট ফাঁপা। আমরা অক্স্‌ফর্ডে থাকার সময় এলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী, শুনলাম রবীন্দ্রনাথের 'সেক্রেটারি' হিসাবে স্বয়ং গিলবর্ট মরে তাঁর মুরুব্বি, 'বেলিয়ল্' কলেজে ভর্তি হয়েছেন, D. Phil করবেন, ব্রিটেনের 'যুদ্ধোত্তর কবিতা' গবেষণার বিষয়। পরিচয় হল, শান্ত শিষ্ট মানুষটি, কিন্তু কেমন যেন সর্বদা ভাবালু। এক সকালে ইউনিয়ন লাইব্রেরিতে খবরের কাগজ দেখছি, হঠাৎ মনে হল কে যেন এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, একটু অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করি অমিয়বাবু মস্ত 'fire-place'-এর পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন এবং

অপলকে আমার দিকে চেয়ে আছেন। থাকতে না পেরে জানতে চাই আমায় কিছু বলবেন কিনা, কিন্তু চমক ভেঙে কবি জবাব দিলেন যে কী যেন চিন্তায় তিনি ডুবে ছিলেন, আমাকে লক্ষ্যই করেন নি। বর্তমানে আমেরিকা-প্রবাসী অমিয়বাবুকে উত্তরজীবনে মাঝেসাঝে দেখেছি, আলাপ হয়েছে, কিন্তু ঘটনাটা ভুলতে পারি নি। এরই সঙ্গে মনে আসছে রাধাকৃষ্ণনের কাছ থেকে শোনা কথা ; মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপকরূপে বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলকে আহ্বান করায় তিনি জবাব দেন যে আজকের দিনে মধ্যযুগে কালাতিপাত তাঁর মনোমত নয়। এতে প্রকাশ পায় সংকীর্ণতা যা ইয়োরোপের নিশ্চয়ই আছে— তবে আমাদের মনের সর্বংসহা ব্যাপ্তিও নিখাদ নয়, তাতে চেতন বা অচেতন ভানের অবস্থিতি অস্বীকার করা চলে না।

দেশে থাকতে থিয়েটার বেশি কখনো দেখি নি, সিনেমার প্রচলনও ছিল অল্প। ওদেশে থিয়েটার খুব বেশি না দেখলেও মোটামুটি ধারণা পাওয়া গিয়েছিল— Sybil Thorndike-কে দেখলাম St. Joan রূপে ("France is lonely and I am lonely with the loneliness of France"), Cedric Hardwicke, Tallulah Bankhead, Elizabeth Bergner, Flora Robson প্রভৃতির অভিনয় চাক্ষুষ করা গেল। Max Reinhardt যখন "A Midsummer Night's Dream" মঞ্চস্থ করলেন, তখন তা বাস্তবিকই উপভোগ্য হয়েছিল। কচিৎ কদাচিৎ কোনো 'ballet' বা 'revue' দেখা যেত— সমারোহ অনভ্যস্ত চোখে মন্দ লাগে নি। চার্লি চ্যাপ্‌লিন যখন বহু বৎসর পর 'City Lights' ছবি তৈরি করলেন, 'টকি'-কে বিদ্রূপ করলেন, তখনকার হৈ-চৈ মনে আছে। এমনি ফিল্‌ম্ অসংখ্য দেখা গেছে— মনে পড়ছে J. B. Priestley-র 'The Good Companions'-এর সরস এবং খাঁটি ইংরেজ চরিত্র যা উপন্যাসে এবং চলচ্চিত্রে বেশ প্রকাশ পেয়েছে। ফিল্‌ম্ সোসাইটির কল্যাণে এবং লণ্ডনে তখন 'Academy Cinema'-তে বাছাই করা দামী ছবি দেখাবার ব্যবস্থা থাকার ফলে অনেক স্মরণীয় ছবি দেখতে পেয়েছি : Eisenstein আর Pudovkin-এর 'Battleship Potemkin', 'Storm over Asia', 'Paris Commune 'New Babylon', 'The General Line' ইত্যাদি ছবি, জার্মান Pabst-এর 'Kamaradschaft', কোন্ এক ফরাসী পরিচালকের অসম্ভব সুন্দর ছবি (শিশুদের নিয়ে)

'Maternélle', Réné Clair-এর 'Le Million', 'A nous la liberté' প্রভৃতি। সোভিয়েট ছবি 'Mother' (গর্কির উপন্যাসকে ভিত্তি করে) কিম্বা 'The Road to Life' (ছন্নছাড়া অনাথ ছেলেমেয়েদের নতুন জীবনে টেনে তোলার কাহিনী) পরে ভিন্ন সংস্করণে দেখেছি, কিন্তু মনে হয়েছে আগেকার কাজই যেন ছিল ঢের বেশি ভালো।

ওদেশের পার্লামেন্ট ভবনে একদিন মাত্র প্রবেশ করেছি; সেদিন House of Commons-এর পূর্ণ অধিবেশন ছিল না, চলছিল কমিটি— বিন্দু মাত্র চাঞ্চল্য ছিল ছিল না, একেবারে নীরস লেগেছিল। ওদেশের ধুরন্ধর বাগ্মীদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে অবশ্য শুনেছি অন্যত্র, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির মূলগত দৌরাত্ম্য ভারতবাসী হিসাবে আমাদের চোখে ধরা পড়ত বলে চার্চিল প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্পর্কে কখনো কোনো মোহ মনে স্থান পায় নি। মোহ বিস্তার কিছু পরিমাণে ইয়োরোপ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা আসে পশ্চিমের শিল্পসাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের বিপুল গভীর ঐশ্বর্যের স্বল্প আস্বাদের ফলে। খাপছাড়া কতগুলো কথা অগোছালো ভাবে এ বিষয়ে লিখলাম জানি, কিন্তু আপাতত এর বেশি তো সাধ্যে কুলোচ্ছে না।

* * *

১৯৩১ সালের বড়োদিনের ছুটি কাটানো গিয়েছিল হুমায়ুন কবির আর শঙ্কর মিত্রের সঙ্গে অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষিত শীতের সুইট্‌সারল্যাণ্ড ভ্রমণে। Lucerne-এ কিছুকাল অধিষ্ঠান, তারপর পাহাড়ী রেলে Engelberg, যা ছিল বেশ খানিকটা উঁচুতে আগাগোড়া বরফে ঢাকা। নানা দেশের 'ট্যুরিস্ট্' সর্বত্র সেখানে ভ্রাম্যমাণ, হরেক ভাষায় কথাবার্তা হোটেল-ঘরে এবং বাইরে। লুসের্ন-এ হ্রদ ছিল চমৎকার, নীল জল, একেবারে তলা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়, গম্ভীর তুষারাবৃত পাহাড়ের ছায়া জলে ভিজে যেন আরো মনোরম। এঙ্গেলবের্গ-এর গাছপালা পথঘাট তখন বরফে ডুবে ছিল, ski-ing-এর সরঞ্জাম আমাদের ছিল না, আনাড়ি অবস্থায় সরঞ্জাম ভাড়া করে তুষার ক্রীড়ায় নামার সংগতি বা অভিপ্রায়ও ছিল না। তাই ঘুরে বেড়িয়েছি, বরফের উপর বহুবার আছাড় খেয়েছি; আশ্চর্যের কথা চারদিক যখন বরফের শাদায় ঝলমল করছে তখন শীতবোধ তেমন

করে নি। পাহাড়ের গায়ে funicular বেয়ে আরো উপরে ওঠা, তারপর aerial tramway করে Trubsee-নামধেয় শৃঙ্গ পর্যন্ত যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সময় কেটে যেত। বেশ মনে আছে একটা ছোটো 'pension'-এ (পান্থনিবাস) তিনজনের জায়গা খালি ছিল না বলে যেতে হল মামুলি হোটেলে— পরস্পর ঠাট্টা করে বলাবলি হল আমাদের কপাল মন্দ, কারণ 'pension'-এর কর্ত্রীটির চেহারা ছিল বাস্তবিকই অসামান্য। ফিরলাম আমরা ফ্রান্স-জার্মানীর সংযোগস্থলে স্ত্রাস্‌বুর্গ হয়ে, এবং যখন লণ্ডনমুখো চলেছি তখন প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়— পকেট ঝেড়ে কোনোক্রমে পয়সা একত্র করে রেস্তোরাঁ-গাড়িতে খাবারের দাম দেওয়া যায়! ওদেশে বেড়ানোর সুবিধা এই যে মুটেভাড়ার বালাই নেই, সর্বত্র স্বয়ংভর কায়দায় 'স্যুটকেস' হাতে নিয়ে ঘোরা সহজ, যেখানেই যাওয়া যাক্-না কেন বিছানাপত্র মিলবেই।

একেবারে একা ঘুরেছি জার্মানীতে '৩২ সালের গ্রীষ্মকালে— ট্রেনে কলোন্ পর্যন্ত (Eau-de-Cologne-এ যার নাম জড়িত)। সেখানকার জগদ্‌বিখ্যাত 'কেথীড্রল্' বার বার দেখা, রাইন্ নদীর ধারে ঘোরা, তারপর নদী বেয়ে স্টীমারে একেবারে Mainz পর্যন্ত যাওয়া, নদীর দুধারে পুরোনো দুর্গ আর প্রাসাদ, মাঝে মাঝে ছোট্ট গাছে-ভরা দ্বীপ, ক্রমাগত বেঁকে বেঁকে চলেছে নদী, এই নদী যাকে জার্মানরা বলে 'Father' 'রাইন্' (এক জার্মানের সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা কথা হল, বললাম আমাদের গঙ্গাকে বলি 'মা')। মাইন্‌ৎস্-এ রাত কাটিয়ে ট্রেনে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হাইডেলবের্গ, যেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় বহুশত বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল, 'নেকার' নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে যার অবস্থান, চমৎকার পুরোনো শহর যা না দেখলে নাকি জীবন অপূর্ণ বলে ইয়োরোপে প্রবাদ। হাইডেলবের্গ রেলস্টেশনে নামতে একজন এগিয়ে কথা বলল, অল্প একটু জার্মান বলতে পারায় কাজ চালাতে পেরেছিলাম, জানাল সে বেকার, বাড়িতে paying guest রাখে, আমার থাকা সস্তায় হবে স্বস্তিরও অভাব হবে না, যদি আপত্তি না থাকে তো একটু হেঁটে গেলেই বাড়ি। রাজী হয়ে গেলাম, পরে জানলাম সে ইহুদী, নাম হাইড, বাড়িতে স্ত্রী এবং কন্যা আছে, গ্রীক ছাত্রও একজন অতিথি হয়ে রয়েছে সেখানে। Blumenstrasse রাস্তায় পুরোনো এক চারতলা বাড়িতে

গিয়ে উঠলাম, আবিষ্কার করলাম যে ব্যবস্থা একটু সাবেকী ; স্নান করতে যাওয়ায় bath tub থেকে কয়লার ডাঁই সরিয়ে পরিষ্কার করে দিল ! কিন্তু অন্যদিক থেকে কষ্ট ছিল না, খাওয়া ভালো, দাম কম, ঘর বিছানা পরিষ্কার —তা ছাড়া সারাদিনই তো বাইরে, কখনো বা bus-এ চড়ে Black Forest অঞ্চলে যাওয়া, 'বাডেন-বাডেন'এর মতো ছিম্‌ছাম্‌ আগেকার নামকরা 'watering place' দেখা। ইউনিভার্সিটিতে অন্যান্য বস্তুর মধ্যে দেখলাম বহুকালের প্রকাণ্ড এক beer-এর জালা—দুধারে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়, সেটিকে ভর্তি করা হত আগে, beer-পিপাসা ওদেশে তো সামান্য ব্যাপার নয় ! শহরের রাস্তায় একদিন দেখলাম ছোটো একটা সভা হচ্ছে, হিটলার তখন তার নাৎসি পার্টি নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, আর এক নাৎসি প্রচারক হাত তুলে বলছে 'Versuchen Sie einmal…' (আসুন, একবার সবাই চেষ্টা করি…)—অন্য কথাগুলো মনে নেই, বুঝতেও তেমন পারি নি। আমি যাদের কাছে ছিলাম সেই হাইড পরিবারের ভবিষ্যৎ কী রূপ নিয়েছিল জানি না ; শুধু জানি বাড়ির গিন্নী আমাকে একটু মায়ার চোখে দেখে ফেলেছিলেন, যখন ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছি বললেন যেন আমি পৌঁছেই ('ankommen') তাঁকে খবর দিই— 'ankommen' শব্দটি আজও মনে আছে বলেই লিখলাম। পরে ভেবেছি তাদের কথা যখন হিটলারী দৌরাত্ম্য জার্মানীকে গ্রাস করল আর প্রথম নৃশংস চোট্‌ পড়ল ইহুদীদের ওপর। মনে আছে জার্মান Reichstag-এর সোশাল ডেমোক্রাট সদস্য Rudolf Breitscheid '৩২ সালের শেষদিকে কিম্বা '৩৩ সালের প্রথম দিকে অক্স্‌ফর্ডে ওজস্বী বক্তৃতায় জার্মানীতে 'Barbarians in power' সম্বন্ধে সবাইকে সতর্ক হতে বলেন ; এই ব্রাইট্‌শাইড্‌কে বিশেষভাবে স্মরণ করছি কারণ ১৯৬৭ সালে দেখেছি Buchenwald-এ (গ্যেটে-র 'Weimar'-এর অদূরে) নাৎসি 'Concentration camp', যেখানে ১৯৪৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, শেষ নিশ্বাস অবধি হিটলারী দানবিকতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম চলেছিল। হিটলার জার্মানী আজ ইতিহাসের এক কালস্মৃতি ; কিন্তু হিটলার ক্ষমতা দখল করার কিছু পূর্বে জার্মানীতেই এক দরিদ্র ইহুদী বাড়িতে থেকেছি এবং প্রত্যক্ষ করেছি যে মানবীয় অনুভূতি ও আত্মীয়তা-বোধ দেশে দেশে বান্ধব সৃষ্টি করে রেখেছে।

'৩২ কিম্বা '৩৩ সালে শঙ্কর মিত্রের গাড়িতে ডক্টর ঘোষ এবং আমি ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা ঘুরে আসতে পেরেছিলাম, সমুদ্রতীরে নামজাদা Torquay-র কাছে Penzance নামে একটা ছোট্ট জায়গায় কদিন কাটালাম, Dovon আর Cornwall জেলার বিখ্যাত নিসর্গ সৌন্দর্য আস্বাদ করা গেল, যে প্রান্তে ব্রিটেন দ্বীপের শেষ আর সীমাহীন সমুদ্রের অবিরাম উচ্ছ্বাস সেই Land's End দেখলাম, মৎস্য শিকার যাদের উপজীব্য সেই ধীবর কুল সেখানে প্রধান, উত্তাল সাগরের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন মোকাবিলা—কত না অখ্যাত অকীর্তিত নির্ভীকতা দেশ-দেশান্তরের শ্রমজীবী জীবনে! ফেরার পথে Lyme Regis নামক স্থানে ছিলাম এক পুরোনো প্রাসাদে, যাকে হোটেল বানানো হয়েছে— খুব একটা দামী জায়গা নয়, তাই ব্যবস্থা শুধু বাহ্যত বনেদী। জ্যোতিশ্চন্দ্রের বিবিধ উক্তি আর শঙ্করের বাংলা গান (কিম্বা মুখ বদ্‌লাবার জন্য হয়তো *Tauber*-এর 'You are my heart's delight', অথবা জনপ্রিয় 'I lost my heart in Heidelberg'-ধরনের বিদেশী গান) দিন পাঁচেক খুব শুনলাম, আর আবার দেখলাম ওদেশের প্রকৃতির কেমন যেন সযত্নবিন্যস্ত শোভা। চ্যানেল পার হয়ে কোথাও ঘোরা তখন অর্থাভাবে সম্ভব ছিল না। অক্স্‌ফর্ডের বন্ধু N.A.S Lakshmanan (পরে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর ডাইরেক্টর-জেনেরল) একবার প্রস্তাব করল তার গাড়িতে ফ্রান্সের উত্তর থেকে দক্ষিণ ঘুরে আসা— সে তখন বিদেশী ভার্যা আহরণে উদ্যত এবং দিলদরিয়া মানুষ বলে অকাতরে অর্থব্যয় ভ্রমণে প্রবৃত্ত। তাই নির্বিত্ত আমি যোগ দেবার সাহস পেলাম না! এই লক্ষ্মণন্‌ কয়েকবার আমাকে অক্স্‌ফর্ড থেকে লণ্ডনে নিয়ে এসেছে, কারণ আমাদের উভয়েরই প্রয়োজন Bar dinner খেয়ে ব্যারিস্টারী পরীক্ষার্থীর খাতায় নাম বজায় রাখা! সে ছিল একটু আগোছাল, সময়ানুবর্তিতা তার ধাতে সইত না; নিমন্ত্রিত হয়ে তার ঘরে গিয়ে কয়েকবার দেখা গেছে সে নেই, কোনো খবরও রেখে যায় নি। অথচ প্রকৃত দরাজ মানুষ; বুকে জড়িয়ে ধরলে সব নালিশ ভুলে যেতে হয়! তার গাড়িতে লণ্ডন ছুটে আসা মানে দেরি করে বেরুনো, বিদ্যুৎগতিতে (মাঝে মাঝে 'ট্রাফিক্‌' আইনকে কলা দেখিয়ে) দৌড়ানো, Lincoln's-এ প্রায় কাঁটায় কাঁটায় হাজির হওয়া, শৌচাগারে একটু ঢুকে হাত ধোওয়ারও সময় না রেখে! অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে অপর কয়েকজন

সমুজ্জ্বল তরুণের মতো লক্ষ্মণন্‌কে আবিষ্কার করেন Lionel Fielden ; কিন্তু স্বাধীন ভারতের রেডিয়ো বিভাগে সমুচ্চ আসনে বসে তাকে চক্রান্তকারীদের হাতে বিড়ম্বিত হতে হয়েছিল, অকালমৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নেয়।

* * *

সরকারী স্কলারশিপের মেয়াদ ফুরোল '৩২ সালের অক্টোবর থেকে—তাই কিছুটা স্বল্প সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে আর বাড়ি থেকে যথাসম্ভব কম টাকা আনিয়ে তারপর থেকে চালাতে হল। কিছুটা কৃচ্ছ্র সাধন অবশ্য এতে ঘটেছিল ; তবে এ শিক্ষাটা পেয়েছিলাম যে ঐ শীতের দেশে অন্তত যুবাবয়সে খাওয়া কমিয়ে অর্থসংকোচ বিপজ্জনক ; বিদেশযাত্রী ছাত্রদের এ কথা তাই বলি। বিলাতে নিরামিষাশী ভারতীয়েরা অনেক সময় কেমন করে প্রায় হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকত জানি না—তা ছাড়া তাদের মতো স্বপাক আহারের প্রবৃত্তি বা অভ্যাস কখনো হয় নি। যাই হোক, খরচ খুবই সাবধানে করতে হল। দেনা শুধু একটু-আধটু করে যাওয়া গেল ব্ল্যাক্‌ওয়েল-এর বইয়ের দোকানে, দেশে ফেরার পরও সেই 'অ্যাকাউন্ট' কিছুকাল চলেছিল! 'বাজে' খরচ অবশ্য বই-কেনা ছাড়া কিছুই ছিল না— লিঙ্কন্‌স্ ইন্‌-এ ডিনারের সময় প্রথম দিতে চাইত 'beer' কিম্বা 'ginger beer' আর কিছু পরে 'port' বা 'sherry'। সবই প্রত্যাখ্যান করতাম, ginger-beer বস্তুটি ঠিক যে কী জানতামও না (অচিরে দেখা গেল আমার সান্নিধ্য ভোজন-টেবিলে বহুজনের কাম্য, কারণ আমাকে দিয়ে সুপেয়গুলিকে আনিয়ে সদ্‌ব্যবহার তারাই করতে পারত!)। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে পান বা সিগ্রেট বা মদ্য স্পর্শ করব না বলে ধনুকভাঙা পণ কখনো করি নি, কিন্তু কোনোটিই নেশা হয়ে দাঁড়ায় নি, কোনোটাকে নিয়ে অভ্যাসও হয় নি—একটু আশ্চর্য যে ইয়োরোপে ছাত্রাবস্থায় কখনো মদের আস্বাদ পাই নি। ১৯৩৬ সালের শেষাশেষি কলকাতায় বন্ধু হম্‌ফ্রি হাউস-এর নির্বন্ধে জীবনে প্রথম হুইস্কি চেখে দেখি, বুঝি বস্তুটি কথোপকথনে সহায়ক, চিত্তবর্তিকাকে একটু উজ্জ্বলও সম্ভবত করে, কিন্তু আসক্তির দড়িতে বাঁধা হওয়ার অবস্থা কখনো ঘটে নি।

কিছুটা অসুবিধার মধ্যেই গবেষণা সম্পূর্ণ করা এবং ব্যারিস্টারী পরীক্ষা চুকিয়ে ফেলার যুগপৎ প্রচেষ্টায় থাকতে হয়েছিল। অক্স্‌ফোর্ডের Worcester College-এ বিখ্যাত Clarke Manuscripts থেকে রিচার্ড ক্রমওয়েল-এর

সময়কার কিছু অনাবিষ্কৃত তথ্য খুঁজে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিলাম; লণ্ডনের পুরোনো প্রত্নপত্রিকা *Notes and Queries*-এ তার কিছু ছাপা হয়েছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়মে আর লণ্ডনের পাবলিক রেকর্ড অফিসে প্রাচীন বই আর হস্ত-লিপি ঘাঁটার মধ্যেও একরকম আনন্দ ছিল; অক্স্‌ফর্ডে Bodleian গ্রন্থালয়ে *Clarendon* এবং অন্যান্য পুঁথি থেকে মাদকতাও কিছু যেন মিলত। Worcester College-এ ছিল বিরাট জলাশয়, সেখানে বিচরণ করত কয়েকটা রাজহাঁস; শোনা যেত তারা মাঝে মাঝে একটু হিংস্র হয়ে ওঠে! ব্রিটিশ মিউজিয়ম ছিল লণ্ডনে আমার সান্ত্বনা— ঐ বিপুল, জনাকীর্ণ অথচ নিঃসঙ্গ শহরে কালাতিপাত অন্যথা বড়ো বেশি কঠোর হয়ে পড়ত। গবেষণা করে যেতে ভালো লাগত; মুশকিল হল সংগৃহীত তথ্যকে সংহতভাবে লিখে ফেলতে গিয়ে। এরই ফাঁকে বার পরীক্ষায় প্রথম অংশ শেষ করতে হয়েছিল —দেখা গেল প্রায় সকলকেই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় 'বার' পরীক্ষার বৈতরণী পার হতে হয়! সেটা মুলতুবি রেখে 'থীসিস্' সম্পূর্ণ করে দাখিল করা গেল— বেশ একটু আশঙ্কা নিয়ে, কারণ নিজেই জানতাম নিবন্ধের বিষয় বাছাই অতিরিক্ত দুঃসাহসী হয়ে গেছে, যদিও আমার 'সুপারভাইজর' Ogg আমার রচনার অংশবিশেষ দেখে খুব তারিফ করেছিলেন। বিলাতবাসের সব চেয়ে কষ্টকর আঘাত পেলাম (যদিও খুব আশ্চর্য হই নি) যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানা গেল যে 'ডি-ফিল্' দিতে হলে আরো কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন পরীক্ষকরা চাইছেন যদিও তৎক্ষণাৎ 'বি-লিট্' দিতে তাঁরা প্রস্তুত। এরকম ঘটনা ওদেশে প্রায় হয়ে থাকে, কিন্তু আমার পক্ষে হল উভয় সংকট। বার পরীক্ষার দ্বিতীয় (এবং শেষ) ভাগ তখনো বাকি; সময় হাতে নেই, অর্থেরও একান্ত সংকুলান, অথচ 'ডি ফিল' নিশ্চিত করা এবং ব্যারিস্টারীর সনদ নিয়ে যাওয়া যখন লক্ষ্য, তখন উপায় কী? সর্বনাশ সমুৎপন্ন হলে যা ঘটে তাই ঘটল; নিরানন্দ মনে স্থির করা গেল যে 'বি-লিট্' ডিগ্রীই নেওয়া যাবে। আর যা হোক্ করে বার পরীক্ষাটা শেষ করতে হবে। আমার মা-বাবার মনে এ সময় মস্ত একটা আঘাত নিশ্চয়ই লেগেছিল— আমাকেও অপরাধবোধে তখন কিছুকাল পীড়া পেতে হয়েছিল।

এককালে নাকি ব্যারিস্টারী পরীক্ষাই ছিল না, কিন্তু আমাদের সময়ে (এবং বোধ হয় এখনো) ব্যাপারটা তেমন সহজ নয়। বেশ পাকা আইনজ্ঞ

ব্যক্তি 'ফেল' করেছেন পরীক্ষায়, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আমাদের আগে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পরে সুবিমলচন্দ্র রায় পরীক্ষায় প্রথম হয়ে স্বর্ণ-পদকাদি অবশ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু শুনেছিলাম বোধ হয় Jennings নামে একজন আইনেরই অধ্যাপক 'ফেল' করেন কোন্ এক 'পেপারে'! আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফৌজদারী আইন পড়িয়ে যাওয়ার পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বহুগুণান্বিত ব্যক্তি ঐ-বিষয়েই বুঝি একবার অকৃতকার্য হন! আমি তো প্রথমে পণ করেছিলাম যে Garcia নামধারী একজনের 'In a Nutshell' series-এর পুস্তিকা পড়ে পাস করব, কিন্তু জীবনে প্রথম 'ফেল' হওয়ার অভিজ্ঞতার ঠোকর খেয়ে বুঝলাম যে অত সহজে কার্যোদ্ধার সম্ভব নয়। লণ্ডনে তখন আকছার ভারতীয় ছাত্র, যাদের পক্ষে ক্রমান্বয়ে বার পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়া একেবারে গা-সওয়া। পরে শুনেছি একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং পেশায় সফল ব্যারিস্টারের কথা, যিনি অনেককে আইনে 'কোচ' করলেও নিজে বারবার পরীক্ষায় বিড়ম্বিত হতেন কিন্তু একেবারে গায়ে মাখতেন না। নাম করে বলব না কিন্তু উত্তরজীবনে যাঁরা ডাকসাইটে ব্যারিস্টার হয়েছেন, হাইকোর্ট-সুপ্রীম কোর্টের জজ হয়েছেন, এটর্নী-জেনারলের পদে বসেছেন, তাঁরা অনেকে একাধিকবার ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় অকৃতকার্য। Garcia-র চটি বই পড়ে পাস করা সম্ভব নয় এটা রীতিমতো ঠেকে বুঝে মরিয়া হয়ে কতকগুলো প্রকাণ্ড বই কিনে Common Law, Equity ইত্যাদি ব্যাপারে মনঃসংযোগের চেষ্টা করে অবশেষে কোনোক্রমে পার পাওয়া গেল। মাঝে একবার কথা হয়েছিল দেশে ফেরার, কিন্তু ডক্টর ঘোষ পরামর্শ দিলেন, 'খবরদার, ব্যারিস্টারীর সনদটা হাতে নিয়ে তবে ফিরো— নাহয় মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের কিছু কষ্টের টাকা এদেশে খরচ হয়ে গেল, খরচটা বাঁচলেও বিশেষ ফায়দা নেই, বাঙালী ভদ্র পরিবারের জীবনে তাতে ইতরবিশেষ তেমন ঘটে না'।

স্বীকার করব বিদেশবাসের শেষ কয়েকমাস কষ্টে কেটেছিল— বাস্তবিক মনঃকষ্টে; কতকটা সেজন্য বোধ হয় কিছুটা মনকে ভুলিয়ে রাখার জন্য তখন পড়েছি Detection, Mystery and Horror-সম্পর্কিত বহু বই, E. C. Bentley থেকে M. R. James প্রভৃতি বহু গুণীর লেখা। মাঝে মাঝে পড়ে চলেছি পুরোনো 'favorite' লেখকদের রচনা— P. G. Wodehouse আর

W. W. Jacobs, কিম্বা হয়তো ডুবে থেকেছি Walter de la Mare-এর অদ্ভুত সুন্দর *Memoirs of a Midget*-এর মতো রচনায়। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব, সহায়তা দিয়েছিল বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর *The Conquest of Happiness*— তাতে আছে 'Envy' সম্বন্ধে এক চমৎকার পরিচ্ছেদ, যার একটা কথা নানা উপলক্ষে ব্যবহার পরে করেছি। রাসেল সুন্দরভাবে বলেছেন যে নেপোলিয়ান ঈর্ষা করতেন জুলিয়স্ সীজর-কে, সীজর ঈর্ষা করতেন হ্যানিবলকে, হ্যানিবল ঈর্ষা করতেন আলেকজাণ্ডারকে, আর আলেকজাণ্ডার ঈর্ষা করতেন হারক্যুলিসকে, যে-হারক্যুলিস হলেন কাল্পনিক ব্যক্তি, বাস্তবে যার অস্তিত্বই ছিল না! আরো মনে পড়ে তখন পড়েছি Somerset Maugham-এর বিবিধ কাহিনী, আর হঠাৎ হয়তো মনের মেঘ কেটে গেছে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল বাক্য আবিষ্কার করে: "The Professor of Gynaecology began his course of lectures as follows : 'Gentlemen, woman is an animal that micturates once a day, defecates once a week, menstruates once a month, parturates once a year, and copulates whenever she has the opportunity.' I thought it a perfectly balanced sentence." (*The Writer's Notebook*, 1895)

বার্ট্রাণ্ড রাসেল একবার লেখেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিবেক অনুসরণ করে যুদ্ধায়োজনে যোগদানে আপত্তির অপরাধে যখন তাঁর কারাদণ্ড হয় তখন জেলের গেটে নামধামের সঙ্গে 'ধর্ম কি?' প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন: 'Agnostic' (অজ্ঞেয়বাদী)। লিখতে গিয়ে ওয়ার্ডার স্বগতোক্তি করে: 'না জানি কত ধর্মই আছে, তবে সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক!' এই মন্তব্যটি তাঁকে জেলখানায় অন্তত সপ্তাহকাল প্রফুল্ল রাখতে পেরেছিল! রাসেলের বেশ কয়েকটা কথা আমাকেও দুঃসময়ে একটু স্বস্তি দিয়েছিল। একবার বুঝি দেখলাম তিনি লিখছেন এক ভারতীয়ের মুখে শোনা গেল যে, পৃথিবীটা ভর করে আছে এক হাতীর মাথায় আর হাতীটা নাকি রয়েছে এক কচ্ছপের পিঠে— কে যেন জিজ্ঞাসা করল কচ্ছপটা কার ওপর, তখন ভারতীয়টি বললেন, 'ঢের হয়েছে, এবার বিষয়টা বদলালে হয় না?' রাসেল এ কথা শুধু রহস্য করেই বলেন নি; ভগবান যদি স্বয়ম্ভূ হতে পারেন তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তো আপনা হতে গজাতে পারে, তাই মূল প্রথম কারণ রূপে

ঈশ্বর কল্পনাকেই তিনি আক্রমণ করেছিলেন। সে যাই হোক, আমার কাছে এমন সরস গভীর কথা তখন যেন প্রশান্তির প্রলেপ এনে দিচ্ছিল। আজও ভুলতে পারি নি রাসেল-এর গল্প যে একদিন কে একজন এসে বললেন, মশাই আপনার গ্রন্থাবলী পড়ে চলেছি কিন্তু একবর্ণও বুঝলাম না, আর যেটুকু বুঝলাম তা দেখি ভুল কথা! কী ভুল—প্রশ্নের জবাব এল যে রাসেল লিখেছেন জুলিয়াস সীজর মৃত। এতে ভুল কোথায় জানতে চাওয়ায় ভদ্রলোক রুষ্ট হয়ে বললেন, 'আরে মশাই, আমিই তো জুলিয়াস সীজর!'

* * *

সন-তারিখ মনে নেই, কিন্তু অক্সফর্ডে যখন আমি পুরোনো হয়ে গেছি, তখন হঠাৎ খবর পেলাম যে ডক্টর ঘোষের মা মারা গেছেন। তখনই ছুটলাম Boar's Hill-এর চড়াই রাস্তায় তাঁর বাসায়, দেখলাম দেশ থেকে মর্মান্তিক খবর পেয়ে তিনি মুহ্যমান, প্রায় বাহ্যবোধ রহিত। মা ছাড়া দেশে আর কারো সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তখন ছিল না; আঘাত হয়েছিল প্রচণ্ড; বিহ্বল ভাবে একটু-আধটু কথা বললেন— স্পষ্ট মনে আছে শুধু মা নয়, স্বদেশের জন্যও তখন তিনি আকুল হয়ে পড়ছিলেন। বারবার বললেন যে এই শোকের ঘায়ে বুঝছি যে এদেশ আমাদের জায়গা নয়, 'Our roots touch different soil' তাঁর এই ইংরিজী বাক্যটি আমার স্মৃতিতে আজও জ্বলজ্বল করছে— আজও (১৯৭৩) প্রবাসী এই প্রকৃত গুণাঢ্য বাঙালী মাতৃবিয়োগ কালে সেদিন অনুভব করেছিলেন যে আমাদের সত্তার শিকড় স্পর্শ করে আছে যে-ভূমিকে, তা হল আমাদের স্বদেশেরই ভূমি, অন্যত্র নয়। বোধ হয় পরদিনই তাঁকে দেখেছিলাম ভারতীয় মজলিস-এর সভায়। বেশ নিজেকে সামলে নিয়েছেন, মুখচোখের চেহারা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনের সংগ্রহে রয়ে গেল তাঁর শোকদীর্ণ মূর্তি আর সেই পরম শোকের মুহূর্তে জননী ও জন্মভূমির অচ্ছেদ্য মায়া যে অভিমানী, দেশত্যাগী সন্তানকেও বিভোর করতে পারে তার পরিচয়।

হঠাৎ মনে পড়ছে ১৯৩০ সালের মে-মাসে দেশে যখন আইন অমান্য আন্দোলন পুরোদমে চলেছে তখন রাধাকৃষ্ণন-এর মতো ব্যক্তি— যাঁকে স্থিতধী বলা হয়তো অত্যুক্তি কিন্তু যিনি মোটামুটি সাবধানী ও সুবিবেচক সজ্জন (মনে রাখতে হবে তখন তিনি বহন করতেন ইংরেজ সরকারের দেওয়া

'নাইট্‌হুড'-এর বোঝা বা ভূষণ)—অক্স্‌ফর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজের Unitarian গির্জাঘরে এক রবিবার Sermon দিলেন, text বাছাই করলেন বোধ হয় St. Luke থেকে : 'And I say unto you : Overturn...' শুনতে গিয়েছিলাম অনেকে, এবং দেখলাম অধ্যাপক যেন অবসন্ন। পরে জানলাম গায়ে একটু জ্বর তখন তাঁর ছিল— কিন্তু সেই পরিশ্রান্তির ভাব যেন তাঁর ভাষণকে দিয়েছিল এক অদ্ভুত দীপ্তি, কারো মনে সংশয় রইল না ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রাম তাঁর হৃদয় ও চিত্তবৃত্তিকে অধিকার করে রয়েছে, 'ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ কারা' যেন সর্ববিধ বৈষয়িক বাধা ঠেলে বলতে চাইছেন শ্রুতকীর্তি বিদ্বান্‌। পুরো এক বছর (১৯২৯-৩০) তিন 'টার্ম' ধরে রাধাকৃষ্ণন্‌ সপ্তাহে দুটো বা তিনটে বক্তৃতা দিয়ে তখন মুগ্ধ করেছিলেন, কিন্তু সব-কিছু ছাপিয়ে 'Overturn' sermon-টি অবিস্মরণীয় থেকে গেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণনের সম্পর্ক ছেদ তখনো হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন থেকে তার ভার ছিল তাঁর হাতে। তিনি স্থির করে রেখেছিলেন হুমায়ুন কবির এবং আমাকে ওয়ালটেয়ারে নিয়ে যাবেন। আমি ব্যারিস্টার হই বা না হই, সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তবে লিখিত ভাবে কিছু না দিলেও স্পষ্ট জানিয়ে রেখেছিলেন যে দেশে ফিরে আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে যোগ দিতে হবে। অমন একজন ব্যক্তির আগ্রহাতিশয্যকে অবহেলা করা সম্ভব ছিল না; হুমায়ুন এবং আমি দু'জনেরই তাই অধ্যাপনায় হাতে-খড়ি ওয়ালটেয়ারে, আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেরিতে (১৯৩৪) দেশে ফিরে দেখলাম যে বহু পূর্ব থেকে আন্ধ্র ছাত্রমণ্ডলীর কাছে আমি রাধাকৃষ্ণনের কল্যাণে পরিচিত হয়ে পড়েছি। এমন-কি, অনায়ত্ত 'ডক্টরেট'-টিও এই অভাজনের নামের সঙ্গে এভাবে আরোপিত হয়েছে যে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া প্রায় অসাধ্য! বিলাত-প্রবাসকালে মাঝে মাঝে রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটত, কাজে যোগদানের তাগাদাও শুনতে হত। রাধাকৃষ্ণন্‌ কয়েকবার এসেছিলেন জেনীভা শহরে তৎকালীন জাতি-সংঘের (League of Nations) Commission on International Intellectual Cooperation-এ ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি রূপে। তখন দেশভ্রমণ কালে তাঁর মালপত্র কোথাও কোনো শুল্ক (customs)-কর্মচারী পরীক্ষা করতে পারত না, রাষ্ট্রদূতদেরই মতো এ-বিষয়ে অব্যাহতি

(diplomatic immunity) তাঁর ছিল। সুযোগ বুঝে আমার বন্ধু সজ্জাদ জহীর মতলব করল যে 'প্রোফেসর' ইয়োরোপে এলে তাঁর জিম্মায় কম্যুনিজ্‌ম্‌-সম্পর্কিত যথাসম্ভব বইপত্র দেশে পাঠানো যাবে, কোথাও ব্রিটিশ সরকারের নেক্‌নজরে সেগুলো আটকে পড়বে না। গ্রন্থপ্রেমে রাধাকৃষ্ণন্‌ অপরাজেয়; মনের প্রসারও তাঁর প্রচুর; কম্যুনিজ্‌ম্‌ মানেন না কিন্তু তার প্রচার নিষিদ্ধ করা বর্বরতা বলতে কুণ্ঠিত নন্‌। আমাদের তো প্রায় বলতেন (এবং পরে দেশে ফিরেও বলেছেন) যে কম্যুনিজ্‌ম্‌ থেকে 'শ্রেণীযুদ্ধ' কাণ্ডটা কেটে দিলে তিনি নিজেকে কম্যুনিস্ট বলতে রাজী ('Cut out the "class war" stuff from Communism and I am a Communist!')! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন Knight' হওয়া সত্ত্বেও তাই বিনা সংকোচে এই 'নিষিদ্ধ' বইয়ের বোঝা তিনি নিয়ে যেতেন এবং জমা দিতেন আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থালয়ে। পরে বলব এই গ্রন্থালয়ের কথা, যেখানে মার্ক্‌স্‌বাদ অনুশীলনের প্রচুর সুবিধা পেয়েছি— আর মর্মাহত হয়েছি আবিষ্কার করে যে রাধাকৃষ্ণনের উত্তরাধিকারী আর-এক 'Knight' ভাইসচান্সলার 'কম্যুনিস্ট' বই বাছাই করে যেচে পুলিশের জিম্মায় সেগুলিকে তুলে দেন।

১৯২৮ সালের মতোই ১৯৩২ সালে অলিম্পিক্‌ হকি-তে ধ্যানচাঁদ-প্রমুখ মহারথীর কল্যাণে ভারতবর্ষ আবার বিশ্বজয়ী হয়েছিল— '৩৬ সালে শ্বেতচর্মের উৎকর্ষ ঘোষণায় উন্মাদ হিটলারশাহীকে যেন বিদ্রূপ করে বার্লিন অলিম্পিকেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। পরে দেখেছি ধ্যানচাঁদ, তার ছোটো ভাই রূপসিং এবং অন্যান্য দেশের মুখোজ্জ্বলকারী খেলোয়াড়কে কত বিড়ম্বনা ভুগতে হয়েছে— একবার বিলেত থেকে ফেরার পর আমাদের বাড়িতে তাদের কাছে থেকে দেখেছিলাম আমার যে ছোটো ভাই অমিয় প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ছিল তার নিমন্ত্রণে। বিশ্ববিশ্রুত হয়েও বিনয়ী ও সদালাপী এ-ধরনের মানুষ স্বাধীন ভারতে যেন যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও মর্যাদা পেল না, অথচ স্বাধীনতার পূর্বে এদের নিয়েই আমরা অহংকার করতাম, এদের কৃতিত্বে পরাধীনতার জ্বালা কিছুটা প্রশমিত হ'ত। '৩২ সালে আবার বুক দশহাত হয়েছিল ইংলণ্ডে আমাদের ক্রিকেট টীমকে পেয়ে। পোরবন্দরের মহারাজাকে ইংরেজ ক্যাপ্টেন করে পাঠায়, কিন্তু তাঁর সুবুদ্ধির ফলে খেলায়

অধিনায়কত্ব করতেন সি. কে. নায়ুডু, যাঁর কথা আগে লিখেছি, পুরো এক কথকতা যাঁকে নিয়ে করা চলে। লর্ড্‌স্ মাঠে প্রথম পদার্পণ করে 'সেঞ্চুরী' করলেন নায়ুডু, 'Wisden'-এর প্রসিদ্ধ পাঁজিতে তাঁর স্থান হল 'cricketer of the year' হিসাবে, ভারতীয় দল সম্বন্ধে নিরুৎসাহী বিলাতী কাগজও মন্তব্য না করে পারল না যে তাড়াতাড়ি 'রান্' তুলতে হলে World XI-এ নায়ুডু বিনা চলবে না। দেখলাম অক্সফর্ডের মতো জায়গায় ছোটো ছেলেরা মিলে রাস্তায় ক্রিকেট খেলছে আর একজন বলছে 'আমি হলাম না-য়ু-ডু'! সে বছর একটা মাত্র 'টেস্ট' খেলা হল ইংলণ্ডের সঙ্গে— অসম্ভব চাঞ্চল্য চার দিকে যখন প্রথম ইনিংস্-এ ইংলণ্ডের তিন উইকেট পড়ে গেল মাত্র ১৭ 'রানে', Sutcliffe, Holmes এবং Woolley-র মতো ডাকসাইটে খেলোয়াড়কে ফিরে যেতে হল। মাঠে ভারতীয় 'টীম্' নামলে চমৎকার দেখাত, :কারণ অনেকেই দশাসই অথচ সুঠাম চেহারা (অক্সফর্ডের মাঠে দর্শককে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে শুনেছি)— সি. কে. নায়ুডু, ওয়াজির আলি, নাজির আলি, নাওমল, লালসিং, মুহম্মদ নিসার, অমর সিং, ব্যাটে-বলে-ফিল্‌ডিংয়ে এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্! এমন নয় যে সাফল্য সর্বদা এসেছে— আসে নি, কিন্তু খেলা দেখিয়ে দর্শকের মন ভরাবার জাদু যেন জানা ছিল সেই 'টীম'-এর। পর বৎসর '৩৩ সালে ইংলণ্ড এল ডি. আর. জার্ডিন্-এর অধিনায়কত্বে ভারতবর্ষে খেলতে। বেশ মনে আছে স্বয়ং Hobbs তার বর্ণনা দেশের কাগজে লিখে পাঠাতেন, 'Close of play' সংস্করণের সান্ধ্যপত্রিকার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম— আনন্দ আর গর্বের অবধি রইল না যখন পড়লাম বোম্বাইয়ে M. C. C.-র বিপক্ষে তরুণ অমরনাথের 'সেঞ্চুরী'-র কথা। Hobbs-এর যে বর্ণনা বেরিয়েছিল সেই ক্রীড়ামালা বিষয়ে, তা কোথাও পুনর্মুদ্রিত দেখি নি, কিন্তু হলে ভালো হত। ক্রিকেট-লেখার কথায় মনে আসছে (কালানুক্রমিকতা অনুসরণ করছি না) Neville Cardus-এর অনবদ্য রচনার অবিস্মরণীয় রেশ— একবার দলীপ সিং-এর ব্যাটিং সম্বন্ধে লিখলেন, বিকেলের রোদের মতোই যেন তা মাঠকে আলো করে রেখেছিল! আবার বোধ হয় ১৯৩৬ সালে Old Trafford-এ মুশ্‌তাক আলী আর অমর সিং-এর ব্যাটিং দেখে অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করলেন ভারতবর্ষীয় ক্রিকেটের ইন্দ্রজালের কথা, যে-ইন্দ্রজালের রাজা একদা ছিলেন রঞ্জিৎ সিংজী।

আর একবার আমার বিশেষ বন্ধু বিজয় মার্চেন্ট-এর অনিন্দ্য ক্রীড়াশৈলী সম্বন্ধে বললেন বিজয় হল 'India's only European'! নেভিল্ কার্ডস্-এর মতো ক্রিকেট-লেখক আমার অভিজ্ঞতায় জানা নেই; ভাবি বুঝি এর কারণ হল যে তিনি লেখেন সংগীত আর ক্রিকেট উভয় বিষয়ে। আর হয়তো কোথায় যেন সংগীত আর ক্রিকেটে মিল আছে! উভয়েই যেন আছে সময়কে আচ্ছন্ন-করে-রাখা আনন্দ আর সময়কে অতিক্রম-করে-থাকা তার রেশ।

কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি! এবার আবার সূত্র ধারণ করা যাক্। ব্যারিস্টারী পাশের বিষম হাঙ্গামা চুকিয়ে অক্স্‌ফর্ড-বাসের পাট উঠিয়ে দেশে ফেরার আয়োজন করতে হল। অক্স্‌ফর্ডে তখন আমার অনেকটা নিরাসক্ত অবস্থান। প্রায় যেন ডক্টর ঘোষেরই মতো—Mallalieu, Irvine, Anthony Greenwood প্রভৃতি যারা ব্রিটিশ রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ কিছুটা ছিল, কিন্তু ক্রমশ নানা কারণে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হচ্ছিল। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে নতুন যারা, তাদের মধ্যে জে. কে. অটল, হিম্মৎ সিং, বি. পি. এল. বেদী (যে ফ্রীডা নামে এক সহপাঠিনীকে বিয়ে করে এবং উদ্যোগ-সহকারে কতক-গুলো বই ইয়োরোপে প্রকাশ করে একটু খ্যাতি পেয়েছিল; বহু পরে তাকে দিল্লীতে দেখেছি কিন্তু কেমন যেন নিভে-যাওয়া অবস্থায়), কচিৎ কদাচিৎ আহমদাবাদের খ্যাতনামা শেঠ অম্বালাল সরাভাইয়ের ছোটো মেয়ে ভারতী (যার ইংরাজী কবিতার কিছু চল্ হয়েছিল, হুমায়ুনও একখণ্ড কবিতার বই ইংরিজীতে বার করেছিল) প্রভৃতির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হত। এরিক ডেকস্টা তো আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, যেমন ছিল লক্ষ্মণন্, যাদের কথা আগে বলেছি—তারা তখনো ও দেশ ছাড়ে নি। বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠ পুত্র প্রশান্তকুমারের সঙ্গে হৃদ্যতার কথা আর কি বলব—তার মতো অজাতশত্রু মানুষ দুনিয়ায় খুব বেশি মেলে না। কিন্তু সে এবং তার প্রায় নিত্যসহচর জি. সি. ব্যানার্জি (ইংরিজী সাহিত্যে যার ব্যুৎপত্তি মহারাষ্ট্রে বিখ্যাত, অথচ বোম্বাইবাসী এই কৃতবিদ্য বাঙালীকে বাংলা কেন স্মরণ করে না জানি না) তখন দেশে ফিরে গেছেন। শঙ্কর মিত্রের কথা আগে লিখেছি—সে বোধ হয় আমার পরে দেশে ফিরেছিল। আর যখন আমি আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে, সম্ভবত সেই সময় হঠাৎ কলকাতায়

সর্দিজ্বরে মারা যায়। তার স্মৃতিতে শঙ্কর মিত্র কীর্তন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, আমার অনুজোপম এই সুকণ্ঠ, সুদর্শন সুহৃদের অভাব আজও ভুলতে পারি নি। প্রশান্ত বসু এবং জি. সি. ব্যানার্জি (গোপালচন্দ্র) ওখানে থাকাকালে মাঝে মাঝে গল্প করতে নিয়ে যেতেন ওদেরই সহপাঠিনী (ইংরিজী বিভাগে) কুমারী ব্যানার্জির কাছে (পরে ইনি বি. জি. রাও নামে এক আই. সি. এস কর্মচারীকে বিবাহ করেন), সেখানে দেখতাম তাঁর মাতুলকে যিনি সাইকেলে বিশ্বপরিভ্রমণ করেছিলেন, বোধ হয় হকিতেও নামজাদা খেলোয়াড় ছিলেন। প্রশান্ত বসুর ভালোমানুষ বলে সুখ্যাতি এমন ছিল যে একবার তাঁর মোটর গাড়িতে তিন ছাত্রীবন্ধু প্রায় জোর করে কয়েক ঘণ্টার নোটিসে তাদের Stratford-on-Avon-এ পৌঁছিয়ে দেওয়ালো; ব্যাপারটা স্থির হল আমার ঘরে বসে। আর বেশ মনে আছে প্রশান্তবাবু যথেষ্ট অসুবিধা সত্ত্বেও প্রশান্ত মনে রাজী হলেন। বলা বাহুল্য, কোনো প্রকার প্রত্যাশাই এ-ব্যাপারে তাঁর ছিল না। অক্স্‌ফর্ডের পালা চুকিয়ে নিতে চললাম যখন, তখন আমার পুরোনো বন্ধুরা প্রায় নেই এবং নতুনেরা (যেমন 'মক্কি' অটল বা হিম্মৎসিং) কেমন যেন আমাকে 'elder statesman' ভাবতে আরম্ভ করেছে—অস্বস্তিকর অবস্থা বই কি, যা থেকে নিস্তার পাওয়া দরকার ছিল।

ওদেশের মায়া কাটাতে কষ্ট যে হয় নি তা একেবারে নয়। যার স্বভাবই হল নিঃসঙ্গ, ওখানকার পরিস্থিতি তার পক্ষে সাধারণ অর্থে সুখকর অবশ্য নয়— কিন্তু স্বস্তি আর সুখের সন্ধানে যে সর্বদা থাকতে হবে এমন কথা নেই, অল্পায়াস-লব্ধ সুখের জন্য ব্যগ্রতাও ছিল না। সেদেশে দেখেছিলাম যে সাম্রাজ্যবাদের পীঠস্থান হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত সদ্‌গুণের সমাবেশ বহুজনের মধ্যে রয়েছে, বুঝেছিলাম যে মতভেদ ও প্রকৃতিভেদকে অতিক্রম করে সেদেশের মানুষের সঙ্গে গভীর এবং সর্বথা নির্ভরযোগ্য সৌহার্দ্য সম্ভব, অনুভব করা গিয়েছিল পরাধীন দেশ থেকে এসেও সেখানকার মুক্ত মানস-ক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ বিচরণের স্বাচ্ছন্দ্য। অক্স্‌ফর্ড রেলস্টেশনে বিদায় দিতে কয়েকজন বন্ধু এসেছিল— আমাদের বাঙালী চোখে জল একটু সহজে আসে, তবুও একটু অপ্রতিভ ভাবে স্বীকার করছি যে চেষ্টা করে চোখের জল ঠেকাতে হয়েছিল। লণ্ডন-প্যারিস-মার্সাই হয়ে আবার 'পি-অ্যাণ্ড-ও' জাহাজে পাড়ি দিলাম (জাহাজভাড়া সরকার না দিলে আসতাম আমাদের

পক্ষে পছন্দসই ইতালিয়ান জাহাজে), বোম্বাইয়ে কালবিলম্ব না করে সোজা রেলে চেপে কলকাতায়, যেখানে মা, বাবা, দাদু, ভাইবোনেরা ও অন্যান্য স্বজনের সান্নিধ্য পেলাম অনেকদিন বাদে। উল্লাসে অভ্যস্ত নই কিন্তু আনন্দ অবশ্য হয়েছিল— তবু স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে মনের কোণে একটা খচ্‌খচ্‌ ভাব বেশ কিছুকাল ছিল, নিজের অকিঞ্চিৎকর সত্তারই একটা অংশ কেমন যেন বৈরী দেশে ফেলে আসা গিয়েছিল, একেবারে অসম্ভাব্য ও হাস্যকর জেনেও তখনকার 'স্টেট্‌স্‌ম্যান'-জাতীয় কাগজের প্রথম পাতায় 'Homeward Sailings'-এর বিজ্ঞাপন দেখে কল্পনা কিছুকাল চলেছিল আবার ভবিষ্যতে ওদেশটা দেখে আসা নিয়ে! আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তাড়া ছিল বলে আবার ঘর থেকে বিদায় নিতে হল; সপ্তাহখানেক মাত্র সেবার কলকাতায় ছিলাম, মনে আছে পাঁচ বছরের অভ্যাস অনুযায়ী কলকাতার দোকানদারকে 'অনেক ধন্যবাদ' জানিয়ে অবাক্ করে দিয়েছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভালো ব্যবহারও পেয়েছি। 'সাহেব' কখনো যে হই নি তা হলপ করে বলতে পারি, কিন্তু কতকগুলো 'ইংরিজিয়ানা' হয়তো ধাতস্থ হয়েছিল (বেশ ক বছর বাদে প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পী যামিনী রায় যখন বলতেন যে তাঁর পরিচিতদের মধ্যে শুধু কবি বিষ্ণু দে এবং আমি খাঁটি বাঙালী হয়েও 'সাহেব', তখন মজা লাগত)— আর একটা জিনিস বুঝেছিলাম যে 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে একেবারে গোঁড়া, একগুঁয়ে, দেশাভিমানী চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত আইরিশ্‌ বানিয়ে দিলেন তার সংগত, শিল্পসম্মত, চিন্তাপ্রসূত হেতু আছে। 'What do they know of India who only India knows?'

বিলাত থেকে জামাকাপড় জুতো ইত্যাদি এমন-কিছু সঙ্গে করে আনি নি, যা কারো চোখ ধাঁধায়। বর্তমানে এদেশে 'craze for foreign' বলে যে বস্তু চালু আছে তা তখন ছিল না। তবে কারো কারো ঔৎসুক্য ছিল Bond Street না হোক্ কাছাকাছি ঘেঁষতে পারে এমন ফ্যাশান্‌দার কাপড়চোপড় সম্পর্কে। আমার আকৃতি এমন যে সহজে তৈরি পোষাক গায়ে বেশ লেগে যেত— মনে আছে ১৯২৯-এর অক্টোবরে লণ্ডনে হর্ন-ব্রাদার্স দোকানে ফ্ল্যানেল প্যান্ট ('bags') এবং একটা Tweed কোটের সন্ধানে হুমায়ুনের সঙ্গে গিয়েছিলাম— দর্জি মাপ নিয়ে বলল, 'Sir, did anybody ever

tell you that you have a film star's waist ?' বুড়ো বয়স পর্যন্ত আর কিছু না থাকুক, আমার ঐ 'film-star's waist' এখনো আছে শুনি, বাড়তি মাংস অবয়বে অল্পই। রীতিমতো মাপ দিয়ে 'স্যুট্' যে ওদেশে বানাই নি তা নয়, কিন্তু Burton কোম্পানির দৌলতে কলে-সেলাই 'রেডি-মেড্' স্যুটও আমার বেশ চলে গিয়েছে। কেতাদুরস্ত ছাতা কিনে আনি নি; 'ম্যাকিণ্টশ' (ওয়াটার প্রুফ) যেটি এনেছিলাম, সেটিও সাদা-মাটা; ওভার-কোটটি অবশ্য ভালো, অন্তত টেক্‌সই, আজও তা বর্তমান, পরকালে সাক্ষ্য দেবার জন্য তৈরি, কিন্তু তারো কোনো আভিজাত্য নেই। আমাদের মাস্টারমশাই নিবারণবাবু— যাঁর কথা আগে বলেছি— সৌখিন মানুষ ছিলেন, নিজে Cuthbertson Harper থেকে সুন্দর বিলাতী 'K' shoe কিনে পরতেন; তিনি দেখতে চাইলেন আমার বিলাত থেকে আনা জুতো, এবং দেখে বললেন, 'আরে ছিঃ, এর চেয়ে ডি-সিন-এর মতো চীনাবাড়িতে ভালো জিনিস মেলে।' সেযুগে আজকালকার হরেকরকম gadget-এর জন্য লালায়িত হওয়ার প্রচলন ছিল না, তাই বিদেশ থেকে সম্ভার তেমন কিছু আনার কথা ভাবি নি। তবে এনেছিলাম বই, যা সারাপথ জাহাজে ভেসে কলকাতা বন্দরে হাজির হল, আর 'কাস্টম্‌স্'-এর হাত থেকে রেহাই পেল অনেক হাঙ্গামা হুজ্জুতের পর। ওয়ালটেয়ারে বসে চিঠি পেলাম ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির কাছ থেকে যে আমার গ্রন্থরাজি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তবে কিনা মহামান্য সরকারের হুকুমে চারখানা বই আটকানো হয়েছে, সেগুলো এই 'নেটিভ্' দেশের রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ব'লে। যতদূর মনে পড়ে তার মধ্যে ছিল *The Condition of India* বলে এক প্রামাণিক বামপন্থী সংকলন, লেনিনের একটা জীবনী (গ্রন্থকারের নাম মনে নেই), *Brusski: A Peasant Novel* (রুশ লেখকের নাম মনে পড়ছে না), আর সম্ভবত *India under British Terror* নামে ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টি-সংগৃহীত কতকগুলো তথ্য, যার মধ্যে ছিল ১৯৩০ সালে মেদিনীপুর এবং পেশাওয়ারে মুক্তি সংগ্রাম দমন বিষয়ক বহু তথ্য। বিলাতে পিক্‌ফর্ড কোম্পানি এবং B. I. S. N. জাহাজের জিম্মায় অক্ষত অবস্থায় সাধের Encyclopaedia মেহগনি-টেবিল সমেত এসেছিল, কিন্তু পূর্বোক্ত গ্রন্থচতুষ্টয়কে পরাধীন

ভারতবর্ষে অবাঞ্ছিত ও আপত্তিকর বলে সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করে নিল।

রুষ্ট হয়ে, আর হয়তো তখনো বিদগ্ধ ব্রিটিশ সাংবাদিকতার ওপর কিঞ্চিৎ আস্থা থাকায়, প্রতিবাদ পত্র পাঠালাম *New Statesman and Nation*-এ। সেটি যে ছাপা হয়েছে জানতাম না; একদিন স্বয়ং ভাইসচান্সলার রাধাকৃষ্ণন্ আমায় ডেকে বললেন— 'আরে কী ব্যাপার। নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান্ তোমার চিঠি ছেপেছে'। আর নিজেই মুখে মুখে বলে গেলেন চিঠির সারাংশ (যারা রাধাকৃষ্ণনের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা জানে, তাদের কাছে এটা একেবারেই আশ্চর্য কিছু নয়): "...I have lived some of the happiest years of my life in England. I count English men and women among my best friends. I love England, her sights and sounds, more than I care to tell. But I cannot help hating, with all the hate of which I am capable, the abominable relationship between our two countries today." কয়েকবার তারিফ করলেন রাধাকৃষ্ণন্ 'I cannot help hating, with all the hate of which I am capable' কথাগুলির। আমার সৌভাগ্য, কারণ এই পত্র প্রেরণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সদ্যপ্রাপ্ত পদ থেকে অপসারণের প্রস্তাব আসে সিণ্ডিকেটের সাহেব সভ্য বিশাখাপত্তনম্ জেলার কলেক্টর মিস্টর উড্-এর পক্ষ থেকে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণনের আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তির কাছে শ্বেতাঙ্গপুঙ্গবের পরাজয় ঘটে। তবে উড্ সাহেবকে ধন্যবাদ, পরাধীনতার দহনকে তীব্রতর করে তুলতে তিনি সহায় হয়েছিলেন এভাবে; না বুঝে উপায় ছিল না 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?'

১৫

রাধাকৃষ্ণনের কল্যাণে 'খ্যাতি' আমার আগেই আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে গিয়েছিল বলে একটু অস্বস্তিতে যে পড়তে হয় নি তা নয়, কিন্তু সেখানে অবাঙালী ছাত্র আর শিক্ষকদের কাছে এমন সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছিলাম যে অবাঙালী সম্বন্ধে কেমন যেন একটা অদ্ভুত অবজ্ঞা-ভরা যে এক-ধরনের কুনো, নাকি-কাঁদা, অক্ষম অথচ অহংকারী 'বাঙালিয়ানা'-র সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি তা কখনো আমার বরদাস্ত হয় না। ওয়ালটেয়ারে থাকার জায়গা খুঁজে পাওয়ার আগে উঠতে হল ফিরিঙ্গী-পরিচালিত Beach Hotel-এ। সেখানে আবিষ্কার করলাম অক্স্ফর্ডে পূর্ব-পরিচিত রঘুবংশকিশোর কাপুরকে। ইংরাজী বিভাগে অধ্যাপনায় সে তখন সদ্য নিযুক্ত, আমারই মতো একটা বাসার তার দরকার। বয়সের সান্নিধ্য হেতু অবিলম্বে হৃদ্যতা হল ত্রিচিনপল্লী পদ্মনাভন্ রাজন্-এর সঙ্গে; এডিনবরা-র বি.কম্ নিয়ে সে 'কমার্স' (বাণিজ্য) বিভাগে তখন যোগ দিয়েছে। কপালের জোরে তিন বন্ধু একসঙ্গে থাকার মতো একটা চমৎকার ছোট্ট বাড়ি জুটে গেল— একেবারে সমুদ্রের ধারে, চারদিকে বালি কিন্তু তারই মধ্যে মিষ্টি জলের একটা কুয়ো, সবচেয়ে কাছে যে বাড়ি সেটা হল 'বীচ্' হোটেল, পাঁচ মিনিটের পথ, পিছনে বালি পার হয়ে পাথুরে আঁকাবাঁকা রাস্তা ভেঙে দশ মিনিটে ইউনিভার্সিটির সদ্য তৈরি দালানগুলোয় পৌঁছানো যায়। তার আগে বসতি নেই। গৃহস্থের বাসযোগ্য নয় বলে বাড়িটা প্রায় 'পোড়ো' অবস্থায় ছিল, ভূতের বাড়ি বলে দুর্নামও রটেছিল, তাই মালিক মাসে ৪৫ টাকায় আমাদের মতো ভাড়াটে পেয়ে বর্তে গেল— কাপুর-এর মেজাজ ছিল সাহিত্যিক, তারই প্রস্তাবে বাড়ির নামকরণ হল 'The Waste Land'। বিশ্ববিদ্যালয় মহলে আমাদের ডেরার হাঁকডাক ছড়িয়ে পড়ল, রাধাকৃষ্ণন্ এলেন (একবার কলকাতায় তৎকালীন ভাইসচান্সলর হাসান সোহ্রাওয়ার্দি আর রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে নিয়ে), ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল কয়াজী (পূর্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ) এলেন, তেলুগু

কবি ও নাট্যকার আব্বুরি রামকৃষ্ণ রাও ও বহু জনের সমাগম সেই নিঃসঙ্গ পুরীতে ঘটতে থাকল। অহোরাত্র সমুদ্রের কলরোল তখন শুনেছি, সমুদ্রের রঙ, রূপ, মেজাজ-এর অসংখ্য অদলবদল দেখেছি, প্রথমে রোমাঞ্চকর লেগেছে, পরে একঘেয়ে— কাব্যিক 'আদিখ্যেতা' আমাদের মধ্যে একদম অপছন্দ ছিল রাজনের, সে প্রায়ই বলত ওয়ালটেয়ারের চাকরি থেকে রেহাই পেলে পারতপক্ষে সমুদ্রের মুখ সে কখনো আর দেখতে চাইবে না!

কিছুটা ছন্নছাড়া হলেও দিন চলছিল মন্দ নয়। শরৎ চাটুজ্জে মশাই যাকে 'কম্বাইন্‌ড হ্যাণ্ড' বলেছেন তেমনই এক চালাক-চতুর চাকর সব দেখাশুনো করত, ভাঙা হিন্দীও অল্প জানত। হোটেলের ফিরিঙ্গী মেম-মালিকের কাছ থেকে ভাড়া-নেওয়া বিছানা আর অল্প আসবাবপত্রে আমাদের দরকার মিটত। খরচ ভাগাভাগি করায় গায়ে লাগত না— জিনিসপত্রের দামও তখন ছিল কম। মনে আছে তিন মাইল দূরে ভাইজ্যাগ (বিশাখাপত্তনম) শহরে সিন্ধী সৎরামদাস-এর দোকানে সাত-আট টাকায় সুতী প্যাণ্ট-কোট বানানো যেত (যা আজ অলৌকিক কাহিনী মনে হবে)। ১৯২৭ সালে তাড়াহুড়ো করে দেখা ওয়ালটেয়ার-এর পাহাড় আর সমুদ্র মিলে যে বিচিত্র শোভা, নিত্য পরিচয়ের ফলে ম্লান হলেও তার ছবি মনে জলজ্বল হয়ে আছে আর প্রকৃতই তার নয়নমনোহারিত্ব ভুলবার নয়। বসতিবহুল (এবং বর্তমানে জাহাজ তৈরি এবং অন্য বহুবিধ কারখানার চাপে বিড়ম্বিত) ভাইজ্যাগে জঞ্জাল আর দুর্গন্ধ কটু লেগেছে, কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষের নিঃস্ব, দুঃস্থ মানুষ আজও তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরের অনভ্যস্ত এবং প্রায়-যেন-অসম্ভব পরিবেশকে পূতিমুক্ত করে রাখার সংগতি পায় নি, সমাজধারাও সহায় হয় নি। মলমূত্র ত্যাগ করে সমুদ্রতটের বৃহদংশকে স্বচ্ছন্দ বিচরণের অযোগ্য করে তোলার হয়তো মার্জনা নেই, কিন্তু কোনোক্রমে জীবনধারণ হল দিনের পর দিন অষ্টপ্রহর যাদের সমস্যা, তারা কি ধিক্কারের পাত্র হতে পারে? আন্ধ্র প্রদেশে মেহনতী মানুষের কুটির সাধারণত এমন যে প্রাপ্ত-বয়স্কের পক্ষে প্রায় হামাগুড়ি না দিয়ে সেখানে প্রবেশ সম্ভব নয়— এরই প্রকারভেদ এদেশে সর্বত্র। কখনো বাধ্য হয়ে অভুক্ত না থেকে, বিলাসে না হলেও মোটামুটি আরামে, সভ্য শিক্ষিত জীবন যাপন করেও দেখা গেল যে একাদিক্রমে কয়েকমাস নিসর্গসৌন্দর্য নিয়ত নিরীক্ষণের ফলে তার দীপ্তি

আর আগের মতন চমক জাগাল না— কেমন করে আশা করা চলে যে আমাদের নিরন্ন, নিপীড়িত, নির্বিত্তের দল নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠবে, সমুদ্রতটের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যকে অটুট রাখা সম্বন্ধে সচেতন হবে? ভাইজ্যাগের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কাপুর বলত বড্ড নোংরা চারদিকে, উত্তর ভারতেও রাস্তাঘাট নোংরা কিন্তু এতটা নয়— তার কথাটা ঠিক ছিল না, প্রকারভেদ থাকলেও সর্বত্র এদেশে নোংরা, অল্পাধিক বিভিন্ন অঞ্চলে, কিন্তু সর্বত্র নোংরা। তবে আমাদের দেশবাসী হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও পরিষ্কার থাকার চেষ্টায় কোনো দেশের তুলনায় পিছপাও নয়, শুধু বহুকাল ধরে জমে-ওঠা অসম্ভব দুর্দশা তাদের টেনে নামিয়ে রেখেছে।

মনের মেজাজ শরীফ্ থাকার সম্ভাবনা রইল না যখন দেশে ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার সরকারী ঘোষণা প্রকাশ হল। পার্টিকে পুরোপুরি ওদেশে মানতে পারি নি; তার সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কও রাখি নি— কিন্তু মনের গোপনে দানা বেঁধে উঠছিল কম্যুনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে প্রত্যয় এবং তারই অপরিহার্য আনুষঙ্গিকরূপে পার্টি-আনুগত্যের ঔচিত্য। বেশ কিছুদিন অবশ্য মনে হয়েছে যে কম্যুনিস্টদের ধরন-ধারণে কেমন যেন একটা বেয়াড়া-পনা— আশ্চর্য কী এতে, যখন শোষক সমাজের রীতিনীতি ভেঙে চুরে দেওয়াই তাদের কামনা! যাই হোক্ বিদেশবাসকালে এ-বিষয়ে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ যা ঘটেছিল, তারই ক্রমান্বিত প্রয়াস আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত পরিবেশে আমার চলতে থাকল। ছাত্রের মতো মার্ক্‌স্‌বাদ নিয়ে পড়াশুনা তখন করে চলেছি, খাতার পর খাতা 'নোট'-এ ভরিয়েছি Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotsky, Bukharin, Radek, Ryazanov, Lozovsky, Preobrazhensky, Lukacs, R. Palme Dutt প্রভৃতির রচনা থেকে। কলকাতার বন্ধুদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী তখন মনুকে ছেড়ে মার্ক্‌স্‌-কে ধরেছেন— মনন-পরিক্রমা তখন তাঁর পূর্ণ হয়েছে, সমাজতন্ত্রে প্রতীতি নিখাদ আর জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে তার প্রচার ও প্রয়োগে প্রযত্ন একাগ্র। ফরিদপুরের পরম বৈষ্ণব-বংশোদ্ভব এই গুণধরের অকালমৃত্যু (১৯৪৪) প্রকৃত এক প্রতিভাকে এদেশ থেকে ছিনিয়ে নিল; কেউ বড়ো একটা তাঁকে আজ স্মরণ করে না, কিন্তু এ-লেখায় বারবার তিনি আসবেন। ভারত-মানসে

বিশ্ববীক্ষার যে গভীর ঈপ্সা প্রোথিত, তারই প্রকাশ দেখলাম এই তরুণ দর্শনশাস্ত্রীর মার্ক্‌স্‌-বেত্তা রূপে। আমারও চোখ ক্রমশ খুলেছিল মার্ক্‌স্‌বাদের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা-স্পর্শে, আর সঙ্গে সঙ্গে, প্রায় যেন নিজের অজ্ঞাতে, আকৃষ্ট হচ্ছিলাম জনতার অভিযানের দিকে, হৃদয়ঙ্গম করছিলাম যে তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয় বিনা মন্ত্রের সাধন সম্ভব নয়।

দেশে ফেরার মাসখানেক বাদে ডক্টর ঘোষের চিঠি পেলাম— লিখছেন লণ্ডন থেকে, তিন সপ্তাহের সোভিয়েট ভ্রমণ শেষ করার পরই। আমাদের কালে সোভিয়েট দেশে যাওয়া খুব সহজ না হলেও ইংলণ্ড থেকে জাহাজে লেনিনগ্রাদ পৌঁছে কিছু সময় ঘুরে আসার আয়োজন করত Intourist; লণ্ডনে Aldwych অঞ্চলে 'Kniga' নামধেয় সোভিয়েট প্রতিষ্ঠান দেখে লোভ হত যাবার, কিন্তু অনেক লোভের মতো এটাকেও সংবরণ করতে হয়েছিল। তখনো সোভিয়েট-জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল কম; হোটেল ইত্যাদি সরঞ্জামের ব্যবস্থা ছিল সীমাবদ্ধ; শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল প্রখর। যাই হোক্, ডক্টর ঘোষ লিখলেন, ওদেশে হায়রানি কম হয় নি; সঙ্গিনী এক যাত্রীর 'স্যুটকেস্' হারিয়ে গিয়েছিল, ফেরত পাওয়া গেল যখন ভ্রমণের মেয়াদ প্রায় শেষ, প্রতি রাত্রে মোজা এবং অন্তর্বাস কেচে বেচারীকে একবস্ত্রে চালাতে হয়েছিল, হোটেলে অব্যবস্থা প্রচুর, পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় অনেক কিছুই নিরেশ— কিন্তু সব ছাপিয়ে মনকে মোহিত করে চোখের সামনে নতুন এক জীবনকে বহুজন মিলে গড়ে তোলার দৃশ্য, আর লেশমাত্র সন্দেহ্ থাকে না যে বাস্তবিকই এখানে সার্থক একটা কিছু ঘটছে! চিঠিটা আমি হারিয়েছি, কিন্তু সারমর্ম স্পষ্ট মনে রয়েছে। সর্বব্যাপারে খুঁতখুঁতে যাঁর মন, এবং কোনো বিষয়ে অত্যুক্তিতে যাঁর একান্ত বিরাগ, সেই মানুষের মুখে ঐ-ধরনের কথা যে কত মূল্যবান্‌, তা আমি জানি। চিঠিটা পেয়ে আনন্দ বোধ করেছিলাম— সোভিয়েটভূমি বুর্জোয়া জগতে তখন প্রায় সতত ধিক্কৃত আর কতকটা সেজন্যই আমাদের চোখে আদরণীয়, তা ছাড়া একমাত্র সমাজ-বাদী দেশ বলে আমাদের উদীয়মান্‌ নবচেতনার প্রধান ধারক। মনে পড়েছিল সোভিয়েট দেশ দেখে এসে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য যে আমেরিকার বিলাসবাহুল্য তাঁকে পীড়া দিচ্ছে, সেখানে যেন স্ফীতোদর কুবেরের রাজত্ব, অথচ সোভিয়েটে চোখে পড়েছিল অপ্রাচুর্যের মধ্যেও লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তি।

ওয়ালটেয়ারে ইতিহাস আর রাষ্ট্রনীতি পড়াতে হ'ত ; সুতরাং আমার চিন্তার ধাঁচ ছাত্র ও সহকর্মী মহলে ধরা পড়তে দেরি হয় নি। বেশ মনে আছে 'ভাইজ্যাগ' থেকে সেখানকার টাউন হল্-এ বক্তৃতা দিতে ডাকল—বিষয় 'The Soviet Experiment'। এটা নিয়ে শহরে একটু সোরগোল পড়েছিল ; রাধাকৃষ্ণন্ বলেছিলেন হেসে, 'Oh, they call the Soviets an 'experiment', do they ?' তখনো এদেশে সোভিয়েট-বিষয়ে জ্ঞান এবং আগ্রহ উভয়ই অল্প, কিন্তু ১৯৩৫-৩৬ থেকে হাওয়া রীতিমতো বদ্‌লাতে শুরু করল। ১৯৩৫ সালে কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেসে 'সংযুক্ত মোর্চা'-র ('United Front') রাজনীতি বামপন্থীদের সামনে উপস্থাপিত হল ; ইংলণ্ড-ফ্রান্সের মতো গণতন্ত্রগর্বীদের সচেতন সহায়তাপুষ্ট মুসোলিনি-হিটলার প্রমুখের দুর্বৃত্ত ভূমিকা ইতিহাসকে কলঙ্কিত করল। বিপ্লবী সংগ্রামকৌশলের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হল, বিশ্বের একক সমাজবাদী রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েটের দায়িত্ব ও গরিমা নূতন ভাবে অনুভূত হতে থাকল। আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মনেও তখন চাঞ্চল্যের সূত্রপাত ; আমার প্রথম ছাত্রদের মধ্যে ছিল গঞ্জাম-বহরমপুরের বিজয়চন্দ্র দাস, যে ১৯৫২ সালে আমারই সহকর্মী, লোকসভায় নির্বাচিত কম্যুনিস্ট সদস্য। দেড় বছর বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদায় সভায় রাধাকৃষ্ণন্ বললেন "হীরেনের সঙ্গে আমার মত মেলে না কিন্তু আমি খুশি যে ছাত্রদের মস্তিষ্কের মাটি খুঁড়ে নতুন চিন্তার বীজ সে বপন করতে চেয়েছে !"

*　　*　　*

আমার দাদু বোধ হয় বিলেত থেকে আমি ফিরে আসার অপেক্ষাতেই বেঁচে ছিলেন, কারণ ওয়ালটেয়ারে দু'মাস কাটার আগেই হঠাৎ তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। তখন বোধ হয় তাঁর একাশি বৎসর বয়স ; সুতরাং যমরাজের কাছে নালিশ খুব সংগত ছিল না— কিন্তু অন্তত সাময়িকভাবে একটা শূন্যতা অনুভব করেছিলাম। নিরহংকার, উচ্চাভিলাষবিবর্জিত, ধীরচিত্ত, সরল মানুষটির চরিত্র যেন এক অনুচ্চার সততার সহজাত বর্মে আবৃত ছিল। পদ্যরচনায় দক্ষতা ছিল, তবে— আজকের কবিরা হাসবেন— হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভঙ্গীতে ; আদর্শ পুরুষ বলে শ্রদ্ধা করতেন কেশবচন্দ্র সেনকে, তর্ক করে সে শ্রদ্ধাকে টলানো সম্ভব ছিল না, যদিও উনিশ

শতকের রেওয়াজ-মাফিক্ যুক্তিবাদীও ছিলেন। আমাদের হেসে বলতেন যে ভক্তেরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে 'ভগবান্' সম্বোধন করছেন তখন পরমহংস স্বয়ং ধম্‌কানি দিতেন; 'ভগবান্ ভগবান্ করছিস্ সবাই, আর ভগবান্ ক্যান্সারে মরছে!' ইংরেজের গুণাবলী সমকালীনদের মতোই তারিফ করতেন— স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে অগ্রণী ইউনিটেরিয়ন্ পাদরী C. H. A. Dall (আমাদেরই গলিতে যাঁর স্কুল নাকি ছিল, যা পরে *Indian Mirror*-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের বাসভবন হয়) কিম্বা যে সওদাগরী অফিসে কিছুকাল চাকরি করেন তার কর্তা ক্লার্ক সাহেবের কাহিনী অনেক শুনেছি। অক্ষয়চন্দ্র সরকার (বাংলাগদ্যের ক্ষেত্রে যিনি 'আচার্য' বলে পরিগণিত ছিলেন), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন (কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ), ব্রাহ্ম সমাজের 'ভাই' প্রমথলাল সেন, ব্রজগোপাল নিয়োগী (সুবিদিত বক্তা ও প্রচারবিদ্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর পিতা) প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল; সাংবাদিকতার 'কম্বল' ছাড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি, কিন্তু গান্ধীযুগকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। চমকপ্রদ কোনো কৃতিত্ব তাঁর জীবনে ছিল না, কখনো কামনাও করেন নি, তবে ছিল সরল, বিনম্র ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধ স্পর্শ, যার অন্তর্ধানে অন্তত কিছু সময় আমার মন হাহাকার করেছিল।

*　*　*

আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এম ভেঙ্কটরঙ্গাইয়া এখন (১৯৭৩) অশীতি-উত্তীর্ণ হয়েও হায়দরাবাদে লেখাপড়া করে চলেছেন— শীর্ণ অথচ দীর্ঘতনু (ছেলেরা ঠাট্টা করত 'length without breadth'), মৃদুভাষী, সহৃদয় এই বিদ্বান নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়েও পরমত-অসহিষ্ণু ছিলেন না— পরিচয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পত্রিকা *Educational India*-তে লিখতে বললেন, সদ্যার্জিত মার্ক্‌স-বোধ হয়তো অর্বাচীনেরই মতো প্রয়োগ করলাম শিক্ষা ও সমাজ-শীর্ষক প্রবন্ধে, কিন্তু তিনি প্রসন্ন হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন তখনকার দিনে প্রথিতযশা অর্থবিদ জহাঙ্গীর কুবেরজী কয়াজী, যাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমরা দোর্দণ্ডপ্রতাপ অধ্যাপক ভেবে একটু যেন ভয় করতাম (প্রেসিডেন্সির প্রিন্সিপাল তিনি হয়েছিলেন, যা তখন ভারতীয়ের পক্ষে দুষ্কর ছিল, তা ছাড়া Tariff Commission ইত্যাদিতে সরকারী মনোনয়ন এবং 'নাইট্'

খেতাব তাঁর মিলেছিল), কিন্তু ওয়ালটেয়ারে একেবারে নিকট থেকে দেখে ভয় করা দূরে থাক্ তাঁর অনুরাগীই হয়ে উঠলাম। কড়া রাজনৈতিক মেজাজের মানুষ এতে আশ্চর্য হতে পারেন কারণ আমাকে (এবং আমার নিত্যসঙ্গী কাপুর ও রাজন্‌কে) তিনি ঠাট্টা করে বলতেন কম্যুনিজ্‌ম্ তো একটা বিভীষকা—'দেখো না লেলিনের মূর্তি, একেবারে যেন দানব।' (কোন্ ছবি কোথায় দেখেছিলেন অবশ্য জানি না)। তখনকার হিসাবে আজীবন বহু অর্থ অর্জন করা সত্ত্বেও রীতিমতো কৃপণ ছিলেন। শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে ফ্ল্যানেল-এর ইজের পরতেন, বলতেন গরমকে ঠেকিয়ে রাখে ফ্ল্যানেল (মনে পড়ে যেত ছেলেবেলায় দেখা বিজ্ঞাপন : 'গ্রীষ্মকালে গরম চা পরম স্নিগ্ধকর পানীয়')— পার্সী-পরিচালিত Seaview Hotel-এ সাদাসিধে ভাবে থাকতেন, অথচ মনটি ছিল নরম, অনেককে গোপনে টাকা দিয়েও সাহায্য করতেন। কয়াজী সাহেবের গুম্ফরাজি ছিল দেখবার মতো, কিন্তু মফস্বল শহর বলে হোক্ কিম্বা নিছক আলসে-পনার চাপে রোজ দাড়ি কামাতেন না, কিছু এসে যেত না তাতে, চেহারায় একটা রাজকীয় ভাব যেন ছিল। অর্থনীতি বিষয়ে সক্রিয় অবদান তাঁর তখন বোধ হয় ফুরিয়ে গিয়েছে, তবে রাধাকৃষ্ণন্ টেনে এনেছিলেন সংগত কারণে— নানা দিক থেকে তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অলংকার। মতের বিপুল ও মূলগত পার্থক্য সত্ত্বেও এই ব্রিটিশভক্ত, বিপ্লবভীরু, সাতে-পাঁচে-না-থাকার-মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষটিকে নিয়ে কৌতুক করেছি অথচ শ্রদ্ধার আসনেও বসাতে পেরেছি। আমাদের তিনজনের মধ্যে সংকেতে কথা কিছু চলত—তখনকার দিনে আমাদের প্রায়-'hero' রাধাকৃষ্ণন্ সম্বন্ধে বলা হত 'l.b.,' অর্থাৎ 'Literate Blackguard'! ভাবটা এই যে সংসারে কর্তৃপক্ষীয় সকলেই দুরাত্মা (blackguard), তবে কিনা তারই মধ্যে রাধাকৃষ্ণন্ অন্তত 'শিক্ষিত'! কয়াজী সাহেবকে আমরা এমনই সদাশিব-গোছের মানুষ ভাবতাম যে তাঁর কোনো বিশেষ দ্ব্যর্থক আখ্যা উদ্ভাবন করি নি।

যে কথা আগে বলেছি, তারই জের টেনে বলব রাধাকৃষ্ণন্ সম্বন্ধে— নিখুঁত মানুষ কোথায়, কিন্তু বাস্তবিকই রাধাকৃষ্ণনের মতো বহুগুণান্বিত ব্যক্তি এত বিরল যে অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও তাঁকে নিয়ে আমাদের গর্ব একান্ত সমীচীন। সাম্যবাদে বিশ্বাসী তিনি ছিলেন না ; আনুষ্ঠানিক অর্থে

ধর্ম তাঁকে আকর্ষণ যে করে না তা নয় আর আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিষয়ে তাঁর গভীর চিত্তাবেগ বস্তুবাদী চিন্তার পরিপন্থী। তা সত্ত্বেও এবং তৎকালীন সরকারের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থালয়কে তিনি সম্ভবত সমাজবাদ সম্পর্কে এ দেশের সব চেয়ে সমৃদ্ধ সংগ্রহ করে তুলেছিলেন। ভাইসচান্সলর পদে বসে আর-এক খ্যাতনামা আন্ধ্র বিদ্বান্ ও বাগ্মী সি. আর. রেড্ডি (রাধাকৃষ্ণনেরই মতো তিনি ছিলেন 'নাইট') সেই সংগ্রহকে ছিন্নভিন্ন করে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পুলিশের হাতে সমর্পণ করেছিলেন— আমি নিজে ওয়ালটেয়ারে পরে গিয়ে তা দেখেছি। বোধ হয় ১৯৪১ সালে রাধাকৃষ্ণন্ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তখন এক সভায় তাঁর গুণ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করি— ধৃষ্টতার অজুহাত রাখি এই যে তিনিই হলেন আমার জানা একমাত্র 'মহাজন' ('great man') যাঁর মুখের ওপর খোলাখুলি সমালোচনা করতে পারি! ওয়ালটেয়ার বাসকালে ঘনিষ্ঠতার ফলেই এই আশ্বাস পেয়েছিলাম। দেখতাম সকলের সঙ্গে সদালাপ করছেন কিন্তু মনের গহনে তিনি একাকী; সর্ববিধ চিন্তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করছেন কিন্তু আঁকড়ে থাকতে চাইছেন একেবারে নিজস্ব ভারতীয়ত্বকে। মাঝে মাঝে ভাবের ঘরে চুরি করতে বাধ্য হচ্ছেন; অস্বস্তি ঘটছে কিন্তু স্বীকার করছেন না; সপ্তাহান্তে বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকা তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থালয়ে, মাঝে মাঝে তাঁর পেন্সিলের দাগ, কোনো দামী কথা তাঁর চোখকে এড়ায় নি, বিদেশী লেখকের সুন্দর একটা শব্দবিন্যাস মনে যেন এঁটে গিয়েছে, হয়তো কোনো বক্তৃতায় শুনলাম তার প্রতিধ্বনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেনেট' মিটিংয়ের জন্য তৈরি হতেন অদ্ভুতভাবে— সঙ্গে এক টুকরো 'নোট' থাকত না, গোটা কর্মসূচী এবং তার খুঁটিনাটি একেবারে কণ্ঠস্থ, ব্যাপারটা আয়ত্ত করছেন চারদিকে বইপত্র ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে, কথা বলছেন আমাদের সঙ্গে সেই অবস্থায়, কিন্তু মনের মধ্যে যেন কুস্তি চলেছে কর্মসূচীর প্রতিটি বিন্যাস নিয়ে, এক মুহূর্তও বিছানায় স্থির হয়ে থাকছেন না, আর শয্যা ছেড়ে উঠেছেন যখন সব-কিছু তাঁর নখাগ্রে, সর্ববিধ প্রশ্ন, যুক্তি, সমালোচনার সদুত্তর দিতে তিনিও সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

যে-কোনো জমায়েতেই বোধ করি খুঁজে পাওয়া যায় বেশ কয়েকজন

মানুষ যারা অপরের মনে ছাপ রাখার মতো সংগতি রাখে, আর সেদিনের অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক মহলে বিভিন্ন প্রকৃতির এবং মোটামুটি সাদাসিধে ধরনের, অথচ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসা গিয়েছিল। অন্তত তখনো তেলুগু ভাষাভাষীরা বাঙালীদের সম্বন্ধে তেমন বিরূপতা পোষণ করত না বলেই মনে হয়েছিল ; মাঝে মাঝেই শোনা যেত বাঙালী আর তেলুগুদের মধ্যে সাদৃশ্য ; উল্লিখিত হত মসুলিপত্তনম্-এ আন্ধ্র জাতীয় কলাশালা এবং তার অধ্যক্ষ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম ; তেলুগু সাহিত্যকার ও সমাজসংস্কারক বীরেশলিঙ্গম্ কতদূর রামমোহন রায় প্রমুখ বাঙালী মনীষীদের দ্বারা প্রভাবিত তার উত্থাপন হ'ত, হয়তো কেউ বলতেন পিথাপুরম্-এর রাজপরিবারের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কের কথা ; প্রসঙ্গক্রমে জানলাম যে উত্তর ভারতে বহুকাল সাংবাদিক রূপে যাঁর স্বকীয় ভূমিকা ছিল, কিছুকাল আগে প্রয়াত আমার শুভার্থী বন্ধু, রাজমহেন্দ্রী-নিবাসী কে. ঈশ্বরদত্ত-এর নামকরণ ঘটেছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদন দত্তের মহত্ত্বকে স্মরণ ক'রে। তৎকালীন তেলুগু সাহিত্যের প্রখ্যাত প্রাচীনপন্থী কবি পিঙ্গলি লক্ষ্মীকান্তম্ সংস্কৃত ও তেলুগু পড়াতেন— আমাদের শুনিয়েছেন সংস্কৃতঘেঁষা তেলুগু কবিতা যার অনেক কথা বুঝতে অসুবিধা ঘটত না। কতকটা ঘনিষ্ঠতা জমে গিয়েছিল আর এক অধ্যাপক, তেলুগু ভাষায় কবি ও নাট্যকার-রূপে কীর্তিত আব্বুরি রামকৃষ্ণ রাওয়ের সঙ্গে— আলসে মানুষ, খেয়ালী মেজাজ, পারতপক্ষে রেশমী ছাড়া সূতী পাঞ্জাবী পরেন না, কয়েক বছর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে এসেছেন, বাংলা বোঝেন, তবে বলতে নারাজ, কাব্যবিচারে একটু (ভারতীয় পরিমাপে) যেন নাকতোলা, পশ্চিমী প্রভাবে আকৃষ্ট কিন্তু একেবারে আন্ধ্র ভূমিতে বেড়ে-ওঠা, মাঝে মাঝে যেন গোঁয়ার ধরনের মানুষ, সাহিত্য আর সমাজ উভয়ের সম্পর্ক ব্যাপারে আগ্রহী এবং অন্তত তখন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত, আর এত সত্ত্বেও মোটামুটি জটিলতাবিহীন ব্যক্তি, যিনি সরস আলাপে হৃষ্ট, একটু হেঁয়ালী ধরনে কথা সাজিয়ে ছেলেমানুষের মতো যাঁর হাসি, সংসারবুদ্ধিরহিত না হয়েও কিছুটা অসংসারী বলেই বোধ হয় যিনি আমাদের খুব কাছে এসেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার চেট্টি সম্ভবত তামিল ছিলেন— কর্মকুশল,

হয়তো বা কিছু পরিমাণে কুটিল, কিন্তু সদাহাস্যময়, আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে অমায়িক, যে-কোনো ব্যাপারে সহায়তায় উৎসুক। গ্রন্থপাল টমাস্ ছিলেন ত্রিবান্দ্রমের লোক, খ্রীস্টান এবং কেরলীয় বলেই বোধ হয় আন্ধ্রদের একটু কৃপাচক্ষে দেখতেন, বিদেশী ডিগ্রাধারী বলেও হয়তো আমাদের সান্নিধ্য খানিকটা বেড়েছিল— কৃষ্ণাঙ্গী অথচ সুদর্শনা টমাস-গৃহিণী সম্বন্ধেও আমাদের একটা আকর্ষণ ছিল, নিজেদের মধ্যে দম্পতির নামকরণ করা গিয়েছিল 'John' এবং 'Lady Jane', ডি.এইচ্. লরেন্স-এর রচনা থেকে ধার করে। গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর চাওলা কেম্‌ব্রিজে সুখ্যাতি পেয়েছিলেন, গবেষকরূপে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্বীকৃত ছিলেন, পরে আমেরিকায় গেলেন, সংবাদ আর পাই নি। নম্র এবং কিছুটা সলজ্জ মানুষটি প্রায় সর্বদাই যেন গণিতের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রধান কারণ ছিলেন তাঁর স্ত্রী, যিনি বাঙালী, স্বভাবে মধুর, ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ— অচিরে জানা গেল সুচেতা কৃপলানি তাঁর ভগ্নী, কিন্তু কালানুক্রমের দিক থেকে এগিয়ে পড়েছি কারণ সুচেতা তখনো আচার্য কৃপলানির পাণিগ্রহণ করেন নি। সন্দেহ নেই উভয়ের প্রাক্‌পরিণয় মেলামেশা তখন চলছিল, কারণ স্বয়ং আচার্য একবার ওয়ালটেয়রে এসে চাওলাদের অতিথি হলেন, খ্যাতনামা জাতীয় নেতা রূপে ছাত্রসংঘ-কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হলেন, বক্তৃতা করলেন স্বকীয় তির্যক্ ভঙ্গীতে। আমার ভূমিকা হল তাঁর বক্তব্যের কঠোর বিরোধিতা এবং তারই কল্যাণে প্রত্যুত্তরে আচার্যের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হল— অসত্য বলছি না, পুলকিত হলাম কারণ আচার্য কৃপলানি যে বুদ্ধি-বৃত্তিতে অসামান্য তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ওভাবে পেয়ে আমার অহমিকাও তুষ্ট হয়েছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তী জীবনে পার্লামেণ্টে বহু বৎসর আচার্য কৃপলানির সামীপ্যে বিচরণ করেছি ; অন্তরঙ্গতা কখনো হয় নি, বয়সের বাধা, প্রগাঢ় মতভেদের বাধা কাটানো সহজ ছিল না। কিন্তু দেশের এক সম্মানিত নেতাকে কাছ থেকে জানতে পারা কম মহার্ঘ ব্যাপার নয়, যথাস্থানে যার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিতও হয়তো দিতে পারব। বলে রাখছি এখানে যে শ্রীমতী সুচেতার সঙ্গে ওয়ালটেয়রে পরিচয় ঘটে নি, ঘটেছিল ১৯৫২ সালে দিল্লীতে, এবং বলতে পারি যে আচার্যের সম্পর্কে দূরত্ব রেখেও আচার্যানীর সঙ্গে হৃদ্যতা কিছু পরিমাণে হয়েছিল, যার অল্প আভাস পরে দিতে হবে। আন্ধ্র

বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য কৃপলানির উপস্থিতিতে যে সভা হয় সেখানে স্থানীয় কংগ্রেস-নেতা শ্রীটি. বিশ্বনাথন-এর সঙ্গে যে পরিচয় হয় তাও পরে সংসদ ভবনে ঘনীভূত হতে পেরেছিল।

বাণিজ্যবিভাগে (যেখানে বন্ধু রাজনের অধিষ্ঠান) বেশ কয়েকটি তাজা মনের সন্ধান পাওয়া যেত, যদিও কলকাতার 'এম-কম' শেষগিরি রাও কিম্বা গুণ্টুরের এক চমৎকার পৌরাণিক নাম-ধারী অধ্যাপকের (নামটি ভুলে গেছি কিন্তু সেটি যে চমৎকার ছিল মনে আছে!) কথাবার্তায় গভীরতার খোঁজ করা বাতুলতা জানতাম। এঁর কাছে শুনলাম গুণ্টুরে ঋতু হল তিনটে— 'Hot', 'Hotter' আর 'Hottest'! আন্ধ্র সৌজন্যেরই নতুন খবর পেলাম— যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন দুটো জামার মধ্যে কোন্‌টা ভালো তো বিগলিত কণ্ঠে জবাব পাবেন 'Both are better'! তা নইলে প্রশ্নকর্তার মনে আঘাত পড়তে পারে! (এ ব্যাপারই লক্ষ করেছি ভাইজ্যাগের দোকানে)। গুণ্টুর-নিবাসী অধ্যাপকটির চেহারা ছিল দশাসই, বঙ মিশকালো, পান-খাওয়া দাঁতের সারি, আলাপ-আলোচনায় কালাপাহাড়ী ভাব অথচ কপালে রক্ত তিলক, দেখা হলে ক্লাস আটকে গল্পে মশ্‌গুল, মজ্‌লিসী সন্দেহ নেই, কিন্তু সময়জ্ঞানের অভাবে মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর। পরে ওয়ালটেয়ার গিয়ে তাঁকে দেখি নি, দেখেছিলাম দত্ত-নামে এক অমায়িক বাঙালীকে। আর দেখলাম গণিত বিভাগে যোগ দিয়েছেন দীর্ঘকায় পি. ভি. রত্নম্ যিনি, কোন্ সুবাদে জানি না, পরে স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগে যোগ দেন, ইন্দোনেশিয়া এবং অন্য কয়েকটি দেশে রাষ্ট্রদূত হয়েছেন, দিল্লীতে দেখা হয়েছে যখন পরিচালিত হচ্ছেন হিন্দীজ্ঞানগর্বিতা পত্নীর হাতে, যিনি হিন্দী এবং সংস্কৃতের উৎকর্ষ নিয়ে বাক্‌বিস্তারে এমনই উদ্‌গ্রীব যে ভয় হত বিদেশে তাঁর শ্রোতাদের কথা ভেবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কম; সেখানে রাধাকৃষ্ণন্ আনলেন হিটলারী শাসনে পলাতক এক ইহুদী বৈজ্ঞানিক যিনি বার্লিনের টেক্‌নিকাল 'হাইস্কুল'-এ (যা আমাদের কলেজেরও বাড়া) অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বদেশী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তখনই নাম-করা লোক ছিলেন অধ্যাপক ভগবন্তম্, যাঁর খ্যাতি সি. ভি. রমনের ছাত্র বলে খুব ছড়িয়েছিল, এবং পরে যাঁকে দেখেছি দিল্লীতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা পদে। ইনি বর্তমানে 'সাঁই-বাবা'-

নামধারী 'ভগবান'-এর ভক্ত ; মনস্তত্ত্ব বিচিত্র বটে। এই মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক পুরুষোত্তম কতকটা একক হলেও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত মানুষ ছিলেন। অব্রাহ্মণ হয়েও বুঝি এক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন, নিন্দুকেরা তাঁর মনস্তাত্ত্বিকসুলভ মস্তিষ্কবিকৃতি নিয়ে রহস্য করত, কিন্তু নানা উপলক্ষে যেমন কলকাতায় ১৯৩৮ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তীতে, তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল শ্রদ্ধার্হ মানুষ। দর্শনবিভাগে রাধাকৃষ্ণনের সহকারীরূপে ছিলেন পি.টি. রাজু ; তখন তাঁকে কেউ আমল দিত না, কিন্তু পরে বহু প্রশংসা পেয়েছেন, ১৯৫৮ সালে তাঁকে দেখলাম যোধপুরে এক সভায়, তখন রাজস্থান তাঁর অধ্যাপনাক্ষেত্র, বহু দার্শনিক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

দর্শনবিভাগের প্রধান অধ্যাপক শৈলেশ্বর সেনের কথা ভুলতে পারা সম্ভব নয়— কত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন জানি না, তবে 'ডক্টর সেন' বলতে আন্ধ্র ছাত্রেরা মাথা নত করত আর আমরা দেখতাম দারুণ হিসাবী অথচ কেমন যেন আপনা-ভোলা, সাবেক কালের সব রেওয়াজ মেনে চলার পক্ষপাতী অথচ প্রকৃত তীক্ষ্ণধী। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কৌতুক করতে সর্বদা প্রস্তুত, কথা যখন বলছেন তখন স্মিতানন, আর ঈষৎ স্ফীত বপুতে মুখের হাসিটি যেন তলপেট থেকে শুরু করে সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ছে, অথচ বাস্তবিকই গম্ভীর মানুষ, প্রগল্‌ভতা একটুও নেই। ওখানে চলৃত খচ্চর-বাহিত 'ঝট্‌কা', যা ঝটিতিবেগে না গেলেও দেহকে ঝাঁকানি দিত প্রচণ্ড এবং যেখানে ছাউনির তলায় ময়লা চটের ওপর শুয়ে বা বসে 'ভোগান্তি' সহ্য করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আর ছিল 'বণ্ডি', যাতে অন্তত পা দুটো ঝুলিয়ে কাষ্ঠাসনে বসা যেত কিন্তু ষণ্ড প্রবরের মন্থর আকর্ষণে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো ছিল এক ব্যাপারই বটে। এই ষাঁড়ে-টানা যান ডক্টর সেন বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। তিনি যখন কলেজে, তখন চালক নিদ্রামগ্ন এবং বাহন খাদ্যান্বেষণে ব্যস্ত, ঘাস যেখানে অতিবিরল সেখানে কাগজ চিবিয়েই সে তুষ্ট। ডক্টর সেনকে বলতাম আপনি একটা বিভাগের প্রধান, সহজেই মোটর গাড়ি কিনতে পারেন, এই দুর্ভোগের মধ্যে থাকছেন কেন ? তাঁর মুখে ফুটে উঠত 'পেটেন্ট' হাসি, আর বলতেন, 'বাপ-ঠাকুরদা কখনো মোটর চড়ল না, আমারই যে চড়তে হবে কে বলল ?' গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, নিত্যকর্মপদ্ধতি পালন করতেন, যদিও দার্শনিক সত্তা হয়তো ব্যবহারিক জীবনের স্পর্শমুক্ত ছিল। আমার সামান্য সংস্কৃতজ্ঞান

এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিধ আধ্যাত্মিকতায় অবিশ্বাসকে ঠাট্টা করতেন, একবার কলকাতায় আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, বুড়োবয়সে একেবারে নিদারুণ ভক্ত না হয়ে আমার নিস্তার নেই! যখন জবাব দিলাম যে সকল ইন্দ্রিয় যখন শিথিল তখনই যদি ধর্মের কাছে মানুষ হার মানে তো সে ধর্মের দাম আর কতটা— শুনে আবার সেই পরিচিত হাসি, দেহের প্রান্ত থেকে প্রান্তে ছড়িয়ে-পড়া হাসি। অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল মানুষটির— ওয়ালটেয়ারেই বাড়ি করেছিলেন পরে, মোটর গাড়িও কিনেছিলেন, দেহরক্ষা সম্ভবত সেখানেই করেছেন। অপরের মুখে শুনেছি তাঁর কন্যা (যিনি নিজে 'ডক্টরেট' করেছেন এবং বোধ করি আন্ধ্রেরই অধ্যাপিকা) ওদেশেই তেলুগু স্বামীকে বরণ করে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করেছেন। পিতৃলোক যদি থাকত তো সেখান থেকেই পিতা সন্তানকে আশীর্বাদ করতেন। জীবনলীলার বৈচিত্র্যে পুলকিত হতেন।

* * *

জওয়াহরলাল নেহরু-র *Whither India?* শীর্ষক রচনা বোধ হয় ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে সমাজবাদ সম্পর্কে আগ্রহ শিক্ষিত মহলে ব্যাপকভাবে উদ্রিক্ত হতে থাকে। অবশ্য বিশের দশকের আলোড়নেরই ফলে এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল— মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা প্রভৃতি নিয়ে কিছু কথা আগেই বলতে হয়েছে। সম্ভবত ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি স্থাপিত হয়—'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' ধরনের যে মনোবৃত্তি জওয়াহরলালের বৈশিষ্ট্য ছিল, স্বচ্ছ চেতনা ও বলিষ্ঠ প্রত্যয় সত্ত্বেও বিপ্লবের রূপায়ন প্রয়াসে অবিরাম সংশয় ও দোদুল্যমানতা যার ফল, তারই প্রকাশ দেখা গেল যখন তিনি কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির ('সি.এস.পি') মুরুব্বি হয়েও তাতে যোগ দিলেন না। ১৯৩৫ কিম্বা ১৯৩৬ সালে 'সি.এস. পি'র প্রধান নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ *Why Socialism!* নামে একটি চমৎকার পুস্তিকা লেখেন—মন্দ লোকের কটু কথা নয়, নির্দোষ কৌতুকেই তখন বলাবলি হত যে জয়প্রকাশ যে অমন তীক্ষ্ণ ভাষায় গান্ধীবাদকে আক্রমণ করতে পেরেছে তার মূল কারণ এই যে সে তার স্ত্রী প্রভাবতীকে গান্ধীজীর জিম্মায় রেখে আমেরিকায় পড়তে গিয়েছিল আর বেশ ক'বছর বাদে ফিরে দেখে যে বউ ঘরে আসতে চায় না, আশ্রমকেই আঁকড়ে থাকে! এটা যখন লিখছি তার কয়েকমাস মাত্র আগে প্রভাবতী দেবীর মৃত্যু হয়েছে। গয়া কংগ্রেসে (১৯২২)

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি, বিহারের শ্রেষ্ঠ নেতাদের অন্যতম, ব্রজকিশোর প্রসাদ ছিলেন তাঁর পিতা। গান্ধী-আশ্রমে আজীবন বাস না করলেও প্রকৃত আশ্রমিকার মতোই নিষ্ঠাবতী তিনি ছিলেন, অল্প তাঁর সংস্পর্শে এসেই বোঝা যেত চরিত্রের গভীরে অটল একটা শক্তি যেন রয়েছে। সে কথা যাক্। আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময় আমার ডাক পড়ত নানাস্থান থেকে—ভিজিয়ানাগ্রাম, কাকিনাদা, রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি জায়গায় সাধারণত ছাত্র-যুব সভা কিম্বা কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমাজবাদ বিষয়ে বলতে হত, কম্যুনিস্ট আন্দোলনে আন্ধ্র পুরোধারা এখনো মাঝে মাঝে সে-সব দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আর তখন যতদূর সম্ভব একাগ্র আগ্রহ নিয়ে সমাজবাদ-সাম্যবাদ বিষয়ে অনুশীলন করেছি— ক্রমশ বুঝেছি অনেক জিনিস নতুন করে। Shaw, Wells, Webb-কে 'The three blind mice' বলার মতো মানসিকতা কখনো অর্জন করতে পারি নি, কিন্তু ধরতে পেরেছি যে মার্ক্‌স্‌-কে তারিফ করার ভাব দেখিয়ে লেনিনকে নস্যাৎ করা (অর্থাৎ যথার্থ বৈপ্লবিক কার্যক্রমকে উপেক্ষা) হল Laski কিম্বা Cole-এর অভিপ্রায়। সিড্‌নী ও বীট্রিস্‌ ওয়েব ১৯৩৫ সালে "সোভিয়েট কম্যুনিজম্‌" সম্বন্ধে মহাগ্রন্থ লেখার আগে শুধু সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দিগ্‌গজ বলে তাদের দূর থেকে শ্রদ্ধা করা যেত, "inevitability of gradualness" তত্ত্বের তারিফ পরাধীন দেশবাসী হয়ে করতে পারতাম না। ওয়েল্‌স্‌-কে কখনো সমাজবাদের শ্লাঘ্য প্রবক্তা মনে হয় নি; *Kipps, History of Mr. Polly*র মতো অনবদ্য কাহিনী, *The Outline of History* এবং *The Science of Life*-এর মতো পরিকল্পনা, *The Time Machine* ধরনের ভবিষ্যৎদৃষ্টিপ্রধান রচনা, আর *First and Last Things*-এর মতো মননশীল অথচ সুখপাঠ্য গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবেই তিনি নমস্য ছিলেন। বোধ হয় ১৯৩৫-এ স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সমাজবাদ বিষয়ে ওয়েলস্‌-এর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি যে স্বল্প তার অত্যন্ত সরেশ সাক্ষ্য পাওয়া গেল; কথোপকথনের অনুলিখন নিউ স্টেট্‌স্‌মান পত্রিকায় এবং পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়েছিল, স্টালিনকে গভীর মার্কস্‌বেত্তা বলতে যাদের দ্বিধা তাদের এখনো সেটা পড়ে দেখা উচিত। Shaw সম্বন্ধে মনে কেমন একটা মায়া জন্মেছিল; মাঝে মাঝে উদ্ভট বাক্য উচ্চারণে স্ফূর্তি অবশ্য তাঁর হত (তা ছাড়া সংসারটাই যখন উদ্ভট, তখন

বিষে বিষক্ষয়ও হয়তো অসুখে হোমিয়োপ্যাথির মতো কিছুটা কার্যকরী), কিন্তু বুঝেছিলাম 'a good man fallen among the fabians' বলে তাঁর লেনিন-কৃত বর্ণনা নির্ভুল। আশ্চর্য হই নি যখন অনেক দিন পরে আমার একদা একান্ত শ্রদ্ধেয় বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর আত্মকথায় দেখলাম Shaw সম্বন্ধে তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি এই যে তাঁর ছিল "equal admiration for St. Joan of Orleans and St. Joseph of Moscow"! স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ বোধ নেই যে জোসেফ স্টালিনের কথা এবং কাজের সঙ্গে যথাসাধ্য পরিচিত হয়ে তখন মুগ্ধ হয়েছি— আজও বহু বিরূপ সমালোচনা জানার পরও মূল মূল্যায়নে মারাত্মক কোনো চিড় ধরে নি। রাসেলের কায়দাতেই কলকাতায় 'পরিচয়' পত্রিকার প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিষ্ঠাতা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো শ্রদ্ধেয় সুহৃদের মুখে 'Uncle Joe'-র দোষকীর্তন শুনেছি, হাঁসের গায়ে জলের মতো মনে দাগ কাটে নি।

'The Waste Land'-এ যে দুই বন্ধুর সঙ্গে ছিলাম, তারা কেউ কম্যুনিজম্-এর অমোঘ টানের আস্বাদ পায় নি, তবে দু'জনেই আমাকে খানিকটা খাপছাড়া মানুষ ভাবলেও আমার বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করত। কাপুর পরে অমৃতসরে পড়াতে যায়, সেখানে পঞ্জাবী এক ছাত্রীর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে (পূর্ববিবাহিতা গ্রাম্য স্ত্রীকে প্রায় বর্জন করে, যেটা রাজন্ এবং আমি কখনো বরদাস্ত করতে পারি নি), দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসে সাংস্কৃতিক কর্মচারী হয়, দেশে ফিরে শিক্ষামন্ত্রালয়ের জয়েণ্ট সেক্রেটারি পদ থেকে অবসর নিয়ে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে মারা যায়। আগেই বলেছি ইয়োরোপীয় (অর্থাৎ প্রধানত ইংরেজী) সাহিত্য সম্পর্কে তার এক রকম নেশা ছিল, সমাজসমস্যা নিয়ে ভাবতে সচরাচর গররাজীই বোধ করত, ভাসা-ভাসা উদারনৈতিক মতামতের বেশি এগোত না, তবে সমাজবাদ বা সাম্যবাদ বিষয়ে বিরূপতা পোষণ করার মতো অবস্থাতে কখনো পৌঁছায় নি। প্রথম স্ত্রী সম্বন্ধে কেমন যেন অচেতনতাকে যদি মার্জনা করা যায় তো সে ছিল প্রকৃতই সজ্জন, সর্বদা সদিচ্ছাপূর্ণ, ব্যবহারে শালীন ও সৎ। রাজন অন্য ধরনের লোক— রেঙ্গুনে মানুষ, বেশ কিছুটা মিলিটারী মেজাজ, স্পষ্টবক্তা, সাহিত্য শিল্প বিষয়ে সর্ববিধ 'আদিখ্যেতা'-র শত্রু, মনটা নিছক সংসারী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবেশে

বিশেষত বন্ধুদের ব্যাপারে, সাধ্যাতিরিক্ত সহায়তা দিতে সর্বদা প্রস্তুত। আজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পড়াতেই সে All India Reserve of Officer-এ যোগ দেয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, স্বাধীন ভারতে 'কর্ণেল' উপাধি নিয়ে বল্লভভাই প্যাটেলের Ministry of States-এর প্রতিরক্ষা পরামর্শ-দাতার কাজ করে, যথাসময়ের পূর্বেই অবসর নিয়ে ব্যবসার জগতে ঢোকে, বিরলা-প্রতিষ্ঠানে উচ্চাসনে বসে, কেরালায় কাগজের মণ্ড তৈরির মস্ত কারখানাকে গড়ে তোলে, আবার বিরলাদের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় নামে, ব্যাঙ্গালোরে বাড়ি বানিয়ে সেখান থেকে 'আজ-দিল্লী কাল-আদিস্-আবাবা-পরশু-ফ্রাঙ্কফুর্ট' করে বেড়ায়। মাঝে মাঝেই কলকাতা-দিল্লীতে তার সঙ্গে আমার দেখা, আমাদের পরিবারে সে আত্মীয়-তুল্য— আমার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতি হলেও আমার একজন বাস্তবিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যার প্রধান গুণ হল এই যে জাত-যোদ্ধাদের মতো তার দৃষ্টি, তার লক্ষ্য চলে সমরেখায়, আঁকাবাঁকা প্রায় কিছু নেই, তার দোষ আর গুণ সমানভাবেই স্পষ্ট।

আমাকে বইয়ের গাদায় ডুবে থাকতে দেখে তারা স্থির করল আমার একটা লেখা একদিন পড়া হবে, এবং বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সেই সুবাদে চায়ের চক্র, মাঝেমাঝেই যার বৈঠকের আয়োজন চলবে। "The Illusion of Liberty" নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম (পরে যা প্রকাশিত হয় এলাহাবাদে তেজবাহাদুর সপ্রু -প্রতিষ্ঠিত এবং কে. ঈশ্বর দত্ত সম্পাদিত *Twentieth Century* পত্রিকায়), লেনিনের 'Liberty is a bourgeois illusion' বাক্যের বিশ্লেষণ প্রয়াসে। চক্রের নাম আমিই দিয়েছিলাম 'অনামিকা', যা শুনে কবি আক্কুরি রামকৃষ্ণ রাওয়ের উল্লাস, কিন্তু বলা বাহুল্য চক্রের জীবন হল সংক্ষিপ্ত। বছর দশেক বাদে *Under Marx's Banner* নাম দিয়ে প্রবন্ধ-সংকলনের কয়েকটা এই সময়কার লেখা— The Myth of Community 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত হয়; "Religion and Social Revolution" প্রবন্ধ আগ্রহ করে *Twentieth Century*-তে ঈশ্বর দত্ত ছাপান; তখনকার নামজাদা মাসিক *Hindustan Review*'-সম্পাদক, 'লিবারল' হওয়া সত্ত্বেও বিহারকেশরী বলে খ্যাত সচ্চিদানন্দ সিংহ আমার লেখা "Thc Origins of Indian Nationalism"

প্রকাশ করেন। যোগাযোগ ঘটে আন্ধ্র প্রদেশের অজাতশত্রু সাংবাদিক কে. রামকোটীশ্বর রাওয়ের সঙ্গে; তাঁর বিখ্যাত ত্রৈমাসিক 'ত্রিবেণী'-তে ছাপান আমার লেখা "The Challenge of Nationalism"। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ১৯৩৬ সালে কলকাতায় যখন থাকি, তখন '*Modern Review*' মাসিকে "Demand for Colonies" এবং "The New Soviet Constitution"— আমার এই দুই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার বাবা রামানন্দবাবুকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন; তাঁরই আগ্রহে লিখি। যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি মেতে ছিলাম, বাবা সে সম্পর্কে উৎসাহ বোধ করতেন না, কিন্তু আমি যে লেখার কাজ করছি তাতে তিনি খুশি হতেন। একটু জনান্তিকে বলে রাখি যে মডার্ন রিভিউতে লেখার পারিশ্রমিক পাই নি, যদিও তখন শুনতাম রামানন্দবাবু লেখকদের অন্তত কিছু দক্ষিণা দেওয়ার নীতি মেনে চলতেন— দোষ নিশ্চয়ই আমার কারণ দক্ষিণা দাবি করি নি, দরজায় ঠেলা না দিলে তা খুলবেই বা কেমন করে?

ইতিমধ্যে থেকে থেকে বাড়ির ডাক আসত, কলকাতায় এসে ব্যারিস্টারীর সনদটাকে একটু কাজে লাগানোর তাগিদ পেতাম। প্রথম ক বছর 'ব্রীফ্'-বিহীন জীবন যাপনের সংগতি সংগ্রহ হয়তো বা কলকাতায় কোনো কলেজে পড়িয়ে জোগাড় করে সম্ভব হবে, তবু চেষ্টা তো করা দরকার, এই ছিল যুক্তি। কলকাতায় মানুষ হয়েছি; কলকাতার টানও কম ছিল না— আর আন্ধ্র থেকে ছুটিতে কলকাতায় অল্প সময়ের জন্য এসেও দেখেছি মনোমত কাজের ক্ষেত্র কত বিস্তৃত, বন্ধুবান্ধবও প্রায় সবাই সেখানে। দু'নৌকায় পা দিয়ে ব্যারিস্টারীতে পসার করা যে সম্ভব নয় তা জানতাম; আইন ব্যবসার দিকে আকর্ষণ কখনো বোধ করি নি, নিছক্ অর্থ উপার্জনের মোহ কখনো অনুভব করি নি, মরিয়া হয়ে পয়সা রোজগারের চেষ্টায় নামব ভাবতে পারি নি। এ-সব সত্ত্বেও, এবং নিজে খুব বেশি দৃঢ়চিত্ত না হওয়ার দরুন, স্থির করা গেল কলকাতায় ফিরে যাব। রাধাকৃষ্ণন্ অপ্রসন্ন হলেন কিন্তু বাধা দিলেন না।

১৯৩৮ সালের শেষাশেষি ওয়ালটেয়ারের পাট চুকিয়ে এলাম; তল্পীতল্পা ছিল অল্পই; মোটের মধ্যে প্রধান হল বই, যা তখনো ধারে Blackwell-এর দোকান থেকে জাহাজ চেপে আসত! স্বর্গে বা নরকে সাক্ষ্য দেবার থাকলে

দিত এই-সব বই, তবে ক্রমশ নানা কারণে তাদের মায়া আজ কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। তখনো কিন্তু বই নিয়ে বিড়ম্বনা শেষ হওয়ার সময় আসে নি। আগেই বলেছি বিলেতে প্রায় পদার্পণ করেই মেহগনি-টেবিল সমেত 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা' কিস্তিতে কেনার কাহিনী। হাইকোর্টে আইনব্যবসা খুলতে হবে বলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা পরামর্শ দিলেন যে আইনগ্রন্থের যথাসম্ভব ভালো লাইব্রেরি আমার নিশ্চয়ই অচিরে দরকার হবে, সুতরাং কালবিলম্ব না করে সংগ্রহ শুরু হোক। Butterworth নামে যে প্রসিদ্ধ বইয়ের দোকান, তার এক প্রতিনিধি জুটে গেল— বুড়ো মানুষ, জাতে ফরাসী কিন্তু ফিরিঙ্গী বিয়ে করে গ্রান্ট্‌ স্ট্রীটের বাসিন্দা, কথার ঝুড়ি, দালাল হলেও শ্বেতাঙ্গ বলে হাইকোর্ট অঞ্চলে বহু বিশিষ্ট জনের পরিচিত। আমাকে ভাঙাচোরা ফরাসী বলিয়ে নিতে ব্যাকুল লোকটিকে এড়ানো মুশকিল হল। জানা গেল যে মাত্র কুড়ি টাকা দিলেই একগাড়ি বই বাড়ি বয়ে পৌঁছে দেবে — Halsbury's Laws of England এবং অন্যান্য কিছু রিপোর্ট যা প্রায় দুটো আলমারি ভরে তুলবে। আর দাম শোধ করতে হবে কয়েক বছর ধরে প্রতি মাসে কুড়ি টাকা দিয়ে! শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু ফাঁদে যে পড়ছিলাম তা বোঝা গেল পরে— বেশ মনে আছে, ১৯৪৩-৪৪ সালে বিরক্ত হয়ে বইগুলো বেচে দেওয়া হল প্রায় জলের দামে, কারণ ঝকঝকে দেখালেও তখন হাত বদল করে বই গুলো 'পুরোনো', আর কিনলেন যিনি তিনি আমার চেয়ে ব্যারিস্টারিতে সিনিয়র। যাই হোক, সন্তর্পণে হলেও আইনব্যবসার দিকে পা ফেলতে যাওয়া আমার পক্ষে বোকামি হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্তত সংসারের একটা বিশিষ্ট এলাকার সঙ্গে গভীর না হলেও অল্প অথচ চাক্ষুষ পরিচয় সেভাবে পেয়েছিলাম।

* * *

সেদিনের বে-আইনী কম্যুনিস্ট পার্টি সম্ভবত আমার সন্ধান জানত কিন্তু আমি তখনো ঠিক তার সন্ধান পাই নি। বলতে কুণ্ঠা নেই মাঝে মাঝে কারো কারো রকমসকম দেখে পার্টি সম্বন্ধে একটু বিরূপ ভাবও মনে উঠেছিল। এ কথা বলছি এজন্য যে বেশ মনে আছে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবসভা হচ্ছে (১৯৩৫), বয়োবৃদ্ধ নেতা হরদয়াল নাগ সভাপতি, মোটামুটি ভিড় হয়েছে, কিন্তু পার্কের এককোণে দেখলাম গোল হয়ে বসে

কিছু লোক 'স্লোগান' দিচ্ছে: 'কংগ্রেস সুবর্ণ জয়ন্তী ধ্বংস হোক!' কাছাকাছি সবাই বলাবলি করল যে ওরা হল কম্যুনিস্ট— আর আমিও বিরক্তি বোধ করলাম। সম্প্রতি সোভিয়েট গবেষণা থেকে জানা গেল ১৯২৮ সালে বারদোলি সত্যাগ্রহের সময় বোম্বাইয়ে কম্যুনিস্ট সংস্থার পক্ষ থেকে এস. ভি. ঘাটে (যিনি পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং যাঁকে পরে কাছ থেকে জানার সৌভাগ্য পেয়েছি) সর্দার বল্লভভাই পাটেলকে একহাজার স্বেচ্ছাসেবক দিতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন— মনে হয় জাতীয় আন্দোলনের মূল্যায়নে যে সর্বদাই ভ্রান্তি ঘটেছে তা নয়, কিন্তু 'কংগ্রেস সুবর্ণ জয়ন্তী ধ্বংস হোক' এই ধ্বনি কটুই লেগেছিল। কম্যুনিজম তখন আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছে, ভারতবর্ষে জন্মে যেন উত্তরাধিকারসূত্রেই যে বিশ্ববীক্ষার তৃষ্ণা মনে জাগে তাকে তুষ্ট করার শক্তি কম্যুনিজম ভিন্ন অন্যত্র কোথাও নেই এই প্রত্যয় চিন্তায় তখন প্রোথিত, কিন্তু তখন পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হয় নি। ট্রট্স্কির মতো ব্যক্তির রচনায় দেখেছি: I cannot be right *without* the Party— মার্ক্সীয় সাহিত্যে তত্ত্ব ও কর্মের অখণ্ডতা যে কত তাৎপর্যপূর্ণ, বোঝবার কিছু চেষ্টা করেছি; যে ইয়োরোপের দিকে তাকিয়ে থাকা আমাদের আজকের পরম্পরা, সেই ইয়োরোপে মার্কসীয় চিন্তার দিগ্বিজয় লক্ষণে উৎফুল্ল হয়েছি; চীন ইথিওপিয়া স্পেন প্রভৃতি দেশে ফ্যাশিস্ট দানবিকতার বিরুদ্ধে মানবিক শুভবুদ্ধির অজেয় নির্ঘোষের মধ্যে জায়মান সমসমাজের পদধ্বনি সবাই শুনেছি; কিন্তু সংহতি বিনা সংকল্প ব্যর্থ আর যে সুসন্নিবদ্ধ সংগঠন বর্তমান যুগের স্বপ্নকে বাস্তবে আনার সম্ভাবনা রাখে, সেই পার্টির সঙ্গে আমার সম্পর্ক তখনো স্থাপিত হয় নি।

সম্পর্ক স্থাপনে বিলম্ব অবশ্য হল না, কারণ সমাজবাদ সাম্যবাদ নিয়ে আমার আগ্রহের খবর কিছুটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমাকে আশ্চর্য করে দিল এক আহ্বান—'সারা বাংলা ছাত্র সম্মেলন' বলে অভিহিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করতে হবে। নানা মতের সমাজবাদী সে সভায় হাজির ছিলেন, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত হলেন, বুঝলাম কয়েক বছরের ঝগড়ায় A.B.S.A., B.P.S.A-র মতো ছাত্রসংগঠনের বদলে নতুন কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু পরিস্থিতি তখনো স্পষ্ট নয়। স্পেনে ফ্যাশিস্ট বর্বরতার

ভেঙে যাওয়া তীব্র নিন্দা করে অ্যালবার্ট হলে (আজ যেখানে কফি হাউস্) সভা হল— আমাকে বক্তৃতা করতে হল যদিও সরোজিনী নাইডু সেখানে প্রধান আকর্ষণ। ওয়ালটেয়ারে অবস্থানকালেই বোধ হয় একবার ছুটিতে এসে আবু সয়ীদ আইয়ুব* কিম্বা সুরেন গোস্বামীর সঙ্গে 'পরিচয়' আড্ডায় গিয়েছিলাম, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বইয়ে বোঝাই বসবার ঘরে আলাপ হল অনেকের সঙ্গে, এঙ্গেলস্-এর 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' গ্রন্থটির সমালোচনা লিখতে প্রতিশ্রুত হলাম আর বাংলায় আমার সেই প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনার কল্যাণে হয়তো একটু সাড়া জাগাতে পেরেছিলাম। সাংবাদিকমহলে (যেখানে আমার পিতা সর্বজনপরিচিত) যাতায়াত একটু-আধটু তখন আরম্ভ হয়েছে ; সুরেন গোস্বামীই প্রায় নিয়ে যেতেন, মার্ক্স্-এর ভাবরাজ্যে তখন তাঁর পুলকিত অধিষ্ঠান, পড়ছেন, চিন্তা করছেন, প্রশ্ন করছেন, নতুন এক বিশ্বের সন্ধান পেয়ে যেন মেতেছিলেন তিনি। ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল সেদিনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' -সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে, জানলাম এমন একজনকে যিনি শুধু আজকের সাংবাদিক মহলে তুলনাহীন তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছন্দ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং এমনই যাঁর সহজাত সমাজচেতনা যে অক্লেশে এবং স্বাভাবিক বাঙালিয়ানার সঙ্গে সংগতি রেখে মার্ক্স্বাদের মর্মবস্তু আয়ত্ত করতে তাঁর বিলম্ব ঘটে নি। কুণ্ঠা দেখা দেয় নি, অ্যালবার্ট হলের ছোটো একটি কমিটি-ঘর ছিল, যেখানে ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে কী যেন একটা বৈঠক হল, যেখানে বিভিন্ন বামপন্থী নেতারা সমবেত হয়েছিলেন এবং তদুপলক্ষে প্রথম দেখা এবং পরিচয় হল স্বনামধন্য মুজফ্ফর আহমদ সাহেবের সঙ্গে— বোধ হয় তখন সম্প্রতি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ড ভোগ করে মুক্তি পেয়েছেন, আমাদের কাছে তিনি এক 'কিম্বদন্তী'। হয়তো তাঁর আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে কাল্পনিক ধারণা একটা ছিল কিন্তু বেশ মনে আছে সুরেন গোস্বামী এবং আমি বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁকে দেখে ; খর্বকায়, মৃদুভাষী ও নিতান্ত 'ভালো মানুষ'-এর মতো চেহারা, পরনে গ্রীষ্মকালেও গরম কোটপ্যান্ট (পরে শুনেছিলাম যক্ষারোগের আক্রমণ সামলে উঠে তাঁকে তখন খুব সতর্ক থাকতে হত), ধরনধারণে 'বিপ্লবী' নেতার চিহ্নমাত্র নেই, বরং রেওয়াজ অনুযায়ী পরিচয়ের পূর্বে অপরিচিত মানুষটি সম্বন্ধে তখনকার আমাদের উভয়েরই মনে সন্দেহ জেগেছিল ; 'এ ভদ্রলোকটি কে ? স্পাই-টাই নয় তো ?'

ইতিমধ্যে আমার অক্সফর্ডের বন্ধু সজ্জাদ জহীর (বন্ধুমহলে যে 'বন্নে' ডাকনামে সমধিক পরিচিত) কম্যুনিস্ট পার্টিকে আমার কথা জানিয়ে রাখায় একদিন খবর পেলাম পার্টির সেক্রেটারি পি. সি. জোশীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আইন বাঁচিয়ে প্রকাশ্যে যারা সরাসরি পার্টির নাম না করে কিম্বা অন্য সংগঠনের আচ্ছাদনে কাজ করত তারা ছাড়াও অল্প কয়েকজনকে তখন জানতাম, যারা বিচরণ করতেন সংগোপনে, প্রকাশ্য পরিচয় থাকত না, সভাসমিতিতে আসতেন না— এম্নি একজন নিয়ে গেলেন। ব্যবধান রেখে চললাম, ট্রাম্ বাস্ কয়েকবার বদ্‌লে টালিগঞ্জ এলাকায় এঁদোপুকুরের ধারে মেটে ঘরে আলাপ হল জোশীর সঙ্গে। ঘরের আসবাবের মধ্যে চ্যাটাই, একখানা চেয়ার আর ছোট্ট টেবিলে টাইপরাইটার। সজ্জাদ যেন একবার আমায় বলেছিল যে তুলনার কথা উঠছে না, কিন্তু একটা বিষয়ে লেনিনের সঙ্গে জোশীর সাদৃশ্য এই যে, দেশে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়ে তার চিন্তা নেই! দেখলাম শক্ত সুঠাম 'পাহাড়ী' চেহারা, খাড়া-ধরণের ঘন চুল, মুখে হাসি, পরনে হাফ্‌প্যান্ট আর গেঞ্জি, ঈষৎ তোৎলা, কথা বলে হড়্‌বড়্ করে কিন্তু ইংরেজীটা চোস্ত্ (উচ্চারণ নয়, কথাগুলো), ব্যবহারে জড়তা নেই বরং আছে সহজ আন্তরিকতা, বুঝলাম অপরকে টানবার শক্তি এ রাখে, আর সে তো ধরেই নিয়েছিল যে পার্টির কাজ আমি করব এবং কিছুটা বিপদের ঝুঁকি নিতেও আমি তৈরি। কী কথা হয়েছিল মনে নেই, তবে ভুলতে পারি নি যে আমি পার্টিকে মাসে দশ কি পনেরো টাকা দিতে পারি জেনে খুশি হয়ে বলল, 'বাঃ! আমাদের বে-আইনী 'কম্যুনিস্ট' ('Organ of the C.P.I., Section of the Communist International' বলে বর্ণিত) প্রতিসংখ্যা 'সাইক্লোস্টাইল' করার খরচ চলে যাবে!' বহু বৎসর ধরে পি. সি. জোশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আমার থেকেছে— সম্প্রতি নানা কারণে ব্যবধান বেড়েছে বলে দেখাসাক্ষাৎ কম। কিন্তু বেশ কিছুকাল আমরা শুধু পার্টিসাথী নয়, অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিলাম। জানি না জোশী ছাড়া অন্য কেউ সেদিন পার্টিপ্রধান থাকলে তার মতো আমাকে পার্টিতে টেনে নেওয়া ঘটত কি না— টালিগঞ্জের সেই দীনহীন কুটিরে যে আমার মনস্থির হয়ে গিয়েছিল, পার্টিতে যোগ দেওয়া জীবনব্যাপী কঠোর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা জেনেও যে কুণ্ঠা বোধ করি

নি, গৌণ হলেও যে তার একটা কারণ জোশীর ব্যক্তিত্ব তাতে সন্দেহ নেই।

পার্টি বে-আইনী বলে বাইরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন কিছুটা গোলমেলে ছিল— কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেসে (১৯৩৫) যুক্তফ্রণ্টের নীতি ঘোষিত হওয়ার ফলে বামপন্থী ঐক্যের সম্ভাবনা বেড়েছিল, ফ্যাশিজমের নোংরা দাপটে দেশের সচেতন জনতা সাম্রাজ্যবিরোধিতার মধ্য দিয়ে সোভিয়েট বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা এবং সমাজবাদ ব্যাপারে ঔৎসুক্য ও অনুরাগ ক্রমশ পোষণ করার বহু লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু ঐক্যের পথে বাধা ছিল বিস্তর আর বামপন্থাকে সর্বদাই তো ঘরে বাইরে অজস্র শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়ে থাকে বলে রাস্তা ছিল কাঁটায় ভরা। ১৯৩৬ সালের শেষ দিকে বোধ হয় প্রকাশ্যে কাজ করার জন্য আমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে হয়েছিল। তার আগে ছিল নীহারেন্দু দত্তমজুমদারের 'বেঙ্গল লেবর পার্টি', যার সঙ্গে পার্টির কেমন যেন একটা অস্বস্তির সম্পর্ক, যদিও যোগাযোগ রাখা হত এবং পার্টির গোপন নেতৃত্ব সে বিষয়ে সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকত। দত্ত মজুমদার শক্তিমান্ ব্যক্তি সন্দেহ নেই; ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় তার দহরম মহরম চলেছিল, সর্বময় 'নেতা' হবার নেশা না থাকলে দেশের আন্দোলনে তার স্থায়ী মর্যাদার আসন নিশ্চিত ছিল, কারণ তার কর্মক্ষমতা, বাক্‌পটুতা ইত্যাদি গুণের অভাব ছিল না, কিন্তু না বলে পারছি না, বিপ্লবী চরিত্রে কোথায় এমন গলদ তার লুকিয়ে ছিল যার ফলে অমন সম্ভাবনাময় প্রাথমিক ভূমিকা সত্ত্বেও তার ব্যর্থতা অনতিবিলম্বে লক্ষ্য করা গেল। কংগ্রেসে তিনি গেলেন, মন্ত্রী হলেন অল্পকালের জন্য, কিন্তু আখের কোথাও বজায় রইল না। চাকচিক্যময় ব্যক্তিত্ব নিষ্প্রভ হয়ে গেল, বার লাইব্রেরির কোণে আর সংকীর্ণ পরিবেশে আজ তার যেন অজ্ঞাতবাস।

নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের লেবর পার্টিতে গুণী কর্মী অনেকে ছিলেন; তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ মাঝে মাঝে ঘটত। শিশির রায়, কমল সরকার, বিশ্বনাথ দুবে, সুধা রায়, অনন্ত মুখার্জি, নিত্যানন্দ চৌধুরী, নন্দ বসু প্রভৃতির নাম মনে আসছে। এদের অনেকে পরে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে সসম্মানে কাজ করেছেন— নাম করতে পারি কমল সরকারের, যিনি আজও

মার্ক্‌সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির শ্রমিক ফ্রন্টের একজন নেতা। তারিখ মনে পড়ছে না, কিন্তু কলকাতায় একটা কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের আত্ম-পক্ষসমর্থনে সাহায্য করার জন্য কমিটি হয়; আমাকে করে দেওয়া হয় তার কোষাধ্যক্ষ। দেশে টাকা বিশেষ ওঠে নি কিন্তু বিলেত থেকে হঠাৎ আট-নশো টাকা এসে গেল, মীরাট মামলার জন্য সংগৃহীত অর্থের উদ্‌বৃত্ত আমরা পেলাম— আমার কাছ থেকে কমল সরকার 'চেক্‌'-টা নিয়ে গেলেন, যাবার সময় গলি কাঁপিয়ে হাঁক দিলেন: 'কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল জিন্দাবাদ!' সমাজের কতকটা ওপরতলায় দত্ত মজুমদারের কয়েকজন বন্ধু ছিলেন যাদের কাছ থেকে পার্টিও সাহায্য পেয়েছে, যেমন হাইকোর্টের নামজাদা উকিল ডক্টর শরৎ বসাকের ছেলে কিরণ বসাক এবং আর একটু দূরে বিজ্ঞানী ডক্টর বীরেশ গুহ কিম্বা চিকিৎসাবিশারদ ডক্টর অমিয় বসু। ওপরতলার মানুষ হয়েও যারা যথাসাধ্য কায়মনোবাক্যে সেদিনের অবস্থায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সহায়তা করেছে তাদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করব দু'জনের। একজন হলেন খ্যাতনামা লেখক ও ব্যবহারজীবী ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের পুত্র নির্মল সেনগুপ্ত; তীক্ষ্ণধী, নিয়মানুবর্তী, নির্ভরযোগ্য, সুদর্শন এই তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মতো বহুগুণান্বিত মানুষ তখন বেশি ছিল না। সে এবং তার বিদেশী স্ত্রী (স্টেলা ব্রাউন্‌ নামেই যে নিজের পরিচয় দিত এবং সুদক্ষ চিত্র-শিল্পী ছিল) প্রধানত বে-আইনী পার্টির গোপন কাজে এবং যথাসম্ভব প্রকাশ্য প্রচেষ্টাতেও লিপ্ত থাকত। আর একজন হল জাকাউল্লাহ খান্‌, যে তখন কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার পদে থেকেও বে-আইনী পার্টিকে নানা ভাবে সাহায্য করত; থিয়েটার রোডে কিম্বা পার্ক সার্কাসের তখনকার অভিজাত ফ্ল্যাটে বে-আইনী 'কম্যুনিস্ট' পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি নিয়ে আমরা একত্র কাজ করেছি। জাকাউল্লাহ দেশভাগের পর পাকিস্তান চলে যায়; একবার মাত্র পরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, পুরোনো দিনের স্মৃতি তার মনে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল। তার সহোদরা হাজরা বেগম (কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা জৈনুল আবেদিন আহমদের স্ত্রী এবং নিজেও পার্টির অন্যতম নেত্রী) এবং বাছাই করা কয়েক জন ছাড়া তার জীবনের এই অধ্যায় কেউ জানে না।

পার্টির জ্যাকারিয়া স্ট্রীটস্থ পুরোনো ডেরার কথা অনেক শুনেছি এবং পরে

পড়েছি, কিন্তু তার অভ্যন্তর আমার কখনো দেখা হয় নি। বোধ হয় ৭৭নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুতে মস্ত বড়ো চার তলা ফ্ল্যাট বাড়িতে প্রায় গিয়েছি। আর মাঝে মাঝে যেতে হত ঐ রাস্তাতেই অ্যাভেন্যু ক্লাব নামে এক বাসা-বাড়িতে (যার চেহারা আজ বদলেছে)। কালানুক্রমের দিক থেকে একটু পরের কথা এসে গেল— কিন্তু ঐ এলাকাতেই সাগর দত্ত লেনে উর্দু দৈনিক 'রোজানা হিন্দ্'-এর ছাপাখানায় মজলিসী মৌলানা মলিহাবাদীর আতিথ্যে পার্টি-জমায়েতের স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। এরই সঙ্গে মনে পড়ছে আমাদের বাড়ির কাছে খালাসীটোলায়, ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের (বর্তমানে রফি আহমদ্ কিদোয়াই রোড) পশ্চিমে সরু গলি মৌলভী লেনের ৭নং বাড়িতে পার্টির বহু দুঃখকষ্টের দিনের অকৃত্রিম বন্ধু কুতুবউদ্দিন আহ্‌মদ্ সাহেবের সঙ্গে কত আলাপ-আলোচনার কথা। · পার্টির মধ্যমণি তখন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ্; সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ তাঁর সাথী ছিলেন আবদুল হালিম— এই দু'জনের কথা তো বলে শেষ করতে পারব না। আর আমার কাছে পরম বিস্ময় এই যে মুজফ্‌ফর সাহেবের মতো ব্যক্তি সম্প্রতি কেমন করে পার্টিজীবন পর্যালোচনা-ব্যপদেশে বহু সহকর্মীর মধ্যে নোংরামির দিকটাই শুধু দেখেছেন। আমার বিশ্বাস হয় না যে বিচারের দাঁড়িপাল্লায় অমন বিকৃতি এনে ফেলা সুস্থ চিন্তায় সম্ভব হতে পারে। যাই হোক্, মুজফ্‌ফর সাহেব কি জানি কেন আমার সম্বন্ধে মমতা প্রথম থেকে পোষণ করেছেন, যে-কারণে তাঁর সম্পর্কে আমারও একটা দুর্বলতা আছে। তাঁরই মাধ্যমে কুতব্‌উদ্দিনকে জানলাম, শুনলাম অগণিতবার তিনি জামিন হয়েছেন পার্টির জন্য; তাঁর বাড়ির দরজা পার্টিকর্মীদের কাছে সর্বদা উন্মুক্ত, সে দরজা ঠেলে পুলিশ যে কতবার খানা-তল্লাসী করেছে তার ইয়ত্তা নেই। একবার অনেকে মিলে আনন্দ করলাম সেখানে, আবদুল হালিম এবং শামসুল হুদার (যার সম্বন্ধে কিছু কথা পরে অবশ্যই বলতে হবে) বিবাহ তো সামান্য ঘটনা নয়! পার্টির মধ্যে বঙ্কিম মুখার্জি, সোমনাথ লাহিড়ীর মতো যাদের প্রতিভা, আবদুল মোমিনের মতো যারা দরদী মানুষ অথচ নিপুণ সংগঠক, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর মতো যাদের মনের জিজ্ঞাসা আর কর্মব্যাকুলতা, রেবতী বর্মনের মতো যারা মার্ক্‌স্‌বাদ বিস্তারে সমর্পিতপ্রাণ, ভবানী সেনের মতো তত্ত্ব ও কর্মে সমন্বয় সাধনে যারা ব্যাকুল, তাদের সঙ্গে এই সময় এবং কিছু পরে আমার যোগাযোগ— সর্বদা

যে ভালো লাগছে, সর্ববিষয়ে যে মতৈক্য ঘটেছে তা নয়, কিন্তু এদের নিয়েই যেন আমার সংসার, অদ্ভুত অথচ মোহনীয় এক পরিবারে যেন আমি 'দত্তক' হয়ে ঢুকেছি!

১৯৩৬ সালের কোনো একটা সময়ে মজার ঘটনা একটা ঘট্‌ল। বাংলা সরকারে উচ্চপদে তখন আসীন ছিলেন 'আই-সি-এস্' সাহেব, মাইকেল ক্যারিট। ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে এই ক্যারিট-পরিবারের সংযোগ ছিল; মাইকেলের ভাই গেব্রিয়েল (একবার এদেশে আসে) ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য, সবচেয়ে ছোট ভাই (নাম বোধ হয় ছিল 'জন্') অল্পবয়সে পার্টিতে ঢোকে, স্পেনের লড়াইয়ে স্বেচ্ছাসৈন্য হয়ে প্রাণ দেয়, অসাধারণ কবিপ্রতিভার পরিচয় বুঝি সে দিয়েছিল। যাই হোক্, মাইকেল গোপনে এখানে পার্টির সঙ্গে যোগ রাখত, কিন্তু 'আই-সি-এস' মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ইস্তফা দেওয়া পর্যন্ত ঘুণাক্ষরে কেউ জানত না। কোথা থেকে আমার খবর পেয়ে সে আমাকে এক সন্ধ্যায় তার ফ্ল্যাটে নিমন্ত্রণ করে এবং আমিও যথা সময়ে হাইকোর্ট থেকে তার ঘরে হাজির হই। পরস্পরকে আগে আমরা চিনতাম না—কিন্তু কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর উভয়েরই মনে হল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ দুজনেই করছি, খোলাখুলি আলাপ জম্‌ছে না। হঠাৎ তখন মাইকেল আমায় জিজ্ঞাসা করল তার চিঠি আমি কবে পেয়েছি এবং সেটা কি ডাকে আসে? যখন আমি বললাম যে চিঠিটা তার আপিসের চাপরাশীর হাতে এসেছিল, তখন সে লাফিয়ে উঠে বলল, 'যাক্, হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম'! তারপর জেঁকে বসে জানাল যে হোম ডিপার্টমেন্টের একটা কাগজ তার হাতে সেদিন এসেছিল যাতে লক্ষ্য করেছে রাজনৈতিক কারণে যাদের চিঠি ডাকঘরে খুলে পরীক্ষার হুকুম আছে তাদের তালিকায় আমার নাম—আর সেজন্যই তার সন্দেহ হচ্ছিল যে আমি ছদ্মবেশী কোনো সরকারী কর্মচারী কি না! আমি যে 'আমি' তা যখন প্রমাণই হয়ে গেল তখন আর তার মনের আর মুখের কোন সংকোচ রইল না—গল্প করল একবার তার এক বন্ধুর মারফৎ নিষিদ্ধ অনেক বই আনিয়ে দারুণ দুশ্চিন্তা হয়েছিল, কাষ্টম্‌স্-এর কবল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরও আবার ডাক পড়ায় দুরুদুরু বুকে ফিরে গিয়ে শুনল যে একটা টাকা অচল বলেই ডাকা হয়েছে, আর

তখন কর্‌করা একখানা রৌপ্যমুদ্রা বার করে দিয়ে তবে ধড়ে প্রাণ ফিরে পায়!

আতিশয্যের ভাষা ব্যবহার করতে কলম আটকাচ্ছে কিন্তু হয়তো বলা ভুল হবে না যে বেঁচে থাকার মেয়াদের মধ্যেই মানুষের মাঝে মাঝে পুনর্জন্ম ঘটে থাকে— শাস্ত্রীয় মতে উপনয়নের সময় দ্বিজত্ব বোধ মনে আসে নি, কিন্তু ১৯৩৬ সালে বিশ্ববিস্তৃত কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুত হয়ে এবং অনন্তপার কর্মযজ্ঞে আহূত হয়ে জীবনের এক অভিনব অধ্যায়ে যেন প্রবেশ ঘটল।

* * *

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৯৩৬) দর্শক হিসাবে যোগদানের সুযোগ পাওয়া গেল কারণ প্রায় একই সময়ে সেখানে নিখিলভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের পত্তন ঘটে। সজ্জাদ জহীর দেশে ফিরেই এব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিল। ইতিপূর্বে ইয়োরোপে সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহান্বিত ভারতীয়দের মধ্যে অনেক আলোচনা চলেছিল; ১৯৩৫ সালে রলাঁ এবং বারব্যুসের নেতৃত্বে প্যারিসে লেখক শিল্পীদের বিশ্ব সম্মেলন হয়, তাতে তখনই লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুলক্‌রাজ আনন্দ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। বহু বিতর্কের পর স্থিরীকৃত এক ইশতেহার-এর ভিত্তিতে লক্ষ্ণৌয়ে প্রগতি লেখক আন্দোলনের উদ্বোধনী অধিবেশন কংগ্রেস সপ্তাহে হওয়ায় বেশ সাড়া পড়ে। অংশ গ্রহণ যারা করেছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য সরোজিনী নাইডু, হিন্দী-উর্দু সাহিত্যের দিক্‌পাল প্রেমচন্দ্‌ আর একাধারে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতা এবং প্রখ্যাত উর্দুকবি মৌলানা হস্‌রত মোহানি। আমার সঙ্গে যাবার কথা ছিল পূর্বোল্লিখিত তেলুগু কবি ও নাট্যকার আব্‌বুরি রামকৃষ্ণ রাও-য়ের, কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত যেতে পারলেন না। ধরেই নিয়েছিলাম সুরেন গোস্বামী নিশ্চয়ই যাবেন, কিন্তু ঠিক মনে নেই কী অসুবিধা হাজির হল— হয়তো বা পয়সার অভাব, তখনকার দিনে আমাদের মতো মানুষের 'ভাঁড়ে ভবানী' প্রায় নিয়ত, আজ্‌কের সাংগঠনিক সহায়তা ছিল অভাবনীয়— তিনিও গেলেন না। সুরেন বাবুর লিখিত প্রবন্ধ সম্মেলনে পড়বার ভার আমার ওপর পড়েছিল— বেশ মনে আছে 'ধন্য ধন্য' রব উঠেছিল। সুরেনবাবুর সেই অমূল্য প্রবন্ধটি ১৯৩৯ সালে প্রগতি লেখক সংঘের ক্ষণস্থায়ী পত্রিকা "নিউ ইণ্ডিয়ান লিটরেচর"-এ প্রকাশ হয়েছিল। হয়তো

আমাদের বন্ধু চিন্মোহন সেহানবিশের মতো গবেষকের কল্যাণে তাকে উদ্ধার করা যাবে, আজকের নিম্নিখে বিচার এবং বিবেচনা সম্ভব হবে।

এটা যখন লিখছি তখন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো খবর এল (১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) যে সোভিয়েট কাজাকস্তানের রাজধানী আল্‌মা আটা-য় আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে সজ্জাদ জহীর-এর জীবনান্ত ঘটেছে। আমাদের কাছে সে ছিল 'বন্নে-ভাই'— তার অভাব কখনো তো মিটবে না, কিন্তু সারা সমাজও সহজে তাকে ভুলতে পারে না। সম্প্রতি কিছুকাল তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ কমে গিয়েছিল; প্রগতি লেখক আন্দোলন আজ নিষ্প্রভ বলে পোষাকী সভাসমিতিতে সাক্ষাতের সুযোগও হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবিকই বহুকাল আমরা ছিলাম সহোদরপ্রতিম সুহৃদ; অক্সফর্ড-বাসের সময় থেকেই আমাদের একান্ত সামীপ্য; কোনো একজনের নাম যদি করতে হয় তো সে-ই আমাকে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে টেনে মিশিয়ে দিতে পেরেছিল। এলাহাবাদে, লক্ষ্ণৌয়ে তাদের বাড়িতে থেকেছি; তার বাবা খ্যাতনামা (স্যর্) ওয়াজীর হাসান শয্যাশায়ী অবস্থাতেও ডেকে কথা বলেছেন; তার মা স্নেহভরে ছেলের বন্ধুকে বহু বিচিত্র সুখাদ্য খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছেন—মনে আছে তিনি স্বামী সম্বন্ধে 'সরকার' বাক্যটি ব্যবহার করেছিলেন আর জানিয়েছিলেন এক মজার খবর যে উত্তর প্রদেশের ভোজনবিলাসী অতিথিরা তাঁর টেবিলে প্রথমে এক প্রস্থ ইংরিজী খাবার খেয়ে তারপর 'মোগ্‌লাই' চর্ব্যচোষ্য নিয়ে পড়ে! বন্নে-র অন্যতম অগ্রজ 'মুন্নে'-কেও (ভালো নাম হুসায়ন জহীর) বন্ধু বলে জেনেছি; রাজনীতি ও বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই সে কীর্তিমান। তার ভাগিনেয়কে দেখেছি যখন সে স্কুলের পালা শেষ করছে; আজ সে হল দেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরূল হাসান। বন্নে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে বহু বার এসেছে; বেশ মনে আছে একবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সে আমাদের ছ'মাসের ছেলে লামাকে নিয়ে ছোড়াছুড়ি করল, মানিকবাবু কৌতুকভরে বললেন যে বন্নের রঙ ফরসা বলে বাচ্চাটা বুঝি তাকে পছন্দ করছে বেশি! অনেক ছিট্‌কে-পড়া ছবি মনে ভেসে উঠছে, কিন্তু থাক্। তবে বলতেই হয় যে একবার লণ্ডনে মে-দিবসের সভা সেরে তৎক্ষণাৎ সে গান লিখেছিল 'মজ্‌দুরোঁনে মুলকোঁ মুল্‌কোঁ, ঝণ্ডা লাল উঠায়া হ্যয়, জো ভুখা থা

জো নজা থা, আজ গুস্‌সা উস্‌কো আয়া হ্যয়, সারা সন্‌সার হমারা হ্যয়, সারা সন্‌সার হমারা হ্যয়'। বিদেশে বসে লেখা তার 'লণ্ডন কো এক রাত' উপন্যাসে সজ্জাদ তার সবচেয়ে প্রিয় চরিত্রকে আমার নাম দিয়েছিল জেনে বুঝেছিলাম যে বিলাতে পার্টিতে যোগ দিই নি বলে সে আমার সম্বন্ধে হাল ছাড়ে নি। বন্নে আজ নেই— জীবনে একটা বড়ো ছেদ পড়ল, নিজের সত্তার একাংশ যেন নিঃশেষ হল।

জহীরদের পরিবারের প্রতিপত্তি লক্ষ্ণৌয়ে কেমন ছিল তার পরিচয় অন্তত একটা এই যে 'ওয়াজির-মঞ্জিল' অবস্থিত ছিল 'ওয়াজির হাসান রোডে'! সেখানে, প্রগতি লেখক সংঘের ঘরোয়া আলোচনা হ'ত, মঞ্জিলে কদিন আমাদেরই 'নরক গুলজার'! উর্দু কবি মজাজ, আলিগড়ের সৌম্যদর্শন বিদ্বান আবদুল আলীম (পরে ভাইস্ চান্সলার), আমাদের পুরোনো 'অক্স্‌ফর্ড' বন্ধু মহমুদুজ্জাফর, এলাহাবাদের সাহিত্য অধ্যাপক প্রকাশচন্দ্র গুপ্তা, গল্পকার যশ্‌পাল, ফৈজ্ আহমদ্ ফৈজের মতো কবি কিম্বা একটু বয়োজ্যেষ্ঠ ফিরাক্ গোরখপুরী বা সুমিত্রানন্দন পন্ত এবং আরো অনেকে এসে আলাপ জমাতেন। সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের অসাধারণ স্বাভাবিক শক্তি দেখা গেল সদাচঞ্চল ও সাবলীল এক সুন্দরীর কর্মব্যস্ততায়— সে হল মহ্‌মুদের স্ত্রী, নাম রশীদা জহাঁ, চিকিৎসক অথচ গল্পকাররূপে তখনই স্বীকৃত, মার্ক্‌স্‌বাদে গভীর অনুরাগী। এই প্রাণোচ্ছলার কথা ভুলতে পারি না, ব্যবহারে এমনই তার সহজ স্বাচ্ছন্দ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিরল মাধুর্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে দুরারোগ্য ব্যাধি কোথা থেকে এসে তার দেহে ভর করল, মন ভেঙে দিল, হাসি কেড়ে নিল; যে স্বয়ং চিকিৎসক, তাকেই বহুবিধ চিকিৎসার শরণ নিয়ে ব্যর্থ হতে হল, অবশেষে সোভিয়েট দেশের এক হাসপাতালে প্রাণান্ত ঘটল। 'Death will come when it will come'— কিন্তু এই যে বিধান, এর ব্যাখ্যা নেই, পিছনে কোনো চৈতন্য নেই, যুক্তিগ্রাহ্যতা নেই, খামোকা শুধু মানুষ মাঝে এক বিধাতাকে খাড়া করে যা-হোক্-একটা মোকাবিলার ব্যর্থ চেষ্টা করে আসছে, অনেকে একটা সান্ত্বনাও হয়তো সংগ্রহ করছে।

কংগ্রেসে জওয়াহরলালের ইংরিজী এবং হিন্দী বক্তৃতা শুনলাম— বাস্তবিকই ১৯৩৬ সালের সেই ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। সমাজ-বাদের কথা স্পষ্ট করে তিনি বলেছিলেন, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্বর

ভূমিকার বিশ্লেষণ করলেন, বামপন্থা যেন নতুন আর উজ্জ্বল এক পথের সন্ধান পেল। সুভাষচন্দ্র বসু বিদেশ থেকে ফেরার মুখে তখন গ্রেফতার হয়েছিলেন— কংগ্রেসে তার তীব্র প্রতিবাদ উঠল। সভাপতি জওয়াহরলাল শ্রমিক-কৃষকদের সংস্থাকে আহ্বান জানালেন সংঘগতভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কথা ভাবতে ("collective affiliation")। মুস্‌লিম জনতার সঙ্গে সংযোগ বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যবস্থার প্রস্তাব করলেন, আর আচার্য কৃপলানি লানি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দফ্‌তরে কয়েকটি বিশেষ বিভাগ খুলে ভার দিলেন তরুণ বামপন্থীদের হাতে— কুন্‌ওয়ার মুহম্মদ আশ্‌রফ্‌ মুসলিম জনসংযোগের দায়িত্ব নিলেন, বৈদেশিক সম্পর্ক রইল রামমনোহর লোহিয়ার জিম্মায়, অর্থনীতি বিভাগ গেল জৈনুল আবেদিন আহ্‌মদ্‌-এর হাতে। আশ্‌রফ্‌-এর মতো ইতিহাসবিদ্‌ এবং কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে ব্যবধান লোপ করার মতো প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি একান্ত দুর্লভ। দেশের দুর্ভাগ্য যে অমন একজন মানুষ নানা দুর্বিপাকে দেশকে যা দেবার তা দিতে পারলেন না— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকে অধ্যাপনারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হল। লোহিয়াও ছিলেন বহুগুণান্বিত দেশভক্ত; মৌলিক এবং উদ্ভট উভয়বিধ চিন্তা ও কর্মে ব্যাপৃত থেকে বিতর্কিত জীবন তিনি যাপন করে গিয়েছেন, যার নিকট-পরিচয় উত্তরকালে লোকসভায় একত্র কাজ করার সময় পেয়েছি। আহ্‌মদ্‌ রয়েছেন আমাদের মধ্যে— কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে, রাজ্যসভায়, কিষান আন্দোলনের পরিচালনায়। মনে পড়ে গেল যে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের 'প্যাণ্ডালে' সারা ভারত কিষান সভার পত্তন হল— দেখলাম বিহারের শ্রুতকীর্তি স্বামী সহজানন্দ, আন্ধ্রপ্রদেশের এন.জি.রঙ্গা, গুজরাটের ইন্দুলাল যাজ্ঞিক এবং আমাদের সুপরিচিত বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় একত্র মিলে সংগঠন গড়ছেন। ১৯৩৫ সালে কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম অধিবেশনে কমরেড দিমিত্রভ্‌ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে 'যুক্তফ্রন্ট' বিষয়ে যে ঐতিহাসিক বক্তব্য উপস্থাপিত করেন, সাম্রাজ্যবাদের তোষণপুষ্ট ফ্যাশিজম্‌-এর জঘন্য নারকীয়তার বিপক্ষে জগদ্‌ব্যাপী যে আলোড়ন তার ফলে ঘটে, তারই প্রতিফলন দেখলাম ভারতবর্ষে, কংগ্রেস এবং সহযোগী বিবিধ সংস্থার জমকালো জমায়েতে।

১৯৩৬ সালের অক্টোবরে আগ্রা, জয়পুর, আজমীর, আবুপাহাড় ইত্যাদি ঘুরে, ভারতবর্ষের বর্ণাঢ্য সত্তার কথঞ্চিৎ আস্বাদ নিয়ে ফেরার পথে এলাহাবাদে জহীরদের বাড়ি কদিন যখন ছিলাম তখন স্থানীয় সমাজবাদীদের সঙ্গে আলাপ হল, একদিন সবাই মিলে গেলাম আনন্দভবনে, জওয়াহরলালের সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন একটি কথা যা ভুলতে পারি নি, চমৎকার লেগেছিল— যদিও আমাদের কম্যুনিস্ট বিচারে জওয়াহরলালের চিন্তায় অনেক ঘাট্‌তি আর গোঁজামিল দেখতাম। স্বাধীনতা আর সমাজবাদের লড়াই প্রসঙ্গে বললেন যে স্বরাজ আর সোশালিজম্ এমন বস্তু নয় যে দুটো হল আলাদা 'লাড্ডু', আগে একটা গ্রাস করে তবেই পরে দ্বিতীয়টি গলাধঃকরণ সম্ভব, একই সঙ্গে উভয় বস্তুকে আয়ত্ত করার চেষ্টায় নামা হল দরকার। এমন সহজ আর সরস করে গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারা কম কথা নয়। আর তখন কংগ্রেসের সাবেকী নেতাদের ক্ষোভ সত্ত্বেও কম্যুনিজম্-সোশালিজম্ সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না, রাজনৈতিক শৃংখলমোচনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিধ শোষণ থেকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিও যে একান্ত কাম্য তা সকলের সমক্ষে প্রচারে কংগ্রেস মহল থেকে তখন বাধা আসত না— সরকারী নিগ্রহের সম্ভাবনা সর্বদা থাকলেও 'জাতীয়' আন্দোলনের ব্যাপক অংশের সমর্থন আমরা পেয়েছিলাম। আজকের পাঠক চম্‌কে উঠবেন জেনে যে আনন্দম বাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের মতো পত্রিকায় মার্কামারা কম্যুনিস্ট হয়েও লেখার আহ্বান বহুবার পেয়েছি। অবশ্য সেদিনের ছবিটাই ছিল আলাদা— বর্মন স্ট্রীটে আনন্দবাজারের দফ্‌তরে যে সুরেন গোস্বামী এবং আমি প্রায় যেন নিজস্ব এক ডেরা বাঁধতে পেরেছিলাম তার মূল কারণ অবশ্য ছিলেন সাংবাদিক এবং মানুষ হিসাবে অবিস্মরণীয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন গৌরবের কৃতিত্ব ছিল যাঁর সবচেয়ে বেশি প্রাপ্য। বর্মণস্ট্রীটে আমরা কাছে থেকে জেনেছিলাম হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদক, আমার পিতৃবন্ধু হেমচন্দ্র নাগকে, এবং তাঁর তৎকালীন সহযোগী ডক্টর ধীরেন সেন, ডক্টর খগেন সেন, আর কিছু পরে সর্বজনপ্রিয় গোপাল হালদার আর স্বল্পভাষী, চিন্তাশীল সরোজ আচার্যের মতো ব্যক্তিকে। কর্তৃপক্ষীয়দের মধ্যে পরিচিত হয়েছিলাম সুরেশচন্দ্র মজুমদার, প্রফুল্লকুমার সরকার

এবং মাখনলাল সেনের মতো বিচিত্র অথচ গভীর চরিত্রের মানুষের সঙ্গে। তা ছাড়া তখনকার আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রের ভারপ্রাপ্ত, অজাতশত্রু সাহিত্যিক মন্মথনাথ সান্যালের মধ্যস্থতায় জেনেছিলাম সেদিনের প্রায় সব কীর্তিমান এবং প্রতিশ্রুতিবান্ লেখককে। বর্মণ স্ট্রীটের নড়বড়ে আপিস থেকে বিরাট দুটো কাগজ রোজ যে কেমন করে নিয়মিত প্রকাশ হত, তা ছিল যেন একটা বিস্ময়— ছোট্ট একটা ভাঙা মেজে-ওয়ালা ঘরে কয়েকজন ডাকসাইটে সাংবাদিককে একত্র বসে কাজ করতে দেখেছি, অসম্ভব এক লম্বা টালি-ঢাকা ঘরে (যার নীচে মুদ্রাযন্ত্র গর্জন করছে, কম্পন জাগাচ্ছে) ঢালাই টেবিলের দু'ধারে বসে কাজ করতেন বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক যাঁদের মধ্যে ছিলেন আমাদের বন্ধু ও পার্টি-সাথী (কবি) অরুণ মিত্র আর (অভয় আশ্রম-ফেরত, খাঁটি সদাচারী, খাদি পরিহিত কম্যুনিস্ট) নৃপেন চক্রবর্তীর মতো ব্যক্তি। বেশ মনে আছে, যখন কয়েক বছর বাদেও এঁরা আনন্দবাজারে কাজ করছেন, অথচ রাজনীতির মোড় বেঁকেছে, কম্যুনিস্টদের 'একঘরে' করা হচ্ছে, খেদানো হচ্ছে, তখন তদানীন্তন কম্যুনিস্ট পার্টিপ্রধান পূরণচন্দ্র জোশী আমায় বলেন— তোমাদের 'সোনার বাংলা' একটা ব্যাপার বটে, নইলে সুরেশ মজুমদার আর মাখন সেন আমাদের লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছেন কেমন করে? এ-অবস্থা অবশ্য সর্বদা চলে নি, গণ্ডগোল ঘটেছিল, নানা চেহারায় দেখা দিয়েছিল, কিন্তু যা লিখেছি তাও হল সত্য ঘটনা।

প্রগতি লেখক সংঘের বিপক্ষে কলকাতায় 'স্টেট্স্ম্যান' কাগজ দারুণ চিৎকার শুরু করেছিল; ম্যাক্সিম গর্কির মৃত্যুর পর দেশ জুড়ে 'গর্কি দিবস' অনুষ্ঠানের যে আহ্বান সংঘ দেয় তাকে কম্যুনিস্ট দৌরাত্ম্যের এক নিদর্শন বলে প্রচার চালানো হয়। তা সত্ত্বেও দেশের মেজাজ ছিল আমাদের অনুকূল; প্রগতি আন্দোলন রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিল। পরিচয় পত্রিকা তখন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিভাদীপ্ত পরিচালনায় সুবিখ্যাত; বাংলার বিদগ্ধ সমাজে তার প্রচার ও প্রশস্তি; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'পরিচয়' পত্রিকায় রচনার বিষয় ও প্রকরণ নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে শুধু যে আগ্রহ রাখতেন তা নয়, কিছু পরিমাণে তাতে অংশগ্রহণেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। মনে আছে সুধীন্দ্রনাথ আমাকে নিয়ে গেলেন একবার কবির কাছে, সঙ্গে সম্ভবত ছিল

মহম্মুদ্জাফর এবং তার স্ত্রী— পরে আরো নিয়ে গেছেন। বিশেষত একবার আমাদের বন্ধু, প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল সাহিত্যের অধ্যাপক হাম্‌ফ্রি হাউসকে নিয়ে। সুরেন গোস্বামী মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে কিছু সময় কাটিয়ে আসতেন, কবির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। 'পরিচয়' নিয়ে বহু কথা পরে না বললে চলবে না, তবে ১৯৩৫-৩৬ সালের একটা ঘটনা উল্লেখ করা হয়তো ভালো। তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে সিডনী ও বীট্রিস ওয়েব -লিখিত দুখণ্ডে 'সোভিয়েট কম্যুনিজম্— নতুন সভ্যতা ?'—মহাগ্রন্থ ; দ্বিতীয় সংস্করণে প্রশ্নচিহ্নটি দুই গ্রন্থকার সরিয়ে দিলেন, ঘোষণা করলেন ধীরপন্থী বিপ্লব-বিরোধী 'ফেবিয়ন' সোশালিজমের দুই শ্রেষ্ঠ প্রবক্তার শেষ জীবনে সোভিয়েট কম্যুনিজমে পরিপূর্ণ আস্থা। বিপুল আলোড়ন ঘটে এই মহাগ্রন্থের প্রকাশে ; আমরা কেউ কেউ অতি কষ্টে সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু শীঘ্রই সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি হয় ; বইয়ের প্রচার বন্ধের হুকুম বার হল। এর বিরুদ্ধে এবং অনুরূপ প্রগতি বিরোধী সরকারী দুর্মতির নিন্দা করে এক বিবৃতি রচনার ভার আমি পেলাম— লেখা হল, বন্ধুবান্ধবদের মঞ্জুরী মিলল, শুধু পরিচয় গোষ্ঠীর শুক্রবাসরীয় সান্ধ্যসভায় বুদ্ধিবৃত্তির ঔজ্জ্বল্যে ও সরস আলাপচারিতায় অদ্বিতীয়, আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটু আপত্তি জানালেন, তাঁর অভিমত অপর বহুজনকেও স্বভাবত প্রভাবিত করল। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর পেতে হলে বিবৃতির সুরকে নাকি কিছুটা নামিয়ে আনা দরকার। সমাজবাদ বিষয়ে পক্ষপাতকে একটু কম স্পষ্ট করা বুঝি প্রয়োজন, শাণিত ভাষা ও ভঙ্গিকেও প্রশমিত করা উচিত। অল্প বিতর্কের পর জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকের কথা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানতে হল, বিবৃতিকে একটু বদলানো হল। এত কথা বলছি এজন্য যে আসলে যখন সুধীন্দ্রনাথ সমভিব্যাহারে গেলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে, তখন কবির কথা থেকে পরিষ্কার বুঝলাম যে তিনি স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে আমার পূর্বলিখিত প্রখরতর বিবৃতিতে স্বাক্ষর নিশ্চয়ই দিতেন। একাধিকবারের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, রবীন্দ্রনাথের পার্ষদ বলে খ্যাত যাঁরা, তাঁরা অনেক সময় কবিকে ঠিক বুঝতেন না— হয়তো ভজনা বন্দনা করতেন কিন্তু তাঁর বিশ্ববিস্তারী মানসিক ঔদার্য্যের অনুধাবনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক থাকতেন। ধূর্জটিবাবুর কাছে আমার অনেক ঋণ, কিন্তু কিছুতেই এই ঘটনাকে তুচ্ছ বলে

মন থেকে সরিয়ে রাখতে পারি না। ১৯৪১ সালে আবার কবির তিরোধানের অল্পকাল পূর্বে নতুন করে জানার সুযোগ এসেছিল যে রবীন্দ্রনাথের অনন্তপার মাহাত্ম্য তাঁর পার্শ্বচরদের কাছে বোধ করি অপরিজ্ঞাতই ছিল।

* * *

১৯৩৮ সালে কবি মোহিতলাল মজুমদার "বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক" প্রবন্ধে নতুন চিন্তাকে নাকচ করার জন্য অস্ত্রধারণ করে লিখলেন: "সকলকে বাতিল করিয়া দিয়া 'প্রগতি' নামক একটি অনার্য শব্দকে বিশাল বংশদণ্ডে বাঁধিয়া ভদ্রবেশী বর্বরগণের অগ্রণী হইয়া, আধুনিক নগর-চত্বরের পণ্যবীথি প্রকম্পিত করিতে হইবে।...আজ যুগধর্মের সুযোগে, মানবসভ্যতার এই অতিশয় সংকটময় দুর্দিনে—ইহারা, এই রস-অধিকার-বঞ্চিত হরিজনেরা জাতে উঠিবার জন্য বিষম কোলাহল করিতেছে।" মোহিতলাল তখন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে—সম্ভবত ১৯৩৬-৩৭ সালে রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ তৎকালীন তরুণ লেখককে নিয়ে ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের পত্তনে তিনি রুষ্ট হয়েছিলেন। বেশ মনে আছে সুরেন গোস্বামী এবং সজ্জাদ জহীরকে নিয়ে ঢাকা গিয়েছিলাম সংঘ স্থাপন ব্যাপারে— হয়তো তখন প্রথম দেখি কিশোর সোমেন চন্দ-কে, কিন্তু তার অবিস্মরণীয় প্রতিভা প্রকটিত হয়েছিল কিছু পরে, "ইঁদুর" "বনস্পতি" প্রভৃতি বিস্ময়কর গল্পরচনায়, ৪২ সালের মার্চ মাসে ফ্যাশিস্ট গুণ্ডাদের অস্ত্রাঘাতে তার মৃত্যু হল দেশের এক অপরিপূরণীয় ক্ষতি, যার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় যক্ষ্মার আক্রমণে সুকান্ত ভট্টাচার্যের উদ্দীপ্ত কবি-জীবনের অকাল অবসান। যাই হোক্, গর্কি-কে নিয়েই এদেশে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অভ্যুত্থান, দেশ জুড়ে গর্কির মৃত্যুতে শোকসভা হয়েছিল, কলকাতায় ১৯৩৬-এর প্রধান সভায় সভাপতি ছিলেন খ্যাতনামা লেখক ও আইনবিদ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং প্রধান বক্তা হলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় যিনি কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়ন এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলনে নিয়ত ব্যাপৃত থেকেও ছিলেন সাহিত্যে একান্ত অনুরক্ত, আলোচনায় কথা যাঁর ফুরোত না, মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর লাগলেও যাঁর আগ্রহকে শ্রদ্ধা না করা সম্ভব ছিল না। রাধারমণ মিত্রের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেসে বলতেন যে পেটের গণ্ডগোলের ফলে বঙ্কিমকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট একটি ঘরে বহুক্ষণ কাটাতে হত, কিন্তু তখন হাতে থাকত একখণ্ড 'ভারতবর্ষ'! নরেশচন্দ্র ছিলেন বাংলায়

প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি; তাঁর কাছে আমরা বহু আনুকূল্য পেয়েছি। তাঁর গৃহে বহুবার যাতায়াত করেছি তাঁর স্বকীয় স্বতন্ত্র সাহসী ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনুভব করেছি। কোথায় যেন দেখলাম তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের অনুরোধে তিনি প্রগতিলেখক সংঘের সভাপতি হন— কথাটা ভুল নয় কারণ দত্তমজুমদার এবং তার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে তখন আমাদের সামীপ্য এবং 'নামজাদা' ব্যক্তি হিসাবে নীহারেন্দুর নামটাই তাঁর সবচেয়ে বেশি মনে থাকা আশ্চর্য নয়। ১৯৩৭ সালের আশ্বিন মাস নাগাদ সুরেন গোস্বামী এবং আমি 'প্রগতি' নামে যে সংকলন সম্পাদনা করি তাতে মুখবন্ধ লেখেন নরেশবাবু, আর কারো মনে নানা সংশয় এবং হয়তো বা কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা থাকলেও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল মহারথীকেই আমরা টানতে পেরেছিলাম! স্মরণ করতে হবে যে ফ্যাশিজম্-এর দুর্বৃত্তির বিরুদ্ধে শুধু সমাজবাদ নয়, সর্ববিধ সৎ চেতনাই তখন জাগরূক হচ্ছিল— ভারতবাসীর কানে বেশ লাগছিল তখনকার এক বিদেশী ছড়া: 'De Valera with his green shirts / His back to the wall / Hitler with his brown shirts / Riding for a fall / Mussolini with his black shirts / Lording it all / Three cheers for Mahatma Gandhi / With no shirt at all!'

স্বাভাবিক দেশজ কারণে ইতিমধ্যে বাংলাসাহিত্যের মোড় কতকটা ঘুরেছিল। ১৯৩৩ সালে গর্কির 'মা' বাংলা তরজমায় গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়; আগেই বুঝি 'লাঙল' ও 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তা বেরিয়েছিল। বাংলার ঘরে ঘরে ১৯২৮ সাল থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের ফুলকি-ভরা নজরুল-কবিতার 'সঞ্চিতা', যার প্রথম সংস্করণ বার করেন ব্রজবিহারী বর্মণ, 'বর্মণ পাবলিশিং হাউস'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ রূপে যিনি আমৃত্যু আমাদের শুভার্থী বন্ধু ও সহায়ক ছিলেন। নজরুল-রচনা পুলিশের হাতে বাজেয়াপ্ত হওয়ার রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু ত্রিশের দশক জুড়ে নজরুলের গানের জোয়ার বাংলাকে মাতিয়ে রাখল— একদা কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সুহৃৎ এই মহাভাগ অজস্র গান ছাড়াও লিখলেন উপন্যাস আর নাটক, যার মূল সুর বাজল অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষিত অথচ অস্পষ্ট ধূমায়িত এক বিপ্লবের নকীবের বাঁশিতে। ত্রিশের দশকে রাঢ় ভূমির

লাল মাটি আর ব্রাত্য মানুষের কাহিনী নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের হাতে 'কল্লোল' যুগকে পরিণতি না হোক সচেতন জঙ্গমতায় উপনায়ন, প্রতিভার সঙ্গে মননের মিশ্রণে আসক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কঠিন প্রয়াস হামসুন এবং গর্কিকে একসূত্রে বাঁধার জন্য। আর সাহিত্যের সোনার খনির গভীরে নামার বক্ষভেদী বাপ্তায় জর্জর হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের রূপ অন্বেষণ শুরু করলেন, "ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য" তাঁকে ভাবিয়ে তুলল, অশান্ত এই মানুষটি এগিয়ে চলতে চাইলেন এবং পরে গাল কুড়োলেন মোহিতলাল মজুমদারের কাছে: "চিন্ময় বাস্তবের পরিবর্তে জড়-বাস্তবের উপাসনা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে···রূপকার কবির আসন হইতে রূপ-বিদ্রোহী কর্মকারের পদবীতে নামিয়াছেন"। প্রতিভাধর লেখকদের মনে তখন প্রশ্নের অবধি ছিল না। সর্ববিধ রসাস্বাদে সহজে পুলকিত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মেটারলিঙ্ক-এর "নীলপাখী" অনুবাদের কৃতিত্বকে বিপন্ন করে যখন সানন্দে গর্কি-তরজমায় নামলেন তখন তাকে কোনো তাৎপর্য না দিয়েও হয়তো চলে গেল; ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে মনোরঞ্জন হাজরার "নোঙরহীন নৌকা" কিম্বা বিশ্ব বিশ্বাস-এর "মজদূর" সম্ভবত কিছুজনের কিঞ্চিৎ নাসিকাকুঞ্চনের কারণ ঘটাল। কিন্তু স্বয়ং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৫ সালে লিখলেন 'অন্তঃশীলা', যার নায়ক সমাজবাদের প্রতিপক্ষরূপে চিহ্নিত হলেন, কিন্তু দ্বিতীয় পর্ব 'আবর্ত'-এ দেখা গেল দ্বিধাদ্বন্দ্ব, এবং অবশেষে 'মোহানা'-য় সেই নায়ক কানপুরের গরিব শ্রমজীবীর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লেন, "কাছে থেকে দূরে যারা" "মূক যারা দুঃখশোকে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে" বলে রবীন্দ্রনাথ যাদের হৃৎস্পন্দন শোনার আকূতি প্রকাশ করেছিলেন, তাদেরই আত্মীয় হবার জন্য দেখা গেল ধূর্জটিপ্রসাদসৃষ্ট নায়কের ব্যাকুলতা। ধূর্জটিপ্রসাদ এই সময় কিছুকাল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে উত্তর প্রদেশের তৎকালীন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার (১৯৩৭-৩৯) সহায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। হয়তো বহু অজ্ঞাতপূর্ব ব্যাপারের সন্ধান তখন পেয়েছিলেন; পরিচয়-এর আড্ডাতে সবাই তাঁর গল্প তখন শুনতাম 'রফি সাহেব'-এর (রফি আহমদ কিদওয়াই, পরে তাকে ভালো-ভাবে জেনেছি) কাজের ধরন, মজলিসী ঢঙ সাঙ্গোপাঙ্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে।

সাহিত্য আর জীবনের মধ্যে যে প্রাচীর কেউ কেউ খাড়া করে রেখেছিলেন, সেটা তখন নড়বড়ে, বহুলাংশে ভগ্ন।

তাই এ কথা ভাবলে ভুল হবে, অন্যায় হবে, যদি কেউ বলেন যে বিদেশে 'New writing' 'Left Review' জাতীয় জিনিসের মোহে পড়ে, Edmund Wilson-এর *Axel's Castle* ধরনের বইয়ের দোহাই দিয়ে। রলাঁ-বারব্যুস্-জিদ্ থেকে আরাগঁ, এলুয়ার, লিজঁা, ভেঙ্গ্যঁ-কুতুরিয়ে ইত্যাদি ফরাসী নাম, হাইন্‌রিখ্ মান্-লুড্‌ভিগ রেন্-টলার প্রমুখ জার্মান নাম, বেবেল্-পাস্তেরনাক-আলেক্সি টলস্টয় থেকে অস্ত্রভ্‌স্কি-শোলোখভ -ধরনের রুশ নাম উল্লেখ করে, আর ইংলণ্ডে সাময়িক চমক-জাগানো অডেন-স্পেণ্ডর-ডেল্যুইস্-ম্যাকনীস্ প্রভৃতি কবির রক্তপতাকাবিলাসে উল্লসিত হয়ে কিছু ব্যক্তি এদেশে একটা বিজাতীয় ধারা প্রবর্তনের ব্যর্থ চেষ্টায় নেমেছিল। হিমালয়ের উচ্চতাও যখন যুগের হাওয়াকে বাধা দিতে পারে না, তখন এদেশেও যে সমসাময়িক জীবনসমস্যার স্পর্শ লাগবে তা তো স্বাভাবিক। মনে আছে আমাদের তৎকালীন বন্ধু (যদিও সর্বদা একটু দূরাবস্থিত) বুদ্ধদেব বসু একবার লেখেন যে সাহিত্য শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা ইউরোপেরই একাংশ বলা চলে। কথাটা বাহুল্যদুষ্ট, কিন্তু যে 'পরিচয়' পত্রিকার এক মুখ্য আকর্ষণ ছিল "পুস্তকপরিচয়", যেখানে বিদেশী (এবং প্রায়শ দুষ্প্রাপ্য) গ্রন্থের আলোচনা নিয়মিত ভাবে এবং স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হত, তা শুধু 'অভিজাত' পাঠকের কাছে নয়, সম্ভবত আরো আদরণীয় ছিল আন্দামানে এবং অন্যত্র রাজবন্দীশালায়— দেশের দুর্গতি দূর করার জন্য কৃতসংকল্প মুক্তি-সংগ্রামীরা যেখানে 'পরিচয়' পাবার জন্য উন্মুখ থাকতেন। কী হেতু ছিল 'পরিচয়' পত্রিকার আত্মবিবরণে 'অভিজাত' শব্দ ব্যবহারের, তা জানি না; পরবর্তী যুগে আমারই নিকট সহকর্মীরা যখন পত্রিকার ভার নিয়ে বিশেষণটি বদ্‌লে লেখেন 'অভিনব', তখনো আমি বিব্রত বোধ করতে বাধ্য হয়েছি— কিন্তু সে কথা যাক্, 'পরিচয়' সম্বন্ধে বলা যায় যে 'বঙ্গদর্শন' যে পরম্পরায় সৃষ্টি করে তাকেই অধুনাতনকালে 'পরিচয়' পুষ্ট করতে চেয়েছে, কথঞ্চিৎ সাফল্য তো অবশ্যই তার প্রাপ্য। বিলাতবাসের সময় টি.এস. এলিয়টের *Criterion* দুর্বোধ্য মনে হত; শুনেছিলাম— বুঝি লণ্ডনের *Times Literary Supplement* লিখেও ছিল— যে 'পরিচয়' হ'ল বাংলা

'ক্রাইটিরিয়ন্'। থাক্ সে কথা— ইতরজনের সান্নিধ্যদুষ্ট কিঞ্চিৎ খ্যাতি সত্ত্বেও আমি 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর সাদর সৌজন্য ও সহায়তা পেয়েছি। সুরেন গোস্বামীর সঙ্গে তখনকার প্রতাপশালী সাহিত্য-নায়ক সজনীকান্ত দাস এবং তাঁর 'শনিবারের চিঠি'-র যোগাযোগ মন্দ ছিল না, কিন্তু আমি কখনো সেই ঘাটের জল স্পর্শ করতে পারি নি। ছাত্রাবস্থা থেকেই, হয়তো ঝাপ্সা-ভাবে রবীন্দ্রভক্ত বলে, 'শনিবারের চিঠি' বিস্বাদ লাগত— যদিও অবশ্য বিভিন্ন সমসাময়িক 'তারুণ্য'-চিহ্নিত রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে শ্লেষ ও ব্যাজবাক্য বহুল যে ক্ষিপ্র সমালোচনা তাতে প্রকাশিত হত তা নিঃসন্দেহে ছিল রসালো ও উপভোগ্য। মনে আছে একবার রুশ ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ন সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহাতিশয্য সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি' মন্তব্য করে যে বাংলা এবং ইংরিজী দুটো ভাষা শিখতে হিমসিম হয়ে কোনো ভাষাটাই আয়ত্ত যখন করতে পারি না তখন আশ্চর্য কী যে রুশ, সুইডীশ, নরউঈজিয়ন ইত্যাদি ঘেঁটে সব কিছু গুলিয়ে গেছে, কাণ্ডজ্ঞানও আর নেই! মনে পড়ছে যে সজনীকান্ত দাসের সহযোগী সম্পাদক ছিলেন বর্তমানে ইঙ্গ-ভারতীয় লেখককুলতিলক শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী— বাংলা লেখা তিনি কার্যত ছেড়েছেন কিন্তু প্রকৃতই বাংলায় তিনি সুলেখক, পরে বোধহয় 'সমসাময়িক' পত্রিকাতেও তার পরিচয় ছিল। তবে যে-পরিমাণ পাশ্চাত্ত্যানুরক্তি ও স্বদেশধিক্কার তাঁকে একক, উদগ্র, বিকারগ্রস্ত, ছিন্নমূল করছে তাতে দুঃখ হয় তর্কাতীত প্রতিভার খণ্ডিত প্রকাশ দেখে; কোনো সালিত্যকারই স্বভূমিতে অমন নিঃসম্বল হয়ে সার্থকতার সন্ধান পেতে পাবেন না। শানিত চেতনা নিযে তিনি নিয়তই এদেশের মানুষকে পূর্ণ তাচ্ছিল্য করছেন— সেজন্য খেদ নেই কিন্তু সম্ভবত ভারতঘৃণা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করলে তাঁরই মঙ্গল হত। সজনীকান্তের চিন্তাধারা, কর্মকাণ্ড ও মতামত যাই হোক-না কেন, নিজের দেশের মানুষকে কোল দেবার জন্য আগ্রহ তাঁর কখনো নষ্ট হয় নি। গোপাল হালদারের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ছিল! সুরেন গোস্বামীর কদর তিনি করতেন; 'প্রগতি' সংকলনে (১৯৩৭) লেখা দিতে তাঁর বাধে নি— যেমন বাধে নি ১৯৪৬-৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি নিয়ে লেখকদের সংগঠিত প্রয়াসে যোগ দিতে। একটু অবাক লাগে, কিন্তু সেতুবন্ধনের চেষ্টা বিনাই সেদিনের প্রগতি সাহিত্য-বিষয়ক কার্যক্রমে একদিকে 'পরিচয়' অন্য দিকে (যদিও অল্প

পরিমাণে) সজনীকান্ত দাসকেও অন্তত কিছুকাল টেনে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

'প্রগতি' সংকলন গ্রন্থটিতে ধূর্জটিবাবুর লেখা ছিল—না থাকলে অঙ্গহানি ঘটে যেত। সাহিত্যচিন্তায় বুদ্ধিবৃত্তির ঔজ্জ্বল্যে তিনি তখন প্রায় অদ্বিতীয়। মজলিসী মানুষ অথচ কোথায় যেন নিয়ত লড়ছিলেন নিজের একাকিত্বের সঙ্গে। প্রমথ চৌধুরী ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের পরিমণ্ডল তখন তিনি অতিক্রম করেছেন অথচ বহন করে চলেছেন বোঝা; ইতরজন সম্পর্কে মমতা সম্ভব ছিল না অথচ কিঞ্চিৎ মায়া রচনা না করে পারছিলেন না; যুগসন্ধির চাপে মনীষা যেন তার ক্ষেত্র থেকে ঈষৎ বঞ্চিত, ব্যক্তিত্ব বন্ধুপরিবেশে সমুৎফুল্ল অথচ অনধিকারীদের উপস্থিতিতে কেমন যেন শুষ্ক ও কৃত্রিমতাদুষ্ট। অপর দিকে লেখেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যাঁকে প্রাতঃস্মরণীয় বললে অত্যুক্তি ঘটে না; সহজ সরল সাধারণ মানুষ, বিপুল বিবিধ বিদ্যার অধিকারী অথচ নিরভিমান আত্মচিন্তারহিত, একান্ত স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহে যিনি জনসেবক—স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ বলে বহুজনপরিজ্ঞাত এই মানুষটির বিচিত্র জীবনকথা সুপরিচিত। ১৯৪১ সালে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির প্রথম সভাপতি তাঁকে আমরা করেছিলাম কিন্তু মনে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে একত্র জামশেদপুরের মতো জায়গায় সভা করা, রাত জেগে তৃতীয় শ্রেণীতে রেলভ্রমণ, বয়োবৃদ্ধ হয়েও অমন এক মানীগুণী ব্যক্তির স্বচ্ছন্দে একা হাওড়া স্টেশনে 'বাস্‌' ধরে বাড়ি যাওয়া, দেশের গোটা 'স্বদেশী' আন্দোলন যেন তাঁর আচারে, ব্যবহারে, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্মব্যস্ততায় এবং চারিত্র্যে অবয়ব পরিগ্রহ করেছিল। 'প্রগতি'-তে লেখা ছিল বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের; কবিতা দেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অরুণ মিত্র -প্রমুখ অনেকে; গ্রন্থাবরণ ছিল মৌলিক এক ব্যঙ্গচিত্র। কাগজের বিজ্ঞাপন কেটে প্রগতি বিরোধের এক মূর্তি নির্মাণ করেন নরেশচন্দ্রের পুত্রবধূ স্টেলা ব্রাউন (সেনগুপ্ত)। ১৩৩৭ সালেও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা কিরূপ ছিল তার প্রমাণ "ভারতে ইংরেজ শাসন" শীর্ষক কার্ল মার্ক্‌স্‌-রচনা অনুবাদে রবার্ট ক্লাইভ্‌ সম্বন্ধে ব্যবহৃত 'তস্কর চূড়ামণি' ('Prince of robbers') শব্দটি ছাপাখানায় নির্বন্ধাতিশয্যে এবং গ্রেফ্‌তারীর আশঙ্কায় আমাকে বদলাতে হয়েছিল অধোবদনে ও অপ্রতিভ হয়ে মাত্র 'ফন্দিবাজ' কথাটি লাগিয়ে! 'প্রগতি'-কে

রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন, শান্তিনিকেতন থেকে সুরেন গোস্বামী তা বহন করে আনেন। দেশ আর বিদেশে তখন যে নতুন হাওয়া, তার পরিচয় কিছুটা দেশকে 'প্রগতি' দিয়েছিল। মনে রাখতে হবে ফ্যাশিস্টবিরোধী শিবিরে তখন আঁদ্রে জিদ্ এবং ই. এম. ফর্স্টার শীর্ষস্থান নিয়েছিলেন। উভয়ের রচনা 'প্রগতি'-তে ছিল ; ফর্স্টার-এর অপরূপ এক প্রবন্ধের অনুবাদ করেন আমার বহুদিনের বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুব।

আইয়ুবের কথা বলতে গিয়ে একটু না থেমে পারছি না। আগেই তার উল্লেখ করেছি। আর বিদেশ প্রত্যাবর্তনের পর যোগাযোগ ঘটল আরো ঘনভাবে— সুরেন গোস্বামীর মতো মার্ক্‌স্‌বাদে দীক্ষা নিয়ে আমার সহধর্মী না হলেও আইয়ুবের সমৃদ্ধ মনের জিজ্ঞাসা এবং ব্যক্তিত্বের আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সুধীনবাবুর 'পরিচয়' পরিবেশে যে দুজন আমার প্রবেশ সব চেয়ে সুগম করে তারা হল পুরোনো বন্ধু আইয়ুব এবং তখন সদ্য-আহৃত সুহৃৎ, আজকের কবিকুলপতি বিষ্ণু দে। আইয়ুব তখন থাকত আমাদের বাড়ির কাছে। মাদ্রাসার দিঘীর পুবদিকে ওয়ালিউল্লাহ্ লেনে— সেখানে একটু দূর থেকে, সমীহ সহকারে দেখতে পেতাম তার দাদা ডক্টর গনিকে (যিনি পরে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আমার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করেছিলেন), আলোচনা হত হাজার জিনিস নিয়ে যা তখন আমাদের ভাবাত, মার্ক্‌সীয় দর্শনে অজ্ঞ হয়েও পাল্লা দেবার বৃথা চেষ্টা করতাম, সে মানত না, তবে গভীরভাবে মনন আর নিদিধ্যাসনের চেষ্টা করত মার্ক্‌স্‌বাদ নিয়ে— তারই ঘরে একদিন দেখলাম বাক্‌পটু বিদ্বান্ অধুনা রম্য রচনায় সিদ্ধহস্ত, সৈয়দ মুজ্‌তবা আলীর মতো গুণীকে, বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য বস্তুতে ভরা অথচ সতত সরস আলাপ শুনলাম, অল্প হলেও পরিচয় পেলাম এক বচন-নৈপুণ্যের যা কেমন যেন চিন্তাবিবর্জিত এবং আপাতগভীর বাগাতিশয্যে অধিকাংশস্থলেই অস্বস্তিকর। পরে নানা কারণে আইয়ুবের সঙ্গে আমার মতানৈক্য কঠোর হয়ে দাঁড়িয়েছে ; পরস্পর সাক্ষাৎও বহুকাল অত্যন্ত বিরল ; কিন্তু বেশ মনে আছে একবার সে আমার সঙ্গে যোগাযোগে সংকোচ বোধের কথা জানাতে আমি বলি— এবং সে সানন্দে সায় দেয়— যে রাজনীতিতে আছি বটে কিন্তু আমাদের পরস্পরবন্ধুতা অটুটই থাকবে, কখনো একটা যেন সন্ধিচুক্তি ('alliance') হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

কিছুটা এলোমেলোভাবে লিখছি তাই এতক্ষণ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষয়ে মাত্র প্রাসঙ্গিক উল্লেখই করতে পেয়েছি। 'পরিচয়'-এর প্রাণপুরুষ এবং শুক্রবাসরীয় মজলিশের মধ্যমণি এই মনস্বীকে প্রথম দেখি ১৯৩৪-৩৫-এ; হাতীবাগান বাজারের সামনে পিতৃগৃহে তিনি থাকতেন, নিজস্ব প্রশস্ত বৈঠকখানাটি আরামকেদারায় সাজানো, মেজে কার্পেটে মোড়া, সারা দেওয়াল জুড়ে থরে থরে বিভিন্ন ভাষার বই; হয়তো বিষ্ণু দে-সমভিব্যাহারে হঠাৎ দুপুরে হাজির হয়ে দেখি ঈষৎ শয়ান অবস্থায় বই পড়ছেন, স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন, কখনো বুঝতে দিলেন না যে সম্ভবত চিন্তায ব্যাঘাত দিয়েছি, স্বচ্ছন্দ আলাপ চলল, কিঞ্চিৎ বিতর্কও অপরিহার্য ভাবে উপস্থিত হল। অনতিবিলম্বে 'ওরে' সম্বোধনে সজোরে ভৃত্যকে ডাকলেন, বনেদী বাড়ির সাবেকী কাঁসার গেলাসে জল আর তারই সঙ্গে 'যোগ', প্রচুর বৈকালীন সুখাদ্য— তাঁর উত্তর জীবনে পরিচিত অনুরাগীদের একটু আশ্চর্য লাগবে, কারণ তাঁরা সুধীন্দ্রনাথকে দেখেছেন মোটামুটি 'সাহেবী' পরিবেশে, রাসেল স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে, প্রায়শ বিদেশী বেশভূষায়। কিন্তু আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তাঁর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের চেহারা, পিতা বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে প্রচণ্ড চিন্তাপার্থক্য অথচ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা (যা প্রকাশ পেত 'পরিচয়'-এ পিতার ক্রমান্বিত দার্শনিক প্রবন্ধে), বাঙালী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে অস্বস্তি অথচ অনুরাগ, পশ্চিমের বিশ্ব-বীক্ষার প্রবল আকর্ষণ অথচ স্বকীয় ভারত-প্রোথিত সত্তার অনপনেয় অভিমান, যারা সাক্ষ্য হল নিজের চিন্তা ও রচনায় পাশ্চাত্য সাধনার আস্বাদ আর সংস্কৃতের অনন্ত অম্বুধি থেকে রত্নাহরণের সংযোজন-প্রচেষ্টা। সাহেব বন্ধুদেব ভিড়ে সুধীন্দ্রনাথ যখন একান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই উচ্চৈঃস্বরে কিছু বলতেন, তখন বেশ মনে হত, যে কথাশিল্পীর ত্রিনয়ন নিয়ে যামিনী রায় মহাশয় মাঝে মাঝে বলেছেন, যে সুধীনবাবু একেবারে খাঁটি স্বদেশী বাঙালী! কর্ণের মতো সহজাত কবচকুণ্ডল নিয়ে যেন এই সৌম্য, সুদর্শন, দীর্ঘকায় মানুষটি এসেছিলেন— আমার স্মৃতিতে তাঁর ছবি হল কুঁচোনো ধুতি আর গিলেকরা পাঞ্জাবী-পরা এক সুপুরুষ, সদাহাস্যময়, ক্লান্ত বা তিক্তচিত্ত হলেও আত্মসংবৃত, চিন্তারাজ্যে বিচরণে স্বচ্ছন্দ, সৌহার্দ্যে অকৃপণ। সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতি মুগ্ধ করেছে আবার তাঁর চিন্তাধারা (বিশেষত উত্তর জীবনে) বিচলিত করেছে, মতান্তর ঘটিয়েছে কিন্তু মনান্তর কখনো হয় নি।

ভিন্ন পথের পথিক হয়েও আমরা কখনো পরস্পরবিচ্ছিন্ন হতে পারি নি, বরঞ্চ বিভেদ সত্ত্বেও পরস্পর অনুরক্ত থেকেছি।

গার্কির ভক্ত না হয়েও সুধীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছিলেন "রুশসাহিত্যের মহাপথে চলুন বা না চলুন, তাঁর রূপনৈপুণ্য অন্য কারো চেয়ে কম নয়; এবং সেই কলাকৌশলের উপভোগ যদিও দুর্লভ বৈদগ্ধ্যের ধার ধারে না, তবু আদর্শ ও যাথার্থ্য, বাদানুবাদ ও তন্ময়তা, চিত্তশুদ্ধি ও রোমাঞ্চপ্রীতি, কালোপযোগিতা ও অবৈকল্যের এরকম অপরূপ সংমিশ্রণ তাঁর আগে আমাদের কল্পনার অতীত ছিল।" এ থেকে কিছুটা বোঝাযায় সুধীন্দ্রনাথের চিত্তব্যাপ্তি, যার আকর্ষণে 'পরিচয়'-গোষ্ঠী সেদিন একটা প্রকৃত বিশিষ্ট স্থান নিয়েছিল। কালেভদ্রে চীনবিদ্যাবিশারদ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বাসায় 'পরিচয়'-বৈঠকে গিয়েছি, তবে সচরাচর যেতাম সুধীনবাবুর বাড়িতে, যেটা ছিল 'পরিচয়'-এর আসল আড্ডা। সেখানে হয়তো হঠাৎ দেখলাম তুলসীচন্দ্র গোস্বামীকে, তখন যিনি এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব— কিন্তু আমি উপকৃত হলাম জেনে এমন এক গুণালংকৃত মানুষকে, যাঁরা প্রতিভা প্রকৃত স্ফুরণের অবকাশ পায় নি এবং দেশই বঞ্চিত হয়েছে। হয়তো দেখলাম সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে, যাঁর বিজ্ঞানপ্রতিভাকে মর্যাদা দিয়েছে সারা জগৎ আর দেশ যাঁকে আচার্য-পদে বরণ করেছে— কিন্তু অনতিগভীর পরিচয়েও দেখলাম এক অসাধারণ মানুষ, প্রতিভায় ভাস্বর তো বটেই কিন্তু তার চেয়ে মোহনীয় যাঁর সহজ সরল হৃদয়বত্তা। ছোটো ছেলেমেয়েদের সংসর্গে যিনি স্বচ্ছন্দে সহর্ষ, সকলকে কোল দেবার দৈবীশক্তি যাঁর নিজস্ব— হয়তো বা মাঝে মাঝে বিচারে ভুল করলেন, যেমন জার্মানীতে গবেষক জীবন কাটিয়ে সেদেশের মায়ায় হিটলারের উঠতি যুগে ফ্যাশিজম্-এর অন্তর্নিহিত দানবীয়তাকে ধরতে পারলেন না কিছুকাল, কিন্তু কেউ কখনো লেশমাত্র সন্দেহের কথা ভাবতে পারে নি তাঁর অবিচল সদ্‌বুদ্ধি ও সুবিবেচনা বিষয়ে। ধূর্জটিবাবুর কথা আগেই বলেছি— বিদ্যার্জনে আবেগ, চিন্তাশয়ে সন্তরনে উল্লাস, তীক্ষ্ণবাক্ আলোচনায় সম্ভোগ, বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনের আকুলতা, সঙ্গে সঙ্গে সহজ সাধারণ মানবসম্পর্কের সন্ধানে ব্যাপৃত থেকে যেন ব্যর্থ ও বিষণ্ণ, যে-ব্যর্থতা আচ্ছাদনের জন্যই মনকে ব্যস্তসমস্ত রাখার একটা প্রয়াস। দেখলাম নীরেন্দ্রনাথ রায়কে যখন তিনি অরবিন্দ-চিন্তার মোহ ছেড়ে মার্ক্‌স্‌-বাদে মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন, চিন্তার দিক থেকে

অত্যন্ত সৎ কিন্তু প্রায় একচক্ষু, সকলের প্রতি স্নেহশীল হবার জন্য ব্যাকুল অথচ কোথায় যেন এতটা একক যে তা থেকে রেহাই নেই— পরে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে এবং তৎসংলগ্ন কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত করেন, যার কিছু উল্লেখ যথাকালে করব। দেখলাম সুশোভনচন্দ্র সরকারকে, যার দীর্ঘকায় সুদর্শন ও সদাপ্রশান্ত উপস্থিতিরই একটা নীরব প্রভাব যেন ছিল. মনে হত না যে তিনি অল্পকাল আমাদেরও এম.এ. ক্লাসে পড়িয়েছিলেন এবং পরে প্রধানত প্রেসিডেন্সি কলেজে কয়েক দশক ধরে ইতিহাস ও রাষ্ট্রতত্ত্ব অধ্যাপনা-ব্যপদেশে ছাত্রচিত্তে মার্ক্স্‌বিদ্যার বীজ বপন করেছিলেন বলে এদেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসেও স্থান করে নিয়েছেন। দেখলাম শাহেদ সোহরাওয়ার্দিকে— রুশ-বিপ্লবের ঘোর বিরোধী বলে যে নানাভাষাবিদ শিল্পরসিক সম্বন্ধে দারুণ অনীহা জাগরূক হওয়া সমুচিত ছিল কিন্তু হল না, কারণ দেখলাম ব্যক্তিত্বের অপর রূপ ; চোখে পড়ল বহুদর্শী প্রৌঢ়ের বিচিত্র অথচ অসার্থক জীবনপরিক্রমার অব্যক্ত ক্লান্তি, আজীবনসংগৃহীত সংস্কার পরিহারে অনিচ্ছা অথচ মনের জিজ্ঞাসাকে স্তব্ধ করতেও অপ্রবৃত্তি, বৈদগ্ধ্য যে যথেষ্ট নয় তার জীবন্ত প্রমাণ— মতামত তাঁর যাই হোক্, সাম্যবাদ নিয়ে কৌতুক আর বৈরিতা তিনি যতই না কেন করুন, সীমিত পরিবেশে তাঁকে সৎ ও স্নেহশীল চেহারাতেই আমি দেখেছি। দেখলাম আরো অনেককে, তবে নাম বাড়াবার দরকার নেই। শুধু উল্লেখ করব আর একজনের— যিনি আফ্রিকায় ছেলেবেলা কাটিয়ে বাংলা শেখেন এবং বলেন বিলম্বে, কিন্তু 'পরিচয়'-এর পাতায় একদা নিয়মিত লিখেছেন, যার সম্পর্কে কিম্বদন্তী ছিল যে তিনি নাকি একটা রোজনামচা রাখেন যার ভিত্তিতে 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর একটা বিবরণ ভবিষ্যতে বেরোতে পারে, কে কবে বেফাঁস কথা বলেছে তাও বাদ যাবে না! ইনি হলেন শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ— বহুদিন দেখি নি, যতদূর শুনেছি উনি এখন শান্তিনিকেতনে অবসর জীবন যাপন করছেন।

* * *

মার্কসীয় রাজনীতির ছারপোকা তখন এমনভাবে আমায় কামড়েছিল যে অর্থকরী প্রয়াসে লিপ্ত হওয়া সহজ রইল না ; হাইকোর্টে পসার জমাতে হলে অন্তত কিছুকাল যে তীর্থের কাকের মতো সবুর করে থাকতে হবে তা বুঝতে দেরি হল না, পিতৃপ্রভাবে এবং কতকটা নিজের ছাত্রখ্যাতির কল্যাণে রিপন

কলেজে তখনকার পক্ষে ভালো চাকরি, ইতিহাসবিভাগের প্রধানপদে বসলাম, হাইকোর্ট বার লাইব্রেরির সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়তে হল না, কারণ তখনো পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার উৎস ছিল ব্যারিস্টারী— কলেজও বাধা দেয় নি, জানাল অবসর সময় আমি কোথায় কী করি তা শুধু আমার ধান্ধা! দুটো আলাদা দুনিয়ায় ভর দিয়ে যেন দিন চলতে থাকল, তবে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, মন তখন স্থির— মার্ক্‌স্‌বাদকে আত্মস্থ না করতে পারি, অসংকোচে অবলম্বন করেছি, আর যথাসাধ্য যেন জীবনের অর্থভেদ করতে পেরেছি। পাশ্চাত্যে তখন ব্যাজবাক্য প্রচলিত ছিল (স্ট্রেচি লিখিত *'The Coming Struggle for Power*-এর মতো প্রভাবশালী গ্রন্থে যা উদ্ধৃত) যে সমস্যা-সংকুল জগতে খোলা আছে মাত্র তিনটি রাস্তা—'ক্যাথলিক্ চার্চে'র শরণ, কম্যুনিস্ট পার্টি-তে যোগদান কিম্বা আত্মহত্যা!' সম্প্রতি দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ সাম্যবাদী হওয়ার পরও বন্ধুভাবাপন্ন ফরাসী দার্শনিকের মন খুঁৎ খুঁৎ করেছে যে কম্যুনিজ্‌ম্ দাবি করে "un oui trop massif" ('too massive a yes'); যাতে সায় দিয়ে চলা বড়ো শক্ত। শক্ত সন্দেহ নেই কিন্তু ভাবতে গেলে জীবনে কোন্ দামী কাজই বা সহজ! যাই হোক, বোধ করি ভারতবর্ষের সন্তান বলেই আমার সত্তার যা-কিছু মহার্ঘ তা চেয়ে এসেছে বিশ্ববীক্ষা— সতত সঞ্চরমান এই বিশ্বের মর্মবস্তু আয়ত্ত করতে পারে এমন চিন্তা, জীবনের বহুবিধ ধারাকে একসূত্রে গ্রথিত করতে পারে এমন প্রত্যয়, এমন বিশ্বাস যা যুক্তিসিদ্ধ, সত্যসন্ধ, চিত্তজয়ী। কোনো নাটকীয় মুহূর্তে নয়, তবে সহজ স্বাভাবিক বিবর্তনেই আমার দেশাভিমান পরিণতি পেয়েছিল মার্ক্‌স্‌বাদে। আর আজ জীবনান্তের সামীপ্যে এসে জানি যে মার্ক্‌সীয় চিন্তার বহু ক্ষেত্রেই আমার গতিবিধি স্বচ্ছন্দ হয় নি, বিপ্লবী জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়া আমার সাধ্যাতীত থেকে গেছে, কিন্তু মার্ক্‌স্‌বাদের মূল বিন্যাসই আমার চিত্তবৃত্তিকে তুষ্ট করেছে, সীমিত কর্মশক্তিকে উদ্রিক্ত করেছে, সুযোগ ও সাধ্য অনুযায়ী সর্বজনের কল্যাণ-প্রচেষ্টায় লিপ্ত থেকে নিজের সর্ববিধ ক্ষুদ্রতা ক্ষালনের নিয়ত নির্দেশ দিয়ে চলেছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার (বঙ্গবাসী কলেজে আচার্য গিরিশ-চন্দ্র বসু-পরিবারের মতো) তখন রিপন কলেজের কর্ণধার বলে স্বল্প হলেও নিয়মিত অর্থার্জনে আমার বিঘ্ন ঘটে নি— প্রচুর আনুকূল্য পেয়েছি সুরেন্দ্র-

নাথ-পুত্র ভবশঙ্করবাবুর কাছে, বেশ বুঝতাম আমায় স্নেহ করেন সুরেন্দ্র-জামাতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (যিনি কংগ্রেসের নরমপন্থী যুগে সক্রিয় হলেও ছিলেন প্রকৃত 'স্বদেশী' মেজাজের মানুষ)— প্রথমোক্ত শুভার্থী শুধু একবার হেসে বলেছিলেন : 'don't use this college as a jumping-off board', আর আমি সে কথা রেখেছি, লোকসভায় ক্রমান্বয়ে নির্বাচিত হয়ে সম্পর্ক রক্ষা অসম্ভব না হওয়া পর্যন্ত কলেজের খাতায় আর প্রচারপত্রে আমার নাম লেখা থেকেছে। রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ সম্বন্ধে ছাত্রাবস্থায় আমাদের একটু নাকতোলা ভাব থাকলেও সাক্ষাৎ পরিচয়ে দেখলাম প্রতিষ্ঠানটির এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, যা অন্তত তখন বাস্তবিকই লক্ষ্য করার মতো ছিল। ছাত্রের বিপুল ভিড় (ছাত্রীরা আসে পরে), কেউ কেউ চনমনে, চপল, এমন-কি চালাক, মাঝে মাঝে মাস্টারমশাইদের একটু বোকা বনাতে পারলে খুশি ; অধিকাংশই শান্ত, সুবোধ, হয়তো বা গরিব ঘরের ছেলে বলে একটু যেন নিষ্প্রভ, কিন্তু কড়া কথা বলার পরও সামান্য মিষ্ট ব্যবহারে প্রায় সবাই 'জল' হয়ে যায় ; ক্লাসের সবচেয়ে 'দুষ্টু' ছেলেকে দেখা যায় অসম্ভব রকম শিষ্ট, অধ্যাপকের হাতে একটুখানি সহৃদয়তার আস্বাদ পেয়ে তার আচরণে অদ্ভুত মনোরমতা। প্রেসিডেন্সি কলেজে যা বিরল তা এখানে সর্বদাই দেখা যেত—'ডেলি প্যাসেঞ্জারি' করে ছেলে আসে যায় কলেজে, হয়তো গোবরডাঙ্গা কিম্বা নৈহাটি থেকে, 'পাতভোরে' খেয়ে আসে, সারা-দিনে পেটে কিছুই হয়তো পড়ে না, অথচ লেখাপড়ায় আগ্রহ, জ্ঞানার্জনের সরঞ্জাম নেই অথচ জ্ঞানস্পৃহায় আকুল। রিপন কলেজের গৌরব 'পথের পাঁচালী' -স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লীবাংলার ভিখারী অথচ অন্ন-পূর্ণা মূর্তির যিনি পরম রূপকার। রিপন কলেজেই পড়েছিলেন আমার সম্মানিত বন্ধু রাধারমণ মিত্র এবং নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, আন্দামান বন্দীশালা এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে যাঁদের স্মৃতি অক্ষয় হয় থাকবে। ১৯৩৬ সালে আমারই ছাত্র ছিল শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, যে পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী হয়েছে আর আজ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতি। জানি না রিপন কলেজের প্রাক্তন ছাত্রতালিকায় বহুখ্যাত ব্যক্তির সংখ্যা কত হবে— কিন্তু সাধারণ মাঝারি শ্রেণীর বাঙালী জীবনের দুঃখে সুখে, ভালোয়-মন্দেতে, দোষেগুণে, প্রতিভায়-দৈন্যে প্রতিনিধিমূলক সংস্থা

ছিল রিপন কলেজ। বোধ করি আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার মূল চরিত্র তদ্রূপই রয়ে গেছে—জানি না, কিন্তু বহুপরিমাণে দীনহীন সেই কলেজে দেখেছি আপাত রিক্ততার মধ্যেই আমাদের বাংলার ঐশ্বর্য।

আমি অধ্যাপনায় লিপ্ত হওয়ায় তখনকার উদীয়মান্ আর তেজস্বী ছাত্র-আন্দোলনে আহূত হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল, সেদিনের পার্টিও তাই তুষ্ট হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘের কাজে প্রচুর সহায়তা সংগ্রহ করতে পারলাম, কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে বহু প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও বিদ্বানের সাহচর্য ও আনুকূল্য থেকে। অধ্যক্ষ তখন ছিলেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সাহিত্যের পঠন-পাঠনে গভীর ব্যুৎপত্তি এবং চরিত্রের সদাশয় সারল্য বাংলার মহানুভব-মণ্ডলীতে যাঁর মর্যাদা নির্দিষ্ট করেছিল, সাধারণ বাঙালী কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও যাঁর চিত্তপ্রসার ও মানবিক ঔদার্য্য প্রকৃতই স্মরণীয়। 'স্বদেশী' প্রভাবে, এবং পুণ্যশ্লোক সতীশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় -স্থাপিত 'Dawn Society'-র সংস্পর্শে, প্রেসিডেন্সি কলেজের সরকারী চাকরি ছেড়ে রিপনে যোগ দিয়েছিলেন—ব্যক্তিত্বে অহমিকা ছিল না, উষ্মা ছিল না (আমার মাঝে মাঝে একটু যেন নিষ্প্রাণও মনে হত, কিন্তু বিষ্ণু দে-র মতো তাঁর অন্তরঙ্গের কাছে শুনেছি সে ধারণা ভুল)। আর-এক প্রধান ছিলেন, আজও সৌভাগ্যক্রমে যিনি জীবিত, বহু কাল রিপন কলেজে শিক্ষাদানের পর রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ—বিপুল যাঁর বিবিধ বিষয়ে বিদ্যা, পরিব্যাপ্ত সমাজ জীবনে যাঁর সদা অদম্য আগ্রহ, সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় চিন্তায় অপরিমেয় আস্থার ফলে সমবেত কর্মপ্রচেষ্টায় আকৃষ্ট হয়েও যাঁর অনীহা (বোধ করি এজন্যই ভারতীয় জনসংঘ-সভাপতিত্বে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী হয়েও তিনি তৎপদে টিকে থাকতে পারেন নি), সাহিত্য সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে রক্ষণশীলতাপ্রবণ হয়েও যাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য, বচন ও লিখন -চাক-চিক্য, এবং ক্ষিপ্র বুদ্ধিবৃত্তি অসামান্য গুণবত্তার পরিচয় দিয়ে চলছে। কলেজে বিশ্রামগৃহের টেবিলে মাঝে মাঝে দেখেছি অধ্যক্ষ এবং দেববাবু 'টাইমস্' কিম্বা 'স্টেট্‌স্‌ম্যান ক্রস্‌ওয়ার্ড'-রহস্যভেদ করছেন, বিশ্বকোষ যেন উভয়ের কণ্ঠস্থ—হঠাৎ মনে হচ্ছে দেববাবু কিছুটা যেন তুলনীয় নীরদচন্দ্র

চৌধুরীর সঙ্গে (উভয়েই 'জাত-বাঙাল' বললে কি দোষ হবে ?), তফাত অবশ্য এই যে অশ্বিনীকুমার দত্তের 'পুণ্যে বিশাল' বরিশাল নাড়ীর সঙ্গে যুক্ত থাকায় দেববাবু কখনো দেশমাতৃনিন্দায় আনন্দ আহরণে স্বীকৃত হওয়ার মতো লজ্জাকে গৌরব মনে করতে পারেন নি।

ভুলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যে তখন কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় ছিলেন হোমিওপ্যাথি বিদ্যায় বিচক্ষণ— প্রতি সকালে হাওড়ার বাড়িতে বহু দরিদ্রের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন, ঔষধ বিতরণ করতেন, এই নিত্যকৃত্য সেরে আসতেন কলেজে ; সুবিদিত তাঁর এই দাক্ষিণ্য, কিন্তু পুণ্যাত্মার লেশমাত্র অহমিকা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। কলেজে স্বভাবতই শোনা যেত প্রাক্তন অধ্যক্ষদের কথা— দেশাভিমানী মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো স্থিতধীকে নিয়ে গর্ব ছিল কলেজের— মাঝে মাঝে উল্লিখিত হতেন সুপণ্ডিত জানকীনাথ ভট্টাচার্য— এই দ্বিতীয়োক্তের বিষয়ে মনে পড়ছে অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষে দুই হিন্দুস্থানী বেয়ারার কথা। একজনের নাম ছিল গঙ্গা, আশা করি আজও সে কাজ করছে, শান্ত, সুদক্ষ, সদাপ্রফুল্ল, আমাদের ক'জনের সে যেন বন্ধুস্থানীয় হয়ে উঠেছিল, ভাবতাম সুযোগ পেলে এর মতো গরিব ঘরের মানুষ জীবনে কত এগোতে পারত ! আর-একজনের নাম জান্‌কী, বয়স কিছু বেশি, কলেজদর্পে ভরা, একবার বলল কলেজ 'জানকী' বিনা অচল, আগে ছিলেন ঐ নামের অধ্যক্ষ (যার সে ছিল খাস বেয়ারা) আর এখন আছে স্বয়ং, আর একটু হেসে দেখিয়ে দিল আমাদের বন্ধু সংস্কৃত অধ্যাপক জানকীবল্লভ ভট্টাচার্যকে ! জানকীবল্লভ ক্রমশ মার্ক্‌সবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন ; পঞ্চানন তর্করত্নের মতো ভাটপাড়ার পণ্ডিত শিরোমণির দৌহিত্রের এই বিবর্তন সামান্য ঘটনা ছিল না ; বহু আলোচনায় আমি তাঁর সংস্কৃত বিদ্যাভাণ্ডার থেকে রত্ন চুরি করতে পেরেছি। পার্টিতে তিনি পরে যোগও দেন, কিছুকাল পশ্চিমবাংলার বিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, ১৯৬৪ সালে পার্টি বিভাগের পর থেকে 'সি.পি.আই. (এম.)' দলে আছেন, কিন্তু ভরসা করি পূর্বের মতোই ব্যাপৃত আছেন প্রাচীন ভারতচিন্তা থেকে আজকের জায়মান নবসমাজে উত্তরণ-সম্পর্কিত অসংখ্য জটিল সমস্যা সমাধান প্রয়াসে। রিপন কলেজে সত্যই কাছ থেকে দেখলাম বেশ কয়েকজনকে,

যাদের পারিবারিক দুশ্চিন্তাবাহুল্যও নৈর্ব্যক্তিক আগ্রহের আকর্ষণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে নি।

রিপন কলেজে তখন প্রকৃত সমুজ্জ্বল এক সাহিত্যিক পরিবেশ— ছেলেবেলা থেকে জানা 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত 'অষ্টবক্র সম্মিলন' কথাটি মনে পড়ে যেত বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত (পরে এলেন প্রমথ বিশী ও বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতিকে একত্র দেখে! 'প্রগতি' কথাটির সঙ্গে বুদ্ধদেববাবুর প্রাণের টান কৈশোর থেকে; সম্ভবত তাই, মার্ক্‌স্‌বাদী আওতায় 'প্রগতি'-র মর্ম সম্পর্কে সংশয় পোষণ সত্ত্বেও তাঁর আনুকূল্য পাওয়া কঠিন হয় নি। 'বন্দীর বন্দনা' -খ্যাত কবির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ঘটে ওঠে নি, কিন্তু বন্ধুতা যে হয়েছিল বলতে সংকুচিত নই। ছোটোখাটো মানুষ, কিন্তু ছিম্‌ছাম্‌, দেশী বা বিদেশী পোষাকে রুচিবান্‌, মুখে সর্বদা একটা লাজুক ভাব, অপরিচিতের সামনে অত্যন্ত মিতবাক্‌ অথচ বন্ধুসংসর্গে সশব্দ হাসি, সাহিত্যের 'রোমান্টিক' ধারাতেই স্বচ্ছন্দ অথচ তার ধ্রুপদী রূপকে আত্মস্থ করার কল্পনা নিয়ে যেন একটু সুদূর, সখেদ, অনিশ্চয় ব্যস্ততা— তখনই তিনি গদ্যপদ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত লেখকপ্রধান বলে পরিচিত, 'কবিতা' ত্রৈমাসিক প্রকাশে সফল, লেখকের পক্ষে বাধাকণ্টকিত পরিবেশে সাংসারিক সংগতি ব্যাপারে সার্থকতা অর্জনে কৃতসংকল্প এবং বোধ হয় সেজন্যই প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় কলেজে বিশেষ কাটাতেন না। অপর দিকে মনোমত আড্ডায় আসক্ত ছিলেন বিষ্ণুবাবু। রিপন কলেজে আমাদের মতো 'ইতরে জনাঃ'-কে নিয়ে অস্বস্তির কোনো লক্ষণ দেখাতেন না। তাঁকে নিয়ে জমিয়ে বসতে পারতেন কীর্তীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 'গৃহশিক্ষক'-ভূমিকায় ডাক্‌সাইটে অধ্যাপক, যিনি হয়তো চেঁচিয়েই বলতেন 'বিষ্ণু, তোমার লেখা একবর্ণও বুঝি না', মাঝ মাঝে জাঁকিয়ে বসতেন জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে (করকোষ্ঠীপাঠে তিনি ছিলেন যশস্বী), কিম্বা কথাপ্রসঙ্গে বলতেন: 'বেদান্তের ব্রহ্মাস্বাদের তুলনা যদি চাও তো বলি ওটা হল সবচেয়ে সরেশ ল্যাংড়া আমের মতো— কেউ লিখে বোঝাক্‌ না তার কেমন স্বাদ আর গন্ধ!' বোমার আমলে 'স্বদেশী' জেলখাটা অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র দে হয়তো অট্টহাস্যে, (যা সে যুগে বহুজনের কণ্ঠনিঃসৃত হত, আজ যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে!) সায় দিলেন। বললেন: 'কই, কে দিচ্ছেন চায়ের অর্ডার?'

একটু হ্রস্বকণ্ঠে এখানে বলে রাখি যে তখন অধিকাংশ কলেজ শিক্ষকের মাইনের অঙ্কটি ছিল এমন যা আজকের ভদ্রসমাজে উচ্চার্য নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও চা (গ্রীষ্মে ডাব পর্যন্ত) কাপের পর কাপ অর্ডার দিয়ে যাওয়া খুব কঠিন ছিল না।

উনিশশতকে বাংলার নবজাগৃতি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এবং কলেজ স্কোয়ারের উত্তরে বইয়ের-দোকানে-ভরা গলিতে নামাঙ্কিত শ্যামাচরণ দের বংশধর বিষ্ণুবাবুকে দেখে মনে হ'ত যে বনেদী কলকাতার ধারা বজায় রেখে চলেছেন; ধুতিতে কোথাও ভাঁজ পড়ে নি, গায়ের 'পাঞ্জাবী' গিলে-করা নয় কিন্তু নিখুঁত ধোপদস্ত; দীর্ঘাকৃতি মেদহীন, বুঝি খর্বসমাজে ভ্রাম্যমাণ বলে একটু ঝুঁকে-থাকা; দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অথচ সদয়; স্মিতানন, স্বল্পবাক্‌, কিন্তু বন্ধু-পরিবেশে আলাপপ্রিয়, ব্যাজোক্তিতে সিদ্ধ, বহুজনবিষয়ে বিস্মৃত তথ্য উদ্ধারে পুলকিত। মনে আছে আমাদের মাস্টারমশাই নিবারণবাবু বিষ্ণুবাবুকে দেখে বলেন: 'বাঃ, এই তো হল আধুনিক কবির চেহারা— একদিকে সুধীন অন্য দিকে বিষ্ণু— এদেরই বলে "নাগরিক"!' বিষ্ণুবাবু তখন লিখেছেন অল্পই আর আমার মতো অধম তার অর্থভেদে প্রায় অক্ষম, কিন্তু ক্রমশ তাঁর কাব্যলোকে প্রবেশ না করতে পারলেও অস্পষ্ট অবলোকনের সৌভাগ্য কথঞ্চিৎ অর্জন করতে পেরেছি, অজস্র প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সর্বত্রচারী মানসিক গতিবিধির আস্বাদে বুঝেছি যে সম্ভবত সমকালীন সকল সাহিত্যস্রষ্টার মধ্যে সমাজবোধ ও শিল্পায়নের অদ্বৈত সার্থকতায় তিনি শ্রেষ্ঠ। এ ধারণা অকস্মাৎ আসে নি, এসেছে ধীরে, নানা বিতর্ক অতিক্রম করে। তাঁর কাব্যক্রমের বহুবিধ দ্যোতনার পরিচয় পেয়ে, দেশদেশান্তরে ক্রান্তিকারী সংঘটনে বিচলিতি ও ব্যর্থতার পথে না গিয়ে সমাজধর্মী কবির প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত তাঁকে হতে দেখে। যাই হোক, রিপন কলেজে তাঁকে প্রথম দেখলাম; অনতিবিলম্বে চিন্তায় খানিকটা সাযুজ্য আবিষ্কৃত হল, সভাসমিতি ব্যাপারে অনীহাগ্রস্ত হলেও, 'প্রগতি' আন্দোলনকে মাঝে মাঝে বিদ্রূপ করলেও বিরূপতা দেখালেন না, বরঞ্চ নিজের ঈষৎ তির্যক ভঙ্গীতে সহায়তাই করলেন, 'পরিচয়' গোষ্ঠীতে আমাদের প্রতিষ্ঠাকে সুগম করে দিলেন— আরম্ভ হল অন্তরঙ্গ সহযোগিতা যা আজও অটুট।

রিপন কলেজ অধ্যাপকদের মধ্যে আরো বহু গুণীর নাম মনে আসছে।

আমারই ইতিহাস বিভাগে এলেন বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ধূর্জটিপ্রসাদের অনুজ বলে নয় নিজ কীর্তিতেই যিনি গদ্যে পদ্যে একজন প্রমুখ লেখক, যাঁর রস-রচনা আর ভূতের গল্প আর বাংলায় জ্ঞানচর্চা আমাকে বহু আনন্দ দিয়েছে; নিজের স্বাস্থ্য এবং সাংসারিক ঝামেলা সম্পর্কে অল্প একটু বাতিকগ্রস্ত অথচ বন্ধুবৎসল, সদালাপী এই মানুষটির সৌহার্দ্য আমার কাছে মূল্যবান্। আবার এলেন শান্তিনিকেতনের পড়ুয়া প্রমথ বিশি, গল্প কবিতা নাটকে সিদ্ধহস্ত, কথায় আর মুখে সর্বদা হাসি, শীঘ্রই সাহিত্যিক বাজারেও সুপ্রতিষ্ঠ—বর্তমানে রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য। তিনি, আমাদের মধ্যে একটা যেন ব্যবধান (যা কিছুটা অবশ্যই তত্ত্বগত, কারণ কম্যুনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে তাঁর মত বোধ করি মৃত ডালেস্-সাহেবেরই অনুরূপ 'The only good communist is a dead communist'!), কিন্তু তাঁর সরস আলাপে পুলকিত হতে আমার কখনো বাধে নি। পুরোনো অধ্যাপকদের মধ্যে মনে পড়ছে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের পুত্র ইংরিজি ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, গম্ভীরমূর্তি বটুকনাথ ভট্টাচার্যের কথা; আমাদের সঙ্গে একটু বেশি মিশতেন আনন্দকৃষ্ণ সিংহ, শিল্প নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেছিলেন এককালে, নন্দলাল বসু যখন অজন্তার 'কপি' করে আনেন তখন সুনীতি চাটুজ্জে মশায় প্রভৃতির সঙ্গে আনন্দবাবুও 'ওরিয়েন্টাল আর্ট' অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতেন। কলেজে তাঁদের মুখে শুনতাম কালিদাস আর জয়দেবের শ্লোক, "তন্বী শ্যামা শিখর-দশনা" কিম্বা "মৈথৈর্মেদুরমম্বরম্" নিয়ে উচ্ছ্বাস। তারকনাথ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে মাঝে মাঝে মজা করা যেত, কারণ কলেজে পডানো ছিল গৌণ ব্যাপার, মুখ্য কাজ (এবং শাঁসালো) তাঁর ছিল ভবানীপুরে জামাকাপডের জমকালো দোকান চালানো (যেখানে সহকর্মীদের সস্তায় কিছু দিতে অবশ্য তিনি গররাজী ছিলেন, শুধু ধারে কিনে হিসাব খুলতে দিতেন!) বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা রসময় চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত পডানোর অজুহাতে রসালো আর উদ্ভট শ্লোক আউড়ে মাঝে মাঝে আসর জমাতেন। বিভূতিভূষণ কাঁঠাল মশায়ের উপাধিটা ছাত্রমহলে কৌতুক সৃষ্টি করত— কিন্তু সান্ত্বনা এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রেরা অধ্যাপকদের জানত নামের প্রথমাক্ষর থেকে, যেমন আমি ছিলাম এইচ্.এন.এম. (হয়তো অল্পলোকই তখন আমার পুরো নাম জানত!)। ব্যারাকপুরের ভূধর ভট্টাচার্য সর্বদা খদ্দর পরতেন, তবে

সুরেন বাঁড়ুজ্জে মশায়ের ওপর ভক্তি ছাড়তে পারেন নি। সাহিত্যিক-অধ্যাপক পরে এলেন অজিত ঘোষ আর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁদের রচনা আজকাল প্রায়ই প্রকাশ হয় দেখে থাকি। এককোণে চুপচাপ বসতেন, ডাকলে সলজ্জভাবে একটু সরে আসতেন, গোবিন্দচন্দ্র দেব, যিনি দর্শন পড়াতেন, দেশভাগের পর জন্মভূমি পাকিস্তান ছাড়েন নি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঋষিকল্প সর্বজনবন্দিত শিক্ষক বলে পরিচিত হয়েছিলেন, বাংলাদেশের অভ্যুত্থান কালে শিক্ষায়তনেই তাঁকে দুর্বৃত্তেরা হত্যা করে— অমন একজন মানুষ, কিন্তু তাঁর পরিচিতি রিপন কলেজে ছিল স্বল্প। গল্প করতে ভালোবাসতেন বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বাংলায় 'বাইবল্' তরজমা করেছেন, গীতা ভাগবত ইত্যাদি অবলম্বন করে বহু ভাষণ অবসরান্তে দিয়েছেন, কিন্তু যাঁকে বাংলা সাহিত্যের উচিত স্মরণ করে রাখা, চারখণ্ডে 'স্মৃতিকথা' রচনার জন্য। এই গ্রন্থে কোথাও লেশমাত্র চেষ্টা নেই সাহিত্যিক গুণ-সম্বলিত ব্যাখ্যানে— নিছক্ সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অবিকল ছবি আঁকার চেষ্টা শুধু আছে, যে মনের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে চমৎকারিত্ব একটুও নেই কিন্তু একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। কলেজে কাছ থেকে দেখেছি আজকের প্রখ্যাত অর্থবিদ্ ভবতোষ দত্তকে— প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন আমার কিছু পরে তিনি সম্পাদনা করেছিলেন, অধ্যাপক হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে তিনি পরে উচ্চপদ থেকে পদান্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন— কদাচিৎ হয়তো দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কিন্তু আমার মনে তাঁর যে ছবি তা হল রিপন কলেজে কর্মরত শিষ্ট, শান্তস্বভাব, মৃদুবাক্, বুদ্ধিদীপ্ত এক যুবকের।

সবশেষে উল্লেখ করছি দুজনের— একজন বাঙালী, অপর জন ইংরেজ। নন্দলাল ঘোষ আজ ভারতবর্ষের একজন প্রধান গণিতবিদ বলে পরিচিত। কিন্তু কাজ তিনি শুরু করেন এবং বহুদিন অনাদৃত অবস্থায় চালিয়ে যান রিপন কলেজের দরিদ্র পরিবেশে— নিজে থাকতেন বেলেঘাটায়, হেসে বলতেন : 'যার নেই পুঁজিপাটা, সেই যায় বেলেঘাটা', উপায় কি ? উপার্জন যখন নামমাত্র তখন এই হল জীবন! অতি সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করে শিক্ষক জীবন যাপনের বিড়ম্বনা তিনি হাড়ে হাড়ে অনুভব করতেন। তা নিয়ে কৌতুক করতেন, মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হতেন, কারণ মন তাঁর একান্ত

যুক্তিবাদী, এ-ধরনের অর্থহীন সমাজবিন্যাস বরদাস্ত করতে চাইতেন না। গণিত গবেষণায় আগ্রহকে কিন্তু জীবনের কোনো বঞ্চনাই স্তব্ধ করতে পারে নি— আর শখ ছিল একটি, ইংরিজীতে কবিতা লেখা (যা নিয়ে বিষ্ণুবাবু এবং আমি রহস্য করতাম, তিনিও হাসতেন)। আত্মহত্যার ঔচিত্য নিয়ে তর্ক করতেন, ইংরিজী লেখা ভারতীয়ের পক্ষে যে এক অস্বাভাবিক কাণ্ড তা কিছুতে স্বীকার করতেন না, বলতেন বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি মানতে পারেন না যে মাতৃভাষাই হল সাহিত্য রচনার একমাত্র বাহন। সব-কিছু ছাপিয়ে সর্বদা নন্দবাবুর কথায় এবং কাজে দেখা যেত এমন এক সাহসী, স্পষ্টবাদী সত্যসন্ধ ভাব যা প্রকৃতই অসাধারণ। আলোচনায় দেখাতেন এমন এক তন্ময়তা যা একটু হয়তো ক্লান্তিকর বোধ হলেও সতত শ্রদ্ধার্হ বলে মনে হত। প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংসারিক অর্থে সর্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় সুযোগ পেয়েও অবলীলাক্রমে তিনি তা অস্বীকার করেছেন— পারিপার্শ্বিক অবস্থার অবনতি দেখে ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু গতানুগতিক পথে চলতে অস্বীকৃত হয়ে আশ্রয় নিয়ে আছেন নিজের সত্তার একাকিত্বে। গণিতগবেষণায় বাধা হয়তো পড়ে নি, কিন্তু জীবনের বহু আকর্ষণকে তিনি অগ্রাহ্য করেই চলেছেন। স্নেহশীল তিনি, কিন্তু কোথায় যেন বাধা পড়েছে, একাকিত্বে আটক পড়েছেন— কোথাও সান্ত্বনা খোঁজেন নি, না মানুষের কাছে না ভগবানের কাছে! বলা বাহুল্য, ঈশ্বরবিশ্বাস বা আধ্যাত্মিকতার জালে তিনি কখনো ধরা দেন নি; মার্ক্‌সবাদ সম্বন্ধে অনুশীলন তেমন করেন নি কিন্তু কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হলেও তাকে গ্রহণ করতে তিনি পারেন নি, বহু প্রশ্ন জেগেছে যার পূর্ণ সদুত্তর বিনা তিনি তুষ্ট নন্। দেশের গণিতবিশারদদের মধ্যে তাঁর উচ্চস্থান, কিন্তু দুঃখ হয় যে এমন বিচিত্র চরিত্রের এক প্রতিভা জনসমাজে অপরিজ্ঞাতই রয়ে গেলেন। এখন বর্ধমানের উপান্তে তিনি বাস করেছেন— আমরা মাঝে মাঝে সন্ধান নিই অপরের কাছে, কদাচ পত্রবিনিময় ঘটে, কিন্তু যোগাযোগ প্রায় বন্ধ।

হম্‌ফ্রি হাউস কেম্‌ব্রিজে সাহিত্য গবেষণায় খ্যাতি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরিজীর অধ্যাপক হয়ে এলেন ১৯৩৬ সালে— আগেকার বিদেশী অধ্যাপক থেকে একেবারে আলাদা ধরনের মানুষ, সাহেবপাড়ায় না থেকে উঠলেন সস্ত্রীক, সেণ্ট পল্‌স্ কলেজের হস্টেলে, সম্ভবত মিলফর্ড, ক্র্যাবট্রি

প্রভৃতির সঙ্গে পূর্বপরিচয়ের সুবাদে। বেশ মনে আছে সেখানে দেখা হল ম্যাডলীন এবং হম্‌ফ্রি-র সঙ্গে; ঘরের মধ্যে জোনাকি এসে আমায় বসল দেখে ম্যাড্‌লীন মুগ্ধ, উভয়েই আমাদের এই দুঃস্থ, বঞ্চিত দেশ সম্বন্ধে প্রকৃত মানবিক মনোভাবের অধিকারী, উপেক্ষা তো করে-ই না, আবার সাম্রাজ্যবাদী মুরুব্বিয়ানার অবশিষ্ট নিয়ে পিঠ চাপ্‌ড়ে সান্ত্বনা দেয় না, জানতে এবং বুঝতে চায় এক প্রাচীন, জটিল, দুর্গত অথচ প্রাণবন্ত দেশের জীবনকে। আমাদের বাড়িতে হাঁটু মুড়ে বসে পাত পেড়ে তারা খেয়েছে, পুরোনো এক গাড়িতে (যা প্রায় জাদুঘরে পাঠবার মতো) জোগাড় করে আমায় বহুবার তারা ঘুরিয়েছে, নিয়ে গেছে আলিপুরে, যেখানে হাইকোর্টের জজ্‌ টৌরিক্‌ আমীর আলির বাড়ি তারা কিছুদিন ছিল— মনে পড়ছে হম্‌ফ্রি সেখানে আমায় প্রথম হুইস্কির স্বাদ নিতে শেখায়, বিলাতে কখনো ও-বস্তু মুখে দিই নি জেনে হাসে, বলে চেকেই দেখো-না কেন, 'নীতি'তে তো বাধে না, এবং দেখেছি যে ক্ষতি কিছু ঘটে নি, বরঞ্চ কথোপকথনের জৌলুস যেন একটু বাড়ে! পানীয় দূরে থাক্‌, পান-সিগারেট ইত্যাদি নিয়েও 'নেশা' কখনো ধরে নি, তবে নিজেকে নিজের বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণের একটু ক্ষমতা থাকায় মনে হয়েছে যে সীমিত পরিমাণে 'পানীয়' গলাধঃকরণে চিত্তবৃত্তির চাকচিক্য সাময়িকভাবে অদ্ভুত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে— এটা অবশ্য যুক্তি হিসাবে বলছি না, শুধু একটু সংবাদ মাত্র! যাই হোক্‌, ম্যাড্‌লীন কয়েক মাস বাদে চলে যাওয়ায় ফাঁকা লেগেছিল খুব— তবে হম্‌ফ্রির সঙ্গে প্রকৃত সৌহার্দ্য তখন আমাদের কয়েকজনেরই একটা মূল্যবান্‌ অভিজ্ঞতা। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রফুল্লবাবুর বিলাত না গিয়েও ইংরিজী জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি হম্‌ফ্রিকে মুগ্ধ করে; প্রফুল্লবাবুর গভীর জ্ঞান আর চরিত্রমাধুর্যে সে ভারতীয় জীবনধারাকে যেন বুঝতে পারে; 'পরিচয়'-এর আড্ডায় সে যেতে থাকে, পরম বন্ধু হয়ে ওঠে সুধীনবাবুর; একসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে যাই। কলকাতায় কিছুকাল থাকার পর এখানকার পুলিশী কর্তৃত্বের সুন্দর একটা ছবি সে আঁকে *I Spy with my little Eye* পুস্তিকায়— বলা বাহুল্য, সরকারী চাকরি আঁকড়ে সে থাকতে পারে নি এবং সেজন্যই নামমাত্র বেতনে কাজ করতে থাকে রিপন কলেজে। আমার মনে পড়ছে হম্‌ফ্রি এদেশে আসার অল্প পরেই কলকাতায় জওয়াহরলাল নেহরু

আসেন 'নাগরিক স্বাধীনতা' (Civil Liberties) কমিটির সভায়— বৌবাজার স্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান হলে সকালবেলা মিটিং, হম্‌ফ্রিকে আমি পরিচয় করিয়ে দিই শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে, যিনি তখন কমিটির বাংলা শাখার সভাপতি। হম্‌ফ্রি তখনো থাকে সেণ্ট পল্‌স্ হস্টেলে— এবং হেঁটে যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ক্লাস নিতে, আমাদের হেসে বলে রাস্তা ভুল হয় না কারণ যেখানে বড়ো হরফে লেখা আছে 'doctors' bag' (বাস্তবিকই আজও সেখানে ডাক্তারী ব্যাগ বিক্রয় হয়) সেখানে মোড় ঘুরলেই সোজা দেখা যায় প্রেসিডেন্সি কলেজ !

* * *

শরৎবাবুর নামটা আসতেই ভাবছি এবার হাইকোর্ট বার লাইব্রেরি এবং ঐ পাড়ায় আমার বিচরণ সম্বন্ধে কিছু বলতেই হয়। সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্রকে 'বাবু' বলাটা অবশ্যই স্বাভাবিক, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তখন— হয়তো বা আজও— ব্যারিস্টাররা 'members of the English Bar', একটা আলাদা জাতি বিশেষ, যার সাক্ষ্য দিচ্ছে উকিল এবং ব্যারিস্টার এই তফাতের মধ্যে, 'বার লাইব্রেরি' আর 'উকিল লাইব্রেরির' (যেখানে দেশী পরীক্ষায় পাস অ্যাডভোকেটরা বসেন) আলাদা অস্তিত্বে (যদিও সম্প্রতি দেশী অ্যাড্‌ভোকেটদের বার লাইব্রেরির সদস্য হওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে, কতকটা সাহেবী আমলে Bengal Club কিম্বা Calcutta Swimming Club-এ রাজেন মুখার্জি কিম্বা ঐরূপ ব্যক্তির সভ্য হতে পারার মতো)। একটু আধটু বদ্‌লেছে, কিন্তু আজও বার লাইব্রেরীতে 'সাহেব'-রা হাঁক দেন 'বাবু' বলে (শুধু 'বাবু', অমুক্‌-বাবু নয়) এবং ছুটে আসেন কর্মচারীরা, পরিধানে চাপকান, মুখে 'স্যর্' শব্দটি লেগে আছে, প্রায় অবিকল পুরোনো জ্যাক্‌সন্-ল্যাংফর্ড্ জেম্‌স্ -প্রমুখের সময়ের মতোই। বর্তমানে খাঁটি সাহেব বোধ হয় একজনও নেই; আমাদের সময় তখন দেখেছি বার্‌ওয়েল, (যার 'বাবু' আজ 'শংকর' নামে প্রথিতযশা লেখক), পেজ্, অর্মণ্ড, সিড্‌নী আইজ্যাকস্ (প্রাক্তন বড়োলাট রেডিং-য়ের ভাগ্‌নে), প্রভৃতি কয়েকজনকে। কিন্তু আমাদের মনের প্রাক্-স্বাধীনতা অঙ্গার এখনো বোধ হয় দেহে লেগে রয়েছে ; ইংরেজ রাজত্বের 'মহিমা'-ই হল এই খানে। মনে রয়েছে কিছু এই উদ্ভট 'সাহেবিয়ানা'-র কাহিনী। সলিসিটার

অথবা এটর্নীদের সঙ্গে ব্যারিস্টারদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কারণ এক বিনা অপরের পেশা অচল, কিন্তু বিলিতী পরম্পরা অনুযায়ী ব্যারিস্টারেরা জাতে উঁচু— শুনলাম একবার, বিশের দশকে, জাঁদ্রেল এক ভারতীয় ব্যারিস্টারের গায়ে হাত দিয়ে প্রৌঢ় এক এটর্নী কিছু বলায় গম্ভীর আওয়াজে সবাই চম্‌কে ওঠে: 'Will you please remove your paw?' নিজে কানে শুনেছি আরো ঢের বেশি মজার কাহিনী: তিনতলায় 'জুনিয়র' ব্যারিস্টারদের ঘরের দরজায় '—বাবু' সম্বন্ধে খোঁজ করায় উপস্থিত কজন বেয়ারার মধ্যে 'নব্ব', নামে যে ছিল আমাদের সকলের প্রিয়পাত্র, নবাবী আমলের ধরনে যার আদব কায়দা ছিল চোস্ত্, যার দীর্ঘ অভিজাতপ্রতিম আকৃতি দেখে মনে হত এ তো স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রদূত হওয়ার মতো একজন, সে প্রশ্নকর্তাকে হতভম্ব করে দিয়ে বলল 'য়ঁহা বাবু-ফাবু নহীঁ রহতে হ্যয়, কহীয়ে কৌন্ সাহাব্‌কো আপ্ চাহ্‌তেঁ?'

হাইকোর্ট 'বার' তখন প্রকৃতই সমৃদ্ধ; কৃতী ব্যবহারজীবীর সংখ্যা অল্প নয়; 'উকিল লাইব্রেরি' থেকেও যখন নরেন্দ্রকুমার বসু কিম্বা অতুলচন্দ্র গুপ্ত আসেন তখন ব্যারিস্টার সাহেবরাও সমীহ করতে ত্রুটি করেন না। 'অ্যাড্‌-ভোকেট-জেনারেল তখন অশোককুমার রায় (অশীতি-উর্ধ্ব হয়েও জীবিত), 'স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল' সুধাংশুকুমার বসু— উভয়েই আইনজ্ঞানে এবং বিশ্লেষণে নিপুণ। শরৎ বসুর মর্যাদাই অবশ্য ছিল ভিন্ন পর্যায়ের; আদালতেও তিনি সিংহবিক্রমান্বিত, কিন্তু তাঁর অপর রূপ রাজনীতিক্ষেত্রে, জনসভায়, সংগ্রামে, প্রয়োজন হলে বন্দীশালায় বা অবরোধে। তাঁর সংস্পর্শে আমি এসেছি, কিন্তু আদালতের কাজব্যপদেশে নয়— 'devil' অর্থাৎ ব্যবসায়ে শিক্ষা-নবিশ হয়েছিলাম সর্বজনপ্রিয় বি.সি. (বিমলচন্দ্র) ঘোষের কাছে; চন্দ্র-মাধব ঘোষ -পরিবারের এই মানুষটির সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্বন্ধ, সানন্দে আমাকে 'চেম্বারে' কাজ করতে দিলেন, ব্যবহার ছিল একেবারে মধুর, মনটি নরম, 'সেন্টিমেণ্টাল', সত্যই স্নেহশীল— তবে, নিশ্চয়ই আইন ব্যবসা সম্বন্ধে অনীহার ফলে নিজের পসার জমিয়ে তোলার ক্ষমতা আমার কখনো গজাল না। আমার ভগ্নীপতি ফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় এটর্নী হওয়াটা একটু সহায়ক যে হয় নি তা নয়, কিন্তু নিজের সহায় নিজে না হতে পারলে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার ঐ-পেশায় সাফল্য সম্ভব নয় বুঝলাম শীঘ্রই। বিমল

ঘোষ মশায় জানতেন আমি লেখাপড়া খুব করেছি আর ইংরিজীটা নাকি নিদারুণ বলি, কিন্তু মনে আছে, বেশ কিছুকাল পরে, সম্ভবত ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরের প্রথমে হঠাৎ কলকাতায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা আবার লেগে যাওয়ায় বার লাইব্রেরি হলে মস্ত একটা মিলিত সভা হয় যেখানে হঠাৎ কলেজ ফেরত উপস্থিত হয়ে আমাকে বলতে হয়, রেওয়াজ ভেঙে বাংলায় বলি, আর বলার শেষে বি.সি.ঘোষ আমায় বলেন: 'হীরেন, তুমি বলছ আর আমার চোখ যে জলে ভেসে যাচ্ছে!' একেবারে অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে এমন প্রশংসা এত দামী যে তা ভুলতে পারি নি।

বলেছি পেশাটিতে দারুণ প্রতিযোগিতা, তবে লক্ষ্য করলাম এবং কেমন যেন কৌতুক বোধও করলাম যে কাজ পেলে যারা কোনোকালে মন দিয়ে পড়াশোনার ধার ধারে নি তারা আইন কেতাবের মধ্যে মশগুল হয়ে মামলা তৈরি করে, অর্থার্জনের অনুপ্রেরণায় ভোর পাঁচটায় উঠে ব্রীফ পড়ে, নিদারুণ পরিশ্রমে পিছপাও হয় না। এটর্নী মহলে জমাতে হলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 'সিনিয়র'-দের সর্বদা তুষ্ট রাখতে হলে যে-সব গুণাবলী প্রয়োজন, সেগুলো আয়ত্ত করতেও অনেকের তেমন আটকায় না। শক্তিমানের স্তুতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সাবধানে অথচ সোচ্ছ্বাসে নিজের গুণগান করতে পারাও কম কাণ্ড নয়, কিন্তু তার দাম কম নয়— একজন তো প্রায়ই বলত যে রোজ ভোরে উঠে নিজের পায়ের ধুলো নিজের মাথায় দিয়ে ভাববে যে আমি মস্ত একজন ব্যক্তি আর তারপর যেমন বুঝবে তেমন কায়দায় যাদের ওপর নির্ভর তাদের খুশি করে চলবে। দেখলাম আরো এক মজার ব্যাপার যে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসের এমন কোনো পরিচয় যে দেয় না তার আইনগ্রন্থে বোঝাই কাজের ঘরে গণেশমূর্তির অধিষ্ঠান— একাধিক 'সিদ্ধিদাতা'-মূর্তি জড়ো হয়ে রয়েছে দেখে বর্তমানে স্বাধীন ভারতবর্ষের এটর্নী জেনারল, আমার বহুদিনের বিশেষ বন্ধু নীরেন দে-র চেম্বারে একবার বলি যে ফেলে দেব মূর্তিগুলো। তখন হিন্দুধর্মে বা আচারে যার বিশ্বাস নেই, যার প্রথমা স্ত্রী ছিলেন খ্রীস্টান আর দ্বিতীয়া হলেন সুইডীশ (এবং খ্রীস্টান), যে প্রকৃতই সংকীর্ণ অর্থে ধর্মাবেগের ধার ধারে না, সেই নীরেন চঞ্চল হয়ে উঠে আমাকে নিবৃত্ত করে। আমি যে বাস্তবিকই মূর্তিগুলো ফেলতে যাচ্ছিলাম তা নয়; মানুষের মনে সংস্কার কতভাবে কাজ করে তা কিছুটা অনুমান করতে পারি, নিজের সম্বন্ধে কালা-

পাহাড়ী গর্বও রাখি না, তবু মনে আছে ছোট্ট ঘটনাটা। আরো মনে আছে আর-একটা ঘটনা যখন আমাদের একবন্ধু আইনবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করে নামজাদা এবং পসারওয়ালা আইনজীবীদের কাছ থেকে লেখার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ব্যর্থ হতে থাকলেন আর কথা উঠল যে এরা Bracton, Lyttleton, Coke, Blackstone থেকে আজ পর্যন্ত হাজার কেতাব ঘাঁটাঘাঁটি করছে, দেশবিদেশের বিচারকদের রায় উদ্ধৃত করছে, অথচ নিজস্ব একটা কথাও আইনের তত্ত্ব নিয়ে গুছিয়ে বলে না, তখন অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছিলেন: 'আরো, বোঝো না, যে পাখি কখনো গাইল না, তাকে কি গাওয়াতে পারা যায়?'

পেশায় রেষারেষি কতটা তার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা আমার তেমন নেই, কারণ তার মধ্যে ঢোকার আগেই রণে ভঙ্গ দিয়েছি। তবে অনেক মজার কথা শোনা গিয়েছে যার দু-একটা ভুলতে পারি না। ১৯৩৬-৩৭ নাগাদ সময় শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টারদের মধ্যে ছিলেন এস.এন. (শৈলেন্দ্রনাথ) ব্যানার্জি— কেউ যেন এঁকে না গুলিয়ে ফেলেন দ্বিতীয় ঐ-নামধারী শম্ভুনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে যিনি কিছুকাল পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চান্সলর হয়েছিলেন। এস.এন্.ব্যানার্জির একটি আপ্তবাক্য (জজ হলে বলা যেত 'obiter'!) দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেওয়া যায়: এক ছোকরা ব্যারিস্টার গাউনপরিহিত অবস্থায় দু'হাত দুলিয়ে হাইকোর্ট বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ শোনে বাঁড়ুজ্জে সাহেব ডেকে বলছেন, 'আরে, শোনো শোনো, এ জায়গায় দুটো হাত ওভাবে দুলিয়ো না, একটা পিছনে রেখে দাও, কে জানে কে কখন এসে—' বলে চোখ টিপলেন। হাস্যরসে ব্যবহারজীবী সম্প্রদায় কারো কাছে হার মানে না; অশ্লীলতার নালিশকেও তারা তোয়াক্কা করে না। এস.এন.ব্যানার্জি একবার বুঝি আদালতে ফরাসী সাক্ষী এসে হাজির হাওয়ায় গাম্ভীর্যের মুখোসপরা বিচারপতিকে হাসিয়েছিলেন এই বলে: "My Lord, my Knowledge of French extends only to the 'letters'।" পূর্বসূরীদের কথা কিম্বদন্তীর মতো মাঝে মাঝে ঘুরত; কার্মাইকেল যখন বাংলার ছোটো লাট তখন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী একবার গবর্মেণ্ট হাউসে দেখা করে ফেরার পর হাবা-গোবা-ধরনের এক ব্যারিস্টার (দু-একজন অমন সর্বদাই থাকেন) বলে ওঠেন: 'স্যর,স্যর, আপনি যখন গেলেন তখন লাটসাহেব কী করছিল?' তখন

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী একটু একদৃষ্টে তাকিয়ে জবাব দেন: 'খেঁচছিল!' পুরো সাহেবী ধরনে হাসিঠাট্টা আর খিস্তিও প্রচলিত ছিল বিশেষত যেখানে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লু. সি. বনার্জির পুত্র আর.সি বনার্জি বসতেন; খাঁটি ইংরেজ ক'জনকেও তাঁর ইংরিজী এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানতে হ'ত। তবে একেবারে ইংরিজী রসিকতা আমাদের কাছে সত্যই একটু যেন বিজাতীয়। কেউ যেন ভেবে না বসেন যে এই-সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা নিয়ে থাকাটা নেহাত নোংরা ব্যাপার। নোংরা ভাবলেই অবশ্য সেটা নোংরা হতে পারে, কিন্তু বার লাইব্রেরির মতো জায়গায় প্রায় নির্লজ্জভাবে অশ্লীলবাক্য ব্যবহারের মধ্যে একটা সততা আছে— জীবনের বহু ক্লেদ যেখানে নিত্য ধরা পড়ছে, বাস্তবকে অস্বীকার করে যে কপট নীতিসর্বস্বতা, সেখানে তা সত্য নয়—আইনজীবীদের কাছে পরস্পব আলাপে একধরনের অসংযম হয়তো একটা 'Safety-valve'-এর মতো। সমরসেট ম'ম (যাঁর সহোদর ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন) একবার লেখেন যে Old Bailey-তে বিচারকের টেবিলে ফুলেব তোড়া সাজানো থাকে, কিন্তু রাখা উচিত একদিস্তা পায়খানার 'টয়লেট্ পেপার' যাতে মহামহিম বিচারকের মনে থাকে যে তিনিও হলেন তাঁর সামনে অভিযুক্ত লোকগুলির মতোই রক্তমাংসের মানুষ। বার লাইব্রেরিতে মাঝে মাঝে রসিক বাক্‌পটুতায় প্রকৃতই পুলকিত হয়েছি— নিজেকে এবং অপরকে নিয়ে কৌতুক করতে পারাটা নিজের উপর আস্থারই পরিচায়ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে একদিন টেবিলে গল্প হচ্ছিল আগের রাত্রের সিঙ্গাপুর রেডিও থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষণ নিয়ে; তিনি বুঝি বলেছিলেন কলকাতায় বোমা ফেলা সম্বন্ধে, যে কলকাতা শহরের ওপর তাঁর কত মায়া, কলকাতায় প্রতিটি গলিতে তাঁর আপন ভাইবোন বাস করেন —তড়িৎবেগে বলে উঠলেন সুপণ্ডিত অথচ সর্বদা 'ঠোঁটকাটা' ব্যারিস্টার অরুণ সেন: 'What a compliment to his father!'

বার লাইব্রেরিতে দেখলাম 'রমলা'র স্রষ্টা, একদাখ্যাত লেখক মণীন্দ্রলাল বসুকে— অল্প কাজ করলাম সুধীশ রায়, সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত, যতীশচন্দ্র শেঠ, হেমনাথ সান্যাল প্রমুখদের সঙ্গে— অভিজ্ঞতা হল সদামিষ্টভাষী সুধীরঞ্জন দাসের (পরে ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতি) বিরুদ্ধে একটা 'চেম্বার' দরখাস্তে দাঁড়িয়ে 'পত্রপাঠ' হেরে যেতে, বুঝলাম বিচারপতি এ.এন.সেন

(যাঁকে পরে খুব কাছ থেকে জেনেছি এবং এই নিয়ে অনুযোগ করেছি) অপরিচিত 'জুনিয়র'-এর দিকে প্রায় তাকালেনই না! কয়েকটা 'undefended' মামলা (যা জুনিয়ারদের প্রথমজীবনে প্রধান ভরসা) করেছি জজ প্যাংক্রিজ, ম্যাকনেয়র, লর্ট-উইলিয়ম্‌স আর আমীর আলির সাম্‌নে— কচিৎ কদাচিৎ 'মোশন' কিম্বা সাদাসিধে 'স্যুট'-এ 'জুনিয়ারী' করলাম। ম্যাক্‌নেয়রকে একবার দেখলাম May and Baker কোম্পানির মামলায় বৈজ্ঞানিক (জেনারেল) সোখে-কে প্রায় অপমান করতে, যদিও বোম্বাইয়ে Haffkine Institute-এর অধ্যক্ষরূপে তাঁর প্রভূত মর্যাদা। কলেরার ঔষধ সস্তায় বিতরণে বাধা দিচ্ছিল বিদেশী কোম্পানি এবং সোখে এসেছিলেন বিশেষরূপে তাঁর সাক্ষ্য দিতে— বুঝলাম জয়ের আসনে বসে বিদেশী শাসনের শোষণ ব্যবস্থাকে সমর্থন কেমন অবলীলাক্রমে সম্ভব। লর্ট-উইলিয়ামস্ একবার এক নামজাদা ব্যারিস্টারকে সোজাসুজি বললেন, 'Mr··· you are being silly', আর মুখের উপর সমুত্তম জবাব না দিয়ে কৌঁসুলী (সুশিক্ষিত, সুবিদিত এবং পরে রাজনীতি ক্ষেত্রে সফল) বললেন শুধু: 'As your lordship pleases'! আমীর আলির সঙ্গে ক্রমে খুব ভাব জমল। যে-বিষয়ে পরে কিছু বলতে হবে; নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ, এক রবিবার দেখলাম আমাদের পাড়ায় ডাক্তার লেনে সাইকৃলে ঘুরছেন জজ সাহেব, আমায় দেখে বললেন: 'তুমি এখানে?' এটা আমারই পাড়া শুনে জানালেন পুরোনো কলকাতার হদিস্ খুঁজছেন, কিভাবে হুজুরীমল্ লেনে পৌঁছানো যায় জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন অবশ্য স্বাধীনতা আসে নি— লড়াই চলছে, ঢিমেতেতালা, তবে প্রায়ই একটা যেন 'সাজ সাজ' ভাব, ১৯৩৬-৩৯ যুগটার কথা ভাবলেই বোঝা যাবে। বার লাইব্রেরিতে ঠাট্টা শোনা যেত ইংরেজ বাহাদুর এমন শিখিয়েছে যে হাইকোর্টে injunction নিয়ে দেশটাকে বুঝি স্বাধীন করে ফেলা যাবে! আর. সি. বনার্জি বললেন এক ছড়া (limerick): 'He thought he saw a Congrersman / A-Spinning on the wheel; / He looked again and saw it was / A practising *vakeel*; / 'If we should lose Swaraj' he said / We'll win it on appeal!

হাইকোর্ট বাড়ির তিনতলায় 'জুনিয়র' ব্যারিস্টারদের ঘরে তখন বসি।

তখনো সেখান থেকে শঙ্কর ব্যানার্জি (পরে মন্ত্রী, স্পীকার, অ্যাডভোকেট জেনারল) দোতলায় 'প্রোমোশন্' পান নি। সেখানে এক টেবিলে আসর জমায় বাচাওয়াৎ (পরে হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্টের জজ), রণদেব চৌধুরী (সুরেন বাঁড়ুজ্জের দৌহিত্র, রিপন কলেজের কর্তা, বাণিজ্য বিষয়ক মামলায় ধুরন্ধর) আর ফজ্‌লে আকবর (পরে ঢাকা হাইকোর্টের জজ)। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে নীরেন আর তার দাদা (অনেকে ভাবত ছোটো ভাই) ধীরেন দে, পেজ্‌-এর জুনিয়র, ধরনে সাহেবী, কিন্তু নিজের কাছে স্বীকার না করলেও মনেপ্রাণে 'স্বদেশী'; হাসিঠাট্টা করছে কিরণ রায় (পরে হাইকোর্ট জজ, 'অতি-বিপ্লবী' আততায়ীর হাতে যাঁর প্রাণ যায় ১৯৭১ সালে) কিম্বা ধীরেন সাহারায়ের সঙ্গে, যে বীরেশগুহ-অমিয় বসু-নীহারেন্দুর অন্তরঙ্গ বলে ভারতবর্ষে 'বিপ্লবী' সম্বন্ধে মনোহর আপ্তবাক্য সরস তাচ্ছিল্য সহকারে আওড়াতে পারত— একধারে একটু যেন গম্ভীর মনোযোগ নিয়ে আইন ব্যবসাতে নেমেছে প্রশান্তবিহারী মুখার্জি (পরে কলকাতার 'চীফ জাস্টিস্')— হাসির লহর উঠছে যে টেবিলে রয়েছে 'শালপ্রাংশু মহাভুজ'-চেহারা মণি ব্যানার্জি (যার সাহসী চরিত্র শেষ প্রমাণ দিয়ে নির্বাপিত হল ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক গুণ্ডার অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুতে), আর শান্তি রায়চৌধুরী, বনেদী উকিল বাড়িতে জন্ম এবং ব্যারিস্টারীর তক্‌মা চাপিয়ে যার হাস্যরসিক ব্যক্তিত্বের এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল যা নানাবয়সের লোককে আনন্দ বিতরণ করতে পারত: শহুরে এক গ্রাম্য কৌতুকের একটা মিশ্রণ তার মধ্যে ছিল। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে বলে কেউ তাকে ঠাট্টা করলে অম্লানবদনে বলে দিত 'আরে ভাই, ভদ্রলোকের মেয়েকে ঘরে এনেছি, তাকে খালি পেটে রাখি কেমন করে?' বার লাইব্রেরিতে অবশ্য আমার প্রথম পথপ্রদর্শক ছিল মহীন্দ্রলাল ('জজি') মিত্র, অক্সফর্ড থেকে যার সঙ্গে দোস্তী— যার মা (প্রথিতযশা চিকিৎসক মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের বিধবা) আর দিদি (বর্তমানে লণ্ডন প্রবাসী শ্রীমতী এলা রীড্‌ [সেন]) আমাদের আত্মীয় করে নিয়েছিলেন, 'এলা-দি' ক্রমশ তাঁর নিজস্ব ঢঙে আমাদের রাজনৈতিক কাজেও পরোক্ষ সহায় হয়েছিলেন।

বার লাইব্রেরির এই ঘরটিতে পরে এল স্নেহাংশু (দোদো) আচার্য, জ্যোতি বসু, (অতি অল্পকাল) ভূপেশ গুপ্ত, যাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগের হাজার স্মৃতি জলজ্বল করছে। এদের কথা পরে যথাস্থানে বলতে হবে ; এদের সম্পর্কিত কোনো কোনো খবর তো আমাদের আধুনিক ইতিহাসেরই অঙ্গ বলা চলে। এদেরই মোটামুটি সমসাময়িক এল অজিত রায় (পরে হাইকোর্টের জজ এবং সুপ্রাম কোর্টের প্রধান), হামুদুর্ রহমান (পরে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি)। দেবী দে, প্রভাত পাল (দু'জনেরই বিশেষত্ব হল চোস্ত্ ইংরিজী), মুরশেদ (স্বনামধন্য ফজ্লুল হক্ সাহেবের ভাগ্নে), আরো অনেকে। সব নাম করতে পারছি না, করার দরকারও নেই— শুধু ছবিটাকে একটু ভরাট না করে চলে না বলেই উল্লেখ করছি। আমার পরিচয়ের পরিধি এভাবে বেড়ে চলেছিল— যে-কাজ আমাকে সব চেয়ে টেনেছিল, স্বার্থচিন্তার আত্মিক অবসাদ থেকে যে-কাজ আমায় নিস্তার দিয়েছিল, সাংসারিক বিষয়ে ব্যর্থ অথচ একটা যেন গভীর তাৎপর্যে সার্থক জীবনযাত্রার দিকে ঠেলেছিল, সে কাজে তাই বহু বিচিত্র জনের আনুকূল্য এজন্যই আমার পক্ষে সম্ভব। ব্যারিস্টারী পেশার পরিবেশকে শুধু দূর থেকে জানলে আপাতদৃষ্টিতে জমকালো অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে রিক্ত বলেই হয়তো মনে লাগত। তার চাকচিক্য সম্বন্ধে আমার মনে কোনো মোহ নেই, কিন্তু তাকে রিক্ত মনে করতেও আমি পারি না। সেখানেও দেখেছি মৌলিক চিত্তচাঞ্চল্যের বহুবিধ লক্ষণ, দেখেছি ক্ষুদ্রতার সঙ্গে হৃদয়বত্তার সহাবস্থান, মাঝে মাঝে অর্ধ-নাটকীয় চেহারায় দেখেছি ইংরেজ শাসনে বাঙালী শিক্ষিত সমাজের দোটানায় হাবুডুবু-খাওয়া দ্বৈতবিহার। একবার জ্যোতি বসু এবং দোদো আচার্য (যে ছিল আমার সবচেয়ে নিকট বন্ধু) তখনকার বে-আইনী পার্টির কী একটা গোপন কাজে বার লাইব্রেরিকে ব্যবহার করার সময় আমায় বলেছিল যে এই জায়গাটা (অর্থাৎ বার লাইব্রেরি) হবে আমাদের 'Smolny' (পেট্রোগ্রাডে [পরে লেনিনগ্রাদ] যা ছিল স্বয়ং লেনিনের কর্মকেন্দ্র)! আইন ব্যবসাতে যে রেষারেষি তা থেকে প্রতিযোগী কেউ ছাড় পায় না। বলতে হাসি পায়, কিন্তু সেখানকার জীবন একটা 'সংগ্রাম'-ই বটে— কিন্তু এতকাল বাদে পিছনে তাকিয়ে মনে পড়ছে তখনকার প্রায় সর্বপ্রাচীন ব্যারিস্টার এচ্.ডি. (হরিদাস) বসুর সর্বাবস্থায় অপরিম্লান সৌজন্য, অন্য দিকে মনে পড়েছে অরুণ সেনের রসিকতা, যার নোংরামিকে হাসির উজ্জ্বল ছটা বরফে রোদের মতো গলিয়ে দিত : 'জানো

হে, আমরা যখন হিন্দু স্কুলে তখন আমরা ছিলাম 'অল-ইণ্ডিয়া Sodomy কম্পিটিশনে চ্যাম্পিয়ন— পাস করে বেরিয়ে সেটা দিয়ে গেলাম ক্যালকাটা মাদ্রাসাকে!'

১৭

আমার ঘরে এবং বাইরে যে-জীবন তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব গজিয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই, কারণ বে-আইনী কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বাড়ির মনঃপূত ছিল না। কিন্তু এ কথা জোর করেই বলব যে মা-বাবা কখনো বাধা দেন নি— বেশ মনে আছে একবার সদ্যস্থাপিত কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির (যাতে 'গোপন' পার্টির নির্দেশে যোগ দিয়েছিলাম, যেমন দিয়েছিল সজ্জাদ জহীর, আর দক্ষিণে সুন্দরৈয়া, গোপালন, নাম্বুদ্রিপাদ প্রভৃতি) উদ্যোগে এক সভায় আমি হলাম প্রধান বক্তা ; বিষয় ছিল 'মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রাজনৈতিক মতামত' (যাকে খণ্ডন করা ছিল আমার ভার)। এবং বাবা কাগজে খবরটা দেখে শুধু মন্তব্য করেন : 'এ আবার একটা বক্তৃতার বিষয় !' সঙ্গে সঙ্গে বলব যে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন নিয়ে বাঙালী বিদ্বৎসমাজে যেমন ছাড়পত্র পেয়েছিলাম, তেমনই সে কাজে পরোক্ষ সহায়তা কম মেলে নি বাবার সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুরা তাঁদের আলোচনায় আমাকেও সাবালকত্বে প্রতিষ্ঠিত করায়। মাস্টারমশাই ছাড়াও সেখানে আসতেন ইংরেজী জ্ঞানে ধুরন্ধর অধ্যাপক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি অনর্গল কবিতা আবৃত্তি করে চলতেন— আসতেন বহু বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন মৌলিকসাহেব— আসতেন তদানীন্তন ইম্পীরিয়ল লাইব্রেরির কর্মী মণীন্দ্র-লাল ব্যানার্জি (যিনি আশু মুখার্জি-পরিবারের আত্মীয় বলে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত গল্পের জাহাজ ছিলেন)— কচিৎ কদাচিৎ এসেছেন ইম্পীরিয়ল লাইব্রেরির কর্ণধার খান্ বাহাদুর আসাদুল্লাহ্ আর পাবলিক রেকর্ড-এর 'কীপর' (বর্তমানে যা হল ন্যাশনাল আর্কাইভস্) খান্ বাহাদুর আবদুল আলি। মনে পড়ে যাচ্ছে তখনকার গ্রন্থাগারআন্দোলন আজকের চেয়ে অনেক জীবন্ত ছিল ; মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, বিনয় দত্ত প্রভৃতি উৎসাহীদের কথাবার্তা এবং ধরন-ধারণে গ্রন্থব্যাপারে যে-আবেগ দেখতাম তা আজ প্রায় যেন ভাবা যায় না। যাই হোক, বাড়ির বৈঠকখানায় প্রবীণ-সমাগমে কথার পিঠে কথা উঠে Wilfred Owen-এর নাম হয়তো উচ্চারিত হল, পিতা এবং

পিতৃবন্ধুরা শুনে উল্লসিত হলেন : 'The true poet must be truthful'— আর আমি হয়তো আমার ছেলেবেলাকার প্রিয় কবিতা Thomas Moore-এর "Pro Patria Mori" নিয়ে Owen-এর আর্তির কথা তাঁদের জানালাম :

"If in smothering dreams, you too could pace
"Behind the wagon that we flung him in,
"And watch the white eyes writhing in his face,
"His hanging face, like a devil's, sick of sin ;
"If you could hear, at every jolt, the blood
"Come gargling from the froth-corrupted lungs,
"Bitter as the cud
"Of vile, incurable sores on innocent tongues,—
"My friend, you would not tell, with such high zest,
"To children ardent for some desperate glory,
"The old lie : *Dulce et decorum est*
"*Pro patria mori.*"

এটা বিশেষ করে মনে পড়ছে কারণ আমাদের আন্দোলনে তখন যুদ্ধবিরোধ একটা বড়ো জায়গা নিয়ে ছিল— ১লা আগস্ট যুদ্ধবিরোধী দিবস অনুষ্ঠিত হত, সে-বিষয়ে পার্টির পত্রিকা 'গণশক্তি'-তে লিখলাম। অবশ্য আরো লিখলাম, সুরেন গোস্বামীও লিখলেন, অন্যান্য বিষয়ে; মার্কস্-কৃত 'ক্যাপিটাল' মহাগ্রন্থের অল্পাংশ সেখানে আমি অনুবাদ করি। যুদ্ধ সম্পর্কে এই দুশ্চিন্তার মূল কারণ ছিল এই যে তখন ফ্যাশিস্ট সর্পকে দুগ্ধকদলীপুষ্ট করে সোভিয়েট আক্রমণে ব্যবহারের জঘন্য চক্রান্তে ব্রিটেন-ফ্রান্সের মতো 'গণতন্ত্র' অগ্রণী। রমাঁ রলাঁ তাই অবিস্মরণীয় ভাষায় বলেছিলেন যে তাঁর বৃদ্ধ চোখে অশ্রু আর ঝরে না কিন্তু সোভিয়েট ধ্বংসের এই আয়োজন দেখে উচ্চৈঃস্বরে তিনি বলবেন : 'সোভিয়েটকে রক্ষা করবই। নইলে মৃত্যু আসুক!' ই.এম.ফর্স্টার-এর মতো সমাজবাদবিষয়ে অনীহাগ্রস্ত অথচ শুভ চেতনায় স্বচ্ছ লেখক বললেন : 'মনে হয় যে মৃত্যুর মতোই যুদ্ধ আজ অনিবার্য ; কিন্তু মৃত্যু অকাট্য জেনেও শান্তির জন্য প্রয়াসে মুহূর্তের জন্যও বিরত হব না।' ফ্যাশিজম্ -এর অনুরাগী না হয়েও তার বিপক্ষে সর্বতোভাবে যত্নশীল হতে যারা কুণ্ঠিত,

তারা কখনো কখনো প্রবোধ দিতেন এই বলে যে ফ্যাশিস্টরা যুদ্ধের কথা ক্রমাগত বলে, তবে কিনা যে কুকুর খুব চেঁচায় সে তো কামড়ায় না! এর জবাবে তখনকার লীগ অফ্ নেশন্‌স্-এর সভায় সোভিয়েট প্রতিনিধি লিট্‌ভিনভ একবার বলেন: 'হ্যাঁ, প্রবাদটা আপনি-আমি শুনেছি বটে। কিন্তু কুকুরটা জানে কিনা, তাই হল প্রশ্ন!' বাস্তবিকই তখন শান্তি আন্দোলন আজকের রূপান্তরিত পরিস্থিতির তুলনায় সংকীর্ণ হলেও কম্যুনিস্ট উদ্যোগিতার এক প্রধান উপকরণ ছিল। ১৯৩৬ থেকে মাথা-তুলে-দাঁড়ানো ছাত্র আন্দোলনের (যার নেতৃত্ব ছিল মূলত কম্যুনিস্টদের হাতে) পতাকায় লেখা ছিল: 'স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতি'। যুদ্ধবাজদের পরাস্ত করার অর্থই ছিল ফ্যাশিজিম্ সাম্রাজ্যবাদের নববিন্যাসরূপে ইতিহাসে যে কদর্যতা আনছিল তার পরাজয়। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে জওয়াহরলাল নেহরু এ-ব্যাপারটা বুঝতেন; কিন্তু তাঁর সহযোগীদের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে মস্তিষ্কপীড়া সাধারণত সামান্য হওয়ায় সংহত নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণে দেশের প্রধান রাজনৈতিক ধারা পূর্ণ সাফল্য দেখায় নি। তবুও আনন্দের কথা যে লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুর, হরিপুরা প্রভৃতি কংগ্রেস অধিবেশনে মোটের উপর প্রগতিশীল চিন্তাই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে মর্যাদা পেয়েছিল।

কলেজে অধ্যাপনার সূত্র ধরে ছাত্র-আন্দোলনে আমায় নিযুক্ত করতে পার্টির পক্ষ থেকে সুবিধা হয়েছিল। হাওড়া শিবপুর অঞ্চল থেকে রিপন কলেজে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রভূত; বোধ করি সমর মুখার্জীর মতো কিছু পুরোনো কমরেডকে বাদ দিলে হাওড়া জেলার পার্টি নেতৃত্বে রিপনে-পড়া ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রচুর। হাওড়া শিবপুর এলাকায় যে কত ক্লাব, পাঠাগার, সমিতি, ব্যায়ামশালার সভায় তখন গিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই; তখন সমসাময়িক কংগ্রেস নেতারাও অনেকে কিছুটা খোলা মনে আমার মুখে সাম্যবাদের কথা শুনতেন— কারণ বাস্তবিকই আমাদের কাছে তখন (এবং এখনো) 'কানু বিনা গীত নাই', সর্ববিষয়কেই একসূত্রে গ্রথিত করার অন্তর্নিহিত শক্তি নিয়ে মার্ক্‌স্‌বাদী জীবনদর্শন তখন আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। গঙ্গার দুধারে বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্তদের এলাকাও ছাত্র, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের মারফতে প্রায় চষে ফেলা গিয়েছিল; তা ছাড়া বকলমে নয়, প্রকাশ্যেও তৎকালীন বাম রাজনীতি নিয়ে অজস্র বক্তৃতা করে

বেড়িয়েছি, কংগ্রেস-সোশালিস্ট পার্টির তরফ থেকে অন্তত একটা মঞ্চে আমার স্থান ছিল। দিন-তারিখের হিসাব সঙ্গে নেই, কিন্তু '৩৬ সালে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'কংগ্রেস সোশালিস্ট' সাপ্তাহিকে রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গে আমার বিতর্ক হয়, তখনকার 'মস্কো বিচার' সম্পর্কে— লোহিয়া সোভিয়েটের নিন্দা করে লেখেন আর আমি বিপ্লবের স্বার্থেই কঠোরতা অবলম্বনের অনিবার্যতা সম্বন্ধে যুক্তি হাজির করি, জগৎজোড়া দুষমনীর মোকাবিলায় সোভিয়েটকে অকুণ্ঠে সমর্থনের বিপ্লবী দায়িত্বের কথা বলি। এই লেখাটায় বুঝি বোম্বাইয়ে একটু সাড়া জাগে— পি. সি. জোশীর কাছে পরে শুনেছি, অনেকের তখন ঔৎসুক্য আমি লোকটা কে, আর জোশী স্বয়ং দারুণ খুশি, আমায় লিখেই বসল সেই রচনার 'ease and grace'-কে অভিনন্দন জানিয়ে। বাংলায় কংগ্রেস-সোশালিস্ট মহলে অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম— আমি কম্যুনিস্ট, সুতরাং তাদের অনেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি না হলেও কেমন যেন আমার সম্বন্ধে তাদের মেজাজ মোটের ওপর শরীফ থাকত। শিবনাথ ব্যানার্জি, গুণদা মজুমদার প্রভৃতির কাছে অপ্রিয় ব্যবহার কখনো পাই নি, গুণদাবাবু জয়প্রকাশ নারায়ণকে আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। গ্রন্থপ্রেমী য়ুসুফ্ মেহর্ আলির সঙ্গে একটু প্রায় হৃদ্যতা হয়েছিল; তবে লোহিয়া বোধ হয় কখনো 'মস্কো বিচার' বিষয়ে আমার রচনাকে মার্জনা করতে পারেন নি। আবার বলছি সন-তারিখের খুঁটিনাটি খবর মনে নেই, ১৯৩৭-এ বাংলা কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির যুগ্মসম্পাদক চারজন হলেন, শিবনাথ ব্যানার্জি, গুণদা মজুমদার, নৃপেন চক্রবর্তী এবং আমি (শেষোক্ত দুজনের কম্যুনিস্ট পরিচিতি জানা থাকা সত্ত্বেও)। অবশ্য জানতাম উত্তরপ্রদেশে (তখনকার যুক্তপ্রদেশ) সজ্জাদ জহীর, জৈন আহ্‌মদ্ প্রভৃতি আমাদেরই পার্টিভুক্ত, কিন্তু একটু আশ্চর্য হলাম আবিষ্কার করে যে গুজরাটের অজাতশত্রু বামপন্থী নেতা দিনকর মেহ্‌তা (আজ তিনি 'মার্ক্‌স্‌বাদী' কম্যুনিস্ট পার্টিতে কিন্তু ভেদপন্থায় অবিশ্বাসী) তখনই কম্যুনিস্ট, যদিও সম্ভবত কংগ্রেস-সোশালিস্ট মাতব্বররা সে কথা স্পষ্টভাবে জানতেন না। সি.এস্.পি.-তে কাজ করার সময় একটা ঠিকানায় যাতায়াত নিয়মিত এবং ঘনঘন ছিল, এটা হল ১৮নং মির্জাপুর স্ট্রীট, যে বাড়িটার চেহারা এখন বদলেছে, এমন ঘিঞ্জি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তার পুরোনো সত্তা চাপা পড়ে

আর হাঁফ ফেলতে পায় না। (কিছুদিন পুরোনো বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থিতিও তাকে যেন বাঁচাতে পারে নি)।

ছাত্র-আন্দোলনের টানে হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার নানাস্থানে ঘুরলাম— দেখলাম লেখক অথচ অক্লান্ত কর্মী মনোরঞ্জন হাজরার মতো লোককে, কয়েকবার সঙ্গে ঘুরলেন তখন উদীয়মান কবি জসীমউদ্দীন (আজ বাংলাদেশে যাঁর অধিষ্ঠান এবং, সুদূরবিস্তারী কবি-খ্যাতি), আর আবদুল কাদির (মুজফ্‌ফর আহমদ্‌-এর জামাতা)। বর্ধমানে সুরসিক আবুল হায়াতের সঙ্গে পরিচয় হল, সি.এস.পি.র কার্যকরী সভায় সে পরিচয় পুষ্ট হতে থাকল, তার অনাবিল আলাপচারিতা যে জলন্ত দেশপ্রেমকে আচ্ছাদন করে রাখত তা বুঝলাম, কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তাঁর প্রাণের টান দেখতে পেলাম। বর্ধমানেই প্রথম দেখলাম কমরেড আবদুল্লাহ্‌ রসুল-এর মতো বিরল মানুষকে— হ্রস্বদেহ, পরিচ্ছন্ন, মার্জিতচিত্ত, সমুদার— কিষাণ আন্দোলনের তিনি নেতৃত্ব করেছেন বহুকাল, আজ অধিষ্ঠিত রয়েছেন মার্কস্‌বাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পরিচালনায়। ভেদপ্রবণ রাজনীতির দুষ্টচক্রে এর মতো ব্যক্তি কেমন ভাবে আটকে আজ আছেন জানি না, কিন্তু জীবনই তো জটিল, তার অর্থভেদ করবে কে? যাই হোক, ছাত্র-আন্দোলনে ক্রমশ গেলাম অবিভক্ত বাংলার অধিকাংশ জেলায়— ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি নানা অঞ্চলে যেতে হল। ছাত্রনেতাদের মধ্যে প্রধান তখন তরুণ বিশ্বনাথ মুখার্জি; নতুন দিনের বারতা মার্কস্‌বাদের মধ্যে শুনতে পেয়ে সেরা ছাত্রেরা তখন এদিকে ঝুঁকছে, অনেকে সাংসারিক সম্ভাবনাকে হেলায় ঠেলে ফেলে রাজনীতির ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—দেখলাম তাদের মধ্যে অমিয় দাশগুপ্তকে, বরিশালে শুনলাম যে সে হল সেখানকার এক ছোটোখাটো গান্ধী-বিশেষ, এমনই তার চরিত্র খ্যাতি! বিশ্বনাথের একাগ্রতা, নিপুণ সংগঠন ক্ষমতা এবং ক্লান্তিহীন ভাষণ-শক্তি তাকে এক বিশিষ্ট মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কম্যুনিস্ট আন্দোলনে প্রধান প্রকাশ্য প্রবক্তা তখন বাংলার সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন; লেখকসংঘ সে-তুলনায় কুণ্ঠিত, সীমাবদ্ধ, কিছুটা অস্পষ্ট, জনসম্পর্ক ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। মজুর আন্দোলনই অবশ্য কম্যুনিস্ট কার্যক্রমের জীয়নকাঠি; ধীরে জায়মান কৃষক আন্দোলনকে বাহুতে তুলে নিয়ে সব্যসাচী রূপে জাতীয় মঞ্চে আবির্ভাব

তার ঐতিহাসিক ভূমিকা। কিন্তু সেই কঠোর, কঠিন, সমস্যাসংকুল দিনে ছাত্র-আন্দোলনের কাছে ভারতীয় কম্যুনিজম্-এর ঋণ হল বিপুল।

দেশের স্বাধীনতার জন্য আকুলতাই অবশ্য তখন সব-কিছু ছাপিয়ে তরুণ মনকে সংগ্রামের আবর্তে টানছিল। ১৯৩৬-৩৭-৩৮ সালে প্রচণ্ড আলোড়ন চলেছিল রাজবন্দীদের মুক্তি আন্দোলনকে উপলক্ষ করে। অগণিত দেশভক্তের স্মৃতিপূত আন্দামান বন্দীশালার দিকে তখন যেন দেশের দৃষ্টি বাঁধা ছিল; রাজনৈতিক বন্দীদের সেখানে যে অবস্থায় রাখা হত তার বিরুদ্ধে ভারত-বাসী শৃংখলিত হয়েও গর্জে উঠেছিল—সম্ভবত ১৯৩৩-৩৪ সালে ভগৎ সিংহের সহকারী মহাবীর সিং আর মোহিত মৈত্র প্রভৃতি অনশনরত বন্দীকে জোর করে খাওয়াতে গিয়ে মেরে ফেলার খবরে সারাদেশ উত্তেজিত। রাজবন্দীর অধিকার সাব্যস্ত করতে যে কী কঠোর লড়াই আগেকার দেশভক্তদের করতে হয়েছিল, তা মনে রাখলে আজকের স্বাধীন ভারতে 'উগ্রবিপ্লবী' অপরাধে কারারুদ্ধ অগণিত তরুণের প্রতি যে অমানুষিকতার সংবাদ আসে তাকে সহ্য না করার প্রতিজ্ঞা হয়তো নিতে পারতাম, কিন্তু সে-সব ঘটনা এখন যেন বিস্মৃত। এটা যখন লিখছি, তখন খবর পেলাম অশীতি-অতিক্রান্ত কমরেড সতীশ পাকড়াশীর মৃত্যু হয়েছে, বয়ঃক্রমের প্রায় অর্ধাংশ যাঁর কেটেছিল কারাগারে কিম্বা গোপন বিপ্লবী জীবনে, আন্দামানেও যিনি বহুকাল ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে আমার পূর্বোল্লিখিত বন্ধু কমরেড নিরঞ্জন সেনগুপ্তের কথা, যিনি আন্দামানে ত্রিশের দশকে বন্দী ছিলেন, বহু সংগ্রামে সেখানে লিপ্ত হয়েছিলেন, সুদীর্ঘ প্রায়োপবেশন বিষয়ে যাঁর গল্প শোনার জন্য ১৯৪৫ সালে সিমলা সম্মেলনে সারা দেশের হোমরাচোমরা-রাও ব্যস্ত হতেন। যাই হোক, আন্দামান দ্বীপ অতি মনোরম স্থান, সেখানে কারাবাস ভারতভূমিতে জেলখাটার তুলনায় ঢের বেশি আরামদায়ক ইত্যাদি কুযুক্তি শোনাবার পর সরকার বাধ্য হল কিছুটা নতিস্বীকার করতে, যখন ১৯৩৭ সাল জুড়ে চলল বিপুল আন্দোলন, এবং শুধু আন্দামানে নয়, সঙ্গে সঙ্গে সহানু-ভূতিসূচক অনশন শুরু হল দেউলি, হিজলী, বহরমপুর, দমদম, আলিপুর, বক্সা প্রভৃতি জেলে। রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীজী ব্যাকুল হয়ে কর্তৃপক্ষকে তিরস্কার করলেন, আর গোটা দেশে শ্রমিক থেকে ছাত্র সবাই মিলে চালাল ব্যাপক অভিযান। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ফেলে বা ভেঙে দেওয়ার যে

অস্থির মনোবিকার কারো কারো সম্প্রতি এসেছিল, তারা হয়তো জানে না সে-সব দিনের কথা, জানে না কেন ১৯৩১ সালে কবি নিজেকে করেন 'প্রশ্ন', কেন ১৯৩৭-এ আন্দামানে সন্ত্রাসবাদে অভিযুক্ত রাজবন্দীদের লড়াই তাঁকে লেখায় :

'মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে, মৃত্যু তারেই টানে,
'মৃত্যু যারা বুক পেতে নেয়, বাঁচতে তারাই জানে।'

কল্পলোকে অধিষ্ঠানসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কখনো এই মর্ত্যের বাস্তব থেকে সংস্পর্শমুক্ত থাকতেন না ; তাঁরই কণ্ঠে তাই তো শুনেছি কালজয়ী ধ্বনি : 'পিনাকেতে লাগে টঙ্কার/বসুন্ধরার পঞ্জরতলে/কম্পন ওঠে শঙ্কার' !

১৯৩৭-৩৮ সালে আন্দামান থেকে কয়েকশো রাজবন্দীর ভারত-প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজনীতির নতুন মোড় ঘোরার সম্ভাবনা দেখা দিল। শ্রমিক-কৃষক সংগঠনে গুণগত রূপান্তরের সময় তখন যেন এসেছিল। ত্রিশের দশকের পূর্বেই চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতীলাল নেহরু, জওয়াহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছেন, কিন্তু তা হল যেন কতকটা পোষাকী ব্যাপার, দেশের জাঁদরেল নেতাকে সম্মেলনের সিংহাসনে বসানো ছাড়া তাৎপর্য খুব বেশি ছিল না। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৯৩৬) জওয়াহরলাল শ্রমিক ও কৃষকসংগঠন সমূহকে কংগ্রেসের সঙ্গে 'সমবেতভাবে সংযুক্ত' (collective affiliation) করার কথা বলেন, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনে মেহনতী মানুষের ন্যায্য স্থানে প্রতিষ্ঠা তখনো বাক্য মাত্র, কার্যে তার লক্ষণ প্রায় নেই। ত্রিশের দশকের মধ্য ভাগে সারা ভারত কিষাণ আন্দোলন পত্তনের মধ্য দিয়ে বোঝা গেল তখনকার প্রধান জাতীয় সংস্থা কংগ্রেসের দুর্বলতা—প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষিজীবী কৃষকের ভূমিকা কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরও যে স্পষ্ট ও শক্তিশালী হতে পারে নি তা থেকেই এদেশের জনসংগ্রামের মূলগত দৌর্বল্য সূচিত। বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর প্রজাস্বত্ব বিধি সংশোধনে কংগ্রেসের কৃষকবিরোধিতা কটু হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইতিমধ্যে কংগ্রেসী প্রভাব থেকে দূরাবস্থিত কৃষক (যাদের অধিকাংশ মুসলমান) ত্রিশের দশকে বিচিত্রচরিত্র নেতা ফজলুল হক্ সাহেবের শাসনে অল্প একটু নিষ্কৃতি পায়, ঋণভারে সামান্য লাঘবসাধনের চেষ্টা হয়। সম্পন্ন বাঙালী ঠাট্টা করে বলে হক্ সাহেব বানিয়েছেন 'BAD' Act ('Bengal Agricultural

Debtors Act)। যাই হোক, আগেই বলেছি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস শামিয়ানায় স্বামী সহজানন্দের নেতৃত্বে কিষাণ সভা গঠিত হল— কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাঁর চলেছিল 'love-hate' সম্পর্ক, তবে ভালো দিকটাই তাঁর সম্বন্ধে স্মরণ করব। (সম্প্রতি চন্দননগরের জনপ্রিয় নেতা, পার্টির আদিযুগে একজন প্রধান, কিছুকাল পার্লামেন্টে আমার সহকর্মী তুষার চট্টোপাধ্যায় মনে পাড়িয়ে দিয়েছেন "প্রকৃতিগতভাবে শান্ত ও নিরুপদ্রব" স্বামী সহজানন্দ আওয়াজ তুলেছিলেন : "মালগুজারী কৈসে লেও গে, ডাণ্ডা হমারা জিন্দাবাদ !")। বিহারে এই সহজানন্দী সুরেই গ্রামীণ কবি চল্লিশের দশক শুরু হওয়ার সময় গেয়েছেন : "কেকৃরা কেকৃরা নাম বাতাও/ইস্ জগ্‌মে বড়া লুটেরোয়া হো/ মালিক লুটে মহাজন লুটে/অওর লুটে সরকারোয়া হো !"

শ্রমিক আন্দোলনেই অবশ্য মেহনতী জনতার শক্তিসূত্র, এবং সেখানে তখনো কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ তেমন দেখা যায় নি। শুধু দেখা গেছে অবশ্যম্ভাবী সামাজিক প্রভাবে কম্যুনিস্ট কর্তৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চলে যাওয়ার সম্ভাবনাকে রুখে দেবার জন্য 'সোশালিজ্‌ম্‌-এর নাম করে অনেকের এগিয়ে আসা— এঁরা অভিপ্রায়ের দিক থেকে যে অসৎ তা বলা বিন্দুমাত্র আমার উদ্দেশ্য নয়, হয়তো তাঁদের কাছে স্বচ্ছ ও সহজগ্রাহ্য যুক্তিও ছিল, কিন্তু বাস্তবে তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনকে শুধু বিভক্ত নয়, বেশ কতকটা পথভ্রষ্ট করে রাখতে পারলেন। শিবনাথ ব্যানার্জির মতো ব্যক্তি সোভিয়েট ব্যবস্থা বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কম্যুনিজ্‌ম্‌-বিরোধিতাকেই অবলম্বন করেছিলেন; সঙ্গে যোগ দিলেন পুরোনো গান্ধীপন্থী, 'অভয় আশ্রম' ইত্যাদি গান্ধীঘাটে জল-খাওয়া, ডাক্তার সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শ্রদ্ধেয় নেতা— এই দ্বিতীয়োক্তের সঙ্গে আমার একটু যেন হৃদ্যতা ঘটেছিল যদিও জানতাম তিনি কম্যুনিস্ট বলে আমার সম্বন্ধে সন্দেহও পোষণ করেন (শিবনাথবাবু আরো প্রখর রাজনীতিবিদ্ বলে বোধ হয় দূরত্বটা একটু বেশি করেই রাখতেন, আপাতসৌজন্যে অবশ্য লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটিয়ে!)। তা ছাড়া, তখন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের মতো 'সর্বহারা'-নেতাও ছিলেন, যাঁরা সম্ভবত কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিকট সম্পর্ক এককালে রাখার ফলেই কেমন যেন উদ্ভটভাবে এবং প্রায়ই অপ্রকাশ্যে অথচ গভীর পদ্ধতিতে, কম্যুনিস্ট কর্মনীতির বিপরীত ঢঙে চলতেন।

অবশ্য ১৯৩৭-এর পর পর্যন্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সঙ্গে পার্টি বন্ধুভাবে চলার প্রাণপণ চেষ্টা করে। মনে আছে হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) সদা-সক্রিয়, এবং সভায় বক্তৃতা দেবার সুযোগ হরণে সুদক্ষ, নীহারেন্দু নিজেকে জাহির করে চলেছেন, আর আমাদের বঙ্কিমবাবু (মুখার্জি) 'গদাইলস্কর' চালে চলাফেরা করছেন, সভাপতি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পুরোনো সামীপ্যের কোনো সদ্ব্যবহার করছেন না, সভাস্থলে উপস্থিত হতে বিলম্ব করছেন, বক্তৃতা দিতে পেলে অবশ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করছেন কিন্তু সেজন্য সচেষ্ট থাকার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছেন না—আমাদের মতো 'ডেলিগেট' নয়, কিন্তু হরিপুরায় উপস্থিত পার্টি-সেক্রেটারি জোশী একবার খেদ করে বলল যে এই বঙ্কিম আর নীহারেন্দুর মধ্যে একটা অদলবদল যদি করে নিতে পারতাম (তখনই নীহারেন্দুর আমাদের মধ্যে অবস্থিতি সংশয়ের বিষয়)! বঙ্কিমবাবুর কথা বলতে গেলে তো ফুরোবে না। সময় ও সাধ্য হলে তার কিছু বলব, কিন্তু দোষেগুণে মিলে অমন প্রতিভাধর কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বেশি দেখি নি—দুঃখের বিষয়, কিন্তু কেন জানি না, পার্টি বঙ্কিমবাবুকে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেয় নি বলে আমার ধারণা, বেজওয়াদা পার্টি কংগ্রেসের (১৯৬১) আগে বোধ হয় তাঁকে 'জাতীয় পরিষদে'ও নেয় নি।

তবে তখনো বামপন্থী সংহতি সুগঠিত না হলেও একেবারে বিভেদ-বিড়ম্বিত হয় নি। ১৯৩৭ সালে নতুন আইন অনুযায়ী নির্বাচন যখন হল, তখন শ্রমিকদের সংরক্ষিত আসন থেকে কম্যুনিস্ট-সোশালিস্টরাই জয়লাভ করলেন। বঙ্কিম মুখার্জি, নীহারেন্দু, শিবনাথ ব্যানার্জি আইনসভায় বসলেন সুদীর্ঘ অথচ প্রাঞ্জল, মাঝে মাঝে মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করতেন বঙ্কিমবাবু; বাঙালীর পক্ষে বিপুল কলেবর, সুকণ্ঠ অথচ প্রয়োজনে গর্জনক্ষম, মানুষটি যখন উত্তেজনায় পাঞ্জাবীর আস্তিন্ গুটিয়ে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতেন, তখন শ্রোতারা বাহবা দিয়ে উঠত, শ্রমজীবীদের অন্তরের কথা তিনি যেন টেনে আনতে পারতেন, কিছুক্ষণের জন্য মাতিয়ে তুলতেন—যার পর থাকত সংগঠনের কাজ, যে-কাজে যোগ্য এবং পরিশ্রমী কর্মীর বোধ হয় নিয়তই আমাদের অভাব থেকে গেছে। শ্রমিক আন্দোলনে ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, রাধারমণ মিত্র প্রভৃতি বহু কাহিনীর নায়কদের সম্বন্ধে

কী করে সাজিয়ে কিছু বলি? হয়তো সুযোগ পাব কিছু পরে, এ-ধরনের নমস্য মানুষ সম্বন্ধে আমার মনের প্রতিক্রিয়া জানাতে।

একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল ১৯৩৬ সালের মে-দিবসে ময়দান সভায় উপস্থিত থাকার সময়। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানে কিছুক্ষণ পাশে মঞ্চস্থ নেতাদের সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটা মন্তব্য করলেন এক সুবেশ ভদ্রলোক, এবং খানিকবাদে আমায় বললেন: 'আপনার সঙ্গে সামান্য একটু কথা ছিল। যদি অনুমতি দেন তো বাড়িতে একবার দেখা করব'। ব্যাপারটা না বুঝে অথচ ভদ্রতার খাতিরে, রাজী হলাম, এবং তিনি নির্দিষ্ট সময়ে এলেন। প্রথমে কিছু অবান্তর আলাপের পর বুঝলাম তিনি চাইছেন আমাকে পুলিশের 'স্পাই' বানাতে! মস্ত এক ভদ্র ভণিতা ফেঁদে বললেন যে দেশের আর বিদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমার মতো মানুষ অনেক লেখাপড়া করে থাকেন, আর সরকারের পক্ষেও প্রয়োজন পরিস্থিতির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারা, সুতরাং যদি আমি মাঝে মাঝে আমার 'পরিস্থিতি-বিচার' জানাই তা হলে বড়ো ভালো হয়। একটু রুষ্ট হয়ে যখন বললাম যে মশায় আপনি আমাকে 'স্পাই' হতে বলছেন কোন্ সাহসে, তখন প্রায় জিভ কেটে ভদ্রলোক বলেন, 'না, না, স্যর্, ও-কথা ভাববেন না, এটা তো 'অ্যাকা-ডেমিক' কাজ, আমরা যে শিখতে চাই…'। আবার বাধা দিতে বললেন যে কংগ্রেসের কোনো কোনো নেতা এ-ধরনের কাজে কুণ্ঠিত নন্ (একটি নাম করলেন, তখনকার প্রখ্যাত নাম, কিন্তু এটা মিথ্যা হতে পারে সন্দেহে উল্লেখ করছি না), এবং— মারাত্মক উদ্দেশ্য ফাঁক করে দিয়ে— আমাকে লোভ দেখালেন এই বলে: 'দেখুন, স্যর্, আপনি সদ্য ব্যারিস্টারী করছেন; যদি এ কাজটি করেন তো পারিশ্রমিক বাদে সরকার পক্ষ থেকে 'স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল'-কে বলে দেওয়া হবে, কিছু মামলা আপনার বাঁধা থাকবে, রোজ-গার আর পেশায় অগ্রগতি স্থির হয়ে যাবে।' ততক্ষণে আমার ধৈর্যচ্যুতি সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল, ভদ্রলোককে চলে যেতে বললাম— কিন্তু ভাবলে আজও খেদ হয়, কোন্ অদ্ভুত সৌজন্যপ্রবণতার ফলে রাগে ফেটে পড়ে সেই ভদ্রবেশী গোয়েন্দার গায়ে হাত দিতে উঠি নি। এটা বোধ হয় চরিত্রেরই দোষ; ক্রোধেও মাঝে মাঝে উন্মত্ত হওয়া উচিত; ঔদাসীন্য সমুচিত নয়। একেবারেই তুলনার কথা ভাবছি না, কিন্তু এরই সঙ্গে মনে পড়ছে ১৯৩৭-৩৮

সালে হাইকোর্ট ফেরৎ 'ওয়েলস্‌লি'-র ট্রামে পকেট থেকে শান্তিনিকেতনী চামড়ার 'পার্স্‌' চুরি করল একটা লোক, কিন্তু চীৎকার করে বাধা দিতে পারলাম না, বুঝলাম হাত-সাফাইয়ের স্পর্শ, কিন্তু বহুজন সমক্ষে তা নিয়ে চেঁচিয়ে উঠবার মতো তাৎক্ষণিক সংগতি মনের ছিল না। বোধ হয় বাঙালী সমাজের যে-স্তরে এবং যে-ধরনে আমার লালনপালন, তাতে কিছু পরিমাণে শরীর ও মনের পঙ্গুতা ও সংকোচ আমাদের মতো ব্যক্তিকে অধিকার করে থাকে।

* * *

বার লাইব্রেরিতে হঠাৎ একদিন নীরেন দে টেনে নিয়ে গেল রাইটার্স বিল্‌ডিং-এ, সাক্ষী হতে হবে তার বিবাহে— 'কনে' ছিল নির্মলা ঘোষাল, যার সঙ্গে নীরেন 'প্রেম করছে' জানতাম— রেজিস্ট্রারের ঘরে ধীরেন দে আর আমি হাজির হলাম। বউ খ্রীষ্টান বলে নীরেনের মা-বাবা প্রথমে ক্ষুণ্ণ ছিলেন, পরে অবশ্য মানিয়ে নেন, তবে নীরেনের মা নাকি খুশি হয়েছিলেন আমি সাক্ষী হওয়ায়, কারণ তাঁর বিলাত-প্রবাসী বড়ো ছেলের নামও হল 'হীরেন'! বিয়ের খবরটা গোপন রাখতে তখন নীরেন চেয়েছিল, তাই কারো কাছে ফাঁস করে দেব না জেনে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। নির্মলা ছিল খুব হাসিখুশি 'চন্‌মনে' মেয়ে; রেজিস্ট্রারের সামনেই ঠাট্টা করে উঠল: 'দেখুন, এই দুই সাক্ষীই আমাকে চুমু খাবার সাহস পাচ্ছে না!' তাদের পরস্পরের মধ্যে পরে মনোমালিন্যের সময় দু-একবার আমায় মধ্যস্থ হতে হয়েছে! কিন্তু বেশ কিছুকাল সুখে থাকার পর তাদের ছাড়াছাড়ি হয়। নীরেনের দ্বিতীয় স্ত্রী সুইডেন-এর মেয়ে; কলকাতা এবং বর্তমানে দিল্লীতে (যেখানে নীরেনকে থাকতে হয় কারণ সে আজ দেশের 'এটর্নী জেনারেল') তার সঙ্গে দেখা মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু নির্মলার খবর জানি না। একটু মনে খচ্‌খচ্‌ও করে। নীরেন অবশ্য আজ মস্ত ব্যারিস্টার; সবাই ভাবে প্রচণ্ড 'সাহেব', বাড়িতে রাখে বাঘের মতো দেখতে একটা কুকুর! কিন্তু তার ভিতরটা 'স্বদেশী', কতকটা যেন দেশের ওপর অকারণ অভিমান করে সরে-থাকা জীবনযাপনের অভিশাপে সে ভোগে! তার দাদা ধীরেনের অকালমৃত্যু বন্ধুদের বেদনা দিয়েছিল খুব; সে-ও ছিল একক, কিছুকাল সমর বিভাগে কাজ করে যেন কতকটা একদৃষ্টি, কারো 'সাতে-পাঁচে' না থেকে

নিঃসঙ্গ, সত্যসন্ধ জীবন যাপন করে গেছে বার লাইব্রেরিতে জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও।

হাইকোর্টে নীরেন-দের টেবিলে (যখন তারে পশার বাড়ে নি) মাঝে মাঝে 'word-making' খেলা চলত, সামান্য পয়সা তার ফলে জড়ো এবং চায়ের 'অর্ডার' হত— আমার সঙ্গে হয়তো রাজনীতি বিষয়ে কথা কিছু হল, নীরেন বলত তোমাদের এই নতুন ধরনের 'কোরস্' গানগুলো খুব ভালো, আমাদের দেশে প্রচারে গানের মতো জিনিস নেই। শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মামলা লড়ার ব্যবসায়ে নীরেন তখন প্রায়ই সাহায্য করত, কমরেড আবদুল মোমিনকে নিয়ে হয়তো আমি সে বিষয়ে 'issue'-গুলো বুঝিয়েছি, একবার চট্‌পট্ লিখে ফেললাম একটা 'thesis' ধরনের জিনিস, যার ভিত্তিতে 'লেবর ট্রাইব্যুনল্' ও আদালতে মৌলিক কতকগুলো যুক্তি খাড়া করা যায়, আইন ও সমাজ বিবর্তনের সম্পর্কটাও তুলে ধরা যায়। পেশায় সফল ব্যক্তিরা অবশ্য সচরাচর কারো কাছে ঋণ স্বীকারে অনিচ্ছুক হয়ে থাকে, তবে নীরেন সম্ভবত কথাটা মনে রাখবে। সে ক্রিকেটে দক্ষ এবং আগ্রহী বলে ঐ ব্যাপারেও অনেক আলোচনা হত— পরে ঈড্‌ন্ গার্ড্‌ন্‌স্-এ 'ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব' গঠন সম্পর্কে আমাদের অনেক চিন্তার আদানপ্রদান ঘটেছিল। হাইকোর্টের উকিল-ব্যরিস্টারদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ করে একটা 'Legal Aid Society' খাড়া করা নিয়েও চেষ্টার কথা মনে পড়ছে : অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি সুবিদিত ব্যক্তি তাতে যোগ দেন। বামপন্থার দিকে একটা আকর্ষণ নীরেনের ছিল, কিন্তু পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে তার স্ফুরণ কখনো হয় নি। তবে ভুলতে পারি না যে একবার (বেশ কিছু বৎসর পরে) পুলিশের চোখে ধাঁধা দিয়ে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় আবদুল মোমিন্ তার বাড়িতে কদিনের আশ্রয় প্রায় ; একটু বিপদের ঝুঁকি নিয়েই নীরেন তাকে রেখেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মোমিন-এর ব্যবহার সত্যই এমন সৌজন্যপূর্ণ ছিল যে 'বুর্জোয়া' মালিক পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছে দেখেছি! তবে নীরেনের মনের গহনে বামপন্থা বিষয়ে অনুরাগ না থাকলে সে ওভাবে সাহায্য করতে পারত না। 'এটর্নী জেনারেল' হয়ে অবশ্য সে নিজের মধ্যে নিজেকে বেশ লুকিয়ে রাখে, আত্মপ্রসাদও সম্ভবত পায়, কিন্তু আশা করা অসমীচীন নয় যে দেশের

প্রয়োজনে আইনের রূপান্তর সাধনের প্রচেষ্টায় সে সহায়ক হতে হয়তো পারবে।

বার লাইব্রেরির টেবিলে, নানা গল্পগুজবের মধ্যেই, লিখে যাওয়া আমার অভ্যাস ছিল। মনে আছে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মহাজনের স্বাক্ষরিত যে-বিবৃতিতে সোভিয়েটের স্বপক্ষে এবং ফ্যাশিজ্‌ম্‌-এর ধিক্কারে কতকগুলি মন্তব্য ১৯৩৬ সালে প্রচারিত হয়, তার খসড়া তৈরি করলাম বার লাইব্রেরিতে। সুরেন গোস্বামীও মাঝে মাঝে 'সংরক্ষিত' স্থানে আসতেন ; দু-একবার কবি বিষ্ণু দে এসেছিলেন। অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিছু পরে স্টালিন-কৃত 'সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস' অনুবাদ করেছিলাম— কলেজ এবং বার লাইব্রেরি উভয় স্থানই ছিল আমার লিখে যাওয়ার প্রকৃষ্ট জায়গা। বহুশত পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার পর অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার যে 'বাহবা' দিয়েছিলেন, তা আমার একটা সম্পদ। বহুকাল প্রবাসী, বহুভাষাবিদ্, একান্ত স্বদেশাভিমানী, বর্তমান জগতের মূল্যায়নে মাঝে মাঝে ভ্রান্ত হয়েও যিনি সমাজ নিয়ে সামগ্রিক চিন্তায় অগ্রণী ছিলেন (এঙ্গেল্‌স্‌-এর *Origin of the Family* অনুবাদ সেযুগে তিনি করেন, অন্যান্য রচনা তো অগণিত), সেই অধ্যাপকের মনন ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে কখনো কখনো কৌতুক করলেও আমরা জানতাম তাঁর অসামান্যতা। তাঁর 'বৈঠকে' স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় 'বাঙালীর বাচ্চা'-দের দুঃসাহসিকতার দৃষ্টান্ত-ব্যাপদেশে নাকি তিনি আমার ঐ বিপুলকায় অনুবাদের উল্লেখ করেছিলেন !

বাবা দু-একবার আমায় লিখিয়েছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কিম্বা চিত্তরঞ্জন দাশের সম্বন্ধে স্মারক রচনা, পরিচয় করিয়েছেন তাঁর অনুজোপম বন্ধু অমলচন্দ্র হোম-এর সঙ্গে। ইনিও কোনো কোনো দিক থেকে অনন্য চরিত্র ; সাংবাদিকতায় বিবরণীতে তাঁর সমুচ্চ স্থান স্বীকৃত না হলে প্রত্যবায় হবে, 'কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট'-এর মতো সম্ভাবনারিক্ত পত্রিকাকে তিনি গুণগত এমন স্তরে উন্নীত করেন যা আশ্চর্য বললে অত্যুক্তি হবে না ; ব্যক্তি-গত সংগ্রহে যিনি অপরাজিত বলতে সংকোচ বোধ করব না, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের মূল্যবান সংগ্রহের চেয়ে অমলবাবুর গ্রন্থশালা আরো সুবিন্যস্ত মনে হয়েছে ; তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী 'চলমান বিশ্বকোষ' ধরনের লোক এই সংবাদিক— মারাত্মক ব্যাধিতে বহু বৎসর পঙ্গু হয়ে রয়েছেন, এটা

দেশের দুর্ভাগ্য। বাবা একবার আমায় বক্তৃতা করালেন মনীষী কৃষ্ণদাস পালের স্মৃতিসভায়— বাবা ছাড়া সেখানে বললেন ইউনিভার্সিটির নামকরা অধ্যাপক ডক্টর হাওয়েল্‌স্‌, এবং ব্যারিস্টার আর-সি. বনার্জির প্রথমা কন্যা মিনি (মৃণালিনী) বনার্জি, যিনি সবাইকে অবাক করলেন সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে বক্তৃতার উপসংহার করে। আমি বুঝতাম আমার মতিগতি সম্বন্ধে বাবা একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কিন্তু কখনো খোঁটা দেন নি, বাধা দেন নি, ব্যারিস্টারীতে অনীহা সম্পর্কেও অপ্রসন্ন মন্তব্য করেন নি। আমাদের বৃহৎ পরিবারের দৈনন্দিন জীবন যথারীতি চলছিল; সেখানেও আমার কর্মধারা কোনো অসামঞ্জস্য আনে নি। বোনেরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায় রোজ আসত— তাদের মোটরগাড়িতে মাঝে মাঝে ঘোরা যেত— প্রতি সন্ধ্যায় মার কাছে এসে তারা গল্পগুজব করে যেত, লুচি তরকারির প্রচুর আয়োজন ঘটত; কেমন করে এ-সব ঠিক চলে মাঝে মাঝে ভেবেছি কিন্তু চলে তো যেত! আমার ছোটো ভাই অমিয় আমাদের মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে মিশুক; সে একবার ধ্যানচাঁদ, রূপসিংকে এনে খাওয়াল। ময়দানে খেলা দেখতাম মাঝে মাঝে—বেশ মনে আছে, ধ্যানচাঁদের 'হকি'-জাদুকরীর পূর্বরূপ থেকে ঈষৎ স্খলন লক্ষ্য করে কাকে যেন বললাম যে এটাই ঠিক, একেবারে 'নিখুঁত' জিনিস হল প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, ধ্যানচাঁদেও মালিন্য আসছে! ফুটবল মাঠে একবার যেন ক্যালকাটার বিপক্ষে খেলায় রেফারী ও শত্রুদলের দৌরাত্ম্যে অধৈর্য হয়ে মোহনবাগান গোষ্ঠ পালের নায়কত্বে ইচ্ছা করে ক্রমাগত সোজাসুজি বলে হাত দিয়ে এবং খেলায় অংশ গ্রহণ না করার ইঙ্গিত দিয়ে পাঁচ ছয় গোলে হারল— বুঝলাম গোষ্ঠ পালের মতো স্থিতধী খেলোয়াড় এটা করছেন কম দুঃখে নয়, বহুকালের সযত্নলালিত ধৈর্য ভেঙে গেছে, বিদেশীর কাছে ক্রীড়া-ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচার নেই! আমার বিশেষ প্রিয় 'ক্রিকেট' সম্বন্ধেও আগ্রহ যথাসম্ভব রাখার চেষ্টায় ছিলাম— সেখানেও অস্ট্রেলিয়ার সম্বন্ধেও Macartney-র মতো অনিন্দ্য 'ব্যাট্‌স্‌মান'-কে (বুড়ো-হাড়েও যিনি ভেল্‌কি খেলালেন) দেখার আনন্দ অবশ্য পেলাম, কিন্তু জাতি-বৈরে ভরপুর মন নিয়ে লক্ষ্য করতে থাকলাম মুশতাক আলী, বিজয় মার্চেন্ট প্রভৃতির খেলা— বিচারে নিশ্চয়ই গলদ ঘটল, একদেশদর্শিতা দেখা দিল, কিন্তু সর্ব বস্তু থেকেই দেশাভিমানের অষ্টধাতু সংগৃহীত হতে লাগল মনে।

পার্টির কাজ এবং নানাস্থানে বক্তৃতা যথাপূর্ব চলছিল। আমার মায়ের জিম্মায় একবার গাঢ় লাল রঙের চমৎকার প্রকাণ্ড পতাকাজাতীয় বস্তু পার্টি থেকে রেখে দিয়ে গেল, বোধ হয় 'কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের' উপহার সেটা— মায়ের কাছে পার্টির কিছু টাকাও জমা রইল, ছেলেকে পুলিশ যদি ধরে, কথা ওঠায় বললেন, 'ও সব অলক্ষুণে কথা শুনব না'। এমন সময় ১৯৩৭ সালের গ্রীষ্মকালে হঠাৎ গলা নিয়ে মুশকিলে পড়লাম, অসুখটা মারাত্মক হতে পারে কিনা তাই নিয়ে বিপন্ন জল্পনাও কিছু হল— বাড়িতে উৎকণ্ঠা, তবে শেষ পর্যন্ত ভয় কাটল, শুধু বেশ কিছুকাল বিছানা এবং বাড়িতে আটক রইলাম। সেই সময় চারদিক থেকে বহু সভাসমিতিতে যোগদানের আহ্বানে সাড়া দিতে পারি নি— পার্টির গোপন নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল শরাফ্ আথর্ আলী নামে এক অবাঙালী ছেলের মাধ্যমে, যে আজ সম্ভবত বিদেশে, খবর জানি না; একদিন সে হেসে বলল যে তোমার চেয়ে তোমার 'গলা' আজ দেশে বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে গেল! হম্‌ফ্রি হাউস দেখা করতে এল, প্রেসিডেন্সি কলেজ সে তখন ছাড়ছে, রিপন কলেজে যোগদান বিষয়ে পরামর্শ চাইল। আশ্চর্য হলাম রিপনের মতো জায়গায় প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে আনকোরা সাহেব কাজ করতে চায়! কিন্তু এমনই ছিল হম্‌ফ্রি— পরে সে Gerald Manley Hopkins সম্বন্ধে প্রাথমিক গ্রন্থ দেশে ফিরে লিখেছে, Dickens-বিষয়ে বিলাতে প্রধান পণ্ডিত বলে গণ্য হয়ে, হঠাৎ মারা গেছে— সুধীনবাবু তার বিশেষ বন্ধু হয়েছিলেন, বিষ্ণুবাবুও, সন্দেহ নেই যে আমরা তাকে কখনো ভুলব না। হম্‌ফ্রি মজা করে বলল এক সহ-অধ্যাপকের কথা; কিঞ্চিৎ মদ্যপানে আহ্বান করলে অধ্যাপকটি বলেন যে বিবাহের পর থেকে তিনি আর ঐ বস্তু স্পর্শ করেন না, আর তখন হম্‌ফ্রি বলে: 'আশ্চর্য, আমার তো মনে হয় বিবাহের পরই ও-বস্তুটির মাধুর্য ও প্রয়োজন বেড়ে থাকে!' সম্ভবত তার কাছে শুনেছিলাম Oscar Wilde একবার বলেন যে Dickens-সৃষ্ট 'Little Noll'-এর দুঃখ বর্ণনা পড়ে যার হাসি পায় না সে কেমন ধরনের জীব! এটা মনে পড়ছে কারণ কিছুদিন আগে বুদ্ধদেব বসুর একটি স্মৃতিচারণ রচনায় দেখেছি যে 'Little Noll' পড়ে ছেলেবেলায় তিনি অঝোরে কেঁদেছিলেন, যা অবশ্য আমাদের বাঙালী পরিস্থিতিতে একান্ত স্বাভাবিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন চিন্তারও বিষয়!

১৯৩৭ সালে অসুখ থেকে সেরে উঠে ওয়ালটেয়ারে কিছুকাল কাটাবার সময় জানলাম যে রাধাকৃষ্ণন্ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থালয়ে যে-সব কম্যুনিস্ট-গন্ধী বই এনেছিলেন, সেগুলিকে পরবর্তী ভাইসচান্সলর সি.আর. রেড্ডি পুলিশের হাতে সমর্পণ করেছেন, এই রেড্ডি মহাশয় অন্ধ্রকুলতিলক বলে আজও বর্ণিত; সন্দেহ নেই তাঁর বহুগুণবত্তা বিষয়ে; কিন্তু এই একটি কুকর্মের জন্য তিনি আমার চোখে হেয় হয়ে রয়েছেন। তবে জানি, পরাধীন জীবনের শতমুখী বিড়ম্বনা কতভাবে আমাদের জীবন ও চরিত্রকে তখন লাঞ্ছিত করত।

বাবার বোধ হয় শরীর কিছুটা খারাপ হচ্ছিল, কিন্তু কখনো কাউকে কিছু বলতেন না, জিজ্ঞাসা করলে বলতেন খুব ভালো আছেন। চোখে বেশ কম দেখতে আরম্ভ করেন তখন, কিন্তু বই কেনা এবং পড়াতে ('মার্জিনে' দাগ এবং মাঝে মাঝে মন্তব্য সমেত) কমতি পড়ল না। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে পুরোনো বইয়ের দোকানে যাওয়া ছিল নিত্যকর্ম। তা ছাড়া আদালতে মাঝে মাঝে যেতেন, এবং প্রতিদিন প্রাতে রিপন আইন কলেজে অধ্যাপনা করতেন; আগে কখনো ভোরে উঠতেন না, কিন্তু রিপন কলেজে যাওয়ার জন্য বহুকালের অভ্যাস পাল্টালেন। হয়তো এতে শরীরে ধাক্কা লেগেছিল, কিন্তু তিনি কখনো অনুযোগ করেন নি, আমরাও 'গা' করি নি; তা ছাড়া ১৮৭৯ সালে জন্মে তাঁর বয়সও তখন এমন কিছু নয় বলে অকাল দুশ্চিন্তা কারো হয় নি। যাই হোক, ১৯৩৭ সালের শেষাশেষি হরিপুরা কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতির সাড়া পড়ে গেল; পার্টির পক্ষ থেকে আমাকেও এ.আই.সি.সি.-র (সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি) সদস্য নির্বাচিত করার কথা উঠল। ওয়েলিংটনের মোড়ে দোতলায় তখন প্রাদেশিক কংগেস কমিটির দফ্‌তর। আমার পিতৃব্য কালীপদ মুখোপাধ্যায় তখন সাধারণ সম্পাদক। মনে আছে অফিসের ছাদে একদিন পরিচয় হল সদ্যকারামুক্ত কম্যুনিস্ট নেতা আবদুর রজাক্ খান্-এর সঙ্গে; দীর্ঘদেহ, সুপুরুষ। মজ্‌লিসী মানুষটি ভাব জমালেন, বললেন (বেশ মনে আছে) 'আমি (অর্থাৎ খান্ সাহেব) আর বঙ্কিম (মুখার্জি) মিলে সারা বাংলাকে বক্তৃতায় কাঁপিয়ে তুলতে পারি'! একদিন কথা হল স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে— সেই প্রথম, সাক্ষাৎ 'পরিচয় স্মিতমুখে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন: 'চাই আপনাদের মতো কম বয়সী নতুন

লোককে'। আমার পিতৃব্য ডেকে পরিচয় করিয়ে ছিলেন সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে— বললেন 'তোমার চেয়ে ঢের বেশি দিন ইয়োরোপে সত্যপ্রিয়বাবু থেকেছেন, জার্মানীতে'। দেখলাম ঈষৎ খর্ব, কৃষ্ণকায়, তীক্ষ্নদৃষ্টি, বুদ্ধিদীপ্ত মানুষটি। পরে বহু যোগাযোগ ঘটেছে; সত্যপ্রিয়বাবু সম্বন্ধে শ্রদ্ধাই পোষণ করে এসেছি। মনে হত আমার পিতৃবন্ধু মৃণালকান্তি বসু মহাশয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আজীবন যুক্ত থাকলেও তাঁর তুলনায় সত্যপ্রিয়বাবু ছিলেন শ্রমিক বিষয়ে মৌলিক চিন্তায় বেশি সচেতন। তবে রাজনীতির আবর্তে মাঝে মাঝে মানুষের ব্যবহারে কেমন যেন উদ্ভট ছায়া পড়ে তার পরিচয় পেলাম কিছুকাল পরে তুচ্ছ অথচ আমার কাছে অর্থবহ এক ঘটনায়। সম্ভবত ১৯৫৪-৫৫ সালে কালীপদ মুখোপাধ্যায় যখন শ্রমমন্ত্রী, তখন বঙ্গীয় চলচ্চিত্র কর্মচারী সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি আমাকে, সংঘের সভাপতিরূপে, এক পত্রে সম্মেলনকে শুভেচ্ছা জানান, স্বাক্ষর করেন 'নিত্যশুভানুধ্যায়ী' বিশেষণের নীচে— সত্যপ্রিয়বাবু অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক কর্ণধার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বক্তৃতায় তাঁরই প্রাক্তন অন্তরঙ্গ মন্ত্রীর ঐ-বিশেষণটির আন্তরিকতা বিষয়ে কৌতুক করলেন আর আমি একটু যেন অস্বস্তি অনুভব করলাম, অতটা প্রখর 'রাজনীতি' বিস্বাদ বোধ হল।

'৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রৌপ্যজয়ন্তী অধিবেশন হল; ১৯১৪ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতাতেই ঐ-সংস্থার জন্ম ঘটে। নানা দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকরা এলেন, যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ছে Sir James Jeans এবং Arthur Eddington-এর কথা; এঁরা দু'জনই বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যবর্তী চিন্তাজগৎ বিষয়ে গ্রন্থ লিখে কয়েক বৎসর পূর্বে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। এদেশে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাতে এডিংটন বুঝি ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে বললেন ব্যাপারটা 'mumbo-jumbo'-র অনুরূপ, বেশ একটু সোরগোল উঠল, কারণ আমাদের বিদ্বৎসমাজ সাধারণত 'ঘেঁটুপুজো' থেকে ব্রহ্মাস্বাদ সর্ববিষয়েই অবিশ্বাসী হবার মতো মানসিক পরিশ্রমে নারাজ —দেখা তো গেছে মস্ত বিজ্ঞানী, খুব সম্ভব অজ্ঞেয়বাদী, হয়তো বা বস্তুবাদী নাস্তিক, কিন্তু কলকাতায় বাড়ি বানাবার আগে তাঁর জমিতে দস্তুরমতো

পুরুত ডেকে, মন্ত্র পড়িয়ে 'ভূমিপূজা' হল। আমার বাবা জ্যোতিষে অবিশ্বাসী ছিলেন বলতে পারি না, কিন্তু ঐ নিয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ বোধ করতেন না, যদিও আমার মামা, হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকিল হয়েও জ্যোতির্বিদ বলে বিখ্যাত ছিলেন, সম্পন্ন লোকেরা ভিড় করত তাঁর কাছে, একবার কজন আপাতদৃষ্টিতে পশ্চিমী-ভাবাপন্ন ব্যারিস্টার আমাকে মুরুব্বি বানিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। যাই হোক, বিজ্ঞান কংগ্রেসের সময় কদিন বাবাকে খুব প্রফুল্ল দেখেছিলাম; নিজে বৈজ্ঞানিক না হয়েও জ্ঞানচর্চার পরিমণ্ডল প্রকৃতই তাঁকে সুখী করত। দেশ-বিদেশের সুধীসমাগমে তাঁর আনন্দ, কয়েকজন অবাঙালী পণ্ডিতকেও তখন বাড়িতে দেখা গেল। ফলিত জ্যোতিষ ছাড়াও নানাবিধ অলৌকিকে বিশ্বাস এদেশের বিদ্বজ্জনের মনকে কিভাবে অধিকার করে আছে ভাবলে অবাক হতে হয়। তৈলঙ্গস্বামীর মতো সাধুর অত্যাশ্চর্য শক্তি সম্বন্ধে অজস্র রটনা রয়েছে। Mark Twain বুঝি কাশীর কোন্ এক তপস্বীর অসাধ্যসাধনক্ষমতা দেখে বলেন 'he must be either the greatest fraud or the greatest scientist in the world'; একটু আগে বলেছি সি. ভি. রমন-এর প্রিয় শিষ্য ভগবন্তম্ আজ 'সাঁই-বাবা'-র ভগবান-ত্বে বিশ্বাসী; হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গল্প শুনেছি তাঁর পিতা বৈজ্ঞানিক অঘোরনাথের হায়দরাবাদ-ভবনে নগ্নগাত্র তেলুগু সন্ন্যাসী শূন্য থেকে যে-কোনো ফুল বা ফল টেনে এনে অভ্যাগতদের স্তম্ভিত করতে পারতেন— এবম্বিধ কিম্বদন্তীর সত্যাসত্য নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক প্রযত্ন নেই, যদিও দেখে ভালো লাগে যে বোম্বাইয়ের Indian Rationalist Association এই জাদুকরী দাবিকে যাচাই করবার জন্য মাঝে মাঝে 'চ্যালেঞ্জ' দেয়। কিন্তু সংগত বৈজ্ঞানিক পরিবেশে অলৌকিক ঘটনার সত্যাসত্য পরীক্ষায় সুযোগ নিতে বিশ্বাসীরা বড়ো কেউ এগোয় না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন ভারতের রাষ্ট্রপতি, তখন তাঁর মুখেও শুনেছি চমকপ্রদ অলৌকিক কাহিনী যাতে তাঁর ব্যক্তিগত আস্থা ছিল পরিপূর্ণ; দেখেছি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিদ্যাজগতে আজন্ম সঞ্চরণশীল ব্যক্তির অনুরূপ সংস্কার-প্রবণতা অতি সম্প্রতি 'জাতিস্মর'-দের পূর্বজন্মস্মৃতি নিয়ে রাজস্থানে এক বাঙালী বিদ্বান্ 'para-psychology' চর্চায় লেগে মার্কিন মুলুকে সাড়া জাগিয়েছেন, কিন্তু বিষয়টি হয়তো উদ্দেশ্যমূলকভাবে রহস্যাচ্ছন্ন, বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে তার চরিত্র নির্ধারণ সম্ভবত কাম্য নয়। ইতিমধ্যে চলুক এই মান্ধাতার দেশে বিশ্বাসের নামে অগাধ বিভ্রান্তি; জীবনে বঞ্চনার অবধি যখন নেই তখন শূন্যতা ভরানো হোক্ কুসংস্কার-গঞ্জিকার কল্‌কে-তে দম দিয়ে, দৈবতুষ্টিতেই যেন আমাদের মাদকতা, কারণ পুরুষকারের মেহনৎ বড়ো বেশি!

দিন এমনি যখন চলছিল, তখন হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো খবর এল রিপন ল'-কলেজ থেকে, যে ক্লাসে বক্তৃতা করতে করতে বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, ভয় বুঝি নেই তবে আমাদের একবার যাওয়া দরকার। জানুয়ারির সকাল তখন; চারদিক প্রসন্ন; অঘটন যে ঘটতে পারে, তা যেন ধারণাতীত। কলেজে দেখলাম অধ্যাপকদের বসবার ঘরে বিরাট টেবিলের ওপর অচৈতন্য বাবাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, জন-দুয়েক ডাক্তার রয়েছেন, এবং বেশ কিছু ছাত্র উদ্‌বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সুধীর ভট্টাচার্য রাশভারি ধর্মবিশ্বাসী মানুষ, আশ্বাস দিলেন ডাক্তারদের মতে প্রাণের আশঙ্কা নেই, তবে— মনে আছে কথাগুলি তাঁর— 'Let us pray'। বাড়ির সবাই, আরো কয়েকজন ডাক্তার, বাবার ঘনিষ্ঠ দু-একজন বন্ধু খবর পেয়ে এলেন— কলেজ সেদিনকার মতো বন্ধ রইল, দিবা-বিভাগের ছাত্র-অধ্যাপক সকলে ফিরে গেলেন, বিপুল বিদ্যায়তনের অনভ্যস্ত মৌন যেন এক অব্যক্ত শঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে রইল। আমাদের মাকে নিয়ে যাওয়া হল কলেজে— বলেছিলাম তাঁকে যে ডাক্তাররা আশ্বাস দিচ্ছেন ভয় নেই, কিন্তু মা কিছু বললেন না। শুধু দেখলাম যে তাঁর চোখ থেকে তৎক্ষণাৎ জল মুক্তোর মতো ঠিকরে পড়ল। জীবনে কখনো তেমন দেখি নি, চোখের অশ্রু যে অমনভাবে ঝরতে পারে তা কল্পনাও করতে পারি নি। আগে বুঝি একবার বলেছি যে মায়েরা অন্তর্যামী— যাই হোক্, মা বুঝেছিলেন আমাদের কপাল ফেটেছে, গেলেন কলেজে, বসলেন স্থিরচিত্তে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে, মূক হয়ে ছিলেন যখন রাত্রে সব শেষ হয়ে গেল, বুকের কান্না চেপে রাখলেন বুঝি পুত্রকন্যাদের মুখ চেয়ে, পরদিন দাহ শেষে যখন ফিরি তখন যেন বললেন: 'পদ্মফুলের মতো চুল ছিল, পুড়তেও দেরি হল না, কাউকে কষ্ট দিলেন না কখনো!'

'মাতৃপিতৃদেবো ভব!' হল আমাদের দেশের শাশ্বত শিক্ষা। তাঁরা যে

দেবস্থানে অধিষ্ঠিত, সেখানে থাকুন। নরনারী রূপে তাঁদের সম্পর্ক সন্তানের বিচার্য নয়। কিন্তু আশ্চর্য হয়েছিলাম, এখনো সেই ঘোর কাটে নি, যখন মায়ের চোখের জল ওভাবে ঠিক্‌রে-পড়তে দেখি। কেউ হয়তো বলবে এটা সামান্য ঘটনা, কিন্তু আমার মনে কালজয়ী হয়ে তা আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, ভাবি সেদিন অকস্মাৎ যা প্রত্যক্ষ করেছিলাম তা মানব-সত্তার প্রচ্ছন্ন ফল্গু-মহিমার বহু ভাগ্যে দেখা ছবি।

পিতার মৃত্যু যে পরিস্থিতিতে ঘটল, তাতে অপ্রত্যাশিতভাবে শ্মশান বন্ধু হলেন বহু ছাত্র, প্রতিবেশী ও বান্ধব, যাঁদের অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সহায়তা সহজে বিস্মরণীয় নয়। কিছুদিন কাটল কতকটা আচ্ছন্ন ভাবে; বোঝা গেল প্রকৃত সত্যতা আছে প্রবাদে যে 'মহাগুরুপতন' ঘটলে মনে হয় যেন পর্বতের নিরাপদ আশ্রয় নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাবার বয়স ৫৯ বৎসরও তখন পূর্ণ হয় নি; অকালপ্রয়াণ করলেন বলা অসংগত হবে না। জীবনে কখনো হাসপাতালে তাঁকে যেতে হয় নি; অঙ্গে কোথাও কখনো অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ঘটে নি; আকস্মিক আক্রমণেই দেহাবসান ঘটল— পুণ্যাত্মা চলে গেলেন, এ কথা অনেকের মুখে শুনলাম। অনুশোচনা একটু হল; হয়তো নিজেদের নূতন সমাজ-চেতনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ অহংকারের ফলে সন্তান সম্বন্ধে পিতার বহু বাঞ্ছাকে তাচ্ছিল্য করেছি বলে দুঃখ হল, পিতাকে যে একটু দূরে রেখে চলছিলাম, বন্ধুভাবে দেখার মতো সামর্থ্য ও সহশক্তি অর্জন করতে পারি নি বুঝে কষ্ট হল। সে-কষ্ট কাটতেও অবশ্য বিলম্ব হল না; "স্রোত চলে, সূর্য জ্বলে"—জীবনের প্রবাহ আবার তার স্বাভাবিক খাতে ফিরে এল।

১৮

’৩৭ সালে অনেক বিতর্কের পর নতুন ভারত-শাসন বিধির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণে কংগ্রেস স্বীকৃত হওয়ার কথা সুবিদিত। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য রইল ভারতবাসীর আওতার বাইরে— বড়োলাটের কর্তৃত্ব সেখানে অবিসংবাদিত, তাঁর কর্মপরিষদে কয়েকজন ভারতীয়ের নিযুক্তি অবশ্য তখন প্রচলিত, কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থ বিভাগের ভার কোনো ভারতবাসী পায় নি, দেশরক্ষা বিভাগের তো কথাই নেই। এ বিষয়েও যে মার্জিত ও উদারচেতা বলে পরিচিত ইংরেজপ্রবরদের মনে কত কুণ্ঠা ও অপ্রবৃত্তি ছিল, তার হাস্যকর উদাহরণ দেখলাম উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম.এন.দাস-কৃত এক গ্রন্থে। মিণ্টো-মর্লি পত্রালাপ থেকে জানা যায় বড়োলাট মিণ্টোর অভিমত ছিল যে কর্মপরিষদে প্রথম ভারতীয় সদস্য (সব চেয়ে নিরাপদ বিভাগ রূপে ‘আইন’ এই বদান্যতার জন্য ১৯০৯ সালে বাছাই হয়েছিল!) হওয়ার পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত ছিলেন (তখন হাইকোর্ট জজ) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কিন্তু তাঁর গাত্রবর্ণ এতই কালো (‘believe me, he is as black as my hat!’) যে-তুলনায় কতকটা পাংশু সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকেই (পরে ‘লর্ড সিন্‌হা’ নামে বিখ্যাত) অনেক চিন্তার পর ঐ পদে বসানো হয়! যাই হোক্, ’৩৭ সাল নাগাদ সময় সব ঘাট দিয়ে অনেক জল বয়ে যাওয়ার ফলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মোটামুটি একটা সম্‌ঝোতা হল। নাটকীয় ভঙ্গীতে কংগ্রেস কতকগুলো প্রতিশ্রুতি আদায় করল, প্রাদেশিক লাটসাহেবরা ‘ভদ্রলোকের অঙ্গীকার’ জানাল যে মন্ত্রীদের কাজে সচরাচর হস্তক্ষেপ করা হবে না। কিছু পরিমাণ টালবাহানা চালিয়ে, একটু যেন দর বাড়িয়ে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের মনকে একটু চাঙ্গা করে এবং নতুন শাসন সংস্কার বর্জন ব্যাপারে বামপন্থীদের বাক্‌বিস্তারকে সুনিপুণ কৌশলে পরাজিত করে কংগ্রেস এগারোটার মধ্যে আটটা প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করল। মুসলিম লীগ নির্বাচনে তেমন জুৎ করতে পারে নি। তবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান্ আবদুল গফ্‌ফর খান্-এর আশ্চর্য নেতৃত্বের

সুযোগে জয়লাভ ছাড়া কংগ্রেস মুসলিম জনতার সমর্থন থেকে ক্রমশ বঞ্চিত হচ্ছিল। এমন অবস্থায় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে বোঝাবুঝির যে সুযোগ এসেছিল, বিশেষত উত্তর প্রদেশের মতো অঞ্চলে, তার সদ্‌ব্যবহারের বদলে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন যে একটা মস্ত ভুল হয়েছিল তা পরে প্রতিপন্ন হয়েছে। স্বয়ং আবুল কালাম আজাদ এজন্য প্রধানত জওয়াহরলাল নেহরুর অবিমৃষ্যকারিতাকে দায়ী করেছেন আর বলেছেন যে পরবর্তী 'পাকিস্তান' আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস-লীগ যুক্ত মন্ত্রীসভা ১৯৩৭ সালে গঠিত হলে দেশ বিভাগেয় অভিশাপকেই এড়ানো সম্ভব হ'ত। অনুমানের কথা থাক্, স্বচক্ষে দেখলাম কলকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরিতে ফজ্‌লুল হক্ আর শরৎ বসু পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন, কিছুদিন জল্পনা চলল কংগ্রেস হক্ সাহেবের সঙ্গে মিতালি করবে কিনা, কিন্তু সব-কিছু ভেস্তে গেল। ফজ্‌লুল হক্ তখনো লীগে নাম লেখান নি ; বহু দৌর্বল্য সত্ত্বেও বাস্তবিকই দরাজ, দরদী খ্যাতি তাঁর ছিল। অথচ দেশের প্রধান মুক্তিপ্রয়াসী দল হিসাবে কংগ্রেস তাঁকেও আপন করতে পারল না। এটা মর্মান্তিক ঘটনা। দেশ বিভাগের যন্ত্রণা নিয়তি আমাদের জন্য স্থির করে রাখে নি : 'the fault, dear Brutus, is not in thy stars but in thyself' ।

ভেদভাববিড়ম্বনার পরম্পরা আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বহুকাল ধরে বিস্তৃত। বাংলা কংগ্রেসে ঝগড়াঝাঁটির অন্ত ছিল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর প্রদেশের 'ত্রি-মুকুট' (কংগ্রেসের সভাপতিত্ব, কর্পোরেশনের মেয়র-পদ এবং স্বরাজ্যদলের নেতৃত্ব) গান্ধীজী পরিয়ে দিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মাথায়— অনতিবিলম্বে দেখা গেল সুভাষচন্দ্র বসুকে নেতৃপদে বসিয়ে অপর এক বর্ধিষ্ণু দল আপত্তি জানাতে লাগল— নিষ্পত্তি সহজ হল না, শুধু মাঝে মাঝে সাময়িক মিটমাট ঘটল। বাংলা কংগ্রেসের বিবাদ ভঞ্জনের ভার নিয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি থেকে থেকে মাধব শ্রীহরি অনে-র মতো নেতাকে পাঠাল, প্রায়ই 'অ্যাড্ হক্' প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি খাড়া হয়ে যেত, একই সঙ্গে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিরল ছিল না। কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টিকে বামপন্থী ঐক্যের মঞ্চে পরিণত করাও সহজ হল না, কারণ ইয়োরোপের মতো এখানেও 'সোশাল

ডেমক্রাটিক' ধারার প্রাবল্য ছিল— মিনু মাসানি, রামমনোহর লোহিয়ার মনে মার্ক্স্‌বাদ ব্যাপারেই দ্বিধা ছিল, বিশ্বরাজনীতির নবরূপায়ণে তৎকালীন একক ও শত্রুবেষ্টিত সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভূমিকা বিষয়ে বিরূপতা ছিল, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে বৈরিভাব পোষণের ফলে ব্যাপক সমাজবাদী ঐক্য সম্পর্কে ছিল অনীহা। ১৯৩৭-৩৯ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ অনেকটা সর্বগ্রাহ্য সমাজবাদী নেতা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছিলেন বলতে পারি। কম্যুনিস্ট পার্টিকে প্রীতির চোখে কখনো দেখতে না পারলেও মাসানি কিম্বা লোহিয়ার অন্ধ কম্যুনিস্ট-বিরোধিতা তাঁর অভিমত ও আচরণে তখন প্রকাশ পেত না, কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ায় ক্রমশ সেই প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট হল। কংগ্রেসের ভিতরকার পাঁচমিশেলী বামপন্থীদের যে খাস লড়াই, সুভাষচন্দ্র বসু ও জওয়াহরলাল নেহরুর পক্ষে একযোগে বল্লভভাই পাটেল-রাজগোপালচারি-রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখের বিরুদ্ধে যে লড়াই ছিল জনতার বহুলাংশের কামনা, তাও অল্পকালের মধ্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। নেহরুর *A Bunch of Old Letters*-এ সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের যে বিবরণ আছে, তা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে বে-আইনী অবস্থায় গতিবিধি কিঞ্চিৎ সন্তর্পণে হলেও তার স্বতন্ত্র সত্তা তখন স্পষ্ট, কিন্তু সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাব যথেষ্ট সীমিত— জওয়াহরলাল তো কতকটা বিদ্রূপের সুরে *The Discovery of India* গ্রন্থে কম্যুনিস্টদের আখ্যা দিলেন "ginger group", রাজনীতিতে একটু "ঝাঁঝ" বাড়ানোর বেশি বুঝি আমাদের সাধ্য ছিল না! জার্মানী-ইতালী-জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচণ্ড শক্তিশালী ফ্যাশিজ্‌ম্‌-এর উৎপাত যখন দুনিয়া জুড়ে প্রকট, তখনকার পরিস্থিতিতে বামপন্থী চিন্তা ও কর্মধারা জোরে এগিয়ে যাওয়ার অনুকূল আবহাওয়া পেয়েছিল বলে মহাত্মা গান্ধী স্বকীয় ভঙ্গীতে তাকে নিজের আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করলেন, জওয়াহরলাল নেহরু কিছু পরিমাণে অস্বস্তি বোধ করলেও গান্ধী-নেতৃত্বের মায়াজাল ছিঁড়তে চাইলেন না, কম্যুনিস্টরা দূরে থাক্‌, কংগ্রেস-সোশালিস্টদের সঙ্গেও যোগ দিলেন না, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলাবার কথা তো ভাবলেনই না। বামপন্থার দিকে অবশ্য তখন দেশ রীতিমতো ঝুঁকেছিল। তাই ভেদাভেদের সূক্ষ্ম জটিলতা ছাপিয়ে কংগ্রেস-সভাপতিত্বে জওয়াহরলালের উত্তরাধিকারী হলেন

সুভাষচন্দ্র ; গান্ধীজীও হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের নায়কত্বে সায় দিলেন, অন্তত প্রকাশ্যে তেমন কোনো আপত্তি দেখা দিল না।

কংগ্রেস-সোশালিস্ট প্রার্থী তালিকায় আমার নাম খুব উঁচুতে না থাকা সত্ত্বেও আমি নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটিতে ('এ.আই.সি.সি.') নির্বাচিত হওয়ায় অনেকে আশ্চর্য হলেন, কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছিল বে-আইনী কম্যুনিস্ট পার্টির শৃংখলা ও সংগঠন কৌশলে। বাংলা থেকে সেবার এ.আই.সি.সি.তে গেলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ্, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রভৃতি কম্যুনিস্ট, যাদের সঙ্গে আমারও স্থান মিলল। অনেক দিন বাদে আবার খদ্দরের জামা-কাপড় সংগ্রহ করা গেল ; মজা লাগে ভাবতে যে স্বয়ং মুজফ্‌ফর সাহেব খাদি পায়জামা-পাঞ্জাবি খরিদ করে হরিপুরা অধিবেশনে যোগ দিলেন! '৩৫ সালে কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেস শুনেছিল 'লাইপ্‌ৎসিগ্‌'-বিচারের খ্যাতিমণ্ডিত কমরেড জর্জি দিমিত্রভ্‌-এর বিশ্ব-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, গ্রহণ করেছিল জগৎকে ফ্যাশিস্ট বিভীষিকার গ্রাস থেকে মুক্ত করার সংকল্প, সর্বদেশে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির পথ প্রশস্ত করার কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল। বঙ্কিমবাবু তখনই বোধ হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের একজন কর্মকর্তা ; মুজফ্‌ফর সাহেবের রাজনৈতিক জীবন আদ্যন্ত ছিল কংগ্রেসের বুর্জোয়া চরিত্র ও কপট ভূমিকার বিরুদ্ধাচরণ— কিন্তু বিপ্লব সরল রেখায় চলে না, পরাধীন দেশের স্বাধীনতাও সর্বদা সোজা রাস্তায় আসে না। তাই এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে হরিপুরা কংগ্রেসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সাথী হয়ে আমি গেলাম।

এটা যখন লিখছি, তার অল্প পূর্বে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর মৃত্যু হয়েছে। অশীতি-অতিক্রান্ত বয়সে কারো দেহান্তে খেদ নেই, কিন্তু এই অনন্য মানুষটির সমকালীন ইতিহাসে যে বিশিষ্ট মর্যাদা তা বহুদিন কীর্তিত হবে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে স্মৃতিচারণ ব্যপদেশে বহু প্রাক্তন সতীর্থ সম্বন্ধে বক্রোক্তি ও বিষোদ্‌গার তিনি করে গিয়েছেন— হয়তো এর হেতু হল বিপ্লবী মানসিকতার আশাহত আতিশয্য। প্রখর বৈপ্লবিক প্রত্যাশা থেকে লেশমাত্র বিচ্যুতি সন্দেহে পরস্পর বিষয়ে বৈরীভাব পোষণের যে পরম্পরা নানা ভাবে সাম্যবাদী ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখা দিয়েছে তারই এক প্রায় উৎকট

উদাহরণ হয়তো এ ঘটনা। যাই হোক্, ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রথম প্রতিভূ বলে যদি শুধু দু'জনের নাম করতে হয় তো তাঁরা হলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এবং শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, একত্র যাদের নামোচ্চারণে অনেকে ক্রুদ্ধ হবেন, কিন্তু উপায়ান্তর নেই— 'তোমার আমার মিল নাই, মিল নাই, তাই বাঁধিয়াছি রাখী'! দ্বিতীয়োক্তকে চিনেছি পরে, কিন্তু আমার পার্টি জীবনের প্রথম অধ্যায় থেকেই মুজফ্‌ফর সাহেবকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি, বোধ করি তাঁর সম্বন্ধে একটু দুর্বলতাও পোষণ করেছি— তাই পার্টি ভেঙে যাওয়ার পর তাঁর অনেক কথা ও কাজ অসহ্য মনে হলেও তাঁর সম্পর্কে কটু প্রতিকূলতা অভাবনীয় থেকে গেছে। নোয়াখালির নির্বিত্ত কিশোর মুসলিম্ ঐতিহ্য বিষয়ে আগ্রহ নিয়ে শিক্ষার্জনের পথে সন্তর্পণে পা বাড়িয়ে কেমন করে ক্রমশ ধীর স্থির গতিতে অথচ মর্মের গভীরে সাম্যবাদের একান্ত অনভ্যস্ত, দুর্গম ও বিপৎসংকুল মার্গে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা খুঁজে পেল, মাঝে মাঝে কাজী নজরুল ইসলাম-এর মতো প্রাণোচ্ছলের সান্নিধ্য কিম্বা এদেশের কম্যুনিস্ট প্রচেষ্টায় অবিস্মরণীয় আবদুল হালিম-এর মতো সরলমতি সহচরের অনুরক্তি সত্ত্বেও কঠোর, একক, প্রায়-অসম্ভব পারি-পার্শ্বিককে তুচ্ছ করে সেই মানুষটি কেমন করে সাম্যবাদের 'সলুতে' জ্বালিয়ে রাখলেন, স্থিতপ্রজ্ঞাবলে দুঃখসুখকে একভাবে দেখে কর্তব্যে অবিচল থাকলেন এবং নিজের জীবৎকালে দেখলেন এই দুর্ভাগ্য দেশেও সাম্যবাদ অজস্র দুর্বলতাসত্ত্বেও অপরাজেয়— এ তো প্রকৃত সমুজ্জ্বল এক বৃত্তান্তের বিষয়। আমার মনে আছে, সম্ভবত '৪২ সালের প্রথমার্ধে কারাগারে কিম্বা 'সুড়ঙ্গ' (underground) নিবাস থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁকে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে এক সভায় অভিনন্দন জানানো হল, ১৯২৭-২৮ সালে 'ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজান্ট্‌স্ পার্টি'-র সহায়ক, সকলের শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতি হলেন, আমার রচিত মানপত্র অতুলবাবুর পূর্ণ অনুমোদন পেয়েছিল। মুজফ্‌ফর প্রায় সবাইকে 'আপনি' বলতেন, যদিও বাংলা পার্টির দফ্‌তরে এবং সাধারণত পার্টি মহলে তাঁর আখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'কাকাবাবু'— তাঁকে ওভাবে কখনো সম্বোধন করি নি, কিন্তু কেমন যেন আত্মীয়তা আমাদের মধ্যে ছিল। কলকাতার বহু পরিবার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর তিনি রাখতেন, আমার বাড়ির বিষয়েও মোটামুটি জানতেন, আমার

লেখাপড়া এবং বক্তৃতাশক্তির তারিফ্ এমন অকুণ্ঠে করতেন যা পার্টি-নেতাদের কাছ থেকে অভাবনীয় ছিল! বেশ মনে আছে ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তিনি জোর না করলে লোকসভায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না— একজন 'কেষ্টবিষ্টু' (যিনি আজও পার্টি-কর্ণধারদের অন্যতম) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন যাতে, বুঝি 'বামপন্থী ঐক্য-'এর স্বার্থে, তখনই সুপ্রবীণ বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুকূলে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করি (জীবনবাবুর জমানৎ নির্বাচনে বাজে য়াপ্ত হয়েছিল)। মুজফ্ফর সাহেবের মার্ক্স্‌বিদ্যায় গভীরতা কতটা ছিল জানি না, কিন্তু জীবনব্যাপী ঐকান্তিকতা নিয়ে মার্ক্স্-প্রদর্শিত পথে চলার প্রয়াস তিনি করেছেন— অবশ্যই অপর বহু জনের মতো ভুলভ্রান্তি করেছেন, পক্ষপাতিত্ব করেছেন (আমি তো দেখেছি অনেক প্রকৃত সজ্জনকেও তিনি সহ্য করতে পারতেন না), পার্টিভঙ্গের যে-অপরাধ প্রমুখ নেতা হিসাবে সেই অপরাধে অপরাধী অবশ্যই হয়েছেন, কিন্তু নিজের ভঙ্গীতে হলেও আজীবন যা করেছেন তা হল প্রকৃত তপশ্চর্যা— তাঁকে ইতিহাস স্মরণ করবে কম্যুনিস্ট কর্মকাণ্ডের প্রতীকরূপে, যে কর্মকাণ্ড টেনেছে হাজার হাজার নাম-না-জানা মানুষকে, যাদের দুঃখবরণ সম্বন্ধে বলা যায় 'upon such sacrifices, the gods themselves throw incense'। আবেগের সুর এনে ফেলতে চাইছি না, কিন্তু ভুলব না কখনো যে পার্টিবিভাগের বিকট যন্ত্রণাকে স্তব্ধ করে একাধিকবার তাঁর রচিত গ্রন্থ দিয়েছেন এবং চিঠিতে লিখেছেন : 'আমার ভালোবাসা নিন।' মিতবাক্ মানুষটির এই সম্বোধনে সত্যই মুগ্ধ বোধ করেছি।

* * *

হরিপুরা যাবার পথে ট্রেনে একসঙ্গে প্রায় আড়াইদিন যাদের সঙ্গে কাটানো গেল তাদের মধ্যে ছিলেন অভয় আশ্রম-খ্যাত ডাক্তার সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোরের প্রসিদ্ধ নেতা জীবনরতন ধর, চট্টগ্রামের আশরফ্ উদ্দীন আহ্‌মদ্ চৌধুরী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রভৃতি। একবার বুঝি নীহারেন্দুর মন্তব্যে সুরেশবাবুর সঙ্গে একটু যেন মনোমালিন্য হল, কিন্তু মোটামুটি আনন্দে সময় কাটল— খুব মনে রয়েছে চৌধুরী সাহেবের প্রাণখোলা হাসি। হরিপুরার পর তিনি হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক; দারুণ ভালো লাগত চোখের তলায় এবং কালো পাৎলা দাড়ির

উপর দিকে খাঁজের পর খাঁজ, যা বোধ হয় অমন অনর্গল হাসিরই দেওয়া ছাপ। দেশভাগের পর থেকে তাঁর কোনো খবর পাই নি, শুধু জানলাম 'বাংলাদেশ' মুক্ত হওয়ার পর যে স্বগ্রামে তিনি আছেন, কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংস্পর্শ না রেখেই বহুকাল ধরে চলেছেন। হরিপুরায় পৌঁছে দেখলাম গ্রাম অঞ্চলকে সাময়িকভাবে গান্ধীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, প্রতিনিধি আর দর্শকদের জন্য ম্যারাপ-দেওয়া দর্মা-ঘেরা থাকার ব্যবস্থা, নেতাদের জন্য তাঁবু। সভাপতির প্রশস্ত তাঁবুতে সুভাষচন্দ্রের মা এসে ছিলেন, আরো ছিলেন অগ্রজ সতীশচন্দ্র বসু যাঁকে বার লাইব্রেরিতে জানতাম, বর্মা-ফেরত ব্যবহারজীবী, মধ্যমভ্রাতা শরৎচন্দ্রের মতোই চুরুট-প্রিয়, নিজ পরিবার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অহংকারী কিন্তু বাস্তবিকই সাদাসিদে সজ্জন। শৌচ, স্নান ইত্যাদির ব্যবস্থা মুক্তাঙ্গনে, যেটা আমার শহুরে মেজাজে অস্বস্তি ঘটিয়েছিল, কিন্তু দেখলাম আকাশের তলায় দর্মা দিয়ে আড়ালকরা জায়গায় পায়খানা সেরে নিজের হাতে কতকটা মাটি ছড়িয়ে দেওয়ার নিয়ম অত্যন্ত খাসা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রুচি অনুযায়ী রান্না একস্থানে সম্ভব ছিল না, তাই খাবার দোকানও কিছু বসেছিল। বাঙালী দোকান ছিল রীতিমতো নোংরা, যেমন ছিল মুসলমান দোকান, যেখানে সস্তায় কাবাব পরোটা মিলত। আমরা তবু এ দুটো জায়গায় যেতাম, রান্নাঘরে উঁকি মারার দুঃসাহস বর্জন করেই বোধ হয় মুখের গ্রাস সুস্বাদু লাগত। বঙ্কিমবাবুকে নিয়ে একটু বিপদ হ'ত ; শৌচে সময় লাগবে বিপুল, স্নানের পর সযত্নে চুলের কেয়ারি করবেন,: খদ্দর ধুতির কোঁচা অতি পরিপাটিভাবে সাজাবেন, মন্থরগতিতে সভাস্থলে যাবেন, বক্তৃতার জন্য আগ্রহের চিহ্নমাত্র দেখাবেন না— অপরপক্ষে দেখলাম নীহারেন্দুকে, পার্টি-কর্তৃপক্ষ জানুক বা না জানুক, বক্তৃতা করার সুযোগ সংগ্রহ প্রতিকূল অবস্থাতেও করবে। আগেই লিখেছি 'নেতা' হবার অনেক গুণ ছিল নীহারেন্দুর, প্রচুর পরিশ্রমের ক্ষমতা ছিল, ব্যক্তিগত আকর্ষণও কম ছিল না (শুধু অনুচর নয়, বন্ধুভাগ্যও তার যথেষ্ট), কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যার অগ্রণী স্থান সে যোগ দিল কংগ্রেসে, মন্ত্রী হল, তারপর ঘটনাবিপর্যয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা হারাল, বার লাইব্রেরির এক কোণে জায়গা নিল, 'প্র্যাকটিস্' যে জমাল তাও বলা যায় না ; সত্য মিথ্যা

জানি না, লোকমুখে শুনেছি যে দৈবে বিশ্বাস প্রভৃতি রোগেও নাকি এখন ভোগে। এ-ধরনের দৃষ্টান্ত বোধ করি মনস্তাত্ত্বিক এক সমস্যা। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কথা পরে অল্প কিছু বলব, কিন্তু বিশেষ করে মনে আসছে ফিলিপ স্প্র্যাটের ভারতীয় জীবন— মেধাবী তরুণ, সাম্যবাদী সংগ্রামে নিবেদিত-প্রাণ, ১৯২৭-২৮ সালে চটকল আর রেলশ্রমিকদের প্রিয় নেতা, চরিত্রগুণে সবার আদরণীয়, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দীদের মধ্যে সততায়, সারল্যে, শুভবুদ্ধিতে, বিপ্লবী নিষ্ঠায় অনিন্দ্য, কিন্তু মার্কসবাদে বিশ্বাস যেই ভাঙল, তারপর থেকে ধাপের পর ধাপ অধঃপতন, লক্ষ্যভ্রষ্ট অবস্থায় সততাও নিরর্থক হয়ে দাঁড়াল, যোগ দিলেন রাজাগোপালাচারির 'স্বতন্ত্র পার্টি'তে, প্রথম জীবনের সুদীপ্ত চেতনা ও চারিত্র্যের মৃত্যু ঘটে গেল। ইংরিজীনবিশ পাঠকের হয়তো এইসঙ্গে মনে আসবে Arthur Koestler-এর মতো লোকের কথা, যিনি হয়তো আবেগাতিশয্য নিয়ে কম্যুনিস্ট হয়েছিলেন বলে অনতিবিলম্বে 'The God that failed' ভেবে আঁত্‌কে উঠে 'তোবা, তোবা' করে নিলেন, কুণ্ঠিত হলেন না বলতে সমাজদেহে ধনতন্ত্র একটা রোগ হলেও সেটা হল যেন সামান্য হাম-জ্বর আর কম্যুনিজম্‌ হল কর্কট ব্যাধি যাকে শল্য-বলে উৎপাটিত করতে হবে!

আমাদের পার্টি তখন (১৯৩৮) বে-আইনী, কিন্তু আটটা প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করায় ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্র কতকটা অনুকূল; তাই বোম্বাই থেকে পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সাপ্তাহিকের (যদিও একটু ছদ্মবেশে) 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' প্রকাশিত হ'ল— সম্পাদকমণ্ডলীতে পূরণচন্দ্‌ জোশী বাদে অজয় ঘোষ, মহমুদুজ্জাফর, সম্ভবত বি.টি.রণদিভে প্রভৃতির নাম দেখা গেল। তখনই, কিম্বা অল্প পরে, দেখলাম কমরেড ভরদ্বাজকে, কারাবাস আর আত্মগোপনের ছাপে যক্ষ্মা যার দেহকে অকালে ভেঙে দিল, নইলে পার্টির একেবারে প্রথম সারিতে জায়গা পাবার সব গুণ তার মধ্যে চমৎকারভাবে ছিল। হরিপুরা কংগ্রেসের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এর একটা ছোট্ট ঘাঁটি ছিল—সেখানে হয়তো উচ্ছ্বসিত হয়ে পি.সি. জোশী আমাদের বলল সভাপতি সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা এত ভালো যে এমনটি আর আগে কখনো হয় নি ("the best ever" বাক্যটি মনে রয়েছে), হয়তো বেড়াতে এল গুণোত্তম হাতীসিং (যে অক্স্‌ফর্ডে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে উৎসাহ বাবদে আমাদের মতো

কুলোকের সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্ক রেখেছিল যদিও তখন যোগ দিয়েছিল কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির কম্যুনিস্ট-বিরোধী অংশের সঙ্গে), কিম্বা হয়তো স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাস্যের 'নোটিস' জানিয়ে এল মিঞা ইফ্‌তিখার উদ্দীন। মনে পড়ছে একরাত্রে ইফ্‌তিখার আমাকে টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরল কংগ্রেস নগরের পথে পথে— অল্পবয়সেই তাকে পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হতে হয়েছে, জওয়াহরলাল নেহরুর সে প্রিয়পাত্র, আমায় বলে বাস্তবিকই এই দায়িত্ব তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে, আমরা তাকে যেন সর্বদা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করি, আর বলে কী অদ্ভুত এই মহাত্মা গান্ধী, একেবারে ভিন্নরুচির মানুষকে সহজে কাছে টানেন তিনি, টেলিফোনে বা টেলিগ্রামে গুরুতর রাজনৈতিক কথা থাকলেও ইফ্‌তিখারের স্ত্রী (পরমাসুন্দরী বলে তখন খ্যাত) আর ছোট ছেলেমেয়ে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করতে ভোলেন না, কেমন করে এমন মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করা যায়! হরিপুরায় আড্ডা জমাত বোম্বাইয়ের সোলি বাট্‌লিওয়ালা, আমার মতো কংগ্রেস-সোশালিস্ট পার্টিতে যার নাম লেখানো, কিন্তু প্রাণের প্রাচুর্যে যে আমার উলটো, সবাইকে বুকে টানার যার অদ্ভুত ক্ষমতা, পি. সি. জোশীর মতো হাফ্‌-প্যাণ্ট (খাদি) পরে ঘুরলেও যাকে মনে হত যে কোনো বড়োলোকের বৈঠক-খানাতেও সে বেমানান নয়। কম্যুনিস্ট আন্দোলনে এর মতো শক্তিধর তখন কম দেখেছি, আর তার বউ নার্গিস্‌কে পরে দেখলাম ঠিক তার জুড়ি —মনে আছে একবার তাদের বলেছিলাম যে তোমরা যে গোটা সৃষ্টিতে সব চেয়ে জনপ্রিয় (the most popular in all creation !)। সোলিকে কলকাতায় বহু উপলক্ষে, আগ্রা ছাত্র সম্মেলনে, ১৯৪৩ সালে বোম্বাইতে পার্টি কংগ্রেসে এবং অন্য সুবাদে অনেকবার দেখেছি— হয়তো দেখলাম চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় সর্বকনিষ্ঠ আসামী আনন্দ গুপ্তের ভবানীপুরের বাড়িতে তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে হিন্দীতে পরম উৎসাহে কথা বলতে, হয়তো শুনলাম বোম্বাই-মার্কা হিন্দীতে মজুর বা ছাত্রসভায় বক্তৃতা করছে, হাসাচ্ছে, একটু বা কাঁদিয়ে তুলছে, আবার কথার মোড় ঘুরিয়ে আবহাওয়াকে সহজ করছে, হয়তো দেখলাম কলকাতা বা বোম্বাইয়ের অভিজাত গৃহে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে, গৃহস্বামী ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বেই বে-আইনী কম্যুনিস্ট পার্টির জন্য কিছু অর্থসাহায্য বার করে নিচ্ছে। কিছুকাল এই

বাট্‌লিওয়ালা-দম্পতী ছিল পার্টির সম্পদ। ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে পার্টির প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন দুই মহিলা কমরেড— মণি-কুন্তলা সেন আর নার্গিস্‌ বাট্‌লিওয়ালা। কিন্তু কী জানি কী ঘটে গেল— আভাসে যা জানি তা স্পষ্ট নয়— সোলি আর নার্গিসের মধ্যে বিচ্ছেদ হল, নার্গিস্‌ রাজনীতি ছাড়ল, সোলিও ১৯৪২ সালের পর পার্টিনীতিতে আস্থা হারাল (এ বিষয়ে পরে কিছু বলব)। স্মৃতিশক্তি একটু ক্ষীণ হলেই সুখী হতাম, কারণ মাঝে মাঝে আমার মনে খচ্‌খচ্‌ করে একটা চিন্তা : প্রথম পার্টি কংগ্রেসের দুই প্রধান মহিলা কমরেডের মধ্যে নার্গিস্‌ আন্দোলন থেকে বিদায় নিল দ্রুত, আর প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগের বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মণিকুন্তলা সেন নানা গুণসম্বলিত বলে বেশ কিছুকাল পার্টিকে সেবা করার পর ১৯৬৪-পরবর্তী (পার্টিভঙ্গোত্তর) যুগে কর্মক্ষেত্র স্রেফ্‌ পরিত্যাগ করে গেলেন— তখন তাঁর স্বামী, এককালের প্রকৃত কর্মিষ্ঠ ও প্রখ্যাত কমরেড জলি কাওল পার্টির সংস্রব ছাড়লেন, কে কাকে টানলেন জানি না, তবে মোট কথা উভয়েই সমাজের সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন স্তরে আশ্রয় পেলেন। শুধু 'স্ত্রিয়াংশ্চরিত্রং' নয়, মনুষ্যচরিত্রই এমন যে 'দেবা ন জানন্তি'!

তখন বাঙালী সাংবাদিকদের মধ্যে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বেঁচে থাকা সত্ত্বেও যাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্পাদক মনে করতাম, সেই সতেজ, সাহসী, স্পষ্টচেতা, স্বচ্ছবুদ্ধি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে হরিপুরায় আমার পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হল। পূর্বেই প্রগতি লেখক আন্দোলনের সুবাদে এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সাহচর্যে আমাদের আত্মীয় সম্পর্ক বেড়েছিল। কলকাতায় এবং মাঝে মাঝে বাইরে একত্র সভাসমিতি বহুবার তখন করা গিয়েছে। যিনি ছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র গৌরবযুগের প্রধান স্রষ্টা, অথচ যাঁকে প্রাক্তন সহযোগী ও সুহৃদ্‌দের সংস্রব ত্যাগ করতে হয়েছিল কারণ নিজের স্বাধীন মতামত বিসর্জন দিয়ে অর্থ ও প্রভাবগৃধ্নুতার কাছে মাথা নত করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, মহাত্মা গান্ধীর একান্ত ভক্ত হয়েও যিনি যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীচিন্তার ব্যর্থতা বোধ করে ক্রমশ, অত্যন্ত স্বাভাবিক বিবর্তনে, আপাতবিচারে বিস্বাদ মার্ক্‌স্‌বাদকে শুধু গ্রহণ নয়, কেমন যেন সহজে ও অকুণ্ঠে আত্মস্থ করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানবিক দৌর্বল্য সম্বন্ধে সুরসিক চেতনা নিয়ে সর্ববিধ গোঁড়ামিকে নিয়ে

রহস্য করতে পারতেন, নিজেকে সেই রহস্যের লক্ষ্যবিন্দু করতে লেশমাত্র সংকুচিত হতেন না, তিনি আজ প্রায় বিস্মৃত— অবশ্য এতে বিশ্বের ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, কিন্তু আমাদের কাছে কেমন যেন লাগে। সুরেন গোস্বামীর কাছে গল্প শুনেছি (হয়তো প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম যুগে তখন একান্ত তরুণ ছাত্র ও লেখক, আমাদের সকল প্রচেষ্টায় সহায়ক, অনিল কাঞ্জিলাল এটা মনে রেখেছেন) যে যশোর শহরে মিটিং করতে গেছেন সত্যেনবাবুর সঙ্গে, রাতের ট্রেনে কলকাতা ফেরা সম্ভব নয়, অথচ তাঁর প্রাত্যহিক রসদ, কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট পানীয়, সভাশেষে অপ্রাপ্য হওয়ায় কয়েকটি কবিরাজী দোকান থেকে 'মৃতসঞ্জীবনীসুরা' সংগ্রহ করে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বিরক্ত সত্যেনবাবু বলছেন : 'আর বাপু, তোমাদের এ-সব মিটিং করে বেড়াব না' ! কালিঘাটের কাছাকাছি সদানন্দ রোডে তাঁর ছোট্ট ক'খানা ঘরের বাসা ছিল আমাদের এক আড্ডা ; সেখানে যাতায়াত সুগম হয়েছিল বিশেষ করে এইজন্য যে কবি অরুণ মিত্র তাঁর সঙ্গে থাকতেন, ঠিক যেন পুত্রস্নেহে আশ্রয় পেয়েছিলেন এবং পরে বিবাহ করেছিলেন সত্যেনবাবুর এক ভাগ্নীকে। পার্টির একজন বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান সদস্য তখন ছিলেন অরুণ-বাবু, এবং নানাভাবে, বিশেষত কর্মক্ষেত্রে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে আমাদের ঘোরাফেরায় প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। যাই হোক্, সত্যেন-বাবুকে নিয়ে আমি হরিপুরা কংগ্রেস উদ্‌বোধনে যোগ দিলাম। একটু দেরিতে গিয়ে নেতাদের মধ্যেই স্থান পাওয়া গেল, পুরো অধিকার নিয়ে প্রথম ঐ-ধরনের রাজনৈতিক সমাবেশে যোগ দিলাম।

বাংলা থেকে গাইয়ের দল গিয়েছিল হরিপুরায়, তাই গান হল বাস্তবিকই চমৎকার— রবীন্দ্রনাথের দেওয়া-সুরে 'বন্দে মাতরম্' প্রথমে, তারপর 'জনগণ-মন অধিনায়ক' আর 'দেশ দেশ নন্দিত করি'। ধন্য ধন্য পড়ে গেল, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় (এককালে হরীন্দ্রনাথের পত্নী, কর্ণাটক-বাসিনী, একদা-খ্যাতনাম্নী, আজও জীবিত আছেন) আমাদের বললেন হেসে, 'Thanks to Bengal'। ইক্‌বালের 'সারে জহাঁসে আচ্ছা' গাওয়া হল, বেহালা-সংযোগে, বিলম্বিত লয়ে একান্ত করুণ সুরে। ইক্‌বালের গান আজ নিয়েছে বিভিন্ন, তেজঃপুঞ্জ রূপ, যার পাশে পুরোনো ভঙ্গী একেবারে ম্লান হয়ে গেছে। সভাপতি সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার কথা আগেই বলেছি ;

জওয়াহরলালের মতো ভাষার ছটা কিম্বা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের বৈদগ্ধ্য ছিল না, কিন্তু ছিল অকপট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, স্পষ্টবাক্যে সক্রিয় সংগ্রাম বিষয়ে দেশবাসীকে আহ্বানের সংকল্প। বাক্যটি উচ্চারণ না করলেও কম্যুনিস্ট পার্টির সেদিনকার 'National Front' তিনি যেন চাইলেন। আমাদের বিশেষ করে ভালো লাগল এজন্য যে সুভাষচন্দ্র ইতিপূর্বে *The Indian Struggle* গ্রন্থে (১৯৩৪) কম্যুনিজ্‌ম্ এবং ফ্যাশিজ্‌ম্-এর খিচুড়ি বানিয়ে 'সাম্যবাদ' বলে এক বস্তু পরিবেশনের কথা লিখেছিলেন, বিশ্লেষণ করেন নি, শুধু অল্প কথায় বলেছিলেন, বোঝা গিয়েছিল যে ফ্যাশিস্ট-প্রচারিত সমাজ-শৃঙ্খলার ছবি তাঁর মনকে টেনেছিল, মারাত্মক ভুল পথে নিয়ে যাবার সম্ভাবনাও রেখেছিল, কিন্তু নিজেকে সামলাতে খুব দেরি তিনি করেন নি। রজনী পাম দত্তের 'লেবর্ মন্থলি' পত্রিকায় বোধ হয় তাঁর সাক্ষাৎকার বেরিয়েছিল; সম্ভবত হরিপুরা বক্তৃতাটিও প্রকাশ হয়েছিল; জানা গিয়েছিল যে ফ্যাশিজ্‌ম্‌কে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বলতে পারি যে সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ডে শেষ পর্যন্ত যে মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে, তার মূলগত হেতু হল তাঁর একাগ্রতা, অর্জুন যেমন লক্ষ্যভেদকালে ঊর্ধ্বে ঘূর্ণায়মান মাছের চোখের তারা ছাড়া অন্য কোথাও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে অস্বীকৃত, তেমনই সুভাষ অটল ঐকান্তিকতা নিয়ে চেয়েছেন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সেজন্য 'শত্রুর যে শত্রু' তার কাছে সহায়তা প্রত্যাশা তাঁর কাছে ছিল স্বাভাবিক, সংগ্রামের আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ্রহাতিশয্য নিয়ে সর্বদা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার জন্যও যেন প্রস্তুত ছিলেন না— এ এমন এক মানসিক পরিস্থিতি যা কখনো কখনো ভ্রান্ত হলেও ইতিহাসের বিচারে শ্রদ্ধেয়। এবং যা সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহু বিচিত্র অধ্যায়ের মধ্যে তাঁর গরিমাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে, সমসাময়িক আলোচনায় এবং পূর্ণ তথ্যের অভাবে যাই বলা এবং ভাবা হয়ে থাকুক-না কেন।

হরিপুরায় শুনলাম কংগ্রেসের নামজাদা সব বক্তার কথা; ভালো লেগেছিল চোস্ত্ ইংরিজী বোল্‌নে-ওয়ালা ভুলাভাই দেশাই-য়ের গুজরাটী বক্তৃতা; আমাদের মতো ক্রিয়াপদের শেষে 'ছে'-র প্রাচুর্যে মজা মনে হয়েছিল। ইনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্যদলের নেতা হয়ে বিচক্ষণ

বুদ্ধিমত্তা ও ওজস্বিতার অনেক পরিচয় দিয়েছিলেন; আইনজীবীরূপে উপার্জন করেছিলেন প্রচুর; অভিজাত জীবনযাত্রাতেও অভ্যস্ত ছিলেন কিন্তু মন ছিল তেজস্বী, কম্যুনিস্টদের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রসঙ্গ রাজনৈতিক আবহাওয়াকে পরে যখন কলুষিত করেছিল তখন তাকে স্বচ্ছ করে নেবার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা সম্ঝোতার মতলবে খোদ্ গান্ধীজীর সম্মতি নিয়ে ১৯৪৫ সালে বেশ কিছুটা এগিয়ে তিনি টের পেলেন সর্দার বল্লভভাই পটেল প্রমুখ ঝুনো কংগ্রেসনেতার শক্রতা কাকে বলে— মওলানা আজাদের *India Wins Freedom* গ্রন্থের পাঠক জানেন যে এই বহুগুণধর দেশভক্তের মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছিল গান্ধী-নামাবলী-পরিহিত, ঈর্ষান্বিত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের চক্রান্তে। হরিপুরায় দেখলাম সর্দার পাটেল সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে আপাতদৃষ্টিতে মর্যাদা দেখালেও দিন গুনছেন তাকে হটিয়ে দেওয়ার সুযোগের অপেক্ষায়— আচার্য কৃপলানি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, গোবিন্দবল্লভ পন্ত্ প্রভৃতির সুকৌশলী সহায়তা নিয়ে এবং তখন স্বকীয় সমীক্ষায় স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ততাসহকারে মগ্ন গান্ধীজীর আশীর্বাদকে পুঁজি ক'রে। জওয়াহরলাল নেহরু আগের দুটো কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হয়েও হরিপুরায় কেমন যেন বেমানান্— সুভাষকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে নিতে পারছেন না, আবার গান্ধী-অনুগামীদের সঙ্গও একটু দুঃসহ!

অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্যরূপে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতিতেও স্থান পেয়েছিলাম। বঙ্কিমবাবু তখন সহ-সভাপতি, আমাদের পার্টির পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী আর কমল সরকার সহ-সম্পাদকদের মধ্যে। স্বয়ং সুভাষচন্দ্র রইলেন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও কর্ণধার। অনতিবিলম্বে দেখলাম রাজনীতিতে ছোটোখাটো 'ভানুমতীর খেল্', কারণ বোম্বাইয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গণ্ডগোলের অছিলায় শ্রমিক-জনতার উপর গুলি ছুড়ল, কয়েকজনের প্রাণহানি হল। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত কম্যুনিস্ট সদস্য ডাঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েক ঘণ্টা এক নাগাড়ে বক্তৃতা করে সরকারকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টায় নামলেন— আমার মনে আছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতিতে এই গুলি চালানোর প্রতিবাদ নিয়ে তুমুল বিতর্ক, কিন্তু সুভাষচন্দ্র বললেন কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতি বল্লভভাই পটেল বোম্বাই মন্ত্রীসভার পক্ষ সমর্থন করেছেন

বলে আমরা ঐ গুলি-চালনায় নিন্দা করতে পারব না! বোম্বাইয়ে প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী হিসাবে বসেছিলেন বি. জি. খের। সর্দার পটেলের মনোনীত তিনি, মানুষটি সৎ বলে পরিচিত কিন্তু বামপন্থার লেশমাত্র সংস্পর্শমুক্ত— সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন তেজস্বী পার্শী নেতা কে. এফ. নরিমান্‌কে, যিনি বামপন্থী পুরো না হলেও কতকটা সেদিকে ঝুঁকেছিলেন, যাঁকে মন্ত্রীসভায় নেতৃপদে বসালে দেশের যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ক্রমশ বিকট হয়ে উঠছিল তার কথঞ্চিৎ প্রশমন হয়তো ঘটত, কিন্তু সুচতুর ষড়যন্ত্রের জোরে সুভাষচন্দ্র পরাজিত হয়েছিলেন। আরো দেখলাম যে মাদ্রাজ প্রদেশে প্রধানমন্ত্রী রাজাগোপালাচারি সমাজবাদী প্রচারের অভিযোগে সোলি বাটলিওয়ালাকে জেলে পুরলেন, বামপন্থীরা সবাই মিলে আপত্তি জানাল; সুভাষচন্দ্র অস্বস্তি বোধ করলেন, কিন্তু কোনো সুরাহা সম্ভব হল না।

প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে যে বাড়িতে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যালয় ছিল সেখানে কিছুদিন একটু উৎসাহ নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে যেতাম, সম্পাদক আশ্‌রফ্‌ উদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরীর অমায়িক হাসি উপভোগ করতাম (যদিও হাসির পিছনে প্রকৃত রাজনৈতিক নিষ্ঠা কতটা ছিল জানি না)। সুভাষচন্দ্র একটু চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেস-সংগঠনের মধ্যে তত্ত্বগত শিক্ষা প্রসার ব্যাপারে, কিন্তু তা স্তিমিত ও স্তব্ধ হয়ে গেল, কংগ্রেসের চিরাচরিত 'real-politik' চলতে থাকল। আমার মতো ব্যক্তি হয়তো একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেই পার্টির পরিচিত কোটরে ফিরে এলাম— মজা লাগে ভাবতে যে হয়তো কিছুটা মাদকের সৃষ্টি হত বে-আইনী পার্টি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগে (ছদ্ম নাম ব্যবহার এবং কয়েক বৎসরের অভ্যাসে block letter-এ চিঠি লেখা আমার সড়োগড়ো হয়ে গিয়েছিল)— তখনকার বহুমুখী ফ্যাশিস্ট-বিরোধী প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে দুধ-কলা দিয়ে যে ফ্যাশিস্ট সাপকে পুষ্ট করছিল ইংরেজ সম্রাজ্যবাদ তার বিপক্ষে যথাসম্ভব প্রচেষ্টায় যুক্ত থাকা গেল। ছাত্রেরা ছিল সে যুগের ঐ-প্রচেষ্টার প্রধান অবলম্বন; বন্দীমুক্তি নিয়ে গর্জন করে উঠত তারা, জীবন ও সাহিত্যকে মুক্তিপথে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ছাত্রদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারা অনেকে অগ্রণী, ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হল যে পতাকা নিয়ে তাতে 'স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতি' এই শব্দত্রয় খোদিত হয়ে

রইল। জাতীয় সংগ্রামের সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান যে জনশক্তি তাকে আহরণ করার কাজ অবশ্য আরম্ভ হয়েছিল— বলা যেতে পারে ১৯৩৮ সালে কুমিল্লায় সারা ভারত কিসান সভার অধিবেশন থেকে কৃষক আন্দোলনের প্রকৃত পত্তন (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বোধ হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন)। আর তখন বোম্বাইয়ের গির্নি কামগড় ইউনিয়ন আর কলকাতার ট্রামশ্রমিক ইউনিয়ন (সঙ্গে সঙ্গে চটকল আর ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মজুরসংস্থা) প্রভৃতিকে অবলম্বন করে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপক জাতীয় ভূমিকা উপস্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ লোকের চোখে তখন ছাত্রদের সংগঠন আর জমায়েৎ আর জুলুস আর রাজনৈতিক 'জোশ্' দেশের মুক্তি সংগ্রামে মহামূল্যবান এক অস্ত্ররূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ছাত্র আন্দোলনে শুধু যে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অমিয় দাশগুপ্ত, অবনী লাহিড়ী, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, অন্নদা ভট্টাচার্য প্রভৃতির মতো সচেতন সংগঠন-প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল তা নয়— কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে 'ভালো' ছেলে বলে যশস্বী অনেকেই এগিয়ে এলেন। করুণা মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ গুহ, সুনীল মুনসী, সরোজ গুহ, সুনীল সেন প্রভৃতিকে দেখা গেল সর্বক্ষণের পার্টিকর্মী হিসাবে। ছাত্র ফেডারেশনের বাংলা প্রাদেশিক শাখার প্রায়-স্থায়ী সভাপতি হয়ে বহু বৎসর ছিলেন দিল্লী থেকে আসা কে. এম. আহ্‌মদ— তবে ঢের বেশি উল্লেখযোগ্য (যদিও এটা একটু পরের ঘটনা) তাঁর উত্তরাধিকারী সাধনচন্দ্র গুপ্ত। নানাভাবে আমাদের বন্ধু ও সহায়ক, কংগ্রেসনেতা জে. সি. গুপ্ত-এর এই মেধাবী পুত্র আকৈশোর কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে লিপ্ত। আজ সে 'মার্ক্‌স্‌বাদী' খাতায় নাম লেখালেও তার বৈশিষ্ট্য আমার মনে জ্বল জ্বল করছে। প্রায়-জন্মান্ধ হয়েও যে অদ্ভুত চিন্তা ও কর্মক্ষমতা সে দেখিয়েছে তার প্রশস্তি গাইতে আমি হর্ষ বোধ করছি। পার্লামেন্টে প্রায় দশবৎসর সে আমার সঙ্গে কাজ করেছে; তার বাড়িতে, সভাসমিতিতে, একত্র রেলভ্রমণে ও অন্য ব্যপদেশে কাছ থেকে বহুবার তাকে আমি দেখেছি। বাংলায় সুবক্তা, নিখুঁত ইংরিজীতে পারদর্শী, শ্রোতাদের চোখে দেখতে না পাওয়ার ফলে অল্প একটু অস্বস্তি ভিন্ন তার ভাষণে কোনো গলদ নেই। দৃষ্টিহীন হয়েও প্রাণচঞ্চল, সংগীতে পটু, কথোপকথনে সাবলীল এই মানুষটিকে দেখেছি লোকসভায় 'ব্রেল' অক্ষরের

ওপর হাত বুলিয়ে বক্তৃতা করছে, যুক্তিতর্কের কোনো বিন্যাসই তাকে এড়িয়ে যেতে পারছে না, দেখেছি নিজের 'ব্রেল' টাইপরাইটার চালাচ্ছে, স্পর্শ ও বোধ -শক্তির জোরে তরতর করে রাস্তায় হাঁটছে, ক্রিকেট খেলা দেখছে আর প্রাণ খুলে উপভোগ করছে। আমার খুব রাগ (এবং দুঃখ) হয়েছিল যখন দিল্লীতে বিশ্ববিদিতা Helen Keller এলেন, অন্ধ হয়েও যিনি প্রতিভা-মণ্ডিতা, কর্মমগ্ন— কেউ ব্যবস্থা করে দিল না সাধনের সঙ্গে তার সাক্ষাতের, পার্লামেণ্টে রোজ দেখা সত্ত্বেও জওয়াহরলাল নেহরুও না, কারণ বোধ হয় সাধন কম্যুনিস্ট এবং সেজন্য সম্ভ্রান্ত সমাজে (নিজে ধনীর সন্তান হয়েও) কতকটা অস্পৃশ্য !

* * *

'ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ, সিদ্ধে কার্যে সমং ফলং' বলে ছেলেবেলায় শোনা একটা কথা মনে আছে। তবে ওভাবে হিসাব না করেই ঠেলেঠুলে এগিয়ে সবার সামনে দাঁড়ানো নিয়ে আমার আজন্ম অস্বস্তি, তা হলফ করে বলতে পারি। রাজনীতি ক্ষেত্রে (এবং আইন ব্যবসাতে) এ ধরনের মানসিকতা যে মূর্খামি তা জানি, কিন্তু উপায় নেই। সত্যেন মজুমদার মশায় ঠাট্টা করে বলতেন : 'অন্তঃপুর থেকে মালা পরিয়ে কেউ তো বাইরে টেনে আনবে না, তাই নিজেকে একটু জাহির না করলে চলবে কেমন করে?' একবর্ণ মিথ্যা বলছি না, কিন্তু হাজার বক্তৃতামঞ্চে দাপট প্রকাশ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত প্রায়ই বলবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিস্বাদ লাগে, আবার এ-বিড়ম্বনায় জড়িয়ে পড়ছি কেন ভাবি, তবে বলতে উঠে হয়তো নৈর্ব্যক্তিক একটা উন্মাদনা আসে। অস্বস্তি বিস্মৃত হয়ে যায়, ভাষণান্তে বুঝতে পারি বলাটা ভালো হয়েছে কি হয় নি। তখনো যদি গ্লানি বোধ করি তো জানি বলায় গলদ থেকে গেছে ! কেবল রাজনীতিগত বক্তৃতা নয়, অধ্যাপনা এবং অন্যবিধ অর্থবহ আলোচনা ব্যাপারেও আমার এই অভিজ্ঞতা। এ হেন মনোবৃত্তি, রাজনীতি বেশ কিছু পরিমাণে যে করবে তার পক্ষে মারাত্মক। আমার ক্ষেত্রে ক্ষতি হয় নি কারণ বলতে সংকোচ নেই যে আত্মপ্রতিষ্ঠার কোনো প্রত্যাশা নিয়ে সে যুগে আমরা কেউই কম্যুনিস্ট আন্দোলনে শামিল হই নি। কলকাতায় একই এলাকা ১৯৫২ সাল থেকে পাঁচবার সাধারণ নির্বাচনে আমাকে লোকসভায় পাঠিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য পার্টিসাথীদের মতোই এ-ধরনের পুরস্কার-সম্ভাবনা নিয়ে কেউ

তখন পার্টিতে আসি নি। বরং জানতাম (আর মোটামুটি আজও জানি) যে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী (লেনিন যাদের বলেছেন 'professional revolutionaries') ভিন্ন অন্য কেউ পার্টির নেতৃত্বে থাকতে পারে না। অনেকেরই মনে পড়বে ১৯৪৬ সালে কয়েকদিন কলকাতায় প্রথম এসেছিলেন ভারতীয় কম্যুনিস্টদের এক প্রধান শিক্ষাগুরু— রজনী পাম দত্ত। মুহম্মদ আলী পার্কে তাঁর যেদিন বক্তৃতা সেদিন বিপুল আয়োজন, আর আলোচনান্তে স্থির হল যে কমরেড দত্তের সঙ্গে মঞ্চে বসবেন শুধু প্রাদেশিক কমিটির তৎকালীন সাতজন সদস্য আর বলবেন শুধু সম্পাদক ভবানী সেন। অধুনা পরিবর্তন বোধ হয় কিছু ঘটেছে, বিত্তবান্ পরিবার থেকে কেউ কেউ এসেছেন নেতৃত্বে ; পরিশ্রম তাদের অবশ্যই করতে হয়েছে, পার্টি নির্দেশ নিয়ত মানতে প্রস্তুত থাকতে হয়েছে, কিন্তু পূর্বাচরিত কৃচ্ছ্রসাধন আর যেন তেমন বাধ্যতামূলক থাকে নি (যার ফলে কাজে হয়তো কিছু উন্নতি ঘটেছে, তবে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার বিপদও যে উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে তা না বলে পারছি না)। যাই হোক, আমার নিজের মনের গড়নে সংকোচের প্রাবল্য এমন যে কোনো কালেই তেড়ে ফুড়ে এগিয়ে চলা কোনো ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নি। বক্তৃতা এবং আলোচনায় ভিন্ন আমার কথায় এবং ধরন-ধারণে বোধ হয় তাই থেকে গেছে একপ্রকার মৃদু, আক্রমণবিমুখ সৌজন্য, যার তাৎপর্য সম্ভবত হল বিপ্লবী চরিত্রের দার্ঢ্য অর্জনে অসামর্থ্য— হয়তো এজন্যই ১৯৩৭ সালের জয়প্রকাশ নারায়ণ থেকে আজকের এন জি. গোরে, এস. এম. জোশী, মধু লিমায়ে-র মতো কম্যুনিস্টবিরোধীদের কাছে আমি অপর কমরেডদের চেয়ে সহনীয়, এমন-কি, সম্পূর্ণানন্দের মতো ব্যক্তির কাছেও বিস্ময়কর হৃদ্যতার পরিচয় পেয়েছি। নিজের গুণ গাইছি না এখানে, কারণ খুব সম্ভব এটা গুণ নয়, এটা এক ধরনের দুর্বলতা আর দোষ।

কিন্তু জোর করে সঙ্গে সঙ্গে বলব যে কম্যুনিস্ট মতবাদ— না বলব জীবন-দর্শন, বিশ্ববীক্ষা ?— গ্রহণ-ব্যাপারে আমার মনে কোথাও খাদ থাকে নি। স্বীকার না করে পারি না যে 'কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল'-এর যুগ থেকে অল্পাধিক আজ পর্যন্ত পার্টিশৃঙ্খলার সর্বব্যাপিতা মাঝে মাঝে একটু যেন আতংকিত করেছে। সম্প্রতি বুঝি Merleau-Ponty কিম্বা আর কোনো এক ফরাসী চিন্তাবিদ বলেছেন মার্ক্সবাদ বিশ্বাসীদের কাছ থেকে দাবি করে

'বড় বেশি প্রচণ্ড এক "হাঁ"' ('*un oui trop massif*')—কথাটা অসত্য নয়, কারণ নির্দেশে সায় দিতে কখনো কখনো সংকট ঘটেছে, সময় লেগেছে (যেমন ভারতবর্ষে ১৯৪১ সালে সোভিয়েট আক্রান্ত হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জনযুদ্ধে রূপান্তর-সম্বন্ধিত সিদ্ধান্তে)। কিন্তু সন্দেহ নেই যে অনেক চিন্তার পর হলেও সায় আমরা দিয়েছি, দিতে পেরেছি, দিতে চেয়েছি, দেশে এবং বিদেশে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের স্বার্থেই তা প্রতি ক্ষেত্রে করেছি। এতে যে ভুলভ্রান্তি কখনো হয় নি, হতে পারে না, তাই বা কে বলবে? তবে, কেউ যেন এ-উদ্ধৃতিতে রুষ্ট বা বিরক্ত না হন্, আগে হয়তো বলেছি যে খোদ ট্রট্‌স্কিই একবার বলেন: **'I cannot be right without or against the Party'**! ভুলভ্রান্তি হবে না জীবনগত কোনো ব্যাপারে, এ তো উদ্ভট কথা! নিছক নিরেট নির্ভুল কাজ আর কথা সর্বদা সম্ভব ভাবাই যে অমানুষিকতা! সর্ববিধ গ্লানিমুক্ত অস্তিত্ব স্বর্গে বিরাজ করতে পারে, কিন্তু মাটির মানুষ সেজন্য লালায়িত নয়। কম্যুনিস্টরা কখনো বলে না তারা নিয়ত নির্ভুল পথে চলে থাকে; আত্মসমালোচনা তাদের সতত কর্তব্য; যথাসাধ্য পর্যালোচনার পরিণতি যে-সিদ্ধান্ত তাতে অটল থাকা তাদের কাম্য।

১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে 'পরিচয়' বৈঠকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মাঝে মাঝে সহাস্যে ও উচ্চৈঃস্বরে 'Unclc Joe' বলে স্টালিনের কঠোর সমালোচনা করতেন— মনে রাখতে হবে যে তখন ক্রমান্বয়ে সোভিয়েট-বিপ্লবের বহু প্রাক্তন নায়কের বিচার ও দণ্ডের ফলে প্রচুর বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছাড়া সুধীন্দ্রনাথ কখনো কম্যুনিস্ট চিন্তা ও কর্মের সমর্থক ছিলেন না। তবে আমার মনে পড়ছে সেদিনের কথা কারণ স্টালিনের লেনিনবাদ ব্যাখ্যা বিনা আমরা অনেকে সে যুগে আন্দোলনে মিশে যেতে পারতাম কিনা জানি না। স্টালিন-বিষয়ে আমার মনে বিলাতে অর্জিত অপ্রসন্নতা আজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাশক্তি অধ্যয়নের ফলে একেবারে কেটে গিয়েছিল। পার্টি-সম্পাদক পি. সি. জোশী তখন প্রায় বলতেন: 'মার্ক্‌স্‌ লিখে গেলেন লেনিনের জন্য, লেনিন লিখলেন স্টালিনের জন্য, আর স্টালিন লিখেছেন আমাদের সকলের জন্য!' সূক্ষ্ম বিচার যাই বলুক-না কেন, স্টালিনের স্বচ্ছ (হয়তো অতি-স্বচ্ছ) ব্যাখ্যা বিনা আমাদের রাস্তা সহজ হত না; হয়তো এজন্যই কিছু ফাঁকি থেকে গেছে, কিন্তু আবার বলি জীবন তো "শুদ্ধ,

অপাপবিদ্ধ" কিছু নয়। মার্ক্স্-এঙ্গেলস্-লেনিনের সঙ্গে স্টালিনের নামোচ্চারণ আজ কিছুকাল নিষিদ্ধ হয়ে রয়েছে ; এক নিশ্বাসে চার নাম করাও সম্ভবত ঠিক নয়— কিন্তু দেশে দেশে অগণিত কম্যুনিস্ট কর্মী স্টালিনের কাছে এত ঋণী যে মনের মণিকোঠা থেকে স্টালিনকে তারা সরাতে পারবে না। সংশয় নেই যে স্টালিনের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব ও ভূমিকায় বিকৃতি আছে, অসংগতি আছে, কিছু পরিমাণে দৌরাত্ম্য পর্যন্ত আছে, কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র বিষম বিরাট পশ্চাৎপটে রেখে তার বিচার সহজ কর্ম নয় ; ইতিহাস না-হয় কিছুকাল অপেক্ষা করুক সেজন্য।

আগে লিখেছি ছাত্রাবস্থা থেকে বার্ট্রাণ্ড রাসেল-বিষয়ে আমার মনের মোহের কথা। বিলাতে থাকতে থাকতেই একবার বিরক্ত হয়েছিলাম শুনে রাধাকৃষ্ণনের মুখে যে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপনা প্রস্তাবে রাসেল নাকি বলেন যে বিংশ শতাব্দীতে তিনি মধ্যযুগে বসবাস করতে সাময়িক ভাবেও প্রস্তুত নন! দেশে ফিরে চমৎকার লেগেছিল কার্ল রাদেক্-এর মন্তব্য রাসেল-রচিত *The Theory and Practice of Bolshevism* সম্বন্ধে ; 'রাসেল-সাহেব ঘরে ফিরে আগুনের দিকে পা তুলে পাইপ টানছেন, রুশ বিপ্লবকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি তুষ্ট, কিন্তু রাদেক্-এর মতো হতভাগা বলশেভিকদের তো আর অমন আয়াস করা চলবে না, বিপ্লবের জ্বলতে-থাকা আগুনের মধ্যেই তাদের পরীক্ষা চলছে!' আবার দেখলাম রাসেল-এর লেখা *Freedom and Organization* গ্রন্থ, ১৮১৫ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত কালের ইতিহাস— আশ্চর্য হলাম অমন সত্যসন্ধ বলে খ্যাত জ্ঞানান্বেষীর মনের নোংরা বিকার দেখে। কার্ল মার্ক্স্কে হেয় করার জন্য তিনি বইয়ের এক জায়গায় লিখলেন যে মার্ক্স্ মানুষ হিসাবে নিম্নস্তরের, কারণ পরম বন্ধু (এবং উপকারক) এঙ্গেল্স্ যখন জীবনসঙ্গিনী মেরীর মৃত্যুতে মর্মাহত, তখন সমবেদনা জানানো দূরে থাকুক, চিঠিতে কেবল নিজের দৈন্যদশার কথা লিখে মার্ক্স্ আরো সাহায্য চেয়েছিলেন। কথাটার প্রমাণ হিসেবে Otto Rühle-কৃত মার্ক্স্-এর জীবনী গ্রন্থটি রাসেল উল্লেখ করেন, আর ভাগ্যক্রমে একখণ্ড ঐ-গ্রন্থ আমার সংগ্রহে এসেছিল (আজও আছে)— সেটা উলটে দেখি পরপর দুই পৃষ্ঠায় Rühle ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, এবং এটা স্পষ্ট যে দৈন্য-জর্জরিত কার্ল মার্ক্স্ তখন

অতিরিক্ত ক্লিষ্ট, কিন্তু দুই প্রিয় বন্ধুর পরস্পর বোঝাবুঝির মধ্যে কোনো চিড় ঘটার কারণ দেখা দেয় নি। নিজের মনের কুসংস্কারের বশে রাসেল-এর মতো মনীষী (ও নানাদিক থেকে প্রকৃত মহাপুরুষ) যে এত বড়ো অবিচার নির্লজ্জভাবে করতে পারেন মার্ক্‌স্‌-এর সম্বন্ধে, তা থেকে আমি বুঝেছি, অটল ভাবে বুঝেছি, বিপ্লব-বিষয়ে বুর্জোয়া শত্রুতার অমোঘ অবশ্যম্ভাবিতা। এ এমন এক অভিজ্ঞতা যা গুণগতভাবে আমার চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। হয়তো এই প্রভাবের কল্যাণে Emile Burns -সম্পাদিত *A Handbook of Marxism* (যাতে মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেলস্‌, লেনিন, স্টালিন-এর লেখা এবং কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের প্রস্তাব থেকে অমূল্য সঞ্চয়ন ছিল) সমালোচনা করেছিলাম 'পরিচয়'-এর জন্য— লেখাটা হারিয়ে গেছে, কিন্তু সেটাকে খুঁজে পেলে খুশিই হব। মনে আছে সুরেন গোস্বামী 'পরিচয়'-এর এক বৈঠকে এসে বললেন ট্রামে বসে (বসা তখন যেত!) সমালোচনাটা পড়তে পড়তে চলে গিয়েছিলেন শ্যামবাজার ডিপো পর্যন্ত, খাসা হয়েছে জিনিসটা! সুধীনবাবু আমার গদ্যরীতি পছন্দ করতেন এবং মতভেদ ভুলে গিয়ে তারিফ জানালেন— বলতে ইচ্ছে করছে এই প্রসঙ্গে যে বাংলা গদ্য লিখিয়েদের মধ্যে হাবুলবাবুকে (হিরণকুমার সান্যাল) সুধীনবাবু বসাতেন প্রথম সারিতে (যা একান্ত সঠিক), কিন্তু আমার দুঃখ যে তাঁর রচনার প্রবাহ সম্ভবত বৃহৎ পাঠক-সাধারণের অচেতন অনীহার স্পর্শে শুকিয়ে গেল।

১৯৩৮ সালে বোধ হয় গোপাল হালদার মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হ'ল— যতদূর মনে পড়ে, তাঁর 'একদা' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম আর প্রথম আলাপ হয় বর্মন স্ট্রীটে আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের নড়বড়ে বাড়ির তেতলা ছোটো ঘরে। এর বছর খানেক আগে যোগাযোগ হয় চিন্মোহন সেহানবিশের সঙ্গে; কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টিতে আমার মতো তিনিও নাম লিখিয়েছিলেন, তবে প্রথম সাক্ষাতের সময় জানতাম না তিনিও 'নিষিদ্ধ' কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য— আলাপ করলেন কোথায় যেন পাঠচক্রে সাম্যবাদ বিষয়ে বক্তৃতা সম্বন্ধে। তখন আমাদের প্রচারের এক প্রধান অস্ত্র ছিল 'স্টাডি সার্ক্‌ল্‌'; কলকাতা আর উপকণ্ঠে প্রায় চষে বেড়াতে হয়েছিল পাঠচক্রের সুবাদে; কলেজে আমার ছাত্রেরা উদ্যোগী হয়ে বেলেঘাটায় যে 'মার্ক্‌সিস্ট্‌ স্টাডি ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করে তার ভূমিকা তো ঐ এলাকার প্রবল রাজনৈতিক

চেতনা সৃষ্টি ব্যাপার কম নয়। গোপালবাবু সর্বজনবিদিত এবং একান্ত অমায়িকতা ও সারল্যগুণে সর্বজনপ্রিয়; আমি কাউকে 'দাদা' 'কাকা' বলে ডাকতে পারি না, কিন্তু গোপালবাবুকে দেখলাম এমন মানুষ যে অন্য বয়ঃ-কনিষ্ঠ সকলে সহজে এবং স্বাভাবিক ভাবেই 'দাদা' বলতে এবং আত্মীয় মনে করতে পারে। চিনুবাবুকে ('চিন্মোহনবাবু' কেউ তাঁকে বলেছে শুনি নি প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসরে) দেখে মনে হল ভিতরটা গম্ভীর, ব্যবহারে অত্যন্ত ভদ্র অথচ স্বচ্ছ; ক্রমশ জানলাম কথোপকথনে তাঁর বাক্‌পটুত্ব; মজলিসী অথচ সংযত, ধীর স্থির এই কাজের মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনলাম; আজও পর্যন্ত তাঁর যুবা-বয়সের চেহারা অবিকৃত, বিনা আড়ম্বরে অনলস প্রযত্নে লিপ্ত রয়েছেন পার্টি এবং সর্ববিধ প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যে। আনন্দ-বাজার কার্যালয়ে কবি অরুণ মিত্রের কল্যাণে শুধু যে এক-টেবিলের কর্মী নৃপেন চক্রবর্তীর মতো নিষ্ঠাবান্ কম্যুনিস্টকে (রাজনীতি জীবনের প্রথম পর্যায়ে ছিলেন কুমিল্লা অভয় আশ্রমের গান্ধীবাদী কর্মী) কাছ থেকে জানলাম তা নয়, ক্রমশ পরিচয়ের পরিধি বিস্তৃত হল, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ঘটল। আনন্দবাজার রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মন্মথনাথ সান্যাল, যাঁর ঘরে প্রায়ই বসে চা-পান ও গল্প চলত, দেখা হত আরো অনেক নামকরা লেখকের সঙ্গে। 'প্রগতি' কথাটার উপর সবাই প্রসন্ন না হলেও বোঝা যেত যে দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে লেখকশিল্পীর কাছে সমাজ-রূপান্তরের কল্পনা এবং প্রয়াস অনাত্মীয় তো নয়ই, বরঞ্চ যেন মর্মস্পর্শী বলে অনুভূত হচ্ছে। মন্মথবাবুর ঘরেই বোধ হয় একবার একটা কথা আড্ডার ছলে তুলে আমি পরে একটু বিড়ম্বিত হয়েছিলাম। সন-তারিখ মনে আসছে না, তবে সুলেখক সুবোধ ঘোষ 'ফসিল' গল্পটি লিখে যখন চারদিকে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন, তখন সর্বত্র তাই নিয়ে আলোচনা। আইয়ুব একদিন আমাকে বলে যে গল্পটি খাসা কিন্তু সুবোধবাবু 'আট বর্গ মাইল'-এর মধ্যে (যা হল গল্পের অকুস্থল অঞ্জনগড়ের আয়তন) কেল্লা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, বাড়ি ঘর দোর ইত্যাদি ঢোকালেন কেমন করে, আর 'ট্রট্', 'ক্যান্টর' ইত্যাদি শব্দ একটু এলোমেলোভাবে ব্যবহার করলেন কেন? আমারও মনে খট্‌কা লাগল. আর দু'জনে ভাবলাম যে কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা এবং অন্ধ বাউলের

অন্তর্দৃষ্টিতে মুগ্ধ আমরা চোখ ভালো করে খুলে বড়ো একটা দেখি না, এমনকি লেখকরাও না। এই জল্পনা বোকার মতো মন্মথবাবুর ঘরে বসে করে পরে জানলাম কে বা কারা রঙ চড়িয়ে কথাটা সুবোধবাবুকে জানিয়েছে এবং স্বভাবতই তিনি আমার ওপর রুষ্ট, সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি সাহিত্যওয়ালাদের ওপরও 'খাপ্পা' হয়েছেন— নিজের অজ্ঞাতে আন্দোলনকে আমি এভাবে হয়তো একটু ক্ষতিগ্রস্তই করে ফেলেছিলাম। বোধকরি অন্তরঙ্গ না হলে পরস্পরকে নিয়ে হাসাহাসিতে বিপদ আছে, তা আমার জানা উচিত ছিল। সবাই আর চিনুবাবু নন্, যিনি সদাব্যস্ত বলে ঠাট্টা করে তার সম্বন্ধে বহুদিন বলা হয়ে আসছে যে 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট' যদি তার সঙ্গে করা থাকে তো নির্ঘাৎ দেখা হবে না, দেখা যদি কেউ করতে চায় তো উচিত দিনক্ষণ আগেভাগে ঠিক না করা।

চীন, অ্যাবিসীনিয়া, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশকে নিয়ে ফ্যাশিজমের কদর্য কুকীর্তি আর তার পিছনে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ সমর্থন তখন আমাদের দেশের সর্বস্তরে নতুন চেতনা উদ্রিক্ত করছিল, 'অভিজাত' পত্রিকা বলে বর্ণিত 'পরিচয়' ফ্যাশিস্টবিরোধী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকায় নেমেছিল। পরাধীন ভারতবাসীর সামনে কত কাজ তখন পড়ে রয়েছে তার ভাবনা মনে ভিড় করেছিল। খ্যাতনামা সাংবাদিক Vincent Sheean-এর *In Search of History* (১৯২৯ কিম্বা ১৯৩০ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে আরব মুক্তি প্রচেষ্টায় নিরত 'রিফ্' নেতা আবদুল করিমকে Sheean বুঝি ভূমধ্যসাগরকূলে এক মনোরম স্থান দেখে সোৎসাহে বলে ওঠেন এখানে একটা 'Casino' নেহাৎ দরকার আর জবাব শোনেন : 'হ্যাঁ, তা বটে, তবে এখানে দরকার আরো অনেক জিনিস।' ভারতবর্ষের কোনো দামী 'দরকার' তখনো মেটে নি— দেশ মুক্ত নয়, জীবন গ্লানিতে ভরা, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভণ্ডামির মুখোস পরে চলতে চায় কিন্তু ফ্যাশিস্ট পৈশাচিকতার লালনপালনে তার ব্যগ্রতা স্পষ্ট। জগৎ জুড়ে ফ্যাশিজ্‌মকে রোধ করার লড়াইয়ে ভারতবর্ষকে তাই অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়তে হল, আর ঐতিহাসিক এই বিবর্তনের ছায়া পড়ল আমাদের রাজনীতিতে, আমাদের সাহিত্যে, আমাদের জীবনে।

* * *

কোথায় যেন দেখলাম ১৯৩৭ সালে চন্দননগরে ধূমধাম করে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরীকে নিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাতে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘ পাত্তা পায় নি। কথাটা ভুল নয়, কিন্তু প্রগতি আন্দোলনের মূল্যায়নে আরো বহু কথা ভাববার আছে। সংঘের প্রথম সভাপতি নরেশ সেনগুপ্ত তো নিজেই লিখেছেন 'প্রগতি' সংকলনে যে 'দল বাঁধিয়া সাহিত্য রচনা হয় না,' তবে প্রকৃত সাহিত্য সিদ্ধির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টিতে 'দল বাঁধার'ও অবদান আছে। লক্ষ্ণৌয়ে প্রথম নিখিল-ভারত সম্মেলনের (১৯৩৬) আগে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যখন ক'জন মিলে যাই, তখন তিনি এই 'দল বাঁধা' নিয়ে এবং সুরেন গোস্বামী ও আমার অধ্যাপকবৃত্তি নিয়ে হাসিঠাট্টা করলেন, এবং একটা 'বাণী' অবশ্য দিলেন, কিন্তু খুব স্বচ্ছন্দে নয়, কারণ ব্যাপারটা ঠিক মনঃপূত ছিল না। ১৯৩৮ সালের শেষে কলকাতায় দ্বিতীয় সম্মেলন যখন হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ উদ্‌বোধনী যে ভাষণ লিখে পাঠান, তাতে সোজাসুজি সাহিত্যের কথা প্রায় ছিল না, ছিল তুরস্কের জাগরণ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার পরিচয়— সম্ভবত তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে পোষাকী সমাবেশে নিছক্ সাহিত্য চর্চা না হয় থাক্! কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা চলে যে শরৎচন্দ্রের মরমী মনে সাহিত্য ও জনজীবনের সংযুক্তি ছিল অকাট্য, আর 'বিশ্বসাথে যোগে' যাঁর বিহার সেই সমুদ্রমনা রবীন্দ্রনাথ জানতেন সমকালীন মানুষের জগতে অনেক ঝঞ্ঝা আসছে, শুনেছিলেন 'পিনাকেতে লাগে টঙ্কার— বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার'। প্রগতি লেখক সংঘের কথা বলছি না, কিন্তু এই আন্দোলনের মূল উপজীব্য যে চিন্তা, তাকে গত চল্লিশ বৎসরে একেবারে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন বোধ হয় মাত্র দু'জন কৃতবিদ্য বাঙালী লেখক— মোহিতলাল মজুমদার এবং 'বনফুল'— অপর সকলে যে একে সর্বদা স্বাগত জানিয়েছেন তা নয়, কিন্তু পূর্ণ প্রত্যাখ্যান কখনো করেন নি, মাঝে মাঝে সখ্যবন্ধনে নিজেদের বাঁধতেও কুণ্ঠিত হন্ নি। তাই যখন দেখি যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো সব অর্থে বিরাট এক ব্যক্তিকে প্রগতি সাহিত্য চিন্তার নিত্য প্রতিকূল এক শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়, তখন হাসি পায়। একবারও বলছি না যে সুধীন্দ্রনাথ প্রগতি সাহিত্য চিন্তাকে গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে, এবং বিশেষ করে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো শক্তিমান্, অথচ সর্বথা ব্যর্থ, মনস্বী

অথচ উদ্ভট আত্মম্ভরিতায় বিকৃত মানুষের সাহচর্যে নিজস্ব সত্তার সর্ববিধ শুভচেতনা থেকে বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ তিনি খুঁজেছিলেন নানা অবান্তর প্রয়াসে —বোধ করি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যপিপাসু বিদ্যার্থীদের সামীপ্য ভিন্ন :তখন আত্মার সান্ত্বনা সুধীন্দ্রনাথের অল্পই ছিল। কিন্তু সহজাত দাক্ষিণ্য নিয়ে আমাদের মতো লোকের খুবই কাছে তিনি এসেছিলেন— শুধু যে ব্যক্তিগতভাবে বন্নে জহীর আর আবদুল আলীমকে অভ্যর্থনা, কিম্বা প্রগতি লেখক সম্মেলনকালে স্বগৃহে প্রখ্যাত উর্দু কবি মজাজ এবং তখন একান্ত তরুণ আলী সর্দার জাফ্‌রি-কে সমাদরে স্থান দিয়েছেন, তা নয়। মার্ক্‌সীয় দর্শন নিয়ে তুমুল তর্ক অবশ্য করেছেন, কিন্তু প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীতে (১৯৩৮) বসতে কুণ্ঠিত হন্‌ নি, লিখিত অভিভাষণ সংঘের পত্রিকায় মুদ্রিত হতে অনুমতি দিয়েছেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে কম্যুনিজম-এর বিশ্ববীক্ষা তিনি সম্পূর্ণ পরিহার করেছিলেন বটে, আর কোনো কালেই কম্যুনিজম্‌কে পুরোপুরি গ্রহণ তিনি করেন নি, কিন্তু যখন তাঁর প্রতিভা ও চারিত্র্যের মধ্যাহ্ন, বাক্যের সার্থকতা এবং সুষমাকে নিয়ে স্থাপত্য রচনা যখন তিনি করছিলেন, তখন কম্যুনিজম্‌কে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, বৈরীভাবে হলেও অভিবাদনে কুণ্ঠিত হতেন না। জাহাজী ইউ-নিয়ন এবং ভাবপ্লাবী কথা নিয়ে সমানভাবে পাগল কবি মহীউদ্দীনের মতো মানুষকেও তিনি নমস্কার করতেন, বিদ্রূপভাজন ভাবতেন না।

সামনে থেকে সত্যেন মজুমদার মহাশয়, আর একটু যেন অন্তরালে থেকে, বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় যারা ঘোরে তাদের তিন-পুরুষের বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রগতি আন্দোলনকে 'মদদ্‌' দিয়ে চলছিলেন। তবে আমাদের সৌভাগ্য যে প্রথম থেকে, কারো কারো সংশয় সত্ত্বেও, কবি বিষ্ণু দে-কে বন্ধু ও সহায়করূপে পাওয়া গিয়েছিল— এবং কতকটা সেজন্যই বিনাক্লেশে বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, একটু পরে সমর সেন, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কবির আনুকূল্য মিলেছিল। সংসারই যখন অনিত্য, তখন দুঃখ করে লাভ নেই যে এদের সকলের আনুকূল্য স্থায়ী হয় নি, কিন্তু সে কথা যাক্‌। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর রচয়িতা সম্বন্ধে একটু সন্দেহ যে ছিল না প্রথমে, তা বলব না; ভারতজীবনের বিচিত্র চেহারা দেখে গভীরভাবে বিষণ্ণ অথচ আপাতদৃষ্টিতে ঈষৎ পুলকিত কবি বিচ্ছিন্নতার দূরাবস্থিত শিখর থেকে

মনোরম ব্যাজোক্তি এবং তার পৌনঃপুনিকতাতেই পর্যবসিত থাকবেন, এবম্বিধ সংশয় যে জাগে নি, তা নয়। কিন্তু অচিরে জানা গেল সন্দেহ অমূলক। কাছাকাছি মানুষ সম্বন্ধে যেমন তাঁর আগ্রহাতিশয্য— বন্ধুদের বিবাহ-ব্যাপারে তিনি অগ্রণী, প্রায় ঘটকালি করে চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, গোপাল ঘোষ, স্নেহাংশু আচার্য প্রভৃতির পরিণয়-ব্যবস্থা করছেন, ছোটো বসবার ঘরে শিষ্যপরিবৃত হয়েও দু-চারজন বন্ধুর এবং নিজের মনোরঞ্জন করছেন বহুজন সম্বন্ধে একটু যেন চিম্‌টি-কাটা গল্পগুজব ক'রে— তেমনই আগ্রহ এই সতত সঞ্চরমান বিশ্ব বিষয়ে, নিজের দুর্গত দেশের ইতিহাস আর সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে, মার্ক্‌স্‌-কথিত সুসমাচারের যাথার্থ্য যাচাই করার ব্যগ্রতায়— নিজের ভঙ্গুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বা স্ত্রীপুত্রকন্যা সম্পর্কে চিন্তা যে নেই তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে মনের পরিশীলিত ব্যাপৃতি। সুকবি দিনেশ দাস-এর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে একবার মজা করে দুটো কবিতা লেখেন— কবিতার সমঝ্‌দার না হয়েও দুঃসাহস নিয়ে বলব যে এই দুজন আধুনিক বাংলা কবিতার তুঙ্গে বিরাজ করছেন আর সিদ্ধির সামীপ্য বিষ্ণু দের ক্ষেত্রে কিছু বেশি। ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি না, কিন্তু জীবনানন্দের মায়াবী কবিতায় আমার কেমন যেন অস্বস্তি, অমিয় চক্রবর্তী থেকে প্রায় সর্বব্যাপারে আমার একান্ত দূরত্ব কাব্যাস্বাদেও বাধাস্বরূপ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিকৃতি বিষয়ে আমার একদা-সমুচ্চ প্রতীক্ষা নিষ্ফল, চলমান জীবনের মর্মস্থল স্পর্শের আকূতি-রহিত হয়ে বুদ্ধদেব বসুর উজ্জ্বল প্রতিভা হ্রস্বীভূত, অনুজ কবিদের কথা এখানে না-হয় নাই বললাম। আধুনিক ইংরাজী কবিতায় আমার প্রবেশাধিকার স্বল্প, কিন্তু বিষ্ণুবাবুর সেখানে বিচরণ বিস্ময়কর রূপে স্বচ্ছন্দ, অথচ স্বদেশের পরম্পরায় তাঁর প্রগাঢ় শ্লাঘা, অজস্র অভাব ও অসংগতির মধ্যে বহুক্লেশে জায়মান্‌ নবসমাজ বিষয়েও তাঁর শুধু মনের জিজ্ঞাসা নয়, নিজেকে জড়িত রাখার প্রয়াস।

পিতার মৃত্যুতে অশৌচ পালন করছিলেন বলে বিষ্ণুবাবু কলকাতায় আশুতোষ 'হল্‌'-এ প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় নিখিল ভারত সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন নি। সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন মুলক্‌রাজ আনন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, পণ্ডিত সুদর্শন— শেষোক্ত তখন হিন্দী সংসারে

সুবিদিত, যদিও প্রধানত ফিল্মকাহিনী রচনার জোরে। রবীন্দ্রনাথের উদ্‌বোধনী ভাষণ দিয়ে সভা শুরু; প্রমথ চৌধুরী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শাহেদ্ সোহ্‌রাওয়ার্দি, সজ্জাদ জহীর, সর্দার জাফরি, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবদুল আলীম, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রমুখ অনেকে উপস্থিত। অল্পাধিক সকলেই আলোচনায় (কিম্বা শৈলজাবাবু আবৃত্তিতে) অংশগ্রহণ করলেন। বেশ মনে আছে প্রেমেনবাবু আমায় বলেছিলেন যে সাহিত্য সম্মেলনে এমন অর্থপূর্ণ আলোচনা বড়ো একটা অন্যত্র শোনেন নি। মুল্‌ক্‌রাজ তার (তখনই বিপুল) বৈদেশিক অভিজ্ঞতার কথা তুলে জানাল যে এ-ধরনের 'সীরিয়স্' চর্চা ইউরোপেও সে খুব কম শুনেছে। একটু বলতে হচ্ছে মুল্‌ক্‌-এর কথা, কারণ সে তো বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি। জহীর-এর বিশেষ প্রিয়পাত্র হিসাবে বিদেশী প্রগতিবাদী লেখককুলে তার প্রতিষ্ঠায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সহায়তা ছিল তার মস্ত পুঁজি। ভারতবাসী হয়েও ইংরিজী ছাড়া যারা অন্তরের কথা প্রকাশে অসমর্থ বলে ঘোষণা করে থাকেন, তাদের সম্বন্ধে আমার বিরূপতা যে আছে স্বীকার করছি। মুল্‌ক্‌-এর লেখার গুণ আর প্রগতি সাহিত্য প্রচেষ্টায় তার নিয়ত সহযোগিতার মূল্য আমি একটুও অস্বীকার করি না। কিন্তু সাধারণত ইংরিজী-লিখিয়ে ভারতীয়দের বিষয়ে আমার মনোভাব অপ্রসন্ন। রাজা রাও-এর লেখা পড়তে পারি না; ভবানী ভট্টাচার্যকে মামুলী লাগে; সুধীন ঘোষকে মনে হয় প্রতিভাবান্ মানুষ কিন্তু বেশ একটু বিগ্‌ড়ে-যাওয়া; ফিরিস্তি দিচ্ছি না এখানে, তবে বলব শুধু যে পছন্দ করি আর. কে. নারায়ণকে, কারণ বিষয়বস্তু আর লেখার ধরনে দেখি এমন সারল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য যা তুচ্ছ বস্তুকেও সত্যের মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। যাই হোক, মুল্‌ক্‌-এর সঙ্গে এই বিষয়ে মাঝে মাঝে প্রকাশ্য বিতর্ক পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু তার সম্পর্কে আমার তারিফে কতকগুলো বাধা আজ পর্যন্ত থেকে গিয়েছে। আমার মতো যার মন তার পক্ষে সহ্য করা একটু শক্ত যে সংস্কৃত একেবারে না জেনে কেউ, ভারতীয় হয়ে, *Hindu View of Art* সম্বন্ধে বই লিখতে পারে (যা মুলক্ যুবাবয়সে বিলাতে করেছিল, যেমন ছাপিয়েছিল **Indian Cooking** সম্বন্ধে বই-ও!)। আমার [illegible] মুশ্‌কিল লাগে হজম করতে যে কেউ চা-বাগান না দেখে,

এমন-কি, কলকাতা থেকে পূর্বে কখনো না গিয়ে "Two Leaves and a Bud" গল্প লিখবে। (যদিও বইটি যে খাসা তা বলব!)। মুলক্-এর বিষয়ে আরো কিছু কথা পরে না বলে পারব না, সুতরাং আপাতত থাক্। যাই হোক, সুধীনবাবুদের মহলে মুলক্ হয়েছিল যাকে ইংরিজীতে বলে 'roaring success'— পরে বারবার-সোভিয়েট-ফেরৎ মুলক্ এই বিশেষ সামাজিক এলাকায় কিছু চোখাচোখা সোভিয়েট কুৎসা বিতরণ করেছে জেনে আমার কষ্টে কার কী এসে গেল!

সম্মেলনের পর স্থির হয় যে একটা ত্রৈমাসিক প্রকাশ করা হবে (যার সম্ভবত দুটো কি তিনটে সংখ্যা বেরিয়েছিল), আর আমরা কজন মিলে বাংলা ছোটো গল্পের একটা সঞ্চয়ন ইংরিজীতে তৈরি করে দেব যেটা মুলক্ ইয়োরোপে নিয়ে গিয়ে বিদেশের (সুতরাং আমাদের চোখে মর্যাদায় সম্ভ্রান্ত) কোনো প্রকাশককে গছিয়ে দিতে পারবে। প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *Modern Review*-তে অনূদিত একটা গল্প, (বিশ্বভারতীর ছাড়পত্র পেলে) রবীন্দ্রনাথের গোটাদুয়েক গল্প, তা ছাড়া বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশংকর, প্রভৃতির লেখা বাছাই হয়েছিল। খুঁটিনাটি মনে নেই, তবে আমি তরজমা করি তারাশংকরের 'তারিনী মাঝি', আর আমার প্রিয় গল্প, বিভূতিভূষণের 'যাত্রাবদল', অনুবাদ করেন স্বয়ং সুধীনবাবু। জানি না দ্বিতীয় তরজমাটির কোনো নকল কোথাও আছে কি না, তবে থাকলে যেন তাকে উদ্ধারের চেষ্টা হয়— কারণ বেশ কিছুকাল পরে, এবং যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে, শোনা গেল মুলক্‌রাজ যে ব্যাগে আমাদের এই বাংলা গল্প সংগ্রহ নিয়ে ঘুরেছিলেন, সেটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে! বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ হয়তো ক্রুদ্ধ বোধ করেন নি, কিন্তু স্বীকার করছি আমার ভয়ানক রাগ হয়েছিল— তবে দূষব কাকে, নিজেরাও যে বোকা, নকল নিজের কাছে রাখি নি, আর তখন তো প্রতিদানের লেশমাত্র আশ্বাস বিনা 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'-জাতীয় হাজার কাজ নিয়ে ব্যস্ত! ক্রমে ঘটনাটি ভুলে যাওয়া গেল, কিন্তু কয়েক বছর বাদে হঠাৎ নজরে এল *Tomorrow* নামে এক সংকলন বিলাতে সম্পাদনা করেছেন প্রগতি লেখক সংঘের প্রাক্তন সভ্য আহ্‌মদ্ আলী (পরে পাকিস্তানবাসী, বোধ হয় চীনে কিছুকাল পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতও), যাতে আমার 'তারিনী

মাঝি' ইংরিজী আকারে বেরিয়েছে। তারাশংকরবাবুকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে তাঁর অনুমতি কেউ চেয়ে পাঠায় নি— আমার তো নয়ই— তবে জিনিসটা যে একেবারে লোপাট হয় নি, এই ঢের! কিছুকাল বাদে রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইংলণ্ডে প্রকাশিত 'আধুনিক বাংলা গল্প' সম্পাদনা করলেন, তাতেও দেখলাম 'তারিনী মাঝি'— এবারও লেখক বা অনুবাদকের সম্মতির কেউ অপেক্ষা করে নি। অনুমতি চেয়ে (তবে দক্ষিণা না দিয়ে) 'তারিনী মাঝি' দেশে প্রকাশ করেছে সাহিত্য অকাদেমি মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে। এখনো মাঝে মাঝে ভাবি মুল্‌ক্‌-এর 'ব্যাগ' হারানোর কথা আর দুঃখ করি বাকি সব কটা গল্পের কী হল কল্পনা করে।

* * *

স্মৃতির ওপর নির্ভর করে লিখে চলেছি, তাই দিনক্ষণের উল্লেখ সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি এই সময়টা 'পরিচয়'-আড্ডায় একটা ঘটনা না বলে পারছি না। ধূর্জটিবাবু কী যেন সুবাদে গান্ধী-চরিত্র বিশ্লেষণ করতে লেগে কোন্‌ এলাকায় কোন্‌ জাতে কোন্‌ পরিবারে তার জন্ম তার লালন, তার বৃদ্ধি ইত্যাদি বলতে আরম্ভ করলেন এমন সুরে যে আমার অসহ্য মনে হল। আর অনভিপ্রেত অসৌজন্যই বোধ হয় দেখালাম হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে যে এ-ধরনের শ্রদ্ধাহীন আলোচনা কি সংগত? আড্ডার তার কেটে গেল, ঘরের প্রফুল্ল আবহাওয়াতে অন্ধকার নেমে এল, সুধীনবাবুর হাসিও তাকে কাটাতে পারল না, অসময়ে সভাভঙ্গ হল। পরদিন বিস্তৃত চিঠি লিখে ধূর্জটিবাবুর কাছে ক্ষমা চাই, উত্তর এল অপ্রসন্ন কয়েক পঙ্‌ক্তি, জানলাম ক্ষমা মেলে নি। আমাকে হয়তো বড়ো বেশি সহনশীল সবাই মনে করতেন; দেশবিদেশে পরিচিত বসন্তকুমার মল্লিক ('পরিচয়'-এর মল্লিকদা) গভীর গহন দার্শনিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনধিকারী জেনেও দীর্ঘ ব্যাখ্যার ধৈর্যধারী শ্রোতার ভূমিকায় আমায় পেতেন এবং স্নেহ করতেন, ধূর্জটিবাবু আমাদের পারিবারিক বন্ধু বলে অগ্রজের সহজ অধিকারে অটল প্রতিষ্ঠা নিয়ে ছিলেন— এ জন্যই বোধ হয় তুচ্ছ এই মতান্তরে তাঁর ক্ষোভ দেখলাম। অবশ্য এটা মনে পুষে রাখার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না, তাঁর স্নেহ থেকে কখনো বঞ্চিত হই নি। বলছি এই ঘটনার কথা, কারণ 'পরিচয়' গোষ্ঠীর মানসিকতা বলে যদি কিছু বর্ণনা করা যায় তো তা থেকে আমার অবস্থান ছিল কতকটা দূরে।

গান্ধীমাহাত্ম্যের অপর দিক, যাকে আজকের কঠোর পারিভাষিকে বলা যায় নেতিবাচক দিক, অচিরে প্রবল ভাবে দেখা গেল সুভাষচন্দ্র বসুকে আসন্ন ত্রিপুরী কংগ্রেসে (১৯৩৯) সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারে। বাংলায় অবশ্য কংগ্রেস মহলে অনৈক্য দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে প্রায় চিরস্থায়ী হয়ে চলছিল। বেশ মনে পড়ছে হরিপুরার পর কলকাতায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় সুভাষচন্দ্রের বিরোধীদের পক্ষ থেকে কিরণশঙ্কর রায় মার্জিত ভাষণে বললেন, আমাদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে তবে মনান্তর ঘটতে দেব না, আর সভাপতি সুভাষচন্দ্রের 'সহায়' না হতে পারি তবে তাঁর পথে 'অন্তরায়' হতে চাই না— ব্যাপারটা বলাই বাহুল্য অত সহজ নয় বরং রীতিমতো ঘোরালো। কিরণবাবুর কথাবার্তায় কিন্তু একটা সরসতার পরিচয় সর্বদা পাওয়া যেত— বঙ্কিমবাবুর কাছে শুনেছি কংগ্রেস অফিসে কী একটা প্রশ্ন করায় অমায়িক হাসি হেসে কিরণবাবু বললেন, 'দাঁড়ান্ এক সেকেণ্ড, এক গ্লাস জল তো আগে খেয়ে নিই !' হেমন্তকুমার সরকারের 'বন্দীর ডায়েরি'-তে বোধ হয় পড়েছিলাম অসহযোগ আন্দোলনে জেলে গিয়ে কিরণবাবুর গম্ভীর জিজ্ঞাসা : এখানে রোজ দাড়ি কামানো চলবে তো ? সুভাষবাবুকে নিয়ে কংগ্রেসের ঝগড়া অবশ্য ক্রমশ তুঙ্গে উঠেছিল, তাই স্বয়ং গান্ধী মহারাজ সভাপতি পদের জন্য আন্ধ্রপ্রদেশের পট্টভি সীতারামাইয়াকে খাড়া করলেন ; অহিংস 'চ্যালেঞ্জ'-এর জবাবে সুভাষচন্দ্র দেশ জুড়ে নিজের বক্তব্য প্রচার করে অভূতপূর্ব সমর্থনও পেলেন। কম্যুনিস্ট, সোশালিস্ট প্রভৃতি বামপন্থীরা তখন তাঁর সাথী ; কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রই নিয়োগ করেন 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি' (যার প্রধান হলেন জওয়াহরলাল), তিনিই জাপানী ফ্যাশিজম্-এর বিপক্ষে যুদ্ধরত চানে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন (যে-ব্যাপারেও জওয়াহরলালের উদ্যোগ প্রভূত) পাঠালেন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে সম্ভবত কলকাতায় ডক্টর মেঘনাদ সাহার প্রশ্নোত্তরে বললেন যে ভারতবর্ষের মতো দেশে ধীরেসুস্থে অর্থনৈতিক অগ্রগতি চলবে না, দরকার হল "forced march"। আশ্চর্য নয় যে দেশের চিত্ত জয় তখনই তিনি করেছিলেন ; গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীর প্রচণ্ড পরাজয় ঘটল, মহাত্মা এমনই বিচলিত হলেন যে মনের আঘাত গোপন করতে পারলেন না। তাঁর পক্ষে যা অপ্রত্যাশিত এমন অশিষ্টতা পর্যন্ত ভাষায় প্রকাশ পেল যখন

বললেন নির্বাচনের পর : 'After all, Subhas Babu is not an enemy of the country' !

ডেলিগেট হয়েও ত্রিপুরী কংগ্রেসে হাজির হতে পারি নি। সম্ভবত অর্থাভাবের দরুন— তবে খবর পেয়েছি ভালোভাবে সেখানকার কাণ্ড-কারখানার। সুভাষবাবুর হাত-পা বেঁধে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দক্ষিণপন্থী নেতারা স্থির করেন কংগ্রেসে প্রস্তাব পাস করাতে হবে যাতে সভাপতি সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর কথা শুনে ওয়ার্কিং কমিটি বাছাই করেন এবং 'সদা সুশীল সুবোধ বালক' হয়ে কাজ করতে থাকেন। গোবিন্দবল্লভ পন্থ্ এই মর্মে যে প্রস্তাব আনেন, সেটাই ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রধান স্মৃতি হয়ে রয়েছে। দুঃখের বিষয় যে বাংলার বাইরে প্রকৃত সংগঠিত কায়দায় সুভাষবাবুর সংগ্রামমুখী নীতির স্বপক্ষে কংগ্রেস-ধারাকে গড়ে তোলার কাজ তেমন এগোয় নি। তাই ত্রিপুরীতে মিউনিক চুক্তি, স্পেন, ফ্যাশিজম্-এর প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা ইত্যাদি প্রস্তাব নিয়ে বক্তৃতা (যা জওয়াহরলাল আবেগ নিয়েই করছিলেন) নিভে গেল পন্থ্-প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্কের কাছে। হাওয়া খারাপ দেখে দক্ষিণপন্থী নেতারা সশরীরে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে প্রচার চালালেন, সুভাষচন্দ্রের শারীরিক অস্বাস্থ্যকে অভিনয় বলতে কসুর করলেন না (মস্ত এক নেতা নাকি বলে বেড়ালেন গান্ধীজীকে ভোট দাও, 'সার্কাস'কে নয় !)। রাজাজীর মতো চতুর বাক্‌পটু মানুষ বললেন, গান্ধীজীর পাকা নৌকায় আমরা চড়ে থাকি, সুভাষচন্দ্রের 'ফুটো' ('leaky') নৌকা চাই না ! পন্থ্-প্রস্তাবের বিপক্ষে বঙ্কিমবাবুর জোরদার বক্তৃতার তারিফ খুব হল, কিন্তু ভোটে প্রগতিপক্ষের হার হল, যার এক প্রধান কারণ কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির শেষ মুহূর্তে সুভাষ-বিরোধিতা।

কলকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরি থেকে ত্রিপুরীতে জয়প্রকাশ নারায়ণকে বিদ্রূপ করে তার পাঠাই ; 'Congratulations Party contemplating posterior of Jawaharlal Nehru'— হয়তো আজও ব্যারিস্টার বন্ধুদের মধ্যে এর সাক্ষী মিলবে ; পাঠকরাও বুঝবেন লেনিনের এক বিখ্যাত বাক্যের নকল করেছিলাম। কমরেড জেড্. এ. আহমদ্-এর কাছে শুনেছি আমার টেলিগ্রামে জয়প্রকাশ প্রভৃতি রুষ্ট— কিন্তু আমি তো গরহাজির। ত্রিপুরীতেই কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি স্থির করে কম্যুনিস্টদের তারা আর দলে

রাখবে না—সম্পূর্ণানন্দ (পরে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী) লিখেছেন এ-প্রস্তাবের মুসাবিদা তিনি সানন্দে করেছিলেন ; আশ্চর্য নয় কারণ সম্পূর্ণানন্দ আজীবন কম্যুনিস্ট-বিরোধী, মার্ক্‌স্‌-কে বাদ দিয়ে বেদান্ত থেকে সমাজবাদ আহরণ করে তিনি তুষ্ট ছিলেন (তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত এককালের কংগ্রেস-সোশালিস্ট, উত্তর প্রদেশের 'কীর্তিমান্' প্রগতিবিরোধী, চন্দ্রভান গুপ্ত, কমলাপতি ত্রিপাঠী আজও রাজনীতিক্ষেত্রে বিরাজমান)। জওয়াহরলালের প্রায় স্ববিরোধী দোদুল্যমানতা এবং তৎকালীন কম্যুনিস্ট-সোশালিস্ট আন্দোলনের অপরিণতি ছিল এমনই যে মিলিত বামপন্থী ফ্রণ্ট সম্ভব হল না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ'—আমাদের বল ছিল স্বল্প, প্রবচন বিনা আমাদের সংগতি ছিল সামান্য। 'জাতীয়' নেতা বলে স্বীকৃতদের মধ্যে জওয়াহরলাল ছিলেন গান্ধীমায়াজালে বন্দী, আর সুভাষ-চন্দ্রের সাহসী চিন্তা ও কর্মোদ্যমাকাঙ্ক্ষা প্রকৃত বিপ্লবী সমাজবাদী ধারণারহিত বলে তৎকালীন পরিস্থিতিতে সাফল্যের সম্ভাবনা রাখত না। এমন অবস্থায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি পদ পরিত্যাগ করতে হল ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকট যখন এল তখন এ দেশের মুক্তি প্রচেষ্টায় দিক্‌ভ্রম, বামপন্থীদের বিভ্রাট আর পরস্পরবিরূপতা, রাজনীতির প্রধান মঞ্চে যাদের অবস্থান সেই কংগ্রেসীদের বিপ্লববিমুখিতা। ১৯৪০ সালে দেশ যখন সংগ্রামের জন্য উদ্‌গ্রীব, তখন তাই নিজের চিন্তার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে গান্ধী বললেন যে তিনি জানেন দেশের মেজাজ কিন্তু জেনে শুনে *'লাল সর্বনাশ'* ('red ruin') টেনে আনতে দেবেন না!

আবার বলছি, বামপন্থী আন্দোলনের যে অংশ সজাগ এবং প্রখর, তার শক্তি তখনো কম, নিজের উপর আস্থা, মাঝে মাঝে বড়াই সত্ত্বেও, প্রকৃতপক্ষে অল্প। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে যে দুই ব্যক্তি বামপন্থীর অনুকূল বলে পরিচিত, তাদের মধ্যে জওয়াহরলালের দৃষ্টি স্বচ্ছ অথচ তদনুযায়ী কর্মে সংকোচবিহ্বল জড়তা, আর সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামে আগ্রহ অথচ বিচার ও বিচক্ষণতায় দৌর্বল্য। *নেহরু অন্তত বারবার বলেছেন যে ফ্যাশিজ্‌ম্‌* ও কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর মধ্যে একটাকে যদি বাছাই করতে হয় তো তিনি কম্যুনিজ্‌ম্‌-এরই পক্ষে, কিন্তু তৎকালীন সুভাষচন্দ্র উভয়ের সমন্বয় কামনা করেছিলেন, শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবীর জায়মান্ বিরাট সংহতির তাৎপর্য তেমন বোঝেন নি।

তাই দেখা গেল ত্রিপুরীতে জওয়াহরলাল বিমর্ষভাবে বিচরণ করছেন, রাজাজী-বল্লভভাই প্রমুখের কেরামতির তারিফ করতে পারছেন না কিন্তু কার্যত তাদের সমর্থনই করছেন— ইতিহাসের ছাত্রদের মনে পড়বে, পোলাণ্ডের প্রথম 'পার্টিশন'-এর সময় (১৭৭২) অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মারিয়া তেরেসা পোল্‌দের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন অথচ ভাগের অংশ নিতে কুণ্ঠিত হন্‌ নি, যাতে প্রাশিয়ার ফ্রেড্‌রিক্‌ বিদ্রূপ করে বলেন : 'Elle pleurait, mais elle tenait' ('তিনি কাঁদলেন কিন্তু ভাগটি ঠিক নিলেন-ও')। যাই হোক, যে-সংঘাত এতদিন কংগ্রেস-সংগঠনের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল, তা এবার দেখা গেল বাইরে, জনগণের আন্দোলনগত সম্পর্কে, আর বিশ্বযুদ্ধের যে ছায়া কিছুকাল পড়েছিল তা এগিয়ে এল।

১৯

মান্ধাতার আমল ঠিক কেমন ছিল জানার উপায় নেই, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় 'মান্ধাতাগন্ধী' এই দেশে পুরোনো রেওয়াজ সহজে বাতিল হয় না। তাই আজও 'বিবাহ' আমাদের 'হয়'; কিছু সাহসী ছেলেমেয়ে পরস্পরকে বাছাই করলেও সচরাচর ঐ-কর্মটি আমরা 'করি' না; বিবাহের ব্যবস্থাপনা করে আত্মীয় বা বন্ধুরা। উপায়ান্তরও প্রায় নেই, কারণ অবাধ মেলামেশার সম্ভাবনা আর সুযোগ একেবারে সীমিত। কৌতুক বোধ করেছিলাম দেখে যে ভাগ্যদোষে বাঙালী কিন্তু মনেপ্রাণে 'সাহেব', তরুণ ইংরিজী-লিখিয়ে শ্রীমান্ ষষ্ঠীব্রত (চক্রবর্তী) 'woman-eater' বলে অহংকার সত্ত্বেও নিজেরই জন্য 'মেয়ে' দেখতে গিয়েছিলেন এবং বাঙালী ভদ্র ঘরের 'গ্র্যাজুয়েট' মেয়ের পিণ্ডবৎ জড়োসড়ো এবং লজ্জাতুর ভাব আর কন্যার পিতার ভাবী জামাতা প্রবরের মনোরঞ্জন-প্রয়াসে বিগলিতপ্রায় বিনয়বাহুল্য নিয়ে বহু বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন। পছন্দ করবেন কি না করবেন স্থির করার জন্য 'মেয়ে দেখতে' গিয়ে যে নিজের এবং মেয়েটির আত্মমর্যাদাতে একই সঙ্গে আঘাত করছেন তা সম্ভবত খেয়াল হয় নি। 'ব্যবস্থাপিত বিবাহে' ছাত্রছাত্রীর পক্ষে শুভার্থীদের হাতেই ব্যাপারটার পুরো ভার বোধ হয় ছেড়ে দেওয়া সংগত— খ্রীস্টানদের কথাই রয়েছে 'marriages are made in heaven', আর ভারতবর্ষে তো প্রায় সব-কিছুই ছেড়ে দেওয়া থাকে বিধাতাপুরুষের হাতে! যাই হোক্, ১৯৩৯ সালে আমার বিবাহ হয়েছিল— বিরহী যক্ষের অবস্থায় না পড়েই 'যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ' ধরনের বাক্য ব্যবহার করে ভার্যার বিরাগ আর কোপ উদ্রেক করতে চাই না: 'whereof one cannot speak, thereof one must be silent.'

আমাদের মেয়ে রিনি জন্মাবার পর বিষ্ণুবাবু ১৯৪১ সালে একটি কবিতায় 'রূপসীর মেয়ে' বলে নবজাতককে সম্বোধন করে বললেন: 'পিতৃলোকের স্বপ্ন তোমার আস্থে/সমসুযোগের সহজ জীবন আসবে'। এতকাল বাদে একটু অপ্রতিভের মতোই মনে হয় তখন আমরা প্রকৃতই 'স্বপ্ন' দেখেছিলাম

(আবার বিষ্ণুবাবুর ভাষায়) : 'জানি হে নবীনা, তোমার যুগের কর্মে / আত্মগ্লানির ব্যর্থতা থেকে বাঁচবে'— কিন্তু প্রতীক্ষা বুঝি কারো কাছে কখনো পূর্ণ বাস্তব হয়ে আসে না, আমাদেরও আসে নি, ত্রৈলোক্য ('মহারাজ') চক্রবর্তীর মতো মহাভাগের অনুসরণে বলতে হবে 'আমার জীবন সফল হয় নাই,' সমসুযোগের সফল জীবন আজও সুদূরপরাহত।

কংগ্রেসের মধ্য থেকে কম্যুনিস্ট কাজ চালানো ব্যাপারে বাংলায় তখন সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি, একটু ভিন্ন স্তরে পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, আর সমুজ্জ্বল মেধা ও তির্যক্ ব্যক্তিত্ব নিয়ে সোমনাথ লাহিড়ী। বঙ্কিমবাবুর আনন্দ ছিল দীর্ঘায়ত আলোচনা (প্রায় মধ্যরাত্র পর্যন্ত হয়তো রাধারমণ মিত্রকে নিয়ে এসে অন্তহীন কথাবার্তা চালিয়ে কয়েকবার আমার গৃহের শান্তি বিচলিত করেছেন !), আর তার দীপ্তি দেখা যেত বিশাল জনসভায় জলদগম্ভীর কণ্ঠে ভাষণরত মানুষটি ধীর গতিতে আরম্ভ করে ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছেন, পাঞ্জাবির আস্তিন্ গুটিয়ে যেন আবেগকে প্রশমিত করছেন, দীর্ঘবপু দীর্ঘতর মনে হ'ত— ভাবতাম এত ভালো বক্তৃতা যদি একটু সংক্ষিপ্ত আর নিবিড় হ'ত! লাহিড়ীকে দেখতাম ভিন্ন রূপে, কারণ তিনি ছিলেন শানিত লিখন ও কথনে পারদর্শী, সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গপরায়ণ, এমন ভাবে যে মনে হত নিজেই ভুলে গেছেন যে হাসি হাসছেন তার পিছনে কত কান্না লুকিয়ে আছে —তাঁর ক্ষেত্রে বাস্তবপক্ষে কম্যুনিস্ট কর্মব্যাপৃতি এক সাহিত্যিক প্রতিভাকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে, কিন্তু খেদ নেই কারণ দেশের ও যুগের ক্ষতি এতে ঘটে নি, বরং বৃদ্ধি হয়েছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে এই দুই কম্যুনিস্ট মহারথী, আর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচুবাবুর মতো নিষ্ঠাবান্ জনসেবকের উপস্থিতির মূল্য কম ছিল না— সুভাষচন্দ্রের অনুচরবৃন্দ সাধারণত এতে তুষ্ট না হলেও তিনি নিজে এর কদর বুঝতেন, কারণ জানতেন সমাগত বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে অবাঞ্ছিত কম্যুনিস্ট সহযোগিতাও মূল্যবান্ কম নয়।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হল কলকাতায় ; অসহনীয় পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলেন ; গোবিন্দ-বল্লভ পন্ত্-এর প্রস্তাবে রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি নির্বাচিত হলেন ; ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সেই সভায় ছিলাম, তুমুল বিসংবাদ সেখানে, জনতা ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের নিয়ত সমর্থক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ি সামনে

পেয়ে আক্রমণ করেছিল, বারান্দা থেকে টাঙানো মস্ত এক ঘড়ি ভেঙে চুরমার করেছিল। কংগ্রেসের সংগ্রামবিমুখ নেতাদের নির্দেশ বিনা আন্দোলনগত কর্মসূচী অবলম্বন চলবে না, হুকুম হওয়ায় সুভাষবাবুদের পক্ষে সংগঠনে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠল। স্বভাবতই গঠিত হল বামপন্থী সমন্বয় কমিটি, যার কর্মস্থল প্রধানত বাংলায়, আর যার আহ্বানে ৯ই জুলাই ১৯৩৯ তারিখে সর্বভারতীয় দিবস উদ্‌যাপনের ঘোষণা প্রকাশ হল। কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষক শক্তির একযোগে সংযোগ সংঘাত ১৯৩৬ সাল থেকে চলার ফলেই এমন অবস্থা— প্রখর সচেতন বামপন্থা ব্যাপ্তি ও বিচক্ষণতায় দুর্বল, জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ অংশে জওয়াহরলাল-জাতীয় সংকোচবিহ্বলতা আর বলা উচিত সুভাষচন্দ্র-সুলভ আবেগাতিশয্য, ফলে দক্ষিণপন্থা কূট-কৌশল জনতার সর্ববিধ অগ্রগমনে বাধাসৃষ্টিতে সাফল্য লাভ করতে পেরে-ছিল। আশ্চর্য লাগে তৎকালীন সম্ভাবনারই বহু উদ্দীপ্ত উদাহরণের কথা ভেবে— অভয় আশ্রমের জগদীশ পালিত ১৯৩৭ থেকেই গান্ধীবাদী নিষ্ঠার সঙ্গে সাম্যবাদী প্রবুদ্ধির সামঞ্জস্য প্রচেষ্টায় কৃষকসমিতির সঙ্গে লিপ্ত হলেন, কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন, কিন্তু দেশের পরিস্থিতিকে ব্যাপকভাবে বদ্‌লে দেওয়ার সংগতি সেদিনের কম্যুনিস্ট প্রচেষ্টায় দেখা গেল না।

যতদূর মনে পড়ে ৯ই জুলাইয়ের প্রতিবাদ দিবস পালনে বাংলা ছিল অগ্রণী। অন্যত্র এটা কংগ্রেসের ভিতরকার এক ঝগড়ার প্রকাশ ছাড়া তেমন কিছু ছিল না, তবে বাংলায় কৃষকসমিতি প্রভৃতির যোগদানে বিভিন্ন গণ-দাবির প্রতিফলন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৯ সালে গান্ধী-গোষ্ঠীর কার্য-কলাপে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ পর্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন— 'বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি' বলে সুভাষচন্দ্রকে তিনি আশীর্বাদ করেন। 'রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্‌বোধন করেছেন, ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে', সেই মহাত্মা গান্ধীকে একই পত্রে অভিবাদন জানালেও কবির মনো-বেদনা প্রোজ্জ্বল প্রকাশ পেয়েছিল। পরিস্থিতি কিন্তু এমন জটিল হয়ে উঠল যে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক চেতনার অসম বিকাশের মূল্য সমগ্র দেশকেই দিতে হল। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃত্বের আতিশয্যের প্রতিবাদে যারা মিলিত হতে পেরেছিল, প্রতিক্রিয়ায় সর্বভারতীয় কংগ্রেসে থেকে স্বতন্ত্র

হয়ে আলাদা সংগঠনের প্রশ্নে সে-মিলন স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। জনতার ব্যাপক সংগ্রামী ঐক্যের স্বার্থেই মূল জাতীয় প্রচেষ্টাকে ছিন্নভিন্ন ও পথভ্রষ্ট করার বিপদ সম্বন্ধে সজাগ না হয়ে উপায় ছিল না। কম্যুনিস্ট-সোশালিস্ট মতাবলম্বীরা প্রায় সবাই সুভাষচন্দ্রের অনুকূলে থেকেও সুভাষচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড ব্লক' আর অপর অনুরূপ কয়েকটি সংস্থার সমর্থনে অসমর্থ হল। বামপন্থী সমন্বয় কমিটির তাই অচিরে অবসান হয়েছিল।

খুঁটিনাটি বর্ণনার দরকার নেই, কিন্তু সেদিনের ক্লেশকর অথচ উদ্দীপনাময় পরিস্থিতিতে কম্যুনিস্ট পার্টি বে-আইনী হয়েও বাংলাদেশে প্রকৃত সচেতন বামপন্থী সংহতির জন্য বিপুল প্রয়াসে নেমেছিল। তারিখ মনে পড়ছে না, তবে জেলায় জেলায় সুতীক্ষ্ণ আলোচনার পর কলকাতার মির্জাপুর (বর্তমানে 'শ্রদ্ধানন্দ') পার্কে কম্যুনিস্ট উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের প্রতিনিধি ছাড়াও বহু সাধারণ সদ্‌বুদ্ধিপরায়ণ কংগ্রেসী সেখানে সাগ্রহে উপস্থিত— মনে আছে বঙ্কিমবাবু বক্তৃতার পর হেসে বললেন যে শ্রোতাদের মধ্যে 'বাঘা-বাঘা' রাজনীতিবিদ-দের সংখ্যাধিক্যে তিনিও শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন! সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী বামপন্থী বলতে যাদের বোঝায় আর সমাজতান্ত্রিক ধারায় গণজাগরণের উপর নির্ভরশীল বামপন্থীদের যে সমন্বয় বিপর্যস্ত হয়েছিল তাকে পুনরুদ্ধার করা। প্রথমোক্তদের উদ্যোগে মোটামুটি গান্ধী-পদ্ধতিতেই কলকাতার 'হল্‌ওয়েল' স্মৃতিস্তম্ভ ('ব্ল্যাক্ হোল্') অপসারণ আন্দোলন প্রতীকী সংগ্রামরূপে দেখা গিয়েছিল, জনজীবনের গভীরে সে-সংগ্রাম প্রবেশ করতে পারে নি। এই উদ্দেশ্য সাধনে বামপন্থী সমন্বয় সংগঠন ছিল একান্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জনগণের হাতে মহাশক্তিমান এই অস্ত্র আর রইল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্বে সরকারী দমননীতির খড়্গ নেমে এল কম্যুনিস্টদের মাথায়। কংগ্রেস নেতারা তখন বহু বিচক্ষণ জল্পনায় ব্যস্ত। সুভাষচন্দ্রও প্রতীক ধরনের লড়াই ছাড়া বেশি কিছু ভেবে উঠতে পারছেন না। তখন বে-আইনী কম্যুনিস্ট পার্টি গণশক্তিকে সচেতন যুদ্ধবিরোধী ভূমিকায় নামাবার চেষ্টা করেছে, বোম্বাইয়ে ৯০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট তাই এক ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে— দেশজুড়ে কম্যুনিস্ট উদ্যোগে যথা-

সাধ্য শ্রমিক ও কৃষক সমাবেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা ঘোষিত হয়েছিল। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে নানারকম দরকষাকষির পর দেশের মেজাজ ঠাওর করে, গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত বাৎলালেন 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ'-র এক অদ্ভুত কার্যক্রম— পুলিশকে আগেভাগে জানিয়ে কোথাও গিয়ে এক লাইন আওড়াবেন সত্যাগ্রহী, বলবেন 'আমরা অহিংস, তাই যুদ্ধ চাই না', আর সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল কারাবাস! প্রথম 'সত্যাগ্রহী' মনোনীত (এবং বিখ্যাত) হলেন বিনোবা ভাবে, যাঁর পূর্ব-পরিচিতি ছিল না, তবে আজ তিনি বিরাজ করছেন গান্ধীনীতির মুখ্য প্রবক্তারূপে, ভূদান, গ্রামদান, জীবনদান ইত্যাদি সৎকথা বিতরণ করছেন। জনতার সংগ্রাম-ব্যাকুলতা এমন যে এই অদ্ভুত অভিনয়কে কেন্দ্র করেই আলোড়ন কিছু হল— গান্ধীমার্গীরা অবশ্য তাকে সংযত করলেন, 'লাল সর্বনাশ চাই না' বলে মহাত্মা স্বয়ং দেশকে সতর্ক করেছিলেন। কম্যুনিস্ট পার্টি 'নিষিদ্ধ' অবস্থায় গোপনে আন্দোলন চালিয়ে গোটা দেশকে নাড়া দেওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই পরিস্থিতিতেও বামপন্থী সংহতি গঠিত হয় নি। রামগড় কংগ্রেসের (১৯৪০) পাশেই অবশ্য সর্বভারতীয় আপসবিরোধী সম্মেলন ('Anti-Compromise Conference') হয়েছিল, সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে কৃষকসভার নেতা স্বামী সহজানন্দ ছিলেন সভাপতি, কিন্তু আগেই বলেছি দেশের ব্যাপক জনতাকে উদ্‌বুদ্ধ করার গভীর প্রয়াসের প্রকৃত সূচনাও দেখা দিল না, কংগ্রেস-নেতৃত্বের সংগ্রামবিমুখিতা আর বামপন্থীদের মধ্যে ভেদাভেদ এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক চেতনা ও শক্তির অভাব সম্ভাব্য গণ-অভ্যুত্থানকে পঙ্গু করে রাখল।

শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে ব্যাপৃত কম্যুনিস্টদের উপর তখন নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি হতে থাকল। কাউকে হুকুম দেওয়া হল বাসস্থান বদ্‌লাতে হবে, কাউকে বা একটা জায়গার বাইরে যাওয়া বারণ করা হল। বাছাই করা বহু কর্মীর গতিবিধি সম্বন্ধে পুলিশের কড়া নজর রইল। নেহাত পার্টির 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' কাজ করে যাওয়ার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল, নইলে সব কাজই তখন বন্ধ হয়ে যেত। এই সময়ে 'সুড়ঙ্গ' থেকে কাজ চালানোর বন্দোবস্ত বরঞ্চ আরো মজবুত হল— সাম্রাজ্যবাদের ধাক্কা সাম্‌লাতে গিয়ে এই হল পার্টির লাভ। আত্মগোপনকারী পার্টি-নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ

রক্ষার অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাই আমার মতো লোকেরও হয়েছিল। এক রাত্রে পুলিশের দঙ্গল এসে আমাদের সদর দরজা ভেঙে ফেলার মতো আওয়াজ তুলল, কয়েকঘণ্টা ধরে খানাতল্লাশী চালাল, কিছু বই আর কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে গেল, আমায় সারাদিন আটকে রাখল। সেদিন কলেজে কলেজে ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল— পরদিন ক্লাস করতে গিয়ে দেখি 'শ্লোগান' লেখা: 'He stood for us— we stand for him'। খানা-তল্লাশের সময় কায়দা করে রীতিমতো বে-আইনী কাগজপত্রের একটা ডাঁই কোনোক্রমে সরাতে পারা গিয়েছিল। শোবার ঘরে কতকগুলো পার্টি-দলিল নিজের জামার নীচে লুকিয়েছিলাম; ভাগ্যক্রমে পাঞ্জাবী গায়ে ছিল, নইলে ধরা পড়ে যেতাম, আর কাগজগুলো ছিল পুলিশের নজরে 'মারাত্মক'! বাড়ির মেয়েদের উপস্থিতি এবং মায়ের 'ঠাকুরঘর'-এর অস্তিত্ব থেকেও সাহায্য মিলেছিল, বাসাবাড়ি হলে যা সম্ভব ছিল না। মনে পড়ে হাসি পাচ্ছে একবার গোপন পার্টির এক নেতা আমার মার কাছে কিছু জিনিস এবং টাকা রাখতে দিয়ে যখন আমি গ্রেফ্‌তার হলে বিকল্প ব্যবস্থার প্রসঙ্গ তোলেন তখন মা বলেছিলেন: 'থাক্, ও-সব অলক্ষণে কথা বলতে হবে না!' ব্যারিস্টারীর কিছু-একটা মর্যাদা সরকারী চোখে না থাকারই কথা, কিন্তু পার্টিমহলে শুনেছি যে আমি নাকি লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যারিস্টার বলে জেলে 'ঘানি টানা' থেকে তখন রেহাই পেয়ে চলেছি!

* * *

ইতিমধ্যে চলছিল নানা স্থানে সভাসমিতি, বাংলা ইংরিজী ছুটো ভাষায় নানা কাগজে লেখা— বোধ হয় ১৯৩৮ সালে স্কটিশচর্চ কলেজে এক ছাত্রসভায় তৎকালীন কংগ্রেস-সোশালিস্ট নেতা মিনু মাসানির সঙ্গে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছিল। '৬১ সালে মাসানি স্বয়ং লোকসভায় মনে পাড়িয়ে দিয়েছেন, আর খুব সম্প্রতি কলেজের তখনকার দুই ছাত্র (বর্তমানে লোকসভার ডেপুটি স্পীকর) ডক্টর সোয়েল এবং (এখন যুগোশ্লাভিয়াতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত) শ্রীযুক্ত মেনন্ তার উল্লেখ করলেন! গোপন পার্টির তখন এক মাসিক বেরুত মাদ্রাজ থেকে এচ্.ডি. রাজার সম্পাদনায়— নাম *New Age,* যাতে নীলবিদ্রোহ সম্বন্ধে খেটেখুটে একটা প্রবন্ধ লিখি, বন্ধুবর প্রমোদ সেনগুপ্ত তাঁর পরবর্তী গবেষণাকালে যার প্রতি ঋণস্বীকারের সদাশয়তা দেখিয়েছেন।

সম্ভবত ১৯৪০ সালে প্রকাশ হয় আমার *An Introduction to Socialism* —পার্টির কেতাবঘর 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সি'র এটা নিয়ে প্রকাশনায় হাতে-খড়ি। বলা বাহুল্য, লেখকের পারিশ্রমিক পার্টিভাণ্ডারে গিয়েছিল; দোকানের পুঁজি ছিল কম, তাই মাছের তেলে মাছ ভাজার চেষ্টা! এককালে ছোট্ট ঘরে (৭২ হ্যারিসন রোড) এন.বি.এ.র জন্ম, কমরেড প্যারী দাস দেখাশুনা করতেন, আজ তিনি বিস্মৃত— অচিরে এলেন সুরেন দত্ত, যিনি বহু বৎসর ব্যবসায়িক দিক থেকে পুস্তকালয়ের প্রাণপুরুষ ছিলেন কিন্তু ১৯৬৪ সালের পার্টিভঙ্গ তাঁকে ঠেলে দিল 'মার্ক্‌সবাদী' শিবিরে, যেখান থেকেও সম্প্রতি তাঁকে সরে যেতে হয়েছে। মুজফ্‌ফর আহমদ্‌, আবদুল হালিম, সোমনাথ লাহিড়ীর মতো প্রমুখ নেতা এন.বি.এ.র তত্ত্বাবধানে থেকেছেন, আর আজ পর্যন্ত দিনের পর দিন লেগে আছেন 'কাটুবাবু', শ্যামবাজারের সম্ভ্রান্ত বসুপরিবারে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো (না বলব প্রহ্লাদকুলে দৈত্য?) একেবারে নাম-লেখানো কম্যুনিস্টদের মধ্যে যিনি বিশিষ্ট। যাই হোক্‌, এই সময়ে প্রগতি আন্দোলনের সুবাদে আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং আমি আধুনিক বাংলা কবিতার যে সংকলন করি, সে বিষয়েও দু-একটা কথা এবার বলি।

প্রগতি লেখক সম্মেলন শেষ হওয়ার সময়ই পরিকল্পনা হয় যে এ হেন একটি সংকলন বার করা চাই— সোৎসাহে এগিয়ে এলেন বুদ্ধদেব বসু, তখনই তাঁর 'কবিতাভবন' কর্মব্যস্ত, কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে তার আন্তরিক আগ্রহ, আমাদের মতো ব্যক্তি তখনো তাঁর চোখে বর্জনীয় সাব্যস্ত হই নি। আইয়ুব বিদ্বান এবং সাহিত্যিক, আর আমি কিঞ্চিৎ 'অন্তেবাসী' হয়েও একটু যেন 'জাতে উঠেছিলাম'— সংকলনের কাজ অবশ্য প্রধানত করলেন আইয়ুব, বুদ্ধদেববাবু এবং অন্যান্য কবিবন্ধুদের পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে। সঞ্চয়ন সম্পূর্ণ হওয়ার পর ভাব ও ভাষায় সমৃদ্ধ এক ভূমিকা লিখল আইয়ুব, কিন্তু আমার অনেকটা অসাহিত্যিক মগজে কতকগুলো চিন্তা গিজ্‌গিজ্‌ করছিল, যা আমাকে বাধ্য করল লেখাতে দ্বিতীয় এক ভূমিকা—'vet' করাবার জন্য দেখালাম কবি (এবং তখন নিষ্ঠাবান্‌ মার্ক্‌সবাদী বলে খ্যাত) অরুণ মিত্রকে, তিনি তারিফ্‌ জানিয়েছিলেন, অন্তত আমার গদ্যের ছটাকে! বুদ্ধদেববাবু কিন্তু কাব্য ব্যাপারে আমার অনধিকার চর্চায় অপ্রসন্ন হয়েছিলেন— তাঁর 'কবিতা' ত্রৈমাসিকীতে সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র

গুপ্ত আইয়ুবের ভূমিকার প্রভূত প্রশংসা করে আমারটি সরাসরি অগ্রাহ্য করার সুপারিশ করলেন, আর জানি যে অতুল গুপ্ত মহাশয় এভাবে আমাকে 'পথে বসিয়ে দেওয়াতে' বুদ্ধদেববাবুর মনের অন্ধকার কেটে ছিল! হলপ্ করে বলতে পারি যে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু হয় নি, কারণ বাস্তবিকই জানি কাব্যজিজ্ঞাসায় আমি পারংগম নই, তা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত কবিকুলের কাছে আমার জীবনদর্শন যে বাতুলতা তা অজানা ছিল না। 'তবুও মানুষের আত্মাভিমান কিছু থাকে, আর আমি তুষ্ট ছিলাম সুধীনবাবুর বা বিষ্ণুবাবুর মতামত জেনে, আর কানাঘুষা শুনে যে স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী কোথায় নাকি আল্‌বোলা টানার অবসরে আমার গদ্য সম্বন্ধে 'স্ফটিকের মতো' বাক্যটি ব্যবহার করে বসেছিলেন! কথা একটু ফাঁপিয়ে ফেলেছি এখানে— তবে অজুহাত এই যে 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র প্রকাশক বুদ্ধদেব বসু মহাশয় বেশ কয়েক বৎসর পরে পরিমার্জিত সংস্করণ বার করেছেন, আমাকে তো সংবাদ দেন্‌ই নি, খোদ আইয়ুবের অস্তিত্বকেও অগ্রাহ্য করে বইটাকে ঢেলে সাজিয়েছেন, পুরোনো দুটো ভূমিকাকেই ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। এককালে বুদ্ধদেববাবু আমাদের বন্ধুই ছিলেন। একত্র কলেজে অসংখ্যবার সাক্ষাৎ হয়েছে, পরস্পর সৌজন্যে কখনো ব্যাঘাত ঘটে নি। মতান্তর সত্ত্বেও মনান্তর কুটিল হয়ে ওঠার কারণ দেখা যায় নি— তবু কেন এবম্বিধ ঘটনা হয় তা মানবচরিত্রগত এক প্রশ্নেরই বিষয় মাত্র।

সুরেন গোস্বামী এবং আমি তখন ছাত্র, সাহিত্য এবং কিছু পরিমাণে কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়ন সভা করে বেড়াচ্ছি, রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনে যুক্ত থাকছি, গোপন পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলছি, '৩৮ সাল থেকে আন্দামান ও অন্যান্য কারাদুর্গ থেকে বেরিয়ে-আসা কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। মীরাট ষড়যন্ত্র আসামীদের মধ্যে ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, শামসুল হুদা, গোপাল বসাক, রাধারমণ মিত্র প্রভৃতি বিচিত্র, বিশিষ্ট, বিপ্লবী চরিত্রের সাক্ষাৎ তখন পেয়েছি। কলেজে নিয়মিত ভাবে কবি বিষ্ণু দে-র সান্নিধ্য ও সৌহার্দ্যের গুণে (এবং কিছুটা গণিতের অধ্যাপক নন্দলাল ঘোষের অকপট সত্যসন্ধ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে) বুঝেছি যে মার্ক্‌সীয় নীতির মর্মবস্তু জীবনধর্মী প্রতিভা ও মনীষার প্রকৃত পরিপূরক বলেই তার আবেদন এত দুর্বার। বারবার গিয়েছি বিষ্ণুবাবুর (কিম্বা মাঝে মাঝে

সুধীনবাবুর) সঙ্গে, বাগবাজারে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অফিসের গলিতে শিল্পী যামিনী রায়ের বাড়ি— যেটা তাঁর না বলে বলা উচিত তাঁর ছবিরই বাড়ি— কারণ সর্বত্র ছবি, দুঃসাহসে ভরা ছবি (অবনীন্দ্রনাথ বুঝি তাঁকে একবার বলেন, আমি জাম্ববান বলছি, তুমি পারবে সাগর পার হতে, এবার লাফ দাও !), চিত্রকর থাকেন একান্তে, প্রায় যেন সংগোপনে সসংকোচে, আর ঘরে ঘরে শুধু ছবি ; মাজা-মোছা মেজে, এক কণা ধুলো নেই, বাইরের কোলাহল স্তব্ধ, নগরজীবনের গ্লানি সেখানে বিস্মৃত। অদ্ভুত এক স্বস্তি যেন বিরাজ করছে, শান্ত সিংহের মতো শিল্পী কথা বলছেন, ছবি যে বোঝে না তারও মন সারা বিশ্বে ছড়ানো রূপের সাগরে ডুব দিতে পারার আনন্দ একটু আস্বাদ করছে। ব্যারিস্টার অরুণ সেন স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রূপপ্রবণতায় অবশ্য যামিনীবাবুকে 'a Paris *gamin* who knows how to make good' বলেও তাঁকে যে কদর করতেন তা জানি ; প্রকৃতিই ছিল অরুণ সেনের ব্যাজোক্তিপরায়ণতা— সম্প্রতি প্রয়াত শিল্পজ্ঞ অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো গুণীকে তিনি বলতেন 'an artist among solicitors and a solicitor among artists' !

হাইকোর্ট বার লাইব্রেরিতে এই সময় এল স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, জ্যোতি বসু, ভূপেশচন্দ্র গুপ্ত— 'দোদো' বলে সর্বজনের কাছে পরিচিত স্নেহাংশুকে দেখলাম কৌতুকপ্রিয়, সহৃদয় ব্যক্তিত্বে মনোহারী, জ্যোতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, স্পষ্টবাক্, ভূপেশ গম্ভীর, একাগ্র, রাজনীতির আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্‌গ্রীব। বিদেশ-বাসকালেই সাম্যবাদের মায়া তাদের টেনেছে, সমানভাবে না হলেও সজোরে টেনেছে। মনে পড়ছে দোদোর কাছ থেকে পার্টির জন্য নিয়ে গেলাম তার প্রথম দান, একশো টাকা, যা সেদিন ছিল প্রায় অভাবনীয়। ময়মনসিংহের মহারাজকুমারের কম্যুনিস্ট হওয়া নিয়ে কেউ কেউ তখন রহস্য করেছেন, কিন্তু আমি জানি কত ঝড় ঝঞ্ঝা আঘাত অপমান পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে সে যথাসাধ্য নিজের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে চেয়েছে— কজনই বা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি আমরা নিখুঁত কম্যুনিস্ট? দোদোর মতো বন্ধু আমি জীবনে এত কম পেয়েছি যে তার বিষয়ে কিছু বলতে ঠিক পারছি না— '৬৪ সালে পার্টিভাগের পর থেকে পরস্পরসম্পর্কে কেমন যেন একটা ছায়া পড়ে তাকে একটু বিকৃত করেছে, যা আমার মনে লুকিয়ে-রাখা এমন একটা

দুঃখ যার উপশমও অসম্ভব। সে আমাকে বলত ‘boss’, আজও দেখা হলে বলে, কারণ তখন অন্তত ঐ ত্রয়ী-র কাছে আমি ছিলাম প্রধান! জ্যোতি আর ভূপেশ, উভয়ের গুণাবলী প্রায় বিপরীত ধরনের, কিন্তু উভয়েই রাজনীতি জীবনে যেন পূর্বোদ্দিষ্ট ভাবেই প্রবেশ করেছে, তাদের চিত্তবৃত্তির মুখ্য সার্থকতা সেই ক্ষেত্রে— দোদোর মধ্যে ছিল (এবং আছে) একটা অস্থিরতা, যা তাকে হয়তো বা ব্যক্তিত্বের উপাদান সমাবেশে অল্প একটু ইতরবিশেষ ঘটলে তাকে শিল্পের দিকে ঠেলতে পারত। জ্যোতি এবং ভূপেশের প্রখর প্রকৃতি অচিরে তাদের টেনে নিয়ে গেল সারাক্ষণের রাজনীতিক্ষেত্রে, দোদো রয়ে গেল হাইকোর্টে। আমার টানাপোড়েন চলতে থাকল কলেজ আর হাইকোর্ট আর সাহিত্যবাসর আর জন-আন্দোলনের বিবিধ ব্যঞ্জনায়; স্বস্তি ছিল না একটুও, তবে স্বস্তি বলে বস্তুকে কখনো জীবনে বোধ হয় চাইতে পারি নি।

মোটামুটি এই সময় প্রথম দেখা হল নিখিল চক্রবর্তীর সঙ্গে— যুদ্ধ বাধার কিছু পরেই বোধ তিনি অক্স্‌ফর্ড থেকে ফিরেছেন, তবে খাঁটি বাঙালী ধুতি-পাঞ্জাবী (চাদর পর্যন্ত) ছাড়া অন্য কিছু তখন পরতেন না, কম্যুনিস্ট হয়েও পরিধানে শুভ্র নিত্যধৌত খাদি, সুদর্শন, ব্যবহারে তেমনই পরিচ্ছন্ন, আলাপে মৃদু, মার্জিত, মননশীল। মার্ক্‌স্‌পন্থী সাংবাদিকদের মধ্যে আজও তিনি একজন অগ্রগণ্য, আর সবাই জানি তাঁর ক্ষিপ্রবুদ্ধি, অধ্যয়নে অনুরাগ, রচনাশক্তি, বিশ্লেষণপটুতা। নিখিলবাবুর চেয়ে অবশ্য সাধারণের কাছে অনেক বেশি পরিচিত হলেন তাঁর সহধর্মিণী, যিনি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীরূপে বিত্তবান্ সমাজ এবং পুরো কংগ্রেসী আবহাওয়ার মোহ কাটিয়ে কেম্‌ব্রিজে অধ্যয়নসময়েই সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, পার্টিতে যোগদান করে সংগোপন জীবনযাত্রা ও বহুবিধ কৃচ্ছ্র সাধনের অভিজ্ঞতায় চেতনাকে পুষ্ট করে দীর্ঘদিন ধরে জন-আন্দোলনে এবং বিশেষ করে লোক-সভায় বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং জনমানসে প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। পার্টিবহির্ভূত বিভিন্ন মহলে আদৃত হলেও নিখিল এবং রেণুর পার্টির সঙ্গে যে নিবিড় সম্পর্ক তারই প্রতীক বলতে পারি তাদের ছেলে সুমিতকে— বোধ হয় ’৪৬ সালে একেবারে ছোট্ট এই শিশুকে তারা ডেকর্স লেনের পার্টি অফিসে আমাদের দেখায়, যে শিশু আজ বড়ো

হয়ে পার্টি সাপ্তাহিকের সংবাদদাতা, মস্কো থেকে গভীর আবেগে লেনিনের সমাধি সম্বন্ধে বাবা-মাকে লিখেছে বলে সেদিন নিখিলবাবুর কাছে শুনলাম।

সম্ভবত '৪১-৪২ সালে জানলাম ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে, 'সানি' ডাকনামে যে তখন আমাদের কাছে পরিচিত, ডাকসাইটে 'আই.সি.এস.' পরিবারে জন্ম, পঞ্জাবে দিল্লীতে মানুষ, কেম্‌ব্রিজে পড়া এবং সেখান থেকে কম্যুনিজমের কুহকে বন্দী। তেমনি চিনলাম আর-এক কেম্‌ব্রিজ-ফেরত, শ্যামবাজারের বসু বংশের অরুণ বসুকে, যে পি.সি.জোশীর উৎসাহে কিছুকাল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেল, বোম্বাইয়ে পার্টি-আস্তানায় 'কম্যুন্'-জীবন যাপন করল— দুঃখের বিষয় নানা টানাপোড়েনের চাপে বেশ কিছুকাল সক্রিয় পার্টিজীবন থেকে দূরেই তার অবস্থান। ইন্দ্রজিৎ ধনীগৃহে লালন সত্ত্বেও প্রথম থেকে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হওয়ার ঝক্কি পুইয়েছে, বহুদিন 'সুড়ঙ্গ'-বাস করেছে, ট্রেড ইউনিয়নের কাজ মক্‌সো করে ক্রমশ মর্যাদা পেয়েছে, বর্তমানে সে পার্টির একজন সেক্রেটারি এবং লোকসভায় দলনেতা। প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একটা দ্বৈত জীবন সে যেন যাপন করেছে— পার্টি এবং পার্টি-সংশ্লিষ্ট মহলে ধরন-ধারণে স্বাভাবিক, আবার সমাজের যে ওপরতলায় তার পারিবারিক অবস্থান সেখানেও স্বচ্ছন্দ! আমি তার ইংরিজী রচনাশক্তির তারিফ করতাম, পরে সে লেখা ছেড়েছে বলে খেদ করেছি— কিন্তু যাক্, মনে পড়ছে একবার '৪২ সালে বোম্বাই থেকে এল এন. কে.কৃষ্ণান্ (যে পরে বিবাহ করে মোহন কুমারমঙ্গলমের বোন পার্বতীকে), কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরূপে পার্টির নতুন নীতি ব্যাখ্যা করল, শুনে বঙ্কিমবাবু দুঃখ করলেন বাংলা পার্টির নেতৃত্বে ঐ-রকম লোক নেই বলে, আর আমার কাছে জেনে দোদো চটে উঠে বলল, 'কেন? ঝুড়ি ঝুড়ি আছে— জ্যোতি বা 'সানি'-ও তো সর্বক্ষণের কর্মী, তারা কম কিসে?' এ কথা বলছি এজন্য যে পরবর্তী কালে নানা কারণে, মাঝে মাঝে মতান্তরের দরুন, পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যাই হোক-না কেন, সে যুগে পার্টিতে আমরা প্রায় যেন একটা সুখী পরিবারের মতো ছিলাম। পি.সি.জোশীর গুণ ছিল সকলের সঙ্গে পরিচয় ও প্রীতির সম্বন্ধ রেখে চলা— হয়তো এটা খুব দামী কাজ নয়, কারণ মনে আছে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে

কলকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে জোশীকে আক্রমণ করে পার্টি-সম্পাদক পদে তার উত্তরাধিকারী বি.টি.রণদিভে বলেন যে 'সুখী পরিবার' হওয়া পার্টির উদ্দেশ্য নয়, 'বিপ্লবী সংগঠন' গড়াই তার কর্ম, যে-কর্মে তেমন আমরা এগুতে পারি নি।

* * *

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ বাধার পর থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত আমাদের পার্টি সর্বশক্তি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছিল—'Proletarian Path' আখ্যা দিয়ে আমাদের আহ্বান কম সাড়া জাগায় নি, *Parties and Politics Unmasked* নামে যে বে-আইনী পুস্তিকা আমরা সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি তাতে বোধ হয় প্রথম সর্বভারতীয় পরিসরে কম্যুনিস্ট পার্টির স্বকীয় বক্তব্য এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য বামবাক্যবিলাসী দলের সুতীব্র সমালোচনা উপস্থাপিত হয়েছিল। তখনকার পরিস্থিতিতে এজন্য যে সাহস ও সংগঠনক্ষমতার প্রয়োজন ছিল তা অল্প নয়, এবং সেজন্যই নিশ্চয় দেখলাম যে রামগড় কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্রের মতো তীক্ষ্ণচেতা আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চান্ নি, যদিও আমাদের নীতি ও কৌশল বিষয়ে তাঁর মনে অনেক আপত্তি ছিল এবং আমরাও তাঁর বিশ্লেষণের দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরতে সংকুচিত ছিলাম না। '৪০ সালের প্রথম দিকে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরামর্শ যখন চলেছিল, তখন কয়েকবার বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমি গিয়েছি— বুঝতে পারতাম আমাদের সম্বন্ধে তাঁর মনে বেশ কিছু অস্বস্তি, কিন্তু কথা হ'ত পরস্পর মর্যাদা ও সৌজন্যের ভিত্তিতে। তাঁর নতুন সাপ্তাহিক *Forward Bloc* তখন প্রকাশ হয়েছে (ঐ-নামের নিজস্ব দল তখন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন), এবং তাতে ফিনলাণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েটের লড়াই বিষয়ে প্রবন্ধ আমি লিখি, অধুনাবিখ্যাত (তখন শরৎ বসুর একান্ত সচিব রূপে প্রধানত পরিচিত) নীরদচন্দ্র চৌধুরী ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবন্ধটাকে ছিন্নভিন্ন করে লেখেন, আমাকেও আক্রমণের জবাব দিতে হয়— যে-জবাব ছাপাতে দেরি ঘটায় সুভাষবাবুর কাছে আমি নালিশ জানাই আর তিনি তখনই সম্পাদনায় ভারপ্রাপ্ত সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয়কে (সুখের বিষয়, এই প্রাচীন স্বাধীনতাসংগ্রামী আজও জীবিত) বলে দেন যে বিতর্ককে কখনো বিলম্বিত হতে দেওয়া উচিত নয়। তখনই আমার মনে একটা ক্ষীণ ধারণা হয়েছিল

যে সোভিয়েট সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বহু তদানীন্তন নেতার মতো বিদ্বিষ্টচিত্ত হয়তো নন্।

নীরদবাবু প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেছিলেন যে কম্যুনিস্টরা ইংরিজী লেখে ভালো (পি.সি.জোশীর হাত বাস্তবিকই ভালো ছিল), কিন্তু আমার লেখাটা নিরেশ। এ কথাটা হয়তো গায়ে মাখতাম, কিন্তু একটা কারণে (যা পূর্বে কোথাও প্রকাশ করি নি) হাসি পেয়েছিল, নিন্দার হুল ফোটে নি। সোভিয়েট-ফিন্নিশ যুদ্ধ-বিষয়ে আমার প্রবন্ধটা ছিল প্রকৃতপক্ষে আমাদের এক সদ্য-আহৃত ইংরেজ বন্ধুর রচনা, যা তার নিজের নামে বার করা সম্ভবপর ছিল না বলে আমার বকলমে জিনিসটা চালিয়ে দেওয়া হয়। এই বন্ধু তখন 'স্টেট্‌স্‌মান্' কাগজে যোগ দিয়েছেন, ব্রিস্টল হোটেলের মাথায় থাকেন, মতামতে কম্যুনিস্ট (যদিও প্রচ্ছন্ন) বলে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা (ভুললে চলবে না যে বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে তখন যারা বেরুত তাদের মধ্যে অনেকেই কম্যুনিস্ট, পরে ধোপে টিকুক্ বা না টিকুক্), সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' আড্ডায় তার যাতায়াত, বিষ্ণু দে এবং আমার সঙ্গেও সে অন্তরঙ্গ, ঝোঁকের মাথায় গুপ্তিপাড়ায় রথের মেলা দেখতে যেতেও তার ব্যগ্রতা, যেজন্য আমার ভগ্নীপতি ফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ি ধার করে আমাদের মাস্টারমশাই আর বিষ্ণুবাবুকে নিয়ে একদিন আমাদের ঘটেছিল প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রা, কারণ শেষ পর্যন্ত আবহাওয়ার কল্যাণে আর গাড়ি বিগ্‌ড়ানোর দায়ে গুপ্তিপাড়া গুপ্তই থেকে গিয়েছিল! এর নাম লিন্‌সে এমর্সন, যে এখনো কলকাতায় (এবং 'স্টেট্‌স্‌মান্' কাগজেই) রয়েছে, যে বিয়ে করেছিল আর.সি.বনার্জির বড়ো মেয়ে মিনিকে (মৃণালিনী), যে ছিল আমাদের বন্ধু, শীলা এবং অনীলাকে ('আইলীন') নিয়ে যারা ছিল তখনকার কলকাতায় এক সুবিদিত ত্রয়ী। অসম্ভব ভালো এবং বুদ্ধিমান্ মানুষ হিসাবে লিন্‌সে আমাদের কাছে ছিল অত্যন্ত প্রিয়— বহুকাল দেখাশোনা নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে তীব্র ইচ্ছা করে তার সঙ্গে বসে কথা বলতে, যদিও ইতিমধ্যে নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আবির্ভাবে আকৃষ্ট হয়ে (এবং অবশ্যই অন্য নানা কারণে) সে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। যুদ্ধের একটা সময় সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে জাপানী সৈন্যের হাতে বন্দী হয়েছিল, ফিরেই এসেছিল আমাদের বাড়িতে,

একেবারে ভাঙা চেহারা, তবে মেরামত হতে দেরি হয় নি; ১৯৪৬ সালে আমাদের ছ'মাসের ছেলে লামাকে দেখতে এসেছিল মিনিকে নিয়ে। যাই হোক, ক্রমশ সে কলকাতার ওপরতলার সামাজিক জীবন যাপন করেছে, মোটামুটি আমাদের সঙ্গ এবং আমাদের মত পরিত্যাগ করেছে। পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে সুধীনবাবুকেই তখন তার সবচেয়ে কাছের মানুষ বলা চলত, আমাদের ভিতর এসে পড়েছিল পরস্পর অনুরাগ সত্ত্বেও একটা ব্যবধান। যাই হোক্, ১৯৪০-৪১ থেকে বেশ কিছুকাল নানাভাবে তার সাহায্য পেয়েছি, পার্টির চাঁদাও চেয়ে এনেছি, আমাকে দিয়ে সে 'স্টেট্স্ম্যানে' সমালোচনা আর বিশেষ প্রবন্ধ লিখিয়েছে। এই লিন্‌সে ছিল নীরদচন্দ্র-নিন্দিত, আমার নামাঙ্কিত রচনার লেখক, আর তাই লেখাটা নিবেশ পড়ে আমোদ পেয়েছিলাম ভেবে— যাক্, খাস ইংরেজের লেখাও দেখছি নীরদবাবুর মনঃপূত হল না!

ব্রিস্টল হোটেলের মাথায় লিন্‌সে এমর্সন-এর ঘরে একবার বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে গিয়ে হঠাৎ টি.এস. এলিয়টের কটা লাইন আমাকে কেমন যেন বিচলিত করে তুলেছিল, একযোগে দেহমনে অদ্ভুত ধাক্কা লেগেছিল, জানালার কাছে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে নিজেকে সাম্‌লাতে পেরেছিলাম। তুচ্ছ ঘটনা সন্দেহ নাই, কিন্তু তখন থেকে

Because these wings are no longer wings to fly
But merely vans to beat the air
The air which is now thoroughly small and dry
Smaller and dryer than the will
Teach me to care and not to care
Teach me to sit still

লাইনগুলো সম্বন্ধে আমার কবিচেতনারিক্ত মনে একটা মমতা থেকে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুবাবুর মতো ব্যক্তির কাছে অনুযোগ জানিয়েছি :

'Most people ignore most poetry
Because most poetry ignores most people'!

লিন্‌সে-কে নিয়ে ২৪৯নং বৌবাজার স্ট্রীটের তেতালায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিসান সভার অফিসে একবার একটু হৈ-চৈ করা গেল, The peoples' flag is deepest red'-জাতীয় কয়েকটা গান পর্যন্ত সে গেয়েছিল। সেখানেই তখন

পার্টির প্রধান প্রকাশ্য আড্ডা— আমার খেয়াল হয়েছিল আমার বাবার নামে একটা ছোটোখাটো লাইব্রেরি সেখানে খাড়া করা, হাজার খানেক বই আর গোটা চার আলমারি দান করা হল। শচীন্দ্রস্মৃতি পাঠাগার উদ্‌বোধন করলেন মৌলভী নওশের আলি (যিনি মন্ত্রী, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার 'স্পীকার' প্রভৃতি পদে তেজস্বী ভূমিকায় নেমেছিলেন, ১৯৫২ সালে রাজ্যসভা-সদস্য যখন তিনি হলেন, তখন খুব কাছ থেকে এই সাহসী ও বিশিষ্ট মানুষটিকে জেনেছি)। অনুষ্ঠানে সানন্দে যোগ দেন আমার বাবার অনুজোপম বন্ধু মৃণালকান্তি বসু, যিনি কিছু পরিমাণে সংসারবুদ্ধিসম্পন্ন ও সাবধানী হলেও সাংবাদিকতা ও শ্রমিক সংগঠনের ইতিহাসে উল্লিখিত হতে থাকবেন। আমার বাবার সংগ্রহ থেকে অনেক দামী বই আর রিপোর্ট ঐ-লাইব্রেরিতে দেওয়া হয়েছিল— পরে অনুতাপ করেছি, কারণ ক্রমে রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইগুলোকে ভ্রাম্যমাণ হতে হয়েছে। পার্টি দফ্‌তরে রাখা হয়েছে, কিছু ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটে (যে '৪৬' নং-এর কথা বলব পরে) সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি আর ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের আস্তানায় গিয়েছে, পুলিশের খপ্পরে পড়ে শেষ পর্যন্ত বইগুলো হাতছাড়া হয়েছে। সমাজবাদ বাবা কখনো সমর্থন করেন নি, কিন্তু মনে আছে মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের চিন্তার একটা ধারার অনুসরণে শ্রমজীবীর বাঁচবার মতো উপযুক্ত রোজগার ('living wage') বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে লিখেছিলেন ১৯৩৬-৩৭ সালে যে দাবি করা উচিত 'culture wage', অর্থাৎ এমন রোজগার যাতে সংস্কৃতির আস্বাদ সম্ভব হয়। মৃণালবাবু প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন। কানে কম শুনতেন বলে কথা তখন হত উচ্চস্বরে— অনেক সময় সঙ্গে থাকতেন তাঁর দূর সম্পর্কের ছোটো ভাই ইন্দুভূষণ সরকার, যিনি বহুকাল ধরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ২৪৯ বৌবাজার স্ট্রীটের দোতালার অফিসের (যা ছিল সঙ্গে সঙ্গে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী, সাংবাদিক কিশোরীলাল ঘোষের স্মৃতিতে স্থাপিত পাঠাগার) রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, শ্রমিক সংগঠনের সবাইকে জানতেন, অল্পশিক্ষিত হয়েও সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন ও সৌজন্য পেতেন। মৃণালবাবু তো স্মরণীয় মানুষ, কিন্তু এই ইন্দুবাবুকেও একটু পুরোনো ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা সবাই মনে করতে পারবেন।

আমার বিচরণ তো ছিল বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে— তাই হয়তো কিসানসভা থেকে গেলাম ব্যারিস্টার বন্ধুদের সাময়িক খেয়ালে স্থাপিত (এবং শীঘ্রই অন্তর্হিত) 'Conchshell club'-এ, যা ছিল পার্ক সার্কাস অঞ্চলে, কিছুটা হাস্যকরভাবে 'সাহেবী' হলেও যেটা আমার মনে হত অভিমানী স্বদেশিয়ানারাই একটা দিক। এর কথা মনে এল কারণ সম্প্রতি পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে দেখলাম একটা '৪০-৪১ সালের অল্প-ফ্যাকাশে ফোটো, যেটা ঐ 'শঙ্খ'-ক্লাবে তোলা— যাতে একত্র রয়েছে বর্তমানে ভারত এবং পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি (অজিতনাথ রায় আর হামুদুর রহমান), আমাদের এখনকার এটর্নী-জেনারল নীরেন দে, কিছুদিন আগে পশ্চিমবাংলার অ্যাডভোকেট-জেনারল স্নেহাংশু আচার্য ('দোদো'), দুর্বৃত্তদের আক্রমণে নিহত হাইকোর্ট জজ কিরণলাল রায়, আরো কেউ কেউ যারা আজ নামী লোক। পুরোনো ফোটোগ্রাফের কথায় মনে পড়ে গেল সেদিন বেতার মন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজ্‌রাল আমায় দিল ১৯৪১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে লাহোরে তোলা এক ছবি— আমি গিয়েছিলাম পঞ্জাব প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে, আর ছবিতে (তখনো ছাত্র) গুজরাল ছিল আমার সঙ্গে; ছেলেমানুষ চেহারা, আজকের সঙ্গে মিল চেষ্টা করে তবে পাওয়া যায়।

১৯৪০ সাল যখন শেষ হচ্ছে, তখন আমাকে যেতে হল নাগপুরে, ছাত্র-ফেডারেশনের সারা ভারত সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে। এর আগে ছিলেন আমার বন্ধু, কম্যুনিস্ট বিদ্বান্ ডক্টর কে.এম.আশ্‌রফ্‌ আর উদ্‌বোধন করেন স্বয়ং জওয়ারহলাল নেহরু। মনে আছে বোধ হয় '৩৬ সালে এলাহাবাদ থেকে ট্রেনে ফিরছি, আমাদের 'ইণ্টার' ক্লাসে ঢুকলেন আচার্য কৃপলানি, বললেন জওয়াহরলাল উঠেছে 'সেকেণ্ড' ক্লাসে, কারণ কংগ্রেস সভাপতি তিনি, একটু ঘুম দরকার; তা ছাড়া বর্ধমানে নেমে শান্তিনিকেতন যাবেন কলকাতা পৌঁছাবার আগে, তাই একেবারে শৌচ সেরে দাঁড়ি কামিয়ে তৈরি হবেন তিনি, আর কৃপলানির অতশত হাঙ্গামা একটু মুলতুবি রাখলেও ক্ষতি হবে না! কৃপলানিকে তার আগে আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্কে সম্মুখীন অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু তিনি আমায় চিনতে পারেন নি, আমিও স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় তুষ্ণীভাব নিয়ে ছিলাম, শুধু কানে আসছিল

দু-একটা রসালো কথা যা সহযাত্রীদের পুলকিত করছিল। ভাবা যায় না এভাবে জওয়াহরলালের মতো ব্যক্তি ট্রেনে চলেছেন, কিন্তু সে যুগটা ছিল আলাদা। যাই হোক্, সুভাষচন্দ্র বসু নিজে '৩৮ বা '৩৯ সালে ছাত্র-ফেডারেশনের সম্মেলনে সভাপতি হন্, কিন্তু তার পর চলতে থাকে অন্তর্দ্বন্দ্ব, নেতৃত্ব থেকে কম্যুনিস্টদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং জবাবে কম্যুনিস্টদের পাল্টা প্রয়াস। নাগপুরে সম্মেলনের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে আশ্‌রফ উপস্থিত ছিলেন। এম.এল.শাহ্ নামে কংগ্রেস সোশালিস্ট-সমর্থিত এক ছাত্র-নেতা নাগপুর সম্মেলনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। বোধ হয় সমীপবর্তী ওয়ার্ধায় গান্ধী-আশ্রমে গিয়ে মহাত্মার আনুকূল্য তিনি চেয়েছিলেন। একটু অস্পষ্ট-ভাবে মনে আছে গান্ধীমহারাজের কাছে আমারও তখন একবার দরবার করার কথা ওঠে। কিন্তু তদনুযায়ী কাজ হয় নি, আমিও মহাত্মা-সন্দর্শনের জন্য ব্যাকুল ছিলাম না। তখন আমাদের মেজাজও ছিল এমন যে গান্ধীজী খুব খুশি মনে আমাদের অভ্যর্থনা করতেন না। বেশ মনে আছে নাগপুরের রাজপথে প্রতিধ্বনি ওঠে আমাদের মিছিলের আওয়াজে— সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বরবাদ হোক, ভারতবর্ষ কোনো সহায়তা দেবে না, 'ন এক পাই ন এক ভাই'!

নাগপুর সম্মেলনে সারা দেশের ছাত্রনেতাদের পরিচয় অনেক বেশি পেলাম। আজ বিশ্বশান্তি সংসদের নেতা, লেনিন-পুরস্কার-বৃত রমেশচন্দ্র ছিল তাদের মধ্যে, যেমন ছিল তার ভাবী পত্নী, পাঞ্জাবের 'ইন্‌স্পেক্টর জেনারল অফ পুলিস'-এর কন্যা পেরিন্ ভারুচা। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সলর Sir Maurice Gwyer-এর রোষভাজন ছাত্র ফারুকী-র নাম উঠছিল ক্রমাগত; আজ সে কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতৃত্বে। বুঝলাম শুধু বাংলায় নয়, দেশের সর্বত্র কম্যুনিস্ট-প্রভাবিত ছাত্র-আন্দোলন আকর্ষণ করেছে এমন বহুজনকে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, সাধারণ অর্থে সামাজিক উন্নতির পথ যাদের কাছে মুক্ত অথচ 'স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতি'-র আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তারা পারে নি, বিপৎসংকুল পথে পা বাড়াতে সংকোচ বোধ করে নি।

সম্মেলনে আশরফের উদ্যোগে ভারতবর্ষের জনসমষ্টিতে বহু বিচিত্র ভাষা-ভাষী জাতির ('nationalities') অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আলোচিত

হয়— আমাদের অনেকেরই মনে সন্দেহ ও প্রশ্ন জাগে, কারণ মুসলিম লীগ তখন ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতিত্বের ঘোষণা করেছে আর সমুত্তরে পূর্বাভ্যস্ত পদ্ধতিতে জবাব দিতে চেয়েছি যে এদেশে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই হল প্রধান, আমরা 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'-র অধিকারী। প্রকৃত ঘটনা অবশ্য এর চেয়ে অনেক বেশি জটিল, কিন্তু নাগপুরে আমি অন্তত আশরফ্-এর প্রতিপাদ্য বিষয় সম্যক উপলব্ধি করতে পারি নি। পার্টিরও সময় লেগেছিল ভারতে বিভিন্ন 'nationalities' সম্বন্ধে মন স্থির করতে; ১৯৪২ সালে ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী -কৃত *Pakistan and National Unity* শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশের সময় এবং পরেও অনেক প্রশ্ন থেকে গেছে। যাই হোক, মনে আসছে '৪১ সালের প্রথম দিকে কলকাতা ইউনিভার্সিটি হলে এক বিরাট সভার কথা— সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শাহে্দ সোহরাওয়ার্দি, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পাকিস্তান সমর্থনে বললেন কলকাতার তখনকার 'মেয়র' আবদুর রহমান সিদ্দীকি, জিন্নার অনুচর হয়েও যিনি যথেষ্ট সাহস ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। এই সভার উল্লেখ করছি এজন্য যে সিদ্দীকি সাহেবের একটা কথা আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। নানা উপলক্ষে তার উল্লেখ আমি করেছি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা ভুলব না। পাকিস্তান সমর্থন প্রসঙ্গেই তিনি বললেন যে পাকিস্তান হলেও বহু মুসলমান থাকবে ভারতবর্ষে আর এই ভারতবর্ষই তার দেশ। অদ্ভুত চমৎকার ভাবে বললেন: "হিন্দু যখন মারা যায় তার শবদেহ তখন পুড়িয়ে দেওয়া হয় আর ছাই ফেলা হয় নদীতে যা কোন্ সমুদ্রে কোথায় যাবে কে জানে? কিন্তু মুসলমান যখন মরে, তখন তার চাই দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৬ × ৩ ফুট—ভারতবর্ষের মাটি। মুসলমানেরও এই দেশ, জীবনে এবং মরণে মুসলমানের এই ভারতবর্ষ হল দেশ!"

২০

চল্লিশের দশকে 'লেনিন দিবস' উদ্‌যাপিত হত তাঁর মৃত্যুদিন ২১ জানুয়ারি তারিখে। ঐ-উপলক্ষে এক সভায় (সম্ভবত ১৯৪৬ সালে) সমাজবাদ গ্রহণ করেন না কিম্বা তা নিয়ে মাথা ঘামান না এমন দেশভক্তদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাভরে কথা-ব্যপদেশে যখন বলি যে আমাদের জননী জন্মভূমি এই ভারতবর্ষের শৃংখলমোচন ভিন্ন অন্য কোনো কামনা তাঁদের নেই, তখন— আজও মনে আছে— সারা দেহে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল। আত্মশ্লাঘাবশে এ কথা বলছি না; বাস্তবিকই ঘটনাটা তুচ্ছ, এমন দৈহিক প্রতিক্রিয়ার সহজ ব্যাখ্যাও আছে; কিন্তু এটা সত্য যে পরাধীন দেশে জন্মে নিছক দেশপ্রেম আমাদের অনুভূতিতে শীর্ষস্থান নিয়েছিল আর সমাজবাদের প্রতি আকর্ষণের একটা মুখ্য কারণ ছিল শত্রু সাম্রাজ্যবাদের সমাজতন্ত্র বিষয়ে প্রচণ্ড আক্রোশ ও বৈরিতা। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েটকে নির্মূল করার যে জগদ্‌ব্যাপী প্রচেষ্টা চলেছিল, নিজেদের ঝগড়া ভুলে চৌদ্দটা রাষ্ট্র মিলে শিশু সোভিয়েটকে গলা টিপে মারার জন্য সরাসরি যে আক্রমণ ঘটেছিল, গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে, দুর্ভিক্ষ ঘটিয়ে, অর্থনৈতিক অবরোধ চালিয়ে বলশেভিকদের উৎপাটিত করার যে চেষ্টা ধনিক দুনিয়া করেছিল, আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যে ঘৃণ্য ভূমিকা নিয়েছিল, তার ফলে বিশ্বের একমাত্র সমাজবাদী দেশ সোভিয়েট সম্বন্ধে আমাদের মমতা ছিল স্বাভাবিক। অ্যাবিসীনিয়ায় (ঈথিওপিয়া), স্পেনে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় এবং অন্যত্র হিটলার-মুসোলিনি-তোজো প্রমুখের ফ্যাশিস্ট দৌরাত্ম্য গণতন্ত্রগর্বী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির নির্লজ্জ সহায়তায় পুষ্ট হচ্ছে দেখে ফ্যাশিজ্‌মকে আমরা সাম্রাজ্যবাদেরই জঘন্য এক মূর্তি বলে জেনেছিলাম। ১৯৩৫ সালে কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেসের পর থেকে ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে দেশে দেশে মিলিত গণতান্ত্রিক মোর্চার জোরে স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির পথে সমাজবাদের দিকে এগিয়ে চলার নীতি ও কর্মোদ্যোগের সঙ্গে তাই আমাদের অন্তরের হৃদ্যতা ঘটেছিল। ব্রিটেন-ফ্রান্স প্রভৃতির কূটনৈতিক শঠতার ফলে ফ্যাশিস্টবিরোধী কার্যক্রম বানচাল হওয়ার

আশঙ্কাকে প্রতিহত করার জন্য ১৯৩৯ সালে হিটলার-জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্র যখন অনাক্রমণ চুক্তি করে তখন প্রগতিশীল মহলেও বহু সংশয়ের উদ্রেক হয়, কিন্তু পার্টিতে আমাদের বুঝতে দেরি হয় নি যে শত্রু-বেষ্টিত সোভিয়েটের এই কৌশল ছিল নীতি ও সাধারণ বুদ্ধিসম্মত; জার্মানী-ইতালী-জাপানের মিলিত অক্ষশক্তিকে (Axis) পরাজিত করা নিয়ে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের বিন্দুমাত্র আগ্রহ যখন নেই এবং যথাসময়ে সোভিয়েটের ধ্বংস-সাধনই যখন উভয় যূথের অন্বিষ্ট তখন ভবিষ্যতে দু-পা এগিয়ে যাবার জন্যই এক-পা আপাতত পিছিয়ে আসা যুক্তিযুক্ত। সঙ্গে সঙ্গে স্টালিন তখন খোলা-খুলি ঘোষণা করেছিলেন যে "সোভিয়েট বাগানে শূয়োরের নাকমুখ এগিয়ে কেউ ঢুকলে তাকে শায়েস্তা করা হবে" (এই প্রতিশ্রুতি অগাধ অসুবিধা অগ্রাহ্য করে ১৯৪১-৪৫ সালে সোভিয়েট অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল)।

১৯৪০ সালে সমাজতন্ত্রকে বাঁচাবার স্বার্থে যখন আন্তর্জাতিক চক্রান্তকে সোভিয়েট চূর্ণ করল ফিনল্যাণ্ডকে ফ্যাশিস্ট গ্রাস থেকে উদ্ধার ক'রে, তখন আবার নিদারুণ রব উঠল সোভিয়েট-বিরোধী পক্ষ হ'তে— কোনো কোনো সৎ ব্যক্তিকেও তাদের প্রচার তখন বিভ্রান্ত করেছিল। পূর্বেই বলেছি নীরদ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে লিখিত বিতর্কের কথা। সম্ভবত এই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে এক সভা হয়েছিল, যেখানে জীবনে ঐ একই বার চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। জানতাম যে হাজার খুচরো বিষয়ে জ্ঞান তাঁর নখাগ্রে, সমরনীতি বুঝি বিশেষ করে অধ্যয়ন করেছেন এবং স্থির সিদ্ধান্ত (যা আজও অটল) করেছেন যে ইতিহাসে যুদ্ধ-ব্যাপারে ইংরেজের কৃতিত্ব হল সব চেয়ে বেশি! বাংলা ভালো লেখেন তবে ইংরিজীতেও সুপণ্ডিত (অবশ্য ইংরিজী রচনায় প্রকৃত অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন পরে)— দেখলাম খর্বাকৃতি মানুষ, মতামতের তীব্রতার সঙ্গে কেমন যেন বেমানান, কিন্তু বাস্তবিকই তখন তাঁকে তেমন আমল কেউ বড়ো একটা দিতেন না। আজ বিদেশী পাঠক ও অনুরাগীদের কৃপায় তিনি বিশ্ববিদিত, খুশ্‌বন্ত সিংয়ের মতো ভক্তের বিচারে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর সম্বন্ধে বেশি কথায় কাজ নেই— তবে সেদিন কে. পি. এস. মেনন (কিছুকাল সোভিয়েটে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত) স্বভাবজ ধীরস্থির ভাব ছেড়ে চটে উঠে বললেন যে স্বদেশের কুৎসা যার সর্ব অর্থে 'উপজীব্য' সে তো

ঘৃণ্য! বাস্তবিকই নানা গুণে মণ্ডিত হয়েও একজন মানুষ যে এমন বিকৃত এবং একান্ত গভীর অর্থে অবজ্ঞেয় হতে পারেন, তা ভেবে হদিস মেলে না। বছর দুয়েক আগে খুশ্‌বন্তের '*Illustrated Weekly of India*-তে "কেন আমি ভারতবাসীদের ঘৃণা করি" শীর্ষক প্রবন্ধে চৌধুরীমশায় কী প্রসঙ্গে আমার (এবং নীরদবাবুরও) বন্ধু, রাজনীতিক্ষেত্রে খ্যাত ত্রিদিব-কুমার চৌধুরীর সঙ্গে আমারও উল্লেখ করে বলেছিলেন যে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে হয়তো কিছু পদার্থ ছিল কিন্তু রাজনীতির মোহে তারা বলির পাঁঠার মতো হাড়িকাঠে গলা আগিয়ে নিজেদের সত্তা হারিয়েছে! এটাকে না-হয় সুপারিশ বলেই মানলাম। অন্তত খুশ্‌বন্ত প্রমুখ পরিচিতবৃন্দের কাছে এতে আমাদের 'দর' একটু বাড়ল! প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে ঐ-লেখা থেকে আবিষ্কার করেছিলাম যে নীরদবাবু আমারই ঠিক দশবছর আগে জন্মেছিলেন (২৩ নভেম্বর ১৮৯৭)। 'ক্ষণজন্মা' কাকে বলে জানি না, হাতের কাছে অভিধানও নেই, কিন্তু নীরদবাবুর সঙ্গে পাল্লা আমি দেব কোথা থেকে? দেবার লেশমাত্র অভিপ্রায়ও নেই।

চীনের মুক্তিসংগ্রাম আমাদের বেশ মাতিয়েছিল— ১৯৪২ সালে *China Calling* বলে ছোটো একটা বইও লিখে ফেলি, যেটা থেকে উদ্‌ধৃতি তুলে ১৯৬২ সালে আমাকে (এবং গোটা কম্যুনিস্ট পার্টিকে) দেশদ্রোহী প্রমাণ করতে কেউ কেউ উঠে পড়ে লাগেন। এড্‌গার স্নো-র সঙ্গে কলকাতায় একাধিকবার অনেক কথা হয়েছিল; তখন *Red Star Over China* সদ্য বেরিয়েছে; স্নো এসেছেন জেনে স্নেহাংশু ('দোদো') আচার্যের বাড়িতে তাকে নিমন্ত্রণ করে সভা ডাকা হয়, দোদো তখন কলকাতার বাইরে বলে আমিই দায়িত্ব নিয়ে তার ঘরে ব্যবস্থা করাই, বাড়ির মালিক এসে দেখে বহু লোক উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তার মস্ত বসবার ঘরে! সে যাক্‌, চীন সম্বন্ধে পড়াশুনো তখন কিছু করা গিয়েছিল, আর আজও মনে আছে, New Zealand-এর Rewi Alley-র (চীনের 'Industrial Co-operatives' সম্বন্ধে ইনি বিশারদ) একটা কথা: 'The workers are the salt of the earth, and to be part of their destiny is the greatest adventure of our time.' সোভিয়েট সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করার জন্য অসংখ্য বই খুঁজে বেড়াতাম তখন; *Treason Trials*-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থেকে

Joshua Kunitz-এর *Dawn over Samarkand*-এর মতো গ্রন্থ ; মার্কিন রাষ্ট্রদূত Davis-এর বিখ্যাত 'Mission to Moscow' কিম্বা Walter Duranty-র *Russia Reported*, Kingsley Martin-লিখিত ও David Low-বিচিত্রিত রুশ-ভ্রমণের বর্ণনা, Webb-দম্পতির *Soviet Communism* মহাগ্রন্থ, কিম্বা পাদরী হিউলেট জনসন-এর (*The Red Dean*) *The Socialist Sixth of the World*-এর মতো সুবিদিত রচনার কথা না-হয় বাদ দেওয়া যাক্। ১৯৪১ সালে সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি স্থাপনের পর থেকে বই, কাগজপত্র, ছবি ইত্যাদি আগের চেয়ে বেশি আসতে আরম্ভ করল, যে-কথা পরে হবে।

মেহনতী মানুষের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিশিয়ে দিতে পারার গৌরব ছিটেফোঁটার বেশি দাবি করতে পারি না। সংসারী মনোবৃত্তি জীবনে কখনো সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি ; নিজের আখেরের কথা কখনো ভাবি নি ; ব্যারিস্টারী পেশায় উন্নতির লোভে পড়ি নি ; মাস্টারী করি, সুতরাং সেই এলাকায় জমিয়ে বসি, পাঠ্যপুস্তক লিখে কিছু জমাই, হয়তো বা কোথাও জমি কিনে রাখি, আস্তে আস্তে একটা বাড়ি বানাই, এ-ধরনের চিন্তা কখনো মনে আমল পায় নি। এ সবই অবশ্য হল নেতিবাচক ব্যাপার, ইতিবাচক দিকটা তেমন উজ্জ্বল বলতে পারি না। মোটামুটি একটা পরিচিতি আমার হয়েছিল দেশে ; তাই কম্যুনিস্ট পার্টিতে স্থান পেয়েছিলাম, তার অমর্যাদা সজ্ঞানে করি নি বলতে পারি— পার্টিতে যোগ দেওয়া এবং যথাসম্ভব কাজ করে যাওয়া, অন্য কোনো ক্ষেত্রে মনোনিবেশ না করে যথাশক্তি একাগ্রতা নিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের অংশীভূত হয়ে কাজ করে যাওয়া, সমাজের যে স্তরে আমার অবস্থান সেখানে থেকেই, প্রকাশ্যে, কিছুটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাওয়া, একে কৃতিত্ব বলি না, কিন্তু এটাই ছিল বছরের পর বছর আমার নিত্যকৃত্য। ১৯৪০ সালের মতো ১৯৪১ সালেও একবার পুলিশ রাত থাকতে দরজা ঠেঙিয়ে ঘরে ঢুকল, থানা-তল্লাশী করল, দামী আর দুষ্প্রাপ্য কিছু বই নিয়ে গেল,. সারাদিন গোয়েন্দাদফ্‌তরে আটকে রেখে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিল। পার্টিতে 'কর্তাব্যক্তি' হওয়ার সম্ভাবনা কিম্বা অভিলাষ বিনাই বে-আইনী যুগ থেকে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক রেখে চললাম— হরেকরকম পার্টি-হুকুম প্রসন্নচিত্তে তামিল করে চললাম, ছাত্রসভা, সাহিত্য-সভা, সংস্কৃতিসভা, ট্রেডইউনিয়নসভা, পাঠচক্র, ময়দান-বক্তৃতা, অবিশ্রান্ত

রচনা ইত্যাদি আমাকে ব্যস্ত রাখল। পার্টিসাথীদের মধ্যে, সর্বক্ষণের কর্মী যাঁরা বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, তাঁদের কৃচ্ছ্রসাধন আমার পার্টিগর্বকে এবং মনুষ্য-চরিত্রে আস্থাকে পুষ্ট করতে থাকল। নেতাদের সবাইকে সমানভাবে পছন্দ করা অবশ্য কখনো সম্ভব হয় নি, হতে পারে না; কারো কারো কোনো কোনো চরিত্রবৈশিষ্ট্য যে পীড়া দেয় নি, তা নয়— তবে অন্তত সে যুগে মোটের ওপর মন থাকত নিষ্কণ্টক, সাম্প্রতিককালে এদিক থেকে কিঞ্চিৎ ক্লেশকর পরিবর্তন যে ঘটেছে তা না বলে পারছি না।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম, মেহনতী মানুষের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়া ব্যাপারে আমাদের আন্দোলনের গলদ এবং গ্লানি এখনো রয়ে গেছে— বোধকরি এ হল যেন খ্রীস্টান পুরাণ -কথিত 'আদিম-পাপ'-এর অনুরূপ এক বস্তু। হাসি পাচ্ছে মনে পড়ে যে একবার প্রাক্তন বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে সাংবাদিক, হিন্দু মহাসভা-মতাবলম্বী) ঠাট্টা করে বললেন যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সর্বত্র আধিপত্য করবেই। 'দেখুন না, কম্যুনিস্ট পার্টিতে জোশী-ভরদ্বাজ-বঙ্কিম মুখার্জি-নম্বুদ্রিপাদ ইত্যাদি, আবার [আমাকে দেখিয়ে] জুটেছেন ইনি!' প্রায়ই উচ্চ বর্ণের শিক্ষিত সমাজ থেকে পার্টির নেতৃত্ব অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রথমে এসেছে, আজও তা অটুট। আজও পার্টিনেতৃত্বে বিত্তবানদের প্রতিষ্ঠাও একটু লক্ষ্য করার মতো; হয়তো দেশের পার্লামেন্টারী আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে কিছু পরিমাণে এটা অনিবার্য। বৈরাগ্য সাধনে সবাই নামুন বলছি না, কিন্তু মনে খচ্‌খচ্‌ করে যখন অনিবার্য কারণ বিনাই ব্যয়বহুল বিমান ভ্রমণ ও বাসস্থানেও শীতাতপনিয়ন্ত্রণের দৃষ্টান্ত (বিরল হলেও) চোখে পড়ে। ১৯৫৯ সালে বোম্বাইয়ের *Economic Weekly* প্রকাশ করে Myron Weiner নামে এক বিদেশীর লেখা, যাতে বলা হয়েছিল যে টাটানগরে শ্রমিকনেতা মাইকেল জন (ইনি কংগ্রেসী ছিলেন) Mercedes-Benz মোটর গাড়িতে ঘোরেন, যেটা আমেরিকার মতো দেশে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা কিন্তু ভারতবর্ষে শ্রমিকদের চোখে কেমন যেন নিন্দার্হ, এবং আই.এন.টি.ইউ.সি.র নেতারা এ কথা যেন মনে রাখেন। তখন আমি ঐ সাপ্তাহিক একখণ্ড এ.কে.গোপালন-এর হাতে দিয়ে বলি যেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এধরনের ব্যাপার সম্বন্ধে সাবধানে চলেন— আশঙ্কা এই যে কথাটাকে মূল্য দেওয়া হয় নি। রাধারমণ

মিত্র চল্লিশের দশকে আমাদের খুব কাছে এসেছিলেন এবং আমার পরিবার-ভুক্ত অর্থবান্ কারো কারো সঙ্গে পরিচয়ের পর একদিন প্রশ্ন করেন: বিপ্লবকালে কিম্বা বিপ্লবের কাছাকাছি সময়ে আমার মতো সামাজিক অবস্থিতি নিয়ে কর্তব্যপালনে সমর্থ হব কি? প্রশ্নটি সহজ নয়; তেমন কঠোর পরীক্ষায় পড়ি নি, কিম্বা হয়তো তাকে এড়িয়ে চলেছি, খুব বেশি জ্ঞাতসারে না হলেও এড়িয়েছি। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শ্লেষোক্ত এক কবিতার পঙ্ক্তি তো অনেকেরই জানা: 'মনে কোরো ভাই, মোরা চাষা নই, চাষার ব্যারিস্টার!' আজকের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখে এই উক্তিটি মনে পড়ে যাচ্ছে। মার্ক্স্‌কে স্মরণ করে তাঁরা যেন **Kafka**-কথিত **"war profiteers of the working class"** কুৎসাকে নস্যাৎ করেন!

* * *

১৯৪০ সালে 'ভারতবর্ষ ও মার্ক্স্‌বাদ' নামে আমার একটা প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করলেন প্রাক্তন রাজবন্দী মহাদেব সরকার, মজলিসী যে মানুষটি কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি সত্ত্বেও পার্টিমহলে জমিয়ে অবস্থান করতেন, হয়তো আজও তাঁর ঘরে আড্ডা বসে। রিপন কলেজে পড়ানো বাদে ১৯৪৪ থেকে কয়েকবছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ইতিহাস (এবং অল্পকাল দর্শন বিভাগে নবসৃষ্ট মার্ক্স্‌বাদ বিষয়ক 'পেপার') পড়াতে হয়েছিল। আশুতোষ বিল্‌ডিংয়ের তেতালার বড়ো 'হল' কিম্বা মাঝেমাঝে সুপরিসর ক্লাসঘরে ছাত্রসভা কত যে করা গেছে তার হিসাব নেই; নানা কলেজে ছাত্রসংঘের আহ্বানে অসংখ্য বক্তৃতা করে বেড়িয়েছি, আর 'কানু ছাড়া গীত' আমাদের ছিল না, যে-বিষয়েই বলি-না কেন মার্কস্‌বাদের কথা আসবেই। বাংলার ছাত্রদল তখন সাম্যবাদের আহ্বানে উতলা হয়ে উঠেছে— আমার সাক্ষাৎ ছাত্রদের মধ্যে, এম.এ. ক্লাসে ছিল সুনীল সেন, অমল বসু, (কবি) সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর মতো অনেকে। চিন্মোহন সেহানবিশ বোধ হয় 'ইয়ুথ কালচারাল ইন্‌স্টিটিউট' ('ওয়াই.সি.আই')-এর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটান, সেখানে জলি কাউল, সুনীল মুন্সী প্রভৃতির মতো কৃতবিদ্য ছাত্র ছিল অগ্রণী, আলোচনা, বিতর্ক, অভিনয় ইত্যাদি ছিল যে সংস্থার কাজ। আমার বন্ধু ও সর্বকর্মে নিত্যসহচর সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

তখন অক্লান্ত উদ্যমে সাম্যবাদী আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। হায়াৎ খান্ লেনে তাঁর বাসা ছিল আমাদের একটা আশ্রয়; পরে উঠে গেলেন শ্যামবাজারে, 'পাঁচমাথার মোড়'-এর কাছে এক গলিতে, যেখানে তাঁর সঙ্গে থাকতেন মীরট ষড়যন্ত্র মামলাখ্যাত রাধারমণ মিত্র।

মীরট মামলায় অভিযুক্ত বাঙালীদের মধ্যে কিশোরীলাল ঘোষকে জানতাম না, যদিও শুনেছি আমার বাবার প্রীতিভাজন বন্ধু তিনি ছিলেন; উত্তর প্রদেশের (তখনকার যুক্তপ্রদেশ) মজুর-কৃষক পার্টির সভাপতি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে (বর্তমানে খ্যাতনামা বিশ্বনাথ মুখার্জি নন্) কখনো দেখি নি। বাকি বাঙালীরা হলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, ধরণী গোস্বামী, রাধারমণ মিত্র, শামসুল হুদা, গোপেন চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, শিবনাথ ব্যানার্জি— এঁদের সবাইকে অল্পবিস্তর কাছ থেকে জেনেছি। শেষোক্ত ভিন্ন সকলেই কম্যুনিস্ট পার্টিতে থেকেছেন। অবাঙালীদের মধ্যে পার্টিসূবাদে গঙ্গাধর অধিকারী, সোহন সিং জোশ, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, শ্রীহরি বিষ্ণু ঘাটে, পূরণচন্দ্ জোশীকে কমবেশি ভালোভাবে জেনেছি; আমীর হায়দর খানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, জোগ্‌লেকর, নিম্ব্‌কর, শওকৎ উস্‌মানির বেলাতেও তাই; বিদেশীদের মধ্যে ফিলিপ স্প্র্যাট-এর সঙ্গে মাত্র একবার দেখা এবং আলাপ হয়েছিল, বেন্ ব্র্যাড্‌লে-র কথা বিলাতে শুনেছিলাম, কিন্তু যোগাযোগ ঘটে নি, লেস্টর হচিন্‌সন্-এর পরিচয় পেয়েছি *The Empire of the Nabobs* এবং *Conspiracy at Meerut*-শীর্ষক উপভোগ্য গ্রন্থের মাধ্যমে। সময় থাকলে (আর পাঠক জুটলে!) এঁদের নিয়ে বেশ একটা বই ফাঁদা যায়। বিচিত্র চরিত্র এই ব্যক্তিপুঞ্জের ভূমিকা আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিতর্কিত হলেও সুপ্রতিষ্ঠ। বিভিন্নস্বভাব বলেই তাঁদের দোষগুণ, তাঁদের সাফল্য ও ব্যর্থতা, এবং তাঁদের কর্ম ও কর্মবিরতির বিচার সুশীল, সত্যসন্ধ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

মুজফ্‌ফর আহমদ্ আর পি.সি. জোশী সম্বন্ধে কিছু কথা আগেই বলেছি। সোহন সিংকে জানি ১৯৩৮ থেকে, তবে ভালো করে জেনেছি পরে। অধিকারী, ডাঙ্গে, ঘাটের সঙ্গে যোগাযোগ একটু পরের কথা। শিবনাথবাবু সম্বন্ধে কংগ্রেস-সোশালিস্ট পার্টির সুবাদে কয়েকটা কথা আগে লিখেছি; কম্যুনিস্টবিরোধী বলে তাঁর সম্পর্কে একটু অস্বস্তিও বোধ করেছি। বুঝেছি

আমার সম্পর্কেও তাঁর অনুরূপ অস্বস্তি, কিন্তু পরস্পরসৌজন্যে কখনো বাধা পড়ে নি। শামসুল হুদার সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছিল, অসাক্ষাতেও তাতে কমতি পড়ে নি; জাহাজের নাবিক হয়ে তিনি সোভিয়েট দেশে গিয়েছিলেন, হাসি-খুসি মানুষ, হঠাৎ হয়তো চটে উঠলেন আবার পরমুহূর্তেই ঠাণ্ডা। ১৯৪৮ সালে একত্র কারাবাসের সময় দেখলাম আন্তর্জাতিক বিপ্লবী কয়েকটা গান বেশ মনে রেখেছেন, কণ্ঠে না কুলোলেও সঙ্গীদের শেখাবার চেষ্টা করলেন। গোপাল বসাককে কলকাতা এবং ঢাকায় দেখেছি— বেঁটেখাটো মানুষ, সহজে আমল হয়তো পান না কিন্তু একগুঁয়ে, কিছুকাল পার্টির সঙ্গে কি একটা গণ্ড-গোলও নাকি তার হয়েছিল। গোপেন চক্রবর্তী বাঙালী সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষ থেকে সোভিয়েট দেশে সংগোপনে চলে গিয়ে কিছুকাল বাস করেছিলেন, সেখানে ভারতবিদ্যায় পারদর্শী দিয়াকভ্-এর ভগ্নীকে বিবাহ করেন, দেশে ফিরে অনেকদিন পার্টির কাজ করার পর আবার গেছেন সেদেশে, মস্কো রেডিওতে বাংলা কথক হয়ে— সাদাসিধে, সহৃদয় মানুষ, চিন্তা বা কর্মে চমক-প্রদ গুণপনার পরিচয় না দিয়েও সহজে বহুজনের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন। ধরণী গোস্বামীকে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি এবং তারই উত্তরাধিকারী ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সংঘের একজন প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে খুবই নিকট থেকে জেনেছি; আজও তিনি পার্টি কেন্দ্রে পরম দায়িত্বের কাজ করে চলেছেন; তরুণ বয়স থেকে কায়মনোবাক্যে বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, সন্ত্রাসবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটেছে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে; কঠোর জীবন কাটিয়েছেন কিন্তু চিত্তের প্রসন্নতা বিকৃত হয় নি— কথায় বা কাজে প্রতিভার চাকচিক্য নেই, কিন্তু আছে অনাড়ম্বর চারিত্র্য।

রাধারমণ মিত্রের পরম বন্ধু ছিলেন গোপেন এবং ধরণী, কিন্তু তিনি নিজে যেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। মীরট জেলে বাসকালে 'চলন্ত বিশ্বকোষ' বলে তাঁর নামকরণ হয়েছিল; মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করেছিলেন, বিষয়টিকে শুধু একাগ্র অধ্যয়নের জোরে আয়ত্ত করে নয়, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থেকে। গভীরভাবে একক এই মানুষটি গান্ধীজীর নজরে পড়েছিলেন, কিছুকাল সবরমতী আশ্রমে বাস করেছিলেন, মীরট জেলে বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় গান্ধীজী ঠাট্টা করে বলেন যে কম্যুনিস্টরা তাঁর

'ডান হাত' (অর্থাৎ রাধারমণ বাবুকে) কেড়ে নিয়ে এসেছে। তিনি উত্তর প্রদেশে এটাওয়া জেলায় কয়েকবৎসর শিক্ষকতা করেন (যেমন করেন তাঁর আবাল্য বন্ধু ও সহচর বঙ্কিম মুখার্জি)। অসহযোগ আন্দোলন কালে হিন্দুস্থানীতে অপূর্ব ভাষণ প্রদানের ক্ষমতার জোরে 'মাস্টারজী' বলে বিখ্যাত হয়ে পড়েন, কিছুকাল গান্ধীমাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে থাকেন। তবে শীঘ্রই মনে নানা প্রশ্ন ওঠে, উত্তরপ্রদেশে রাজনৈতিক খ্যাতি প্রত্যাখ্যান করে কলকাতায় এসে কর্পোরেশন স্কুলে মাস্টারী নেন্— আর তখন গান্ধীজীর ডাক আসে, 'আশ্রমে এসে অন্তত ছমাস থেকে যাও!' মহাত্মা কোনো ওজর মানতে রাজী হন্ না, অর্থাভাবের কথা উঠলে জীবনলাল-এর বড়বাজারের গদিতে গিয়ে কলকাতায় পারিবারিক খরচের জন্য দরকারী টাকা চেয়ে নিতে বলেন। আজকের পাঠক বোধ হয় চিনবেন এই জীবনলাল শ্রেষ্ঠীপরিবারকে— 'Crown Aluminium'-এর এরা মালিক, আর তখন আজকের মতো ধনী না হলেও যথেষ্ট সম্পন্ন গুজরাটী হিসাবে গান্ধীজীর বিশেষ ভক্ত। রাধারমণ-বাবুর কাছে শুনেছি তিনি গেলেন জীবনলালের গদিতে, গান্ধীজীর কাছ থেকে আসছেন জেনেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল কত টাকা দরকার, একটু ভেবে বললেন ৬০০ টাকা (তখনকার দিনে ছ'মাসের খরচ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট) আর বলামাত্র, প্রমাণ সাবুদের অপেক্ষা না করে, খাজাঞ্চি করকরে ছ'শো টাকা হাতে তুলে দিল— যদি আরো মোটা অঙ্ক চেয়ে বসতেন, তা হলেও অন্যথা হ'ত না! যাই হোক, রাধারমণ মিত্র গেলেন সবরমতী আশ্রমে, কিন্তু সেখানকার সৎসঙ্গেও মনের অন্ধকার কাটল না, গান্ধীনীতি সম্বন্ধে সংশয় দূর হল না, সদ্য-আস্বাদিত মার্ক্‌স্‌তত্ত্বের মহিমাই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল। কম্যুনিস্ট পার্টিতেও নাম লেখালেন না, যদিও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে থাকলেন— হয়তো এজন্যই মুজফ্‌ফর আহমদের মনে তাঁর সম্পর্কে একটু বিরূপতা ছিল, বলতেন তিন ভাষায় দারুণ বক্তা কিন্তু পার্টি সম্বন্ধে কেমন যেন দো-মনা। পরে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছুকাল পার্টিসদস্য হয়ে আমাদের হর্ষ বর্ধন করেছিলেন, আবার এলিয়ে পড়েন অসার্থক নৈঃসঙ্গ্যে। অসামান্য বাগ্মী যে ছিলেন তার কিছু পরিচয় আমরাও পেয়েছি— সে-প্রসঙ্গ আপাতত থাক্, বলি অন্য এক ঘটনার কথা।

২২শে জুন ১৯৪১ তারিখে রেডিও মারফত জানা গেল যে সেদিনই ভোর রাত্রে অতর্কিতে হিটলার-বাহিনী অভূতপূর্ব অস্ত্রসমাবেশ নিয়ে সোভিয়েট ভূমি আক্রমণ করেছে আর আচম্‌কা আঘাতে লালফৌজকে নিদারুণ ক্ষয় ক্ষতি এবং পশ্চাদপসরনের গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে। এই আকস্মিক ও পরাক্রান্ত ফ্যাশিস্ট তাণ্ডবের সংবাদ জগৎকে স্তম্ভিত করেছিল, আর আমাদের মনের গভীরে সঞ্চারিত হয়েছিল সোভিয়েটভূমি সম্বন্ধে নূতন এবং একান্ত আত্মীয় এক অনুভূতি। মনে আছে খবর শুনেই যোগাযোগ করি আমার তখনকার দুই নিকটতম বন্ধু ও কমরেডের সঙ্গে— স্নেহাংশু আচার্য ও জ্যোতি বসু। স্নেহাংশু তার গাড়ি নিয়ে ছুটে আসে (তার BLB 141 গাড়ি চড়ে তখন কলকাতা চষে বেড়াতাম আমরা), স্থির করি সেদিনই সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি (Friends of the Soviet Union, F. S. U.) নামে সংস্থা গড়ার জন্য কমিটি খাড়া করা যাবে, আর চেষ্টা করা হবে অবিলম্বে সোভিয়েটভূমি বিষয়ে গ্রন্থ, পুস্তিকা, পত্রিকা প্রকাশ, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা নিয়ে। সর্বজনপ্রিয় ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হলেন সভাপতি, স্নেহাংশু এবং আমি সম্পাদকের ভার নিলাম, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সেদিনই বৈঠক বসল। দুঃসংবাদ জানাতে গিয়েছিলাম রাধারমণবাবুকে কর্পোরেশনের 'স্টোরস্‌' অফিসে— খবর শুনে তাঁর চোখে আগুন ফুটে উঠেছিল, লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন সোভিয়েটকে জিততেই হবে, নইলে আমাদের এই ভারতবর্ষকেও যে কত দীর্ঘ দিন ধরে পরাধীনতার জ্বালা সইতে হবে !

আমাদের স্বদেশ তখন পরবশ। আবার বলি স্বাধীনতার চিন্তা তখন দেহে মনে রোমাঞ্চ আনত, শিরায় শিরায় তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়ে দিত, আমাদের সত্তার সর্ববিধ সার্থকতা তখন দেশের মুক্তির প্রতীক্ষায়। কিন্তু একটু না-হয় গর্ব করি যে তখনই দেশপ্রেম ও সাম্যবাদের মূলগত সামঞ্জস্য যথাসাধ্য আমরা আত্মস্থ করেছি— ভুলভ্রান্তি অবশ্যই ঘটেছে, কিন্তু দেশাভিমান ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে সংগতি স্থাপনের প্রয়াসে নেমেছি। এ শুধু আমাদের কথা নয়— যেখানেই মানুষের অধিকার অস্বীকৃত, যেখানেই নবজীবনে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা, সেখানেই দেখা গেছে প্রথম সমাজবাদী দেশ সোভিয়েট সম্বন্ধে মমতা। সোভিয়েট বিপ্লবের অব্যবহিত পরে কয়েক বৎসর ধরে যে দুর্দিন চলেছিল তাকে পরাজিত করার রসদ সোভিয়েট চেয়েছিল

নানা দেশের জনতার সমর্থন থেকে। সোভিয়েটের স্বকীয় শক্তি ইতিহাসকে দীপান্বিত করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু জগজ্জনের এই মৈত্রী ও সহায়তার আগ্রহ হল সোভিয়েটের অক্ষয় সম্পদ। সেদিনের বিপন্ন সোভিয়েটভূমি আত্মবিশ্বাস হারায় নি, এই ঐশ্বর্যের অস্তিত্ব তার অজানা ছিল না বলে।

সদ্যস্থাপিত সমিতির পক্ষ থেকে সুরেন গোস্বামী গেলেন শান্তিনিকেতনে —রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য তখন ভেঙে পড়েছে, কিন্তু তাঁর আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল আমাদের সব চেয়ে বেশি। কবি রাজী হলেন সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির পৃষ্ঠপোষক হ'তে, তবে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে, ইংরেজ নিজের স্বার্থে সোভিয়েটকে সাহায্য করবে বলছে বটে, কিন্তু 'বিশ্বাস কোরো না ওদের; তোমরা কম্যুনিস্টরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গা-ঢিলা দিয়ো না'। কম্যুনিস্ট পার্টিরও চিন্তা তখন ঐরূপই ছিল— তাই সুরেনবাবু দেখালেন রবীন্দ্রনাথকে পার্টির সদ্যগৃহীত প্রস্তাব, কবি পুলকিত হলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনান্ত ঘটতে তখন দেরি ছিল না। সোভিয়েট আক্রান্ত হওয়ার পর ছয়-সাত সপ্তাহের বেশি তিনি বাঁচেন নি। শেষ রচনাগুলিতে (যেমন Eleanor Rathbone-কে লেখা চিঠি) সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে তাঁর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল, আর সবাই তো জানি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কেবল জানতে চাইতেন যুদ্ধের খবর, বলতেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-এর মতো অন্তরঙ্গ সহচরকে যে সোভিয়েট কখনো হার মানবে না। এক বিষণ্ণ শ্রাবণ দিনে কবি চলে গেলেন, ব্যথাতুর দেশবাসী মহাগুরুপতনের আঘাত সইল, উপায়ান্তর ছিল না, মৃত্যু তো অবধারিত ঘটনা। তবে কবির ঋষিবাক্য ব্যর্থ হয় নি; যে দেশে তিনি লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তি দেখেছিলেন এবং তুলনায় ধনগর্বী আমেরিকার কুবের-সুলভ বিলাসমেদবাহুল্যে ক্লিষ্ট হয়েছিলেন (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়) সেই সোভিয়েট দেশ পরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রমাণ করল যে সমাজবাদ অপরাজেয়, আগুনের অক্ষরে ইতিহাসের আকাশে তা জাজ্বল্যমান্ হয়ে রইল।

* * *

৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটের চারতলায় সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির দফ্তর হল আমাদের প্রধান কর্মস্থল—কেমন যেন ঐতিহাসিক সংগতি রয়েছে

কলকাতার এই জম্‌জমাট রাস্তার 'লেনিন সরণী' নামকরণে, আজও এফ.এস.ইউ.'র পরম্পরাবাহী 'ইস্‌কাস্‌' (ইন্দো-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সমিতি) এই রাস্তা থেকেই কাজ করছে। শ'খানেক লোক স্বচ্ছন্দে বসতে পারে এমন একটি হল্‌-ঘর, আড়াইখানা খুদে কামরা আর ছাদ নিয়ে ছিল এই দফ্‌তর ; বিয়াল্লিশ সালে এখানেই আস্তানা পড়ল ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের। কিছু পরে বাসা বাঁধল গণনাট্য সংঘের (IPTA), আরো অনেক পরে, স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সারা ভারত শান্তি সংসদের বাংলা শাখা। '৪৬ নং' হয়ে দাঁড়াল এক 'কোড্‌'-বাক্য ; রাস্তার নাম বলতে হত না, সবাই বুঝত অকুস্থল! চিন্মোহন সেহানবীশ এ-নিয়ে অনেক খবর সাজিয়ে বহু মজার কথা মনে পাড়িয়ে দিয়েছেন ; 'ঠিকানা-কলকাতা' নামে সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থে সুনীল মুন্সী রেখা এবং লেখার মাধ্যমে '৪৬ নং-'এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। আশ্চর্য নয়, কারণ এখানে চলত একাধারে নির্ভেজাল আড্ডা, তারস্বরে তর্ক, সুমার্জিত সভা, দেশী ও বিদেশী মহাজনের সমাগম, এলোমেলো গানের মধ্য দিয়ে অজানা প্রতিভার আবিষ্কার, শান্ত সৌষ্ঠব নিয়ে শিল্পমহিমান্বিত অনুষ্ঠান, গভীর ও তরল উভয়বিধ আলোচনা ও পঠনপাঠন, নাটকপাঠ ও অভিনয় এবং নৃত্যের মহড়া (যার তোড়ে নীচের ঘরের বাসিন্দা ফিরিঙ্গিদের নৈশাহার্যের ওপর একবার চুন-সুরকির ডেলা পড়ে অনর্থ ঘটায়, কিন্তু কি জানি কেন, এই সহনশীল ফিরিঙ্গি পরিবারের কেউ আমাদের সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিরক্তি ও রোষ দেখায় নি)। এখান থেকে প্রকাশ হল সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির ইংরিজী পাক্ষিক, 'ইন্দো-সোভিয়েট জার্নাল', যেটার পুরো ভার আমার হাতে ছিল ; প্রথম কয়েক সংখ্যায় সম্পাদক হিসাবে নামটা ছাপা হত জ্যোতি বসুর, কারণ তাকেই সমিতির প্রাদেশিক সম্পাদক ঘোষণা করা হয়েছিল। এখান থেকেই আয়োজন করা হত সোভিয়েট বিষয়ে ছোটোখাটো ঘরোয়া বৈঠক থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো জনসভা, 'পোস্টার' বা 'ফিল্‌ম্‌'-প্রদর্শনী। মনে পড়ছে বিশেষ করে ৭ই নভেম্বর ১৯৪১ তারিখে বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে টাউন হলে মস্ত সমাবেশ ; পার্টি তখন বে-আইনী বলে এ-ধরনের প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে পার্টির সকল সম্ভাব্য শক্তি ব্যবহৃত বলে জনসমাগম হল প্রচুর। বক্তৃতা করার আগে সভার মর্মস্পর্শী মূর্তি দেখে হঠাৎ মনের মধ্যে ঘুরতে লেগেছিল একটি কথা : 'সোভিয়েট আমারও দেশ!' কিছু পরে ঐ আখ্যা

দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে কারো কারো কাছে বিদ্রূপের ভাগী হয়েছি, বৈরিতা-বর্জিত হলেও তা ছিল বিদ্রূপ। বহুদিন কাটার পরও জ্যোতি বসু— যখন সে প্রভূত যশস্বী এবং মন্ত্রীপদারূঢ়— সকৌতুকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সেদিনের কথা, পার্টি তখন বিভক্ত, হয়তো কিছুটা সমালোচনাও তার মনে ছিল! আমি লিখেছিলাম: "সোভিয়েট আমারও দেশ। হ্যাঁ, এ কথা আবার বলি, যদিও মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আমি ভারতীয়, ভারতবর্ষকে আমি ভালোবাসি, আমার দেশের প্রতিটি ঘাসের ডগাকে আমি ভালোবাসি, ভারতবর্ষের মুক্তির চেয়ে বড়ো কোনো কামনা আমার নেই, তবুও আমি বলব যে সোভিয়েটও হল আমার দেশ।"

১৯৬৬ সালে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির ২৩-শ কংগ্রেসে হাঙ্গেরীর নেতা কাদার অতি শোভন ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বলেছিলেন: "সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে নীতিসম্মত ভ্রাতৃত্ববোধকে সর্বদা আন্তর্জাতিকতার কষ্টিপাথর বলে আমরা ভেবেছি, আজও তাই ভাবি। সোভিয়েট-বিরোধী কম্যুনিজ্‌ম্ বলে কোনো বস্তু কখনো ছিল না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও কোনো কালে থাকবে না।" ঐ কংগ্রেসেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা হোচি-মিন্-এর বাণী পাঠ করার পর ভিয়েৎনাম কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক লে-জুয়ান বলেন: "ভিয়েৎনামী কম্যুনিস্টদের কাছে মাতৃভূমি যেন দুটি— প্রথমত ভিয়েৎনাম, এবং দ্বিতীয়ত, যেদেশে সমাজবাদ প্রথম দিগ্‌বিজয়ী হয় সেই সোভিয়েট ইউনিয়ন।" নিজের বিষয়ে বলতে পারি যে সোভিয়েট কর্মকাণ্ডের কোনো কোনো ব্যঞ্জনায় কচিৎ কদাচিৎ বিব্রত হয়ে থাকলেও পূর্বোদ্ধৃত উক্তি করে কখনো অপ্রতিভ বোধ করি নি, লেশমাত্র কুণ্ঠা বা লজ্জা অনুভব করি নি।

পার্টির পক্ষ থেকে প্রধানত সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতি ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কাজের ভার ছিল অল্প কয়েকজনের উপর— জ্যোতি বসু; স্নেহাংশু আচার্য, ভূপেশ গুপ্ত (যে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেই ডুবে রইল পার্টির কাজে, কিছুদিন 'সুড়ঙ্গ' বাস করল, প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধি ছিল সে), মোহিত ব্যানার্জি আর আমি। এই মোহিতকে প্রায় সবাই আজ ভুলে গেছে কিন্তু কয়েকটা তার কাজ কখনো যেন ভুলে না যাওয়া হয়। সংগীতজ্ঞ না হয়েও তার একটা নৈপুণ্য ছিল যা সে খাটালো অন্তর দিয়ে, 'আন্তর্জাতিক' এবং

অন্যান্য কয়েকটা বিদেশী বিপ্লবী গানের বাংলা তরজমা করে, একটু আক্ষরিক, সুতরাং কটোমটো, কিন্তু সুরের সম্পূর্ণ সংগতি রেখে। 'ইণ্টার-ন্যাশনাল'-এর যে অনুবাদ কাজী নজরুল ইসলাম অনেক দিন আগে করেন তাতে মূল গানের সুরের সঙ্গে সম্পর্ক মাত্র ছিল না। উর্দু যে অনুবাদ সুরগত সামঞ্জস্য সুন্দরভাবে রেখেছিল, তাতে কথাগুলো কিছুটা বদ্‌লানো হয়েছিল— কে এই অনুবাদকার, জানি না। তবে আমাদের স্মৃতি অতি ক্ষণস্থায়ী বলে এটিকে উদ্ধৃত করছি, গান হিসাবে এটি চমৎকার জমে থাকে :

ক্যা খাক্ হ্যায় তেরী জিন্দগানি, উঠ-এ গরীবো বেনোয়া

ক্যা হ্যায় ইয়ে তুম্‌নে দিলমেঠানি, রহে বন্দা গুলাম আবদা ?

আও গুলামী অপ্‌নী ছোড়ে, হুঁ আজাদ অওর রেহা,

বদ্‌লে ইয়ে সারে দুনিয়া বদ্‌লে, জিস্‌মে জুলুম্ হ্যায়্ জোর অওর জফা !

হ্যায়্ জং হমারী আখ্‌রী, ইস্‌পর হ্যায় ফয়স্‌লা

সারে জহাঁকো মজ্‌লুমোঁ, উঠো কী বক্ত্ আয়া ॥

মোহিত করল অবিকল অনুবাদ, যা দেখে (এবং প্রথমে শুনেও) জ্যোতি এবং আমরা অনেকে হেসে খুন, এ কথাগুলো বাংলায় আউড়ে গান হবে কেমন করে, কিন্তু দেখা গেল একটু 'মক্‌সো' করে নিলে ঠিক্‌ই হয় :

জাগো জাগো জাগো সর্বহারা, অনশন-বন্দী ক্রীতদাস,

শ্রমিক দিয়েছে আজ সাড়া, উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস।

সনাতন, জীর্ণ, কু-আচার, চূর্ণ করি জাগো জনগণ,

ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার, জীবন মরণ করি পণ।

শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড, এসো আজি মিলি একসাথ,

ইণ্টার ন্যাশনাল মিলাবে মানব জাত।

প্রাসঙ্গিক বলে এখানেই জানাই হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-কৃত হিন্দী 'ইণ্টারন্যাশনাল'-এর কথা। সংগীত বিজ্ঞানে এবং স্বকীয় কণ্ঠসঞ্চালনে কৃতবিদ্য এই বিচিত্র গুণধর মানুষটির কথা পরেও বলব— এখানে শুধু উদ্ধৃত করছি তার তরজমা, যাতে রয়েছে ভারতীয় সংগীতধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী শব্দের চরিত্রগত সংগতিও বটে :

উঠো জাগো ভুখে বন্দী, অব খীঁচো লাল তল্‌ওয়ার,

কব তক্ সহোগে ভাই, জালিমকা অত্যাচার ?

তুম্‌হারে রক্তসে রঞ্জিত ক্রন্দন, অব্‌ দশ দিশ লায়া রং,
সও সও বরষকা বন্ধন, একসঙ্গ্‌ করেঙ্গে ভঙ্গ্‌।
য়হ্‌ অন্তিম জং হ্যায়্‌ জিস্‌কো, জিতেঙ্গে হম্‌ একসাথ,
গাও ইন্টারন্যাশনাল, ভব-স্বতন্ত্রতাকা গান ॥

মোহিত শুধু এই গান নয়, অন্য বেশ কয়েকটা গানেরও তরজমা করল—বিশেষ করে মনে পড়ছে 'সোভিয়েটভূমি বিশ্বশ্রমিকপ্রিয়, সুখশান্তি সদা বিরাজমান/ জগতে নাই তোমার তুলনীয় / কোথায় এমন মুক্ত স্বাধীন প্রাণ ?' সেটা যে-কোনো সমাবেশে বিদেশীর গলায় (ভুল হলেও) শুনলে সোভিয়েট শ্রোতারা মেতে ওঠে। মোহিতের পার্টিজীবন অবশ্য স্বল্পস্থায়ী; কিছুকাল বাদে বিমান বাহিনীতে সে কাজ নেয় (বিলাতে 'অ্যাকউন্ট্যান্সি' বিদ্যা সে আয়ত্ত করেছিল), কয়েক বৎসর আগে তার অকালমৃত্যুতে সবাই ব্যথিত, সরল, শান্ত, সদ্‌বুদ্ধিপরায়ণ বন্ধুবৎসল মানুষটিকে কেউ ভুলব না— স্নেহাংশুর মতো কৌতুকপ্রিয় প্রাণবন্ত বন্ধু মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে রহস্য করেছে, মোহিতকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিয়ে মজা পেয়েছে, কিন্তু বাস্তবিকই তার সাহচর্য আমাদের কাছে ছিল মহার্ঘ।

সম্ভবত ১৯৪১ সালের জুলাই মাসেই বাংলা থেকে উদ্যোগী হয়ে আমরা ব্যবস্থা করলাম নিখিল ভারত সোভিয়েট সুহৃৎ সম্মেলনের— অধিবেশন বসল কলকাতার প্রশস্ত ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে। 'ইন্দো-সোভিয়েট জার্নাল' পরিচালনা ব্যপদেশে আমার সঙ্গে পুনার প্রথিতযশা অধ্যাপক কোশাম্বীর যোগাযোগ হয়েছিল—গণিত, ইতিহাস, সংস্কৃত ও বহুবিধ বিদ্যায় পারংগম এই মানুষটির মতো প্রকৃত পণ্ডিত, সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্‌স্‌বাদে সুগভীর অনুরাগী আর কাউকে আমাদের যুগে দেখি নি। শুধু তুলনা করতে পারি—তবে পুরোপুরি তুলনা চলে না— মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন-এর সঙ্গে, যিনি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহায়ক ছিলেন, কিসান আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বিরাট বিদ্যাবত্তার বোঝাকে হালকাভাবে বহন করে সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন, যেদিন ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে বে-আইনী অবস্থা থেকে রেহাই পেয়ে পার্টির মস্ত মিছিল কলকাতার পথঘাটকে কাঁপিয়েছিল, যে-মিছিলের একেবারে সামনে রক্তপতাকা স্কন্ধে নিয়ে চলছিলেন দুই ভিন্ন

প্রকৃতির বিদ্বান্, রাহুলজী আর অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়। পিতা ধর্মানন্দ কোশাম্বীর কোবিদখ্যাতিকে অতিক্রম করে পুত্র বিবিধ রচনায় অজস্র প্রমাণ দিলেন শুধু অসামান্য নয়, আজও অদ্বিতীয় প্রতিভার। তাঁকে চাইলাম সোভিয়েট সুহৃৎ সম্মেলনে সভাপতি রূপে, জবাব দিলেন এ-হেন প্রস্তাবে তিনি বিস্মিত, কিঞ্চিৎ বিমুগ্ধ, অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কিন্তু কলকাতা যাতায়াত তাঁর পক্ষে তখন অসম্ভব। 'ইন্দো-সোভিয়েট জার্নাল' তাঁর বহু আনুকূল্য পেয়েছিল ; সম্মেলনে যোগদানে তাঁর অক্ষমতায় আমরা পীড়িত হলাম, কিন্তু উপায় ছিল না। তখন ডাকা হল আমার পুরোনো বন্ধু ইফতিখার উদ্দীনকে যে তখন পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং সর্ববিধ প্রগতিকর্মে আগ্রহী। সে এল, সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলল, বক্তৃতা দিল— আর এলেন পাঞ্জাব থেকে তরুণ সর্দার জগজিৎ সিং যিনি পরে কিসান সভার এক প্রধান হয়েছিলেন। তাঁকে চিনতাম না আগে, হাওড়া স্টেশনে প্রথম দেখলাম, প্রায় নেংটি পরে এসেছেন, সঙ্গে মালপত্রের মধ্যে মাঝারি আকারের একটা বাণ্ডিল যা বগলদাবা করা সহজ— তুলে নিয়ে যাওয়া হল আলিপুরে বেকর রোডে স্নেহাংশু আচার্যের মনোরম বাসভবনে, কারণ স্থির করা হয়েছিল তাঁকেই সারা ভারত সংস্থার সাধারণ সম্পাদক করা হবে। একটু পিছনে থাকা যেন আমার নিয়তি, সঙ্গে সঙ্গে আমার পছন্দ-ও, তাই আমি হলাম যুগ্মসম্পাদক— কাজের ভার প্রকৃতপক্ষে পড়ল আমারই ওপর। গর্ব করতে চাই না, কিন্তু সোভিয়েট সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং রচনা আমাকে যত করতে হয়েছে, তা একটা 'রেকর্ড'-ধরনের যে ব্যাপার তাতে সংশয় নেই! কিন্তু থাক্, এ-বড়াই করে ফেললাম বলে একটু বিব্রত লাগছে, পাঠকদের কাছে মাফ চেয়ে রাখছি।

সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন তেমন প্রতিনিধি-মূলক না হলেও মোটামুটি সফল হয়েছিল ভালো। শ্রমিকদের একটা আলাদা সমাবেশ হয়েছিল, যেখানে এক হাজার মেহনতী মানুষ মিছিল করে আসে— মনে আছে শিবনাথ ব্যানার্জি (যিনি যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন) মিছিলের দৈর্ঘ্য দেখিয়ে বললেন যে গুনে গুনে হাজার লোক যেখানে জড়ো হয়, সেই ভিড়কে দেখে দশহাজার যদি কেউ বলে তো 'না' করা যায় কি? কথাটা মনে আছে কারণ আজকাল দেখি আকছার প্রচণ্ড সমাবেশ, যেখানে

নাকি দশলক্ষ (কি তারও বেশি !) জমায়েৎ বলে জাঁক চলে, কিন্তু গুনে গুনে দেখলে যে সংখ্যা বেরোয়, তার সন্ধান না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতি পরিচালনায় পার্টির উপদেশ আর সাহায্য মিলত অবশ্যই। পার্টির প্রাদেশিক সম্পাদক ভবানী সেন স্বয়ং পাঠচক্রে ক্লাস নিয়েছেন, সভাসমিতি, প্রদর্শনী ইত্যাদি ব্যাপারে পার্টিকর্মী ও বন্ধুদের সহায়তা অপরিহার্য ছিল। দফতর চালানো ব্যাপারে প্রথম দিকে বেশ কিছুকাল ধরে মূল্যবান কাজ করতেন প্রাক্তন রাজবন্দী সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়, যিনি আন্তরিক আবেগ নিয়ে সমিতির দৈনন্দিন তত্ত্বাবধান করতে থাকেন; 'অন্তরীণ' অবস্থায় আমার রচনা (বিশেষত ইংরিজী) তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বলে আমার সহযোগী হওয়া নাকি তাঁর কাম্য ছিল, কয়েকটা বিষয়ে মাঝে মাঝে মতদ্বৈধ সত্ত্বেও একসঙ্গে আনন্দেই কাজ করেছি। সত্যব্রত পরে আমাদের শুভার্থিনী শ্রীমতী এলা এবং তাঁর স্বামী ('স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার তৎকালীন বার্তাসম্পাদক) অ্যালেক রীড্‌-এর চেষ্টায় 'স্টেট্‌স্‌ম্যান'-এ নিযুক্ত হল, এখনো বোধ হয় ঐ-পত্রিকাতেই উচ্চপদে রয়েছেন (অ্যালেক ও এলা রীড পার্টিরও বন্ধু ছিলেন, যদিও কখনো সর্বব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না— এই দম্পতি বিষয়ে অনেক কথা মনে আসছে কিন্তু নিজেকে সংবরণ করতে হবে)। '৪৬ নং'-এ আমাদের 'সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দে'র নেতা অবশ্য ছিলেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত— নিরহংকার, শিশুর মতো সরল, চরিত্র-মাধুর্যে সকলের প্রিয়, আর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার— মজলিসী, দরাজ, তীক্ষ্ণচেতা, জীবনের জটিলতাকে সহজ মানবিকতার প্রসাদে অতিক্রম করার প্রতিভা-সম্বলিত, অথচ হাস্যরসিক, নগণ্য নিন্দুকের ইতরতায় অবিচল, আমাদের 'guide, philosopher and friend', যদিও বহু বিষয়ে আপাত-বিচারে তাঁকে মনে হত একটু যেন প্রগল্‌ভ, গভীরতার অনুভূতিকেও যেন লঘু করে ফেলছেন— কিন্তু যাক্‌। ১৯৫৪ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের আসরে তিনি ছিলেন প্রধান। সোভিয়েট ভ্রমণ-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত বইটি এবং স্টালিন জীবনীতে তিনি সোভিয়েটের প্রতি তাঁর অটল মমতার সাক্ষ্য রেখে গেছেন— কিন্তু ব্যক্তিরূপে শ্রদ্ধাপ্রীতি-বিমিশ্রিত তাঁর স্মৃতিও আমাদের মনে অটল। এরই সঙ্গে উল্লেখ করব আর-একজনের নাম, যিনি ছিলেন তুলনায় গম্ভীর, একেবারে ভিন্ন উপাদানে গড়া, অথচ সোভিয়েট সৌহার্দ্য

ব্যাপারে শুধু উৎসুক নয়, প্রায় তন্ময়, কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান সদস্য হয়েও কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সর্ববিধ সত্যসন্ধ প্রয়াসে সাগ্রহ সহযোগী (হয়তো পুত্র গৌতমের প্রভাব এক্ষেত্রে ছিল), সুভাষচন্দ্রের পরম বন্ধু ও দীর্ঘকালের সহচর— ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির সঙ্গে এঁর অবিচ্ছিন্ন ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কে প্রকৃতই সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এক স্মরণীয় ঘটনা।

* * *

কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি তখন হল সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধে সোভিয়েটকে সাহায্য করা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম চালানো। ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সম্বন্ধে তখনো আমাদের প্রখর প্রতিকূলতা ও আক্রোশ। '৪১ সালের নভেম্বর ডিসেম্বরে লাহোরে পঞ্জাব প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে সভাপতি হয়ে গেলাম, কদিন আরামে থাকলাম মিঞা ইফ্‌তিখার উদ্দীন-এর বাড়িতে, ভাব হল ভারত-বিখ্যাত নেতা ডক্টর সৈফুদ্দীন কিচলুর সঙ্গে, সম্মান জানাতে গেলাম অশীতিপর অধ্যাপক রুচিরাম সাহনীকে (যিনি অসহযোগ যুগে খ্যাতিমান হয়েছিলেন), লাজপৎ রায় -ভবনে আলোচনায় চমৎকৃত হলাম তরুণ এক ছাত্র কমরেডকে দেখে, তার নাম হল সৎ পাল ডাং (আজ পঞ্জাবে পার্টির ইনি এক প্রধান নেতা), চিনলাম যে-সব তরুণ-তরুণীকে তাদের মধ্যে ছিল রমেশচন্দ্র (এখন বিশ্বশান্তি পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক), লিট্টো (যে পরে পার্টি সম্পাদক কমরেড অজয় ঘোষকে বিবাহ করে, এখন ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সংঘের সম্পাদক), প্রেম-সাগর গুপ্তা (এখন দিল্লী কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি), ইন্দ্রকুমার গুজরাল (বর্তমানে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)। এই সময় বিভিন্ন জেলে ও বন্দীনিবাসে কম্যুনিস্ট ও বন্ধুভাবাপন্নদের মধ্যে গভীর আলোচনা চলছিল হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট আক্রমণ এবং ব্রিটেন ও সোভিয়েটের সহযোগিতার ফলে পরিস্থিতি পরিবর্তন এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জনযুদ্ধে রূপান্তরণ নিয়ে। দেওলি বন্দীনিবাসে তখন ছিলেন বি.টি.রণদিভে; তিনি পরে আমায় বলেন যে, লাহোরে ছাত্রসম্মেলনে আমার বক্তৃতার বিবরণ কাগজে পড়ে তাঁরা বুঝলেন তখনো পার্টি জনযুদ্ধ নীতি গ্রহণ করে নি, যদিও দেওলি

বন্দীদের অধিকাংশ সেই মর্মে মত দিয়েছেন। পরে জেনেছি কী বিপুল এই বিতণ্ডা চলেছিল; আমাদেরও আলোচনায় শামিল হতে হয়েছিল; সাম্রাজ্যবাদী শাসনে জর্জর ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটিশ-বিরোধিতাকে মুলতুবি রাখা সহজ কর্ম ছিল না। যাই হোক্, জানি এজন্যই তখন আমাদের দিকে সরকারের কোপদৃষ্টি খুবই ছিল; আগেই লিখেছি আমার বাসগৃহে খানা-তল্লাসী এবং ধরে নিয়ে আটকে রাখার কথা। এটাই ছিল স্বাভাবিক; বহু বিচার বিশ্লেষণ বিনা পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের ঐতিহাসিক চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না, পূর্বেই তো উল্লেখ করেছি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা।

বোধ হয় ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে জওয়াহরলাল নেহরু কয়েকদিন কলকাতায় এসে রইলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাসভবনে। সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতি *Land of the Soviets* নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করে, সেটি এবং সমিতি-সম্পর্কিত কিছু সংবাদ তাঁকে আগে পাঠানো হয়েছিল— তখন তিনি জেলে, গান্ধী-নির্দেশে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করার ফলে। আর-এক খণ্ড ঐ গ্রন্থ, কিছু কাগজপত্র এবং জ্যোতি বসু ও স্নেহাংশু আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে একদিন আমি বিধানবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম, বিকেল চারটেয় আমাদের সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট ছিল। দেখলাম জওয়াহরলালের সাক্ষাৎপ্রার্থী বহুজনের ভিড়, আর লক্ষ্য করলাম যে চারটে যখন প্রায় বাজে তখন জওয়াহরলালের প্রাইভেট সেক্রেটারি উপাধ্যায়, যাকে পরে লোকসভা-সদস্যরূপে জেনেছি, সদ্য আগত Leonard Schiff-এর সঙ্গে কথা বলে তাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। এই শিফ্-কে চিনতাম; পাদরী, প্রগতিতে আস্থাশীল, ভারত বিষয়ে উৎসুক, মোটের ওপর ভারতবন্ধু বলা যায় এমন ইংরেজ— কিন্তু আমাদের বসিয়ে তাকে ভিতরে নেওয়া হল দেখে আমি রুষ্ট, তখনই একখণ্ড কাগজে লিখে পাঠাই যে চারটেয় আমাদের সাক্ষাৎকাল নির্দিষ্ট, অথচ এই সময় সাহেব পাদরীকে ডাক দেওয়া হয়েছে, এ যদি শুধু আমাদের গাত্রবর্ণের পার্থক্যের দরুন, তো জওয়াহরলালজী দয়া করে জানিয়ে দিন, আমরা আর অপেক্ষা করব না! আমার সন্দেহ নেই যে জ্যোতি আর স্নেহাংশুর এ ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে। যাই হোক্, পত্রপ্রাপ্তিমাত্র জওয়াহর-লাল স্বয়ং বেরিয়ে এসে মার্জনা চাইলেন, বললেন তাঁর অজ্ঞাতেই ঘটনাটি

ঘটেছে— অবশ্য অস্বস্তির আবহাওয়া নামে নি কারণ ছিল শিফ্‌ আমার পূর্ব-পরিচিত এবং তারও সঙ্গে কিছু কথা সকলের মেজাজকে হালকা করে দিয়েছিল। সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতি জওয়াহরলালেরও আনুকূল্য কিছুকাল পেয়েছিল— '৪২ সালের ঝড় অবশ্য এ-সব একেবারে ঢেকে ফেলল— তবে মনে আছে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আমাদের পাঠিয়েছিলেন সোভিয়েট শৌর্য সম্বন্ধে এক মনোহর বাণী যাকে বারবার সে যুগে আমরা ব্যবহার করেছিলাম।

* * *

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত বরেণ্য বন্দীদের পক্ষ থেকে সোভিয়েট আক্রান্ত হওয়ার পর এবং ব্রিটেন-আমেরিকার সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি গৃহীত হওয়ার পর বিশ্বপরিস্থিতিতে রূপান্তর এসেছে বলে যে ঘোষণা, তা অনেকেরই মনে থাকবে। দেওলি ও অন্যত্র রাজবন্দী নিবাস থেকেও এসেছিল অনুরূপ বিশ্লেষণ। বে-আইনী পার্টির সর্বস্তরে ক্রমাগত চলছিল আলোচনা— ঠিক জোর করে বলতে পারছি না, হয়তো এই সময়েই একবার গেলাম সোমনাথ লাহিড়ীর গোপন আশ্রয়ে, নিয়ে গেল তরুণ পার্টিকর্মী দিলীপ বসু একেবারে নিজস্ব বেপরোয়া কায়দায় অতি দ্রুত মোটরগাড়ি ছুটিয়ে দিয়ে (যেমন বহু তরঙ্গভঙ্গের পর আজও করে থাকেন 'মনীষা' গ্রন্থালয়ের পরিচালক আমার স্নেহভাজন এই কমরেড!) ১৯৪২ সালের সম্ভবত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে পাটনায় সারা ভারত ছাত্র সম্মেলনে (সভাপতি ছিলেন ইফতিখার উদ্দীন) জনযুদ্ধ বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হল, দেশ জানল কম্যুনিস্ট পার্টি নীতি বদলাচ্ছে। পাটনা ফেরৎ কম্যুনিস্টরা বুকপকেটে 'জনযুদ্ধ'-এর আহ্বান লাগিয়ে ঘুরতে লাগল; প্রচণ্ড আলোচনার জোয়ার বইতে লাগল। ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে হ্যারি পলিট এক পত্র মারফৎ পরামর্শ দিলেন বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং ভারতবর্ষে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে। আমাদের অনেকেরই মনে বহু প্রশ্ন, সংশয় ও অস্বস্তি যে ছিল তা না বলে পারব না— আমাদের পরাধীন বায়ুমণ্ডলে প্রকৃতপক্ষে তা-ই ছিল স্বাভাবিক ও সংগত। ছাত্র কমরেডদের আমি বলেছিলাম, কেমন করে একে 'জনযুদ্ধ' বলি, তার চেয়ে বলি না কেন, একে 'জনযুদ্ধে' পরিণত করা হোক্? এখানে অবশ্য

আলোচনা অবান্তর—তবে পার্টির মধ্যে দীর্ঘ, বিপুল বিতর্কের উল্লেখ অবশ্য-করণীয়। তৎকালীন ইতিহাসে আগ্রহীরা পার্টি-সেক্রেটারি পি. সি. জোশীর *Forward to Freedom* রচনায় এর সুবিন্যস্ত ব্যাখ্যা পাবেন। 'Proletarian Path'-এর যে আহ্বান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আদিতে দেওয়া হয়েছিল তা থেকে 'Peoples War' ধ্বনিতে উত্তরণের যুক্তিসিদ্ধ বিবরণ পাবেন। পার্টির ব্যাখ্যা এক কথায় বলতে গেলে ছিল এই যে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী সংগ্রামে বিশ্বের জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে সোভিয়েটের সাফল্য সাধনে সহায়তার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ সহ সকল পরাধীন দেশের দ্রুত বন্ধনমোচনের পরিপ্রেক্ষিত তখন উন্মুক্ত হতে চলেছিল। '৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' লড়াইয়ের মাদকতা ছিল সন্দেহ নেই, ইংরেজ শাসনের দৌরাত্ম্য ও দুরভি-সন্ধি আমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়; গান্ধীজীও 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ধরনের ডাক দিয়েছিলেন যা তাঁর পক্ষে ছিল অভূতপূর্ব; আমাদের মতো দেশের বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবোধ যে বহির্বিশ্বের প্রতি প্রায় দৃক্‌পাতহীন হওয়া স্বাভাবিক, সহজ হিসাবে 'শত্রুর শত্রুকে বন্ধু' মনে করাও যে সংগত, তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষের কম্যুনিস্টরা তখন কর্মকৌশলের দিক থেকে ভুল কিছু করে থাকলেও তা বোধগম্য, কিন্তু পূর্বোল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে অনেক চিন্তার পর মনস্থির করেছিলাম বলে "ভারত ছাড়ো" লড়াইয়ের সেই ঘনঘোর অধ্যায়ে আমরা নিভে যাই নি, বরঞ্চ বহুজনের বৈরিতা ও ব্যঙ্গ সত্ত্বেও কখনো উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বসি নি। এজন্যই বিদেশ থেকে অনুপ্রেরণা (এমনকি, *Moscow gold* পর্যন্ত!) পাই বলে যে সস্তা ও মিথ্যা ও কটু প্রচার চলে থাকে, তার কাছে কম্যুনিস্টদের কখনো হার মানতে হয় নি। এরই সঙ্গে স্মরণীয় যে সেই যুদ্ধের দুর্দিনে ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষ সোভিয়েট সম্বন্ধে বিপুল মৈত্রী অনুভব করেছে, সর্বান্তঃকরণে শুভকামনা জানিয়েছে। আরো মনে পড়ছে গান্ধীজির নিজেরই কথা যে, '৪২ সালে 'আগস্ট' আন্দোলন বিষয়ে জওয়াহরলালেরও মনে দ্বিধা ছিল প্রচুর (মওলানা আজাদের ক্ষেত্রেও তাই), কারণ ফ্যাশিস্ট আঘাতে বিপন্ন রুশ ও চীন সম্বন্ধে তাঁর আবেগ ছিল এমন যে (গান্ধীজির ভাষায়) "তা আমার বর্ণনা করার শক্তি নেই।" সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় যে সুভাষচন্দ্র বসুও হিটলার-

জার্মানীতে বাসকালে আজাদ হিন্দ রেডিও-মারফৎ সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারে সম্পূর্ণ অসম্মতি জানাবার সাহস দেখিয়েছিলেন (যা আমরা জেনেছি অনেক পরে) এবং ফ্যাশিস্টদের বিরক্তি ও চাপ সত্ত্বেও নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। এ কথা আজ বহুলপ্রচারিত যে ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধে জাপানের ব্যর্থতা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে জাপানের পক্ষ থেকে প্রয়োজনানুরূপ সহায়তাদানে অনিচ্ছার তিক্ত অভিজ্ঞতা পেয়ে তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন সোভিয়েটভূমিতে গিয়ে ভারতের মুক্তি অভিযানকে নবপথে চালিত করবেন।

* * *

প্রসঙ্গটা উঠেছে বলে এখানেই 'আগস্ট আন্দোলন' সম্বন্ধে একটু বলে নেওয়া দরকার। সংগঠনের প্রকৃত প্রস্তুতি বিনা এবং অতর্কিতে প্রায় সমগ্র কংগ্রেস নেতৃত্বের সরকারের হাতে বন্দী হওয়ার ফলে লড়াই তেমন দীর্ঘস্থায়ী না হলেও যে প্রচণ্ড আকার নিয়েছিল, দেশকে তুমুলভাবে নাড়া দিয়েছিল, মেদিনীপুরে, উত্তর প্রদেশের বালিয়া, আজমগড়ে, মহারাষ্ট্রের সাতারায় এবং অন্যত্র অল্পকালের জন্য হলেও ইংরেজ শাসন যে প্রায় উৎপাটিত হয়েছিল, গোটা দেশজুড়ে বিদ্রোহের হাওয়া ছুটেছিল, তাতে সন্দেহ নেই—আমাদেরও মন উত্তাল হয়েছিল রীতিমতো। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে ৯ই আগস্ট সকালেই তৎকালীন মন্ত্রী (বাংলা প্রদেশের) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলাম, সরকারী দমননীতি যাতে অসংযত হয়ে উঠে অবস্থা সঙ্গিন না করে তোলে বলবার জন্য। জনযুদ্ধের নীতির যৌক্তিকতা নিয়ে বহু আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল— দেখেছিলাম নৃতাত্ত্বিক নির্মলকুমার বসুর মতো সত্যসন্ধ মানুষ মেতে উঠেছিলেন, আর বুঝেছিলাম সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে সংগঠন-রহিত অবস্থাতেও অসামান্য কর্মশক্তির অফুরন্ত আধার। ট্রামের তার কাটা, যানবাহন জালিয়ে দেওয়া, রেলের রাস্তা খুঁড়ে ফেলা, সশস্ত্র পুলিশের তোয়াক্কা না করা-ব্যাপারে ভিতর থেকে জোর নিয়ে সবাই এ-সবের শক্তি রাখে দেখলাম, যেমন পাটনায় এগিয়েছিল ন'টি ছেলে তেরঙা নিশান নিয়ে, প্রাণান্তের পর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ভাস্কর্য যাদের ভাস্বর করে রেখেছে।

আবার বলি, কারণ বলা দরকার, যে হিটলারের বিরুদ্ধে আসল লড়াই

লড়ছে সোভিয়েট দেশ আর এ-লড়াই জেতার ফলে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত বদলাবে এই হিসাব অনুযায়ী আমরা যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলি, ফ্যাশিস্ট-বিরোধিতাকে প্রধান কর্তব্য বলে মানি, অবিলম্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে যুদ্ধে সহযোগিতার অকাট্য শর্ত বলে ধার্য করি নি, ফ্যাশিজ্‌ম্‌কে ধ্বংস করলে তবেই সর্বদেশে মুক্তির ভিত্তিভূমি স্থায়ী হবে এই বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় বলেই দেশের প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আমরা সংকোচ করি নি। নিজেদের মনে নিশ্চয়তা ছিল বলে সেদিন আমরা মনোবল হারাই নি, অজস্র কুৎসা আর গঞ্জনাকে অগ্রাহ্য করেছি। দেশের রাজনীতিতে যে তলিয়ে যাই নি তার প্রমাণ বারবার সাধারণ নির্বাচন মারফৎ মিলেছে। অবশ্য কেউ তর্ক করতে পারেন এই বলে যে আগস্ট-আন্দোলনে আমরা যোগ দিলে হয়তো ফ্যাশিজ্‌ম্‌ এবং ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য, উভয়েরই যুগপৎ পরাজয় ঘটানো যেত। তর্কের খাতিরে বলি, হয়তো যেত, কিন্তু আমরা সে-ঝক্কি নিতে প্রস্তুত ছিলাম না, বিশেষত যখন জিন্না-নেতৃত্বে মুসলীম লীগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে বিকৃত করার চেষ্টায় ব্যস্ত এবং কংগ্রেসের অদূরদর্শিতা ও অহংকার সাম্প্রদায়িক বিসম্বাদ ও কলহকে আরো জটিল ও কঠোর করে তুলেছিল, আর পাকিস্তান দাবি সম্বন্ধে সহৃদয় মনোভাব দেখিয়ে উভয় সংগঠনের যুদ্ধকালীন মৈত্রী স্থাপনের যে চেষ্টা রাজাগোপালাচারী করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৪১-৪২ জুড়ে অনেকেরই ধারণা ছিল যে সোভিয়েট যুদ্ধে হারবে, আর সঙ্গে সঙ্গে এদেশ পর্যন্ত পাড়ি মারবে দিগ্‌বিজয়ী ফ্যাশিস্ট বাহিনী। শোনা যেত পথে ঘাটে বৈঠকে জল্পনা হচ্ছে হিটলারের দর্প নিয়ে— সে নাকি যুদ্ধজয় করে মস্কোতে ঘটা করে খানা খাবে, উৎসব করবে দিল্লীতে হাজির হয়ে! প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে বাস্তবিকই নাকি লেনিনগ্রাদে Hotel Astoria-তে হিটলারের বিজয় ভোজোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র মুদ্রিত হয়েছিল— যে হোটেলে একাধিকার আমি পরে থেকেছি।

সোভিয়েট ধ্বংসের যে মতলব তখন শুধু হিটলার নয়, বকলমে আরো অনেকে নানা ঢঙে ও ছদ্মবেশে করেছিল, তাতে সৃষ্টি হয়েছিল এক মারাত্মক পরিস্থিতি। '৪২ সালে আমাদের মনোভাব ও কর্মনীতি বুঝতে হলে এটা মনে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। কোথাও আমাদের কথা ও কাজের ধরনে ভুলচুক নিশ্চয়ই হয়েছিল— সুভাষচন্দ্রকে ফ্যাশিজ্‌ম্‌-এর সহায়ক ভেবে

আক্রমণ করা যে ভুল ছিল তা পরে জেনে আমরা ভ্রান্তি স্বীকার করেছি। কিন্তু সেই সময় প্রকৃত ঘটনা জানার উপায় ছিল না, বরঞ্চ বর্তমান *New Times* পত্রিকার পুরোগামী *War and the Working Class* সাপ্তাহিক প্রভৃতি মারফৎ যে সংবাদ তখন মিলছিল তাতে দুশ্চিন্তাই আমাদের বেড়েছিল। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কটূক্তি তখন আমাদের পত্রপত্রিকায় করা হত বলে অভিযোগ শোনা যায়, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে আমাদেরও সুভাষচন্দ্রের ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে কম কটূক্তি শুনতে হয় নি, যত্র তত্র কম্যুনিস্টদের দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়ার রেওয়াজ তো আজও শেষ হয় নি। আবার বলি, কোথাও কোথাও আমাদের কথা ও কাজের ধরনে ভুলচুক্ নিশ্চয় ঘটেছিল; বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইসচান্সলর অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ '৪২ সালে কম্যুনিস্টদের ব্যবহার সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেছিলেন (অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে পাল্টা নালিশ না-হয় নাই করলাম, তিনি তো ইংরেজের প্রসাদস্বরূপ 'নাইট' খেতাব ফিরিয়ে দেওয়ার মতো হিম্মৎ কখনো দেখান নি!) তাকে একেবারে উড়িয়ে দেব না। কম্যুনিস্টবিরোধী হলেও সম্পূর্ণানন্দের মতো ব্যক্তি এ বিষয়ে যা লিখেছেন এবং নিজে আমাকে বলেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা বলব না। হয়তো যাদের বিপক্ষে অভিযোগ তারা প্রকৃত কম্যুনিস্ট কেউ ছিল না; হয়তো পার্টিনীতির ভুল ব্যাখ্যা করা কিম্বা সরকারের অত্যন্ত চতুর ফাঁদে অজ্ঞাতে পা ফেলে ('National War Front' নামে এক সংস্থায় পার্টির কোনো কোনো সভ্যও ভুল করে জড়িয়ে পড়েছিল) কেউ পার্টিনীতি লঙ্ঘনও করে ফেলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলব যে মূলগতভাবে যুদ্ধ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল নির্ভুল এবং স্বদেশ ও বিশ্বের পক্ষে হিতকর। এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলেই ১৯৪২ এবং তার পরবর্তী বেশ কিছুকালই আমাদের পার্টির মনের তেজ ক্ষুণ্ণ হয় নি, কর্মক্ষমতা কমে নি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়েছে যুদ্ধশেষের কিছু পরে সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। শেষ পর্যন্ত শরৎবাবুকে রাজী করিয়ে আমি নিয়ে আসতে পারি সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতি কর্তৃক আহূত কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটের এক জনসভায়। পুরোপুরি মতের মিল অবশ্য আমাদের মধ্যে সম্ভব ছিল না, কিন্তু অবিশ্বাস্য মনে হলেও তিনি আমায়

বলেছিলেন (ইংরাজী কথাগুলোই ব্যবহার করেছিলেন, আজও মনে আছে): "Perhaps, Hiren, I should concede that during the war we had made an international miscalculation."

একটা মাত্র ঘটনায় আমার মনে খটকা জেগেছিল, যা না বলে পারছি না। '৪২ সালের নভেম্বর মাসে পার্টির পক্ষ থেকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আন্দোলন চালানো হয় বন্দী নেতাদের মুক্তির জন্য এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে যুদ্ধকালীন সরকার গঠন করে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। পার্টির নির্দেশে প্রত্যেক সদস্যকে সভাসমিতি, বিতর্ক, প্রচারপত্র বিতরণ, বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় নামতে হয়েছিল; কারো রেহাই ছিল না। এই উপলক্ষে আমার বাসগৃহে সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক প্রভৃতিদের কয়েকটি সমাবেশ হয়েছিল। পার্টিনেতা পি.সি.জোশী স্বয়ং উপস্থিত হতেন, বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে দেখা এবং আলাপ করেছি— যেমন জোশীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর কাছে। কথায় কথায় তিনি জোশীকে বলেন যে আগস্ট-অভ্যুত্থানে কম্যুনিস্ট পার্টি যোগ দিলেও ইংরেজ তাকে দমন করবার ক্ষমতা বোধহয় রাখত, সুতরাং পার্টির নীতি ও কর্মকৌশল ভ্রান্ত হয়ে থাকলেও সম্ভবত দেশের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি— জবাবে অল্প হেসে জোশী জানায় যে কম্যুনিস্টরা আগস্ট-অভ্যুত্থানে যোগ দিলে ইংরেজরা হারত। ত্রিপুরারিবাবু এবং জোশী হয়তো এই কথোপকথন ভুলে গেছেন, কিন্তু আমি ভুলি নি, এখনো আমার মনে মাঝে মাঝে খচ্ খচ্ করে। অবশ্য স্মৃতি ভিন্ন অন্য কোনো সাক্ষ্য আমার নেই, কিন্তু জোর করে বলতে পারি, আমি ঘটনাটা বানিয়ে বলছি না। বাস্তবিকই যদি জোশীর হিসাব ঠিক, অর্থাৎ যদি কম্যুনিস্টরা যোগ দিয়ে আগস্ট অভ্যুত্থানকে দ্রুত সফল করার শক্তি রাখত, তা হলে আমাদের পরাধীন পরিস্থিতিতে সেই যোগদানই যুক্তিযুক্ত ছিল না কি?

কী হত আর না হত ভেবে আজ লাভ নেই, তবে আমি নিশ্চিত যে সবদিক থেকে যাচাই করলে সেদিনের অবস্থায় 'জনযুদ্ধ' নীতি আপাতদৃষ্টিতে দেশবাসীর চোখে না হলেও মৌলিক বিচারে নির্ভুল ছিল। দেশের অস্তিত্ব এবং আন্তর্জাতিক পটভূমিতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার দুরূহ কর্মে তখন আমরা লিপ্ত থেকেছি; ধ্রুব নীতির প্রতি আনুগত্য তখন আমাদের শক্তি-

বৃদ্ধির সহায় হয়েছে; এজন্যই তখন পার্টি ভাঙা দূরে থাক্‌, পার্টি বেড়েছে, আরো ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রভাব। পার্টি এবং পার্টি-সমর্থক জনতার মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়েছে পরবর্তী কালে— প্রথম যখন যুদ্ধোত্তর যুগে সস্তায় বিপ্লবের কিস্তিমাৎ করার স্বপ্নে ডুবে পার্টি-নেতৃত্ব অসহিষ্ণু ও বেদরদী হয়ে স্বেচ্ছাচারিতার পঙ্কে পড়েছিল।

আগস্ট-অভ্যুত্থানের বেশ কিছুকাল পার্টির নামে দারুণ কুৎসাপ্রচার চলেছে— জোশী বুঝি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে, ম্যাক্‌স্‌ওয়েল প্রভৃতির সঙ্গে তার চুক্তি, ইত্যাদি রটনা করা হয়েছে। ১৯৪৫ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে; তখনো পর্যন্ত আমরা অনেকে ছিলাম ঐ প্রতিষ্ঠানে। আমাদের বহুরূপী শত্রুরা একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে প্রচার চালায় যার এখানে বিবরণ প্রয়োজন নেই, তবে কৌতূহলী পাঠক গান্ধীর সঙ্গে জোশীর যে পত্রবিনিময় প্রকাশিত হয়েছিল সেটা পড়ে দেখতে পারেন (আমার তখন কাজ ছিল এর বাংলা তরজমাটা করে দেওয়া)। সম্প্রতি *Wavell Papers* নাম দিয়ে তৎকালীন বড়লাটের যে কাগজপত্র বেরিয়েছে, তাতে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত যে এম.এন. রায়-এর 'ফেডারেশন অব লেবর' ধরনের প্রতিষ্ঠান সরকারী টাকা পেত, কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি কখনো একটা পয়সাও ঐ কলঙ্কিত সূত্র থেকে নেয় নি— পরিষ্কার লেখা রয়েছে: "কম্যুনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধোদ্যোগ সমর্থন করে বটে, কিন্তু তাদের প্রচার আগের মতো এখনো (১৯৪৩-৪৪) ব্রিটিশরাজের বিপক্ষে, আর তারা ক্রমাগত কংগ্রেসী বন্দীদের মুক্তি দাবি করে চলেছে। 'হোম' সেক্রেটারি টট্‌নহাম ভেবেছিলেন যে পার্টিকে আবার নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত কিন্তু পরে স্থির করেন সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের অভিমত অনুযায়ী জোর করেই বলা হচ্ছে যে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির আইনসংগত অস্তিত্ব যতদিন যুদ্ধ চলছে ততদিনের জন্যই, তারপরে আর নয়।"

কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে অবশ্য শত্রুশ্রেণীর কুৎসা কিছু অজানা অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু '৪২ সাল সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আসছে যা লিখে রাখা দরকার ভাবছি। আগস্ট-আন্দোলনে রাজাগোপালাচারি যোগ দেন নি; সেজন্য কংগ্রেসে তাঁর প্রতিষ্ঠা কমে, কিন্তু দেশদ্রোহিতার অপবাদ সংগ্রামীরা তাঁর নামে দেয় নি, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সব চেয়ে বড়ো মর্যাদার পদে

তাঁকে বসাতে বাধা ঘটে নি। বাংলায় বিধানচন্দ্র রায়ের মতো 'ডাকসাইটে' কংগ্রেস নেতা আন্দোলনে নামেন নি ; কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বরং তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখা গেল, '৪৩-৪৪ সালে দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য বিপদের বিপক্ষে লড়াইয়ে Bengal Medical Relief Co-ordination Committee-প্রভৃতির কাজে। ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে কম্যুনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন যখন কলকাতায় হয়, তখন বি.পি.সি.সি.র পক্ষ থেকে মৈত্রীসূচক বাণী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল। বেশ মনে আছে বললেন, কিরণ-শঙ্কর রায়ের অনুপস্থিতিতে তিনিই প্রাদেশিক কংগ্রেসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কম্যুনিস্ট পার্টিকে। আজ হয়তো অনেকের কাছে এগুলো অবিশ্বাস্য কথা মনে হবে, কিন্তু এই ছিল ঘটনা। অবশ্য সন্দেহ নেই যে ৯ই আগস্ট দেশ জুড়ে জনতার মন গভীর ভাবে আলোড়িত হয়েছিল। দেশের মুক্তিসংকল্প যে অপরাজেয় তার বহু বিক্ষিপ্ত অথচ সমুজ্জ্বল প্রমাণ মিলেছিল, কিন্তু নানা কারণে আন্দোলন স্থায়ী হয় নি, কয়েক মাসের মধ্যেই সরকার অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনল। তারপর গোপন কর্মকাণ্ড অবশ্য চলেছিল (জয়প্রকাশ নারায়ণ, লোহিয়া প্রভৃতির ভূমিকা এই উপলক্ষে স্মরণীয়)। কিছু সময় লাগল পট পরিবর্তন হতে। ক্রমশ, যুদ্ধের বিভিন্ন বিচিত্র অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম থেকে পূর্বে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ-এর কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দেশের হাওয়া একেবারে বদলালো, পুলিশ এবং ফৌজের ভিতর অসন্তোষ দেখা দিল, '৪৫-৪৬ এ বোম্বাইয়ে নৌবাহিনীর বিদ্রোহের মতো দেদীপ্যমান ঘটনায় ভারতব্যাপী জনজাগৃতির ভাস্বর চিত্র পরিস্ফুট হল—এ অবশ্য একটু পরের কথা, কিন্তু তখন মুক্তিকামী ভারতবাসী প্রায় সবাই এক। আর কম্যুনিস্টরা তো লড়াইয়ের ময়দানে শামিল করার কাজে অগ্রণী। '৪২ সাল নিয়ে তাই কম্যুনিস্ট হিসাবে অপ্রতিভ বোধ তো বিন্দুমাত্র করি না, বরঞ্চ গর্ব করি যে কঠিন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী নীতিসম্মত পথে চলারই চেষ্টা তখন আমরা করেছি।

২১

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন হিটলারের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ঘোষণা করেছিলেন গীতাবাক্যের অল্প একটু পরিবর্তন করে : 'যত্র স্তালিন মহাজ্ঞানী / যত্র রক্তা চ বাহিনী/তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি/ধ্রুবা নীতি মতির্মম'। যে পক্ষে (যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণের স্থানে) মহাজ্ঞানী স্তালিন এবং (মহাভুজ পার্থের স্থানে) লালফৌজ, সে পক্ষের বিজয় তো অবধারিত! এ-ধরনের লেখার যোগ্য বাহন ছিল 'অরণি', যা হল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিজস্ব সাপ্তাহিক, যেখানে তাঁকে ঘিরে অরুণ মিত্র, সরোজ দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিমল ঘোষ, সুধী প্রধান, বিনয় ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মিলে মনোজ্ঞ এক চক্র গঠন করেছিলেন! 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র গৌরবদিনের প্রধান স্রষ্টা হয়েও রাজনৈতিক সৎসাহসের মূল্য দিয়েছিলেন সত্যেনবাবু কাগজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে—তাঁর জায়গায় কিছুদিন বসলেন 'ক্ষয়িষ্ণু বাংলা'-র রচয়িতা প্রফুল্লকুমার সরকার যাঁকে মনে হত সজ্জন কিন্তু নিষ্প্রভ, অবশ্যই বুদ্ধিমান্ কিন্তু সাংবাদিকবৃত্তির গরিমা থেকে বঞ্চিত। তারপর দেখলাম লোকসভায় কিছুকাল আমার সহকর্মী চপলাকান্ত ভট্টাচার্যকে 'আনন্দবাজার'-এর সম্পাদকরূপে— গুণী ব্যক্তি সন্দেহ নেই, সংস্কৃতপ্রেমী, লিখনপদ্ধতিতে গুরুগম্ভীর, রাজনীতির মঞ্চে অবস্থানে আগ্রহী, কিন্তু সত্যেনবাবুর সঙ্গে তুলনীয়ই নন্; 'Pitt is to Addington what London is to Paddington!' ঠিক মনে পড়ছে না তবে খুব সম্ভব সদ্য-আরব্ধ 'যুগান্তর' দৈনিকের ভার নিয়ে সত্যেনবাবু কিছুকাল রইলেন, যখন দেখলাম তাঁর সহকারীদের মধ্যে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে, আকৃতিতে খর্ব কিন্তু লিখন-কথনে উজ্জ্বল, অচিরে জানা গেল তাঁর বাগ্মিতা, সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ বিষয়ে প্রভূত অধ্যয়ন, বিবিধ প্রগতিকর্মে যোগদান, ক্রমশ বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে সুবিদিত হওয়া, দ্বিতীয় যুদ্ধান্তে বিশ্ব শান্তি-আন্দোলনে যোগ দিয়ে খ্যাতি অর্জন, বাংলা সাংবাদিকতায় অগ্রণী বলে আজও তাঁর স্বীকৃতি—সত্যেনবাবুর স্নেহভাজন ছিলেন তিনি, বুঝি তাই তুলনা উঠতে পারে কিন্তু

তুলনা চলে না, বহুগুণসম্বলিত হয়েও মৌলিকতা এবং চারিত্র্যের বিচারে সত্যেন্দ্রনাথ যে বহু উর্ধ্বে। স্বয়ং বিবেকানন্দ তা অস্বীকার করবেন না।

'অরণি'-র 'ফাইল' থেকে সেদিনের অনেক ভুলে যাওয়া অথচ দামী খবর মিলবে। বিশেষভাবে মনে পড়ছে অভিনয় জগতে 'মহর্ষি' বলে বন্দিত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের এক লিখিত ভাষণ যা '৪৬নং-এ' পড়া হওয়ার পর 'অরণি'-তে ছাপা হয়, আর যেটি নিজের মনের তাগিদে ইংরিজী তরজমা করে আমার সম্পাদনায় *US—A People's Symposium*-এ ছাপাই। থিয়েটারের সঙ্গে অপরিচয়ের ফলে আগে তাঁকে কখনো দেখি নি—সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির অফিসে প্রথম দেখলাম; মনস্বী বাঙালীরই যেন মূর্তি, আবছা ভাবলাম সাদৃশ্য কিছুটা বুঝি আছে প্রয়াত মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে। শুনলাম জলদগম্ভীর কণ্ঠে শুদ্ধ স্পষ্টোচ্চারিত বাক্য,আলাপে বুঝলাম তাঁর অনায়াস সৌজন্য। চিন্তায় দেখলাম শুভ্র নিত্যধৌত খদ্দর পরিচ্ছদের মতোই পরিচ্ছন্নতা। বিস্মিত হলাম দেখে প্রবীণ হয়েও নবযুগের মানসিকতা সম্বন্ধে তাঁর সৌম্য সংবেদন, পরে পরিচয় গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলকিত হলাম আবিষ্কার করে যে ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন প্রকরণে কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারেরই মতো স্বচ্ছন্দে, এবং বাঙালিয়ানাকে অক্ষুণ্ণ রেখে শুধু ভারতবোধ নয়, মার্ক্‌সবাদের মতো আপাতবিচারে দূরাবস্থিত বলে বর্ণিত বিশ্বদর্শনকেও আত্মস্থ করেছেন। দেশের মুক্তিপ্রয়াসে একদা মনোরঞ্জন-বাবুর গভীর সংযোগ ছিল। মূল্যও তার তিনি দিয়েছিলেন; তাঁর পুত্রদ্বয়, নটনারায়ণ ও নরনারায়ণ তখন আমাদের পার্টির বিশিষ্ট তরুণ কর্মী; ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মকাণ্ডে তাঁর নায়কত্ব যারা দেখেছে তারা ভুলবে না। গোটা পরিচ্ছেদ তাঁর সম্পর্কে লিখলেও তো বহু কথা বাদ থেকে যাবে, কেমন করে অল্প বাক্যে তাঁর ছবি আঁকি? মনোরঞ্জনবাবুর সম্বন্ধে বলতে ইচ্ছা করে: 'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'— বিশেষণে তিনি বিরক্ত হতেন, তবুও বলি যে তাঁকে দেখে বাঙালী মানবতায় আমার আস্থা দৃঢ় হ'ত, তাঁর উপস্থিতিতে ছিল এমন এক শান্ত স্নিগ্ধ প্রভাব যা বিরল। তাঁর মৃত্যুর পরও হঠাৎ হয়তো দিল্লী বা অন্য কোথাও থেকে কলকাতা ফিরে মনে হয়েছে যাই 'রূপবাণী' সিনেমার কাছে তাঁর চারতলার ফ্ল্যাটে, তখনই কশাঘাতে মন জানিয়েছে তিনি নেই, বুঝেছি চিত্তের এক প্রধান আশ্রয় হারিয়েছি— যেমন হারিয়েছি পরে,

যখন শিল্পশিরোমণি যামিনী রায় কিম্বা বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুর পর বুঝেছি যে ক্রমশ এই জগতে নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছি।

আর এক প্রায়-অখ্যাত, আকারে প্রকারে একটু যেন অদ্ভুত, বেপরোয়া, ছিমছাম বৈঠকে বেমানান্, অথচ গভীর, প্রখর বিশ্লেষণে, জটিল সমাজনীতি নির্ণয় ব্যাপারে অসাধারণ সহজাত মেধার অধিকারী ব্যক্তির নাম এখানে করব— মনোরঞ্জনবাবুর 'মহর্ষি' আখ্যা মনে পাড়িয়ে দিল এঁর কথা কারণ বিতর্কে প্রায়শ উত্তেজিত ও কোপন স্বভাব (যদিও কোমলচিত্ত) মানুষটিকে বন্ধুরা নাম দিয়েছিলেন 'দুর্বাসা'! নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকালেই ছিলেন প্রায় সর্বত্র বিস্মৃত। একটু বা অবহেলিত— নিজেই হেসে একবার আমায় বললেন, কলকাতায় তখন সদ্যস্থাপিত চীন জনগণতন্ত্রের 'কনসালেট-জেনারলে' এক অনুষ্ঠানে গিয়ে বুঝলেন যে আমন্ত্রকরা তাঁকে ভাবছে হয় মানিক ব্যানার্জি নয় তো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কারণ নারায়ণ ব্যানার্জি লোকটা আবার কে? আমার পরিচয় প্রথম তাঁর সঙ্গে হয় ১৯৩০ সালে লেখা এবং ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত তাঁর 'শ্রীভাঁওতা' গ্রন্থটিকে উপলক্ষ করে। ছেলেবেলা থেকে সন্ত্রাসবাদী দলে থেকে, লেখাপড়ার সুযোগ প্রায় হেলায় অবহেলা করে আজীবন স্বদেশিয়ানার 'বাউণ্ডুলে-গিরি' চালিয়ে (নিজের কথা এভাবেই তিনি বলতেন) জেলবাস, 'অন্তরীণ' জীবন ইত্যাদির দীর্ঘ আস্বাদ নিয়ে কখন কি ভাবে যে সঞ্চয় করলেন মনের মধ্যে এমন সজাগ, সাহসী, সুতীক্ষ্ণ চিন্তা যা 'শ্রীভাঁওতা'-র মতো অপূর্ব অথচ বিস্মৃত গ্রন্থে প্রকাশ পেল, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। এককালে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতি সাহিত্যে হালকা, সরস শ্লেষের সুরে গভীর কথা শোনাবার রেওয়াজ প্রবর্তন করেছিলেন; নারায়ণবাবু কতকটা ছিলেন তাঁরই 'গুরু-মারা' শিষ্য! গান্ধীচিন্তা সমেত বিবিধ নীতিবাক্যের বুজরুকি চমৎকার ভাবে তখনই ধরতে পেরেছিলেন কি করে তাই ভাবি। সরকার বইটা বাজেয়াপ্ত করল, আজও তা আর ছাপা হয় নি। হয়তো আজ একটু 'বাসি' হয়ে গেছে লেখাটা। তবে 'বিপ্লবের সন্ধানে' নাম দিয়ে যে স্মৃতিকথা তিনি পরে প্রকাশ করেছেন, তা থেকে কয়েকটা পাতা নিশ্চয়ই তুলে দেব যদি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গদ্যের সঞ্চয়ন করবার ভার এবং সময় পাই; অনেকে হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না, কিন্তু এই কথাই আমি বলি।

'কোলে'-বাজারের দোতলার একটা ঘরে নারায়ণবাবু থাকতেন, পুরোপুরি আত্মনির্ভর। আজীবন একা মানুষ, পুরোনো আসবাবপত্রের একটা নামমাত্র ব্যবসার জোরে দিন গুজরান হত, 'ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে', জীবনের কাছে চাহিদা নেই। বিলাসের মধ্যে এক 'মান্থলি' ট্রামের টিকিট। স্নান করতেন না, কেউ সে-কথা তুললে খিঁচিয়ে উঠতেন, বার্নার্ড শ-র ধরনে 'বচন ঝাড়তেন' (এটা তাঁরই প্রিয় বাক্য!)। কাপড়-চোপড় সাধারণত ময়লা থাকত তবে 'ফ্রেঞ্চ কাট্' দাড়ির কেয়ারি একটু যেন করতেন, যদিও '৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলকাতার দাঙ্গার দুর্দিনে বিপন্ন পরিবেশ থেকে উদ্ধার পেয়ে অচেনা হিন্দু এলাকায় মুসলমান-ভ্রমে অপঘাত মৃত্যু এড়াবার জন্য সঙ্গীদের পীড়াপীড়িতে দাড়িটি বিসর্জন দিয়েছিলেন, আর কখনো গজান্ নি! যখন আমি তাঁকে জানলাম তখন তিনি পাকা কম্যুনিস্ট, কিন্তু একক ও একান্ত স্বাধীন অস্তিত্বের মায়ায় কখনো পার্টিতে যোগ দিতে চান নি— বরং বলতেন তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির 'ধাঁচ-ধোঁচ' জানেন, কবে কখন পার্টির মনোমত নয় এমন কথা বলে পাকে পড়বেন, তখন অবস্থা কুলীন ব্রাহ্মণ ঘরের 'ধাড়ী' মেয়ের মতো, যে বেশ ছিল 'আইবুড়ো' থেকে, অথচ বিয়ের পর দেখতে দেখতে বিধবা হল, মাছ খাওয়াটা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল! এ-হেন মানুষই আবার ১৯৪৫ সালে দেখলাম কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে কথা বলতে গিয়ে নিজের এক পুরোনো পরম বন্ধুর সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া বাধালেন, সেই বন্ধুরই কাছে জমা-রাখা নিজের জীবনের পুরো (যদিও সামান্য) সঞ্চয় বার করে এনে সটান্ পার্টি অফিসে মুজফ্ফর আহমদের হাতে প্রায় সবটা তুলে দিলেন পার্টির সদ্যপ্রকাশিত দৈনিক 'স্বাধীনতা' ভাণ্ডারে! পার্টি সম্পর্কে, এবং মাঝে মাঝে নাম করে আমাদের কারো কারো সম্বন্ধে 'চ্যাটাং চ্যাটাং' বাক্য ব্যবহারে তিনি সংকুচিত ছিলেন না; জীবনের শেষ দিকে, স্বাধীন ভারতবর্ষের বিচিত্র হালচাল দেখে প্রায় দেশসুদ্ধ সবারই ওপর রুষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু ভিতরটা তাঁর সর্বদা পুড়ছিল— যখন ক'বছর আগে মারা গেলেন, প্রায় যেন ইচ্ছামৃত্যু, চোখের দৃষ্টি যেতে চলেছে দেখে স্বেচ্ছাকৃত প্রায়োপবেশনেই জীবনাবসান ঘটল। উদ্ভট, অসামান্য মানুষটি হিউলেট জন্সন্-এর (*The Red Dean*) বই অবলম্বনে 'সোভিয়েট দুনিয়া' রচনা করেছিলেন। আরো বহু চমৎকার লেখা তাঁর রয়েছে। কিন্তু

আমাদের দুর্ভাগা পরিবেশে সব-কিছু উপেক্ষিত। অল্প কয়েকজন গুণীগ্রাহ 'কোলে'-বাজারে তাঁর ঘরে একটা ছোটো পাঠাগার খুলেছেন, প্রদীপ টিম্‌টিম্‌ করে কদিন জ্বলবে জানি না।

সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির কল্যাণে, এবং যুদ্ধে ইংরেজ সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় আগের তুলনায় সোভিয়েট থেকে সোজা পাঠানো কাগজপত্র ছবি, ফিল্‌ম্‌ ইত্যাদি আর একেবারে দুর্লভ রইল না। পূর্বেই উজ্‌বেক কবি গফুর গোলাম, কাজাক্‌ কারাবাইয়েভ্‌ ইত্যাদির অল্প কিছু লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, আলেকজান্দার ব্লক্‌, মায়াকভ্‌স্কি থেকে পাস্তেরনাক-এর মতো মহাজন বিষয়ে কিছু জানাশুনা ঘটেছিল— প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে যে ত্রিশের দশকে পাস্তেরনাক্‌ সংকুচিত হন নি স্টালিনকে অভিবাদন জানিয়ে কবিতা লিখতে, আর মার্কিন সমালোচক Edmund Wilson লিখেছিলেন যে প্যারিসে রলাঁ-কর্তৃক আহূত লেখকশিল্পীসমাবেশে স্টালিনেরই নির্দেশে পাস্তেরনাক ও বেবেল্‌ সোভিয়েট সাহিত্যিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন। VOKS নামে সোভিয়েটে এক সমিতি ছিল যার কাজ নানা দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রেখে চলা; প্রথম যুগে তার 'বুলেটিন' আসত, ছাপা নয়, 'সাইক্লোস্টাইল' করা। আগেকার 'ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচর' (নূতন নাম 'সোভিয়েট লিটারেচর') পাওয়া যেতে লাগল। পাঠচক্র, প্রদর্শনী, পত্রিকাপ্রকাশ, পুস্তিকামুদ্রণ, সিনেমা, তা ছাড়া অবশ্য সভাসমিতির আয়োজন তখন পুরোদমে চলেছিল; আজকের মতো সোভিয়েটের বন্ধু হওয়া অবশ্য তখন নিরাপদ বস্তু ছিল না, তবুও সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতি যে সাড়া জাগিয়েছিল তাকে বিপুল বললে অত্যুক্তি হবে না। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার অবদান এব্যাপারে ছিল অসামান্য; পরে (১৯৫২-৫৬) লোকসভায় এই বিরাট মানুষটিকে খুব কাছ থেকে জানার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু চল্লিশ দশকেই তাঁর সান্নিধ্যে আসি, তাঁর একান্ত দেশাভিমান, বিবিধ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ও অন্য বহু গুণে মুগ্ধ হই। বোধ হয় ১৯৪৪ সালে অল্পকালের জন্য সোভিয়েট ঘুরে এসে সমিতির দফ্‌তরে তিনি এক বক্তৃতা করেন, পুরো অনুলিখন করে 'ইন্দো-সোভিয়েট জার্নাল'-এ প্রকাশ করি— চমৎকার, তথ্যবহুল অথচ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা, বৈজ্ঞানিকের স্পর্শে বিশিষ্ট।

দু-একজন করে সোভিয়েট নাগরিক তখন এদেশে আসতে আরম্ভ করেছেন। ক্রমে কলকাতায় একটা বাণিজ্য দফ্‌তর, বোম্বাইয়ে ফিল্‌ম্‌ অফিস সোভিয়েট থেকে খোলা হল। 'প্রাভ্‌দা' দৈনিকের প্রতিনিধি হয়ে এলেন গ্ল্যাডিশেভ—৪৬নং-এ অভ্যর্থনার একটা ঝাপসা-হয়ে-আসা ফোটোগ্রাফ সেদিন চোখে পড়ল, তাতে রয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্যোতি বসু, স্নেহাংশু আচার্য, দেবব্রত ('জর্জ') বিশ্বাস, মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস (প্রখ্যাত শিশু চিকিৎসক), অজিতনাথ রায় (যিনি আজ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি) প্রভৃতি অনেকে। পরে এলেন বাংলা ভাষায় সুদক্ষ Orestov প্রভৃতি, যারা (স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে) মাদাম এর্‌জিনা-র মতো বাঙালী লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী মহলে আত্মীয় হয়ে গিয়েছিলেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রভৃতি যে-সব জায়গায় তখন আমাদের অধিষ্ঠান, সেখানে আসতেন ভারি মিশুক চুমাশেঙ্কো যাকে অমল হোম মশায় (এই প্রাণবন্ত মানুষটি আজ বহু বৎসর পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন; সুখের কথা যে তাঁর সাধের নিজস্ব গ্রন্থসংগ্রহ সম্প্রতি কলকাতার রবীন্দ্রসদন সংগ্রহে স্থান পেয়েছে) একবার বলেন যে তার নামের প্রথমার্ধ হল বাংলা ভাষার সবচেয়ে মধুর শব্দ কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের অর্থ হল 'বিষ' আর তৎক্ষণাৎ জবাব আসে : বেশ মজার কথা তো—কারণ প্রায়ই শুনি যে আমার দেশের "চুমা"-য় "বিষ" আছে!

ফ্যাশিজ্‌ম্‌ বিষয়ে আন্তরিক ঘৃণা এবং সোভিয়েটের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুস্থ চেতনা ও সহজ সৌহার্দ্য তখন প্রকৃতই বাঙালী মনে দেখা দিয়েছিল। সম্ভবত ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে সদ্যস্থাপিত ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখকসংঘের পক্ষ থেকে কলেজ স্ট্রীট-Y. M. C. A.-তে রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' অভিনয় করলেন বাঙালী সাহিত্যিকরা— ভূমিকায় নামলেন হিরণকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসুর মতো ব্যক্তি। এটা যখন লিখছি তার কদিন আগে বুদ্ধদেববাবুর মৃত্যু হয়েছে— নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মতদ্বৈধ হলেও ভুলব না কখনো যে সেই দুর্দিনে তিনি ফ্যাশিস্ট-বিরোধী আন্দোলনে যোগদানে সংকুচিত হন নি, নিজে লিখেছেন, তাঁর স্ত্রী প্রতিভা দেবী 'ফ্যাশিজ্‌ম্‌ ও নারী' পুস্তিকা লিখে দিয়েছেন আমাদের জন্য। বোধ হয় 'রথের রশি' অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে Arnold Bake (জাতে ওলন্দাজ) গাইলেন; 'নাই নাই ভয় হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার'— খাস সাহেবের গলায়

রবীন্দ্রসংগীত একটু মজাদার হলেও বেশ লেগেছিল ; এঁরই কণ্ঠে অল্প-রেকর্ড-বাসকালে আমি শুনেছি : "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে", আর পরে জেনেছি অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর কলকাতা কেন্দ্রে পাশ্চাত্য সংগীত পরিচালকরূপে।

'পরিচয়' এবং অন্যান্য সাহিত্য-বৈঠকের কল্যাণে লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগে তখন একটা সহজ সৌষ্ঠব যেন ছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝে অল্প অস্বস্তি বোধ করলেও বেশ একটু কাছে আসছিলেন, প্রগতি লেখক সংঘে সাগ্রহে যোগ দিলেন। বিষ্ণুবাবু এবং আমার 'শীল' সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা, আর একবার তো উৎসাহভরে চিন্মোহন সেহানবীশকে 'আমার কমরেড' সম্বোধন করে নিজের বই উপহার দিলেন। এই মানুষটিকে মাত্র কিছুদিন কম্যুনিস্টদের ফাঁদে বন্দী বলে চিত্রিত করার রেওয়াজ কয়েকটা মতলবী মহলে দেখা গিয়েছে ; কম্যুনিজ্‌ম্‌কে কখনো নিজের জীবনদর্শন বলে তারাশঙ্করবাবু গ্রহণ করেন নি, বরং ছিল গান্ধী-চিন্তার সঙ্গে তাঁর মর্মের সংযোগ, কিন্তু বিচিত্র বর্গের বাঙালী জীবন অবলোকন ও অনুধাবনে চক্ষুষ্মান ও হৃদয়বান্‌ এই যশস্বী কখনো সমসমাজের তত্ত্ব ও কর্মযজ্ঞকে অবজ্ঞেয় মনে করেন নি, বৈরীশিবিরেও মিশে যান নি। বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে যামিনী রায়ের পাশের বাড়িতে প্রথম তাঁকে দেখি ; নগ্নগাত্র, গলায় মালার মতো ঝুলছে উপবীত, কথার ধরনে গ্রামের ছাপ আর রাঢ়ের টান, ব্যবহারে অমায়িক, আলাপে সহজ, ব্যক্তিত্বে অজটিল— বাড়ি গাড়ি ইত্যাদি করে টালায় যখন বাস তখনো দেখেছি তেমনি, শুধু খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘরে বহুজনের আসা-যাওয়া, ছবি আঁকা শুরু তখন করেছেন, সামান্য একটু যেন 'ঋষি-ঋষি' ভাব অসাড়ে এসে পড়েছে, কিন্তু অন্তরটি সর্বদা সাদাসিধে আর সৎ, যা বিনা মহত্ত্ব সম্ভব নয়। এই মহত্ত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন, নিজের স্তর বেছে নিয়ে সাধনাই করেছিলেন, তাই হতে পারলেন সারা বাংলার আত্মীয়, লিখলেন 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', লিখলেন আজ প্রায়-বিস্মৃত 'ঝড় ও ঝরাপাতা', লিখলেন অজস্র সুন্দর (এবং গুণগত বিচারে অসমান) গল্প। তারাশঙ্করবাবু যখন রাজ্যসভার সদস্য, প্রায়ই দিল্লী থেকে দূরে থাকতেন, একবার লিখলেন মধুর ক'লাইনের চিঠি, আমাকে দেখেছেন স্বপ্নে— আনন্দের

ধাক্কা লেগেছিল বুকে, কারণ সেই সময়টাতেই কয়েকটা এলাকা থেকে প্রচার চলছিল যে তিনি কম্যুনিস্টদের নিয়ে তিক্ত বিরক্ত।

গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে মহত্তম যিনি, সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনের গভীর, অশান্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে একেবারে কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরে অবস্থান ও কর্মপ্রযত্ন নির্বাচন করেছিলেন (এ যেন রামায়ণের ভাষায়, 'কর্মভূমিম্ ইমাম্ প্রাপ্য কর্তব্যম্ কর্ম যৎ শুভম্')। তাঁর মতো ব্যক্তি আমাদের সর্ব অর্থে দুঃখী ও দুর্বল পরিবেশে শান্তি না পেলেও উপশম অন্তত পেয়েছিলেন, তাই দেখতাম তাঁকে সোৎসাহে শুধু '৪৬ নং'-এ কিম্বা অনুরূপ আয়োজনে নয়, জনসভা ও পার্টির বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে—চিন্মোহন-বাবু মনে পড়িয়ে দিলেন '৪৬ নং'-এ মানিকবাবু একবার পড়লেন 'হারানের নাতজামাই' গল্পটি, যাতে রয়েছে আশ্চর্য কিষাণ নারী 'ময়না-র মা'-র ছবি। আমার মনে আসছে চিন্মোহনবাবুর বিয়ের পর '৪৬ নং'-এ বন্ধুরা মিলে আনন্দ করছেন, উমাকে বলছেন মানিকবাবু যে তাঁর দারুণ 'হিংসে' হচ্ছে, কী কপাল চিনুবাবুর, যে এত ভালো বউ হল! আরো ভাবছি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারির কথা, মানিকবাবুর সঙ্গে আমি চলেছি চট্টগ্রাম; কম্যুনিস্ট প্রার্থী কল্পনা দত্ত-র সমর্থনে সভায় সেখানে উভয়ে বক্তৃতা করব, গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুরগামী স্টীমারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল গল্পে, জ্যোৎস্নায় ভরা পদ্মার অপরূপ নিতম্ব-মাধুর্য দেখে মুগ্ধ হলাম, 'পদ্মা নদীর মাঝি'-র যিনি স্রষ্টা, তাঁকে পাশে রেখে সেই পাড়ি সহজে ভুলবার তো নয়!

আজ যিনি বাঙালী কবিকুলে দিক্‌পাল বলে সর্বস্বীকৃত, সেই বিষ্ণু দে নিজেকে মেধাবী ও মরমী কবিসত্তার সংগোপনে আবদ্ধ থাকতে না দিয়ে সততসঞ্চরমান এই বিশ্বে মানুষের ইতিহাসের জঙ্গমতার প্রতি পর্যায়ে সাড়া দিতে থাকলেন, সমকালীন জীবনের মাধুর্য, তার মাদকতা, সঙ্গে সঙ্গে তার মুশকিল, তার সংকট, আর তার সংগ্রামে শামিল হতে চাইলেন। মজলিশে জমে না যাওয়া পর্যন্ত একটু যেন দূরাবস্থিত, ভিন্নগোত্র, পরিপাটি, ধারালো মানুষ হিসাবে বিষ্ণুবাবু কখনো ঠিক 'জনপ্রিয়' ছিলেন না; পার্টিমহলে (পরবর্তী কালে গবেষক বলে পরিচিত) বিনয় ঘোষ প্রভৃতি বেশ কয়েক জনের মনে তাঁর সম্বন্ধে নানান নালিশ জমা থাকত, মাঝে মাঝে প্রকাশও হয়ে পড়ত, এবং দুই তরফের লোক হয়ে আমার ঘটত অস্বস্তি, একাধিকবার

পার্টি-সেক্রেটারি ভবানী সেন-এর সঙ্গে বসে ফয়্সালার চেষ্টা হত— ভবানী-বাবু অন্তত এ-সব ব্যাপারে অন্য পার্টিনেতার তুলনায় ছিলেন সাহিত্যিক সমস্যার সমঝদার। যাই হোক, কথা বেশি বাড়ছে, রাশ টানা দরকার। বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে নাম করতে হয় বিশেষ করে ক'জনের— জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (যার 'নবজীবনের গান' ও অনুরূপ কয়েকটা কীর্তি এনেছে সাহিত্যে সংগীতে নতুন এক বৃত্ত), চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় (যিনি কেন জানি নিভে গেলেন, বিদ্যাচর্চায় মন দিলেন), সমর সেন (১৯৩৭-৩৮ সালেই যার তরুণ প্রতিভা গগনচুম্বনের ইঙ্গিত দিয়েছিল— ইচ্ছা করেই এভাবে বলছি তাকে যুগপৎ রুষ্ট এবং পুলকিত করবার আশায়— কিন্তু কবিকে তো হতে হয় স্থিতধী, চিত্তের প্রসাদ বিনা সৃষ্টির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়, আর হয়তো তাই আমাদের অনেকের বহুপ্রীতিস্নেহভাজন এই গুণধর অতি দ্রুত নির্বাক্ হয়ে পড়লেন, বহু বৎসর ধরে বহু অবান্তর কর্মে লিপ্ত থাকলেন, পরভাষায় গদ্য-লিখনে যশস্বী হলেন কিন্তু বাংলা কবিতা আর তাকে পেল না, অধুনা সমাজ-বিপ্লব বিষয়ে তার গভীর ব্যগ্রতা তাই প্রকাশ হতে দেখি নিখাদ ইংরিজী প্রবন্ধে, যার দৌড় এদেশের জীবনে বেশি দূর কেমন করে হবে ?)

যুদ্ধ বাধার আগে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে যে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল, যুদ্ধের সময় এবং পরে তার পরিণতিতে কেমন যেন বিকৃতি এসে হাজির হল। পূর্বেই 'স্বগত' প্রবন্ধ সংকলনে লিখেছিলেন : "ফ্যাশিজ্ম্ আর কম্যুনিজ্ম্-এর উভয় সংকটে শেষোক্ত নিগ্রহ-নীতিই যথেষ্ট কম অসৎ বলে আমাদের অবশ্যকরণীয় নয় ; এবং সমুৎপন্ন সর্বনাশে অর্ধত্যাগের হিতোপদেশ যতই পাণ্ডিত্যসূচক হোক্-না কেন, দুটো মন্দের মধ্যে একটার নির্বাচন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অসাধ্য। এক্ষেত্রে সভ্যতার চিরাচরিত মধ্য পন্থাই হয়তো অগতির গতি।" এটা হাতের কাছে পেলাম, কারণ সুধীন্দ্র-নাথের কম্যুনিজম্-বিরোধিতা এবং এম. এন. রায় মহাশয়ের সঙ্গে হৃদ্যতা নিয়ে প্রবন্ধ সেদিন এক পত্রিকায় দেখলাম, পড়লাম সহর্ষ সিদ্ধান্ত যে সুধীন্দ্রনাথ এবং অর্ওয়েল ("1984"-এ সোভিয়েট-ধ্বংসের ভবিষ্যদ্‌বক্তা) ছিলেন একাত্ম ("দুজনেরই বন্ধু" ম্যালকম্ মাগারিজ্) ইত্যাদি। সুধীন্দ্রনাথের মনের দোটানা ভালো করেই জানতাম ; সব দিক না ভেবে সিদ্ধান্তে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, গোটা মন সায় দেবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়া তাঁর

স্বভাবে ছিল না, হয়তো বুঝতেন না যে বিচারকের আসনে নিরপেক্ষ হয়ে থাকার মধ্যেও রয়েছে একরকম মনস্থির করা ; 'অগতির গতি, মধ্যপন্থা' যে মারাত্মক হতে পারে তা স্বীকার করতেন না। যাই হোক্, কম্যুনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে তাঁর সংশয় যায় নি, ইংরেজসুলভ ভণ্ডামিতে ভরা গণতন্ত্রের বুক্‌নি অসার জেনেও সম্মতি গেল সেই দিকে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের তৎকালীন ভূমিকার সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য ঘটল। আমার পুরোনো বন্ধু সুশীল দে (আই. সি. এস.), বহুদিনের পরিচিত এবং কিছুকাল পার্লামেন্টে সতীর্থ বীরেন রায় (বেহালার বিখ্যাত বাসিন্দা) এবং সুধীন্দ্রনাথকে নিয়ে এম. এন. রায়ের মেলামেশা তখন খুব চলেছিল। পূর্বোক্ত আমার আর-এক বন্ধু লিন্‌সে এমার্সন্-ও যুদ্ধান্তে এম. এন. রায়ের প্রভাবেই সাম্যবাদী প্রত্যয় পরিত্যাগ করল। বলতে দ্বিধা নেই যে সুধীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মের এবম্বিধ পরিণতি পীড়া দিয়েছিল ; একেবারেই অবশ্য তুলনীয় ব্যাপার নয়, কিন্তু একটু কষ্ট পেয়েছিলাম যখন তিনি প্রথমা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করলেন। মনে পড়ছে '৩৬-৩৭ সালে সরোজিনী নাই ডু এসেছেন সুধীন্দ্র-নাথের বাড়িতে, চায়ের আসরে গৃহিণী বসলেন কিছুক্ষণ, বিদেশী ভাষায় আলাপে অনভ্যস্ত বলে মুখের হাসিতে নীরবতাকে ঢাকছেন, শাহেদ্ সোহ্‌রা-ওয়ার্দি বললেন শ্রীমতী নাইডুকে যে আমাদের 'ছবি' (সুধীন্দ্র-জায়ার নাম) আজকালকার 'talking picture' তো নয়, সে হ'ল 'silent picture' !

বহু পরে, ১৯৬৭ সালে, গ্যেটের ভাইমার-এর সন্নিকটে বুখেন্‌ভাল্‌দ্ 'কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্প' দেখেছি· ফ্যাশিজ্‌ম্-এর দানবিকতা যে কত কদর্য তা চাক্ষুষ করেছি— কিন্তু '৩৬-৩৭ সাল থেকেই, রজনী পাম দত্ত -কৃত *Fascism and Social Revolution* প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠের ফলে মনে জমে উঠেছিল ঐ জঘন্য উৎপাত সম্বন্ধে অপরিমেয় ঘৃণা। সন্দেহ নেই সুধীন্দ্রনাথও ফ্যাশিজ্‌ম্‌কে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতেন, কিন্তু সোভিয়েট কর্মকাণ্ডের মহিমা বিষয়ে তিনি অন্ধ থেকে গেলেন ; চিত্তের মুক্তি তাঁর অন্বিষ্ট কিন্তু বাস্তব সমাজ-জীবনে মানুষের মুক্তির সঙ্গে তার সামঞ্জস্যের সন্ধান তিনি পেলেন না, ব্রিটিশ বিধানের বুজরুকিকে না মানলেও কেমন যেন আঁকড়ে রইলেন, হয়তো সান্ত্বনা পেলেন *Encounter*-এর মতো বিদগ্ধ অথচ বিষোদ্‌গারী পত্রিকায় লিখে। কারো প্রভাবে আত্মহারা হবার মতো মানুষ তিনি ছিলেন

না, কিন্তু আমার ধারণা এ-বিষয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সংসর্গ অন্তত কিছু পরিমাণে তাঁর চিন্তাকে সংক্রামিত করেছিল, সাম্যবাদ সম্পর্কে প্রবল বিতৃষ্ণা সুস্থ দৃষ্টিকেই বিকৃত করেছিল।

এম. এন. রায় মহাশয়ের গুণগ্রাহী কিছুতেই হব না বলে ধনুক-ভাঙা পণ কখনো করি নি। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছিলাম তাতে শ্রদ্ধা অবশ্য বেশ কমে যায়, বুঝেছিলাম শুধু পরিস্থিতির চাপে নয় চরিত্রবৈশিষ্ট্যের ফলেও তিনি কেমন যেন ভেদনীতি-বিশারদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিপ্লবের ক্ষেত্রে বিতর্কিত হলেও কীর্তিমান বাঙালী বলে আমাদের কাছে আদৃত হওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। এদেশের রাজনীতিতে যখন তাঁর প্রকাশ্য আবির্ভাব, তখন কংগ্রেসে স্বয়ং জওয়াহরলাল নেহরু তাঁকে সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন নি। যতদূর জানি, হয়তো আজীবন চক্রান্তে অভ্যস্ত বলে তিনি বরং সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে মিতালি পছন্দ করেছিলেন, কোথায় যেন পড়েছি 'wrong horse' চেপেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো ছিল তাঁর উদ্দেশ্য! কংগ্রেসে তিনি যে প্রতিষ্ঠা সহজে পেতে পারতেন তা সম্ভব হল না, রায় চললেন নিজের একক রাস্তায়, এবং যে অতীত নিয়ে এসেছিলেন তার ফলে কম্যুনিস্ট-সোশালিস্ট কারো সংসর্গই তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তাঁর পত্রপত্রিকা, আলাদা শ্রমিক সংগঠন 'ফেডারেশন অফ্ লেবর', এবং বাছাই করা অনুগামী নিয়ে তিনি রইলেন, ১৯৩৯ থেকেই ইংরেজ সরকারকে পূর্ণ সাহায্য দিতে চাইলেন, সরকারও তাঁর 'ফেডারেশন'কে পুষ্ট করল, পরস্পরের মধ্যে 'quid pro quo'-র আদান-প্রদান চলল। নজরটা অবশ্য তাঁর উঁচু ছিল; *Wavell Papers*-এ দেখি বড়লাট রায়ের এক চিঠি পেয়ে তার ওপর 'নোট্' করছেন যে 'he was Viceroy and had no desire to be Vice-Roy'! যাই হোক্, সুধীনবাবু যখন কিছুকাল পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে হাজরা রোডে ছিলেন, তখন বার দু'য়েক এম.এন.রায় মশায়ের সাক্ষাৎ পেয়েছি। অসংকোচে বলতে পারি, শ্রদ্ধান্বিত মনেই তাঁর সামনে গিয়েছি, যদিও মতভেদ ছিল বহু— আর সবাই তো জানে তিনি ছিলেন আকারে দশাসই মানুষ, দেখলে অহংকার হত, বলা যেত সত্যই যে 'বাঙালী নহে খর্ব'! বুদ্ধিবৃত্তির ঔজ্জ্বল্য তো নিঃসন্দিগ্ধ, আর জীবনকথায় অন্ধকার পরিচ্ছেদ থাকলেও অগ্নিদীপ্তিও তো ছিল, তাই

তাঁকে পূর্ণ মর্যাদা দিতেই প্রস্তুত ছিলাম, আন্তরিক বিনয় নিয়েই কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। বেশ মনে আছে ব্যর্থ হতে হল, কারণ অত বড়ো মানুষ হয়েও আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে হয়তো কম্যুনিস্ট পার্টিসভ্য বলেই দূরে রাখতে চাইলেন, আলাপে উদ্ভট কুণ্ঠা, আলোচনায় একান্ত অনীহা, কেমন সন্দিগ্ধ ভাব এবং এমনই কষ্টকৃত সৌজন্য যে বেশিক্ষণ তাকে সহ্য করা পীড়াদায়ক লেগেছিল। আশ্চর্য নয় যে বিবিধ গুণালংকৃত হয়েও এই অসাধারণ বাঙালী বিপ্লবের ইতিহাসে মহত্ত্বের কোনো স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে পারলেন না। অন্তত একদা বিপুল কর্মক্ষমতা এবং নিয়ত শ্রান্তিহীন মন সত্ত্বেও তিনি যে অবদান রেখে গেলেন তার মূল্যায়নে কঠোর না হবার উপায় আছে কি? শেষ জীবনে *Beyond Communism* প্রভৃতি রচনার বক্তব্যে অজ্ঞাত বিচারে আকর্ষণীয় কিছু নেই তা নয়, কিন্তু কোথায় কোন্ বিপ্লবী জানে না এ-ধরনের চিত্তবিলাসের বাস্তব পরিণাম? ঐ একই নামে গ্রন্থ লেখেন বেলজিয়মের de Man যিনি দীর্ঘকাল সমাজবাদের ধ্বজাধারী থাকার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাশিস্টদের কাছে আত্মবিক্রয় করেন। আরো মনে পড়ছে যে NATO-র সেক্রেটারি-জেনারেল হয়েছিলেন Paul-Henri Spaak, যিনি ত্রিশের দশকে ছিলেন ট্রট্স্কির শিষ্য-বিশেষ! যাক, এটুকু লিখে অন্তত স্বস্তি পাচ্ছি যে প্রবল মতান্তর সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্যকে বিকৃত করে নি, তাঁর শীল, তাঁর সংস্কৃতি ছিল সকল ক্ষুদ্রতার উচ্চে।

* * *

'৪২-৪৩ সালের এই সময়টা প্রধানত আমাদের বিচরণ ছিল '৪৬ নং'-এ আর ২৪৯, বৌবাজার স্ট্রীটের তেতলায় পার্টি অফিসে, যেখানে রোজ যেতে না পারলে ভাত হজম হত না। আগেকার পক্ষে মস্ত চারতলা বাড়ি, ওপরে বিশাল ছাদ, যেখানে পার্টিসভ্যদের সভা হয়েছে বহুবার। এসেছেন পার্টি লাইন বিশ্লেষণের জন্য পি. সি. জোশী (যে তো কলকাতার আপন জন, পরে বিবাহও করল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রয়াস-খ্যাত কল্পনা দত্তকে) কিম্বা গঙ্গাধর অধিকারী, যাকে পার্টির সবাই জানে 'doc' বলে (জার্মানীতে ডক্টরেট করার সঙ্গে সঙ্গেই কম্যুনিস্ট পার্টির কাজে আত্মনিমজ্জন করে আজও সপ্ততি-ঊর্ধ্বে তিনি কর্মব্যস্ত)— মনে পড়ছে 'জনযুদ্ধ' নীতির ব্যাখ্যা করবার সময় মাঝে মাঝে নিজের মাথায় টোকা দিচ্ছেন, যেন ভিতর থেকে চিন্তা-

প্রবাহকে টেনে বার করছেন! একবার প্রমোদ দাশগুপ্ত (বর্তমানে সি.পি. এম.এর প্রধান নেতা) উৎসাহের চোটে বললেন এমন ব্যাখ্যা কখনো শুনি নি! পার্টি অফিসে দেখা যেত মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন নিয়মিত কাজ করছেন, অধ্যাপক নীরেন রায় কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কয়েকমাস একাদিক্রমে সারাদিন ধরে অফিসে হাজিরা দিলেন। একবার সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতি সম্পর্কে একটা রিপোর্ট লিখতে বসলাম, সঙ্গে সঙ্গে 'টাইপ' করতে থাকল দিলীপ বসু, লেখা এবং টাইপ করা চলল একযোগে আর সমান বেগে; সর্বদা হাসিখুশি আর কাজের সঙ্গে কথা বলে যাওয়ায় অভ্যস্ত দিলীপ তাই নিয়ে মন্তব্য করতে থাকল (আজও দিলীপ কলকাতার যানবাহনে জমজমাট রাস্তার মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে গাড়ি চালাতে চালাতে পার্শ্ব কিম্বা পশ্চাদ্‌বর্তী সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে নিঃসংকোচে, হাত নানা ভাবে নাড়িয়ে যুক্তিকে জোরদার করতে থাকে। চালকের হাবভাব দেখে আরোহী তটস্থ হয়ে থাকে কিন্তু পুরোনো পাপী আমরা জানি দিলীপের রকমসকম, ট্র্যাফিক পুলিশও অনেক সময় তার বেপরোয়া অথচ সুকৌশলী গাড়ি চালানোর তারিফ করেছে)। রিপোর্টটি আমাদের ছাত্রবন্ধুদের পছন্দ হয় নি। কারণ আমার বক্তব্য ছিল যে সোভিয়েট-সুহৃৎ আন্দোলনে ছাত্র-সমাজের আগ্রহ তেমন বাড়ছে না আর ছাত্রনেতারা পাল্টা নালিশ করেন যে আমরা হয়তো বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটু বেশি মেতেছি! এটার উল্লেখ করলাম এজন্য যে এ-ধরনের সমালোচনা পার্টিজীবনে ছিল নিয়মিত আর সে আলোচনায় আমি অধ্যাপনা করছি বলে ছাত্র কমরেডদের তীক্ষ্ণ মন্তব্য থেকে নিস্তারও দাবি করতে পারতাম না!

জ্যোতি বসুকে পার্টি ক্রমশ টেনে নিল ট্রেড ইউনিয়ন এবং খাস পার্টি সম্পর্কিত কাজে— সে হিন্দীতে বক্তৃতা দিতে শিখল, মজুর মহলে ঘোরা-ফেরায় অভ্যস্ত হল, বাজিয়ে নেওয়া হল যাতে ভবিষ্যতে দরকার হলে আত্ম-গোপন করে থাকবে (যা তাকে পরে একাধিকবার করতে হয়েছে)। ভূপেশ গুপ্ত-ও পার্টির সাংগঠনিক কাজে ডুবে থাকল, তখনকার কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও নেহাৎ সহজ ছিল না। সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির সভাসমাবেশে আমরা লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ছাড়া শ্রমিক-কৃষক প্রতিনিধিদের আনার চেষ্টা করতাম, নানা দলের রাজনীতিকদেরও টানতাম

—তাই প্রথম দিকেই এসেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (যাঁকে সভাপতি করে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এক সমাবেশে বিনয় রায়ের বলিষ্ঠ গলায় গান আর তার সঙ্গীদের কণ্ঠ মিলে চাঞ্চল্যময় আর অপরূপ এক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল), পরে আসতেন মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশেম, প্রায় দৃষ্টিহীন হয়েও যিনি যোগ দিতেন সভায়, স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য রাখতেন। আমরাও চাইতাম যাতে কংগ্রেস আর লীগ পরস্পর কলহ ছেড়ে একত্র হয়, যুদ্ধকালীন জাতীয় সরকার গঠনে উদ্যত হতে পারে। পার্টিনেতাদের মধ্যে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ভবানী সেন আর সোমনাথ লাহিড়ীকে আমরা টেনে আনতাম— বঙ্কিমবাবুর উদাত্ত ওজস্বিতা আর দরাজ ব্যক্তিত্ব, ভবানী সেনের সূক্ষ্ম জটিল চিন্তাকে সহজ বাক্যের পরিচ্ছদে প্রকাশ করার ক্ষমতা, আর লাহিড়ীর শ্লেষ, যুক্তি, আবেগকে মিলিয়ে বলার নৈপুণ্য ছিল আন্দোলনের সম্পদ।

চল্লিশের দশকে, আর বলতে গেলে আমার জীবনে একটা বড়ো অধ্যায় জুড়ে, আমার ডান হাত ছিল 'দোদো', স্নেহাংশুকান্ত আচার্য যার পুরো নাম, পূর্বেই অবশ্য একাধিকবার উল্লেখ করেছি। কিন্তু এ-ধরনের রচনায় বারবার তার নাম না করলে তো চলে না। ময়মনসিংহ মহারাজ-বংশে জন্মে সে অবলীলাক্রমেই এসেছিল পার্টিতে— সর্বদা প্রাণোচ্ছল, কথায় কৌতুকের ফোয়ারা, শ্লীল অশ্লীল সর্ববিধ রহস্যে সিদ্ধ, অতিশয়োক্তিপরায়ণ হয়েও প্রকৃত প্রস্তাবে সংযত, আন্দোলনকে সর্ববিধ সহায়তাদানে সতত উদ্যত, প্রতিশ্রুতি প্রদানে অতিরিক্ত অকাতর হলেও সর্বদা অন্তরের সহজ ঔদার্যে সমুজ্জ্বল, এমনই একজন যার দুর্বলতা বা দোষ নিয়ে কেউ ভাবতে পারতাম না, গোপাল হালদার মশায় তো একবার বললেন যে স্নেহাংশুর কথা ভাবলে মনে পড়ে শুধু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে! আমার সে অত্যন্ত নিকট হয়েছিল, এমনই নিকট যে 'মার্কসিস্ট' কম্যুনিস্ট পার্টির (সি.পি.এম.) বিপক্ষে আমার একটা বড়ো নালিশ এই যে পার্টি ভাগ করিয়ে তারা স্নেহাংশুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে! বোধ হয় '৪৮ সালে অকারণে স্নেহাংশু পার্টি থেকে সাময়িক ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছিল; তাকে আমি তখন দেখেছিলাম, একেবারে ভেঙে পড়েছিল, মাতৃপিতৃবিয়োগেও তেমন আর্ত বোধ করে নি। আর ফিরবার পথে সারা সময়টা আমি ভেবেছিলাম তাকে পার্টিতে টেনে

আনার প্রথম দিনগুলোর কথা, নানা ভাবে পার্টির কাজে তার নিষ্ঠা আর একাগ্রতার কথা, নিজেকে অভিশাপ দিয়েছিলাম অক্ষমতার জন্য, বেয়াড়া পার্টি-পরিস্থিতির সুরাহা তখনই সম্ভব ছিল না বলে, কিছুটা অংশীদারীই করেছিলাম তার প্রচণ্ড বেদনাতে। মাঝে মাঝে ভাবি বন্ধুভাগ্য আমার মন্দ— দিল্লীতে পার্লামেণ্টারী জীবনে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু সাদাৎ আলী খান্ তুরস্কে রাষ্ট্রদূত অবস্থায় মারা গেল। খবর পেলাম '৬৭ সালের সেই মুহূর্তে যখন একই রেডিও সংবাদে লোকসভা নির্বাচনে আমার সাফল্যেরও বিবরণ এল! জওয়াহরলাল নেহরু এবং আমার মধ্যে ব্যবধান অনেক; তাই বন্ধুত্ব বাক্যটি হয়তো প্রযোজ্য নয়। কিন্তু তাঁর সান্নিধ্য ও স্নেহকে সম্পদ মনে না করে পারি নি— পরিণত বয়সে হলেও তাঁর মৃত্যু আমাকে মর্মাহত করেছিল, আজও একটা শূন্যতা অনুভব করে থাকি। ঠিক স্নেহাংশুর মতো বন্ধু আমার আর নেই, হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু আজ সে বিচ্ছিন্ন, 'vase' ফেটে গেলে তাকে আর জোড়া তো যায় না— যাক্ এই বৃথা ব্যক্তিগত বাক্যবিলাস। একটু অনুপাত ও কাণ্ডজ্ঞানরহিত ভাবেই কয়েকটা কথা লিখে ফেললাম দেখছি।

প্রায় যখন যুদ্ধের ঘনঘটা চারদিক অন্ধকার করে রেখেছে তখনই কথা হয়েছিল সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির পক্ষ থেকে ছোটো একটা দল যাবে সোভিয়েট দেশে— তাতে ছিলাম আমি, স্নেহাংশু এবং উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্য ডক্টর হুসায়ন ('মুন্নে') জহীর (ইনি পরে Council of Scientific & Industrial Research-এর Director General হয়েছিলেন, সজ্জাদ ['বন্নে'] জহীরের ইনি অগ্রজ)। বঙ্কিমবাবুরও যাবার কথা উঠেছিল, তবে হয়তো প্রতিনিধি দলে নয়। পাসপোর্টের চেষ্টা করা হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ করি সোভিয়েট পক্ষ থেকেই জানা গেল যে সময়টা সমীচীন নয়— প্রকৃতপক্ষে তখন আমাদের যাওয়ার কোনো অর্থ ছিল না, কারণ চলছিল স্টালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক সর্বধ্বংসী লড়াই, '৪২ সালের নভেম্বরে শুরু হয়ে যার নিষ্পত্তি ঘটে পর বৎসর ফেব্রুয়ারিতে। অসম্ভব বিপর্যয়ের মধ্যে সোভিয়েট দেশ থেকে বই কাগজপত্র, ছবি, পোস্টার, ফিল্ম্ প্রভৃতি যে পাওয়া যাচ্ছিল, তাই ছিল তখনকার এক বিস্ময়। তখনই আমরা পড়তাম কাজাকস্তানের চারণ কবি, নিরক্ষর জাম্বুলের রচনা, পেলাম

অস্ট্রভ্স্কির *How the Steel was Tempered*-এর মতো অতুলন কাহিনী, জানলাম রবীন্দ্রনাথ যাকে ১৯৩০ সালে বলেছিলেন 'ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ' তার বহু অজ্ঞাতপূর্ব ব্যঞ্জনার বিবরণ। অনেক পরে ১৯৫৪ আর ১৯৬৫ সালে লেনিনগ্রাদে দেখা হয়েছে সোভিয়েট পণ্ডিত Kalyanov-এর সঙ্গে, যিনি সংস্কৃতে আমার সঙ্গে দু-একটা কথা বললেন, আর জানলাম যুদ্ধরত অবস্থা থেকে ডাকিয়ে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগ অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে ১৯৪২ সালে তাঁকে জানায় যে মহাভারতের রুশ যে অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন সেটিকে সম্পূর্ণ করতে হবে! কালিয়ানভ্কে পরে বাধ্য হয়ে তাশখন্দে গিয়ে অনুবাদ করে যেতে হয়েছিল, আজ সে ব্রত উদ্‌যাপিত— কিন্তু ভেবে আশ্চর্য হতে হয় ঘটনাটা। তেমনই আশ্চর্য হতে হয় দেখে যে রামায়ণ কাহিনী নিয়ে নৃত্যনাট্য প্রধানত শিশুদের জন্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অগণিত প্রাপ্তবয়স্ক শ্রোতাদের সামনে, বৎসরের পর বৎসর মস্কোতে সোল্লাসে আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এদেশে পরিচিতা মাদাম গুসেভার পরিচালনায়— আমি দেখলাম '৬৭ সালে, প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বললেন, সাত-আট বৎসর আগেও আমি দেখেছি, অথচ চমৎকারিত্বের লেশমাত্র হানি ঘটছে না, আজও বোধ হয় চলেছে সেই অনুষ্ঠান, প্রতিবারই প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ, আনন্দের আস্বাদে সবাই সুখী, একান্ত বিদেশী বিষয় বলে কারো কাছে বিসদৃশ লাগছে না। বাস্তবিকই কোথাও যদি 'বসুধৈব কুটুম্বকং' মন্ত্রের সার্থকতা, তো তা ঘটেছে সোভিয়েট দেশে সমাজবাদের সংস্পর্শে, বিপ্লবের জাদুতে। যাই হোক, দুবছর ধরে নিয়মিত 'ইন্দো-সোভিয়েট জার্নালে' এবং অন্যত্র অসংখ্য রচনা ও অনুবাদে তখন হাত দিয়েছি; দুঃখের বিষয় তার অধিকাংশই আজ নেই, 'ইন্দো-সোভিয়েট জার্নাল' যদি কোনো সংগ্রাহকের জিম্মায় থাকে তো তা অন্তত আমার অজানা।

সম্ভবত '৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন টেলিফোন এল নারীকণ্ঠে : বোম্বাই থেকে অনিল ডিসিল্‌ভা এসে হোটেল ম্যাজেস্টিক থেকে কথা বলছি, গণনাট্যসংঘ (আই.পি.টি.এ.) গঠন ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই, এখুনি যদি আসেন। হোটেলটা কাছেই, তাই অবিলম্বে যেতে অসুবিধা ছিল না, একটু বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ পেলাম দেখে যে মহিলা প্রকৃতই শ্রীমতী, বছর ন'য়েক বিদেশে কাটিয়েছেন, সেখানে সমাহৃত বিদেশী স্বামীকে পরিত্যাগ

করেছেন, পাশ্চাত্য রীতিনীতিসংগত ব্যবহারে সিদ্ধ, একটু চটুলও বটে; সৌহার্দ্য স্থাপনে দ্রুত ও স্বচ্ছন্দ, নাট্য এবং অভিনয় বিষয়ে অগভীর পরিচিতি সত্ত্বেও অনাবিল আবেগ ও সংবেদনশীলতায় মণ্ডিত— অবিলম্বে দোদোকে খবর দিলাম, 'whiff from Europe' (অনিল সম্বন্ধে আমার বাক্য!) সাম্‌লাবার ক্ষমতা তার আমার চেয়ে ঢের বেশি, তা ছাড়া শ্রীলংকার এই অভিজাতবংশোদ্ভবাকে গণনাট্য এবং সংশ্লিষ্ট মহলে নিয়ে যাওয়া আর কলকাতায় অতিথি বলে তার যথাযথ দেখাশোনার সামর্থ্য দোদোরই ছিল। শীঘ্রই জানা গেল, অনিল শুধু সখের কর্মী নয়, বাস্তবিকই গণনাট্যের মূল প্রেরণায় নিজের ঢঙে সে মাতোয়ারা, ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রাম মজদুরদের ছোট্ট একটা নাটক নিয়ে, যেটা লিখলেন ট্রামশ্রমিক দশরথলাল, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে যার অভিনয় হল পার্টি অফিসের ঠিক সামনে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল্-এ। দেখা গেল বোম্বাই থেকেই কমরেড ডাঙ্গের সঙ্গে তার বেশ পরিচয়, তাই টি.ইউ.সি. মহলে তার বিচরণে ব্যাঘাত ঘটে নি। তখনই হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হল-এ অনেকগুলো গান শোনাচ্ছিলেন— তার প্রিয় রচনা 'সূর্য অস্ত্ হো গয়া' আর ফরাসী জাতীয় সংগীত 'মার্সেইয়েজ'-এর অবিকল সুরে চমৎকার হিন্দীগান, 'অব্ কোমর বাঁধ তৈয়ার হো লাখকোটি ভাইয়োঁ', সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় ছিল 'বিন্ ভোজনকে ভগবান্ কঁহা?' 'হল্' ভর্তি, আমি ঢুকলাম ভিড় ভেদ করে, অনিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই আমার বাহুলগ্না, কানে পুলকিত তরুণ কণ্ঠে টিপ্পনী শুনলাম: 'আরে, হীরেন মুখুজ্জে-ও উড়ছে!' দুঃখের বিষয় কথাটা ঠিক ছিল না, কারণ উড়ি নি, তবে এই রূপগুণান্বিতা বহুবল্লভার সঙ্গে বাস্তবিকই গভীর অন্তরঙ্গতা ও প্রীতির সম্পর্ক আমার হয়েছিল, সর্বসমক্ষে 'darling' 'dearest' ইত্যাদি সম্বোধনে সে নিবৃত্ত হত না, আমারও অপ্রতিভতার কারণ ঘটত না—'৪৪ সালে বোম্বাইয়ে তার গৃহে কয়েকদিন থেকেছি, তখন কী এক কারণে সে ঠিক পার্টির নেকনজরে ছিল না; পি. সি. জোশী আমাকে হেসে বলেছিল: 'তোমার কথা আলাদা, আর কেউ হলে পার্টি থেকে নাম কেটে দিতাম!'

অনিলের সঙ্গে পরিচয় জমতে থাকল কারণ একাধিকবার তখন সে কলকাতা যাতায়াত করল— গণনাট্যসংঘ স্থাপনের প্রথম যুগের উদ্দীপনা তো

কম ছিল না ; 'People's Theatre stars the People' ধ্বনিতে মাদকতা ছিল, গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে সেদিন আমাদের আন্দোলনের বক্তব্য দেশের লোকের সামনে উপস্থাপিত করা শুধু নয় তাদের মরমে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার কাজের আকর্ষণ ছিল প্রভূত। যখন বোম্বাই গেলাম '৪৩ সালের এপ্রিল মাসে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সর্বভারতীয় কংগ্রেসে যোগে দিতে তখন আবার তার সঙ্গে দেখা ; তখন সে পার্টির সদস্য, কংগ্রেসে আসত দর্শকের কার্ড নিয়ে, আর সংলগ্ন সর্ববিধ অনুষ্ঠানে সর্বদা ছিল আমার সহবর্তিনী। কলকাতায় দোদোর সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল তা আরো বেশ এগোল। রোজ সকালে দু'জন মিলে এসে আমাকে তুলে নিয়ে যেত পার্টিকংগ্রেস এলাকায় যেখানে সবাই ব্যস্ত থাকতাম বহুক্ষণ, রাত্রে আমাকে নামিয়ে তারা চলে যেত। আমি উঠেছিলাম 'অ্যাপলো বন্দর' পাড়ায় চর্চিল চেম্বর্স-এ, অতিথি হয়েছিলাম বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত পত্রিকা *Economic Weekly*-র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শচীন চৌধুরীর ফ্ল্যাটে (এখন পত্রিকার নাম *Economic and Political Weekly*)। অনেক কথা হত, বিশেষত '৪২ সালের আগস্ট-আন্দোলনে বোম্বাই শহরের ভূমিকা নিয়ে, যা থেকে বুঝেছিলাম কেন তাঁর মতো চিন্তাশীল বিশ্লেষণ-নিপুণ এবং হৃদয়বান্ সজ্জন তৎকালীন কম্যুনিস্ট নীতিকে গ্রহণ করতে পারেন নি, মনেপ্রাণে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী হয়েও আগস্ট অভ্যুত্থানের ক্ষণস্থায়ী গরিমায় মুগ্ধ হয়েছিলেন, নানা দিক থেকে পার্টির তারিফ করতে অস্বীকৃত না হয়েও একটু যেন অপ্রসন্ন বোধ করতেন। আলাপ হল তাঁর ছোটো ভাই হিতেন চৌধুরীর সঙ্গে, ফিল্ম্ ব্যবসার জগতে তিনি খ্যাতিমান, দাদার মতো না হলেও যাঁর ব্যক্তিত্বে বৈশিষ্ট্য ছিল। স্বাধীন ভারতে 'ইকনমিক উঈকলী'-র কর্ণধার রূপে শচীনবাবুর নাম এত ছড়িয়েছিল যে ১৯৬৫ সালে প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যখন সবাইকে অবাক্ করে কলকাতা হাইকোর্টের যশস্বী ব্যারিস্টার শচীন চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীপদে নিয়োগ করলেন (বার লাইব্রেরিতে এঁকেও কাছ থেকে জেনেছি, দেখেছি সাহেবী ধরনের মানুষটির গর্ব সংস্কৃত জ্ঞান, মুগ্ধবোধ অনেকটা কণ্ঠস্থ!), তখন বোম্বাইয়ে শচীনবাবুর কাছে বহুজন অভিনন্দন পাঠায়! আমাদের দেশে 'ইকনমিক উঈকলী'-র মতো সাময়িক আগে কখনো দেখা যায় নি ; তবে খাঁটি, মজলিসী বাঙালী

সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়ত্বকে আয়ত্ত করার ফলে যে ব্যক্তিত্ব ধারণ করতে পারে, তারই নিদর্শন ছিলেন শচীন চৌধুরী। বহুকাল বাংলার বাইরে কাটিয়েছিলেন বলেই বোধ হয় বাংলার মায়া তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মনে হত তাঁকে সবচেয়ে মানায় নিছক বাঙালী আড্ডায়। বোম্বাইয়ের মতো শহরে (এবং যেখানেই এদেশে যেতেন) সর্বদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে ঘুরতেন অথচ অ-বাঙালীকে কোল দিতে পারতেন স্বচ্ছন্দে, চিন্তায় একটা বিশিষ্ট স্তরে বিচরণ করতেন, অথচ সর্বদাই মনে হত তিনি একজন সহজ, স্বচ্ছ, সাধারণ মানুষ। চৌধুরী-বংশোদ্ভব নীরদচন্দ্রের সঙ্গে শচীনবাবুর সম্পর্ক কী ছিল জানি না তবে ভেবেছি *The Continent of Circe*-র সমালোচনা শচীনবাবুর মতো রসিক জনকে দিয়ে করাতে পারলে শুধু মজা নয়, একটা সাহিত্যিক ঘটনারও সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। আমার দুঃখ যে কিছুকাল আগে এই মনস্বী, মরমী মানুষটির মৃত্যু হয়েছে।

*　　*　　*

বোম্বাইয়ে '৪৩ সালে পার্টি কংগ্রেসের কাছাকাছি সময়ে প্রগতি লেখক সংঘের তৃতীয় নিখিলভারত সম্মেলন বসে। গণনাট্যসংঘের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ঘটে। সত্যেন মজুমদার মশায় গেলেন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য শেষ পর্যন্ত যেতে পারলেন না (হয়তো এজন্যই নাট্যসংঘের সমাবেশে এই অধমকে সভাপতির আসনে অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বসতে হয়েছিল)। বিষ্ণু দে আমাদের সঙ্গে একট্রেনে চললেন। তিনি এবং আমি টিকিট কেটেছিলাম সেকেণ্ড ক্লাসে, দুরাত্রির যাত্রায় অন্তত শুতে পাবার লোভ একটু ছিল, কিন্তু স্টেশনে আমাদের বিশ্বনাথ মুখার্জির স্ত্রী গীতার শারীরিক অবস্থা দেখে আমার জায়গায় তাকে ঢুকিয়ে স্থান নিলাম থার্ড ক্লাসে যেখানে গোটা একটা কামরায় নরক গুলজার করে ছিলাম অনেকে— দোদো, চিন্মোহন সেহানবীশ, 'জর্জ' বিশ্বাস (আমাদের যুগে রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে যিনি অতুলন), জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (যার গুণপনার তারিফে যে আমি কথা খুঁজে পাই না), শম্ভু মিত্র আর বিজন ভট্টাচার্য (একালের নাট্যকথায় যাদের নাম জলজল করছে), ভারতী-যুগের লেখক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সুজাতা ও সুপ্রিয়া (এদেরই 'ত্রয়ী', বর্তমানে রবীন্দ্রসংগীতে অসামান্যা সুচিত্রা তখনো ছোটো বলেই যেতে পারে নি), 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ'

গান লিখে যে তরুণ কবি তখনই বঙ্গবিখ্যাত সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নামের ফর্দ না-হয় না-ই বাড়ালাম। এলাহাবাদ স্টেশনে জানা গেল যে সেখানে আগের দিনের ট্রেন থেকে নেমে আমাদের বঙ্কিমবাবু প্ল্যাটফর্মের রেস্তোরাঁয় আহারে প্রবৃত্ত অবস্থায় দেখলেন ট্রেন ছেড়ে গেল, বিচলিত হলেন না, ধীরস্থির মেজাজে খাওয়া শেষ করে যাবার অন্য ব্যবস্থার খোঁজ করলেন, উপায় একটা নিশ্চয় বেরিয়েছিল কারণ বোম্বাইয়ে সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ মানুষটির সাক্ষাৎ পেলাম। গাড়ি কোথাও থামলে আমাদের কামরার সামনে ভিড় জমে যেত, জর্জের উদার নেতৃত্বে বহু কণ্ঠে গাওয়া 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' কিম্বা 'অব্ কোমর বাঁধ্ তৈয়ার হো' ধরনের গান চকিত জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। যুদ্ধকালীন রেলযাত্রায় তখন সময় অনেকটা লাগত। দুটো রাত আর দিনেরও অনেকটা তৃতীয় শ্রেণীতে বসে দাঁড়িয়ে, এঁকে বেঁকে শোবার চেষ্টা করে কাটাতে হল, আহার মন্দ হয় নি কিন্তু স্নানের পালাটা মুলতুবি রাখতে হয়েছিল। নামলাম যখন বোম্বাইয়ে তখন দোদো হেঁকে উঠল: 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি, আপন গন্ধে মম, কস্তুরীমৃগসম'। বিষ্ণুবাবু এবং অসুস্থ গীতা সারা রাস্তা মোটামুটি আরামে হয়তো কাটিয়েছিলেন, কিন্তু জিত হল 'হৈহয় ক্ষত্রিয়' আমাদেরই।

পার্টিকংগ্রেসের কিছু আগে হল প্রগতিলেখকসম্মেলন, যার সভাপতি মণ্ডলীতে সত্যেন মজুমদার এবং অন্য কয়েকজনের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রমুখ নেতা শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে-ও ছিলেন। প্রথম তাঁকে দেখলাম বোম্বাইয়ে, বেঁটেখাটো মানুষ, কথায় চনমনে, আলাপে রসিক, মজুর আন্দোলনে একাগ্র হয়েও সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ, মতামতে তীক্ষ্ণ, প্রকাশে স্পষ্ট, সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু অহমিকাসম্পন্ন, অপর জন সম্বন্ধে ঈষৎ তাচ্ছিল্যধারী— প্রথম সাক্ষাতে আলোচনা হল সদ্যঘোষিত এবং একান্ত অতর্কিত সংবাদ যে কম্যুনিস্ট তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল আত্মবিলোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ বিভিন্ন দেশে স্বকীয় ভিত্তিতে কম্যুনিস্ট আন্দোলন পরিণতির পথে অগ্রসর বলে আন্তর্জাতিক সংস্থার অস্তিত্ব আর নিষ্প্রয়োজন, বরং স্বেচ্ছায় এর বিলোপসাধনের ফলে সাম্যবাদের বিশ্বব্যাপ্ত বৈরীশক্তি কিছুটা নিরস্ত্র হবে, নানা দেশের কম্যুনিস্টরা মস্কোয় অবস্থিত আন্তর্জাতিকের হুকুম তামিল করে চলে বলে যে অপপ্রচার সর্বদা সরব তাকে স্তব্ধ হতে হবে।

খবরটা আকস্মিক বলে তার মর্মার্থ আয়ত্ত করতে আমাদের একটু দেরি হয়েছিল, প্রথম দিকে একটু যেন বিচলিতই হয়েছিলাম। পার্টিশৃঙ্খলা অনুযায়ী প্রগতিলেখক সম্মেলনে যোগদানকারী পার্টিসভ্যদের সমাবেশ চলল গভীর রাত পর্যন্ত ; বহু গুরুতর বিষয় আলোচিত হল, মতান্তর যে দেখা দেয় নি তা নয় কিন্তু সেদিনের দুর্যোগে ফ্যাশিস্ট দানবিকতার বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের সংহতি ছিল আমাদের অন্বিষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাকে ভাষা দিয়েছিল অপরূপ এক গানে : "উঠেছে যে জীবনের লক্ষ্মা, মৃত্যুসাগর মন্থনে/নূতন জীবন চায় শিল্পীর বরাভয়, নবসৃষ্টির শুভক্ষণে", যে নবসৃষ্টি প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটবে তখন যখন স্রষ্টাদের মিলন হবে "সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে/জনতার মুখরিত সখ্যে"! বেশ মনে পড়ছে পার্টি সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ' কিম্বা সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির পাক্ষিক মুখপত্রের কাজে গিয়েছি বেনিয়াটোলা স্ট্রীটে গুপ্তপ্রেসে (যেখানে বহুবিশ্রুত 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা' প্রণয়ন ও মুদ্রণ হত), সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গে দেখা। সেদিনই সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে সভা, চাই নতুন আর মন-মাতানো উদ্‌বোধনী গান, যা লিখল জ্যোতিরিন্দ্র সেই পড়ন্ত প্রেস-বাড়ির অন্ধকার ঘরে বসে, সুর দিল নিজে ভাঁজল কয়েকবার, আমাদের শোনালো এবং সভায় গিয়ে গাইল! এটাই, বোধ হয় প্রথম এ-ধরনের গান যার 'রেকর্ড' গ্রামোফোন কোম্পানি বানিয়ে বাজারে ছাড়ে, আর এর রচনা-কাহিনী হল অবিকল যা এখানে লিখেছি। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কম যেতেন না গভীর জটিল কবিতা রচনায়, এমন কবিতা যাতে বিষ্ণু দে-র মতো সতীর্থের সঙ্গে তিনি প্রবর্তন করতেন নিছক ঘনত্ব যা গড়া হ'ত কবিতার অষ্টধাতু দিয়ে। কিন্তু সহজে স্বচ্ছন্দে নেমে এলেন অন্য এলাকায়, গানের সুরে গভীর কথা শোনালেন দেশবাসীকে— শোনা যায় আত্মভোলা এই কবিকে 'চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টাণ্ট' বানাবার চেষ্টা হয়েছিল, ঘর থেকে বেরুতেন খেয়ে দেয়ে, মধ্যাহ্ন কাটাতেন 'কার্জন পার্ক'-এর বেঞ্চিতে শুয়ে থেকে আর বহুজনের সঙ্গে গল্প করে, ফিরতেন সন্ধ্যায় অম্লান-বদনে, আর কিছুকাল এই অভিনয়-পর্ব চালিয়ে ধরা পড়ে আর চলতে পারলেন না সংসারী পথে, কম্যুনিস্ট পার্টি স্বভাবতই অমন ঘরছাড়া প্রতিভাকে লুফে নিয়েছিল!

প্রগতি লেখক সম্মেলনে ডাঙ্গের অভিভাষণে অনেক তথ্য ছিল, নিপুণ

ভাবে নিবদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ, প্রশ্নোদ্দীপক— মনে আছে রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা (বাংলা কতকটা পড়ে তিনি বুঝতেন), আর ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নতুনভাবে অধ্যয়ন বিষয়ে আগ্রহ। সত্যেন মজুমদার স্বভাব-সিদ্ধ সরস ভঙ্গীতে বললেন, আমাকে তখনই তার তরজমা করতে হয়েছিল। দেখা হল খাজা আহ্‌মদ্ আব্বাস প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে, বক্তৃতাও তারা করলেন। বেশ মনে পড়ছে মারাঠী নাট্যকার 'মামা' ওয়ারেরকর-এর সঙ্গে অনেক আলাপ, বাংলা নাটক ও অভিনয়ের তিনি ছিলেন পরম অনুরাগী, সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল চিন্তা ও কর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ। বোম্বাইয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়েছি, বেশ কিছুকাল ধরে সেই বর্ষীয়ান্ মহা-জন আমাদের নানা প্রয়াসে সহায় হয়েছেন। আর মনে পড়ছে প্রথম সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হায়দরাবাদের বাসিন্দা, উর্দুর প্রধানতম এক কবি, মখদুম মহীউদ্দীন-এর সঙ্গে। তখন একটা কলেজে পড়াতেন, পার্টিতে ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছেন, দেখলাম তাঁকে খেত্‌ওয়াদি মেন রোডে পার্টির তৎকালীন কেন্দ্রীয় অফিসে, সেদিনই শোনালেন সদ্যরচিত গান (উর্দু কবিদের 'মুশায়রা'-র কল্যাণে একটু গাইয়ে না হলে বুঝি চলে না !), যে-গান সাহিত্যসম্পদে সত্যই সমৃদ্ধ : 'ইয়ে জং হ্যায় জং-য়ে আজাদী/আজাদীকে পর-চম্-কে তলে, ইয়ে জং হ্যায় জং-য়ে আজাদী' ! এখনো যেন শুনতে পাই কবি গাইছেন : 'য়ে আজাদী আজাদী ক্যা, জিস্‌মে মজ্‌দুর কো রাজ ন হো ?' আর কণ্ঠে প্রাণ ঢেলে বলছেন : 'গুল্‌জার তরানা গাতা হ্যায় আজাদী কা আজাদী কা··· দেখো পর্‌চম্‌ লহ্‌রাতা হ্যায় আজাদী কা আজাদী কা'। মখ্‌-দুমের জীবনাবসান হয়েছে, কিন্তু কবি-কর্মী এই অসাধারণ মানুষটিকে শুধু উর্দু কবিতাই স্মরণ করে রাখে নি, দেখে সুখী হয়েছি যে হায়দরাবাদের এক প্রশস্ত রাজপথ তারই নাম বহন করছে।

পার্টিকংগ্রেসের আনুষঙ্গিক এবং প্রগতি লেখক ও গণনাট্য সম্মেলনের অঙ্গীভূত বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তখন বোম্বাইয়ে হয়েছিল। বঙ্কিমবাবু এবং আমি সেখানকার বাঙালী সভায় বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম, কিন্তু প্রধান অভিজ্ঞতা হল সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গান, নাচ, অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কলায় পটু এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তরুণ কর্মীদের একত্র দেখে। পার্টির নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রদর্শনে পুরস্কারও দেওয়া হল— আমি

ছিলাম বিচারক মণ্ডলীতে, কেরালা, আন্ধ্র এবং বাংলা সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পেয়েছিল। সুভাষের গান : 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ / রুখবো দস্যুদলকে আজ / দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ / ভারতে ছুড়ে স্বরাজ' যখন বহুজনের কণ্ঠে ঘোষণা জানাল : 'আমরা নই তো ভীরুর জাত / দেবো নাকো হ'তে দেশ বেহাত / আজকে না যদি হানি আঘাত / দুষবে ভাবী সমাজ', তখন অবাঙালী শ্রোতারও মন হল উত্তাল। যখন বিনয় রায় স্বকীয় ভঙ্গীতে, উত্তর বাংলার গ্রাম্য সুরে ও কথায় তার স্বরচিত ডাক দিল : 'হোই হোই হোই / জাপান ঐ / আসে বুঝি / হামার টারীত্ / বার্যাও গাঁওয়ের / গেরিল্লা জুয়ান', তখন প্রকৃতই চোখের সামনে ফুটে উঠল সেদিনের জনতার সংগ্রামী মূর্তি। বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিনয় রায় তার 'গানের ঝুলি' ভরিয়েছিল, যা থেকে '৪৬ নং'-এ এক সভায় স্বনামধন্য সুরকার শচীন দেব-বর্মন কয়েকটা শুনে মেতে ওঠেন— যার একটা উদাহরণ হল : 'আল্লা ম্যাঘ্ দে পানি দে / ছাইয়া দে রে টুই / আশমান হইল টুটা ফুটা / জমিন হইল ফাডা / ম্যাঘ রাজা ঘুমাইয়া রইল / পানি দিব কেডা?' যা শুনে আব্বাস মুগ্ধ আর জোর করে তার এক নাটিকায় আমাদের বিজন ভট্টাচার্যকে সাজিয়ে তার মুখ দিয়ে এটা বলাল। পার্টি কংগ্রেসে প্রেরণার শিহরণ বয়ে গেল যখন গাওয়া হল 'ফিরাইয়া দে দে দে / মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে'—মালাবারের চার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কৃষকসন্তানের স্মরণে রচিত গানের শেষ কলি ঘুরতে লাগল হলের চারদিকে, ছাদ ভেদ করে আকাশে গেল ধ্বনি : 'চার কায়ুরের বদলে আজ ভাই / মোদের হাজার হাজার কায়ুর চাই / ফিরিয়া পাবো রে মোদের / কায়ুর শহীদেরে!' অনেক কথা মনে আসছে, যা লেখার স্থান নেই— মারাঠী নাটক, আমাদের বিচারে একটু যেন কাঁচা; পঞ্জাবী অভিনয়, যার সহজ বাস্তব স্বাভাবিকতা প্রায় যেন বিস্ময়কর, যদিও বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে মৌলিকতা কম; শিল্প প্রকৃতই 'মাটির কাছাকাছি' হলে যে সরসতা পায় তার চমৎকার নিদর্শন, বিহারের গ্রাম্যকবির ছড়া : 'কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বতাও / য়ে জগ্‌মে বড়া লুটেরোয়া হো / মালিক লুটে মহাজন লুটে / অওর লুটে সরকারোয়া হো!'

'জর্জ' বিশ্বাসের গান, শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি ও অভিনয়, চিত্ত-প্রসাদ ভট্টাচার্যের প্রচার-চিত্র, বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যোদ্দীপনা, সুভাষ

মুখোপাধ্যায়ের এবং অচিরে তারই অনুজ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্য সৃষ্টি— সেদিনের কম্যুনিস্ট জীবনে মস্ত একটা জায়গা নিয়েছিল, কোন্ এক ঐতিহাসিক ইন্দ্রজালে রাজনীতি আর সংস্কৃতির একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কও দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে কারো কারো অবস্থিতি অবশ্য বদলেছে, কিন্তু সেদিনের সত্য তাতে ব্যাহত হয় না। জানি না কখনো কোথাও কোনো রাজনৈতিক দলের মহাসম্মেলনকে উপলক্ষ করে '৪৩ সালের বোম্বাইয়ের সঙ্গে তুলনীয় কিছু অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা। এটা স্মরণ করে গর্ব একটু বোধ করছি, না বলে পারি না। রাজনীতিক্ষেত্রে সেদিন আমাদের বহু ধিক্কার শুনতে হয়েছে, কিন্তু তাতে অতিরিক্ত বিচলিত হই নি, নিজস্ব ভাবধারার ভিত্তিতে, ইতিহাসের প্রবাহের সঙ্গে মিলে থেকে দেশের মুক্তি অর্জন এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণের যে আহ্বান আমরা শুনেছিলাম তা আমাদের চিত্তকে পূর্ণ করে রেখেছিল। আমাদের মধ্যে দোষ আর দুর্বলতা নিশ্চয়ই আছে, রক্তমাংসের মানুষ আমরা সর্বথা শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ বলে দাবি কখনো করি না, কিন্তু কোথায়, কোন্ এক গভীরে, হয়তো সত্তার একটা সার্থকতার সন্ধান আমরা পেয়ে থেকেছি, আর সেজন্যই জানি যে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় আমাদের যে যাত্রা তার সুপরিণতি ও সাফল্যেও সংশয় নেই। লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে মার্ক্‌স্‌-এর উক্তি যে দীর্ঘকাল লাগবে আমাদের নিজেদেরই বদলাতে, গোটা সমাজকে বদলানো তো আরো দূরের কথা। চকিত চমকপ্রদ জয়ের আশার ছলনে পড়ব না অথচ একান্ত আস্থা পোষণ করব যে আমাদেরই সমবেত কর্মযজ্ঞের ফলে আগামী দিনের সূর্যোদয়ের মতো অকাট্যভাবে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটবে— এ-ই তো কম্যুনিস্টদের বৈশিষ্ট্য। অতিরঞ্জন হয়ে পড়ছে, কিন্তু না বলেও যে পারছি না যে সেদিনের পারিপার্শ্বিক প্রায়ই প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও আমরা মাথা নত করি নি, লেনিনের পার্টির সভ্য আমরাও বলে গর্ব করতে পেরেছি, রক্তপতাকার মর্যাদা রক্ষার প্রতিজ্ঞায় শৈথিল্য পরিহার করতে পেরেছি। দু'বছর আগে সমাজবাদী জার্মানীতে (জি.ডি.আর.) শুনলাম যে-ধ্বনি 'Wo ein Genosse ist, da ist die Partei' ('যেখানে একজন কমরেড, সেখানেই তো পার্টি'), তা ভারি ভালো লাগল, বেশ যেন চেনা মনে হল, স্মরণ করিয়ে দিল সেই-সব দিনের কথা যখন পার্টিগর্বে ভরপুর ছিলাম।

২২

'তোর সোনার ধানে/বর্গী নামে/দেখ্‌রে চাহিয়া' বলে চমৎকার যে গান তখন লেখেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, তার শেষে ছিল: 'ক্ষুধায় বুকে আগুন জ্বলে ভাই/সেই আগুনে তুষ্‌মনেরে করবো এবার ছাই/মরতে যদি আছি সবাই/মর্‌বো ভালো করিয়া'। আর একটা গানে 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান্‌ কিসান ভাই রে' বলেছিলেন কবি, কারণ 'ও কিষান তোর ঘরে আগুন/বাহিরে তুফান/বিদেশী সরকার ঘরে/দুয়ারে জাপান রে···'। এই উভয় সংকটের উৎকট মূল্য বাংলা আর বাঙালীকে দিতে হয়েছিল; তার জের সুদে আসলে আজও দিয়ে যেতে হচ্ছে, রেহাই মেলে নি। বোম্বাইয়ে পার্টি-কংগ্রেস সেরে কলকাতায় আমরা ফেরার মাস তিনেকের মধ্যে করাল এক ছায়া বাঙালী জীবনকে গ্রাস করতে চলল— ইংরেজ শাসক নিছক নিজের স্বার্থে জাপানকে রুখতে চেয়েছিল, কিন্তু বাঙালীর ওপর তার একতিল বিশ্বাস ছিল না, তাই হাজার সরকারী দৌরাত্ম্য ঘটল, জাপানীর হাতে পড়বে ভয় করে চালু হল এক অমানুষিক 'denial policy', বৃহৎবঙ্গের বহু অঞ্চলে যানবাহনের প্রধান উপায় নৌকা কেড়ে নেওয়া হল, জ্বালামুখী যুদ্ধব্যবস্থার উদর পূর্তির জন্য বাংলার মাটির সর্ববিধ ফসল চলে গেল সরকারী গুদামে আর মজুতদারের গহ্বরে, দেখা দিল অদৃষ্টপূর্ব মুনাফাখোরের ঝাঁক, যাদের কাছে সুনীতি, মানবতা, দাক্ষিণ্য বলে কোনো অনুভূতির স্বীকৃতি ছিল না। অর্থ যে মানুষকে পিশাচ করে তোলে তার অজস্র দৃষ্টান্ত সামনে এল, সর্ববিধ মূল্যবোধ বিলুপ্ত হতে চলেছিল। যেন বহু যুগ ধরে জমে থাকা পাপের শাস্তি হিসাবে এল 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', বিদেশী শাসনের দানবীয়তা আর স্বদেশী বণিকবর্গের অমানুষিকতা মিলে কদর্য অনাসৃষ্টি আনল, যার স্মৃতি প্রত্যক্ষদর্শী আমরা মন থেকে মুছে ফেলি কেমন করে?

বিশ্বযুদ্ধ তখন এমন পর্যায়ে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন এমন যে প্রায় হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় আমরা পড়েছিলাম, যুগপৎ সাম্রাজ্যতন্ত্রী দুঃশাসন এবং তারই আশ্রিত লোভলোলুপ ভারতীয় দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে সফল

ব্যাপক সংগ্রাম সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস নেতারা তখন কারাগারে; মুসলিম লীগ ক্রমশ মুসলিম জনতার অধিকাংশকে আন্দোলনের মূল প্রবাহ থেকে দূরান্তরিত করেছে; তুলনায় স্বল্পশক্তি আমরা শুধু নিজের জোরে দেশের দুরবস্থার সুরাহা করতে অসমর্থ বলে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি কংগ্রেস-লীগের বেয়াড়া ঝগড়া মিটিয়ে ইংরেজ সরকারের দৌরাত্ম্য রোধের জন্য আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি যে বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীনের জাজ্বল্যমান্ ভূমিকার প্রভাবে ইতিহাসে নতুন পরিপ্রেক্ষিত উন্মীলিত হবে, ভারতবর্ষের মতো দেশের শৃংখলমোচন ঘটবে। এই পঙ্গু অসামর্থ্যের মূল্য সব চেয়ে বেশি দিতে হল বাংলাকে— পঞ্চাশের মন্বন্তরে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালীর প্রাণ গেল, হাহাকারে চারদিক ছেয়ে গেল, কারা যেন খুলে দিয়েছিল যন্ত্রণার অন্নসত্র, গ্রাম থেকে দলে দলে এল দুঃখীজন, এল শুধু একটু অন্নের প্রত্যাশায়, মুমূর্ষু আর মৃতের মেলা বসে গেল কলকাতার মমতাহীন পথে ঘাটে।

এই 'মন্বন্তর' সম্বন্ধে '৪৫ সালে 'উড্‌হেড্' কমিশনের যে অনুসন্ধান ফল প্রকাশ হয় তা থেকে জানা গিয়েছিল যে '৪৩ সালে কৃত্রিম কারণে চালের দাম বাড়িয়ে মুনাফাখোরেরা দেড়শো কোটি টাকা বাড়তি লাভ করেছিল। কোনো সন্দেহ নেই যে সরকারী যোগসাজশেই এই ঘটনা সম্ভব হয়েছিল। এ-ধরনের দৌরাত্ম্য নিবারণে আমাদের অসামর্থ্যও যে অপরাধ তা না বলে পারছি না। উড্‌হেড্ কমিশনের রিপোর্টে রয়েছে (উদ্ধৃতিটা পেলাম বর্তমানে '৭৪ সালে দেশের খাদ্যসংকট বিষয় লিখিত এক প্রবন্ধ থেকে): 'দেশবাসীর মাত্র একাংশ অনশনের যন্ত্রণা ভোগ করেছিল— তারা হল গ্রামাঞ্চলের গরীব। বৃহত্তর কলকাতা এবং অন্যত্র অবস্থাপন্ন ব্যক্তি আর কারখানা শ্রমিকদের '৪৩ সালে খাদ্যাভাবে কষ্ট পেতে হয় নি।' কিছু অতিরঞ্জন এতে রয়েছে; কষ্ট তাদেরও হয়েছিল, তবে মারাত্মক কিছু নয়। যারা ধনী তাদের কথা না-হয় থাক্, কিন্তু বেশ মনে আছে যুদ্ধায়োজনের স্বার্থে এমন ব্যবস্থা হয়েছিল যে রেল কিম্বা কলকারখানায় নিযুক্ত লোকেরা মস্ত ঝুলি ভরে চাল-আটা নিয়ে যাচ্ছে অথচ দোকান খালি কিন্তু সংগোপনে চড়া দামে লেনদেন চলেছে আর শহরের সর্বত্র বুভুক্ষুর হাহাকার, পেটের জ্বালায় গ্রাম-থেকে-চলে-আসা আবালবৃদ্ধবণিতা নির্জীব, মৃত্যুর অপেক্ষায়

সময় গণনারও সাধ্য তাদের নেই। 'এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক, মুখে' ভাষা দেবার শক্তি তখন আমরা দেখাতে পারি নি ; পার্টি দফ্‌তরের কাছেই বৌবাজার মোড়ে সারি সারি সুখাদ্যের দোকানের সামনাসামনি ছিন্নমূল নিঃস্ব বাঙালী দলে দলে পড়ে থেকেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়তো কোনো শিশুর শব অবহেলায় ছড়িয়ে থেকেছে, দৌড়ে গিয়ে কেউ সাজিয়ে রাখা খাবার কেড়ে নেবার চেষ্টা করে নি, যতদিন সম্ভব কোনোক্রমে প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্ করেছে তারপর সব-কিছুর নিষ্পত্তি। অদৃষ্টবাদী মানুষ ভাগ্যকে মানে, দোষ দেয় না, বিধাতার স্তুতি করে, তাকে ভর্ৎসনা করে না ; 'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে' বলা তখন সম্ভব হয় না। যাকে বলা হয় 'food riots', তা তখন তাই একেবারে হয় নি— হয়তো বা সচেতন রাজনীতি যারা করে তাদেরও হিসাব ছিল যে ও পথে সুরাহা নেই— কিন্তু বাস্তবিকই আশ্চর্যের কথা যে যন্ত্রণার শেষ সীমায় পৌঁছেও নিঃস্ব বাঙালী তখন সহ্য করে গেছে, যতদিন পেরেছে চেষ্টা করেছে 'মাগো একটু ফ্যান' বলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে, তারপর নিয়েছে আকাশের নীচে মাটির আশ্রয়। বোধ করি এ-ঘটনা আজ অকল্পনীয়, কিন্তু সেদিন ঘটেছিল। মাঝে মাঝে ভেবেছি —নিজেদের মধ্যে বলাবলিও করেছি— যে হয়তো অতিবৃদ্ধ এই দেশের মানুষের যুগযুগান্তর ধরে অর্জিত এমন স্থৈর্য আছে যে সাময়িকভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দোকান লুঠ করতে মন সায় দেয় না। যাক্ সে কথা, এখানে শুধু স্মরণ করি কম্যুনিস্ট পার্টি-সমেত সবাই তখন এমন সংকটে পড়েছিলাম যে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-এর মতো মনুষ্যত্বের অত বড়ো অপমানকে হজম করতে বাধ্য হয়েছি।

এই সময় যখন কৃষকের ফসল সরকার নিয়ে গেল যুদ্ধের অগণিত প্রয়োজনে আর সরকারের কাছে সরবরাহকারী এক নতুন ধরনের রক্তচোষা ব্যবসায়ী দল গড়ে উঠল, শিল্পাঞ্চলকে মোটামুটি ঠিক রাখার জন্য যখন সরকার 'রেশনিং' চালু করল, তখন গ্রাম অঞ্চল হয়ে পড়েছিল অসহায়। খাদ্য-সংকটের সাথী হয়ে বস্ত্র ও সর্ববিধ অত্যাবশ্যক বস্তুর সংকট হাজির হল। পার্টি উদ্যোগী হয়ে, বিশেষ করে কলকাতা আর আশপাশে, খাড়া করল জনরক্ষা আন্দোলন, মহিলা কর্মীরা বিশেষভাবে এগিয়ে এলেন, আমার ঘনিষ্ঠদের মধ্যে স্নেহাংশু আচার্যকে 'জনরক্ষা'-র কাজে নেওয়া হল, সকলেরই কম-বেশি যোগ

দিতে হল। মজুতদার-বিরোধী লড়াই তখন আরম্ভ হয়েছে ; লঙ্গরখানা খোলা থেকে গ্রামের ধান গ্রামে ধরে রাখার জন্য ধর্মগোলা গঠন আর মজুতদার চোরা কারবারী-পুলিশ যোগসাজশ ফাঁস করার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চলেছে। এভাবে ঐ দুর্দিনে পল্লী অঞ্চলে কৃষক সংগঠন বেড়েছে, অনেক জঙ্গী কর্মী খুঁজে পাওয়া গেছে— বহু ঘটনা ঘটেছে, যাতে পুলিশ লোভী বদ্‌মায়েসদের পক্ষ নিয়ে কৃষক কর্মীদের নির্যাতন করেছে, জেলে পুরেছে কিন্তু শায়েস্তা করতে পারে নি, মনোবল ভাঙতে পারে নি। কিছুটা মনে আসছে যে দিনাজপুরের মতো জেলার কোথাও কোথাও কৃষক 'ভলন্টিয়ার' দল সারা রাত হাটে বাজারে পাহারা দিয়েছে যাতে চোরা কারবারী পার না পায়, মজুত ধরে এনে কৃষক সমিতির তদারকিতে সস্তায় কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছে, মেয়ে পুরুষ সকলের সাহায্য নিয়ে অতর্কিত পুলিশ আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক থেকেছে, অনেকে জেলে গেছে, অত্যাচার সহ্য করেছে, বেরিয়েছে সুদক্ষ, সচেতন কর্মী রূপে। ময়মনসিংহ জেলায় আদিবাসী হাজং-দের অঞ্চল এবং কাছাকাছি এলাকায় কিছু পরে যে লড়াই তার গৌরব তো সহজে ভুলে যাবার নয়— তার পত্তনও ঐ দুর্দিনে। একটু পরবর্তী বিষয়ের উল্লেখ এখানেই করি। কারণ ১৯৪৬-এর 'তেভাগা'-সংগ্রাম, যা সারা বাংলায় আর বিশেষ করে উত্তরে, বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল, বহুজনের কারাবাস ও মৃত্যুবরণে যার প্রদীপ্ত প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, তার একটা প্রধান উৎস হল '৪৩-৪৪ সালে কৃষকদের মজুতদার-বিরোধী প্রয়াস। '৪৪ সালে বোধ হয় দিনাজপুরে বসে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন আর '৪৫-এ ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত কৃষকসভার অধিবেশন। মজুতদারী চোরা কারবারীর মতো যে দুর্বৃত্তির সঙ্গে আজও আমাদের অনিবার্য এবং নির্দয় পরিচয় চলেছে, তার প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। আর তার বিপক্ষে লড়াইয়ে পুরোগামী ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণে বাংলার কৃষক আন্দোলন। এ ঘটনা থেকে আজকের কর্তব্য সম্বন্ধে দেশবাসী সচেতন ও সক্রিয় হতে পারে নিশ্চয়ই।

যেখানে আমার গতিবিধি ছিল অবিরাম, সেই '৪৬ নং' ধর্মতলা স্ট্রীটে দেশব্যাপী তখনকার বিভীষিকার মোকাবিলা করছিলেন লেখকশিল্পীকুল। সেদিনের দুঃসহ বাস্তবকে স্বীকার না করে তার বিপক্ষে নির্ভীক লড়াইয়ের

উদ্দীপনা ছিল বিবিধ শিল্পসৃষ্টিতে। ফিরিস্তি দিচ্ছি না, কালানুক্রমে তথ্য সাজাচ্ছি না। কিন্তু তখনই প্রকাশ হয়েছিল তারাশঙ্করবাবুর 'মন্বন্তর' (যার ইংরিজি তরজমা আমি করি 'Epoch's End' নাম দিয়ে), বেরিয়েছিল গোপাল হালদারের সুবৃহৎ উপন্যাস (তিন খণ্ডে), মানিকবাবুর অসংখ্য শাণিত গল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা প্রমুখের বহু মর্মস্পর্শী কাহিনী। ('৪৬ নং' এদের সবাইকে টানত; নারায়ণবাবু অকালে চলে গেছেন আর ননী ভৌমিক আজ বহুদিন সোভিয়েট প্রবাসী হয়ে মৌলিক রচনা প্রায় ছেড়েছেন, এ যে একটা বড়ো খেদ!)। শিল্পীর তুলিতে জয়নুল আবেদিন, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, রথীন মৈত্র, চিত্ত প্রসাদ, সোমনাথ হোড় প্রভৃতি, ক্যামেরা নিয়ে সুনীল জানা, শম্ভু সাহা সেদিনের ভয়ংকর চেহারাকে কালজয়ী আকৃতি দিয়ে রেখেছেন, চরম দুর্গতিকে অতিক্রম করার মহিমাও যে মানুষের রয়েছে তার আভাস ফুটিয়েছেন। মন্বন্তরের সঙ্গে হয়তো বলা যায় যে সবচেয়ে প্রচণ্ড পাঞ্জা লড়েছিল সদ্যপ্রতিষ্ঠিত গণনাট্যসংঘ (আই.পি.টি.এ.)— যদি কেউ ভাবেন যে তোপের সামনে গান জুড়ে দেওয়াটা বিল্‌কুল বাতুলতা তো নাচার, বরঞ্চ মনে রাখতে হবে যে অভাবনীয় দুর্দশার চাপে দেশবাসী যখন ম্রিয়মাণ তখন মানুষের নিজের ওপর আস্থা আর গোটা সমাজের বিবেক জাগিয়ে না তুলতে পারলে সর্বৈব ব্যর্থতা ছিল অবধারিত। কম্যুনিস্ট পার্টি এ-ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিল; পার্টি সম্পাদক পূরণ চন্দ্‌ জোশীর আগ্রহ ছিল অপরিসীম; *Who lives if Bengal dies?* বলে মর্মস্পর্শী পুস্তিকা সে তখন লিখল; গণনাট্যসংঘের এক সমুজ্জ্বল দল ভারত-পরিক্রমা তখন করেছিল, বাংলার যন্ত্রণা আর জীবন-প্রতিভাকে একই সঙ্গে সারা দেশে পৌঁছে দিয়ে অগণিত ভারতবাসীর প্রাণকে আকুল করেছিল।

বিশ্ববরেণ্য চিত্রকর পিকাসো ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে বলেছিলেন: 'চিরকালই আমি নির্বাসিত। আজ আমার নির্বাসন ঘুচল।' একটু অহংকার নিয়েই বলি যে মানিকবাবু এভাবেই ভেবেছিলেন। লঘু নয় গভীর চিন্তারই এই ফল। তেমনি এই সময় পার্টির সঙ্গে অনেকটা একাত্ম হতে পেরেছিলেন বহু গুণী, যারা সচরাচর রাজনীতি বলতে যা বোঝায় তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান্। পিকাসো বুঝি বলেছিলেন: 'ছবি আঁকা শুধু ঘর সাজানোর জন্য নয়: ছবি হচ্ছে হাতিয়ার, লড়াইয়ের অস্ত্র, যা দিয়ে আমি

আত্মরক্ষা করি, শত্রুকে আঘাত করি।' শিল্পকে অস্ত্র বলে স্থির করে নিয়ে আমরা কম্যুনিস্টরা অবশ্যই মাঝে মাঝে মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছি, '৪৮-৪৯ সালে দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা সম্বন্ধে উৎকট অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছি, কিছু কটুবাক্যও কেউ কেউ ব্যবহার করেছি। কিন্তু পিকাসো যে মূল কথাটি বলেছেন, তাই যেন সকলের মনে থাকে। আতিশয্য অবশ্যই বর্জনীয়, কিন্তু মাটির পৃথিবীতে মানুষের ব্যবহার একেবারে নিখাদ হয় কেমন করে? সময়বিশেষে কিঞ্চিৎ আতিশয্যই হয়তো স্বাভাবিক, নয় কি? আমাদের অপরাধ ক্ষালনের জন্য নয়, তবে শুধু সম্যক্ উপলব্ধির প্রত্যাশা নিয়ে উদ্ধৃত করব রুশসাহিত্যের ইতিহাসের একটি ঘটনা যা Isaac Deutscher-এর লেখা থেকে জেনেছি। 'Populist' আন্দোলনের কবি Nekrasov-এর সমাধিস্থলে যখন স্বয়ং ডস্টয়েভ্স্কি এক উচ্ছ্বসিত (এবং কিঞ্চিৎ ভণ্ড) স্তুতি জানিয়ে Pushkin-এর সঙ্গে তাঁর তুলনা করেন, তখন প্লেখানভ্ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন পুশকিন্-এর দৌড় তো ছিল এই যে তিনি 'sang of the toes of ballerinas!'

* * *

ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ বলে প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছিল —প্রগতি লেখক সম্মেলনের দ্বিতীয় সর্বভারত সম্মেলনের পর কেমন যেন ঝিমিয়ে-পড়া ভাব এসেছিল, কিন্তু তাকে না কাটিয়ে উপায় রইল না যখন ৪২ সালের ৮ই মার্চ তারিখে মর্মান্তিক এক ঘটনা থেকে বোঝা গেল সেদিনের নিদারুণ বিপদ। ঐদিন ঢাকায় তরুণ সোমেন চন্দ ফ্যাশিস্ট ঘাতকদের সুপরিকল্পিত আক্রমণে নিহত হলেন, অকালে নিভে গেল বাংলা সাহিত্যে এমন এক প্রতিভা যার মধ্যে দেখা গিয়েছিল মহত্ত্বের সুস্পষ্ট আভাস, সঙ্গে সঙ্গে সরল, সবল, সজাগ এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব যা পরাধীন নিপীড়িত সমাজে নির্বিত্তের মুক্তিপ্রয়াসে লিপ্ত হয়ে সকলের সমাদর পেয়েছিল। প্রকৃতই সোমেন চন্দ রেল আর সূতাকল শ্রমিক থেকে বিদগ্ধ কলাবিদ্ পর্যন্ত বহুজনের একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এই কদর্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মার্চ মাসের শেষাশেষি কলকাতায় ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক সম্মেলন হল, যোগ দিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রভৃতি খ্যাতনামা— বলাই বাহুল্য যে

গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, অরুণ মিত্রের মতো ব্যক্তি সাগ্রহেই ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ স্থাপনে অগ্রসর হলেন। '৪৩ সালে সম্ভবত এই সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে তারাশঙ্করবাবু সভাপতিরূপে যে ভাষণ দেন তার কিয়দংশ ইংরিজীতে অনুবাদ করে পার্টি পত্রিকায় ছাপাই, পরে আমার সম্পাদনায় *U S* নামে এক সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করি। সোমেন চন্দ-এর অসামান্য গল্প 'ইঁদুর' আই সি.এস. অশোক মিত্রের অনুবাদে ছাপা হয়, এটিই লেখকের সবচেয়ে স্মরণীয় রচনা। খুব তাড়ার মধ্যে *U S* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বলে কিছু মুশকিল ঘটে; তারাশঙ্করবাবুর অনুমতি চাওয়া হয় নি বলে তিনি একটু রুষ্ট হয়েছিলেন, সংকলন যথাযথভাবে সেদিনের পক্ষে প্রতিনিধিমূলক হতে পারে নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। বোম্বাইয়ের কাগজে সমালোচনা প্রসঙ্গে খাজা আহ্‌মদ আব্বাস সংগতভাবেই আপত্তি জানান: 'U S, Professor Mukerjee? Why not all of us?' যাই হোক, নানা বিষয়ে লেখার ধান্দায় তখন থেকেছি, যেমন রয়েছি আজও— '৪৩ সালে প্রকাশ হল আমার 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' এবং *China Calling* বই দুটি, সঙ্গে সঙ্গে তখনই বোধ হয় তরজমা শুরু করি 'সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টি' (বলশেভিক)-র ইতিহাস, অবিশ্বাস্য মনে হলেও রিপন কলেজ এবং বার লাইব্রেরির টেবিলে গল্পগুজবের মধ্যেই কলম চালাতে হত, মাঝে মাঝে ঠাট্টার আল্‌গা খোঁচা খেতাম।

'পরিচয়'-এর পরিচালনাভার সুধীনবাবু '৪৪ সালের শেষের দিকে তুলে দেন ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখকসংঘের হাতে— এ থেকে অন্তত অনুমান অমূলক নয় যে কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপ তাঁর অপছন্দ হলেও নিজের সাধের পত্রিকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়াটা তাঁর উদার চিত্তবৃত্তি এবং আমাদের প্রতীতি বিষয়ে কথঞ্চিত শ্রদ্ধারই নিদর্শন! 'পরিচয়' আড্ডার চেহারা ইতিমধ্যে বদ্‌লে গিয়েছিল; চারুচন্দ্র দত্ত, (অধ্যাপক ও কবি) সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, বসন্তকুমার মল্লিক প্রমুখ প্রবীণ তখন আর নেই; 'আই.সি.এস.' মজিদ রহিম (স্যর আবদুর রহিমের পুত্র, বর্তমানে পাকিস্তানে একজন প্রধান) সুধীনবাবুর বন্ধু হিসাবে মাঝে মাঝে আসেন, আলোচনা ভিন্নপথে যায়; চীনবিদ্যাবিশারদ প্রবোধচন্দ্র বাগচী কদাচিৎ আসতে পারেন; কথনপটু হারীতকৃষ্ণ দেব 'পরিচয়'-এর ক্রমশ পরিবর্তমান

পরিবেশে স্বচ্ছন্দ হয়ে বসেছেন, কিন্তু যেন চেষ্টা ক'রে; গিরিজাপতি ভট্টাচার্য বা সুশোভন সরকারের মতো ব্যক্তি 'পরিচয়'-এর অজানা সংক্রমণে সেতুর মতো রয়েছেন; হাবুলবাবু (হিরণকুমার সান্যাল) পূর্বাপর অধ্যায়ে সমানভাবেই সহজ ও সহর্ষ; নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, অমরেন্দ্র-প্রসাদ মিত্র 'পরিচয়-এর নবপর্যায়ে আস্থা আর নিষ্ঠা আর কর্মশক্তি নিয়ে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন। ইতিমধ্যে বিষ্ণু দে-র ঈষৎ শ্রান্ত অথচ অবিরাম জীবনায়ন চলেছে, চোরাবালি থেকে খুঁজে পেলেন জোয়ারের তীব্র স্পর্শ, কবিতায় তাই ঘোষণা : 'তবে কেন আজ শেষ শ্রেণীসংঘর্ষে / নেতি প্রতিষ্ঠ সন্দেহ আর ভয়? / লোকায়তে দাও লোকোত্তরের তীর্ণ / প্রসাদ, গোষ্ঠীদম্ভ যেখানে দীর্ণ /।' তাই বোধ হয় '৪৪ সালে প্রকাশিত 'সাত ভাই চম্পা'-তে রয়েছে শান্ত আবেগ : 'এ মাহ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে / চকিতে দেখাও জনগণ মনে সুখ / মুক্তি! মুক্তি! চিনি সে তীব্র সুখ / সাত ভাই জাগে নন্দিত দেশ-দেশ /।' একটু যেন নেপথ্যে এখানে বলে রাখি যে আমাদের মধ্যে কড়া এবং গোঁড়া ধরনের কেউ কেউ বিষ্ণুবাবুর লেখার হদিশ ঠিক পেতেন না; আশ্চর্যও নয় কারণ নিজের নিছক পুলক কিম্বা অন্য কোনো খেয়ালে প্রায় অজ্ঞেয় আর অবোধ্য হয়ে উঠতে তাঁর বাধত না (মহৎ লেখকের এই licence, আর্ষপ্রয়োগের অধিকার যাকে বলা যেতে পারে, তা বিনয় ঘোষের মতো সমালোচক বিষ্ণুবাবুর ক্ষেত্রে কখনো স্বীকার করেন নি)— মাঝে মাঝে পার্টিলেখক মহলে একটু এই নিয়ে বিস্বাদ আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিষ্ণুবাবুর কবিতার তেমন সমঝ্‌দার না হয়েও অনুরাগী বলে পরিচিত আমার অবস্থা দুই পক্ষের মাঝখানে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, হয়তো বা কমরেড ভবানী সেন ব্যাপারটা সামলে দিয়েছেন। একথা মনে আসছে কারণ সেদিন থেকে আজ, গঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে, 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত'-এর কবি তৃপ্ত-অতৃপ্ত ত্রিশঙ্কু সত্তার চেতনা থেকে যেখানে উত্তীর্ণ সেখানে জনতার সীমাহীন শক্তিতে তিনি আস্থাবান্, শান্তি এবং আনন্দের মতো মানুষের সবচেয়ে কঠিন ও গভীর অন্বিষ্ট যে মর্ত্যলভ্য তাতে তিনি নিঃসংশয়—কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে এই নির্লিপ্ত লেখকের তাই স্বজন-সম্পর্ক, সেখানে ছেদ নেই, তুচ্ছ মতান্তর তাতে ইতরবিশেষ ঘটায় না।

কলেজে আমাদের দলে বিভিন্ন প্রকৃতির যারা ছিলেন, তাদের কথা কিছু

আগেই বলেছি। '৪৪ সালে স্বদেশী গানের ছোটো একটা সংকলন করি, জ্যোতিরিন্দ্র-সুভাষ প্রভৃতির রচনাও তাতে ছিল, সহায়তা পেলাম বয়োবৃদ্ধ কিন্তু তেজস্বী অধ্যাপক বিজয়কুমার রায়ের কাছে। আজকের যশস্বী অর্থ-নীতিবিদ্ ভবতোষ দত্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে গেলেন, ক্রমশ বিষ্ণুবাবু এবং নন্দলাল ঘোষও গেলেন, কিন্তু শেষোক্ত দু'জনের সঙ্গে যোগাযোগ অটুট রইল, পার্টিপুস্তকালয় ন্যাশনাল বুক এজেন্সির মতো জায়গায় মোলাকাৎ হতে থাকল। নন্দবাবু প্রচণ্ড যুক্তিবাদী মানুষ, বিতর্কের বিষয়ের অভাব কখনো হত না তাঁর সঙ্গে, তবে পার্টি সম্বন্ধে সমালোচনা থাকলেও কটু বিরূপতা দেখতাম না, নানা ব্যাপারে সহায়তাও মিলত। কলেজ কাউন্সিলে কিছুকাল শিক্ষক প্রতিনিধি হয়ে কাজ করার ফলে জানলাম অনেক জিনিস, মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানবুদ্ধি একটু বাড়ল, সুখকর না হলেও তার প্রয়োজন ছিল। ইতিমধ্যে রাধারমণ মিত্র এবং ব্যারিস্টার অরুণ সেনের মধ্যস্থতায় পরিচয় পেলাম কবি সমর সেনের পিতা অরুণচন্দ্র সেনের— এককালে অধ্যাপক এবং প্রচণ্ড রবীন্দ্রভক্ত, পরে রবীন্দ্রবন্দনার বিপক্ষে খড়্গহস্ত, একদা পিতা দীনেশ চন্দ্র সেন সম্বন্ধে অবজ্ঞা পোষণের পর্যায় পার হয়ে অবশেষে যেন কতকটা স্থিতধী, নিখাদ মার্কসবাদে উৎসাহী হয়ে তৎকালীন সর্ববিধ সমাজবাদী প্রচেষ্টার দৈন্য দেখে তিক্ত বিরক্ত, লিখলেন 'মর্মান্তিকা' নামে একটা সংক্ষিপ্ত উপন্যাস (যা তাঁর ছাত্র স্নেহাংশু আচার্য নিজব্যয়ে ছাপাল, শিল্পের বিচারে ত্রুটি সত্ত্বেও যে রচনাটিতে ছিল অধৈর্য এবং সততার ছাপ), কিছুটা খাপছাড়া অথচ অবৈকল্যগুণে মণ্ডিত, বিরল এক মানুষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগে নূতন কয়েকজনকে জানলাম, যাদের মধ্যে ছিলেন হিন্দীর অধ্যাপক শুক্ল, রক্ষণশীল কিন্তু আমুদে আর মিশুক। এই সময়ে চিনলাম রিপন কলেজে উর্দু-অধ্যাপক, প্রকৃত মহাজন, পরভেজ শহীদীকে। এর অকালমৃত্যুতে শুধু উর্দু কবিতা নয়, সারা দেশের সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে— বেশ বোঝা যেত পরভেজের রচনার স্বচ্ছ অথচ গভীর ব্যঞ্জনা, নতুন যুগের বাঙালী কবিদের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য, জীবনব্যাপারে অশেষ আগ্রহ, আবেগে স্থির অথচ একটু যেন সংকুচিত, সব-কিছুর ক্ষণভঙ্গুরতায় যেন কাতর, পার্টির ডাকে সাড়া দিতে কবি হিসাবেও উদ্গ্রীব, কিন্তু প্রায়ই একটু বিচলিত, অথচ আহত হয়েও শৃংখলা মানতে খুশিমনে রাজী। পরভেজ-এর উর্দু

কবিতার ইংরিজী তরজমা করেছিলেন আইয়ুবের দাদা, ডাক্তার গণি, যার কম্যুনিস্ট সত্তাকে চিনতে আমাদের দেরি হয়েছিল— বোধ করি সেই সত্তাকে পুষ্ট করেছিল এমন ধরনের সহৃদয়তা যার সঙ্গে কাব্যাসক্তিরও একটা সম্পর্ক ছিল।

অনেকগুলো পাতায় সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর উল্লেখ করি নি বলে খারাপ লাগছে, কারণ এমন ভাবে সবাই তাঁকে ভুলে বসেছে যে ভয় হয় বুঝি অলক্ষ্যে আমিও ভুলতে বসেছি, কিন্তু না, তা সম্ভব নয়— আজও মনীষা গ্রন্থালয়ের আড্ডায় অনিল কাঞ্জিলালের সঙ্গে কথায় কোনো-না-কোনো সুবাদে সুরেন-বাবুর নাম উঠবেই, আর হয়তো চিন্মোহন সেহানবীশ সুরেনবাবুর লেখাগুলো জড়ো করার কাজ সম্বন্ধে কিছু বলবেন। সোভিয়েট সুহৃৎসমিতি, ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী আন্দোলনে সুরেনবাবু একজন পুরোধা সর্বদাই ছিলেন; 'পরিচয়' আড্ডায় নিজেকে ঠিক মানানসই ভাবতে না পারলেও তাঁর স্থান ছিল বিশিষ্ট; তীক্ষ্ণ যুক্তিসিদ্ধ, সুসন্নিবদ্ধ ভাষণে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল বিশাল; তত্ত্বগত আলোচনায় তাঁর সমকক্ষ বড়ো একটা কাউকে দেখি নি; কিন্তু কেমন যেন একক ছিল তাঁর স্বভাব, ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যাও ছিল, কোথা থেকে রাজ্যের বিষাদ মাঝে মাঝে মনকে দখল করত, তখন বন্ধুদের সান্নিধ্য চাইতেন না, নিজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। বঙ্গবাসী কলেজে এবং পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগে অধ্যাপকরূপে চারদিকে সুনাম, কিন্তু জীবনযাত্রায় নিয়ত সমস্যা— হঠাৎ যখন স্কট লেনে বঙ্গবাসী কলেজ হস্টেলে থাকতেন, তখন কাল বসন্ত রোগ তাঁকে ধরল, যথাযথ চিকিৎসার পূর্বেই জীবনান্ত ঘটল, সমুজ্জ্বল একটা আলো নিভে গেল কিন্তু প্রায় এমন নেপথ্যে যে ব্যক্তিজীবনের অকিঞ্চিৎকরতাই যেন মৃত্যু দিয়ে ঘোষণা করে গেলেন। ১৯৪৪ সালে এই দুর্ঘটনা, দিনতারিখ মনে পড়ছে না, ইন্দোসোভিয়েট জার্নালে এবং 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিকে তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলাম, তাও হাতের কাছে নেই। মহৎ কীর্তির সম্ভাবনা লুপ্ত হল, বাস্তবিকই এক স্মরণীয় বাঙালী মনস্বী চলে গেলেন।

'৪৪ সালের শেষ দিকের একটা হাস্যকর ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নানা সুবাদে সাক্ষাৎ করতে হত সেযুগে; রাজনীতি ব্যাপারে একেবারে অকাট্য মতানৈক্য সত্ত্বেও তাঁর

চরিত্রে একটা ব্যাপ্তি ছিল যেজন্য টানতে তাঁকে পেরেছি এমন ক্ষেত্রে যেখানে সহজে হয়তো তিনি রাজী হতেন না— দৃষ্টান্ত হল সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির আম-জমায়েতে তাঁকে আনা। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' যখন প্রকট, তখন 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' তিনি গঠন করেন; আমাদের উদ্যোগে ছিল জনরক্ষা সমিতির বিবিধ কার্যক্রম; কিছুটা সহযোগিতা স্বভাবতই তখন ছিল। যাই হোক্, পার্টির ইংরিজী সাপ্তাহিকে 'Shyamaprasad over Calcutta University' বলে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ হয়, যেটার রচনাভার পেয়েছিলাম আমি (অপর কমরেডদের সহায়তায়)। স্বজনপোষণের যে ধারা স্বয়ং আশুতোষের কাল থেকে চলে আসছিল, পুত্র শ্যামাপ্রসাদের কর্তৃত্বে সেই কলঙ্ক মোচন দূরে থাক বরং ঘনীভূত হওয়ায় শিক্ষাবিষয়ে আগ্রহীদের মনে যে চাঞ্চল্য জেগেছিল তারই প্রকাশ ছিল প্রবন্ধে— সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ-বাবুর মতো মূলগতভাবে প্রগতিবিরোধী অথচ সৌজন্য, বুদ্ধি বিবেচনা ও কর্মনৈপুণ্যের জোরে শিক্ষিত হিন্দুদের মনোমত মুখপাত্রের প্রভাবকে আঘাত করার উদ্দেশ্যও ছিল। আশুতোষের পরিবারস্থ কয়েকজনই তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সর্বেসর্বা— কর্মচারীদের কাছে তাঁরা ছিলেন 'বড়বাবু', 'মেজবাবু', 'জামাইবাবু', সাবেক জমিদারি গৃহস্থালীই যেন সেখানে প্রচলিত! আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো বহুগুণান্বিত ব্যক্তি যে কোনো দেশেই দুর্লভ, কিন্তু নিজ নামের সঙ্গে সংগতি রেখেই বুঝি তিনি স্তুতিতে তুষ্ট হতেন বড়ো বেশি, আর আমাদের সমাজে বিদ্বজ্জন বিদ্যাগর্ব ভুলে গিয়ে ক্ষমতা ও সাফল্যের কাছে সহজে কুর্নিশ করেন বলে খোসামোদের একটা রেওয়াজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া নোংরা করেছিল। সত্য ঘটনা একটা বলছি, বিশ্ববিদ্যালয়েরই এমন একজন কর্মচারীর মুখে শোনা যাকে আমি পূর্ণ বিশ্বাস করি। শ্যামাপ্রসাদ যখন ভাইস্ চ্যান্স্‌লর, তখন সমাবর্তন দিবসের পূর্ব দিনে সেনেট হাউসে (যে বাড়ি ভেঙে আজ গ্রন্থালয় ভবন নির্মিত হয়েছে) 'মাইক্রোফোন্' পরীক্ষার জন্য স্বয়ং ভাইস্‌চান্স্‌লর গিয়েছিলেন আর স্বভাবতই সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন হোমরাচোমরা। তাঁদের মধ্যে একজন, যিনি শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষকস্থানীয় এবং বয়সাধিক্য সত্ত্বেও বহু বৎসর ধরে একটি বিভাগের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সাধারণ কর্মচারীদের সরিয়ে বলেন যে তিনি নিজেই যন্ত্রটি পরীক্ষা করবেন, আর রেওয়াজ-মাফিক '১, ২, ৩'

বলে আওয়াজ যাচাই না করে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ করলেন, যার বক্তব্য হল যে পুণ্যশ্লোক আশুতোষের মৃত্যুতে আশঙ্কা হয়েছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে কিন্তু বিধির প্রসাদে তাঁর সুযোগ্য সন্তান শুধু পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ নয়, অভূতপূর্ব প্রতিভা নিয়ে কাজ করে চলেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি! মনে রাখতে হবে যে এই বক্তৃতার শ্রোতা মাত্র কয়েক জন, যারা প্রায় সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধস্তন কর্মী, কিন্তু স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদের উপস্থিতির এমন সুযোগ হেলায় হারাবার পাত্র ছিলেন না বয়োবৃদ্ধ এই বিদ্বান্!

কথা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আরো বলতে চেয়েছিলাম যে সম্ভবত কম্যুনিস্ট পার্টির পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশের ফলে নিখিল চক্রবর্তী এবং আমার ওপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজর পড়ল, এবং দু'জনেই আবিষ্কার করলাম যে পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগে আমাদের আর 'লেক্‌চরর' হিসাবে রাখা হচ্ছে না। সবাই অবশ্য বুঝল এই পদচ্যুতির হেতু কী, তবে একটা কানাঘুষো শুনেছিলাম যে আমরা নাকি নানা ধান্দায় ব্যস্ত বলে পড়ানোতে 'ফাঁকি' দিয়ে থাকি! শ্যামাপ্রসাদবাবুকে এ বিষয়ে জানিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে কোনো কিছুই তিনি জানেন না। তবে বলে রাখি যে ফাঁকি একটু-আধটু যে দিই নি, তা নয়! ইতিহাস বিভাগ ছাড়াও আমাকে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ দর্শন বিভাগে নবপ্রবর্তিত একটি বিষয় ('মার্কসীয় দর্শন') পড়াবার আংশিক ভার দিয়েছিলেন— ব্যাপারটা সহজ ছিল না, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থালয় কিম্বা (অর্থব্যয়ের সামর্থ্য থাকলে) বাজার থেকে প্রয়োজন পুস্তকাদি সংগ্রহ করার সম্ভাবনা ছিল সংকীর্ণ, আর অল্প কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে তখনই কম্যুনিস্ট কবি বলে বিখ্যাত সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে ক্লাসে, সেখানে 'Theses on Feuerbach,' 'Anti-Duhring' আর 'German Ideology' ইত্যাদি বিষয়ে আমার ব্যাখ্যাকে অভিসন্ধিদুষ্ট এবং পণ্ডিতী অর্থে 'ফাঁকি' বলার লোকের অভাব কেন হবে?

*   *   *

সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির কাজে সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়ের একাগ্রতার কথা আগেই লিখেছি। কিছুদিন প্রচুর উৎসাহ নিয়ে আমার সহযোগী ছিল রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; ছাত্র-আন্দোলন থেকে সে এসেছিল, লেখাপড়ায় কৃতী কিন্তু

সেদিনের আবহাওয়ায় সাম্যবাদে আকৃষ্ট সর্বক্ষণের কর্মী— পরবর্তী জীবনে তাকে দেখছি বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ -প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট, নয়া দিল্লীর জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যত্র, দেশবিদেশে, বিশেষত সমাজবাদী মহলে, সমাদৃত বিদ্বান রূপে। গিরীন চক্রবর্তী আর অমল বসু, আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিভিন্ন আমার এই দুই ছাত্র বেশ কিছুকাল সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি সংগঠনের প্রাণস্বরূপ হয়ে ছিল। গিরীন নিজে লেখক, বন্ধু অজয় বসুর সহযোগিতায় 'পূরবী পাবলিশার্স' নামে প্রকাশন ব্যবসা খোলে; অজয়বাবু পঞ্জিকাখ্যাত 'গুপ্ত প্রেস'-এর স্বত্বাধিকারী-পুত্র বলে সুবিধাও মেলে। এখান থেকেই বোধ হয় ১৯৪৪ সালের শেষাশেষি আমার ইংরিজী প্রবন্ধ সংকলন *Under Marx's Banner* প্রকাশিত হয়; এই 'গুপ্ত প্রেসে' পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' আর 'ইন্দোসোভিয়েট জার্নাল' ছাপা হত বলে অজয়বাবুর সঙ্গেও আমার হৃদ্যতা— মনে আছে একবার তিনি বলেছিলেন যে তাঁর পঞ্জিকার বর্ষগণনা বিষয়ে আমাদের রাজনৈতিক বিচারে আগামী বৎসরে কী ঘটতে পারে তার আন্দাজ দিলে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, তবে পরে মজা লেগেছিল এক দিন তাঁরই মুখে পঞ্জিকার নিজস্ব জ্যোতির্বিদ্‌দের ভবিষ্যৎগণনায় নির্ভুলতা নিয়ে গর্ব শুনে! গিরীন হৃষ্টপুষ্ট, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দর্শনীয়, সদাপ্রফুল্ল, ধরনে ঢিমেতেতালা, কাজের কঠোর সমালোচনা শ্রবণেও নির্বিকার। দেখতে অমল তার বিপরীত, পরনে ছিমছাম ইংরিজী পোষাক (যা গিরীন কালেভদ্রে পরত), নিজে সাহিত্যিক না হয়েও লেখাপড়ায় আগ্রহী, ক্রমশ একটি ছাপাখানার মালিক, সোভিয়েট সৌহার্দ্য ব্যাপারে অপরিসীম উৎসাহী, আলোচনায় ক্ষিপ্রবুদ্ধি, স্পষ্টবাক্‌। ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সমিতির ('ইসকাস') যুগ পর্যন্ত অমলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চলেছিল— একবার দিমিত্রভের জীবনী ছাপিয়ে আমাকে দিয়ে একটা ভূমিকা লেখায় (এর যে কপিটি আমার কাছে ছিল সেটি ১৯৫৪ সালে বুলগরিয়ান রাষ্ট্রদূতকে দিই এবং প্রত্যুত্তরে পাই দিমিত্রভ সম্বন্ধে এক বিরাট সচিত্র গ্রন্থ, তবে ওদেশে এ-বইয়ের খবর তারা আগে পায় নি, পরেও সংগ্রহ করতে পারে নি)। অমলের উদ্যোগে Ralph Fox-এর *The Novel and the People* কিম্বা Christopher Caudwell-এর *Illusion and Reality* কলকাতায়

প্রকাশিত হয়েছিল। কতকগুলো অকিঞ্চিৎকর কারণে ১৯৫৩-৫৪ সাল নাগাদ সময়ে পার্টির সঙ্গে অমলের সম্পর্কে কি যেন ছেদ পড়ে। আশা করব সে-অধ্যায় কেটে গেছে, আর অমল আজও কোথাও নিজেকে কাজে লাগিয়ে রেখেছে। সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতি আন্দোলন উপলক্ষে যাদের সংস্পর্শে এসেছি তাদের মধ্যে খোঁজ পাই না দুজনের, যাদের ওপর আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল— একজন এই অমল, আর-একজন হল ক্ষিতীন রায় চৌধুরী, যে একদা ছিল পার্টির প্রাদেশিক পার্টি দফতরের প্রধান কর্মী, পরে ১৯৪৮-৪৯-এ জেলজীবনে আমার সঙ্গী, অসম্ভব পরিশ্রমক্ষমতা আবার মাঝে মাঝে শিথিল, ব্যবহারে মধুর, সংগঠনে নিপুণ, অথচ হয়তো তার নিজের মধ্যেই কোনো অভাব কিম্বা পরিবেশে কোনো গলদ তাকে পাঠিয়েছে কোথায় যা অন্তত আমার কাছে তো হল নিরুদ্দেশযাত্রা।

৪৬ নং-এর দফতরে তখন রোজ বসত ভিকৃটর কাওল, যাকে বর্তমানে দেখি দিল্লীতে 'সোভিয়েট দেশ' পত্রিকার কার্যালয়ে। ভিকৃটরের ছোটো ভাই জলি তখন অল্পবয়সেই পার্টিতে কেওকেটা, দারুণ ট্রেড ইউনিয়ন করছে, সম্পাদকমণ্ডলীর কাছেপিঠে সর্বদা ঘোরে কারণ ইংরিজী লেখে আর বলে খুব ভালো— আশ্চর্য এই যে এমন যে-জলিকে বহুবৎসর দেখলাম, একসঙ্গে জেলে কাটালাম, বিশবৎসরাধিক কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী (এবং নেতা) হয়েও সেই জলি '৬৪ সালে পার্টি-ভাগাভাগির পর আন্দোলনকেই পরিত্যাগ করল। বেশি সময়ও তার লাগল না বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত বিরাট এক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিবিধ বিজ্ঞাপনের ভারপ্রাপ্ত হয়ে বসতে! এরই সঙ্গে মনে পড়ছে যার উল্লেখ আগে একবার করেছি— প্রশান্ত সান্যাল, যে ছিল প্রমুখ ছাত্রনেতা। পার্টির প্রকাশন বিভাগের প্রধান, জলি-র মতোই যার সুড়ঙ্গনিবাসে অভিজ্ঞতা অল্প নয়, সে ক্রমে সরে গেল, প্রথমে সংবাদপত্র জগতে, তারপর নামকরা প্রচারবিদ্ হয়ে। বোম্বাইয়ের পার্টি 'কম্যুনে' বাস করেছেন, এমন অন্তত দুজন দিল্লীতে রয়েছেন আজ, একজন কলেজ অধ্যাপক, অপরজন সরকারের, অত্যুচ্চ কর্মচারী। লিখতে লিখতে দৃষ্টান্ত আরো মনে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু থাক্, এ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত টানা ঠিক হবে না। জীবনই জটিল বস্তু; কোথায় কখন এবং কেন কী ঘটে তার জবাব সহজ নয়; কম্যুনিস্ট পার্টিতে যারা আসে তারাও সৃষ্টিছাড়া মানুষ

নয়, প্রচলিত সমাজের দোষে গুণে তাদেরও অংশীদারী। শুধু ভাবি যে আমাদের দেশে আজও পর্যন্ত পার্টি সংস্থায় নেতৃত্বের স্তরে (এবং কাছাকাছি) যাদের অবস্থান তাদের অধিকাংশের শ্রেণী-উদ্ভব ও সম্পর্ক হয়তো বা একটু দুর্ভাবনারই বিষয়; আন্দোলন আর সংগ্রামের অভিজ্ঞতাও বুঝি এমন ধরনের যে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের তূর্য বেজে উঠলে যথাযথ সাড়া দেবার সংগতি কজন রাখি?

সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির কাজে এই সময় (এবং পরেও) গভীরভাবে জড়িত ছিলেন বীরেন ঘোষ, এককালের মস্ত ফুটবল খেলোয়াড় এবং রাজবন্দী— 'এরিয়ান্স' টীমে উইং ফরোয়ার্ড ছিলেন আগে, দেখেছি ঈষৎ ভারী দেহ সত্ত্বেও বল নিয়ে নিদারুণ বেগে এগিয়ে সজোরে 'শূট' করার তাঁর ক্ষমতা, পরে জাঁক করেছি তাঁকে নিয়ে এই বলে যে কম্যুনিস্ট পার্টি আমাদের এমন সংস্থা যেখানে আছেন ফুটবল 'তারকা' এবং কালোয়াতী গানে প্রথিতযশা সুখেন্দু গোস্বামীর মতো গুণী। বীরেনবাবু বন্দীজীবন শেষ করে ছোটোখাটো ব্যবসা ফেঁদে আজও রয়েছেন, নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। চিন্তায় বা কথায় গভীর বা দ্রুত না হলেও বীরেনবাবু ছিলেন আগের যুগের 'স্বদেশী'-ওয়ালাদের গুণাবলীতে ভূষিত, একটু বেশি গম্ভীর, 'সদা সত্য কথা বলিবে' ধরণের মনোভাব যেন বইছেন, অথচ গল্পগুজবে আমোদ-আহ্লাদে গররাজি নন্। বীরেনবাবুর সঙ্গে আমার সব কাজের আর এক সাথী ছিল দিলীপ বসু, যার একাধিক উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। বনেদী এবং অর্থবান্ 'কলকাতার কায়েত' পরিবারের এই ছেলে অল্পবয়সে ঝুঁকেছিল কম্যুনিস্ট আন্দোলনের দিকে, ভয় পায় নি বে-আইনী যুগে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' কাজে লেগে থাকতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টারি সনদ যোগাড় করার নামে সেদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি এবং বিশেষ করে রজনী পাম দত্তের মতো মহাভাগের সান্নিধ্যে থেকেছে, আজও তাত্ত্বিক আলোচনায় পূর্বাভ্যস্ত আবেগ ও আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রেখে সে পার্টির একজন প্রাণোচ্ছল জনপ্রিয় কর্মী। আমার মনে পড়ছে '৪৪-'৪৫ সালে মাঝে মাঝে তাকে বকেছি, বলেছি কেন এসেছিলে কম্যুনিস্ট পার্টিতে, যদি অকারণে কাজে আলৃগা দাও, বড়োলোকের ছেলে অন্য পার্টিতে তো খুব জমাতে পারতে— ওভাবে কথা বলতে পেরেছি কারণ

সে আমার স্নেহভাজন সহকর্মী, ছাত্রতুল্য হলেও তাকে আমি আজও মর্যাদা দিয়ে থাকি।

'৪৪ সালে কিন্তু দু'জন এলেন সমিতির দৈনন্দিন কাজ চালাতে, যাদের নাম আগেই করেছি—ধরণী গোস্বামী আর রাধারমণ মিত্র। দুই পুরোনো সাথী একত্র কাজে নেমে সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির দফ্‌তরের খোল-নল্‌চে বদ্‌লে দিলেন। রাধারমণবাবু তখন পার্টিসভ্য, নিজের অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বসলেন ৪৬নং-এ। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কর্মের ভার নিলেন, খাতাপত্র নিখুঁত করে সাজালেন, আমাদের সাধারণ বাঙালী আল্‌সে কায়দায় 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ' তাড়ানোর কাজকে একেবারে নতুন চেহারা দিয়ে বসলেন। আগেই বলেছি নানা গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। একবার শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তীকে নিয়ে সভা হল; বেশ মনে পড়ছে পূর্ণবাবু বললেন শিল্পীকে মর্যাদা না দিয়ে সমাজ তার কাছ থেকে সৃষ্টির প্রত্যাশা করে কি ভাবে? 'দুশো টাকা মাসে আমরা রোজগার করতে পারি না মশায়, পারলে দেখতেন চেহারাই বদ্‌লে যেত!' এই সভায় কোনো প্রস্তুতি বিনা রাধারমণবাবু শিল্পের ইতিহাস বিষয়ে চিত্তগ্রাহী মার্কস্‌বাদী বিবরণ একটা দিয়েছিলেন। বেশ-কিছু পরে বাংলার ইতিহাস বিষয়ে ছ'দিন ধরে বক্তৃতা দিলেন, টিকিট কিনে শ্রোতারা রোজ 'হল্‌' ভর্তি করে রাখতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সবাই মুগ্ধ—কিন্তু উদ্ভট স্বভাব দোষে কিছুই লিখলেন না, অনুলিখনও কেউ করেন নি, মনে অনুযোগও তাঁর দেখি নি। বরং আশ্চর্য হই দেখে যে সম্প্রতি কিছুকাল পার্টি এবং সর্ববিধ প্রাক্তন সম্পর্ক ত্যাগ করে শুধুমাত্র আচার্য সতেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে সাপ্তাহিক আড্ডায় আনন্দ পেয়ে একটু-আধটু লিখলেন ডেভিড হেয়ারের জীবন কিম্বা কলকাতা শহরের নামকরণের মতো বিষয় নিয়ে, আশ্চর্য হই দেখে মানুষটির অসাধারণ ব্যুৎপত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে সার্থক পরিশ্রমে নিয়মিতভাবে লিপ্ত হয়ে থাকার প্রতি পরিপূর্ণ অনীহা। এদিক থেকে ধরণীবাবু হলেন একেবারে বিপরীত চরিত্র—চমক জাগিয়ে তোলার সামর্থ্য বা অভিপ্রায় নেই, নিজের গুণাগুণ সম্পর্কে মস্তিষ্কপীড়া নেই, সন্ত্রাসবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পর থেকে লেগে রয়েছেন পার্টির কাজে— যাবেন যেখানে তাঁর 'posting', নিষ্ঠা-সহকারে কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকবেন, ফলাফল নাটকীয় না-হয় নাই

হোক্, কিন্তু কাজ তিনি করে যাবেন। এই ভূমিকাতেই এই বর্ষীয়ান্ সাম্যবাদী আজ পার্টি কেন্দ্রে হিসাবপরীক্ষার মতো কাজে নিযুক্ত, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংলায় ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী আন্দোলনের একজন নির্দেশক।

সকলের নাম করতে পারলাম না, কিন্তু এমনি কজন মানুষের সাহচর্যে তখন '৪৬ নং'-এ আমাদের কাজ চলত। অনুচ্চারিত আশীর্বাণী সর্বত্র পেতাম পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো নিরহংকার সাহিত্যগতপ্রাণ মানুষের কাছ থেকে— যিনি মেটারলিংকের 'নীলপাখী' আর ম্যাক্সিম গর্কির বহু রচনা শুধু নয়, আমাদের উপরোধে সানন্দে এবং এবং বিনা পারিশ্রমিকে প্রথম খণ্ড *New Writing*-এ (John Lehmann -সম্পাদিত) প্রকাশিত দীর্ঘ চীনা গল্প অনুবাদ করেছিলেন, পরে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির আহ্বানে সোশালিস্ট জগতের একাধিক রচনা তরজমা করলেন, বাংলা সাহিত্যিক মহলে সর্বত্রচারী মানুষটি সর্বজনের সুখ চাইতেন বলেই তাঁর কাছে কতকটা দুজ্ঞেয়, আমাদের বিশ্ববীক্ষার সাফল্য কামনায় পরাঙ্মুখ রইলেন না। রমেশচন্দ্র সেনের মিঠে হাতের লেখা কাহিনীর কদর হয়তো আজ নেই, কিন্তু তাঁর মতো প্রকৃত মহাজনকে আমাদের কাজ (আর চিন্তা) আকৃষ্ট করেছিল। বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঠিক রাখার কাজে প্রধান অবদান ছিল অজাতশত্রু গোপাল হালদারের— মাঝে মাঝে তাঁকে 'সর্বঘটে কাঁঠালিকলা'-র মতো ব্যবহার হয়তো আন্দোলন করেছে কিন্তু হাসিমুখে সর্ববিধ কর্মে যোগ দিতে কুণ্ঠিত তাঁকে কখনো দেখা যায় নি। মুশকিল হচ্ছে নাম করা আর না করা নিয়ে— তবে উল্লেখ করতেই হয় অন্তত দুজন গল্পকারের যাদের প্রতিভার ভাতি বাংলা রচনার গৌরব— এরা হলেন নরেন মিত্র আর সমরেশ বসু, যিনি আজ কিছু পরিমাণে বিতর্কিত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব কিন্তু কল্পনার বিস্তার ও বাস্তবায়নে যার স্বাক্ষর বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী, বর্তমানের ব্যবধান যাকে প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রাণপ্রবাহ থেকে দূরে সরাবার শক্তি রাখে না।

সুভাষের 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ' ছাড়া সেযুগে লেখা কয়েকটা গান আজ প্রায় বিস্মৃত, কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে ক্ষেত্র চট্টোপাধ্যায় কেমন যেন স্বদেশী যুগের জাদুকরী আবেগ জাগিয়ে গেয়েছিলেন: 'খাল কেটে আর কুমির ডেকে আনবো না ভাই আজ / লক্ষ বছর ফেল্‌ব না আর মায়ের

চোখের জল'। সহজ মমতায় হরিপদ কুশারি চমক লাগালেন : 'সোনার বাংলা হল শ্মশান / একসাথে সব চল্'! হোসেন ভাই আর পিতম ঘোষকে তাদেরই নিজস্ব ঢঙে ডাকেন বিজন ভট্টাচার্য : 'এখনও সময় আছে দুইখানা হাত এক করিতে / সোনার হরিণ দেইখ্যা শেষে পাছে ছুটো না / গোলক-ধাঁধা বোঝা কথা হুঁস ফিরাইয়া আনো চাচা / ঘরের কথা পরের কাছে কইব্যায় যাইও না'— কে ভুলতে পারে যে শুনেছে বিজনের গলায় গাওয়া এই গান! দেশ যখন মুহ্যমান্, ভবিষ্যতের কল্পনাই যখন সাধারণ বুদ্ধিতে ভয়াবহ, তখনই সংগ্রামী দেশবাসীর অপরাজেয় দেশপ্রেম ঘোষণা করলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী মাথায় নিয়ে : 'মৃত্যুরে দিয়ে মৃত্যুর হবে অবসান'! এমনই পরিস্থিতিতে এলেন শম্ভু মিত্র, পড়লেন নিজের লেখা নাটকের মুসাবিদা, শুনলাম দানাদার গলার স্বর, বোঝা গেল দুর্লভ নাট্যপ্রতিভার আবির্ভাব— কিছুটা অহংকার আর স্বাতন্ত্র্যবোধ সত্ত্বেও মিশলেন তিনি সকলের সঙ্গে, ময়মনসিংহের কৃষক কবি নিবারণ পণ্ডিতের মতো শক্তিধরের আবিষ্কারে উত্তেজনা বোধ করলেন, ঝাঁপিয়ে পড়লেন গণনাট্য আন্দোলনে, শুধু তৃপ্তি ভাদুড়ী (পরে মিত্র) নয় আরো বহু সতীর্থের সন্ধান পেলেন যারা মিলে বাংলা অভিনয়ে নতুন ধারা আর নতুন চরিত্র প্রবর্তন করেছেন। বিদগ্ধ যাকে বলে তা না হয়েও বৈদগ্ধ্যের প্রতি শম্ভুবাবু আকৃষ্ট ছিলেন, সানন্দে বিষ্ণু দের কবিতায় কণ্ঠ দিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রের 'মধু বংশীর গলি' আবৃত্তি করে অগণিত সমাবেশকে মুগ্ধ করলেন, বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী', আর তার চেয়ে ঢের বেশি স্মরণীয় 'নবান্ন' অভিনয়ে লেখকের সঙ্গে শম্ভু মিত্র, শোভা সেন, তৃপ্তি ভাদুড়ী, চারুপ্রকাশ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু, সুধী প্রধান প্রভৃতি দেখালেন আশ্চর্য সাফল্য, ব্যক্তি ও সমষ্টিগত অর্থে অভাবনীয় কৃতিত্ব। তারিফ করলেন স্বয়ং শিশিরকুমার ভাদুড়ী, যাঁর মন ভিজানো সহজ কাণ্ড ছিল না, অভিনয় ব্যাপারে যাঁর মানদণ্ড ছিল কঠোর এবং নিজের ওপর আস্থা ছিল এমনই অপরিমিত যে অপর সম্বন্ধে (বিশেষত অর্বাচীন নাট্যযশঃপ্রার্থী সম্বন্ধে) কুঞ্চিতনাসিকা মনোবৃত্তি ছিল অকাট্য। তখনই শুনেছিলাম যে গণনাট্য সংঘের গুণপনা স্বীকারে প্রাথমিক কুণ্ঠা তিনি বর্জন করেছেন, আর বহু পরে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গী হয়ে একাধিকবার যখন তাঁর নানা আলোচনা শুনেছি তখন প্রত্যক্ষ

ভাবেই তা জানার সুযোগ পেয়েছি। মনে পড়ে যাচ্ছে বোধ হয় ১৯৪৫ সালে কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে লেখক-সম্মেলনে বাংলার দুই বিখ্যাত কবিয়াল, শেখ গোমহানি আর রমেশ শীল, বহুজনকে শুনিয়েছিলেন 'কবির লড়াই'; টগর অধিকারী নামে এক অন্ধ একতারা বাজিয়ে সেখানে সবাইকে মোহিত করেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে গণনাট্যের ডাকে সাড়া দিলেন তুলসী লাহিড়ীর মতো সুলেখক ও সজ্জন, 'দুঃখীর ইমান' নাটকটি মঞ্চস্থ করে যিনি বোধ করি সর্বপ্রথম ব্যাপক নাট্যামোদী সাধারণের সামনে তুলে ধরলেন নতুন জিনিস, আর অকুণ্ঠে সাহায্য করতে থাকলেন সর্ববিধ প্রগতি প্রচেষ্টাকে। '৪৬নং'-এ এলেন ইতিমধ্যে নাট্যজগতে স্বীকৃত দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দল বেঁধে নাটক করার উন্মাদনায় অংশীদারী করে আজীবন স্বেচ্ছাবন্দী হলেন সেই প্রয়াসে, আজও ব্যস্ত রয়েছেন গণনাট্য সংঘের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের কাজে। আর প্রধানত শান্তি-আন্দোলনের সুবাদে কিছু পরে এলেন নাট্য ও সাংবাদিকতার জগতে প্রতিভাধর শচীন সেনগুপ্তের মতো ব্যক্তি।

'৪৪ সালে কলকাতায় সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে যে আয়োজন হয়েছিল তা মনে রাখার মতো। যুদ্ধের মোড় তখন একটু ফিরেছে কিন্তু ফ্যাশিজ্‌ম্‌-এর পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হলেও বহু কঠোর আর নিষ্ঠুর পরীক্ষা বাকি ছিল— সোভিয়েটকে শুভকামনা জানিয়ে এক ইস্তাহার রচনা করা হয় (ইংরিজী এবং বাংলাতে যার ভার ছিল আমার ওপর), আর সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধিমূলক ব্যক্তির স্বাক্ষর সমাবেশ হয়েছিল অভাবনীয়। সংগীত বিশারদ, ক্রীড়াবিদ্ প্রভৃতি সাগ্রহে এই ইস্তাহারে সম্মতি দিয়েছিলেন। কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়— যার মধ্যে ছিল *I S J Souvenir*, 'ইন্দো-সোভিয়েট জার্নাল' থেকে বাছাই-করা লেখার সংকলন, যার একখণ্ডও আজ কোথাও নেই জেনে প্রকৃতই দুঃখ হয়। এখানে সফল সম্মেলন করে আমরা সদলে গেলাম বোম্বাইয়ে সর্বভারত সম্মেলনে, সভানেত্রী হলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। সংঘের কাজের বিবরণ আমাকেই পেশ করতে হয়েছিল, প্রধান প্রস্তাবেও বলতে হয়েছিল— দিলীপ বসু (যে সঙ্গে ছিল) মনে পড়িয়ে দিল যে একবার বিজয়-লক্ষ্মীর সঙ্গে কিছুটা কথা কাটাকাটি আমায় করতে হয়েছিল, কারণ তাঁর

কথায় বুঝি সোভিয়েটের ভূমিকা সম্বন্ধে বহু প্রশংসার সঙ্গে একটু প্রচ্ছন্ন খোঁটাও ছিল যা আমাদের তখনকার মেজাজে চুপচাপ হজম করা সম্ভব ছিল না। যাই হোক্, মোটের ওপর সম্মেলন সুষ্ঠুভাবেই শেষ হয়, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু একটু নেপথ্যে থেকে সাহায্যও করেন, জুহুর সমুদ্রতটে উভয় নেত্রীর সঙ্গে একত্র সাক্ষাৎ করি, নিয়ে যান সরোজিনীর ছোটো বোন সুহাসিনী (পূর্বে নাম্বিয়ার) এবং তার স্বামী জাম্বেকর। সম্মেলন থেকে স্থির হয় যে সংঘের প্রধান দফ্‌তর কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ে আসবে, জাম্বেকর হবে সম্পাদক, 'ইন্দো-সোভিয়েট জার্নাল'-ও বেরুবে বোম্বাই থেকে। জাম্বেকর পার্টির পুরোনো সদস্য, তবে তাকে ছাপিয়ে ছিল সুহাসিনীর সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব আর গভীর কণ্ঠস্বর। জাম্বেকর আমাকে নিয়ে গেল এন.এম.জোশীর কাছে, যিনি ছিলেন নরমপন্থী হয়েও শ্রমিক নেতাদের মধ্যে সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস-ভাজন, যাঁর সম্বন্ধে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আমায় একবার বলেন বহুপূর্বে যে জোশী বিদেশ যাচ্ছেন জেনে তাঁর হাতে নির্ভয়ে চিঠি দেওয়া যায়, পৌঁছে দেবেন ইয়োরোপের কোনো কম্যুনিস্ট ঠিকানায়, অস্বীকার করবেন না, লুকিয়ে খুলে পড়বেন না, কথার খেলাপ করবেন না, অথচ হয়তো 'সোশালিস্ট'-নামধারী অন্য কাউকে (নামও একটা করলেন যার উল্লেখ করছি না) ঐ কর্মটি দিলে তা পণ্ড হওয়ারই সমূহ আশঙ্কা। দেখলাম জোশী থাকেন একটি ঘরের ফ্ল্যাটে, পরিষ্কার, বিলাসবিবর্জিত কিন্তু সুরুচিতে সাজানো, 'পট্' থেকে ঢেলে চা খাওয়ালেন, দু-একটা কথা হল। বেশি আলাপ হল 'বম্বে ক্রনিক্‌ল্' দৈনিকের সম্পাদক, জাতীয়তাবাদী বলে বিখ্যাত সৈয়দ আবদুল্লাহ ব্রেল্‌ভির সঙ্গে; তিনি সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন, আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণে সম্মতি দিলেন। এ সময়ে আবার পরিচয় জমল খাজা আহ্‌মদ আব্বাসের সঙ্গে; আমাকে বোধ হয় নিয়ে গেলেন ভি. শান্তারামের 'প্রভাত ফিল্‌ম্ স্টুডিও'-তে— মনে আছে এইজন্য যে আরো কয়েকবছর আগে আমার খুব ভালো লেগেছিল শান্তারাম-এর 'সন্ত জ্ঞানেশ্বর' ছবি, পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণগুণে অলৌকিক কাহিনীও গ্রহণীয় মনে করতে পেরেছিলাম, সহজ সরল গানের কুহকে যা ছিল ভরা। আব্বাস সাংবাদিকরূপে ও চিত্রজগতে যশস্বী; প্রগতি আন্দোলনের বিবিধ পর্যায়ে তার সহায়তা মিলেছে; আজও বোম্বাইয়ের 'ব্লিৎস্' পত্রিকার শেষ

পৃষ্ঠা'-য় তার চিন্তা প্রগতিপ্রচেষ্টাকেই পুষ্ট করতে চায়; সোভিয়েট দেশে ১৯৫৪ সালে কিছুদিন একত্র তার সঙ্গে বিচরণের সুযোগও আমার ঘটেছে। মনের গড়ন আমাদের আলাদা, কিন্তু আমি তার নানা গুণের তারিফই করে থাকি, বিশেষত সোভিয়েট সম্পর্কে তার সম্প্রীতি ব্যাপারে সংশয়ের লেশমাত্র নেই বলে আমি তার অনুরাগী। কিন্তু একটা খটকার কথা না বলে পারছি না, যা কাঁটার মতো আমার মনে মাঝে মাঝে খচ্‌খচ্‌ করে ওঠে। অনেকে জানেন সোভিয়েট পত্রিকা 'নিউ টাইম্‌স্‌-এর কথা; তাতে বেশ কয়েক বছর আগে দেখলাম 'ব্লিৎস্‌' থেকে আব্বাসের এক লেখার উদ্ধৃতি, যার বক্তব্য হল এই যে জওয়াহরলাল নেহরু স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একরাত্রে বার বার ব্যগ্র হয়ে আব্বাসকে ফোন করে যুদ্ধের খবর জানতে চান আর শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রের অফিস থেকে আব্বাস নেহরুকে আশ্বস্ত করেন যে যুদ্ধ সোভিয়েটের স্বপক্ষেই চলছে এবং তখন নেহরু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘুমোতে পারেন! (*New Times*, Moscow, 2 June 1965 p. 25)। স্বভাবতই এমন খবর সোভিয়েট কাগজ ফলাও করে ছাপে, আর কিছুদিন পরে লালফৌজের এক সেনাপতির (Batov) 'নিউ টাইম্‌স্‌'-এ অন্য এক প্রবন্ধে আব্বাস-পরিবেশিত সংবাদ পুনরুল্লিখিত হয় (*New Times*, 18 May 1969, pp. 9-20)। এটা পড়েই আমার মনে প্রশ্ন ওঠে: স্টালিনগ্রাদ যুদ্ধের সময় (নভেম্বর '৪২ থেকে ফেব্রুয়ারি '৪৩) নেহরু যখন আহ্‌মদনগরে বন্দী, খবরের কাগজও বোধ হয় পান না, কাকপক্ষীর কাছ থেকে ছাড়া খবর পাওয়া যখন দুরূহ, তখন কেমন করে বোম্বাইয়ে সংবাদপত্র অফিসে টেলিফোন করেন তিনি? এ প্রশ্নের জবাব নেই, কারণ ঘটনাটা সত্য হতেই পারে না, অবশ্যই স্বকপোলকল্পিত, বেশ একটু দূরদর্শিতার সঙ্গেই সোভিয়েট পক্ষ থেকে প্রশস্তি সংগ্রহের অভিসন্ধি নিয়ে লেখা এ-জিনিস। 'ব্লিৎস্‌'-এ কর্মরত এক বন্ধুকে জানিয়েছিলাম, আব্বাসকে বলি-বলি করেও বলে উঠতে পারি নি, কিন্তু অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলতে পারি নি— অল্পাধিক অপরাধ জীবনে আমরা সবাই মাঝে মাঝে হয়তো করি, কিন্তু এ-ধরনের ঘটনা মার্জনা করা যায় কেমন করে?

* * *

বোম্বাইয়ে দিনদশেক থাকার সময় কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, সংসারের জটিলতারও একটু অজ্ঞাতপূর্ব পরিচয় পাওয়া গেল। পার্টির কেন্দ্রীয় দফতরে কর্মরত সবাই মিলে একত্রবাসের যে ব্যবস্থা ছিল, তার অনেক কিছু ভালো লেগেছিল। সাদাসিধে খাওয়া, অনেকটা আত্মনির্ভর জীবনযাত্রা। ঠাট্টা শুনতাম 'হাফপ্যান্ট'-পরিহিত সুন্দরৈয়া ভাতটা খায় একটু বেশি, শহুরে ধরন তার রপ্ত হয় নি! পার্টিপরিবার চলত মোটের উপর স্বচ্ছন্দে। তবে আমাদের কারো কারো মতিগতি বাস্তবিকই এমন যে, 'কম্যুন'-জীবনে মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে উঠতে হয়। আশ্বস্ত হয়েছিলাম শুনে যে '৪৬ সালে প্রথম ভারতদর্শন যখন করেন কমরেড পাম দত্ত, তখন তিনি 'কম্যুন'-এর তারিফ করলেও বলেছিলেন যে সর্ব অবস্থায় ঐ বস্তু ঠিক গ্রহণীয় না হওয়াই সম্ভব। একদিন মনে আছে কমরেড এ.এস.আর. চারির সঙ্গে রাস্তার ধারের দোকানে আখের রস পান করতে করতে কথা হচ্ছিল— আমি বললাম বন্নে জহীর কৃত একটি পুস্তিকা পার্টি প্রকাশ করেছে যার একটি অধ্যায়ের নাম : '**Pakistan —A Just Demand**', কিন্তু পার্টির যে বক্তব্য কমরেড অধিকারীর 'থীসিস্'-অনুযায়ী দেশবাসীকে জানানো হয়েছে তাতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন **nationalities**-এর (যাদের মধ্যে বেলুচী, পাঠান, সিন্ধি প্রভৃতি বহুলাংশে মুসলমান) পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে দেশের ঐক্য সাধনের কথা উঠেছে, সোজাসুজি পাকিস্তান দাবিকে ন্যায্য বললে নিশ্চয়ই ভুল বোঝাবুঝি বাড়বে। আমি জানতাম যে জহীরের আসল যুক্তিতে আমি যা চাই তাই-ই বলা হয়েছিল, এবং গান্ধী ও জিন্না একত্র মিলুক্ বলে যে বিপুল আন্দোলন পার্টি তখন চালায় তার ব্যাখ্যাও ছিল— যে সমস্যা সমাধানে জাতীয় নেতৃত্বের অক্ষমতা কাটানো গেল না বলে শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগের দণ্ড দিতে হল, সেই সমাধানে সহায়তা করেছিল ঐ পুস্তিকা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রায় যেন সূত্রাকারে পাকিস্তান বিষয়ে যা বলা হল তাতে সায় দেওয়া যায় কেমন করে? চারি তখন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পার্টিতে সর্বক্ষণের কর্মীরূপে তিনি বিশিষ্ট, পরবর্তী জীবনে আদালতে প্রচুর পসার অর্জনের মধ্য দিয়ে তার গুণবত্তা সূচিত হয়েছিল, পার্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছেড়েও তিনি কখনো পার্টির সাহচর্য ছাড়েন নি। কিন্তু '৪৪ সালে আমাকে জবাব যা দেন তাতে অবাক হয়েছিলাম। যখন তাঁর যুক্তি মানতে আমি নারাজ শুধু তখন তিনি

বললেন যে এ-সব বিষয় বাস্তবিকই বুঝতে গেলে পার্টি-'কম্যুন'-এ বসবাসের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন! একটুও অতিরঞ্জন করছি না, কিন্তু এভাবেই চারি (যার সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য অটুট ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত) আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন— ভাবি হয়তো 'কম্যুন'-জীবন যাপনের ফলে মনস্তত্ত্বও এক-পেশে হয়ে পড়ে আর সম্ভবত সেজন্যই আশ্রম বা 'কম্যুন' কোনোটাই মাটির মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

বোম্বাইয়ে সেবার পূর্ব-কথিত অনিল ডিসিল্‌ভার অতিথি হয়েছিলাম— কোলাবা অঞ্চলে সমুদ্রকূলে Cuffe Parade নামে রাস্তার উপর এক পুরোনো জাঁদরেল গম্বুজওয়ালা বাড়ির একতলায় প্রশস্ত ফ্ল্যাটে। আগেই বলেছি এই সিংহলী মেয়ের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ চরিত্রের কথা; অসংকোচে সে আমাকে জানাত তার জীবনের বিবিধ অন্তরঙ্গ ঘটনা, একবার দেখাল পেন্সিলে আঁকা তার কয়েকটা প্রতিকৃতি, শুনলাম এঁকেছেন বিখ্যাত এক বৈজ্ঞানিক যার সঙ্গে কিছুকাল তার প্রেম চলেছিল, তবে নিছক শারীরিক অর্থে প্রেমিক রূপে তিনি নাকি অকৃতী! আমায় ঠাট্টা করে বলল যে আমার স্ত্রীকে কলকাতায় তার খুব ভালো লেগেছিল, নইলে সে আমাকেও ছেড়ে দিত না— এ ব্যাপারে আমি ব্যক্তিটি যেন নগণ্য এবং তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাই হল মুখ্য? আমি থাকার সময় তার এক মেয়ে বন্ধু এসে কদিন কাটিয়ে গেল, মহীশূরবাসিনী, আমেরিকা-ফেরত, সেখানে শ্বেতাঙ্গ স্বামীকে ত্যাগ করে এসেছে, সন্তান-সম্ভাবনা রদ করতে চায়— আজকাল যে 'women's lib' আওয়াজ শুনি, তারই পূর্বাভাস দেখলাম, যা এদেশে অন্যত্র আমার অভিজ্ঞতায় আসে নি। আগেই তো বলেছি পি.সি. জোশীর কৌতুক: আমি ছাড়া আর কেউ সে সময় অনিলের অতিথি হয়ে থাকলে পার্টি তাকে বার করে দিত! জানলাম আরো কিছু যাতে মজা যে পাই নি তা নয়, কিন্তু আশ্চর্যও হয়েছি। এক প্রধান নেতা অনিলের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিলেন। রুষ্ট হয়ে তাঁর স্ত্রী নালিশ করেন, তবে একটা রাস্তা বের হয় কাণ্ডটাকে খতম করার, সাময়িকভাবে অস্থিরমতি অথচ প্রকৃত শক্তিধর সেই নেতাকে বিদেশে গুরুতর কাজের জন্য যেতে হয়— আমাকে অনিল দেখিয়েছে, তাঁর লেখা চিঠি! নাম করছি না, কিন্তু ঘটনাটা সত্য। আর কেউ যেন না ঘৃণাক্ষরে ভাবেন যে অনিলকে স্বৈরিণী বা ঐ রকম কোনো নিন্দাত্মক আখ্যা দিতে

চাইছি— বাস্তবিকই দেখে মুগ্ধ হয়েছি তার স্বাভাবিকত্ব, 'সিংহলী আমরা Sensuality নিয়ে লজ্জা বোধ করি না' বলত সে সহজ ভাবে। এখন সে ইয়োরোপে, কিছুকাল Vigier নামে বিশিষ্ট ফরাসী চিকিৎসাবিদ্বান ও কম্যুনিস্টের সঙ্গে বিবাহবন্ধনের পর আবার বুঝি সে মুক্তজীবন যাপন করছে, কিন্তু শুধু রমণী নয়, দেহের সঙ্গে মনের চর্চাও তার অভ্যস্ত, বছর দশ-বারো আগে পাঠালো আমাকে তার লেখা *Life of the Buddha*, বিরাট এক গ্রন্থ, প্রসিদ্ধ বিদেশী প্রকাশক Phaidon Press-এর উদ্যোগে ছাপা।

'৪৬ সালের শেষ দিকে বোম্বাই গিয়ে আমার পুরানো বন্ধু ফিরোজ মিস্ত্রির (অধুনা এ. সি. সি. কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) বাড়িতে ছিলাম আর একাধিকবার নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি অনিলের কোলাবা-স্থিত গৃহে, যেখানে তখন সে সংসার ফেঁদেছিল মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দের সঙ্গে। জানলাম মুল্‌ক্‌ তার বিদেশী স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ ('ডিভোর্স্') নিয়ে অনিলকে বিয়ে করবে, ব্যবস্থা ঠিক আছে। মুল্‌ক্‌-এর প্রতিভার অনুরাগী হয়েও তার সম্বন্ধে আমার কয়েকটা সংশয়ের কথা আগেই বলেছি; অনিলেরও তা জানতে বাকি ছিল না, তাই আমাকে অনুযোগ করত আমি যেন মুল্‌ক্‌কে আরো একটু বেশি পছন্দ করি, বুঝতাম সে মুল্‌কের প্রেমে বাস্তবিকই পড়েছে, ঘর বাঁধতেও বুঝি মন চাইছে। অনিল আর তার বোন স্থপতি Minnette de Silva তখন মুল্‌ক্‌কে সাহায্য করেছিল *Marg* শিল্প পত্রিকা প্রকাশে, টাটা প্রমুখ ধনপতিদের আনুকূল্যে যে 'মার্গ্' ত্রৈমাসিক বিদগ্ধজনের কাছে সুপরিচিত, এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-সাময়িকী। কখন কোথায় তাদের মধ্যে কি মন-ভাঙাভাঙি ঘটে জানি না। কিন্তু কেমন যেন নোংরা লেগেছিল যখন *Contemporary Indian Literature*, vol. V, November-December 1965 (Mulk Raj Anand Special Number) [20A, Ram Nagar, New Delhi] পত্রে (পৃ. ৪৫-৪৬) দেখি মুল্‌ক্‌রাজের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তে যে অনিলকে বিয়ে করতে গিয়ে মুল্‌ক্‌ জানলেন অনিল 'Vigier নামে ফরাসীকে মাত্র একদিন বোম্বাইয়ে দেখে এবং প্রেমে পড়ে বিয়ে করতে চলেছে ফ্রান্সে, আর লণ্ডন-প্যারিসে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে মুল্‌ক্‌ পারল না'! এ-সব খবর মুল্‌ক্‌ স্বয়ং ঐ পত্রিকাকে সরবরাহ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু কী ছিল এর

দরকার। ভিভিয়ে-র সঙ্গেও পরে অনিলের ছাড়াছাড়ি ঘটেছে, কিন্তু সে কথা থাক। মুল্‌ক্‌রাজ-এর মতো মহাজনের জীবনবৃত্তান্তে এ উল্লেখ এভাবে কেন? মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে কি ভাবি যখন দেখি যে আজও বোম্বাইয়ে খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে মুল্‌ক্‌রাজের বসবাস অনিল ডিসিল্‌ভারই ভাড়া-নেওয়া কোলাবার ঐ সুন্দর, সুগম ফ্ল্যাটে, অথচ নগণ্য এক সাহিত্যপত্রিকায় (যা একজন তথাকথিত প্রগতিবাদী লেখক দিল্লীতে বার করতেন, আজও করেন) বলতে হয় মুল্‌ক্‌রাজ-এর মতো যশস্বী লেখককে, যে গোটা ব্যাপারটাতে বেয়াড়া মেয়ে অনিলেরই সর্বৈব দোষ! একটু বেশি কথা ফাঁদতে হল, কিন্তু এর অন্যথা করি কিভাবে? অবশ্য স্বীকার করছি যে হয়তো মুল্‌ক্‌ সম্বন্ধে একটু অবিচার করছি, কারণ আমার পক্ষপাত, আমার মমতা এই চপল, গভীর, বিলাসী, দরদী, অসামান্য সিংহলী মেয়ের উপর ছিল, আজও রয়েছে।

২৩

'এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি'— ছেলেমানুষ-গলায় নিজের লেখা 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' পড়েছিল ৪৬ নং-এ সুকান্ত ভট্টাচার্য, তখন সদ্য সে এসেছে আন্দোলনে, বেলেঘাটার কিশোর ছেলে, সকলের প্রিয়, শান্ত চেহারা, শিষ্ট ভাব কিন্তু ভিতরে আগুন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে একটু পরে কম্যুনিস্ট পার্টির দৈনিক 'স্বাধীনতা'-য় সে ভার নিল রবিবাসরীয় কিশোর-সভার, সাহিত্য এবং পার্টি ক্ষেত্রে সর্বকনিষ্ঠ এই প্রতিভাধরকে দেশ আনন্দে স্বাগত জানাল, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে অকালমৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিল, প্রচণ্ড আঘাত পেলাম সবাই। সুকান্তের 'রাণার' কিম্বা 'বিদ্রোহ চারিদিকে বিদ্রোহ আজ' ইত্যাদি কবিতা আর গান মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল, ভুলতে-পারা-যায়-না এমন ঢঙে গাইতেন দেবব্রত ('জর্জ') বিশ্বাস। রবীন্দ্রসংগীত রাজ্যে আমাদের কালে জর্জ অতুলন, গাঢ়, গভীর, ভরাট, গলায় 'নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর' আর কে গাইবে? কে পারবে তার মতো 'কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী' উচ্চারণ করতে, কিম্বা কণ্ঠের কুহকে 'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদলসাঁঝে' আর 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'-র মতো গানের মায়াজাল ছড়িয়ে দিতে? পাশাপাশি নাম করতে পারি শুধু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের, যার গলায় হঠাৎ শোনা 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' কিম্বা 'শেষ কোথায়' -জাতীয় রবীন্দ্র রচনা কখনো ভোলার বস্তু নয়, কিন্তু মাধুর্যের উপাদান একটু যেন বেশি, ঋজুতার বৈভব যেন তদনুপাতে একটু ক্ষুণ্ণ। একেবারে অনধিকার চর্চার দরুন মার্জনা চাইছি, অপর বহুপরিচিত ও অপরিচিত সমসাময়িক সাংগীতিকদের কথাও বলতে পারছি না। তখনো বয়সে ছোটো সুচিত্রা মিত্রের মতো সুধাকণ্ঠী কিম্বা 'নবজীবনের গান' যার সৃষ্টি, সেই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের উল্লেখও এই প্রসঙ্গে করলাম না। ৪৬নং-এর উদ্যোগে যখন হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় এসে রইলেন কিছুকাল স্নেহাংশু আচার্যের বাড়িতে, তখন বাস্তবিকই সুরের আগুন ছড়িয়ে পড়ল, হেমন্ত-'জর্জ'-এর মতো জাত-গাইয়েও যেন খুঁজে পেলেন যোগ্য গুরু,

যিনি বাস্তবিকই মাতোয়ারা, যত্রতত্র দেখাতে রাজী কেমন করে শিক্ষিত গলা দিয়ে শরীরের প্রত্যঙ্গ থেকে ধ্বনি বার করা যায়। ধ্রুপদ চর্চায় যার আকুলতা, প্রাতঃস্মরণীয় ওস্তাদ আবদুল করিম খান সাহেবের সঙ্গে তুলনার আশঙ্কায় কুণ্ঠিত না হয়ে শ্রীরঙ্গমের পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'যমুনা কি তীরে' গাইতে যার সংকোচ নেই, সুর নিয়ে দুঃসাহসে ভাঙাগড়ার পরীক্ষায় যার বিপুল আগ্রহ, এমনই এক বিরল, বিতর্কিত শক্তিমানকে কাছ থেকে অনেকে দেখলাম। স্নেহাংশুর বাড়িতে রইলেন সস্ত্রীক— তবে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে হরীন্দ্রনাথ যেভাবে ঘোরাফেরা করতেন তাতে মনে পড়ে যায় ছাত্রাবস্থায় বিলাতে শোনা গল্প C. E. M. Joad সম্পর্কে, যে জোড্ এক 'Summer school' থেকে আর-এক 'Summer school-'এ ঘুরছেন, প্রতিবারই স্ত্রী পরিচয়ে বিভিন্ন সঙ্গিনী! কলকাতার গায়করা শিখল ইণ্টারন্যাশনালের হিন্দী তরজমা, শিখল ফরাসী জাতীয় সংগীত 'মার্সেইয়েজ্'-এর অবিকল সুরে 'অব্ কোমর বাঁধ তৈয়ার হো লাখ কোটি ভাইয়ো', কিম্বা যে গান '৩০ সালে হরীন্দ্রনাথকে ছ'মাস জেল খাটিয়েছিল—'শুরু হুয়ী হ্যয় জং হমার, শুরু হুয়ী হ্যয় জং,' যার শেষ কলিতে রয়েছে : 'ভারত কো হম্ বচানেওয়ালে/সৌরজগৎমে মচানেওয়ালে/ আপ্নী শক্তিসে নচানেওয়ালে/বিষধর শ্বেতভুজঙ্গ।' (মনে আছে 'শ্বেত'-কে বদলে মাঝে 'ফ্যাশিস্ট' শব্দটি জোড়া হ'ত!) সহজে মুখে মুখে ঘোরে এমন সস্তা কুহকের গানকে খোল-নলচে বদ্‌লে নতুন চেহারা দিলেন : 'আ গয়া দিন স্বাধীনতাকা / আগে চলো আগে চলো ভাই / জয়কার কী ঝংকার আতী / লো চারো তরফ্ জয়কা পতাকা।'—কে ভুলবে সেই-সব গান, যারা তা শুনেছে একযোগে নানা জাতের মানুষের কণ্ঠে। হাসি পাচ্ছে মনে পড়ে যে 'সূর্য অস্ত্ হো গয়া' নিয়ে সুর বিস্তারে মগ্ন হরীন্দ্রনাথ— আত্মভোলা কণ্ঠে বলছেন : 'পগ্ পগে হম্ গাতে চলি, সুস্থ ভুবন গগন তলী, পগ্ পগে হম্ গাতে, হম গাতে,' তখন যুগপৎ তার অঙ্গ ও শব্দ ভঙ্গী অনুসরণে হেমন্তের মতো আস্থাবান্ কণ্ঠশিল্পী পুলকিত হলেও অপ্রস্তুত!

হরীন্দ্রনাথকে পরে লোকসভায় সতীর্থরূপে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি। অজস্র কবিতা লিখেছেন ইংরিজীতে, প্রকৃতই অজস্র, কারণ তাঁর পরিমিতি চেতনা নেই, প্রতিটি রচনাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসেন, বাছাইয়ে মন

বসাতে পারেন না, কোথায় যেন সংহতি আর সংযম নেই বলে প্রতিভা বিকৃত হয়ে দ্যুতি হারিয়েছে— আমার সন্দেহ নেই, কঠোর বিচারে বাছাই করলে হরীন্দ্রনাথের রচনাস্তূপ থেকে যথার্থ রত্নসম্ভার মিলবে, কিন্তু রত্নকে তিনি চাপাই রাখতে দিয়েছেন, কিম্বা পরিবেশের চাপে দিতে বাধ্য হয়েছেন, সহায় বড়ো একটা কেউ হয় নি, তার অসংযত প্রতিভার বিচ্ছুরণকে প্রায় যেন কৌতুকের বস্তু ভাবা হয়েছে। জীবনপ্রাচুর্যে হরীন্দ্রনাথ আজও অশীতিবর্ষ সামীপ্যেও ঈর্ষণীয়, কিন্তু যে প্রতিভা নিয়ে তিনি এসেছিলেন তার প্রকৃত স্ফুরণ হল না, উত্তরপুরুষ তার কীর্তিকে কতটা স্মরণ করবে জানি না। আমার মনে পড়ছে আপাতদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভ এই গুণধরকে যখন একবার বলি Racine-কে দেওয়া Boileau-র উপদেশ: 'You must learn to write effortless verse with difficulty', তখন তিনি আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন, আর যখন দেখাই কোন্ এক ফরাসীর কথা: 'Souffrir passe; avoir souffert ne passe jamais' ('যন্ত্রণা কেটে যায়, কিন্তু যন্ত্রণাভোগের চেতনা কখনো কাটে না'), তখন একেবারে অভিভূত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। বোম্বাইয়ে এখনো নাকি মাঝে মাঝে ফিল্‌ম্ করেন হরীন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনি আমাদের যুগের একজন বিচিত্র গুণান্বিত মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে নিজক্ষেত্রে পথিকৃৎ।

কম্যুনিস্ট পার্টি যখন দেশের জীবনে আন্দোলনের শিকড় সন্ধানেই সাহিত্য ও শিল্প ব্যাপারে বিপুল জিজ্ঞাসা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, তখনই স্বাভাবিকভাবে হরীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য গুণী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে অন্ধেরিতে প্রধানত পি.সি.জোশীর উৎসাহে আই.পি.টি.এ.র যে শিবির স্থাপিত হয়, সেখানে পূর্বোক্তদের বাদ দিয়েও আন্না ভাই সাথে, যশবন্ত ঠক্কর, অমর শেখ্, শান্তি বর্ধন, রবিশংকর প্রভৃতিকে আমরা পেয়েছিলাম। অকাল-মৃত্যু শান্তি বর্ধনের মতো সংহত শিল্পীকে ছিনিয়ে নিল; রবিশংকর পরে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রতিভার চর্চা করে দেশের মুখোজ্জ্বল করে চলেছেন— তবে আমাদের অহংকার তাঁরা আমাদের সাথী ছিলেন, মনে পড়ছে (যা হয়তো অনেকের অজানা) যে ইক্‌বাল-কৃত 'সারে জহাঁ সে অচ্ছা হিন্দোস্তান্ হমারা' গানটি পূর্বে যে বিলম্বিত লয়ে করুণ কণ্ঠে বেহালার মূর্ছনার সঙ্গে গাওয়া হত, তাকে একেবারে নতুন, তেজস্বী সুর তখন দিয়েছিলেন রবিশংকর।

ভাবতে ভালো লাগে যে হয়তো এ-সব ব্যাপারের জন্যই ১৯৪৮ সালে পার্টি যখন নিষিদ্ধ, তখনই পার্টিকে সাহায্য করার জন্য কলকাতায় জল্‌সা হয়েছিল, আর বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রমুখ গায়ক আনুকুল্য প্রদানে ইতস্তত করেন নি।

'৪৬ নং'-এ তখন আসত নানা দেশের কম্যুনিস্ট— শুধু ব্রিটেন, আমেরিকা নয়, আসত অন্য বহু দেশ থেকে, আসত নীগ্রো আর গ্রীক আর জাপানী-আমেরিকান— তারা কেউ কবি, কেউ শিল্পী, কেউ চিকিৎসক, কেউ সাধারণ শ্রমজীবী— তাদের একসূত্রে বেঁধেছিল সাম্যবাদ, আর তাই অতি সহজে ছাদের মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসার চেষ্টা করে তারা বাংলা আর হিন্দী আর উর্দু ইণ্টারন্যাশনাল কিম্বা রবীন্দ্রনাথ বা কারো জোরালো গান গাইতে চাইত, আলাপ করত নানা বিষয়ে, তাদের হৃদ্যতা অক্লেশে প্রকাশ হতে দেখতাম। এদেরই মধ্যে ছিল Clive Branson-এর মতো মরমী লেখক, Alun Lewis-এর মতো কবি, যুদ্ধ যার জীবনদীপ অকালে নিভিয়ে দিল, যে দেখেছিল এই বঞ্চিত, জটিল দেশে সৃষ্টির কী অপরিসীম ঐশ্বর্য চার দিকে ছড়ানো রয়েছে! নাম করার দরকার নেই, কিন্তু তারা কেউ কেউ এসেছে আমাদের বাড়িতে, স্বচ্ছন্দে বন্ধুতাস্থাপন করেছে, বুঝতে দেয় নি যে আমরা ভিন্ন জাতির মানুষ, শ্বেতাঙ্গ সামীপ্যে আমাদের তৎকালীন পরাধীনতা থেকে উদ্ভূত মনস্তাত্ত্বিক বিচলিতি ঘটতে দেয় নি। তখন সত্যই অহংকার হত ভেবে যে এমন পার্টি আমাদের, যা দেশবিদেশের নানা জাতির নানা গাত্রবর্ণের মানুষকে এভাবে কাছে টেনে এনেছে। এই অহংকারের কথাই নতুন করে মনে পড়েছিল পার্লামেণ্টে যাবার পর, যখন এক কংগ্রেসী বন্ধুর মুখে শুনি (বোধ করি ১৯৫৩ সালে) যে Aneurin Bevan দিল্লীতে আমার বক্তৃতা শোনার পর তিনি কতটা তারিফ করলেন জানতে চাওয়ায় বিলাতের 'লেবর'-নেতা হেসে বলেন যে ও-বক্তৃতা তো তিনি প্যারিস, রোম, ভিয়েনাতেও শুনেছেন! প্যারিস, রোম বা ভিয়েনা দেখে থাকলেও সেখানে কোনো কম্যুনিস্টের বক্তৃতা আমি শুনি নি, সুতরাং সাদৃশ্যের কথা যাচাই করতে পারি না। কিন্তু ভাবি, হয়তো বা কিছু আছে যা আমাদের যোগসূত্র, যা আমরা সর্বমানবকে গ্রথিত করার যোগ্য গ্রন্থি মনে করে থাকি। জানি না অত শত কথা, তবে গর্ব হয় বই-কি ভেবে যে দুনিয়া জুড়ে নতুন জীবন

প্রতিষ্ঠার কাজে এক হয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা নানান্ দেশের কমুনিস্ট। আর জানি যে নিজের দেশে মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘব করে নতুন জীবনের বনিয়াদ গড়বার কাজে না লেগে থাকলে তো সব চিন্তাই বৃথা, সব অহংকারই ছাই।

সে-যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে মহারথীদের মধ্যে 'বনফুল' আর মোহিতলাল মজুমদারকে কখনো কাছে টানতে পারি নি, পারা সম্ভব ছিল না, আমাদের সম্পর্কে তাঁদের অনপনেয় অনাত্মীয়তা। নানা কারণে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমরা কাছে পাই নি— একটা হয়তো তার কারণ সহজ সাধারণ বাঙালী মনের আবেগাতিশয্য তাঁর লেখায় লক্ষ্য করে একটা অস্বস্তি আমাদের অনেককে অন্ধ করে রেখেছিল বিভূতিবাবুর পর্যবেক্ষণ আর অনুভূতির ঐশ্বর্যের দিকে। এটা আমার এক দুঃখ, কবি জীবনানন্দের সঙ্গে কখনো কোনো নিকট সম্পর্ক স্থাপিত না হতে পারার জন্য— এর কারণ একেবারে আমার জানা নেই, হয়তো চিন্মোহন সেহানবীশের মতো কেউ অনুমান করে কিছু বলতে পারেন। মনে পড়ছে যে 'বুধবারের বৈঠকে' যখন সাহিত্য-সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের আলোচনা মাঝে মাঝে বিতর্কের গুমোট সৃষ্টি করছিল, তখন Laurent Casanova নামে এক ফরাসী কমুনিস্ট নেতার লেখা শিল্প ও সমাজতত্ত্ব -বিষয়ক এক পুস্তিকার অনুবাদ করেছিলাম। '৪৫ সালে কয়েকবার এসেছিলেন বহু বৎসর আমেরিকাবাসী চীনা অধ্যাপক চেন্ হান্ সেং, আধুনিক চীনা সাহিত্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করলেন, আমার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, '৪৬ সালে প্রকাশিত আমার লেখা *India Struggles for Freedom*-এর চীনা অনুবাদ করাবেন বলে আমাকে জানান পিকিং থেকে চীন বিপ্লব (১৯৪৯) বিজয়ী হওয়ার পর, অত্যন্ত আনন্দ পাই যখন আবার দেখি তাঁকে দিল্লীতে ১৯৫৫ সালে, মাদাম সুন্‌ইয়াৎ সেন-এর সমভিব্যাহারে। '৪৬ নং'-এ একবার দারুণ জমে গিয়েছিল 'মুশায়রা', যখন উর্দু গীতিকবিতার বাদ্‌শাহ্ জোশ্ মলিহাবাদি একধারে পরভেজ শহীদী আর অন্যধারে সাগর নিজামীকে নিয়ে কবিতার কলি রচনা আর আবৃত্তি (যা বাস্তবিকই গান) করলেন, অদ্ভুত ঘনিষ্ঠ এক মজলিস্ বসে গেল, গোটা আসর জুড়ে কী স্বচ্ছ স্ফূর্তি, কী সাযুজ্যের সহজ উল্লাস! বর্তমানে পাকিস্তানবাসী জোশ্ নিজেকে এখন দুঃখ করে বলেন 'জোশ্ মরহুম'! একটু পরের কথা মনে ভেসে আসছে—'৪৬ নং'-এ এলেন রজনী পাম দত্ত, স্বাধীনতার পর

এলেন জোলিও ক্যুরি আর বার্নাল, এলেন বিজ্ঞানী জে.বি.এস. হলডেন আর কবি ম্যাক্‌নীস্‌. এলেন গিয়ানার নেতা জাগান আর বার্নহাম, চেকোশ্লোভাকিয়ার বাংলা পণ্ডিত দুষান্‌ জহ্বাবিটেল, সোভিয়েট দেশের পুডভ্‌কিন্‌, চেরকাসভ্‌, টিখনভ্‌. জেরাসিমভ, :তুরসুনজাদে, রশিদ বেবুটভ্‌ (গাইলেন 'সারে জহাঁ সে অচ্ছা'), এলেন আমাদেরই সঈফুদ্দীন কিচলু, সুন্দরলাল, পৃথ্বীরাজ কাপুর। একটা আলোচনা সভায় (সম্ভবত '৪৪ সালে) বেশ একটু অপ্রতিভ বোধ করার স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। পূর্বেই বলেছি, আমরা পাকিস্তান দাবির পিছনে সংগত যুক্তির সন্ধান করেছিলাম, বহুজাতিক ভারতবর্ষে সর্বসম্মত রাজনৈতিক সমাধানের অন্বেষণে ছিলাম এবং সেজন্যই আমাদের সদিচ্ছায় মুসলিম লীগের কারো কারো আস্থা ছিল (যেমন ছিল রাজাগোপালাচারি বা ভুলাভাই দেশাইয়ের মতো কংগ্রেস নেতা সম্বন্ধে)। পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি নামে এক সংস্থার উদ্ভব তখন হয় ('রেনেসাঁস্‌' কথাটি থেকে শেষ অক্ষর লোপের দায়িত্ব সম্ভবত আমাদেরই সংশ্লিষ্ট পাণ্ডিত্যখ্যাতিমান্‌ কয়েকজনের উচ্চারণ-বিভ্রম !)। বোধ হয় এদেরই পক্ষ হতে '৪৬ নং'-এ আসেন আবুল মনসুর আহ্‌মদ, হবিবুল্লাহ্‌ বাহার (দুজনই পরে কিছুকাল পাকিস্তানের মন্ত্রী) এবং আরো কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিক বন্ধু। সেদিনই বোধ হয় শুনি কবি শাহাদাৎ হোসেন-এর পঙ্‌ক্তি : 'মন্বন্তরে মনু চলে যায়, নব সংহিতা আসে' ! মনসুর সাহেব দেশ-বিভাগের স্বপক্ষে বলেন, ভারতীয় পদ্ম আর বসরাই গোলাপের মতো দুটো রাষ্ট্র স্বস্তিতে সহ-অবস্থান করবে না-ই বা কেন, আর প্রসঙ্গক্রমে অনুযোগ করেন যে হাজার বছর পাশাপাশি থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মুসলিম চরিত্র সৃষ্টিতে কুণ্ঠিত, আর শরৎ চন্দ্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডক্টরেট' প্রাপ্তি উপলক্ষে আশ্বাস দিতে হয় যে চেষ্টা করবেন মুসলমান জীবনের ছবি আঁকতে। কথায় কথায় মুসলিম বাঙালী লেখকদের রচনা সম্পর্কে পাঠক সাধারণের ঔদাসীন্য উল্লিখিত হওয়ায় আমি বলে বসি যে তাঁদের মাসিকপত্র ইত্যাদি পেলে বড় ভালো হয়। তৎক্ষণাৎ মনসুর সাহেব বলেন, 'হীরেনবাবু, এখনো হয়তো রেওয়াজ আছে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলেই বাইবেল সোসাইটি থেকে বিনামূল্যে একখানি সুদৃশ্য 'বাইবেল' মেলে, কিন্তু বিনামূল্যে পাওয়া বলে কেউ বড়ো একটা তা পড়ে না— আপনারা দয়া করে আমাদের লেখাগুলো কিনেই পড়ুন-না কেন ?'

ফিল্‌ম্‌ নিয়েও '৪৬ নং' কিছুটা মাথা ঘামিয়েছে— শুধু সোভিয়েট থেকে পাওয়া ছবি (যার কতকগুলি একেবারে অপূর্ব) নিয়ে নয়, একবার তো দু'দিন ধরে জ্যোতির্ময় রায়-এর 'উদয়ের পথে' (হিন্দীতে 'হমরাহী') নিয়ে আলোচনা চলেছিল। জ্যোতির্ময়বাবু কিছুকাল আমাদের সহযোগী ছিলেন, লেনিন স্মৃতি উপলক্ষে জনসভায় এবং অন্যত্র বক্তৃতাও করেছেন। বাংলায় বোধ হয় প্রথম প্রকৃত প্রগতিশীল ফিল্‌ম্‌ 'ছিন্নমূল'-এর নির্মাতা নিমাই ঘোষ নিয়মিত আসতেন, ছবি তোলা সম্পর্কে বক্তৃতাও করেছেন; সোভিয়েট দেশে তিনি গিয়েছেন, 'ছিন্নমূল' সেখানে দেখানো হয়েছে। অসম্ভব ভালো কিছু সোভিয়েট ছবি সে যুগে আমরা দেখেছি; শুধু 'Suvorov'-এর মতো যুদ্ধকালে নির্মিত অনবদ্য ছবি নয়, বারবার দেখেছি Donskoi-পরিচালিত 'Childhood of Maxim Gorki', দেখেছি 'Kuban Cossacks,' 'Tale of Siberia', 'Peter the Great', 'Ivan the Terrible', 'Battleship Potemkin' প্রভৃতি ছবি। একবার শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে ছবিঘর ভাড়া করে সতু রায় নামে আমাদের এক বন্ধু নিজের উদ্যোগে আর কিছু অর্থক্ষয় করে একাদিক্রমে অনেকগুলি ছবি দেখালেন; নইলে দেখার উপায় ছিল সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির কাছ থেকে বিনামূল্যে ছবি চেয়ে নিয়ে, যা অনেকেই করতেন। এই সুবাদে আমার প্রথম সাক্ষাৎ তখন একান্ত তরুণ, অধুনা বিশ্ববিদিত, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে; তিনি এবং চিদানন্দ দাশগুপ্ত কলকাতা ফিল্‌ম্‌ সোসাইটির কর্ণধার ছিলেন এবং এফ.এস.ইউ.র সঙ্গে মিলে একবার ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেন। সবাই আজ জানে 'Battleship Potemkin' সম্বন্ধে সত্যজিতের শ্রদ্ধা; প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যাচ্ছে ঐ ছবির স্রষ্টা আইজেনস্টাইন আমেরিকায় গেলে কেবলই তাঁকে শুনতে হয় যে সোভিয়েট ছবিতে হাসিখুশি নেই, কে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, আপনার দেশে কেউ কখনো হাসে?', আর তখন আইজেন্‌স্টাইন বলেন, 'আপনাদের কথা ফিরে গিয়ে যখন বলব তখন আমার দেশের লোক হাসবে বটে!' ধর্মতলা স্ট্রীটে আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটে দীর্ঘকায় সত্যজিৎ এসে বসলেন, একটু কথা হল, আমায় দেখালেন তার নিজস্ব ফিল্‌ম্‌-গ্রন্থ-সংগ্রহের তালিকা, আমার মনে সন্দেহ রইল না যে এমন সংগ্রহ অন্তত এদেশে অতুলনীয়। তখন থেকে বহু বৎসর কেটে গেছে, 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু হয়েছে

সত্যজিতের সদা-অতৃপ্ত অথচ স্থিতধী প্রতিভার জয়যাত্রা, চলেছে সত্যসন্ধ শিল্পীর অবিরাম সৃষ্টি, গর্বভরে দেখছি চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে ভারত-মনীষার ভাস্বর প্রকাশ। সুখের বিষয় যে তিনি এই রাজ্যে সর্বগরিষ্ঠ হলেও একক নন্— অন্তত উল্লেখ করব দুজনের নাম, ঋত্বিক ঘটক যার মধ্যে বিকৃতির বেশ কিছু খাদ সত্ত্বেও প্রতিভার সোনা জ্বলজ্বল করে আর মৃণাল সেন, নব নব উন্মেষে দুঃসাহস আর আবেগ আর মানবিক সততায় যার কাজ অনন্য।

* * *

যুদ্ধের সময় ট্রেনে যাতায়াত একেবারেই সুখকর ছিল না, কিন্তু প্রচুর তখন ঘুরতে হয়েছে। সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতি কিম্বা অন্য যে-কোনো সুবাদে পার্টিরই কাজে রেলে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রায় বস্তাবন্দী অবস্থায় ঘোরার অভিজ্ঞতা হয়েছে। মনে আছে একবার যেতে হল রংপুরে, সন্ধ্যার পর ট্রেনে চড়ে জায়গা মিলল না, ঠায় দাঁড়িয়ে এবং মাঝে মাঝে উবু হয়ে বসে সময় কাটাতে হল পার্বতীপুর পর্যন্ত, যেখানে গাড়ি বদ্‌লে এবার বসার জায়গা পাওয়া গেল। মনে আছে মুঙ্গের যাচ্ছি, কী জানি কেন জসিডি জংশনে গাড়ি বদ্‌লাতে হল, সারা রাত গাদাগাদি বসে যাওয়া। মুঙ্গেরের কথা মনে হচ্ছে বিশেষ করে এজন্য যে সেখানে প্রথম দেখলাম কার্যানন্দ শর্মাকে, যার চেহারা কথাবার্তা ধরন-ধারণ থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল ইনি পুরো কংগ্রেসী, কিন্তু বহুকাল কংগ্রেস করার পর কম্যুনিজ্‌ম্‌কে তিনি একান্তভাবেই গ্রহণ করেছিলেন, কিসান আন্দোলনের প্রমুখ নেতা হয়েছিলেন, পার্টিতে সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়েছিলেন। আর ঐ মুঙ্গেরেই দেখলাম এক বাঙালী কমরেডকে, নাম অনিল মিত্র, শহর ও জেলার সর্ব-জনপ্রিয়, পার্টির প্রাণস্বরূপ— বহুদিনই কিন্তু তার সন্ধান পাই নি, জিজ্ঞাসা করে জেনেছি তিনি পার্টি ছেড়ে দিয়ে বিদেশে বসবাস করছেন। বাস্তবিকই 'সংসারোঽয়ম্‌ অতীব বিচিত্রঃ'।

পার্টির সাপ্তাহিকে নিয়মিত আমায় লিখতে হত, প্রকাশন-সংস্থা 'ন্যাশ-নাল বুক এজেন্সি'-র তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যেও ছিলাম। ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যাদের সঙ্গে তাদের মধ্যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, নিরঞ্জন সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায়ের নাম না করলে চলে না। নিরঞ্জনবাবু আর সরোজবাবু তো পার্টির বে-আইনী যুগেও আমার প্রধান যোগসূত্র ছিলেন সংগঠনের সঙ্গে।

'জনযুদ্ধ' অফিসে নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার মোলাকাৎ ছিল নিয়মিত; বিদেশী সংবাদ পর্যালোচনা আমায় করতে হত, আর সকালের রেডিও শুনে সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধের অপ্রকাশিত ভালো খবর আমার লেখায় ঢুকিয়ে মাঝে মাঝে নিরঞ্জনবাবুকে সুখী করতাম। তাঁর সহকারী আমি হয়ে বসলাম 'Red Aid' (অর্থাৎ পার্টি এবং আন্দোলনে জড়িত সকলের চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান) আর 'দীর্ঘমেয়াদী রাজবন্দী মুক্তি' আন্দোলনে। কম্যুনিস্ট পার্টিতে যে ক'জনকে আমার বন্ধু বলতে ভালো লাগে, তাদের মধ্যে ছিলেন নিরঞ্জনবাবু। মেছুয়াবাজার বোমা মামলার একদা বিখ্যাত আসামী এই মানুষটি অল্পবয়সে সন্ত্রাসবাদে আকৃষ্ট হন, পরে আন্দামান সমেত জীবনের বহু কঠোর ঘাটে জল খেয়ে বোঝেন যে সাম্যবাদ বিনা সমাজসমস্যার সমাধান নেই, স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতা নিয়ে পার্টিতে কাজ করতে থাকেন। ননী দাসগুপ্তের মতো ছেলে তাঁকে বলত 'মোটাদা'— আখ্যাটি মানানসই, কারণ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তিনি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। ননীর কথা বিশেষ করে মনে আসছে— সুদর্শন তরুণ, হাসিখুশি, 'মোটাদা'-র মতোই ক্রিকেট ভক্ত, আন্দামান ফেরত, পান খায় না, সিগারেট খায় না, অথচ হঠাৎ কালকর্কট রোগ তাকে হত্যা করল। মনে পড়ছে নিরঞ্জনবাবুর আর-এক শিষ্য, ধনীবংশের ছেলে সুনীল সেন, গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায় বে-আইনী ঠিকানায়, 'মোটাদা' ডাকলেই যে-কোনো কাজের জন্য তৈরি, অথচ যে বাড়িতে তার জন্ম তা হল ভবানীপুরের সুবিখ্যাত রৌপ্যালংকার ব্যবসায়ী 'লক্ষ্মীবাবু'-দের। নিরঞ্জনবাবু আজ নেই; পার্টিভঙ্গের সময় থেকে একটু যেন ব্যবধান এসেছিল, কিন্তু জানি তিনি সর্বদা চাইতেন পার্টি আবার জুড়ে এক হোক্, আর যেমন দেখেছি মুজফ্ফর সাহেবের বেলায়, তেমনই তাঁর আমার সম্বন্ধে মমতা অটুট ছিল। কয়েক বৎসর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, আমার কাছে এ-ক্ষতির পূরণ নেই।

'দীর্ঘমেয়াদী রাজবন্দী' বলতে বোঝাত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র ও অনুরূপ কয়েকটি মামলায় বহু বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ রাজনৈতিক বন্দী। এদেরই অন্যতমরূপে নিরঞ্জনবাবু এই মুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। এই সুবাদে কর্তৃপক্ষীয়দের কাছে তদ্‌বির এবং জনসাধারণকে

নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি ছিল আমাদের কাজ। কংগ্রেসে যোগেশচন্দ্র গুপ্তের (জে.সি.গুপ্ত, সাধনের পিতা) মতো কয়েকজন দীর্ঘমেয়াদী রাজবন্দীদের মুক্তি প্রয়াসে আমাদের সহায় ছিলেন। '৪৫ সালে বড়লাট লর্ড ওয়েভেল্-এর আহ্বানে সিমলায় যখন দেশের নেতাদের সম্মেলন হয়, তখন এই দীর্ঘ-মেয়াদী রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী, জওয়াহরলাল প্রভৃতিকে ওয়াকিবহাল করার জন্য জে.সি.গুপ্ত, নিরঞ্জনবাবু, স্নেহাংশু আচার্য এবং আমি সেখানে গেলাম। সব খরচের ভার নিল স্নেহাংশু; সে ছিল সবদিক থেকেই আমাদের কাণ্ডারী! টিকিট আগে মেলে নি, তাই স্নেহাংশুর 'প্ল্যান'-অনুযায়ী হাওড়া ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে আমরা ঢুকলাম প্রত্যেকে এক আনার প্ল্যাটফর্ম টিকিট নিয়ে, প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর কোথাও জায়গা নেই দেখে ঠেলে ওঠা গেল 'এয়ারকণ্ডিশন্‌ড্' প্রথম শ্রেণীতে, যেখানে দুটো কামরায় ভাগাভাগি করে স্থান মিলল—বলা বাহুল্য, টিকিটের দাম এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার স্নেহাংশুর। সিমলায় তার বোনের বাসা খালি পড়ে থাকায় অসুবিধা হল না, গুপ্ত সাহেবকে সগৌরবে একলা ঘরে ঢুকিয়ে আমরা তিনজন রইলাম অপর শয়নগৃহে—শীতের দেশ, নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিলাম, কিন্তু হরি! হরি! স্নেহাংশু এবং আমি বারবার জেগে উঠলাম বিচিত্র এক কোলাহল শুনে। ঘটনাটি কী বুঝতে একটু সময় লাগল—মনে হল যেন গভীর কোন্ বিবর থেকে মৃদু আর ঘূর্ণ্যমান্ এক ধ্বনি উপরে উঠে পক্ষবিস্তার করে হঠাৎ চলন্ত শকটের মতো শব্দ তুলে অর্ধ-মুহূর্ত একেবারে স্তব্ধ থেকে প্রচণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো আওয়াজে শান্তি পেল! বেশিক্ষণ সবুর করতে হল না, কারণ আবার আরম্ভ হল পূর্ণ ঐ প্রক্রিয়া, যা চকিত বিস্ময়ে দু'জনে শুনলাম। প্রথমে বাস্তবিকই বুঝি নি ঘটনাটা কী, কিন্তু স্নেহাংশুর ক্ষিপ্র মন আবিষ্কার করল যে আমরা শুনছি নিরঞ্জনবাবুর নাসিকা গর্জন, যদিও তিনি নির্বিকার, 'sleeping the sleep of the just', পার্শ্ববর্তীদের প্রতিক্রিয়া কেন, সর্ববিষয়েই তখন সংজ্ঞাহীন —বাস্তবিকই যখন একটুক্ষণ উচ্চগ্রামী নাসাশব্দ স্তব্ধ থাকত, তখন আমাদের ভয় হত যে শেষকালে দম আটকালো নাকি, কিন্তু কোনো দুর্দৈব ঘটে নি, সকালে উঠেছেন নিরঞ্জনবাবু, যেমন হাসিমুখ রোজ তেমনই, রাতের অন্ধকারে কী ঘটেছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 'বৌদি, আপনি নিরঞ্জনদাকে

'ডিভোর্স' করেন না কেন?' ব'লে স্নেহাংশু ঠাট্টা করেছে পরে অমিয়া দেবীকে, তিনিও হেসেছেন খুব।

গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলাম আমরা বোধ হয় Summer hill নামে বাড়িতে, যার মালিক ছিলেন রাজকুমারী অমৃত কাওর (পরে ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী)। দেখা করেছিলাম জওয়াহরলাল, মওলানা আজাদ প্রভৃতির সঙ্গে; জিন্নাসাহেবের নাগাল মেলে নি, তবে Cecil Hotel-এ (যেখানে তাঁর অবস্থান) এক ঝাঁক সাংবাদিক আমাদের প্রায়ই ঘিরে রাখত, আমাদের বক্তব্য বিষয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না, তবে চিত্রার্পিতের মতো শুনত নিরঞ্জনবাবুর আন্দামান-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা, বিশেষ করে ১৯৩৭ সালে বন্দীদের গণ-অনশনের কাহিনী, 'forced feeding'-এর বর্ণনা, জোর করে খাওয়াতে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে মুখে আর নাকে নল ঢোকাবার খবর, জবরদস্তির চাপে ফুসফুসের ভিতর নল ঢুকে গিয়ে বিপ্লবী মোহিত মৈত্র আর মোহনকিশোর নামোদাস-এর মৃত্যু, পরপর তিনজন সহ-বন্দীর মৃত্যু ও সাগর সমাধি সত্ত্বেও বাকি সবাই অটল, একটানা ৪৯ দিন উপবাসের পর রাজনৈতিক বন্দীরূপে স্বীকৃতি আদায়ের মধ্য দিয়ে আংশিক জয়, দেশের নেতাদের উদ্‌বেগ, রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী আকূতি, ইত্যাদি। কংগ্রেস লীগ নির্বিশেষে সবাই উন্মুখ হয়ে নিরঞ্জনবাবুর গল্প শুনত, আর প্রতিফলিত গৌরবে আমরা আনন্দ পেতাম।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পূর্বে কখনো একেবারে সামনাসামনি বসে কথা বলি নি। সিমলায় যে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গভীর কথা আমাদের হয়েছিল, তা একেবারেই নয়। হাসিঠাট্টাই করছিলেন তিনি, বন্দীমুক্তি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতেও পারেন নি, তবে মনে হল যে হিংসা অহিংসার কথা ততটা ভাবছেন না, ভাবছেন ইংরেজ সরকারের আসল মতলব সম্বন্ধে, কারণ দেশ যদি স্বাধীন হতে চলে তো এই বন্দীদের আর আটকে রাখার অর্থ হয় না। তবে গান্ধীজীর সঙ্গে দুটো সাক্ষাৎকারেই আমার কেমন যেন মনে হয়েছে, অদ্ভুত শক্তি মানুষটির, তিনি বুঝি পারেন অপরের মনের ঝড়কে অন্তত স্তব্ধ করে দিতে— জীবনে অন্তত কয়েকজনকে কাছে থেকে দেখেছি যারা প্রকৃতই মহৎ মানুষ, কিন্তু আর কারো সান্নিধ্যে ভাবি নি যে তিনি যেন অন্য গ্রহবাসী, ভিন্ন পর্যায়ের একজন, মুখে সরল হাসি ও সহজ কথা

কিন্তু কোথায় আত্মার অতলে তিনি স্বতন্ত্র। এ কথাই আবার মনে হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর, যখন হঠাৎ কলকাতার শান্তিভঙ্গ করে সাম্প্রদায়িক ছিঁচ্‌কে খুনোখুনি কয়েকদিন চলে, আর জ্যোতি বসু (এবং সম্ভবত বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়) আমাকে নিয়ে যায় বেলেঘাটায় গান্ধী যেখানে ছিলেন। সেবারও দেখেছি স্থিতপ্রজ্ঞ আনন গম্ভীর কিন্তু প্রসন্ন, মন আহত কিন্তু একেবারে অপরাস্ত, বাক্যে জ্ঞানী অথচ সরস, সকলের চিন্তার গুমোট যেন কাটাচ্ছেন কিন্তু কোথায় যেন একক তাঁর সত্তা, যার গভীরে মগ্ন থেকেই তাঁর শক্তি। বেশ মনে পড়ছে সে-রাত্রেই প্রভেদ চাক্ষুষ করলাম অন্যজনের তুলনায়— থিয়েটার রোড-ভবনে তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সোফার ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে দাঙ্গা নিবারণ বিষয়ে আলোচনা করছেন।

সিমলায় দেখা হ'ল আমার পুরোনো বন্ধু মিঞা ইফ্‌তিখার উদ্‌দীনের সঙ্গে। আমাদের সে Davico-তে চা খাওয়াল, সেখানে চোখে না পড়ে পারল না পাঞ্জাবীদের প্রাণপ্রাচুর্যের ছবি, জীবনটাকে উপভোগ করতে চায় তারা আর এমন ভাবে যে সবাই তা দেখে। ইফ্‌তিখার একবার বুঝি বলল, তোমরা বাঙালী, তোমাদের মগজে অনেক কিছু, কিন্তু আমরা পাঞ্জাবী, আমাদের বুকে এত হাসি যে চেপে রাখতে পারি না! পরে দিল্লীতে বসবাসের সময় এ কথা বহুবার মনে এসেছে, কিন্তু থাক্‌। সিমলায় কাজ সেরে ফিরলাম, ট্রেনে স্নেহাংশুর টাকায় প্রথম শ্রেণীর টিকিট, কিন্তু কাল্‌কা এসে দিল্লীগামী ট্রেনে স্থান নেই— গণ্যমান্য যাত্রীদের জন্য আগে থেকে সব 'বর্থ' ভর্তি। জে. সি. গুপ্তকে স্নেহাংশু তুলে দিল স্যার আজিজুল হক্‌-এর (তৎকালীন বড়লাট কাউন্সিলের আইন-সদস্য) 'সেলুনে', পরিচারকের স্থানও সেখানে নগণ্য নয়, কিন্তু বাকি তিনজন আমাদের বিপদ কাটে কেমন করে? স্নেহাংশু মুরুব্বি হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করল, অনেক দরজায় ধাক্কা দিয়ে হতাশ হল কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র সে নয়। কোনোক্রমে নিরঞ্জনবাবু এবং সে একটু ট্রেনের মেঝেয় জায়গা পেল আর আমায় তুলে দিল যে কামরায় ছিলেন আসামের 'প্রধানমন্ত্রী' স্যর্‌ মুহম্মদ সাদুল্লাহ্‌— এটা ছিল ছয়-বর্থ-ওয়ালা কামরা, সব কটাই দখল, তবে এক 'আর্মি অফিসর' প্রস্তাব করলেন তিনি এবং আমি মেঝেতে শুয়ে পড়ব, আর পেতে দিলেন

মস্ত একটা আস্তরণ। পরদিন ভোরে উঠে সাহুল্লাহ্ সাহেব আমায় বলেন: 'আমি তো সারারাত জেগে থাকি, ঘুমোতে পারি না, তাই দেখে হিংসা হচ্ছিল আপনি যেভাবে বিছানায় পড়েই ঘুমোলেন— ভাবছি আপনাকে যদি দাঁড়িয়েও থাকতে হ'ত তো নিদ্রায় ব্যাঘাত হত না!'

* * *

পার্টি অফিসে রোজ একবার অন্তত হাজিরা না দিতে পারলে তখন যেন ভাত হজম হ'ত না (আজ এ রেওয়াজ লোপ পেয়েছে)— এটা কষ্ট-কল্পিত বাক্য নয়, প্রকৃত ঘটনা। পূরণচন্দ্ জোশীর আমলে আমাদের পরস্পর বন্ধনে যেন একটা পারিবারিক মনোভাব ছিল। ২৪৯ নং বৌবাজার স্ট্রীটকে কিসান সভা আর ট্রেড ইউনিয়নের জিম্মায় রেখে পার্টি কিছুকাল যখন ক্যাম্বেল (বর্তমানে নীলরতন সরকার) হাসপাতালের সামনে এক বাঁধানো গলির শেষে অফিস বসায় (এখান থেকেই আমাদের প্রথম দৈনিক 'স্বাধীনতা' প্রকাশ হয়েছিল, বোধ হয় ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ তারিখে), তখন রাতভোর সভা হয়েছে, পরস্পরের (এবং নিজের) আত্ম-সমালোচনা ('self-criticism') করে আন্দোলনকে যথাসম্ভব জোরদার করে তুলতে। জোশীর মানসিকতায় আর কাজের ধরনে একটা দিক ছিল যাতে আবেগের আতিশয্য অবশ্য কিছুটা থাকত কিন্তু আমাদের মতো মানুষের বিচারে তাতে ক্ষতি ছিল না, বরং ছিল উপ্রি একটু স্বস্তি, পরস্পর-মৈত্রী বিষয়ে একপ্রকার আস্থা। '৪২ সাল থেকে অনেক ঝড়ঝাপ্টা কাটিয়ে জাতীয় জীবনে পার্টির সতেজ ও সপ্রতিভ অবস্থিতি যে বস্তুর সাক্ষ্য দেয় তাকে সাফল্য বললে অসংগত হবে না। ইংরেজ শাসনের দমননীতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম ছিল অবিরাম; জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবি নিয়ে আমরা ছিলাম নিয়ত সোচ্চার; জগদ্ব্যাপী যুদ্ধে স্বাধীনতা ও প্রগতির শত্রু ফ্যাশিজম্-এর পরাজয় আমরা চাইতাম একান্তভাবে, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিবিধ দুর্বৃত্তি রোধে আমরা সর্বদা উদ্যত ছিলাম; কংগ্রেস ও লীগ-নেতাদের মধ্যে বোঝাপড়া বিনা বৈরী সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা সম্ভব নয় বলে আমরা সে-বিষয়ে সর্বশক্তি নিয়ে সচেষ্ট থাকি; '৪৪ সালে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার সংঘটনে আমাদের অবদান অল্প ছিল না, আলোচনার ব্যর্থতার পরও জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমাদের প্রযত্নে হানি ঘটে

নি ; '৪৫-৪৭ সালে দেশব্যাপী যে জনবিক্ষোভ ও অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তাতে-এজন্যই আমাদের স্থান ছিল সুস্পষ্ট, কয়েক বৎসর ধরে আমাদের নামে ক্রমাগত কুৎসা রটনাতেও দেশবাসী আমাদের প্রতি বীতরাগ হয় নি। কেউ কেউ হয়তো বলবেন সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে '৪৩ সালে আমরা কটূক্তি করেছি— অস্বীকার করব না, আমাদের পক্ষ হতে উত্তরকালে পার্টি-সম্পাদক অজয় ঘোষ মার্জনাও চেয়েছেন, কিন্তু কেমন করে ভুলব যে তখন আমাদেরও অসংখ্যবার শুনতে হয়েছে 'দেশদ্রোহী' অপবাদ, যার চেয়ে নোংরা নিন্দা আর নেই, আর তৎকালীন পরিস্থিতিতে বিদেশে, ফ্যাশিস্ট-অধিকৃত দেশে প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানারও উপায় ছিল না, যেটুকু ছিল তাও ছিল অর্ধসত্য অর্ধভ্রান্তিতে ভরা। সোভিয়েট 'নিউ টাইম্‌স্' পত্রিকার প্রাক্তন নাম ছিল *War and the Working Class* ; তাতে দেখেছি বার্লিন ও টোকিও-নিবাসী 'দুই বসু' সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা, তখনই অবিশ্বাস করা সম্ভব বা স্বাভাবিক ছিল না। সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে সোভিয়েট এবং পূর্ব জার্মান সূত্র থেকে নির্ভরযোগ্য যে-সব তথ্য এসেছে, সেজন্য যাঁকে দেশবাসী 'নেতাজী' আখ্যায় ভূষিত করেছে তাঁর মূল্যায়ন আজ অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু যুদ্ধকালে, ফ্যাশিস্ট দানবিকতার উল্লসিত দম্ভের দিনে, কেমন করে সে-মূল্যায়ন সম্ভব ? সুভাষ-চন্দ্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা এখানে বিবেচ্য নয় ; যথাস্থানে তার বিশ্লেষণ দেশ পাবে ভরসা করি ; এখানে শুধু বলি যে বহু কটুকাটব্য ঐ-যুগে আমরা শুনেছি কিন্তু দেশের জনমানসে আমাদের স্থান থেকে কেউ আমাদের ভ্রষ্ট করতে পারে নি।

মনে আছে '৪৩ সালে মহাত্মা গান্ধী কারাগারে অনশন করলেন, আর সারা দেশ অসম্ভব উতলা হয়ে পড়ল। মির্জাপুর (বর্তমানে শ্রদ্ধানন্দ) পার্কে বিরাট সভা, আয়োজনে কম্যুনিস্টরাই অগ্রণী ; সভাপতি হলেন শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যার বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা ব্যাপকতা নিশ্চয়ই ছিল, যার ফলে সাম্প্রদায়িকতা-দোষবিমুক্ত না হয়েও বহু শুভকর্মে তাঁকে আমরা পেয়েছি ; আমাদের পক্ষ থেকে বললেন তীক্ষ্ণধী বাগ্মী, সোম-নাথ লাহিড়ী— মনে আছে গান্ধীকে তাঁর সম্বোধন : 'হে গুরু ! হে পিতা !', আর স্বদেশী যুগের গায়ক হরেন্দ্রনাথ ঘোষের তেজস্বী কণ্ঠে গাওয়া 'অবনত

ভারত চাহে তোমারে, ওহে সুদর্শনধারী মুরারি!' এখানে হঠাৎ মনে এসে গেল '৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি গান্ধী-হত্যা সংবাদে মুহ্যমান আমাকে বলা হয়েছিল দৈনিক 'স্বাধীনতা'-র জন্য মহাত্মা বিষয়ে লিখতে— যা লিখেছিলাম তা (সংগত কারণেই) সম্পাদক লাহিড়ীর মনোমত হয় নি, তিনি গোটা পাতা জুড়ে 'হেডিং' ছাপিয়েছিলেন: 'ক্ষোভ নয়, ক্রোধ!' ভারতমানসে গান্ধীর স্থান নিরূপণ তো সহজ কর্ম নয়।

'৪৫ সালের শেষ দিকে পার্টির নির্দেশে যারা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম তারা সবাই একযোগে পদত্যাগ করি। ঐ সময় কিছুকাল আমি কাশীতে কাটিয়েছিলাম; কম্যুনিস্ট-বিরোধিতাকে জনমনে কতটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তার প্রমাণ পেলাম রাস্তায় ছোট্ট ছেলেমেয়েরা খেলাব্যপদেশে ছড়া কাটছে শুনে: 'এক-দো, লাল ঝণ্ডা ফেক্ দো!' তা সত্ত্বেও আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন কাশী বিদ্যাপীঠের বন্ধুরা, বক্তৃতা করালেন, আলোচনায় বসালেন— শুধু একটু ক্ষুব্ধ হয়ে দেখলাম যে ওখানকার তৎকালীন অধ্যক্ষ, আচার্য নরেন্দ্রদেব, ঘটনাচক্রে কিম্বা বিরক্তিবশে উপস্থিত ছিলেন না, কম্যুনিস্ট ছাত্ররা সংখ্যাল্প হলেও সাহস করে আমাকে নিয়ে গেল কম্যুনিজ্‌ম্-বিরোধিতার কেন্দ্র বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে— বক্তৃতা করলাম, শ্রোতাদের মধ্যে বৈরিতা ছিল, তবে অশালীনতা কেউ দেখায় নি, পরিচিত হলাম উড়িষ্যার খ্যাতনামা কংগ্রেসী বিশ্বনাথ দাশের ছাত্রনেতা পুত্রের সঙ্গে। কাশীতে বাঙালীটোলাস্কুল ইত্যাদি জায়গায় ছোটোবড়ো কয়েকটা সভা করলাম; প্রাচীন বাঙালীদের মধ্যে দেখলাম মহেন্দ্রনাথ রায়কে, যিনি ম্যাক্সিম গর্কি এবং লেনিন সম্বন্ধে লিখেছিলেন, যাঁর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে দু'জনকে আমার বেশ মনে রয়েছে— চুঁচুড়ার সুবোধ রায় আর শিলচরের নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম, যাদের মতো উদারচেতা, চিন্তাশীল, দরদী সাহিত্যিক যে-কোনো সমাজে বিরল। কাশী আমার আগেই দেখা, কিন্তু আবার মজলাম বিশ্বনাথের গলি আর দশাশ্বমেধ ঘাটের মায়ায়, ভারতবর্ষের 'Eternal City' কাকে না মুগ্ধ করে? এই কাশীতেই '৪৫ সালের দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন আমাদের ছেলে লামা জন্মেছিল— সেদিন রবিবার, আলোঝলমল উৎসবের দিন— একটু না-হয় জাঁক করেই বলি যে এসত্ত্বেও শিশুর জন্মক্ষণে গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান নিয়ে

লামার মা বা আমি কল্পনা করতে চাই নি, আমার মেয়ে রিণির মতোই লামারও জন্ম-পত্রিকা কখনো করানো হয় নি।

যুদ্ধ চলাকালে ইংরেজ সরকার কিছুতে দেশের মুক্তির দাবির সামনে ভাঙতে বা মচকাতে রাজী হয় নি, আর আমরাও নিজেদের ঘর সামলে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে দাঁড়াতে পারি নি। যাই হোক্‌, ঐতিহাসিক ভূমিকম্প যে একটা তৈরি হচ্ছে, তা সবাই বুঝেছিলেন, আর কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে একটা ঔৎসুক্য অপ্রত্যাশিত জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের জজ টৌরিক্‌ আমীর আলির কথা আগেও বলেছি; মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধের একজন প্রধান ও পণ্ডিত প্রবক্তা, প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য আমীর আলির ইনি পুত্র; আশা করি ইংলণ্ডে অবসরজীবন এখন স্বস্তিতে যাপন করছেন। আমার উপর তাঁর কেমন একটা মায়া ছিল; মনে আছে একবার বললেন 'এসো আমার বাড়িতে, তোমাদের কয়েকজন red hot Communist-কে সঙ্গে এনো, ব্রেকফাস্ট খাবে আমার সঙ্গে'। যথারীতি স্নেহাংশুর শরণ নিয়ে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। অনেক মনোরম স্মৃতি রয়েছে তাঁর সম্বন্ধে— একবার হাই-কোর্টে দোদোর সঙ্গে তাঁর চেম্বারে মধ্যাহ্ন-অবসরের সময় যেতে লিখে পাঠালেন: 'ভিতরে চলে এসো, যদি গল্পগুজবের জন্য তো নিশ্চয়ই, আর যদি কোনো কাজে, তো না!' হাইকোর্টে আমাদের বন্ধুমহলে পার্টিদরদীদের সংখ্যা তখন বেড়ে চলেছে, নাম করে কারো উল্লেখ না-হয় নাই করলাম। কলেজে অধ্যাপকদের মধ্যে তখন নিজস্ব সংগঠনের চিন্তাও জেগেছে; পার্টি সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা বেড়েছে। কলেজ কাউন্সিলের কর্ণধার, বর্ষীয়ান্‌ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা) আমাকে স্নেহ করতেন, আর হয়তো সেজন্যই তিনি আগের যুগের মধ্যপন্থী আর আমি নতুন যুগের সাম্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ডেকে ভার দিলেন তাঁর আইনবিষয়ক সাপ্তাহিক *Calcutta Weekly Notes*-এ সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখার। আশ্চর্য হয়েছিলাম কারণ আইন-ব্যাপারে মনঃসংযোগ করি নি, সাফল্যের হিসাবে একরকম ছন্নছাড়া জীবন কাটিয়েছি, গড়্‌গড়্‌ করে ইংরিজী বলতে পারা সত্ত্বেও আদালতে পসার জমাবার চেষ্টামাত্র করি নি। কিন্তু চৌধুরী সাহেব (ব্যারিস্টার হিসাবে নামের সঙ্গে 'মহাশয়'-এর বদলে

'সাহেব' ছিল চল্‌তি।) বললেন যে চারুবাবু (নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অগ্রজ) নিছক আইন-সম্পর্কিত মন্তব্য লিখবেন আর আমি লিখব ব্যাপক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্ন নিয়ে। যার জায়গায় আমি বসলাম তিনি ছিলেন মস্ত ইংরিজীনবিশ বলে খ্যাত অ্যাড্‌ভোকেট ফণীভূষণ চক্রবর্তী ; হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হওয়ায় তিনি আর *Calcutta Weekly Notes*-এ লিখতে পারবেন না (পরে ফণীবাবু প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন, সর্বজনমান্য ব্যক্তি তিনি)। আইনে চারুবাবুর মস্তিষ্ক খুব সূক্ষ্মভাবে কাজের শক্তি রাখত, লিখতেনও ঝরঝরে ভাষায়— সুখের বিষয় এখন অবসর নিয়েও তিনি সক্রিয়। আবার সাংবাদিকতায় ঢুকে দেখলাম যে স্বদেশীযুগের 'জে. চৌধুরী' 'moderate' বলে বহুকাল পরিগণিত হলেও তেজস্বী মানুষ, ইংরেজ সাম্রাজ্য সম্পর্কে মনের কোনো দ্বিধা নেই, দেশাভিমানে কারো তুলনায় তিনি পশ্চাৎ-পদ নন্। আমি তাই লেখার স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, আর প্রথম দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখি তখন সদ্যস্থাপিত 'United Nations Organisation' বিষয়ে। এই 'U. N. O.'-র নামোল্লেখে মনে পড়ে যাচ্ছে যে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো শহরে '৪৫ সালের মে মাসে নূতন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রথম সম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ সরকার-মনোনীত স্যর্‌ আর্কট্‌ রামস্বামী মুদালিয়র আর কে একজন গিয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস পক্ষ থেকে স্থির হয় যে সম্মেলনে যোগদানের অধিকার না মিললেও কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠানো যাবে। কে কে গিয়েছিলেন মনে নেই, তবে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যে গিয়েছিলেন তা জানি। এই সভায় সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ্‌ বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে বলেন : 'A time will come when the voice of an independent India will be heard', আর আনন্দা-শ্রুতে উদ্‌বেল হয়ে ওঠেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী। এ ঘটনার কথা আমি তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি, যদিও মলোটভ-এর ঐ-বিবৃতি তখনই আমাদের কাছে সুবিদিত ছিল, তা নিয়ে বক্তৃতা করেছি, প্রবন্ধাদিও লিখেছি। আশ্চর্য নয় যে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীন হবার পূর্বেই, দেশবিভাগের আগে, '৪৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে ভারতবর্ষকে সোভিয়েট ইউনিয়ন কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়, নভিকভ্‌-কে ভারতে প্রথম রাষ্ট্রদূত বলে নিয়োগ ক'রে।

২৪

কলকাতার বাসিন্দা আমরা কখনো ভুলব না ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসের কটা পুণ্য দিনের কথা যখন জব চার্নক্ প্রায় তিনশো বছর আগে যে শহরে ইংরেজ সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিল সেখান থেকে অন্তত বাহাত্তর ঘণ্টা বিদেশী শাসন ভয়ে মুখ লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। দেশজুড়ে তখন অসন্তোষ, পুলিশ আর ফৌজের মধ্যেও তার অনেক লক্ষণ, সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজকে কড়া সাজা দেওয়ার যে মতলব ইংরেজ করেছিল দেশবাসী তাকে ভেঙে দেবার জন্য ব্যাকুল। কারো বুঝতে বাকি ছিল না যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোথাও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তার মুরোদ দেখাতে পারে নি, জাপানী বাহিনীর সামনে বিদ্যুৎগতি পশ্চাদপসরণ ছাড়া কৃতিত্ব তার প্রায় ছিল না। স্থানীয় অধিবাসীদের আনুগত্য দাবি করার সব অধিকার ইংরেজ শাসন হারিয়েছিল। দিল্লীর লালকেল্লাতে ঘটা করে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন নেতা শাহ্ নওয়াজ খান্, সায়গল আর ঢিলন-এর বিচারের ব্যবস্থা ইংরেজ করল, তখন আরো স্পষ্ট হল যে সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে যারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একজোট হয়েছিল তাদের সঙ্গে জাপানী ফ্যাশিজ্‌ম্-এর সম্পর্ক ছিল সামান্যই, বস্তুত জাপানীরা কখনো যথোপযুক্ত সাহায্য দেয় নি, বিমান বা যান্ত্রিক অস্ত্রশস্ত্র মোটেই আজাদ হিন্দ ফৌজকে দেয় নি, এমন-কি, আন্দামানের সার্বভৌম স্বত্ব নেতাজীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে দেবার 'ভান করেও আসল কর্তৃত্ব ছাড়তে চায় নি। আর সেখানকার ভারতীয়েরা প্রাণ ভরে চেয়েছিল স্বদেশের মুক্তি, চোখের সামনে ইংরেজের অকর্মণ্যতা আর অমর্যাদা দেখে জন্মভূমির শৃংখলমোচনের কামনা তাদের উদগ্র হয়ে উঠেছিল। লালকেল্লার সামরিক বিচারে কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ভুলাভাই দেশাই প্রখর আইনজ্ঞান ও যুক্তিনৈপুণ্য দেখান; জওয়াহরলাল নেহরু এই উপলক্ষে ব্যারিস্টারীর ধড়াচূড়া পরে আদালতে হাজির হন, সঙ্গে প্রবীণ স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু ও অন্যান্যকে নিয়ে। সারা দেশ জুড়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের যোদ্ধাদের মুক্তি নিয়ে তখন বিপুল উন্মাদনা; কলকাতা

যথারীতি ছিল আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকায়, আর ১৯শে নভেম্বর ছাত্রেরা অভিযান করল নিষিদ্ধ লালদিঘির (ড্যালহাউসি স্কোয়ার, অধুনা বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) দিকে, সশস্ত্র পুলিশ যথারীতি পথ রোধ করল,-ধর্মতলা স্ট্রীটে চাঁদনী এলাকায় গোটা রাস্তা ভর্তি হয়ে রইল ছাত্র ও অন্যান্য নাগরিকের ভিড়ে, অভ্যস্ত কায়দায় পুলিশের গুলি চলল, ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় শহীদ হলেন। এরপর দুদিনেরও বেশি সময় কলকাতার বুকে আগুন জ্বলতে থাকল। কংগ্রেস নেতারা সে আগুন নিভাবার চেষ্টায় পেরে উঠলেন না। লালদিঘির রাস্তা খুলে দিতে সরকার বাধ্য হল, আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন নায়কের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড মকুব করে দিতে হল।

সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু স্বয়ং ধর্মতলা স্ট্রীটে উপবিষ্ট ছাত্রদলকে. ঘরে ফিরে যেতে বলে দেখলেন তারা ঐ ধরনের উপদেশ মানতে রাজী নয়। শহরের মেজাজে তখন বিদ্যুতের স্পর্শ লেগেছে, বিপ্লবের চেহারা কেমন হয়ে থাকে তার একটা ক্ষীণ হলেও স্পষ্ট আভাস তখন পাওয়া গেল, পার্টির ভূমিকাও ছিল বিশিষ্ট। দুঃখের বিষয় কংগ্রেস নেতৃত্ব জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে সংগঠিত করা দূরে থাক্, তাকে প্রশমনের চেষ্টাই করলেন। বড়লাটের সঙ্গে তখন তাদের বহু বিচিত্র আলোচনা, বিলাতে যুদ্ধোত্তর নির্বাচনের ফলে লেবর পার্টি সরকার গঠন করায় তাদের বিপুল প্রত্যাশা, 'Wavell is sincere', এই ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল ক'মাস আগেকার সিমলা সম্মেলনের পর থেকে! নভেম্বরে কলকাতায় অমন মন-মাতানো ঘটনা আর দেশব্যাপী আলোড়ন সত্ত্বেও '৪৫ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কলকাতায় প্রস্তাব গ্রহণ করল যে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতির প্রকাশ করতে গিয়ে যেন সর্ব অবস্থাতেই "শান্তিপূর্ণ ও আইনসংগত" উপায়ে স্বরাজলাভ আমাদের উদ্দেশ্য তা মনে রাখতে হবে! অক্টোবর মাসেই সবাই মিলে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা কম্যুনিস্টরা দিয়েছিলাম বলেই আমাদের বাঁচোয়া। মুসলিম লীগ কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর ধারে-কাছে থেকেছে এমন কাউকে পেলেই অনেক আগে তাড়িয়েছিল; লীগের কাছে আমরা ছিলাম কংগ্রেসের পঞ্চম বাহিনী! কংগ্রেস-লীগের বিসম্বাদ আর ইংরেজের পোয়াবারো, এই পরিস্থিতি সমাপ্ত করাই ছিল আমাদের চেষ্টা, কিন্তু '৪৫-৪৬ সালের পরম মুহূর্তেও দেশের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের

ভূমিকা হয়ে রইল খর্ব, খণ্ডিত, পঙ্গু। গান্ধী, নেহরু, আজাদ-প্রমুখ সবাই গোপনে কলকাতার লাট বাড়িতে গভর্নর Casey-র সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করে দেশকে জানালেন অহিংসার পথ আঁকড়ে থাকতে হবেই। মনে পড়ছে কিছু কিছু ভিতরকার খবর পেতাম কেসি-র খাস প্রাইভেট সেক্রেটারি John Irwin-এর কাছ থেকে। জন্ তখন সদ্য এদেশে এসে আমাদের বন্ধু হয়েছে। ভারতীয় শিল্পে দারুণ আগ্রহ তার; চৌরঙ্গী টেরেসে যতীন মজুমদার মশায়ের বাড়িতে চিত্র সংগ্রহ দেখতে একদিন হাজির; হঠাৎ দেখি জন্ অন্যমনস্ক, তাকিয়ে আছে বাইরে। বলল মেঘের এমন রঙ কখনো দেখি নি— পরে সে ভারতীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়েছে। ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টিতেও বেশ কিছুকাল থেকেছে, এখন সম্ভবত লণ্ডনে এক বিখ্যাত মিউজিয়মের সংরক্ষক।

নভেম্বরের ঘটনাকে ছাপিয়ে গোটা দেশে দুন্দুভি বেজে উঠল '৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে অন্তত চারদিন আবার কলকাতা শহর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গ্রাস থেকে নিজেকে ছিনিয়ে রেখেছিল। এবার উপলক্ষ হল আজাদ হিন্দ ফৌজেরই আবদুর রশীদ আলির মুক্তি— ইংরেজ চেয়েছিল যাতে হিন্দুরা দাবিতে না যোগ দেয়। কিন্তু কে রোধ করবে সেদিনের জলতরঙ্গ? বাংলার মুসলিম লীগ-পন্থী 'প্রধানমন্ত্রী' হুসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দি স্বয়ং বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিলেন কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে। ব্যর্থ চেষ্টা করতে পারি শুধু সেদিনের উন্মাদনার চেহারা আঁকতে— তবে পাঠককে বলব, সংগ্রহ করে পড়ুন মানিকবাবুর লেখা 'চিহ্ন', যাতে রয়েছে রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিনের অবিস্মরণীয় ছবি, আর তারাশঙ্করবাবুর 'ঝড় ও ঝরা পাতা', যা হল ফেব্রুয়ারি দিনগুলির প্রতিকৃতি— যে বলে বলুক লেখাটা ফোটোগ্রাফের ধরনে আর তাই নাক-তোলা বিচারে মহৎ শিল্প বুঝি নয়, কিন্তু যখন গণজাগরণ বিপ্লবের আকার নিতে চাইছে তখন তার অবিকল বর্ণনাতেই ফুটে ওঠে সৃষ্টিশীল শিল্পের প্রতিটি উপলক্ষণ।

মাদ্রাজ, করাচি, দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি বহু অঞ্চল থেকে তখন আসছিল নানা আকৃতির অগণিত অভ্যুত্থানের খবর। সারা দেশ অভূতপূর্ব উদ্দীপনায় জানল যে বোম্বাইয়ে Royal Indian Navy-র জাহাজে ভারতীয় নাবিকরা

বিদ্রোহ করেছেন (২১-২৩ ফেব্রুয়ারি '৪৬)। সাম্রাজ্যবাদ বাস্তবিকই প্রমাদ গণেছিল; সমরবাহিনীর কোথাও ফাটল ধরবে না এই ছিল তার জাঁক, কিন্তু কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে না জেনে সরকার মরিয়া হয়ে উঠল। এখানে বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নয়, তবে বলতে চাই যে বিদ্রোহী নাবিকদের সমর্থনে গোটা দেশ জেগে উঠেছিল। বোম্বাইয়ে প্রচণ্ড সর্বব্যাপী হরতাল; কংগ্রেস, লীগ এবং কম্যুনিস্টদের ঝাণ্ডা একত্র বেঁধে বিদ্রোহী নাবিকেরা উড়িয়েছিল, প্রত্যাশা করেছিল জাতীয় নেতাদের সমর্থন মিলবে। জওয়াহরলাল নেহরুর সংকোচবিহ্বল ভূমিকা আবার সবাই দেখলাম; একদিকে তিনি উল্লসিত যে 'ইংরেজ ভারতবাসী আর সামরিক বাহিনীর মাঝখানে যে লোহার প্রাচীর বানিয়েছিল তা ভেঙে পড়েছে', কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে সরকারের হাতে মস্ত কামান, যার কাছে বিদ্রোহীদের ছোটো বন্দুককে হার মানতেই হবে। আরো টীকা করলেন যে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর কায়দায় 'ব্যারিকেড' বেঁধে বিপ্লব সাধন সম্ভব নয়! বেমালুম ভুলে গেলেন তিনি যে জনতা আর দেশের ফৌজের মধ্যে রাখী বন্ধনের প্রাণমাতানো দৃশ্য যখন দেখছি আমাদের এই পরাধীন ভারতবর্ষে, তখন সংগ্রামের যে নব পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্তপ্রায় তাকে স্বাগত জানিয়ে আগুয়ান্ হওয়াই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। '৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে যিনি ক্রমশ গণবিপ্লব বিষয়ে চেতনা সংগ্রহ করে-ছিলেন নিজের গভীর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, সেই অরুণা আসফ আলি তখন মিনতি করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর কাছে— 'barricades'-এ যে লড়াই শুরু হতে চলেছে, তাকে আশীর্বাদ করুন! গান্ধী অবশ্য কর্ণপাত করেন নি; তবে শুধু তিনিই যে অহিংসা তত্ত্বের পূজারীরূপে অস্বীকৃত হলেন, তা নয়। স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদ '৪৬ সালের মার্চ মাসে বললেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন নেই: 'no immediate cause has arisen to join issue with the foreign rulers who are acting as caretakers!' অদ্ভুত এ কথা বলেও কিন্তু নেতারা পার পেয়ে গেলেন। এর কিছু পরে বিলাত থেকে ক্যাবিনেট মিশন আসে, আর কংগ্রেসী বড়ো কর্তাদের মধ্যে বোধ হয় সর্দার প্যাটেল ঘটা করে বলেন যে ইংরেজ তো চলে যেতে ব্যগ্র, আমাদের শুধু ধীরে সুস্থে তাদের তল্পিতল্পা বাঁধায় মদদ্ দিতে হবে (to help with

their packing)। ইংরেজ তখন অত্যন্ত কুটিল কায়দায় কংগ্রেস আর লীগের মধ্যে কালনেমির লঙ্কাভাগ-গোছের কাণ্ডকারখানা উস্‌কে মতলব হাঁসিলের চেষ্টায়, অথচ দেশের প্রধান নেতৃত্ব এমনই অথর্ব আর অসহায়, জনতার একান্ত কামনা থেকে বিচ্ছিন্ন। এ কথা বলে আনন্দ একটুও পাচ্ছি না, কারণ আমরাও তো তখন (এবং এখনো) দেশের সামগ্রিক হিসাবে সার্থক হস্তক্ষেপে অসমর্থ।

তবু স্মরণ করে বুক দশহাত হচ্ছে যে '৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে ইন্দো-চীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের দৌরাত্ম্যের বিপক্ষে কলকাতার ছাত্র সমাজ বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের ব্যবস্থা করেন— সেদিনও গুলি চলল, শহরের রাজপথ বাঙালী ছাত্রের বুকের রক্তে রাঙা হল। ভিয়েৎনামী বন্ধুদের কাছে আজও গর্বভরে বলি যে হো চি মিন্‌ এবং তাঁর অতুলন নেতৃত্বকে পূর্ণ সমর্থন জানাবার পরম্পরা আমাদের বাঙালীদের মধ্যে বহুদিন চলে এসেছে। হয়তো ভুলে যাব, তাই এখানেই বলে রাখি '৪৬ সালে স্বয়ং হো চি মিন্‌ কলকাতায় আসেন, এস্‌প্লানেডের কাছে ডেকর্স্‌ লেনে পার্টির প্রাদেশিক অফিসে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যান, তাঁর সঙ্গে তোলা একটি ফোটোগ্রাফ পার্টি অফিসে তখন ঝোলানো হয়েছিল, এখন বোধ হয় পশ্চিমবাংলা পুলিশের মহাফেজখানায় সেটা খুঁজে পেলেও পাওয়া যাবে।

সেদিনের মাতোয়ারা আবহাওয়ায় ২৩শে জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে এবং মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ দেশবাসী বিশ্বাস করতে চায় নি কখনো। আর ঐ দিন বিপুল উন্মাদনা সর্বত্র দেখা গিয়েছিল। পঞ্চাশবার শঙ্খধ্বনি করে সুভাষচন্দ্রের জন্মসময় সূচিত হল। মস্ত মিছিল বেরুল চতুর্দিকে, মনে পড়ছে একটা লরীর উপর স্বয়ং মেজর জেনারেল শাহ্‌ নওয়াজ খান (লালকেল্লায় বিচারে সদ্যমুক্ত), গায়কদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছেন অপূর্ব যে কুচকাওয়াজের গান আজাদ হিন্দ ফৌজের অবিস্মরণীয় অবদান: 'কদম্‌ কদম্‌ বঢ়ায়ে জা'! শাহ্‌ নওয়াজকে পরে ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনেছি লোকসভা-সদস্য (এবং মন্ত্রী) হিসাবে— একাধিকবার লক্ষ্য করেছি সুভাষচন্দ্রের উল্লেখে তার চোখে জল, যেমন দেখেছি আরো যেন তীব্রভাবে তার সতীর্থ জেনারেল ভোঁস্‌লের ক্ষেত্রে। এ-ধরনের আবেগ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত

অবশ্য আসে না। কিছু সন্দেহ নেই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার দিনগুলিতে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বমহিমা বহু ভিন্নপ্রকৃতির মানুষকেই অভিভূত করতে পেরেছিল।

* * *

'৪৫ সালের শেষদিকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় তৎকালীন অতি সংকীর্ণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে নির্বাচন হয় তাতে অমুসলমান আসনে কংগ্রেস এবং মুসলমান আসনে লীগ্ প্রায় পুরোপুরি জয়লাভ করে। '৪৬ সালের গোড়ায় নির্বাচন হল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায়। আর সেখানেও তার চেহারা হল অনুরূপ (বিভিন্ন প্রদেশে পার্টির পক্ষ থেকে ১০৮ জন প্রার্থী খাড়া করা হল ; কংগ্রেস এবং লীগের মিলিত কুৎসা আর সর্ববিধ কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতার মুখে ন'জন কম্যুনিস্টের সেদিন নির্বাচিত হওয়া নেহাৎ কম কথা ছিল না। নির্বাচন সভায় বক্তৃতা করার জন্য আমাকে যেতে হয়েছে চট্টগ্রাম, দার্জিলিং, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকায়। বক্তৃতা করার আগে রাত কাটিয়েছি স্নেহাংশু আচার্যদের প্রাসাদে। ময়মনসিংহ রাজবংশের বিখ্যাত আতিথেয়তার আস্বাদ অপরূপ লেগেছিল স্বয়ং স্নেহাংশু আমার সঙ্গী ছিল বলে, তবে মজা পেয়েছি দেখে যে রাজবাড়িতে নামার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট স্নেহাংশুর পদধূলি নিতে এল প্রায় শ খানেক চাকর বাকর। মানিকবাবুর সঙ্গে পদ্মাপার হয়ে চাঁদপুর যাওয়ার কথা আগেই বলেছি ; চট্টগ্রামে কল্পনা দত্তের নির্বাচন সভায় বক্তৃতা করেছি, পুরোনো পার্টিসভ্য রণধীর দাশগুপ্তদের বনেদী কবিরাজ বাড়িতে দুদিন একত্র থেকেছি। দার্জিলিং-এ ছিলাম কমরেড রতনলাল ব্রাহ্মণের বাড়িতে, সেখান থেকে চার হাজার ফুট নেমে পুলবাজার ময়দানে বক্তৃতা করেছি, গোর্খা বস্তিতে রাত কাটিয়েছি, মিছিলের সামনে অশ্বারোহণ পর্যন্ত করতে হয়েছে। আর ফেরার সময় দীর্ঘ চড়াই পথ পাহাড়ী ঘোড়ার পিঠে চলেছি। রতনলাল, জি. এল. খুব্বা, হামাল প্রভৃতি গোর্খা কমরেডরা ছাড়া ছিলেন ওঝা-জী নামে এক প্রবীণ ও অমায়িক বিহারী পার্টিনেতা যার কোনো খবর পরে আর রাখতে পারি নি। পার্টির পক্ষ থেকে বাংলায় তিন বিজয়ী প্রার্থী হলেন জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ (দার্জিলিং) আর রূপনারায়ণ রায় (রংপুর)। জ্যোতি জিতেছিল রেলশ্রমিকদের ভোট পেয়ে (তখন তাদের স্বতন্ত্র নির্বাচন কেন্দ্র) আর তার হাতে হেরেছিল

হুমায়ুন কবির। এর আগে স্বনামধন্য ফজ্‌লুল হকের কৃষকপ্রজা দলে যোগ দিয়ে হুমায়ুন কিছুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের ('কাউন্সিল') সদস্য ছিল, অধ্যাপনা ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রতিষ্ঠা, সাহিত্য বিষয়েও তার আগ্রহ প্রকাশ পেত তারই নিজস্ব 'চতুরঙ্গ' ত্রৈমাসিকে (আমার তো মনে হয় নানাদিকে প্রচুর সাফল্য আজীবন লাভ করেও হুমায়ুনের সাহিত্যখ্যাতি-কামনা অতৃপ্তই থেকে গিয়েছিল), কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালে হেমেন্দ্র-নাথ দত্তের মতো মুনাফালোভী ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কটু লাগত। জনমানসে যে স্থান অধিকার সে করতে পারত তা কখনো পারে নি। মনে আছে স্নেহাংশু আচার্য এবং আমি জ্যোতির পক্ষ হতে ভোট গণনায় উপস্থিত ছিলাম। হুমায়ুন ছিল; ফল ঘোষিত হওয়ার সময় হুমায়ুনকে বলেছিলাম যে সে ছাড়া আর কেউ অমন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত না, কিন্তু স্বভাবতই আমার এ স্তোকবাক্যে সে তুষ্ট হয় নি! যাই হোক্, জওয়াহরলাল নেহরু তাঁর *The Discovery of India* গ্রন্থে এই সময় আমাদের ভূমিকা সম্বন্ধে লেখেন যে আমরা ছিলাম 'ginger group' মাত্র, অর্থাৎ আবহাওয়াকে অল্প একটু ঝাঁঝিয়ে তোলার বেশি সাধ্য ছিল না। আমাদের শক্তি ও প্রভাব অবশ্যই ছিল সীমিত। কিন্তু যে বিপুল আয়োজন কংগ্রেস পক্ষ থেকে তখন হয়েছিল আমাদের পরাজয়ের উদ্দেশ্যে তা দেখে মনে হত যে এমন কামান দাগা কখনো শুধু মশা মারার জন্য হতেই পারে না। নেতাদের মধ্যে কে কতদূর শ্রেণীসচেতন ছিলেন অনুমান করতে যাব না, কিন্তু ভারতবর্ষের সেই ক্রান্তি মুহূর্তে কম্যুনিস্ট পার্টিকে পর্যুদস্ত করার ধনুক-ভাঙা পণ তৎকালীন বুর্জোয়া শ্রেণীচেতনারই সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল।

অস্ট্রেলিয়ন্‌ আর. জি. (পরে লর্ড) কেসি এখনো বোধ হয় জীবিত, ব্রিটিশসাম্রাজ্যের এক বহুদর্শী উপরওয়ালা হিসাবে মাঝে মাঝে আমাদের মতো অন্ধকার দেশে নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপ্তবাক্য শুনিয়ে থাকেন। কলকাতার লাট ভবনে কংগ্রেস নেতারা '৪৬ সালের ডিসেম্বরে তাঁরই সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ঘোষণা করেন যে 'আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি প্রচুর সহানুভূতি সত্ত্বেও 'শান্তিপূর্ণ ও আইনসংগত' উপায়ে স্বরাজ অর্জনের নীতি থেকে কংগ্রেস একতিল সরে আসবে না'। এজন্যই দেখা গেল বিলাত থেকে এক পার্লামেণ্টারি প্রতিনিধি দল এসে গুরুতর

রাজনৈতিক প্রশ্নের মোকাবিলার চেষ্টামাত্র না করে প্রায় প্রগল্ভ ব্যবহার করল, কংগ্রেস নেতাদের কেউ কেউ বিরক্ত হলেন। কিন্তু কংগ্রেস যেন গায়ে মাখল না, বরঞ্চ উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল 'ক্যাবিনেট মিশন'-এর প্রতীক্ষায়— শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের সঙ্গে ঝগড়া মিটাতে না পেরে কূটনীতির পরীক্ষাতেও হেরে গেল, সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠিটি তুলে দেওয়া হল ইংরেজের হাতে, ভরসা করে থাকতে হল সাম্রাজ্যবাদের বদান্যতার ওপর। '৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় অভূতপূর্ব হিন্দুমুসলমান দাঙ্গায় তখন দেশের পুঞ্জীভূত পাপ ঠিকরে পড়ে আমাদের মুখে কদর্য চুনকালি লেপে দিল, তার কয়েকদিনের মধ্যে জওয়াহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস-নেতা সাম্রাজ্যবাদের ভাঁওতায় মোহিত হয়ে এবং নিজেদের রণক্লান্তি আর সংগ্রাম-বিমুখিতার পরিচয় দিয়ে বড়োলাটের 'অন্তর্বর্তী সরকার'-এ ('Interim Government') যোগ দিলেন— কিছুদিন টালবাহানার পর লীগও সেই সরকারে প্রবেশ করল, গোটা কাণ্ডটাই যে ইংরেজ সরকারের প্ররোচনা আর পরিকল্পনা, তা কারো মগজে ঢুকল না।

নভেম্বর '৪৫ থেকে জুলাই '৪৬— বিশেষত এই আটমাস, (আর কলকাতায় দাঙ্গা সত্ত্বেও তার পরও) দেশ যেন বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। যে মাসে কাশ্মীরের মতো ইংরেজের বশংবদ রাজ্যে শেখ-আবদুল্লার নেতৃত্বে বিরাট অভ্যুত্থান দেখা গেল, স্বয়ং জওয়াহরলাল অবিরাম লাটবেলাট মহলে ভ্রাম্যমাণ হয়েও সেখানে কদিন গ্রেফ্‌তার হয়ে রইলেন। কোথাও-না-কোথাও হরতাল ধর্মঘট, মিছিল, জুলুম্ এ-সব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা— মনে পড়ছে কী এক দাবি নিয়ে ছোটো একটা শোভাযাত্রা চলেছে, ট্রামে সাধারণ মুসলমান সহযাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত মন্তব্য: 'অ্যায়সাহি হোনা, যহ্ হুকুমৎ খতম্ হোগী!' বিবিধ শ্রমজীবী বিক্ষোভের পরিণতি দেখা দিল '৪৬ সালের ২৯শে জুলাই সারা ভারতবর্ষে ডাক-তার ধর্মঘটের আকারে— সেদিন কলকাতার অভ্যস্ত জীবন শুধু স্তব্ধ নয়, নিদারুণভাবে আলোড়িত, শহরের সর্ববিধ দৈনন্দিন কর্ম ছিল বন্ধ আর সর্বক্ষণ মিছিলের স্রোত বয়ে চলেছিল ময়দানে। সেখানে সারাদিন কী অদ্ভুত গণ-চাঞ্চল্য! মুসলিম লীগনেতাদের অভিসন্ধি যাই হোক্-না কেন, তারাও যে বলতে বাধ্য হয়েছিল 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর কথা, তার মূলে ছিল জনতার উন্মাদনা। ১৬ই আগস্ট তারিখে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে যে

অনপনেয় কলঙ্ক অনুষ্ঠিত হল, তার পিছনে যে জটিল, কুটিল, ক্ষুদ্রস্বার্থ-প্রণোদিত কর্মকাণ্ড ছিল এবং নিপুণ সাম্রাজ্যবাদী দানবিকতার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ ভেদনীতি প্রয়োগ চক্রান্তের নগ্ন কদাকার দেখা গেল, তা ঘনায়মান জনবিক্ষোভকেই একেবারে বিপথে টানতে চেয়েছিল। দেশের মুক্তিপ্রচেষ্টা এতে ব্যাহত হল সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বোম্বাই প্রদেশে ওয়ারলি এবং অমলনের, মাদ্রাজে ত্রিচিনপল্লী ও কোয়েম্বাটুর, মহীশূরে কোলার, ত্রিবাঙ্কুরে ভায়ালার ও পুনাপ্রা, 'তেভাগা' সংগ্রামে মুখরিত বাংলার কয়েকটি জেলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের উন্নাও, বস্তি, আলিগড়, রায়বরেলি, আরো বহু অঞ্চলে জন-অভ্যুত্থান রোধের শক্তি কারো ছিল না। তখনই আরম্ভ হয় হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানা এলাকায় সাম্রাজ্যবাদের অনুচর নিজাম-শাহীর বিপক্ষে আন্ধ্রদেশের কৃষকদের ঐতিহাসিক লড়াই। 'বিদ্রোহ চারিদিকে বিদ্রোহ আজ,' এ তো শুধু সুকান্ত ভট্টাচার্যের কল্পনা ছিল না; কিশোর কবি সত্যই দেখেছিল তার কল্পনা বাস্তবে নামছে। প্রকৃতপক্ষে এই ছিল সময় সর্বশক্তি দিয়ে দেশের মুক্তি সাধনে নামার। সংগ্রাম এড়িয়ে শান্তশিষ্ট ভাবে স্বাধীনতা পাব আশা করে এই দেশকে যে মূল্য দিতে হয়েছে— দেশভাগের পূর্বে ও পরে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও আনুষঙ্গিক অজস্র কলঙ্কের মধ্য দিয়ে যে মূল্য দিতে হয়েছে, আজও ভিন্নরূপে হচ্ছে— সে-তুলনায় ইতিহাসের কোনো বিপ্লবকেই এত চড়া দামে কিনতে হয় নি। '৪২ সালে গান্ধীজী আগের তুলনায় জঙ্গীভাব কিছুটা দেখিয়েছিলেন। যদিও সংগ্রাম আরম্ভের পূর্বেই তিনি ও অন্যান্য প্রধান নেতারা হলেন বন্দী। তখন তিনি ধ্বনি তোলেন: 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'— ইংরেজকে 'নোটিস্' দিয়েছিলেন 'ভারত ছাড়ো', প্রত্যাশা করেছিলেন 'অল্পকালের দ্রুত সংগ্রাম' ('short, swift struggle') জয়ী হবে। লুই ফিশার-এর মতো সাংবাদিককে বলেছিলেন যে অরাজকতা একটু এলে ক্ষতি নেই, আর জমিদারের দল বোধ হয় 'পালিয়ে (আন্দোলনের) সহযোগিতা করবে'! '২০-২১ সালে একবার তিনি স্বীকার করেন যে মুসলমান ধর্মনেতারা অহিংসাপন্থী নন্। সুতরাং অহিংসার ফল না পেলে অন্যপথে যাওয়ার অধিকার তাদের আছে। '২৮ সালে একবার জওয়াহর-লালকে লেখেন 'ধনী আর বাক্যবাগীশ শিক্ষিত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে আন্দোলন করা উচিত, কিন্তু এখনো সে-সময় আসে নি'। '৪৫-৪৬ সালে

বেশ দেখা গেল যে গান্ধীজী এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের হিসাবে 'সে-সময়' কখনো আসার নয়— কারণ অহিংসা নীতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন না দিয়েই সেদিনের বিরাট বিক্ষোভকে জনতার বিজয়ে রূপায়িত করার সম্ভাবনা কম ছিল না। একথা বলে গান্ধীনেতৃত্ব সম্বন্ধে উন্নাসিক অহংকার প্রকাশ করতে চাইছি না— চাইব কেমন করে যখন আমাদের নিজস্ব শ্রেণীতে বিপ্লববোধ-সঞ্জাত সামর্থ্য ছিল এত করুণ ভাবে স্বল্প ও সীমিত।

* * *

বোধ হয় '৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে ইন্দোচীন থেকে ফ্রান্সে ফিরে যাবার পথে কলকাতায় কিছু সায়গঁ-প্রবাসী হাজির হয়েছিল— তাদের মধ্যে ছিলেন Karpeles নামে দুই ভগ্নী, যারা বুঝি এককালে রবীন্দ্রনাথের কাছা-কাছি ঘুরতেন, আর Monique Lange বলে এক মেয়ে, যাকে সম্ভবত প্রথম আবিষ্কার করেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (একদা পার্টির ছাত্রকর্মী, বর্তমানে সফল সাংবাদিক) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ সংক্রান্ত ভ্রমণ ব্যপদেশে। সুব্রতদের বালিগঞ্জ একডালিয়া রোডের বাসায় মনীক্ (সে বলত বাংলা 'মণিকা' নামটাই ভালো) কিছুদিন ছিল, তার নামকরণ বুঝি হয়েছিল 'পাগ্‌লী', সুব্রত-র মাকে 'মা' বলত, তাঁর হাতে মেখে দেওয়া 'ফলার'-এরও ভক্ত হয়েছিল। আমি মনীক্‌কে প্রথম সম্ভবত দেখলাম আই. পি. টি.এ.-র এক অনুষ্ঠানে, ভাঙা ফরাসী একটু চালালাম যদিও সে ইংরিজী বলতে পারায় তার দরকার ছিল না— আর সে কেমন যেন আমার অনুগত হয়ে গেল, সঙ্গে যেত নানা জায়গায়, সভাসমিতিতে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে, বিষ্ণুবাবুর বাড়িতে (যেখানে সে স্বচ্ছন্দ), গোপাল ঘোষ— নীরদ মজুমদার— রথীন মৈত্র— পরিতোষ সেন— প্রাণকৃষ্ণ পাল— বংশীচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি শিল্পীর ছবি দেখতে। তার এক বিমাতা এসেছিলেন, পাকা সায়গঁ-বাসিনী, চেহারায় চরস্ বা ঐ রকম কোনো মাদকে আসক্তির স্পষ্ট ছাপ (আসক্তির খবরটি অবশ্য দেয় মনীক্), ব্রিস্টল হোটেলে একবার দেখেছিলাম, ফ্রান্সের প্লেনের জন্য বিরক্তচিত্তে অপেক্ষমানা, একবার দেখাই ছিল যথেষ্ট। তাদের দেশে ফেরা নিয়ে গণ্ডগোল বুঝি কিছু হয়, যেজন্য কলকাতায় মনীক্ আটকে পড়ে, সরকারী খরচে একটা হোটেলে জায়গা যা হোক্ করে হ'ত, কিন্তু আমার খেয়াল হল তাকে দোদো অর্থাৎ

স্নেহাংশু আচার্যের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য তোলা। ইতিমধ্যে স্নেহাংশুর বিবাহ হয়েছিল সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে তিনকন্যার কথা আগে বলেছি তাদের মধ্যমা সুপ্রিয়ার সঙ্গে। কবি বিষ্ণু দে যে বন্ধুমহলে ঘট্‌-কালি-বিশারদ, তা আগেই বলেছি; তাঁরই প্রস্তাবে আমার ঘরে সুপ্রিয়া আর দোদোর আলাপ হয় (পূর্বেই অবশ্য তারা পরস্পরকে দেখেছিল), ক্রমে ঘনিষ্ঠতা ঘটে, এবং দোদোর পিতা সেকালে বদান্যতা ও অন্য বহু গুণে মণ্ডিত মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর সানন্দ সম্মতিতে তাদের পরিণয় হয়। যেদিন মনীক্‌কে দোদোর বাড়িতে হাজির করি, সেদিন সুপ্রিয়ার চেয়ে দোদোই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে, বলে কোথা-থেকে-জুটে-আসা এই ফরাসী মেয়েটার ওপর আমার মায়া এত কেন! মায়া অবশ্য পড়েছিল তার ওপর, সন্দেহ নেই। দেশে ফিরে, একাধিকবার বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ করে, সে এমন চিঠিও আমায় লিখেছে, নানাবিধ সম্বোধন করে, যা পড়লে অপরে কি ভাবতে পারে জানি না, কিন্তু আমি তো হাসি। দেশে ফিরে সে ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েই আমাকে চিঠি লিখে মনের উল্লাস জানায়, ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরী নিয়ে হাঙ্গামা উপলক্ষ করে পার্টি পরিত্যাগও সে করে— তারপর হঠাৎ শুনি বিষ্ণুবাবুর কাছে যে সে নাকি নামকরা লেখিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে, একখানা তার বইও (ইংরিজী অনুবাদে) বিষ্ণুবাবু আমাকে দেন। প্যারিসে Gallimard-এর বিখ্যাত গ্রন্থালয়ে কাজ করতে থাকলেও সাহিত্যিক খ্যাতি নাকি তার কতকটা হয়েছিল। '৫২-৫৩ সালে একবার সত্যেন বোস্‌ মশায় প্যারিস থেকে ফিরে আমায় বললেন, 'ওহে হীরেন, দেখলাম তোমার এক বান্ধবীকে, Gallimard-এর দোকানে, সে তো তোমার প্রেমে পড়ে রয়েছে এখনো, ব্যাপারখানা কি?' ব্যাপারখানা অবশ্য কিছুই নয়, আমাদের মতো ব্যক্তি এ-সব ব্যাপারে কিছুটা নীরস ও বঞ্চিত না হয়েই যে পারি না। যাক্‌, সম্প্রতি গত বৎসর হঠাৎ দিল্লীতে আবির্ভূত হয়েছিল মনীক্‌-এর এক কন্যা, যে থাকে মায়ের থেকে আলাদা, আর ধরন-ধারণে প্রায় যেন 'হিপ্পি', মনে হল চরস-আসক্ত দিদি-মার আদল পেয়েছে, 'গ্রামত্যাগেণ দুর্জনঃ'—নীতি অনুসরণ করাই শ্রেয় ভাবলাম। এর পরে আবার বহু বর্ষ পরে মনীক্‌-এর চিঠি পেয়েছি, মেয়ে সম্বন্ধে ব্যস্ততা নেই, আমার সম্বন্ধে আবেগ এখনো সোচ্চার, কিন্তু সেটা

অভ্যাসেরই বশে, শুধু ফরাসী ঢঙের ছোঁওয়ায় কথাগুলো একটু মনোহর, তার বেশি কিছু নয়।

'৪৬ সালের এপ্রিল মাসে রজনী পাম দত্ত এদেশে এলেন, দমদম বিমান বন্দরে পার্টির পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করা হল। ভারতবর্ষে কম্যুনিস্টরা বোধ করি তাঁর কাছে সব চেয়ে ঋণী নানা দিক থেকে বলে সবাই তাঁর আগমনে উৎফুল্ল হলাম। পূর্বে কখনো এদেশে আসার ছাড়পত্র পান নি, খাস ব্রিটেনের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও— যদিও এদেশ তাঁর জন্মভূমি না হয়েও পিতৃভূমি, কলকাতা রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের মহার্ঘতম রত্নের মধ্যে তিনি একজন। অক্সফর্ডে ছাত্র হিসাবে এই অসম্ভব যশস্বী তরুণ বয়সে সাম্যবাদ অবলম্বন করার বিপুল মূল্য দিতে কখনো সংকুচিত হন নি, আজীবন ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির প্রমুখ নেতার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন, *Labour Monthly*-র মতো অসাধারণ পত্রিকা প্রথম থেকে পরিচালনা করে আসছেন, *Modern India, Fascism and Social Revolution, World Politics, The Internationale, India Today* (এবং তার ক্রোড়পত্রাদি) প্রভৃতি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ রচনা করে আন্দোলনকে পুষ্ট করেছেন। পিতা উপেন্দ্রকৃষ্ণের স্মৃতিতে *India Today* উৎসর্গ ব্যপদেশে অল্প কথায় পিতৃভূমির প্রতি যে মমতা প্রকাশ করেছিলেন, তার পরিচয় তাঁর সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে পেলাম প্রচুর। দমদম বিমানবন্দর থেকে স্নেহাংশুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নিরঞ্জন সেনের সঙ্গে আমিও 'আর.পি.ডি.'-র মোটরে ছিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত তখন তিনি ; বিমানযাত্রা তখনো আজকের মতো আরামের ছিল না ; বমনভাবের দরুন একটু অসুস্থও ছিলেন। মনে আছে বললেন 'ক্লাইভ স্ট্রীট' দেখতে চান ; ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীকরূপে, তাঁর ইতিহাস-চেতনায় ঐ রাস্তার (আজ 'নেতাজী সুভাষ রোড') একটা ছবি হয়তো ছিল, দেখে একটু যেন হতাশ হলেন, যেমন আমরা লণ্ডনে Fleet Street কিম্বা Leaden hall street-এর প্রতীকসমৃদ্ধ পথ দেখে ভাবতাম এই-ই ব্যাপার!

কমরেড রজনী পাম দত্তের বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয় বোধ হয় '৪৬এর জুন মাসে, যখন তিনি ছিলেন বোম্বাইয়ে পার্টিকেন্দ্রে, জন্মোৎসব সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় আসা উপলক্ষে মহম্মদ আলি পার্কে বিরাট প্যাণ্ডাল

বাঁধা হয়, পার্টির অনেকে ছাড়াও কলকাতার বিদ্বজ্জন সেখানে ভিড় করেন, তথ্য ও বিশ্লেষণে অমূল্য এক ভাষণ শোনেন। তাঁর কাছাকাছি আমায় থাকতে হয়, ছোটো বক্তৃতাও করতে হয় যখন তিনি যান Red Aid চিকিৎসাকেন্দ্রে —সেদিন একটা প্রায় ঝাপসা হয়ে আসা ফোটোগ্রাফ দেখলাম যাতে আর-পি.ডি., মুজফ্ফর আহমদ্, নিরঞ্জন সেন, স্নেহাংশু আচার্য, ডাক্তার বিজয় বসু ('৩৭ সালের চীনে প্রেরিত ভারতীয় মেডিকাল মিশন খ্যাত) প্রভৃতির সঙ্গে আমি ছিলাম। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে কলকাতায় মে-দিবস উদ্‌যাপনে আর.পি.ডি.-র উপস্থিতি ও বক্তৃতা— ময়দানে বললেন, আকাশ তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন, যে-কোনো মুহূর্তে ঝড়জল নামবার আশঙ্কা, নিয়ে চলেছি তাঁকে পরবর্তী সভায় মেটিয়াবুরুজে, আকাশের ভাবগতিক দেখে তাগাদা দিলাম 'এখনই চলুন'; কিন্তু শান্ত সৌম্য প্রসন্ন মুখে শুধু বললেন: 'একটু বসি, আমার বক্তৃতা তরজমা হচ্ছে (করছিল কমরেড জলি), শেষ না হলে উঠি কেমন করে?' একটু অপ্রতিভ বোধ করলাম, কিন্তু বুঝলাম সৌজন্যে নিখুঁত এই মানুষটি— যে পরিচয় আমার মতো দূরাবস্থিত ব্যক্তিও একাধিক-বার পরে পেয়েছি। তরজমা শেষ হতে ছোটা হল গাড়িতে মেটিয়াবুরুজ, সভাস্থলে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই বজ্রবিদ্যুৎসমেত বৃষ্টিপাত, এমন বৃষ্টি যা বিলাতের লোক সাত জন্মে দেখতে পায় না ('raining not cats and dogs but lions and tigers'!)—কিন্তু শ্রমিকদের আগ্রহাতিশয্যে কিছুক্ষণের জন্য কমরেড দত্তকে নামতে হল, সভা হতে না পারলেও চেহারা দেখাতে হল, নইলে সবাই মুষড়ে পড়ত! গাড়িতে ফিরলেন একেবারে ভিজে, গায়ের চামড়া পর্যন্ত জল, আর তখন হল ভাবনা, কারণ জানতাম তাঁর শরীরের অবস্থা, বিলাতী হিসাবে অমন নাকানিচোবানির পর নিউমোনিয়ার আক্রমণ অব্যর্থ, যদি না অবিলম্বে কিছু ব্যবস্থা হয়। সুখের বিষয়, স্নেহাংশুর বাড়িতে তখনই তাঁকে গরম জলে স্নান করিয়ে গরম পোশাক পরিয়ে শুইয়ে দেওয়া গেল, গরম পানীয়েরও ব্যবস্থা বোধ হয় ছিল; কোনো দুর্ঘটনা আর ঘটে নি। শুনেছি পরদিন আবার গিয়েছিলেন মেটিয়াবুরুজে, কারখানার গেটে বক্তৃতা করেছেন, শ্রমিকরা অতবড়ো আন্তর্জাতিক নেতাকে অমনভাবে কাছে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়েছেন।

প্রগাঢ় গভীর জ্ঞানের আলোকে মার্কস্‌তত্ত্বকে বিচার করে তিনি পরিপূর্ণ

ভাবে গ্রহণ করেছিলেন ; তাই আজীবন তাঁর প্রত্যয়ে কোনো চিড় পড়ে নি, আজও মার্কস্‌বেত্তাদের মধ্যে তিনি প্রমুখ। এই প্রত্যয়ের প্রভাবেই বোধ হয় তাঁর সৌজন্যও এত স্বাভাবিক ও সংহত। এজন্যই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকে আমি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করি। ঠিক বলতে পারছি না *India Today*-র পরিমার্জিত সংস্করণগুলিতে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত, গান্ধীজী-বিষয়ক বাক্যগুলি আছে কি না, কিন্তু আমার মনে খোদিত রয়েছে তাঁর কঠোর সিদ্ধান্ত ১৯৩০-৩২ সালের আন্দোলনে গান্ধী-ভূমিকা বিষয়ে : **'thise Jonah of revolution, this general of unmitigated disasters, this mascot of the bourgeoisie'**! গান্ধী-বিষয়ে এই বিচার যিনি একদা করেছিলেন তিনি বহমান জীবনের পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী বলেই গান্ধী-নেতৃত্বকে অবজ্ঞায় উড়িয়ে দেওয়ার মতো অবিমৃষ্যকারিতা কখনো করেন নি, মৌলিক সমালোচনা সত্ত্বেও আন্তরিক সরল শ্রদ্ধা নিয়েই গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করেন। উভয়েই ভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই।

*   *   *

ইতিমধ্যে পার্টির প্রধান দফতর বসেছে এস্‌প্লানেডের কাছে ডেকার্স লেনে মস্ত পুরোনো বাড়িতে, নিজস্ব প্রকাণ্ড ছাপাখানায় দৈনিক 'স্বাধীনতা' মুদ্রিত হচ্ছে, এর জন্য অর্থসংগ্রহও ছিল সেদিনের উদ্দীপনা, 'গরিবের সহায় যে গরিব' তা কত সত্য বোঝা গিয়েছিল। পার্টি-লাইব্রেরিতে আমার বাবার নামে স্থাপিত যে গ্রন্থসংগ্রহের যথাযথ ব্যবহার ২৪৯নং বৌবাজার স্ট্রীটে হচ্ছিল না সেটি এখন স্থানান্তরিত হল— শিল্প কমিশন, শ্রম কমিশন, কৃষি কমিশন, রাওলাট কমিটি, ভারত শাসন বিষয়ে বাৎসরিক সরকারি বিবরণ, পুরোনো 'মডার্ন রিভিউ'-র বাঁধানো বহু খণ্ড ইত্যাদি অনেক মূল্যবান্ জিনিস সেখানে ছিল, যা '৪৮ সালে পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে পুলিশের (তখন 'স্বদেশী' পুলিশ!) জিম্মায় চলে যায়, উদ্ধার কখনো সম্ভব হয় নি। যাই হোক্, ডেকার্স্ লেনের এই অফিসে তিনতলায় এক প্রশস্ত ছাদ ছিল, যেখানে মাঝে মাঝে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। নিজে একটু বড়াই করে বলতে পারি যে কয়েকবার দেশের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস (কিম্বা মার্কস্ বা এঙ্গেল্‌স্‌-এর জীবনকথা) থেকে বাছাই করা কয়েকটা

অধ্যায় সাজিয়েছি, গান আর আবৃত্তি মাঝে মাঝে ঢুকিয়ে বহুজনের সামনে মনোহর এক সন্ধ্যা কাটানোর ব্যবস্থা হয়েছে। মনে পড়ছে বিশেষ করে যেদিন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বীর বন্দীরা দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসের পর সম্বর্ধিত হলেন পার্টি-অফিসের ছাদে, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রমুখ ইতিহাসের নায়ক এসে বসলেন, বক্তৃতার পাট কমিয়ে দেশের মুক্তিপ্রয়াসের আলেখ্য তুলে ধরা হল, গান আবৃত্তি আর সংক্ষেপে মূল তথ্যও তার তাৎপর্য পরিবেশন করা হল, 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়', কিম্বা 'কতকাল পরে, বলো ভারত রে, দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে' শুনে চমকালেন সবাই, 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপরূপে বাহির হলে জননী', অথবা 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' ধরনের গানে রোমাঞ্চ জাগল। শম্ভু মিত্রকে বলেছিলাম আবৃত্তি করতে—'তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে, কেমন করে সইব?'—আশ্চর্য সুন্দরভাবেই করলেন, আমার একটু ভয় ছিল হয়তো ওটা তার পছন্দসই হবে না, তবে জাত-অভিনেতারূপে শম্ভুবাবু বোধ হয় শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মেজাজ বুঝেই তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন আর সবাইকে মুগ্ধ করলেন। অম্বিকাবাবুকে যেন মনে হল চট্টগ্রাম বন্দীপরিবারের 'কর্তা', ঘরকন্নার সব ভার তাঁর— এই বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করলাম যখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম স্বাধীন ভারতবর্ষের কারাগারে, স্বাধীন সরকার চট্টগ্রামের বীরদেরও তো রেহাই দেয় নি! অনন্ত সিংহ সম্বন্ধে কত দুর্দান্ত কাহিনী আগে শোনা গিয়েছিল— মায়াবী মানুষ, বক্তৃতা করতে গিয়ে আবেগে গলা ভিজে ওঠে, তালতলায় এক সম্বর্ধনা সভায় '২৩ সালের শহীদ গোপীনাথ সাহার নামোচ্চারণে কণ্ঠরোধ হল তাঁর। গণেশ ঘোষের সঙ্গে তো এই সেদিন পর্যন্ত পার্লামেন্টে একত্র বসেছি— সহৃদয় ব্যক্তিত্ব, ব্যবহারে অসম্ভব ভদ্র, ভিতরটা বজ্রের মতো কঠোর যে হতে পারে তা মাঝে মাঝে বোঝা যায়, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। এঁদের সম্বন্ধে কথা ফাঁদলে শেষ করব কেমন করে, তাই ক্ষান্ত হই। শুধু এখানে বলি যে চট্টগ্রামের এই প্রোজ্জ্বল বন্দীদল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট আক্রান্ত হওয়ার ফলে ইতিহাসে যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে তার বিশ্লেষণ অতি সত্বর দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় সকলেই যোগ দিয়েছিলেন ভারতের কম্যুনিস্ট

পার্টিতে। ভাবতে ভালো লাগে যে ত্রিশের দশক থেকে মুক্তিসংগ্রামে সবচেয়ে দীপ্তিমান্ যারা তাদের মধ্যে অনেকেই— যেমন ভগৎ সিং, যেমন পেশোয়ারে মুসলিম জনতার উপর ইংরেজের হুকুমে গুলি ছুড়তে অস্বীকৃত গাড়ওয়ালী যোদ্ধাদের মধ্যে ঠাকুর চন্দ্রা সিং, যেমন চট্টগ্রামের ইতিহাস-কীর্তিত সংগ্রামীরা, যেমন '৪২ সালে মহারাষ্ট্রে সাতারার স্বাধীন 'সরকার' -এর নেতা নানা পাতিল, যেমন অরুণা আসফ আলি, এবং আরো বহুজন— দেশভক্তির পরিণতি ও সার্থকতার সন্ধান পেয়েছেন সাম্যবাদে।

আবার ভাবি, গর্ব করি কেমন করে যখন '৪৬ সালের ২৯শে জুলাই যে শহর উত্তাল হল গণ-অভ্যুত্থানের গরিমায়, সেখানেই তিন সপ্তাহ কাটার আগে ঘটল এমন অমানুষিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যা অকল্পনীয়, যা সব-কিছু হিসাবকেই ভেস্তে দিয়েছিল। আমাদের আন্দোলনে নিশ্চয়ই আছে এমন কিছু দুর্বলতা যা এই গোড়ার গলদকে আজও পর্যন্ত কেটে বার করে দিতে পারে নি। তাত্ত্বিক তর্কের উত্থাপন তিলমাত্র আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কেমন যেন মনে হচ্ছে যে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত নেতৃত্বে আজও শুধু প্রধান নয়, প্রায় একক হয়ে থাকার মধ্যে একটা গোঁজামিল লুকিয়ে রয়েছে। আমাদের সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টিতে প্রায় সবাই এসেছে দেশের মুক্তি-আন্দোলনের মূল প্রবাহ থেকে— সন্ত্রাসবাদ, কংগ্রেস ইত্যাদিতেই তাদের রাজনৈতিক জীবনে হাতে-খড়ি। পূর্বযুগে মুজফ্‌ফর আহমদ্-এর মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজন এবং চল্লিশের দশক থেকে আরো কিছু ব্যক্তি প্রায় সরাসরি কম্যুনিজ্‌মে আস্থা নিয়ে কাজে নেমেছেন, কিন্তু আমাদের এই পরাধীন দেশে স্বভাবতই জাতীয় স্বাধীনতা কামনা থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগত। বামপন্থী জাতীয়তাবাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠে, সর্বহারা বিপ্লবে প্রকৃত বিশ্বাস রেখে মতিস্থির করা এবং কাজে লেগে থাকা, হয়তো তাই একেবারে সহজ কখনো হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে দেখি এঙ্গেলস্-এর কয়েকটি অমূল্য বাক্য আর লেনিনের নিয়ত সতর্কবাণী সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মতো দেশে কৃষকের ভূমিকা ব্যাপারে পার্টির পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত যেন একটা মজ্জাগত অবহেলা আছে, অনিচ্ছাকৃত হলেও যে-অবহেলাকে উৎপাটিত করে গ্রামের গরিবের মধ্যে বিপ্লবের বারতা বিতরণেও আমাদের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও দেখা গেছে

যে শ্রমিকসংগঠনকে 'সাম্যবাদের বিদ্যালয়' ('a school for Communism') রূপে তৈরি করার কাজে মন দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত অল্প। বোম্বাইয়ের গিরণী কামগড় ইউনিয়নের মতো সুবিপুল সংস্থার অভ্যুদয় কালে যে দীপ্তি তা আজ শুধু স্মৃতি। সুখস্মৃতি তাকে বলি না, কারণ আজকের বিক্ষুব্ধ জীবনে তার অবদান প্রায় নেই, শিবসেনার মতো নির্লজ্জ ফ্যাশিস্ট সংগঠনের শক্তি যেখানে জাজ্বল্যমান্। কলকাতার 'বাহাদুর' ট্রামশ্রমিকদের নিয়ে যে গর্ব এককালে করেছি, তা অন্তর্হিত; গঙ্গার দু'ধারে চটকল মজদুরদের লড়াই সম্প্রতি তেজীয়ান্ হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক দাবিতেই তা পর্যবসিত, সামগ্রিক পরিপেক্ষিতে সমাজবিপ্লবপথে পুরোধা রূপে শ্রমিকশ্রেণীকে দেখি না; দুর্গাপুরেও দেখি না, যেখানে বিরাট কারখানা, সজাগ শ্রমিক, সংগ্রামী মেজাজ সত্ত্বেও দেশজোড়া অব্যবস্থা আর কর্তৃপক্ষীয় দৌরাত্ম্যের নিরাকরণে শ্রমিক আন্দোলন আগুয়ান্ বলি কেমন করে? অথচ জানি আমাদের প্রকৃত শ্রমজীবীদের মধ্যে নেতৃত্বগুণের অভাব নেই। অসম্ভব বঞ্চনার মধ্যেও তার প্রমাণ আমার সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাতেই বার বার পেয়েছি। মামুলী শিক্ষার (এবং অন্যান্য সামাজিক সুবিধার) গুণে নেতা হয়ে যারা বসেছেন, তারা অনেকেই সুযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু জেলে দেখেছি ট্রাম-শ্রমিক মিশিরজীর মতো মানুষের চরিত্রব্যাপ্তি আর শিক্ষাগর্বিত কারো কারো অচেতন ক্ষুদ্রতা, মজা পেয়েছি দেখে যে মস্ত এক নেতা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নিদ্রামগ্ন, বুকের ওপর লেনিন পুস্তিকা, মনে পড়েছে যে মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণীরা পাড়ার পাঠাগার থেকে উপন্যাস আনিয়ে থাকেন নিদ্রাকর্ষণের মোলায়েম ঔষধ হিসাবে! যাই হোক্, কলকাতায় আমাদের আন্দোলনে গোড়ায় গলদ নিশ্চয়ই ছিল, নইলে '৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট অমন অপ্রস্তুত ভাবে কেন আমাদের দেখতে হল তিনদিন ব্যাপী দানবীয় তাণ্ডব, কেন মাঝে মাঝে শান্তি মিছিলের করুণ উপস্থিতি ছাড়া প্রবল হস্তক্ষেপের উপায় খুঁজে পাই নি? কেন তার পর থেকে এমন ঘটনাস্রোত যাতে ইংরেজের যা ছিল মনস্কামনা, অর্থাৎ দেশবিভাগ এবং তারই ফলে মোটের উপর অনুগত পাকিস্তানকে ভারতের বিপক্ষে 'time-bomb' রূপে ব্যবহার করার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, সেই মনস্কামনা রোধে আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলাম! কেন আমাদের তুষ্ট থাকতে হল নোয়াখালির দাঙ্গা প্রশমনে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন খ্যাত

কম্যুনিস্ট লালমোহন সেনের প্রাণাহুতির উদাহরণ দেখিয়ে— বুর্জোয়া পক্ষে মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তো সেখানে দাঙ্গারোধে পরম গরিমান্বিত ভূমিকায় নেমেছিলেন ? প্রয়োজন ছিল যে জনসংহতি আর সজাগ কর্মকাণ্ড, কেনই বা তা আমাদের সাধ্যাতিত প্রমাণিত হল ?

মুসলিম লীগ ১৬ই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ কার্যক্রম' ('direct action') ঘোষণা করার মধ্যে অন্তত বাহ্যিক যে সংগ্রামমুখী প্রতিজ্ঞা ছিল, জনমানসে তার তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলতে আমরা পারি নি। অনুশোচনায় লাভ নেই, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে ট্রাম-শ্রমিক ইউনিয়নের মতো তৎকালে সচেতন সংস্থায় মুসলিম লীগের এই 'প্রত্যক্ষ কার্যক্রম' দিবস প্রতিপালন নিয়ে ঘোর বিতর্ক উঠেছিল, বাংলায় কর্তৃত্বারূঢ় লীগ-সরকার কর্তৃক সেদিন ছুটি ঘোষণা করার পিছনে দুরভিসন্ধি কতদূর ছিল না-ছিল নিয়ে বহু জল্পনা চলেছিল। ১৪।১৫ আগস্ট তারিখে একটা চলন্ত ট্রামে দু'জন কণ্ডাক্টর-এর তর্ক শুনতে পেয়েছিলাম, উভয়ের যুক্তিবিস্তারশক্তির তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলাম। মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ' সংগ্রাম দিবসের কয়েকদিন আগেকার আবহাওয়া যাই হোক্, এটা তো ঠিক যে রশীদ আলি দিবসে (ফেব্রুয়ারি '৪৬) লীগনেতা 'প্রধান' মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি নিজে ছিলেন মিছিলের পুরোভাগে। আর তার পর বিধানসভা ভবনে একাধিকবার বামপন্থী বিক্ষোভ প্রদর্শনের সামনে সোহ্‌রাওয়ার্দি এসেছেন, বুঝিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। জ্যোতি বসু, স্নেহাংশু আচার্য, ভূপেশ গুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে সোহ্‌রাওয়ার্দির যোগাযোগ অল্প ছিল না। মাঝে মাঝে আমিও আলোচনায় থেকেছি। একবার মনে পড়ছে সোহ্‌রাওয়ার্দি আমাদের মুসাবিদা-করা এক বিবৃতি পড়ে ঠাট্টা করলেন 'তোমরা কি দারুণ "glib" !'— ধারণাটা এই যে কথার খই ফোটাই আমরা প্রচণ্ডভাবে,' কিন্তু কাজে কত 'দড়' তা খুবই সংশয়ের ব্যাপার ! আরো মনে পড়ছে 'অ্যাসেম্বলি'-র বিস্তৃত উঠোনে একবার শোভাযাত্রা আসার পর সভা হল। পার্টির একটা গাড়ি ছিল তার উপর দাঁড়িয়ে কজনের বক্তৃতা, ভূপেশ বলতে গিয়ে আবেগাতিশয্যে সুভাষচন্দ্রের উল্লেখ করল, 'বাংলার দুলালকে বাংলার নন্দন কাননে ফিরিয়ে আনব' বলে বিপুল হাততালি পেল। এটা বিশেষ করে মনে আছে এজন্য যে কথাটায় আমার খট্‌কা লাগে, পার্টি-অফিসে মুজফ্‌ফর সাহেবকে বলি আমার ভালো লাগে না এই

ধরনটা, কারণ 'demagogy' অর্থাৎ জনতাকে সস্তায় উত্তেজিত করার অভ্যাস শুধু একটা বক্তৃতাভঙ্গী নয়, একটা বিশেষ মানসিকতারও পরিচয় দেয়, যা কম্যুনিস্টদের কাছে মূলত বর্জনীয়। বলতে পারি মুজফ্‌ফর সাহেব আমার সঙ্গে একমত ছিলেন, তবে সেদিনের উন্মাদনায় অনেকেই যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা থেকে বিচ্যুত হতে গররাজী ছিলেন না। একটু অবান্তর বাক্‌বিস্তার হয়তো করে ফেলছি, কিন্তু করছি এজন্য যে লীগ নেতাদের সঙ্গে আমাদের যে সংযোগ ছিল— কিছু পরে 'সংযুক্ত স্বাধীন বাংলা' নিয়ে আলোচনায় সোহ্‌রাওয়ার্দি এবং কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে আমাদের আলোচনায় যার পরিচয় আবার মিলেছিল— সেই সংযোগের রাজনৈতিক সদ্‌ব্যবহার করে আমরা পারি নি নিবারণ করতে সেই যন্ত্রণাময় ঘটনাকে, যার নামকরণ, সাম্রাজ্যবাদের কুশলী সমর্থক 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকা করেছিল 'The Great Calcutta Killing.'

* * *

মন চায় না সেই দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাকে টেনে আনতে। কিন্তু অল্প কথায় সেদিনের বেদনার ছবি না আঁকলে চলবে না। ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবসে শহরে যে প্রচণ্ড আলোড়ন হবে তা জানা ছিল, কিন্তু তা যে কদর্যরূপ নিয়েছিল তা ছিল কল্পনারও অতীত। দোকানপাট সব না হলেও মোটামুটি বন্ধ হবে, বিকেলে ময়দানে নিদারুণ মিটিং বসবে, নানাবিধ রণহুংকার শোনা যাবে, এধারে ওধারে কিছু শান্তিভঙ্গ, হয়তো বা প্রাণহানি আর লুঠতরাজ, ঘটতে পারে কিন্তু মারাত্মক কোনো ঘটনার প্রত্যাশা কেউ বোধ হয় করে নি। যা ঘটল তা অবশ্য বর্ণনাতীত; সকাল থেকেই অসম্ভব থম্‌থমে ভাব, বিকেলে ময়দানযাত্রী মিছিল শুরু হওয়ার আগেই কয়েকটা এলাকায় হাঙ্গামা, দুপুরেই জোর উপদ্রবের সূচনা, চাঁদনীচকের গ্রাণ্ট স্ট্রীটে ছোটোখাটো মারামারি, আর তার পর থেকে গোটা শহর জুড়ে প্রলয়দামামা। 'লড়্‌কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আওয়াজ উঠিয়ে যারা সভা করল, তাদের মেজাজ গোড়া থেকেই চড়া। প্ররোচনারও অভাব ছিল না, গুজবের স্রোতে দৌরাত্ম্যের ভেলা ছুটে চলল, ময়দানসভায় বক্তৃতার চোটে টগ্‌বগে মন নিয়ে একান্ত উত্তেজিত জনতা ফিরল, পথে যা নাগালে এল তাকে চূর্ণ করতে চাইল— পরদিন ধর্মতলা স্ট্রীটের দুধারে রুদ্ধদ্বার দোকান ভেঙে ছড়িয়ে কাঁচের গুঁড়োয়

ভরা পথের অবাস্তব দৃশ্য দেখতে পেলাম। সেদিন এবং তার পরের দু'দিন শহর যেন রইল দমবন্ধ অবস্থায়। হিন্দু মুসলমান নিজস্ব এলাকায় রুদ্ধশ্বাস অস্তিত্ব চালাচ্ছে আর যেখানে তাদের একত্র বসবাস সেখানে সংখ্যাল্পকে ভুগতে হয়েছে মর্মভেদী যন্ত্রণা কিংবা মৃত্যু, যা এসেছে সেই অসহনীয় কষ্ট থেকে নিষ্কৃতিরূপে। বিড়িওয়ালা বা শালকর পেটের দায়ে দোকান করে সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকল অঞ্চলে। আর তাদেরই প্রথম বলি হতে হল সেদিনের অমানুষিকতার। তিন দিন তিন রাত্র দুপক্ষের লড়াই চলল, মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য উভয়দিকে মুহুর্মুহু চীৎকার: 'বন্দেমাতরম্' কিম্বা 'নারা-য়ে-তক্‌বীর, আল্লাহ্-ও-আকবর্'! ঘোর বর্ষণের মধ্যে রামধনুর মতো মুসলমানকে হিন্দু এবং হিন্দুকে মুসলমান সহায়তা দিচ্ছে এমন দৃষ্টান্ত যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তা বিরল— উপায়ান্তরও ছিল না, কারণ ইচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায় দুটো তাঁবু এমন উন্মত্তের মতো আলাদা রুখে দাঁড়াল যে শুভবুদ্ধির সেখানে স্থান ছিল না। পার্টির সবাই যে যেখানে আছে, সেখানে সাধ্যমতো ঐ বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীদের সাহায্য করেছিল নিশ্চয়, কিন্তু আকস্মিক প্রলয়ের সামনে তা প্রায় সমুদ্রে গোস্পদতুল্য মনে হল। আমাদের তালতলাপাড়ার একাংশ হিন্দুপ্রধান, অপরাংশ মুসলমান প্রধান; প্রথম দিকে দুই অংশের মধ্যে যাতায়াত প্রায় বন্ধ, সুরেন ব্যানার্জি রোডের মতো বড়ো রাস্তায় মিলিত শান্তি মিছিল বার করার চেষ্টা হল, গতিক্ ভালো নয় বুঝে ক্ষান্ত হতে হল। দেখা গেল পার্কগুলোর লোহার বেড়া উপড়ে নিয়ে দুর্বৃত্তেরা মারণাস্ত্র বানিয়েছে। অবিনশ্বর আত্মার অধিকারী বলে বর্ণিত মানুষকে পিটিয়ে খুঁচিয়ে খুন করা হচ্ছিল— যে কুকর্ম পশুতে কখনো করে না তা মানুষ করছিল অবলীলাক্রমে, শুধু মুহূর্তের উন্মাদ উত্তেজনায় নয়, দলবেঁধে, 'প্ল্যান্' করে, উল্লাস দেখিয়ে। মনুষ্যত্ব যে কত ঠুন্‌কো হতে পারে তার জঘন্য নির্লজ্জ প্রদর্শনী তখন রাজনীতিগর্বে গর্বিত কলকাতা শহরের সর্বত্র চলেছিল।

সাধারণত এই কদর্য কাণ্ডের জন্য মুসলিম লীগকে দায়ী করা হয়। কিন্তু সেই চরম দুর্দিনে দেশের পুঞ্জীভূত পাপের নগ্ন প্রকাশের দায়িত্ব হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে এবং দল নির্বিশেষে সবাইকেই নিতে হবে। কংগ্রেস কিম্বা হিন্দু-সম্প্রদায় সেই মহাপাতকের স্পর্শ থেকে মুক্ত ছিল বলা মিথ্যাচরণ মাত্র। সংসারের বর্তমান অবস্থিতিতে রেষারেষির রাজনীতির মধ্যে অনিবার্য ভাবে

রয়েছে যে নিদারুণ নোংরামি, তা অস্বীকার করে লাভ নেই। মুসলিম লীগের কার্যক্রমে যে বদমায়েসি ছিল তা সহজেই ধরা পড়ে, কিন্তু অপরপক্ষের দৌরাত্ম্য নিজের ওপর চতুর একটা আচ্ছাদন চাপিয়ে ঘুরতে পারত। এমনও কেউ অবশ্য বলবেন যে তখনকার আবহাওয়াতে এক গালে চড় খেয়ে মহত্ত্ব ও অহিংসা দেখিয়ে অপর গাল এগিয়ে দেওয়া শুধু বাতুলতা ছিল না, ছিল একেবারে অবাস্তব প্রক্রিয়া— লড়াই যখন অমন ভাবে লাগে তখন হার কিম্বা জিত ছাড়া রাস্তা নেই, 'hammer or anvil'-এর মধ্যে বাছাই করে নিতে হয়। এ যুক্তি ফেলে দেবার মতো নয়, কিন্তু লড়াই যে ঐ স্তরে চড়েছিল, সেটারও তো কার্যকারণ বিশ্লেষণ দরকার, আর তা হলে দেখা যাবে কোনো পক্ষই নির্দোষ নয়। উভয়েই অভিশপ্ত, উভয়েই ঘৃণার্হ।

তিনদিন তিনরাতের নিষ্ঠুর নির্মম ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর আমাদের মতো অবস্থিতেরা ঘোরাফেরা করতে পেরেছিলাম, শুনেছি কারখানা এলাকায় শ্রমিকদের বহু সাহসিক সৎকর্মের কথা, যা নিয়ে আমাদের শান্তি প্রচার চলেছে। তালতলা, এণ্টালি, পার্ক সার্কাস ইত্যাদি বাড়ির কাছাকাছি হিন্দুমুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় শান্তি কমিটি গঠন করা গেছে, একত্র বসে পাড়ার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালাবার জন্য প্রয়োজন ব্যবস্থায় চেষ্টা হয়েছে, পুলিশ সংগঠনকে নিরপেক্ষভাবে কাজে নামাবার জন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি করা হয়েছে। অতি ধীরে, ত্রস্ত অস্বস্তি নিয়ে। স্বাভাবিক অবস্থা অনেকটা ফিরেছে— কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের পর যেমন মাঝে মাঝে নদীর গতি পর্যন্ত পাল্‌টে যায়, তেমনি যে-খাতে আমাদের জনতার চিন্তা ও কর্ম চলছিল, যার প্রোজ্জ্বল প্রকাশ দেখেছিলাম '৪৫-এর নভেম্বর থেকে '৪৬-এর জুলাই পর্যন্ত, সেই খাতে আর প্রবাহ যেন রইল না। হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার চোটে আমাদের ইতিহাস বিশ্রী একটা মোড় নিয়ে বসল। ক্রমশ সহজ হয়ে এল ভাবা যে এই বিকৃত দেশে একত্র মেহনতী মানুষ ভাষা-ধর্ম-নির্বিশেষে স্বাধীনতা অর্জন করবে আর তার সাম্যবাদী পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে চিন্তা করা দিবাস্বপ্ন, বরঞ্চ 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' স্মরণ করে মেনে নেওয়া যেতে পারে দ্বিখণ্ডিত দেশের বিকৃত স্বাধীনতা। হিন্দু আর মুসলমান উভয়েরই মনে যেন আশঙ্কা, অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্র থাকা হল সসর্প গৃহে বাসের মতোই বিপজ্জনক।

১৬ই আগস্ট-এর পিছনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যে তার অপরিসীম চাতুর্য নিয়ে ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে সান্ত্বনা সংগ্রহ করি কেমন করে?

বহুদিন আগে মুসলমান বাঙালী বাউল মদন গিয়েছিলেন: 'তুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায় / তাতেই যদি জগৎ জুড়ায় / বল্ তো গুরু দাঁড়ায় কোথায় / অভেদ সাধন মরল ভেদে'। পরম্পরার নিগড়ে আজও বাঁধা আমাদের এই দেশে ধর্মের এই দ্বৈত ভূমিকা প্রকট রয়েছে; জাতীয় আন্দোলন, এমন-কি, সজাগ শ্রমিককে পুরোভাগে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে মার্ক্স্‌বাদী প্রয়াসও এই পরিস্থিতিকে বদ্‌লাতে পারে নি—মনে পড়ছে মার্ক্স্‌-এর সতর্কবাণী: 'তোমাদের নিজেদের পাল্‌টাতেই ১৫, ২০ কিম্বা ৫০ বৎসর লাগবে, সমাজকে পাল্‌টানো তো আরো দূরের কথা!' যাই হোক্, কলকাতার সেই ভয়াবহ সংঘর্ষের পরও দেখা গেল, দুই সম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষ স্তিমিত হচ্ছে না; হিন্দু সংখ্যাধিক্যের দরুন কলকাতা অঞ্চলে মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়েছে সুতরাং বদ্‌লা চাই অন্যত্র, ফলে একেবারে মুসলিমপ্রধান নোয়াখালিতে ক'মাস বাদে আগুন জ্বলল, যাকে নিভোতে গেলেন গান্ধী স্বয়ং, প্রাণ দিলেন আমাদের পার্টির লালমোহন সেন মুসলিম কৃষকদের সঙ্গে থেকে। এই 'বদলা' নামে নোংরা শব্দটির প্রতিধ্বনি তুলে হিন্দুপ্রধান বিহার প্রদেশে মুসলিম-নিধনযজ্ঞ শুরু হল—দিল্লীতে শাসনভার অনেকটা হাতে পেয়ে জওয়াহরলাল নেহরু শাসালেন বোমা ফেলে অত্যাচারীদের শায়েস্তা করা হবে, কিন্তু কিছুই সহজ নয়, সেখানেও দীর্ঘদিন ধরে বিপর্যয় চলল।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় শাসনে কংগ্রেস এবং কিছুটা টালবাহানার পর মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ক্ষমতা হস্তান্তরের উপক্রমণিকায় অভিনয় শুরু হয়েছে, জওয়াহরলাল নেহরু হয়েছেন বড়লাটের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সহ-সভাপতি। কংগ্রেস-লীগের প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে স্থির হয়েছে গৃহমন্ত্রালয়ের ভার নেবেন কংগ্রেস পক্ষ থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আর অর্থমন্ত্রালয় থাকবে লীগ-নেতা নবাবজাদা লিয়াকৎ আলীখান্-এর হাতে। এ এমনই এক ব্যবস্থা যার ফলে কংগ্রেসই আবিষ্কার করল যে অর্থবিভাগের কর্তৃত্ব বিনা কোনো জরুরি পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা চলে না, আর অর্থবিভাগের চেয়ে গৃহমন্ত্রালয়কে কব্‌জায় রেখে দেশে প্রতিপত্তি সুনিশ্চিত করার যে প্রত্যাশা ছিল কংগ্রেসের, তা অপূর্ণ রয়ে গেল। আরো মজার

ব্যাপার দেখা গেল যে প্রগতিবিরোধী কুখ্যাতি সত্ত্বেও লিয়াকৎ আলি বাজেট কাঁদলেন এমনভাবে, যাতে অর্থবান্‌দের অল্প একটু মুশকিলে পড়তে হল, যেটা প্রগতিগর্বী কংগ্রেসের মনোমত হয় নি! নানা অসংগতিতে ভরা ছিল এই সময়টা— তবে লক্ষ করার বস্তু এই যে যুগের হাওয়া বুঝে টাটা-বিড়লা তখন এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রচার করলেন, যেটা আজ হয়তো তাদের মনঃপূত হবে না, কারণ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্ল্যানিং কমিটি মেঘনাদ সাহা এবং কে. টি. সাহা-এর মতো মনীষীর সাহায্যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন। যাই হোক, রাজনৈতিক আকাশ অন্ধকার হয়েই রইল, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ একের পর এক চাল খেলে যেতে লাগল, একবার কংগ্রেস এবং লীগকে স্তোক দিল, কখনো বলল দেশবিভাগ ভারতবন্ধু প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীর কখনোই কাম্য নয়, আবার কখনো হাওয়া তুলল যে হিন্দুমুসলমান কিছুতেই যখন এক ঠাঁই হতে রাজী নয় তখন সদাশয় ইংরেজ বাহাদুরের আর কী করার আছে! পাঠক অন্যত্র সংগ্রহ করবেন সেই ক্লেশকর অধ্যায়ের বিবরণ, এখানে একটু শুধু তার উল্লেখ করা গেল। বাস্তবিকই ক্লেশকর এই অধ্যায়, যখন জওয়াহরলাল স্বীকার করেছেন তাঁর জীবনীকার মাইকেল ব্রেশর-এর কাছে যে তিনি ও অন্যান্য নেতারা তখন ক্লান্ত, হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের পরিমাপ ও চরিত্র দেখে শুধু মর্মাহত নয়, ভবিষ্যৎ বিষয়ে রীতিমতো শঙ্কিত, আর তাই যখন মাউন্টব্যাটন বড়লাট হয়ে এলেন, তখন রাজপ্রতিনিধিদম্পতির বন্ধুসুলভ মনোভাব দেখে ক্রমশ প্রভাবিত হতে থাকলেন, শেষে অন্তর বেদনা সত্ত্বেও দেশবিখণ্ডন মেনে নিলেন, সংকটময় পরিস্থিতিতে নূতন পর্যায়ের সংগ্রামের সম্মুখীন হতে আর ভরসা রইল না।

জাতীয় নেতৃত্বের এই পরাজয়ের দায়িত্বে আমাদেরও অংশীদারী রয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে একক শক্তিতে দেশকে সফল সংগ্রামে আহ্বান করার সংগতি আমাদের ছিল না। মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত স্বার্থে আন্দোলনে নামা— নিশ্চিতভাবে সফল হবে জেনেই শুধু বিপ্লব করতে নামব, এ তো বিপ্লবী মনোভাব নয়! যাই হোক্, স্বতন্ত্র শক্তিরূপে দেশের ইতিহাস নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় নামা আমাদের পক্ষে তখন সম্ভব হয় নি। এজন্যই বোধ করি (১৫ই আগস্ট ১৯৪৭) ক্ষমতা হস্তান্তরণ ও তার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে

আমরা মোটের উপর তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে থেকেছি, খণ্ডিত হলেও স্বাধীনতা যে মহামূল্য তা অনুভব করেই বোধ হয় বিপ্লবচিন্তা থেকে অনেকটা নিজেদের নিবৃত্ত রেখেছি। একেবারে নিবৃত্ত থাকা অবশ্য সম্ভব হয় নি, হওয়া সংগত ও সমুচিত ছিল না। তেলেঙ্গানায় লড়াই আয়তনে ও গুণগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তার সঙ্গে কম্যুনিস্ট কর্মকাণ্ডের ছিল নাড়ির সম্পর্ক। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে তখন আমরা ব্যাপৃত থেকেছি দ্বিখণ্ডিত হলেও ভারতভূমির স্বাধীনতা প্রাপ্তি নিয়ে। এরই মূল্যায়ন করতে গিয়ে আবার ১৯৪৭-৪৮ সালে পার্টিতে আসে সম্পূর্ণ বিপরীত ঝোঁক— সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের ফলে যে খণ্ডিত স্বাধীনতা তাকে প্রায় মূল্যহীন বলে দেশজোড়া লড়াইয়ের ডাক দেয় পার্টি। আবার সে লড়াই বাস্তবের পরিপন্থী বলেই ব্যর্থ হয়। পার্টির মধ্যে এই যে টানাপোড়েন চলেছিল, তা অন্তত প্রমাণ করে যে আমরা ভুলভ্রান্তি করতে থাকলেও মরে ছিলাম না, মূলগত যে স্বাতন্ত্র্য আমাদের আছে অন্য সমস্ত পার্টি থেকে, তাকে কখনো ভুলি নি, তবে আরো বৃহৎ ভূমিকায় নেমে দেশের নূতন ইতিহাস সৃষ্টি যে করতে পারি নি তার কারণ আমাদের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

* * *

’৪৬ সালের শেষ দিকে দাঙ্গার আবহাওয়া কেটে যাওয়ার আগেই আমার ছাত্র ও বন্ধু এম.এ.সয়ীদ-এর উদ্যোগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিনেমাকর্মীদের নিয়ে বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এম্পলয়ীজ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা একটা স্মরণীয় ঘটনা। আমাকে সয়ীদ সভাপতিপদে বসিয়েছিল আর আজ পর্যন্ত একাদিক্রমে আমি সেই মর্যাদায় রয়েছি, একাধিকবার অনিচ্ছাপ্রকাশসত্ত্বেও কর্মীরা আমাকে ছুটি দেন নি। স্পষ্ট মনে পড়ছে সাম্প্রদায়িক আতঙ্কে অবসন্ন কলকাতায় এই ইউনিয়ন অন্তত একটা আশার প্রদীপ জ্বালতে পেরেছিল। সয়ীদের বাস ও কর্মস্থল ২৯ নং বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে কার্যকরী সমিতির সভা হ’ত, সিনেমাহলে সাধারণ জমায়েৎ হ’ত ; আমি হিন্দু, সয়ীদ মুসলমান, নেতাদের মধ্যে বাঙালী অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান-পার্শী, বাস্তবিকই সেদিন এটা উৎফুল্ল হবার মতো ব্যাপার ছিল। আজও নানা ঝড়ঝাপটা পার হয়ে এই ইউনিয়ন অটুট রয়েছে, শ্রমিক সংগঠনগুলি বারবার ভেঙেচুরে যাওয়া

সত্ত্বেও আমরা একত্র থাকতে পেরেছি, আর আমি দেখেছি এই গরিব ইউ-নিয়নের চরিত্র আর শক্তি, ছোটো বড়ো মাঝারি কয়েকশো সিনেমায় ছড়িয়ে থাকা কর্মচারীদের হাজার দুর্গতি আর বিড়ম্বনা সত্ত্বেও একজোট থাকার প্রতিজ্ঞা। এখানে বহুজনের সংস্পর্শে এসেছি, যাদের নাম করা সম্ভব নয় কিন্তু তারা সবাই স্মরণীয়। সয়ীদ-এর দরাজ দিল, আর বাংলা এবং হিন্দুস্থানীতে দারুণ বক্তৃতাশক্তি, বাংলা সিনেমার আদিযুগের মানুষ, 'বয়োবৃদ্ধ' 'জর্জসাহেব'-এর ইউনিয়ন বিষয়ে আশ্চর্য নিষ্ঠা (এঁরই স্মৃতিতে কলকাতায় ইউনিয়নের নিজস্ব ভবন উৎসর্গিত), পরবর্তী যুগে ইউনিয়ন-সেক্রেটারি, সম্প্রতি মৃত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ কর্মক্ষমতা— না, আর বাড়াব না, শুধু এখানে বলব যে '৪৬ সালে এই ইউনিয়নের পত্তন এবং তখন থেকে এর অটুট সংগঠন প্রায় যেন একটা প্রতীকী ঘটনা।

কলকাতার তখনকার বদ্ধ, দূষিত জীবন থেকে কিছুকাল নিস্তার পাবার আশায় যেতে পেরেছিলাম স্ত্রীপুত্রকন্যাকে নিয়ে দার্জিলিঙে স্নেহাংশু আচার্যের মনোহর বাসগৃহে ; জলাপাহাড়ে ঠিক সেন্ট্ পল্স্ স্কুলের নীচে যার অবস্থান ছিল এমন যে শহরের যে-কোনো স্থান হতে তাকে দেখা যেত, গিরিনগরীর শোভারই এক অঙ্গ ছিল সেই বাড়ি। আমাদের সঙ্গে ছিল জ্যোতি বসু ; আর রতনলাল ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে দার্জিলিং অঞ্চলে পার্টির যে কর্মীরা সংগঠিত হয়েছিলেন, তাদেরও সাহচর্যে সবাই আনন্দ পেতাম। প্রায় একমাস সেই অপূর্ব নিসর্গ সৌন্দর্যের মধ্যে কাটে ; মনে আছে একদিন স্নেহাংশুর শ্যালিকা সুচিত্রা কয়েকটা গান শোনাল, যার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের-সুর-দেওয়া 'বন্দে মাতরম্', যেমন গাওয়া ঐ গান আর কখনো কোথাও শুনি নি। স্নেহাংশুর এক ভগ্নীও তখন ছিলেন সপুত্রকন্যা— আমার মেয়ে রিনি, বছর পাঁচ যার বয়স তখন, ছিল ছোটোদের 'লীডার', আর ছেলে লামা, যে তখন এক বছরেরও নয়, একেবারে স্নেহাংশুর প্রিয়পাত্র হয়ে বসল এমনভাবে যে স্নেহাংশু তো বারবার তার মাকে ভয় দেখিয়েই বসল যে ছোটোছেলেটাকে সে-ই নিয়ে নেবে, ছাড়বে না! মনে আছে রতনলাল একদিন নিজে তীব্রবেগে জীপ চালিয়ে নিয়ে গেলেন কালিম্পং— একেবারে অসম্ভব পাহাড়ী রাস্তাতে প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চালাবার কী দারুণ নৈপুণ্য দেখলাম! দার্জিলিঙে সেই একটা মাস যে নিশ্চিন্ত আনন্দে কেটেছিল, তা

আজ যেন ভাবাই যায় না। তবে পালিয়ে থাকা গেল না কলকাতার জটিলতা থেকে, ফিরে যখন এলাম তখনো আবহাওয়া থম্‌থমে, হিন্দুমুসলমান একত্র চলাফেরা কিন্তু কেমন যেন গা বাঁচিয়ে সন্তর্পণে, ছিঁচকে লড়াই চলেছে, কোথাও কোথাও 'কার্ফিউ', বেঁচে থাকাই একটা লাঞ্ছনা।

হঠাৎ একদিন দার্জিলিঙে দেখা হয়ে গেল পুরোনো কমরেড সোলি বাট্‌লিওয়ালার সঙ্গে; পার্টি ছাড়লেও তার ব্যবহার দেখলাম ঠিক আগেরই মতো। শুনলাম বোম্বাইয়ে কুতুব পাবলিশার্স্‌ আমার লেখা *India Struggles for Freedom*-এর প্রথম সংস্করণ বুঝি কয়েক সপ্তাহেই সব বিক্রি করে ফেলেছে—তখনো নিজের 'কপি' দেখি নি, তবু শুনে খুশি হলাম, বইটার তখন খুবই কদর হয়েছিল। বছরের শেষে বোম্বাই যেতে হয়েছিল; 'রয়ালটি'-র একাংশ দম্‌কা খরচ হয়ে গেল বিমানযোগে কলকাতা ফেরায়—তার আগে প্লেনে চড়ি নি, তখন টাটার উড়োজাহাজ, মাঝ পথে নাগপুরে থামতে হত, সেখানে খেতে দিত, বন্দরের বাড়িঘরদোর ছিল গরীবানা ধরনের। পার্টির কেন্দ্রীয় দফ্‌তরে বহুদিনের কমরেড হাজরা বেগম হঠাৎ থামিয়ে বললে, 'হীরেন, তুমি নাকি স্বাধীনতার লড়াই নিয়ে একটা বই লিখেছ? আমার বোন (জোহ্‌রা কিম্বা উজ্‌রা, উদয়শঙ্করের নৃত্যসহচরী) সারা রাত জেগে পড়েছে, ছাড়তে পারে নি!' বইটার সবচেয়ে দামী সার্টিফিকেট পেয়েছি এইটা।

অনিল ডিসিল্‌ভা আর ফিরোজ মিস্ত্রি মিলে কুতুব পাবলিশার্স্‌-এর পত্তন করে। কয়েকবছর আসর জাঁকিয়ে লালবাতি জ্বেলেছে কুতুব; তবে কুতুব-এর নামডাক কিছুকাল সত্যই হয়েছিল। এদেরই উদ্যোগে বোধ হয় '৪৫ সালে আমি মাণিকবাবুর 'পদ্মানদীর মাঝি' ইংরিজীতে তরজমা করি; বাস্তবিক উপভোগ করেছিলাম কাজটা, এই অনুবাদ নিয়ে অল্প একটু গর্বও বোধ করি, কিন্তু ভাগ্যচক্রে এর প্রচার তেমন জুৎসই হয় নি; প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে যাওয়ার পর আবার ছাপবার ব্যবস্থা ঘটে নি, আর ইতিমধ্যে 'কুতুব' গণেশ ওলটাবার ফলে বইটা যেন মাঠে মারা গেছে।

'ক্ষমতা হস্তান্তর' করে ইংরেজ এদেশকে 'স্বাধীনতা' দিয়ে যেতে তখন দেরি, ছিল না, কিন্তু আবহাওয়ায় উদ্দীপনা হারিয়ে গিয়েছিল। বোম্বাইয়ে যখন গিয়েছি '৪৬ সালের শেষে, তখন সেখানেও সাম্প্রদায়িক অশান্তি।

তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনার বিবৃতি দিচ্ছি না, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসনে হাত-পাকানো ইংরেজ ক্রমাগত যে রঙ-বেরঙের চাল চেলে গেল, তার পাল্টা রণকৌশল এদেশ ভুলে গিয়েছিল। মনে পড়ছে '৪৬ সালে কৃষ্ণ মেনন কলকাতা এসেছেন; প্রথম পরিচয় হল তাঁর সঙ্গে, লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় চোখে দেখেছি, আলাপ হয় নি। মির্জাপুর পার্কে সভায় একসঙ্গে বক্তৃতা করলাম; জ্যোতি-ভূপেশের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম। আমার একটু মনে সন্দেহ, কারণ ধারণা হয়েছিল যে ব্রিটিশ 'লেবর' দলের ওকালতি করতে এসেছেন, নেহরুকে বাগে আনা তাদের দরকার ছিল। কৃষ্ণ মেননকে পরবর্তীকালে খুবই কাছে থেকে জেনেছি— প্রতিভাবান্ মানুষ, ক্ষিপ্রবুদ্ধি, তত্ত্বে আকৃষ্ট, বিতর্কে নিপুণ, দীর্ঘায়ত বাক্যবিন্যাসে দক্ষ, কিন্তু অতিরিক্ত আত্মাভিমানী, অপরের গুণ লক্ষ্য করলে অপ্রসন্ন, পরিচিতদলে বেষ্টিত হয়েও একক, অন্য জন সম্বন্ধে প্রায়-অবজ্ঞা পোষণের ফলেই বোধ হয় এই একাকিত্ব। যখন লিখছি তখন দিল্লীতে অসুস্থ অবস্থায় তিনি রয়েছেন, দেশ কামনা করছে তাঁর আরোগ্য, দেশের প্রধানদের মধ্যে বহুগুণান্বিত এই মানুষটির কাছ থেকে প্রত্যাশা এখনো রয়েছে।

জাতীয় নেতৃত্বে জওয়াহরলাল তখন অগ্রণী, কিন্তু 'অন্তর্বর্তী সরকার'-এর প্রমুখ হয়ে তাঁর ভূমিকা তখন বদলে গেছে, শ্রান্তচিত্তে খণ্ডিত স্বাধীনতাতেই তুষ্ট হতে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। ভারতবর্ষে যে 'soft state' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় Gunnar Myrdal-এর মতো পর্যবেক্ষকের বিবেচনায় এদেশের জোটপাকানো হাজার সমস্যার সমাধান আজও হল না, সেই 'soft state'-এর প্রারম্ভ তখন দেখলাম। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কালোবাজারী আর চোরাকারবারীদের সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ নেহরু লেখেন তাদের পাকড়াও করে ল্যাম্প-পোস্টে লট্‌কে দেওয়া হবে— আজও এই শাসানি এদেশে হাসির খোরাক হয়ে রয়েছে। বিহারের দাঙ্গার সময় নেহরু ধমক দিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি চলতে থাকলে অপরাধীদের শায়েস্তা করা হবে চূড়ান্তভাবে, দরকার হলে বোমা মারা হবে— আজও সাম্প্রদায়িক অপরাধে নিয়ত লিপ্ত দুর্বৃত্তদের শাস্তিবিধান সম্ভব হয় নি, বোমা না-হয় না-ই ব্যবহার করা হল। মহাত্মা গান্ধী তখন ক্রমশ বুঝছিলেন তাঁর অবসর নেওয়ার সময় এসেছে— উপাসনা সভা মারফৎ নৈতিক প্রভাব অবশ্য ছিল, দেশবাসীর চিত্তে তাঁর

আসন ছিল অটল, কিন্তু দেশবিভাগে সম্মত হতে না পেরে তাঁর এল এক অদ্ভুত মানসিক সংকট, যা থেকে নিস্তার পেলেন না, সাম্প্রদায়িক হিন্দু আততায়ীর হাতে নিধন এল যেন মুক্তির মতো। তখনকার কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিরল প্রতিভামণ্ডিত মানুষটি দ্রুত পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে সংগতি খুঁজে পাচ্ছেন না, দেশবিভাগে সম্মত নন্ একেবারে কিন্তু সেই দুর্ঘটনা নিবারণে প্রকৃত বিচক্ষণ প্রচেষ্টার অভাবে মর্মাহত। 'লৌহমানব' বলে বর্ণিত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কড়া হাতে দেশ শাসনের শিক্ষানবিশিতে তখন মগ্ন; অপর নেতাদের চেয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, দেশ ভাগ হলে অতিরিক্ত মনোবেদনার কোনো কারণ তিনি দেখেন নি, বরং ভাবতেন জগৎ জুড়ে আগুয়ান বামপন্থীর আওতা থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে দেশবিভাগেরও হয়তো প্রয়োজন। কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে তাঁর নীতি ছিল স্পষ্ট; হুকুম দিলেন— খাস্ সরকারী সূত্র থেকেই জেনেছিলাম— যে 'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও' থেকে সব কম্যুনিস্টদের সরিয়ে রাখতে হবে। '৪১ থেকে '৪৬ সাল বহু রেডিও বক্তৃতার পর আবিষ্কার করতে হল যে বেতারের দরজা আমাদের কাছে বন্ধ। মজা লাগল সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর চিঠিপত্র দেখে যে এন. এম. জোশীর মতো মানুষ সম্পর্কেও তাঁর কম্যুনিস্ট সন্দেহ জানিয়ে বলছেন যে কম্যুনিস্টরা অনেকে কাজের লোক হতে পারে কিন্তু 'সোনার ছুরি' হলেও তো সেটা ছুরি! ('Sarder Patel's Correspondence', Vol III. ed Durga Das দ্রষ্টব্য)।

দিল্লী-সিমলা-লণ্ডনে জওয়াহরলাল এবং জিন্নাকে নিয়ে বড়লাট মাউন্টব্যাটন্ যে-'বাহাদুরী-কা-খেল' দেখালেন, তার সাক্ষাৎ জ্ঞান আমার নেই। তবে মনে আছে বিলাতের পার্লামেন্টে স্ট্যাফর্ড্ ক্রিপস্ এর ঘোষণা (মার্চ ১৯৪৭) যে বিপুল সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করে ভারতবর্ষকে খাস দখলে রাখা আর সম্ভব নয়, তাই অন্য পথ নেই, 'ক্ষমতার হস্তান্তর' (ভারত ও পাকিস্তানের হাতে) হল একমাত্র সমীচীন ব্যবস্থা। স্বয়ং গান্ধীজী সেদিনের পরিস্থিতিতে 'হরিজন' পত্রিকায় লেখেন যে 'ফরাসী, কিম্বা সোভিয়েট, এমন কি ইংলণ্ডের বিপ্লবের মতো' কাণ্ড ঘটিয়ে 'রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে'র মূল্যে স্বাধীনতা ক্রয় করার কথা যারা ভাবে তারা 'খোলাখুলি এবং সৎভাবে' সেকাজ তো আরম্ভ করতে পারে নি! এই পরোক্ষ অভিযোগে আমরাই

তো অভিযুক্ত, কিন্তু আমাদের সাধ্য ছিল না, তখনকার উদ্ভট অবস্থায় হয়তো সাধ্যও হয় নি। গান্ধী নিজে নিজের ব্যর্থতায় ক্লিষ্ট হয়েছিলেন; 'আর আমার ১২৫ বছর বাঁচার ইচ্ছা নেই, আমার জীবন বিফল হয়েছে', এ-কথা বারবার বললেন যখন দেশবিভাগকে মহাপাতক বলে তিনি বর্ণনা করলেন। '৪৬-'৪৭ সালে প্রায়-অশীতিপর মহাত্মা কলকাতায় এসে বেলেঘাটায় মুসলিম গৃহে রইলেন, গেলেন নোয়াখালি, বিহার শফর করলেন, পঞ্জাবে যেতে চাইলেন, আবার এলেন কলকাতা, পরে গেলেন দিল্লী, যেখানে '৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি আততায়ীর হাতে তাঁর জীবনান্ত। বৃদ্ধবয়সে বাংলা শিখতে বসলেন, বললেন 'আমি আজ বাঙালী হয়েছি'— '৪৭ সালের মে মাসে 'সংযুক্ত স্বাধীন বাংলা' নিয়ে যে ধ্বনি উঠল, কিরণশঙ্কর রায় আর সোহ্‌রাওয়ার্দি সে-বিষয়ে কথাবার্তা চালালেন, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে পরামর্শ হল (মনে আছে কিরণবাবুর বাড়িতে আলোচনায় আমিও যোগ দিয়েছি), সেই ধ্বনিকে গান্ধী স্বাগত জানাতে চাইলেন, তবে নিজস্ব অবাস্তব ভঙ্গীতে। সোহ্‌রা-ওয়ার্দিকে বললেন গান্ধী : 'আমি তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে সংযুক্ত বাংলার জন্য খাটব, তবে তোমার সম্বন্ধে অনেকেরই মনে যে সন্দেহ তা তোমাকে কাটাতে হবে, আর আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে সর্ব অবস্থায় অহিংস পদ্ধতিতে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাংলার ঐক্য অটুট রাখবে'। হাওয়া তখন চলছিল উলটো দিকে, তাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলা আর পঞ্জাবের যে-সব অঞ্চলে অমুসলমানদের সংখ্যাধিক্য সেগুলিকে সরিয়ে ভারতে এবং বাকি এলাকা পাকিস্তানে পাঠাবার যে প্রস্তাব নিয়ে তুমুল আওয়াজ তুললেন, সাম্রাজ্যবাদের আনুকূল্যে তারই জয় হল, বাংলায় শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি কংগ্রেস নেতা সায় দিলেন, 'সংযুক্ত বাংলা' প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত দানা না বাঁধায় তার প্রকৃত প্রাসঙ্গিকতা রইল না। দেশবিভাগ তাই এল যেন গ্রীক 'ট্র্যাজেডি'-র অবশ্যম্ভাবিতা নিয়ে। কলকাতায় আমরা দেখলাম সাম্প্রদায়িক অশান্তি মিলিয়ে যাচ্ছে না; শুধু বেলেঘাটায় মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি যেন একটা আশার বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে; দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একেবারে ওপরতলার মন্ত্রণায়; জনশক্তি ইতিহাসের নব অধ্যায় সূচনার সময়েও হৃতবীর্য, মুহ্যমান্।

১৫ই আগস্টের আগের দিন বিকালে হঠাৎ কলকাতার চেহারা বদ্‌লালো,

জনতা যেন সুপ্তোত্থিত সিংহের মতো আবার কেশর নাড়াল। তড়িৎগতিতে খবর ছড়ালো শহর জুড়ে যে কলুটোলার 'বড়ামস্‌জিদে' হিন্দুদের কোল দেওয়া হচ্ছে, অদ্ভুত উদ্দীপনার মধ্যে হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে, মিঠাই বিতরণ হচ্ছে। দেখতে দেখতে গোটা শহর আর শহরতলীতে অপূর্ব উল্লাস— আগেকার কয়েকটা অসম্ভব মাসের রুদ্ধশ্বাস মর্মবেদনা যেন আনন্দের বন্যায় মন থেকে সাফ্‌ হয়ে বেরিয়ে গেছে, চারদিকে কলরোল 'হিন্দুমুসলমান কী জয়'! ১৫ই আগস্টের দৃশ্য তো বর্ণনা করা যায় না, ভোলাও যায় না— রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছে: 'কবে যে দুঃখজ্বালা হবে রে বিজয় মালা/ঝলিবে অরুণ রাগে/নিশীথ রাতের কাঁদা'। অহোরাত্র আবালবৃদ্ধবনিতা যেন পাগল; কলকাতার রাজভবন, যা ছিল চিরকালের নিষিদ্ধ এলাকা, সেখানে জনস্রোত— কার কাছে যেন শুনলাম আনন্দের এমনই জোয়ার যে গুরুগম্ভীর অধ্যাপককে দেখা গেছে উল্লসিত জনতার অনুসরণে লাটবাড়ির রেলিং টপ্‌কে ঢুকছেন! জলস্রোতের মতো সেদিন জনস্রোত সর্বত্র— দেশভাগের দুঃখ তখনকার মতো সবাই ভুলেছি, বুক ভরে শুধু অনাস্বাদিতপূর্ব অহংকার, আমার দেশ তো আজ স্বাধীন!

মনে পড়ছে সেদিন সোভিয়েট-সুহৃৎ সমিতির অফিসে উদ্দীপনা। পার্টি দফ্‌তরে আনন্দের মাতামাতি। পথে, গৃহাভ্যন্তরে সর্বত্র উল্লাস। দক্ষিণ-ভারতীয়দের নিয়ে এক সভা করলাম সকালে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় আরো কয়েকটি জমায়েতে বলতে হল। তালতলায় এক স্মরণীয় সমাবেশ হয়েছিল —বললেন সৈয়দ বদরুদ্দোজা, বাংলা উর্দু ইংরিজীতে উদ্দীপ্ত ওজস্বিতায় যাঁর সমকক্ষ নেই, বললেন কম্যুনিস্ট নেতা ভবানী সেন, বিশ্লেষণে সংহত আবেগ যাঁর মজ্জাগত। এদের পরে বলতে উঠে একটু অস্বস্তি হয়তো ছিল, কিন্তু কাটতে দেরি লাগে নি। তেমন ভালো বলা জীবনে কম বলেছি— 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী··· 'মন ভরে ছিল সেদিন সকলের, শ্রোতা-বক্তা প্রত্যেকের।

উপেন বাঁড়ুজ্জে মশায়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম, কে যেন জিজ্ঞাসা করে দেশ স্বাধীন হলে তিনি কী করবেন, আর তাঁর জবাব ছিল: প্রথমেই একচোট্ দৌড় দিয়ে আসব যতটা পারি, তার পর খাব যতগুলো পারি রসগোল্লা, তার পর লম্বা ঘুম, তার পর জানি না কী করব! '৪৭ সালের

১৫ই আগস্ট অনেকটা আমাদেরও সেই অবস্থা। ১৬ তারিখে বোধ হয় সবাই মিলে মিশে মস্ত মিছিলে গেলাম বেলেঘাটায় গান্ধীর কাছে। ১৭ই বোধ হয় ঈদ্; ময়দানে হিন্দুমুসলমান প্রাতৃভাবের প্রাণোচ্ছল দৃশ্য। ১লা সেপ্টেম্বর হঠাৎ আবার তার কেটে গেল। কিন্তু জনতার শুভবুদ্ধি আর মহাত্মার উপস্থিতি সংকটকে জয় করল, বিপদ দূর হল। চক্রান্তের চাপে আর আমাদের পাপে স্বাধীনতা যতই বিড়ম্বনাদুষ্ট হোক্-না কেন, দুশো বছরের গ্লানি যে আগেকার মতো নোংরা বোঝা আর আমাদের বুকে চাপিয়ে রাখতে পারে নি, এ-চেতনা তো কম মহার্ঘ নয়। আর রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গিয়েছিলেন অভয় বাণী, সকল শঙ্কা জয় করে জীবনের ডঙ্কা বাজাতে হবে সুপ্রভাতে, অন্ধকার দেখে ভয় পাওয়া চলবে না— বিপদ দল বেঁধে আসে আসুক, রাত তো ভোর হয়েছে : 'ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে, মেঘের সিংহবাহনে!'

নির্দেশিকা